বঙ্গবাণী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ—দ্বিতীয়ার্দ্ধ

ভাদ্র হইতে মাঘ, ১৩৩২

সম্পাদক—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্য্যাধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কার্য্যালয়—৭৭নং রসারোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৪৸৹] [প্রতি সংখ্যা

চতুর্থ বর্ষ

দ্বিতীয় ষাণ্মাষিক বর্ণানুক্রমিক

বিষয় সূচী

ভাদ্র হইতে মাঘ

১৩৩২

লেখক সূচী

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

ভাদ্র

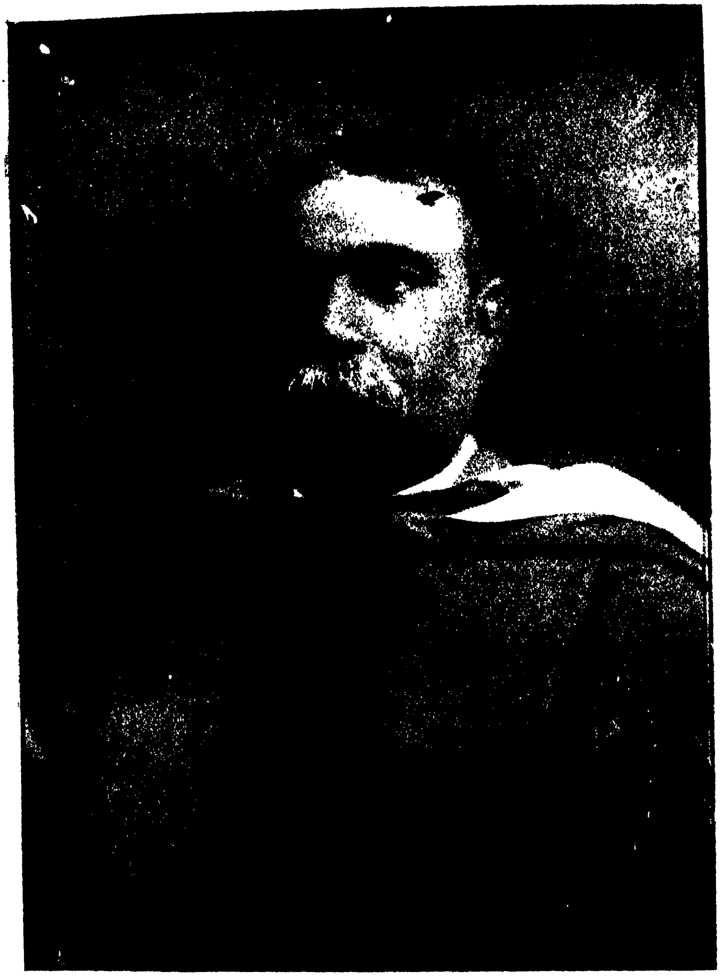
আশ্বিন

কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ



বঙ্গবাণী

সম্পাদক

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্যালয়

৭৭ নং রসা রোড নর্থ,

ভবানীপুর।



দর্শন দরবাজাতে আলমগীর

শিল্পী—ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।　　কলিকাতা রিভিউর সৌজন্যে

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

ভাদ্র

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
১ম সংখ্যা

শেলী*

Out of the day and night
A joy has taken flight
Fresh spring and summer and winter hoar
Move my faint heart with grief but with delight
No more—oh, never more. †

* শেলীর জীবনী আলোচনাও যেমন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে তেমনি তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যের আভাস দেওয়াও ইহার লক্ষ্য নহে। অথচ জীবন এবং কাব্যের মূলে মানবের যে অধ্যাত্ম চেতনা রহিয়াছে তাহারই বিকাশ শেলীর জীবনে কি ভাবে ঘটিয়াছিল, তাঁহার কাব্য হইতে তাহারই একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা আমি করিয়াছি। কবির অন্তর্জীবনের বিকাশ ও পরিণতি—অন্তরে অন্তরে শেলী বাস্তবিক কোন অনুভবের প্রেরণায় চলিয়াছিলেন—তাহার সত্য ইতিহাসটি বহির্জ্জীবনের কতকগুলি ঘটনার মধ্য হইতে অনুমান করা যে সহজ নহে তাহা সকলেই জানেন। কাব্য জীবনেরই সত্য অনুভব হইতে উদ্ভূত তাহার মধ্যে জীবনের প্রকৃত ইতিহাসটি বেশী প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই সম্ভাবনাটুকু স্বীকার করিয়া লইয়া এই প্রবন্ধের সূত্র-পাত। এই ভাবে 'idealised history of the soul' কল্পলোকবাসী মানবাত্মার জীবনী লিখিবার চেষ্টা পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। প্রথম চেষ্টা হিসাবে ইহার ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। —ম।

† A Lament. ১৮২১.

ইংরাজী সাহিত্যের নবযুগের অন্যতম কবি শেলীর (১৭৯২-১৮২২খৃঃ) মরজীবনের অবসান হইয়া গিয়াছে সে আজিকার কথা নহে। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে আসন্ন ঝটিকার মুখে শেলী সমুদ্রে তরণী ভাসাইয়া ছিলেন—সেইখানেই শেলীর সঙ্গে বহির্জ্জগতের বিদায়। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের শেলীকে আমরা হারাই নাই। যাঁহার জীবন একটা বিষম ব্যথাময় করুণ সঙ্গীতের মত একবার ফুটিয়া উঠিয়া নিস্তব্ধ নৈশ আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে—যাঁহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারাশি ঝরাফুলের মত ম্লান হইয়া হাওয়ার মুখে কি জানি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, সেই শেলীর কথা বলিতে বসিয়া কত কথাই মনে পড়িতেছে!

বড় মধুর বড়ই ব্যথাবিধুর এই নামটি। নাম শুনিতেই অতি স্পষ্ট হইয়া মানসনয়নের সম্মুখে সুপ্ত নিশীথে নীলাকাশে চন্দ্রের মত একখানি বড় সুন্দর, বড় বেদনা-করুণ, বড় কোমল মুখ ভাসিয়া উঠে। সমগ্র বিশ্বজগতের উন্মাদ কোলাহল পশ্চাতে মিলাইয়া যায়, অন্তরে ওই দুটি ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টির মাঝে অন্তর লীন হইয়া যায়—মুখের কথা মুখেই থাকিয়া যায়, চিন্তাও যেন স্তব্ধ হইয়া পড়ে, শুধু কোন্ অকারণ দুঃখে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে।—তার পর অন্তর কাঁদিয়া বলিয়া উঠে, কেন বিধাতা এমন কোমল প্রাণটিকে এই কঠোর নির্ম্মম পাপতাপময় জগতে পাঠাইয়াছিলে, কেনই বা তাহাকে আবার এমন ব্যর্থ করিয়া ফিরাইয়া দিলে; কেন এই অভিমানী প্রাণ শিশুর এতটুকু আদরও করিলে না! কোন অপরাধে, নিষ্ঠুর নীরব উপহাসে তাহার প্রাণের ব্যাকুল প্রশ্নকে বিড়ম্বিত করিলে! বুঝিনা, কেন! বোধ করি প্রতি মানব অন্তরের নিদারুণ নিয়তিকেই এমন করিয়া দেখাইলে!

তাই বুঝি শেলীর কথা ভুলিতে পারা যায় না। শেলীর কথা ভাবিতে বসিয়া আর এক অভিমানীর কথা মনে পড়িয়া গেল—সেটি শেলীরই সমসাময়িক বায়রণ (১৭৮৮-১৮২৪ খৃঃ)। কতকগুলি উদ্দামপ্রকৃতির বালক আছে তাহারা যেমন দারুণ অভিমানের বেগ আপনার অন্তরে অবরুদ্ধ করিতে না পারিয়া যাহা সম্মুখে পায় বিরক্তিভাবে তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, দিগ্বিদিকে প্রলয় জাগাইয়া "ঝড়ের মত শান্তি" খুঁজিতে থাকে, এই বায়রণও সেই প্রকৃতি লইয়া আসিয়াছিলেন, অভিমানের অগ্নিজ্বালা তিনি আপনার হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু তা-বলিয়া শেলীর হৃদয়ের অভিমানই কি কম ছিল!

উভয়েরই হৃদয়ের অপার বাসনারাশি যখন বাধাময় বাস্তব জগতের সীমায় আসিয়া আহত হইয়াছিল, তখন উভয়ের অন্তরে ব্যথা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। এই আঘাত পাওয়ার ফলেই এই দুটি মহাপ্রাণের স্বরূপ জগতের দৃষ্টিকে চমকিত করিয়া তুলিল—মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের প্রাণের অপরিসীম ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সমগ্র ইউরোপের চিত্ত যখন সামাজিক মোহের গণ্ডী, রাজনৈতিক শাসনের গণ্ডী, চিন্তার গণ্ডী, অনুভবের গণ্ডীর মাঝে একেবারে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, যখন চারিদিক হইতে কারাগৃহের অবরুদ্ধতা বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া

হৃদয়ের স্পন্দন, প্রাণের স্পন্দনকে থামাইয়া দিবার বিভীষিকা দেখাইতেছিল, যখন চারিদিকের আকাশ বাতাস ভরিয়া সীমার নিষ্ঠুরতাকে দলন করিয়া স্বাধীন হইবার একটা অস্পষ্ট রুদ্ধ আবেগ অনুভূত হইতেছিল, ঠিক সেই গ্রীষ্ম-বর্ষার সন্ধিক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগ প্রেরণা লইয়া এই দুইজনের আবির্ভাব। তাই দেখিতে পাই যে দিকে যে রকমের হোক্, স্বাধীনতার এতটুকু আভাস মাত্র পাইলে এই দুটি 'এওলীয়' হৃদয়বীণা ঝঙ্কারমুখর হইয়া উঠিত। কিন্তু—অবশেষে—কি করুণ সমাপ্তির মাঝেই না এই দুটি প্রাণ নীরব হইয়া গেল! উভয়েরই অসমাপ্ত জীবনের দিকে চাহিয়া মনে হয় যেন কোন মহান্ শিল্পীর দুখানি অসমাপ্ত কাব্য—কি হইতে পারিত তাহারই সকরুণ বিস্ময় জাগাইতেছে! কে যেন কোন্ নিভৃত বনপ্রান্ত হইতে গভীর নিশীথে গাহিতেছে শুনিতে পাই—"ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে!" এই দুটি করুণ জীবনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষকালে আপনা হইতেই বলিতে ইচ্ছা হয় "কিছুনা, এই জীবনটা শুধু একটা কোলাহল মাত্র—নীরব নিস্পন্দ আকাশের মাঝে ক্ষুদ্র শিশুর চীৎকার মাত্র।" মনে হয় " it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. "

বলিতেছিলাম যে শেলীর কথা মনে হইলেই বায়রণের কথাও মনে পড়িয়া যায়। ইঁহাদের সাদৃশ্যই ইহার কারণ; কিন্তু ইঁহাদের সাদৃশ্যও যেমন অপরূপ, তেমনি স্বাতন্ত্র্যও এত স্পষ্ট যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা ধরা পড়ে। হৃদয়ের অনুভবের তীব্রতা ইঁহাদের অতুল, জীবনের ব্যথাকে এমন তীব্রভাবে অনুভব খুব কম লোকেই করিয়া থাকে। তাই দুজনেই বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন —এই ব্যথা পাওয়ার মাঝেই আবার তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিমান করিয়া বা আহত হইয়া চুপ করিয়া থাকা বায়রণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তিনি যেখানে ব্যথা পাইতেন, ঘা দিয়া উঠিতেন, চীৎকার করিয়া ক্রুদ্ধদর্পে জানাইয়া দিতেন যে জড় পদার্থে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু শেলী ব্যথা লইয়া নীরব; বায়রণ যেখানে উচ্চকণ্ঠে চতুষ্পার্শ্বের লোককে চমকিত করিয়াছেন, শেলী সেখানে আপনার অন্তরে ব্যথা গুটাইয়া অসাড় হইয়া গিয়াছেন। এই দুটিই তীব্র অভিমানী প্রকৃতির লক্ষণ—কিন্তু শেলীর বেদনা যেন বড় গভীর, তাই তাঁহার মৌন অভিমান যেন আরও তীব্র। সেইজন্য তাঁহার গান, তাঁহার কবিতা আমাদিগকে বেদনায় বিষাদনম্র করিয়া তোলে। বায়রণের মত উচ্ছৃঙ্খল প্রতিঘাতপরায়ণ, কটুব্যঙ্গপ্রিয় করিয়া তোলে না।

অনেকে বায়রণকে অহঙ্কারী বলিয়াছেন। কথাটা সাধারণতঃ যাহা বোঝায় তাহা বলিতে সঙ্কোচ হয়, কেন না, বায়রণ ঠিক অহঙ্কারী ছিলেন না। কিন্তু এইটুকু বলিতেই হইবে যে বায়রণ আপনার অভাব অভিযোগ লইয়াই এত ব্যস্ত ও মগ্ন থাকিতেন যে অন্যদিকে চাহিবার অবসরই তাঁহার হইত না। বায়রণ হৃদয়হীন একথা কে বলিবে? কিন্তু তাঁহার নিজের দুঃখবোধের আতিশয্য তাঁহাকে অন্যের অবস্থার কথা ভাবিতে দিত না। সেইজন্য বায়রণে ক্ষমা পাইনা।

যে ক্ষমা আপনার সমূহ ক্ষতি ও বেদনা বিস্মৃত হইয়া শত্রুর দিকেও করুণাবিগলিত বুক বাড়াইয়া দেয় তাহা বায়রণে পাই না। তাই যেখানে তিনি আহত সেখানেই তিনি দ্বিগুণ বলে আঘাত দিতে উদ্যত। তিনি ভাবিতেও পারেন না যে যাহার নিকট হইতে আঘাত আসিয়াছে তাহার অবস্থা এমনই করুণ হইতে পারে যে আঘাত দেওয়াই সেখানে অন্যায়।

শেলীর মাঝে কিন্তু এই গুণটি খুবই পাই। তাই তাঁহার লেখায় কোন মানুষের উপর ক্রোধের এতটুকু চিহ্নও পাই না। পাপকে অন্যায়কে উৎপীড়নকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া ঘৃণা করিতেন, তাহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পাপীকে উৎপীড়নকারীকে তিনি করুণার চক্ষে, অজ্ঞান বলিয়া সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে কখনও ভুলিতেন না। বায়রণের মত শেলীরও হৃদয়ে ঘোর অতৃপ্তির দাহ ছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের সেই জ্বালা কখনও তিনি বহির্জ্জগতে ছড়াইতে পারিতেন না। আপনার মাঝে সব গুটাইয়া রাখিতেই তিনি ভাল বাসিতেন। শেলীও বুঝিয়াছিলেন যে এই জীবন সার্থক হইবার নয়। ইহা শুধু একটা তৃপ্তিহীন পিপাসা, ইহার মাঝে আছে শুধু প্রতীক্ষা. শঙ্কিত দ্বিধাজড়িত চলা, সন্দেহ সংশয় আর অননুভূত প্রেম সম্ভাষণের কল্পনাপোষণ মাত্র—আর আছে শিরায় শিরায় ব্যস্তভাবনা ও অন্ধ অনুভবের হাতড়াইয়া ফেরা মাত্র। আর কিছুই নহে।

To thirst and find no fill—to wail and wander
With short unsteady steps—to pause and ponder—
To feel the blood run through the veins and tingle
Where busy thought and blind sensation mingle;
To nurse the image of unfelt caresses
Till dim imagination just possesses
The half-created shadow, then all the night
Sick......

এইরূপ ব্যর্থতার আঘাতে জ্বলিয়া উঠিয়া চারিদিকে আগুন জ্বালাইতে বায়রণ সঙ্কুচিত হন নাই; কিন্তু সেই আগুনের স্পর্শ দিয়া কাহাকেও কষ্ট দিতে শেলীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। অন্যের এতটুকু দুঃখের নিকট শেলীর আপনার সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। প্রেমের এই গভীরতা শেলীর ছিল বলিয়াই তিনি আপনার জ্বালাময় নীরব বিদ্রোহ দমন করিতে শিখিয়াছিলেন "to sit and curb the soul's mute rage which preys upon itself alone."

মানুষের গড়া এবং বিধাতার গড়া বিধিবিধান এই দুজনের কাহারও মনঃপুত ছিল না। বায়রণ যেই বুঝিলেন যে তিনি বিধাতার চক্রান্তে একটা বন্দী মাত্র—কতকগুলি নিয়মের দুর্লঙ্ঘ্য অধীনতা স্বীকার করিয়া না চলিলে স্বস্তি নাই, অমনি বিধাতার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর মত দাঁড়াইয়া বলিলেন তিনি স্বাধীন। শত অক্ষমতার দ্বারা লাঞ্ছিত হইলেও তাঁহার ইচ্ছা কাহারও অনুসরণ করিবে না, কাহারও নিকট নত হইবে না,—ইহাই যেন তাঁহার পণ হইয়া দাঁড়াইল। কারা-

প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার প্রবল চেষ্টায় শব্দও যেমন বিস্তর হইল, অনর্থক আঘাতও তেমনি খুবই পাইলেন। এই কোলাহলে, চিরন্তন প্রথার সন্ধানুবর্ত্তী মানুষের কানেও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল—তাহারাও চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু এই কারাগারের দম-বন্ধ-করা অবরুদ্ধতার যাতনা যে এই একটি প্রাণীই তখন অনুভব করিতেছিল তাহা নয়, আর একটি মুক্তিশিশু বায়রণের পার্শ্বে বেদনামূক হইয়া বসিয়াছিল, সে একবার হয়ত যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তখনই সে আবার নীরব হইয়া গেল। শেলী চীৎকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনটাই ছিল মুক্তির জন্য একটা মর্ম্মস্পর্শী নীরব ক্রন্দন।

প্রথম শেলী ভাবিতেন ধরার উপর স্বাধীনতার স্বর্গ, অমরতার স্বর্গ, আনন্দের স্বর্গ গড়িয়া তোলা অসম্ভব নয়। কোথা হইতে জানি না শেলীর তরুণ জীবনেই এই মহতী সম্ভাবনার উজ্জ্বল রশ্মিপাত হইয়াছিল এবং তাহাতে শেলীর কোমল দৃষ্টি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাই বায়রণ যখন উচ্চকণ্ঠে বলিতেছিলেন "ভাঙ্গ ভাঙ্গ এই পাষাণকারা" তখন তাঁহারই পার্শ্বে চুপ করিয়া থাকিয়া, শেলী এক নবসূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রতীক্ষার অবসান হইল, সম্ভাবনা সম্ভাবনাই রহিয়া গেল—অবশেষে বুঝিতে হইল যে একটা ভ্রান্ত স্বপ্ন মাত্র তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। পূর্ণতার যে আদর্শ শেলীর চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা চিরন্তন মানব যৌবনের একটি পবিত্র সুন্দর বসন্ত-স্বপ্ন, জগতের বাস্তব সীমায় তাহার বিকাশ হইতে পারে না, ইহা যখন শেলীর অন্তর বুঝিতে পারিল তখন হইতেই শেলীর হৃদয়ে বিষাদ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্ন টুটিয়া গেল, কিন্তু তাহার মোহাবেশ তাহার জীবনের প্রতি তন্ত্রীতে জড়াইয়া রহিল।

শেলীর অন্তর বড় আশা করিয়াছিল যে প্রেমের প্রভাবে সে জগৎটাকে সত্য স্বাধীনতা ও আনন্দের আবাস করিয়া তুলিবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সকলকে কল্যাণের সমভাগী করা, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া, ভীষণ অত্যাচারের জন্য অশ্রুপাত, আত্মতৃপ্তি, এবং কাহারও উপর কোন অত্যাচার না করিতে হইলে যে সব চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন সেই সব বৃত্তি লাভ করা, আনন্দে জীবন যাপন কিম্বা দুর্দ্দশাগ্রস্তের জন্য করুণা ও সহানুভূতি অনুভব করা একমাত্র প্রেম থাকিলেই সম্ভব হয় (Revolt of Islam viii, 12 ১৮১৭ খৃঃ)। অর্থাৎ যত অত্যাচার যত দুঃখ দৈন্য, যত কিছু অভাব ও অশান্তি, সকলের মূলে মানুষে মানুষে সত্য প্রেমের অভাব—ইহা শেলী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ, অহঙ্কারহীন, সরল, গভীর প্রেমিক হৃদয় মানুষের অজ্ঞান দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিল।* মানুষের অজ্ঞানই জগতের ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা

* He was the most gentle, the most amiable and least worldly-minded person I ever met; full of delicacy, disinterested beyond all other men, and possessing a degree of genius joined to simplicity as rare as it is admirable. He had formed to himself a beau ideal of all that is fine high-minded and noble and he acted upto this ideal even to the very letter— BYRON.

কপটতা ও মিথ্যাচারকে জন্ম দিয়া এই জগৎটাকে একটা পাশব অশান্তিময়, বিরোধময় দৃশ্যে পরিণত করিয়া তোলে—ইহাই শেলীর বিশ্বাস ছিল। তিনি কিছুতেই অন্তরে স্বীকার করিতে পারিতেন না যে, এই বিপুল বিশ্বের নিদানভূতশক্তি একটা নির্ম্মম খামখেয়ালী কিছু মাত্র—তাঁহার অন্তর কেবলই বলিত এক অনন্ত প্রেমময় শক্তি এই বিশ্বসৃষ্টিকে ক্রমাগত সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।—ইহাই ছিল শেলীর প্রথম জীবনের স্বপ্ন। যতদিন এই স্বপ্নের মুগ্ধতা শেলীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন তাঁহার জীবন বিষাদতিক্ত হইয়া উঠে নাই,—তখনও আশা ছিল কোন অপূর্ব্ব প্রেমানুভূতির মধ্যে তিনি নিজের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবেন। তাঁহার প্রেমের তীব্র পিপাসাই তাঁহার মনে এই বিশ্বাসটিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল যে বিশ্ব এক পরম প্রেমেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র সেই জন্য প্রেমের দ্বারা সেই পরম জ্যোতিঃর মাঝে আত্মবিলয়কেই তিনি জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়াছিলেন।

শেলী ছিলেন প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের তন্ময় উপাসক। তাই যখনই কোথাও সৌন্দর্য্য সত্য এবং প্রেমের কণামাত্র আভাসপাইতেন, তখনই তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, জীবনব্যাপী দুঃখের তীব্র অভিজ্ঞতাকে নিমেষের মাঝে ধূলার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া আনন্দ-গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া Skylarkএর মত বিমান-পথে উধাও হইয়া যাইতেন। প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার এমন মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ ছিল বলিয়াই দেখিতে পাই যে, এত বিরোধী অভিজ্ঞতার মধ্যেও কিছুতেই তিনি প্রেমকে ক্ষণিক কিম্বা বিনশ্বর বলিতে পারেন নাই। সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস তুলিয়া যে পুষ্পোদ্যানে আনন্দ-সঙ্গীত বহিয়া চলিয়াছিল সেখানে আজ সঙ্গীত থামিয়া গিয়াছে, পুষ্পরাশি একে একে ম্লান হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে—শীতের কঠোর আঘাতে সব সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে মৃত্যুর অসাড় স্তব্ধতা, তাহার মধ্যে ভগ্নহৃদয়ের "পত্রহীন ধ্বংসাবশেষ" মাত্র মূক সাক্ষীর মত, মৃত-কঙ্কালের মত বিগত মহিমার, অতীত জীবনোচ্ছ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তবুও শেলী বলিতেছেন, না, না, তারা কিছুই নষ্ট হয় নাই, বদলাইয়া গিয়াছি শুধু আমরাই; কারণ প্রেম, সৌন্দর্য্য, আনন্দ ইহাদের পরিবর্ত্তন নাই, মৃত্যু নাই (Sensitive Plant 134-137)।*

প্রথম জীবনের এই বিশ্বাসটুকু বুকে জড়াইয়া এই জীবন সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়াও শেলী কোনও রকমে মাথা উচু করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার বুঝি তাহাও সহিতেছিল না! তাই আঘাতের পর আঘাত দিয়া একেবারে নিরাশ্রয় করিবার জন্য যেন বিধাতার জেদ চড়িয়া গিয়াছিল। একদিকে বিশ্বজগতের নশ্বরতা আর অপরদিকে হৃদয়ের চিরন্তন আশ্রয়ের ব্যাকুলতা—এ দুয়ের অসামঞ্জস্য শেলীর হৃদয়কে দিনের পর দিন গভীরতর বিষাদে ও নৈরাশ্যে অবসন্ন করিয়া দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একএকটা নিবিড় মুহূর্ত্ত আসিত সত্য, যখন তাহার অন্তর প্রেমানুভূতির মধ্যে মগ্ন হইয়া যাইত, এবং অপার আনন্দ তাঁহার জীবনের সকল জ্বালা হরণ করিয়া লইত। কিন্তু

* Sensitive Plant ১৮২০ খৃঃ।

এই বিরোধ বিস্মৃতিময় মুহূর্ত্তগুলি ত চিরকাল থাকিত না, আবার যোগ 'trance' ভাঙ্গিয়া যাইত, আবার কঠোর সংসারের কঠোর নির্ম্মম সত্যের আঘাতে কাঁদিতে হইত। অবশেষে তাই দেখিতে পাই শেলীর অন্তরাকাশে আশার আলোক নিবিয়া আসিতেছে, যেন দিগন্তের পরপার হইতে, চেতনার অদৃশ্য গোপন স্তর হইতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার বাহির হইয়া আসিয়া তাহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; অন্তর যেন তাহার বড় অনিচ্ছায়, বড় বেদনায় স্বীকার করিতেছে যে, যাহার মধ্যে জীবনের চরম আনন্দ, তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না—"সে অচিন্ পাখী কমনে আসে যায়" কেউ জানে না, তাহাকে কেউ ধরিয়া রাখিতে পারে না।

শেলীর প্রেমলাভে এই তীব্র নৈরাশ্য, তাহার প্রেমানুভবের তীব্রতার অনুপাতেই হইয়াছিল। শেলীর প্রেম যে কি তীব্র তাহার পরিচয় পাই 'Epipsychidion'এ; * 'Prince Athanese' † যাহা পাইতেছিলেন না বলিয়া এক অদ্ভুত অস্পষ্ট, অজ্ঞাত দুঃখের ("sorrow strange and shadowy and unknown)" আঘাতে মূক হইয়া পড়িতেছিলেন, Alastor এ ‡ 'কবি' যে মানসী প্রেমময়ীর সন্ধানে মৃত্যুকে বরণ করিলেন Epipsychidion সেই প্রেমের সাফল্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি। শেলীর অন্তরাত্মা সারাজীবন একটি মনের মানুষের, মরমের দরদীর সন্ধানে ফিরিতেছিল। জীবনের মাঝে তাহাকে ক্ষণিকের মত পাইয়া, তাহাকেই আপনার হৃদয়ের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তিনি যে মানসী মূর্ত্তি আপনি দেখিয়াছেন ও যাহার চরণে আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্যের প্রতিমাই Epipsychidion. এই "সোণার স্বপন সাধের সাধনা" একদিন "একটি নিবিড় নিমেষে" শেলীর জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই জন্যই শেলীর সমগ্র প্রাণের প্রেমব্যাকুল নিবিড় তীব্রতার সন্ধান করিতে হইলে এই Epipsychidionএর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। § আপনার চিরজনমের প্রার্থিত প্রেমাস্পদকে যখন পাই-পাই মনে করিয়াই আনন্দ-আবেগে তাঁহার চিত্ত উচ্ছ্বসিত তখন তিনি বলিতেছেন "ওগো আমি একান্তই তোমার—আহা আমি ত 'তোমার' নই—আমি যে তোমারই একাংশ মাত্র" (Ep. 51–2)। প্রেমাস্পদের মধুর কথায় তিনি আত্মহারা হইয়া এক তীব্র ব্যাকুলতার মাঝে মগ্ন হইয়া যান; যেমন করিয়া উষার শিশির সূর্য্যালোকে আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, দরদীর অপূর্ব্ব সঙ্গীতে তাঁহার হৃদয়ও তেমনি গলিয়া মিলাইয়া যায়—as morning dew in the sunshine dies—মনে হয় যেন ধ্যানে গ্রহনক্ষত্রের মধুর সঙ্গীত শোনা যায়,

Sweet as stops of planetary music heard in trance.

প্রেমের প্রভাবে তিনি এমনই করিয়া প্রেমাস্পদের সহিত এক হইয়া যাইতেন। কেবল

---

* Epipsychidion ১৮২১ খৃঃ। † Prince Athanese ১৮১৭ খৃঃ।] ‡ Alastor ১৮১৫ খৃঃ।

§ শেলী বলিয়াছেন "It is an idealised history of my life and feeling" "ইহা আমার জীবন এবং অনুভবের একখানি কাব্যেতিহাস"—Shelly to John Gisborne from Lerici, June 18, 1822.

যে কোনও একটি ব্যক্তির সহিত প্রেমের একাত্মতা অনুভব করিয়াই শেলী আত্মহারা হইতেন তাহা নয়, সমগ্র বিশ্বজগতেই তিনি প্রেমের এই অপরূপ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুধু যে ব্যক্তিজীবনকেই প্রেমের লীলা বলিয়া তাঁহার মনে হইত তাহা নয়। এই বিশ্বের অনন্ত গতিবৈচিত্র্যে যে একই বিশ্বব্যাপী প্রেমের লীলামাত্র, জীবনের অলস তরঙ্গগুলি যে সেই একই শাশ্বত প্রেমশশাঙ্কের গতিকে অনুসরণ করে ;

The eternal Moon of Love under whose motions
The life's dull waves move.

তাহা তাঁহার অন্তরে বিদ্যুৎঝলকের মত ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। যেন কোন্ অদৃশ্য রহস্যের ইঙ্গিতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেবতা ও কীটাণুকীট উভয়েই অরূপ প্রেমের বিকশিত মূর্ত্তি ; তাই তিনি বলিতে পারিতেন যে মাটির নীচের কীটেরও অন্তরাত্মা ভালবাসা এবং পূজার মাঝ দিয়া আপনাকে পরমেশ্বরের সহিত মিলাইয়া দেয়,

I know
That Love makes all things equal : I have heard
By mine own heart this joyous truth averred :
The spirit of the worm beneath the sod
In love and worship, blends itself with God.

Ep. 125—29.

সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য যেমন একটি অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদও তেমনি একে অন্যকে পরিপূর্ণ করিয়া একটি অখণ্ড প্রেমের মধ্যে ফুটিয়া আছে (Ep. 142)—ইহাই ছিল শেলীর অনুভবগত বিশ্বাস। তাই প্রেমকে তিনি কোন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার মনে হইত প্রতিরূপই প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি। তাই তাঁহার দৃষ্টিতে প্রেম ভাগের দ্বারা ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয় না, বরং আনন্দ-প্রেম এবং চিন্তাকে যতই ভাগ করা যায়, অংশ সমগ্র হইতে বড় হইয়া উঠে (Ep. 181)। প্রেমে দুই এক হইয়া যায়, প্রেমের পরিণতিতেই "দুইটি ইচ্ছার মধ্যে একই আশা, দুইটি অন্তরে একই ইচ্ছা একই জীবন, এক মৃত্যু, এক স্বর্গ, এক নরক, এক অমরত্ব একই ধ্বংস"। (Ep. 584—86.)

প্রেমের এই স্বরূপ শেলী দেখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, এই স্বরূপকে যদি জীবনের সর্ব্বমুহূর্ত্তে সর্ব্ব অনুভবে প্রতিষ্ঠা না করা যায় তাহা হইলে জীবন চলে না। তাই তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে তাহা হইলে প্রেম ও প্রেমের পরিপূর্ণ আদর্শ কি একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র? যত চাহিলেন দেখিলেন কোনও একটি রূপের মধ্যেই প্রেম নিঃশেষে পরিপূর্ণ হইয়া নাই। হয়ত এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র প্রেম একটি

বিশেষ রূপের মাঝে কেমন একটা পূর্ণতার আভাস লইয়া হৃদয়কে মুগ্ধ করিল কিন্তু প্রেমকে সেখানে কিছুতেই ধরিয়া রাখা সম্ভব হইল না; মনে হইল যেন প্রেম রূপে রূপে লুকোচুরি জুড়িয়া দিয়াছে। এইরূপ অভিজ্ঞতার ফলে শেলীর মনের একটা বিশ্বাস টলিয়া গেল; তাঁহার মনে হইল যে মানবরূপই বলা যাক্ আর যে কোনও রূপই বলা যাক্ প্রতিরূপই প্রেমের একটা ক্ষণিক প্রতিবিম্ব মাত্র—অস্থায়িভাবে রূপের মাঝ দিয়া প্রেম আপনাকে এমনই করিয়া প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। তাই শেলী বলিতেছেন, "আমি কত নরমূর্ত্তির মাঝেই না অবিবেচকের মত আমার মানসী মূর্ত্তির ছায়ার সন্ধান করিয়াছি—

In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought.

সমুদ্রের প্রশান্ত বক্ষ উত্তরে' হাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হইয়া অনন্ত তরঙ্গখণ্ডে যেমন ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার ফলে পূর্ণচন্দ্রের একটি প্রতিবিম্ব যেমন অনন্ত তরঙ্গে খণ্ডিত বিম্বে শুধু ঝিলিমিলি করিতে থাকে—বৃহৎ ভগ্নদর্পণের খণ্ডে খণ্ডে যেমন সুন্দর বালকের সৌন্দর্য্য খণ্ডিত হইয়া প্রতিফলিত হয়, শেলীও এই জগতের দিকে চাহিয়া তেমনি কোন্ অদৃশ্য পূর্ণপ্রেমের ও সৌন্দর্য্যের সহস্রধাবিভক্ত প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন (Passages of the Poem. Ep. 21—26)। সেইজন্যই শেলী আপনার প্রেমাস্পদ মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "ওগো পরম জ্যোতিঃর মূর্ত্তরশ্মি"

O embodied Ray of the Great Brightness !

অর্থাৎ যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আনন্দ শক্তির প্রকাশ সবই সেই একমাত্র পরমসত্যের প্রকাশমাত্র। আমাদের ক্ষণিক আমিত্বের মাঝ দিয়া সেই "শক্তি, প্রেম, আনন্দ, ঈশ্বর" আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন; আমাদের হৃদয়গুলি তাঁহারই ক্ষণিক আবাস মাত্র।

There is a Power, a Love, a Joy, a God which
Makes in mortal hearts its brief abode

Ep. Fragments 134—35.

এই চিরন্তন প্রেমের সম্মুখীন হইয়া শেলীর নিকট মৃত্যুও একটা ছায়ার মত মনে হইত, কারণ প্রেমের নিকট মৃত্যুর যে কোনও অর্থই নাই। তাই তিনি তখন বলিতেন ভয় কিসের! "মাটি মাটি হইয়া যাইবে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মা যেখান হইতে আসিয়াছিল আবার সেই জ্বলন্ত উৎসে ফিরিয়া যাইবে—চিরন্তনের একটা অংশ মাত্র আজকালও পরিবর্ত্তনের মাঝ দিয়া দেখা দিয়াছে—কিন্তু তথাপি এ যে সেই অনির্ব্বাণ আত্মা"* সেই চিরন্তন সত্তার সম্মুখে এই জীবনটাও একটা স্বপ্নমাত্র, একটা ক্ষণিকের উন্মাদনা, স্বপ্নদৃষ্ট ঝঞ্ঝার মত অচঞ্চল সত্তার বুকে একটা মায়ার খেলা মাত্র, তাই

* Adonais XXXVIII. ১৮২১ খৃঃ।

Adonais এর মৃত্যুতে শেলী বলিতেছেন "ওগো, সে কি মরিয়াছে ? না, না, সে শুধু জীবন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। আমরাই শুধু স্বপ্নঝঞ্ঝায় আপনা হারাইয়া ছায়ার সঙ্গে একটা ব্যর্থ যোঝাযুঝি জুড়িয়া দিয়াছি, উন্মত্ত আত্মবিস্মৃতির মাঝে অহননীয় মিথ্যাকে হনন করিবার চেষ্টা করিতেছি।" (Adonais XXXIX) এই যে মৃত্যুকে এড়াইবার প্রবল চেষ্টা ও সংগ্রাম ইহা মিথ্যা, অনর্থক, মৃত্যু বস্তুটাই যে নাই! এ জীবন স্বপ্ন ভগ্ন হইলে মানুষ আবার আপনার খণ্ডতা, সীমাবদ্ধতা হারাইয়া সেই অবাধ অসীম চেতনার সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই ছিল শেলীর বিশ্বাস (Adonais XLII). তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই জীবনের চিরচঞ্চলতার মধ্যে স্থির কিছুই থাকিবে না, কিন্তু তথাপি মহাকালের দৃষ্টি ছাড়াইয়া কোনও কিছুই যাইতে পারে না; খণ্ড বহু নষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু অখণ্ড ঐক্যের বিনাশ নাই

The one remains, many change and pass.

এই কথা কয়টি শেলী একদিন আশ্বাসভরে সান্ত্বনার ছলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আবার এই সত্যটিই শেলীর তীব্রতম বেদনার কারণ হইয়া উঠিল। সত্য হইতে পারে যে, যাহা অনন্তপ্রেম তাহা অক্ষয় এবং অব্যয় কিন্তু এই বিশ্বজগতের কিছুই যে চিরন্তনত্বের দাবী করিতে পারে না ইহাও শেলী মর্ম্মান্তিক সত্য বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলেন "(এ জগতে) নশ্বরতা ছাড়া আর কিছুই থাকিতে পারে না।"* তিনি আরও বুঝিতেছিলেন যে এই জীবনের মাঝে হৃদয়ের অনন্ত সাধ আশা ও ভালবাসা কিছুই চরিতার্থ হইবার নয়। বেদনাকে তুচ্ছ করিবার জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন বটে "এই বিশ্বজগৎটা একটা বিরাট স্বপ্ন, চক্ষের ধাঁধা মাত্র—চেতন আত্মা ভিন্ন আর যাহা কিছু দৃশ্য, জ্ঞেয়, সবই একটা একটা ক্ষণিক স্বপ্ন"† কিন্তু তিনিও ত এই জীবনস্বপ্নে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন ত স্বপ্নের সুখদুঃখ মিথ্যা বলিয়া অনুভব হয় না! স্বপ্নেও দুঃখ, অতৃপ্তি, বিরহ সত্য হইয়া আসিয়া হৃদয়কে ব্যথাবিদ্ধ করে। শেলীও তাই জীবনকে স্বপ্ন বলিয়া তাহার হাত হইতে মুক্তি পান নাই। হয়ত কখনও কখনও শেলীর অন্তর এই স্বপ্নজগতের ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইত, তিনি অনন্তের সহিত মিলিত হইয়া ব্যক্তি-জীবনের বিচ্ছিন্নতার বেদনা, খণ্ডতা ও বিরোধ বিস্মৃত হইতেন—তখন মনে হইত মৃত্যু একটা মিথ্যা, জগতের চঞ্চল ছায়ালোক একটা স্বপ্নমাত্র। কিন্তু এই ধ্যানলব্ধ অথবা স্বপ্নলব্ধ সত্যকে তিনি জীবনের জাগ্রৎ মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে পারিতেন না; অর্থাৎ তিনিও এই জগতের ছায়াদৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতেন, ছুটিয়া ব্যর্থ হইতেন, কণ্টকবিদ্ধ হইয়া কাঁদিতেন।

স্বপ্নমুগ্ধ শেলী যতই জীবনটাকে একটা রহস্যময় নিদ্রা (obscure and fading sleep—Rev. Islam vi) বলিয়া কল্পনা করুন না কেন, অনুভবের মাঝে তিনি আপনাকে জাগ্রত বলিয়াই জানিতেন; এইজন্য জীবনের অনিত্যতা, চঞ্চলতা দেখিয়া ব্যথাও পাইতেন। শেলীর জীবনের

* Mutability ১৮১৬ খৃঃ। † Hellas 776—85, ১৮২১ খৃঃ।

প্রথমেই এই একটা দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছিল। একদিকে ক্ষণিক অনুভবের বিদ্যুতালোকে যখন তাঁহার সমগ্র চেতনা একেবারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত তিনি পরম আশ্বাসে স্থির হইয়া বলিয়া উঠিতেন যদিও এই জীবনদীপ বড় ম্লান নির্ব্বাণোন্মুখ (the flame of life so fickle and so wan)* তবু এই জীবন নিশাশেষে "প্রভাতের নিশ্চিতালোক" (morn's undoubted light) আসিবেই; যদিও একথা সত্য যে এই জীবনের সঙ্গে, যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি অনুভব করিতেছি, সবই একটা মিথ্যা রহস্যের মত দূর হইয়া যাইবে তবু তাহার পশ্চাতে পরমাশ্চর্য্য দিবালোক আসিয়া যে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া মানবকে অপূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রদান করিবেই একথাও তখন শেলী নিশ্চিত বিশ্বাসেই বলিয়া উঠিতেন। কিন্তু হৃদয়ের "এত প্রেম আশা, প্রাণের তিয়াসা"র বিরুদ্ধে সমগ্র জীবনের নৈরাশ্যময় অভিজ্ঞতা আসিয়া যখন সাক্ষ্য দিতে লাগিল তখন শেলীর হৃদয় একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। হয়ত জীবন সার্থক হইবে না, হয়ত জীবনের সকল ক্রন্দন বিফলতা ও নৈরাশ্যের পূর্ব্বাভাস মাত্র, হয়ত সকল উচ্চাশা শুধু আকাশের পানে হাত বাড়ান মাত্র,—এমনই একটা আশঙ্কা শেলীর অন্তরে গোড়াতেই উঁকি মারিয়াছিল। এই আশঙ্কারই বেদনা-করুণ চিত্র Alastor।

এই কবিতাটির ভূমিকায় শেলী নিজেই বলিতেছেন যে "এই যুবক একদিন তাহার জীবনব্যাপী অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসাও ভুলিয়া গিয়া নিজেরই মত আর একটি হৃদয়ের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এক অপরূপ মানসী প্রতিমার অন্বেষণে যুবক বাহির হইল, কিন্তু হায়রে, এই অন্বেষণ শুধু নৈরাশ্য ও বেদনাময় মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনিল।" এই কবিতাটি যেন শেলীরই জীবনের চিত্রিত ভবিষ্যদ্বাণী। শেলী নিজের জীবনে একদিন এই ব্যর্থতা অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন হায়রে একি দুর্ভাগ্য যে যারা কোনও একটি ব্যক্তির মাঝেই পূর্ণতার সন্ধান করে তাহাদের নিকট ভালবাসা একটা ফাঁসের মত দুঃখময় দুর্দ্দশা হইয়া উঠে। (Alas that love should be a blight and a snare to those who seek all sympathies in one.) কেবল যে ইহাই অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নয়, প্রেমের নিত্যত্বে পর্য্যন্ত তাঁহার কেমন একটু দ্বিধা ও সংশয় ফুটিয়া উঠিতেছিল। জীবনের শেষ ভাগে মৃত্যুর ১২ দিন পূর্ব্বে একখানি পত্রে † শেলী বলিতেছেন "আমার মনে হয় মানুষ সব সময়ই কিছু না কিছু ভালবাসে; তবে ভালবাসার ভুলটা এইখানে যে মানুষ মরমূর্ত্তির মাঝে যা হয়ত চিরন্তন তাহার সন্ধান করিয়া ফিরে—এই ভ্রান্তিকে জয় করা রক্ত মাংসের মানুষের পক্ষে সহজ নয়।" ইহা অবসন্ন শেলীর শেষ কথা। প্রথম জীবনের অনুভবের মাঝ দিয়া যে আদর্শ শেলীর হৃদয়কে মাঝে মাঝে বিষাদমুক্ত করিয়া পরম আশ্বাসে ভরিয়া দিত সেই আদর্শের প্রতি সংশয় আসিয়াছে, তাই এই কথাগুলির মাঝে আর সে আশ্বাস নাই।

প্রথম জীবনের শেলীকে ভাল করিয়া না দেখিলে বুঝা যায় না শেষ জীবনের শেলী কি তীব্র

* On Death ১৮১৩। † Letter to John Gisborne, June 18, 1822.

বেদনায় অবসন্ন। তিনি যে জীবনের রঙ্গমঞ্চে কোনও রকমে একটা অভিনয় মাত্র জোর করিয়া করিয়া চলিয়াছিলেন, জীবনে যে তাঁহার এতটুকু আনন্দ এবং উৎসাহও ছিল না * তাহা বুঝিতে হইলে, তাঁহার চিত্তপটের এই করুণ দৃশ্য-পরিবর্ত্তন ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, শেলীর প্রথম জীবনের সেই আশা-উল্লসিত উৎসুক অন্তরের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়। তখন দৃশ্য জগতের মাঝে জীবনের মাঝে কোন অর্থ না পাইয়া তিনি নিরাশ হইতেন না। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস সত্যেরই মত দৃঢ় ছিল যে, এই দৃশ্য জগৎই চেতনার একমাত্র প্রকাশ নয়। তাই তাঁহার অন্তর ব্যাকুল-আগ্রহে অদৃশ্য জগতের অধিবাসীদের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিল। যাহাদের দেখা যায় না, শোনা যায় না, তাহাদের দেখা পাইবার জন্য, তাহাদের কথা শুনিবার জন্য বালক শেলীর চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত। বিফলমনোরথ হইয়া তখনও হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতনা (*Cf.* Oh, there are spirits in the air) ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার প্রতি তাঁহার এই বিশ্বাসের পরিচয় তাঁহার 'Hymn to Intellectual Beauty' তে পাওয়া যায়।† শেলী সৌন্দর্য্যের উপাসক—এই সৌন্দর্য্যের নিকট তিনি বালক অবস্থায়ই আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন এবং সারাজীবন ইহারই পূজা করিয়া ছিলেন—এই সৌন্দর্য্য বাহিরের নয়; যে সৌন্দর্য্য এই বাহ্য সৌন্দর্য্যকেও সুন্দর করিয়া তোলে, সেই অদৃশ্য অনুভবগম্য সৌন্দর্য্যেরই জয়গান শেলী গাহিয়াছেন। এই সৌন্দর্য্যকে তিনি সমগ্র বিশ্বে অনুভব করিয়া তাহাকে ধরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন—তাই যখন তিনি বলিতেছেন যে কোন অদৃশ্য শক্তির ভীমচ্ছায়া আমাদের মাঝে অদৃষ্টভাবে ঘুরাফেরা করিতেছে,

The awful shadow of some unseen Power
Floats though unseen among us.

তখনকার সেই বলার মাঝে অপ্রাপ্তির আশঙ্কা ও বিষাদের সুরটি পাই না। মাঝে মাঝে যদিও তিনি অদৃশ্য জগতের অধিবাসীদের দেখা না পাইয়া, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া নিরাশ হইতেন তবু তাহাদের অস্তিত্বে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কত নির্জ্জন কক্ষে, কত জনহীন গুহায় তাহাদের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে,

While yet a boy I sought for ghosts and sped
Through many a listening chamber, cave and ruin
And starlight wood, with fearful steps pursuing
Hopes of high talks with the departed dead.

কত জ্যোৎস্নালোকিত বনানীর মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সহসা সৌন্দর্য্যের উৎসারিত উৎস তাঁহার চক্ষে ধরা দিয়াছিল। তাই শেলী সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "সহসা আমার উপর তোমার ছায়াপাত হইল, আমি চীৎকার করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাতে হাত চাপিয়া ধরিলাম।"

* See "To Edward Williams"—১৮২১

† Hymn to Intellectual Beauty, ১৮১৬।

On a sudden thy shadow fell on me
I shrieked and clasped my hands in ecstasy.

তখন যেন জীবনের অর্থটি আসিয়া ধরা দিল, জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সংশয় ও বিনাশের হাত হইতে যেন অন্তর মুক্তি পাইল।

মোঁব্লাঁর * ভীম পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন; সেখানেও এই একই চিরন্তন সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়া শেলী বলিতেছেন যে, সকল গতিচঞ্চলতা ও জন্মমৃত্যুর অন্তরালে অব্যাহত শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। সে শক্তি সুদূর, শান্ত, অনধিগম্য। কালপ্রবাহ যেন তাহার কত নিম্নে কোথায় স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গিয়াছে। যুগযুগান্তব্যাপী হিমপুঞ্জের অচল নিস্তব্ধতার মাঝে দাঁড়াইয়া যেন শেলী মহাকালের মহিমাময় শাশ্বত রূপ দেখিতে পাইলেন। পরিবর্ত্তনের জগৎ ছাড়াইয়া যেন তিনি সমগ্র বিশ্বের মর্ম্মাবস্থিত চিরন্তন "নম্র গভীর প্রশান্ত" (So mild, so solemn, so serene) শক্তিরূপের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছেন—ওই মহা-মহিমরূপের মাঝে যেন এই ক্ষুদ্র আমিত্বও ডুবিয়া লীন হইয়া যায়,—তাই এখানে কোন বিরোধ নাই, অশান্তি নাই—একাত্মতার মাঝে যেন চিত্ত পরম বিরতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

* * *

এমন তীব্র গভীর অনুভব হইয়াছিল বলিয়াই শেলী কখনও এই শক্তি, এই পরম সৌন্দর্য্য এই প্রেমকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এই জগতের দিকে চাহিতেই যেন কোন্ এক চিন্ময় সত্তার ফাটিয়া-পড়া রূপের আভাস তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ঝলক মারিয়া যাইত। এই মূর্ত্ত-সৌন্দর্য্যের সহিত মুখোমুখী হইয়াই শেলী বলিয়াছিলেন, "ওগো আলোক-শিশু, মেঘগুলিকে ভেদ করিয়া আসিবার পূর্ব্বে প্রভাতের আলোকের মত, যে পরিচ্ছদ তোমাকে আবৃত করিয়া আছে তাহারই মাঝ দিয়া যেন তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলজ্বল্ করিয়া উঠিতেছে।......তোমায় কেউ দেখিতে পায় না, তবু সকলেই তোমায় অনুভব করে"† আবার এমন মুখোমুখী দেখা হইয়াছিল বলিয়াই শেলীর সারাটা জীবন বড় দুঃখে, বড় ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। শেলী ভালবাসিয়া, পাইয়া, হারাইয়া-ছিলেন। জগতের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আসিয়া বার বার যখন তাঁহার হৃদয়ের পরাজয় ঘোষণা করিতে লাগিল, তখন বহুপূর্ব্বে যে অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তার ছায়াপাত শেলী অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই আসিয়া শেলীর চিত্তাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহার তীব্র প্রেমব্যাকুল হৃদয় ব্যর্থ অন্বেষণে ফিরিয়া ফিরিয়া বহুপূর্ব্ব হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল; তাই দেখিতে পাই দুঃখের সঙ্গে, রাত্রির সঙ্গে, অন্ধকারের সঙ্গে তাঁহার বড় বন্ধুত্ব, বড় যেন প্রাণের মিল। আনন্দ, আলোক ও

* Mont Blanc, ১৮১৬।

† Prom. Unbound II. sc V. Song of the Spirits, ১৮১৮-১৯ : ৯।

উৎসবের রাজ্য হইতে চিরবিদায় লইয়া নিরাশার চিরান্ধকারে নিরুদ্দেশ হইবার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতেই তিনি আয়োজন করিতেছিলেন। * * *

নির্ম্মল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্য্যালোক, সাগরবক্ষে উর্ম্মিরাশি কত না লীলাচ্ছন্দে উঠিতেছে পড়িতেছে; আকাশ বাতাস বিহগের কলগান, সমুদ্রের গম্ভীর ধ্বনি সবই এক আনন্দের উচ্ছ্বাসকে দিগ্বিদিকে বিচ্ছুরিত করিতেছে! মধ্যাহ্ন স্তব্ধতার মাঝে বসিয়া বসিয়া শেলী সবই দেখিতেছেন, অনুভব করিতেছেন, ইহাও বলিতেছেন 'আমার এই মধুর অনুভবের সাথী যদি কাহাকেও পাইতাম!' কিন্তু অন্তরের মাঝে সৌন্দর্য্যানুভবের সেই আনন্দদীপ্তি নাই। তিনি ক্লান্ত—স্বাস্থ্য শান্তি আশা সবই গিয়াছে, আছে মৃত্যুর প্রতীক্ষা। লোকে হাসি-উল্লাসে জীবন কাটায়, বলে জীবন একটা আনন্দ, কিন্তু শেলীর জীবনপাত্র তিক্তরসেই ভরিয়া গিয়াছে, তাই তিনি বলিতেছেন 'হয়ত তোমরা আনন্দ পাইয়াছ কিন্তু আমার পাত্র অন্য রসেই ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল, *

To me the cup has been dealt in another measure.

"এখন শ্রান্ত শিশুর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই উদ্বেগাকুল জীবনটাকে নিদ্রার মাঝে ভুলিতে চাই,—চাই সেই মৃত্যুকে যে নিদ্রার মত নিঃশব্দে আসিয়া এই দুর্ব্বহ জীবনের ভার হইতে আমাকে মুক্তি দিবে।"

জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেছিল যে, এই জীবন একটা মহাশ্মশান মাত্র। মানুষের যা কিছু আশা, যা কিছু অন্তরের সাধ ও সাধনা, তাহার জীর্ণ কঙ্কালে এক বিকট-বিশাল Golgotha-র সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। এই কালসমুদ্র মহামানবের তিক্তাশ্রুসায়র † ঘনাচ্ছন্ন তামসী রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-ঝলকের মত এই জগতের আনন্দও একটা ক্ষণিক দীপ্তি মাত্র, শুধু মানব দুঃখের দারুণ দুর্দ্দশাকে উপহাস করিয়া যায়। ধর্ম্ম, ভালবাসা, বন্ধুত্ব সব, সবই যায়, মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিবার জন্য! ‡ এই মানবজীবন না-পাওয়ার একটা অতি করুণ নাট্য—এই অনুভব শেষজীবনে শেলীর সকল তারুণ্য আশাকে দলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তখনকার সেই দুঃসহ একাকিত্বের গূঢ় বেদনায় শেলী প্রায় মূক। তাই নিসুপ্ত নিশীথে নিঃসঙ্গ শশাঙ্কের দিকে চাহিয়া শেলী আত্মসাদৃশ্যে বিচলিত হইয়া বেদনা-সজল-কণ্ঠে বলিতেছেন "আনন্দহীন দৃষ্টি যেমন আপনাকে নিবদ্ধ করিবার যোগ্য বস্তু না পাইয়া কেবলই চঞ্চল হইয়া ফিরে, তুমিও কি তেমনি এই বিজাতীয় তারকার দেশে নিঃসঙ্গ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ওই ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া পৃথিবীর দিকে নিমেষ-হারা হইয়া চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, তাই কি তুমি ম্লান?" §

* Stanzas in Dejection ১৮১৮। † Time ১৮২১। ‡ Mutability ১৮২১।

§ To the moon ১৮২০।

যদিও নিষ্ফলতার দুঃসহ বেদনা মৃত্যুকে শেলীর নিকট প্রার্থিত করিয়া তুলিতেছিল, তবু যে প্রেমকে একদিন শেলী হৃদয়ের অন্তস্তলে অতি সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন সে যে একেবারে অপ্রাপ্য এই কথাটি বিশ্বাস করিতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই একটি শেষ সান্ত্বনা যেন কিছুতেই আর ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। তিনি বুঝিতেছিলেন যে, জীবনের কঠোর শীতঋতু আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কঠোর আক্রমণে সমগ্র হৃদয় যে অসাড় হইয়া আসিতেছে তাহাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি মনের মাঝে কোথা হইতে মানব অন্তরের চিরদুরন্ত আশা বলিতেছিল, বসন্ত আসিবে—তাই এই প্রশ্ন:—If winter comes, can spring be far behind ?

শীতের আগমনী ধ্বজা উড়াইয়া হেমন্ত-শেষের "পশ্চিমা হাওয়া" (west wind)* আসিয়া দ্বারে উপস্থিত। গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া, দিকে দিগন্তে উড়াইয়া দেওয়া তাহার কাজ; তুষার-ঝঞ্ঝার প্রচণ্ডতার মাঝ দিয়া সে বৎসরের আসন্ন মরণগীতি গাহিয়া চলিয়াছে। তাহার নির্ম্মম, প্রচণ্ড গতির দিকে চাহিয়া শেলী বলিতেছেন,—"ওরে আমিও একদিন এমনই অবাধ, এমনই দ্রুত, গর্ব্বিত ছিলাম, কিন্তু আজ তোরই মত একজন, দুঃসময়ের নিষ্ঠুরভাবে শৃঙ্খলিত ও অবনত,

A heavy weight of hours has chained
and bowed one too like thee.

ওগো আমায় তরঙ্গের মত, বৃক্ষপত্রের মত, মেঘখণ্ডের মত তুলিয়া ধর, জীবনের তীক্ষ্ণ কণ্টকের উপর পড়িয়া আমি যে রক্তাক্ত!" একটি বড় কোমল, বড় তরুণ আশাভরা, বড় সুন্দর হৃদয় একটা নির্ম্মম আঘাতে যেন মুসড়িয়া গিয়াছে, এই ক্রন্দন তাই বড় করুণ, বড় অরুন্তুদ! তবুও এই ভাঙা হৃদয়ও সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শেষ চেষ্টা করিতেছিল—একটা ব্যর্থজীবনকে শেষকালে যেন আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার একটা সকরুণ চেষ্টা—এ চেষ্টা মানুষকে কাঁদাইয়া দেয় মাত্র। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া ভাল করিয়া জ্বলিতে চায়, কিন্তু তাহার সলিতা পুড়িয়া গিয়াছে, তৈলও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আশা তবুও ছাড়ে না, তাই সে তখনও বলিতেছে "গেছে যা দেরে ফুরাতে।" "ত্বরা করিয়া নবজন্মকে আনিবার জন্য, আমার যা-কিছু প্রাণহীন ভাবনা সব ঝরা পাতার মত দূর হইয়া যাক্,

Drive away my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth.

যাহা কিছু জড়তাগ্রস্ত, যাহা কিছু 'জীর্ণ আমার শীর্ণ আমার একেবারে' দাও দাও সব ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একেবারে উড়াইয়া দাও—কিন্তু শীতের এই নগ্নতার মাঝে, ওই একান্ত রিক্ততার মাঝে যেন আমাকে ফেলিয়া রাখিও না, নব জন্ম দাও,

* West wind ১৮১৯

"যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না
একেবারে
বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই
শাখারে"।

তবুও শীত আসিতেছে ইহা সত্য,—সে ত ফিরিবে না। জীবনের যাহা কিছু সবই ঝরিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কা ও সন্দেহ—এতকাল জীবনের বিচিত্র বর্ণ যবনিকার অন্তরালে আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল; আজ তাহা একেবারে সত্য হইয়া শেলীর দৃষ্টির সম্মুখে আপনার বর্ব্বর নিষ্ঠুরতাকে উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল। শেলীর হৃদয় একেবারেই বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল—শেষ মুহূর্ত্তে তাই যেন শেলী বলিতেছেন,

Pansies let *my* flowers be;
On the living grave I bear
Scatter them without a tear—
Let no friend however dear
Waste one hope, one fear for me.*

আমার এ জীবন্ত কবরের উপর কেউ অশ্রুপাত করিও না; আমার দিকে চাহিয়া কেউ আর কোন আশা করিও না, উদ্বিগ্নও হইওনা। আমার দিন রাত্রির আনন্দ তিরোহিত হইয়াছে; নব বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত কিছুই আমায় আর আনন্দ দেয় না, শুধু হৃদয়কে শোকাচ্ছন্ন করিয়া তোলে।† "এ জীবন একটা বিচিত্র দৃশ্যপট মাত্র; ইহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া, এই জীবন যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি চালনা করিবার চেষ্টা যেন করিও না, করিও না।" এ জীবন একটা প্রহেলিকা, একটা দারুণ সমস্যা—ইহার মীমাংসা নাই।

শেলীর জীবনে ইহার কোনই মীমাংসা মিলিল না। অতৃপ্ত অন্তর কি জানি কাহাকে শূন্যপানে চাহিয়া ব্যথিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, এই যে স্বপ্নঘোরে, নানা পুষ্প সম্ভারে হৃদয়ের ডালি সাজাইয়া বড় ব্যগ্র হইয়া ঘরের বাহির হইলাম, সে কাহার সন্ধানে? "আমি কার পথ চাহি, এ জনম বাহি কার দরশন যাচিরে!" আমার প্রার্থিত কোথায়? এ জীবন আমার কি? ইহাই শেলীর শেষ প্রশ্ন! মৃত্যুর সর্ব্বগ্রাসী‡ সর্ব্বতোব্যাপ্ত রূপ§ দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, তাহা হইলে এই জীবন কি একটা মায়া, একটা ধাঁধা মাত্র? Adonais্র মৃত্যুতেও তাঁহার জীবন সম্বন্ধে এই প্রশ্নই জাগিয়াছিল; তাঁহার অন্তর বলিতেছিল এ জীবনটা সত্য নয়, একটা স্বপ্ন মাত্র।‖

* Remembrance ১৮২১।
† A Lament ১৮২১।
‡ Apostrophe to Silence ১৮১৮।
§ Death ১৮২০।
‖ Adonais ১৮২১

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নটাই তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছিল; কোথাও যেন চিত্তের শাশ্বত বিরাম তাঁহার মিলিতেছিল না। তাঁহার শেষ রচনা (মৃত্যুকালের রচনা বলিলেও বলা যায়) Triumph of Life কবিতাটি আর কিছুই নহে—তাঁহার শেষ প্রশ্ন "এই জীবন কি?" কবিতাটি তাঁহার জীবনের মতই অসমাপ্ত, প্রশ্নেই আরম্ভ, আবার প্রশ্নেই ইহার পরিসমাপ্তি। শেলী সারাজীবন ভরিয়া অন্ধকারে পথহারা আলোক-পিপাসু শিশুর মত কেবল কাঁদিয়াই গেলেন। নিরুদ্দেশ সমুদ্র যাত্রার দিনে বুঝি শেলীর বুকে শেষ সম্বল আশাও ছিল না।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

দেশবন্ধুর অপ্রকাশিত গান

(১)

এইত সে তমাল তলে
মোহন মালা দিলে গলে।
আদর ক'রে কইলে কথা
ভিজল মালা চোখের জলে।
সেইত সেই মাধবী রাতে
জড়ায়ে নিলে বুকের পরে
সকল সুখ সকল ব্যথা
গলিয়ে দিলে সোহাগ ভরে॥
আজি বঁধু! কোথা তুমি!
হাহা করে তমাল তল।
কোথায় গেল চোখের জল!
সকল শুষ্ক মরুভূমি
হাহা করে হৃদয় তল—
কেন নিলে প্রাণের হাসি
কেন নিলে চোখের জল॥

(২)

এযে আমার ফুলের হার
এযে আমার কাঁটার মালা!
এযে সকল মধুর মিঠি
এযে আমার বিষের জ্বালা।

দিয়াছ যা কিছু নিতে যে হবে
যত না সুখ যত না জ্বালা !
এই দেখ তব চরণমূলে
দিয়াছি ধরে কিসের ডালা।

(৩)

কোন্ তারেতে বাজবে বল
ওগো প্রাণের বাজনাদার !!
প্রাণের মাঝে রাখব বেঁধে
সইতে তব সুরের ভার !
একটুখানি আভাস পেলে
বাঁধব প্রাণে প্রাণের তার।
কঠিন কোমল সকল সুরে
ঝরবে তবে মধুর ধার !!

(৪)

দাও দাও প্রাণের নিধি
প্রাণে প্রাণ বেঁধে দাও।
সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও।
আমি সইতে নারি দূর থেকে
তোমার কাছে ডেকে নাও।
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের পরে বেঁধে দাও।
ভাবতে গেলে তোমার কথা
সকল অঙ্গ শিহরে,
ভুলতে গেলে তোমার কথা
প্রাণের মাঝে বিহরে।
আমি ভাবতে নারি
আমি ভুলতে নারি
তোমার কাছে ডেকে নাও।
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের পরে বেঁধে দাও।

চিত্তরঞ্জন দাশ

বঙ্গ সাহিত্যের সার্ভে

সাহিত্য কি ?

সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সহিতের ভাব, অথবা সম্যক্ প্রকারে আহিত অর্থাৎ সংহত।—শব্দশক্তি-প্রকাশিকা।

যে-সকল রচনাসমষ্টি সমাজের লোকদিগকে একভাবে ও আদর্শে সংহত করে তাহাই সাহিত্য।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—শব্দের ও অর্থের যথাযথ সহভাবে প্রকাশিত বিদ্যা-সাহিত্য।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে—অত্যুত্তম ভাবাবলীর সর্ব্বোত্তম প্রকাশ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকাই সাহিত্য।

গ্যয়টে বলেন—সত্য এবং বিচারবুদ্ধি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া কারুখচিতরূপে সর্ব্বত্র সমান হইয়া প্রকাশ পাইলে সেই রচনাবলী সাহিত্য মধ্যে গণ্য হয়।

ম্যাথ্যু আর্‌নল্‌ড্ বলেন—জীবনের সমালোচনাই সাহিত্য।

হাড্‌সন বলেন—সাহিত্য বলিতে সেই-সকল পুস্তকই গণ্য যাহাদের বিষয় এবং রচনাপ্রণালী সাধারণ মানবচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রীতি প্রদান করে; রূপ ও সৌন্দর্য্য যে আনন্দ দান করে সেই আনন্দদায়ক রূপ ও সৌষ্ঠব সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। জীবনের রস দ্বারা পুষ্ট হইয়া সাহিত্য উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। সাহিত্য ভাষার বাহনে জীবনেরই বাহ্যিক বিকাশ। এইজন্য পঞ্জিকা বা জমা-খরচের খাতা বা টাইম্‌-টেব্‌ল্ সাহিত্যের অন্তর্গত হইতে পারে না। সাহিত্য আবার ব্যক্তিত্বেরও দর্পণ।

টেন্ বলেন—জাতীয় মনস্তত্ত্বের ইতিহাসের প্রধান দলিল সাহিত্য।

কুর্‌থোপ্ বলেন—সাহিত্য কেবল মাত্র ব্যক্তিবিশেষের ভাবরাজ্যের প্রতিষ্ঠান নহে, উহা সমগ্র জাতির আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যের মূল উপাদান—জাতীয় চারিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সভ্যতা।

লর্ড মর্লে বলেন—যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের মন প্রসার লাভ করে ও বিচারবুদ্ধি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়; কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলিতে নিমজ্জিত না থাকিয়া আমরা নানা বিষয়ের সহিত সহানুভূতি দ্বারা যোগ স্থাপনে আগ্রহবান্ হই এবং আমাদের স্থিরদৃষ্টি লাভ হয়; আমাদের মানসক্ষেত্রে যে-সকল ভাব ও তথ্য স্বয়ম্ভাত হয় না,—সে-সকল বিষয়ে যে বৃত্তির সাহায্যে আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, সেই পদ্ধতি ও সেই বৃত্তি যে উপাদান অবলম্বনে বিকাশ লাভ করে, তাহাকেই সাহিত্য বলে। সুতরাং সাহিত্যের এই সংজ্ঞার মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান সকলই অনুস্যূত। সৎসাহিত্যানু-শীলনের চরম ফল ও বিশেষত্ব সম্যগ্‌দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানব-হৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দ-গীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়-বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানস-সঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে। ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা—ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।

সাহিত্যের সামগ্রী

যে সমাজে মানুষের জীবন যত বিচিত্র তাহার সাহিত্যও তত বিচিত্র। প্রত্যেক জাতি ও সমাজের স্থানীয় অবস্থা ও সভ্যতার বিশিষ্টতা অনুসারে তাহার সাহিত্য রূপ গ্রহণ করে।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলেন—সাহিত্যের বিচিত্র রূপ জাতীয় বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিগত ভাববৃত্তি এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে।

হাড্‌সন বলেন—সাহিত্যের প্রেরণাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আমাদের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা, (২) জনসমাজের ভাব ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল, (৩) যে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা বাস করি ও যে কল্পনাক্ষেত্র আমরা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অবাস্তব হইতে উৎপন্ন করিয়া তুলি তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল, এবং (৪) রূপ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের চিত্তের স্বাভাবিক আকর্ষণ। আমরা নিজেরা যাহা চিন্তা করি ও অনুভব করি, তাহা অন্যকে জানাইবার বাসনা দুর্দ্দম হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে; এজন্য সাহিত্য রচয়িতার চিন্তা ও ভাবের মুকুর। আমরা অপর নরনারীর চিত্তবৃত্তি কর্ম্ম ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সতত উৎসুক; সেইজন্য সাহিত্য জীবন-নাট্যের পটভূমিকা। আমরা যাহা চিন্তা করি ও কল্পনা করি তাহা অপরকে জানাইবার চেষ্টায় বর্ণনাময় সাহিত্য সৃষ্টি করি। এবং যখন কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য রসরচনা করা হয় তখন সাহিত্য আর্ট হইয়া উঠে। সাহিত্যের সামগ্রী মানবজীবনের ন্যায় বিচিত্র ও বিবিধ প্রকারের হইলেও তাহাকে পাঁচটি স্তবকে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) ব্যক্তির ব্যক্তিগত বাহ্যাভ্যন্তর অভিজ্ঞতা (২) মানুষের সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা—জীবন-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ক, ঈশ্বরতত্ত্ব ইহকাল পরকাল প্রভৃতি সার্ব্বজনিক তত্ত্ব, (৩) ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও সম্পর্কজনিত প্রচেষ্টা ও সমস্যা, (৪) বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানবসমাজের সম্পর্ক এবং (৫) মানুষের আত্মপ্রকাশের বিবিধ চেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রং ইঙ্গিত প্রার্থনা করে—যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।

পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের সম্পর্ক

ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ-সমাজেরও তেমনি একটা ইতিবৃত্ত আছে। যে কালে জীবনের যে ভাব—জাতির যাহা রীতি-নীতি-পদ্ধতি-প্রণালী—সেই কালের কাব্যে তাহার ছায়াপাত হয়। নবীন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্ত্তনরূপে বোঝা চাই। প্রবালদ্বীপের মতন বহুকাল ধরিয়া বহু জীবনের স্তর পড়িয়া পড়িয়া ভাষার কলেবর পুষ্টিলাভ করে; ভাষার কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না।

হাড্‌সন বলেন—কোনো বড় লেখক ভুঁইফোঁড় স্বয়ংসিদ্ধ রচয়িতা নহেন; তিনি অতীত ও বর্ত্তমানে যোগবদ্ধ থাকিয়া জাতীয় সাহিত্যকে অতীত হইতে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার জন্য আবির্ভূত। এইজন্য ইতিহাসের দিক্‌ হইতে সাহিত্যের বিচারের সময় দুইটি বিষয় বিবেচ্য—(১) সাহিত্যে দেশকালের জীবনধারার অক্ষুণ্ণ প্রবাহ এবং (২) কাল-কালান্তরের পরিবর্ত্তন-পরম্পরা উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। জাতীয় সাহিত্য সেই জাতির মনের ও চরিত্রের বিভিন্ন কালে পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন, তাহা নহে;—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।

সাহিত্যের আদি স্বরূপ

সাহিত্য সমাজের চিন্তাধারার বিকাশ ও প্রকাশ উভয়ই। আদিম মানুষের মনে প্রকৃতির ভীম-কান্ত রূপ যে ভয়-বিস্ময় ভক্তি-আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা যখন ক্রমে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইতেছিল, তখন সমাজের এক শ্রেণীর লোক সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এইসব ধারণার একটা অর্থ প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। ইহারা হইল সমাজের পুরোহিত সম্প্রদায়। ইহারা যেন মূক সমাজের মুখপাত্র—ভাষাহীনের ভাষা।

এই জন্য দেখা যায়, সকল দেশের সকল জাতির আদি সাহিত্য ধর্ম্মমূলক।

মনুষ্য আগে অনুভব করে, পরে সে চিন্তা করিতে শিখে। এজন্য সকল সমাজের আদি

সাহিত্য পদ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পদ্য সরল মানুষের মনের ভাব মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করিতে পারে, তাহার একটা সুর ও ছন্দ যতি ও তাল থাকাতে তাহা মনে গাঁথিয়া যায়; এজন্য পদ্য সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে এবং আদিম ও মানব ও ভাবপ্রধান ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সমাদৃত হয়। মানবের চিন্তা ও যুক্তির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও উন্নতি হইতে থাকে।

পৌরাণিক উপাখ্যান (mythology) পদ্য সাহিত্যের জনয়িতা।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি—কবিতায় হ্রস্ব-পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ, এবং ছন্দ ও মিলের ঝঙ্কার বশতঃ কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং পদের প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে।"

কাব্য

পদ্য সাহিত্যকে কাব্য বলে।

আমাদের দেশের অলঙ্কার-শাস্ত্র সাহিত্য-দর্পণের মতে রসাত্মক বাক্য মাত্রই কাব্য। য়ুরোপের নানা মুনি কাব্যের নানা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাঃ জন্‌সন বলিয়াছেন যে ছন্দোবদ্ধ রচনা সত্য ও আনন্দকে একত্র সংযুক্ত করিয়া যুক্তির সাহায্যে কল্পনাকে নিযুক্ত করে তাহাই কাব্য। মনীষী মিলের মতে—যে চিন্তা ও বাক্যের ভিতর দিয়া ভাবাবেগ স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হয় তাহাই কাব্য। মেকলে বলিয়াছেন—চিত্রকর যেমন বর্ণসুষমার সুসমঞ্জস বিন্যাস কল্পনার রাজ্যে মায়াজাল বিস্তার করে, তেমনি ক্ষমতাশালী বাক্যবিন্যাসকে কাব্য বলে। কার্লাইল বলিয়াছেন—সঙ্গীতাত্মক চিন্তা পরম্পরাই কাব্য। সমালোচক হ্যাজ্‌লিট বলিয়াছেন—কল্পনা ও ভাবাবেগের ভাষাই কাব্য। লে হাণ্ট্ মত প্রকাশ করিয়াছেন—সত্য সুন্দর ও শক্তির জন্য চিত্তের আগ্রহে যখন কল্পনা ও রূপকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও সমতাসম্পন্ন ভাষা তাহার বাহন হয় তখন তাহা কাব্য-পদবাচ্য হয়। কবিবর শেলী বলিয়াছেন—কল্পনার প্রকাশ কাব্য। কবি ও সমালোচক কোল্‌রিজ বলিয়াছেন—কাব্য হইতেছে বিজ্ঞানের বিপরীত—কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দদান, সত্যসন্ধান নহে। কবি ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ্ বলিয়াছেন—সকল জ্ঞানের সুরভি-নির্য্যাস ও অতীন্দ্রিয় অনুভাব হইতেছে কাব্য; ইহা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাবোন্মেষিত প্রতিচ্ছবি। সমালোচক ম্যাথ্‌য়ু আর্‌নল্‌ড্ বলিয়াছেন—মানব-ভাষার আনন্দঘন পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতেছে কাব্য; মানবভাষা পরিপূর্ণভাবে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখনই তাহা সত্যেরও প্রকাশক হয়; ইহা কবিত্বমধুর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া কবিত্বময় সত্যের

মানদণ্ডে মানবজীবনের মনোরম সমালোচনা। কবি এড্‌গার এলেনপো বলিয়াছেন—কাব্য হইতেছে ছন্দ-তালে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কবি কেব্‌ল্‌ বলিয়াছেন—অন্তরের পরিপূর্ণ আবেগ বা পরিপূর্ণ কল্পনার উপ্‌চাইয়া পড়াই কাব্য। ডয়েল্‌ বলিয়াছেন—যাহা বর্ত্তমান ও সুলভ তাহার সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি কাব্য। রাস্কিন কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—উন্নত মনোভাবকে উন্নত ভিত্তির উপর কল্পনার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠ করাই কাব্য। অধ্যাপক কুর্‌থোপ বলিয়াছেন—ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কল্পনাময় চিন্তা ও ভাবের যথাযথ প্রকাশে আনন্দদানের কারুশিল্পই কাব্য। ওয়াট্‌স্‌ ডান্টন বলিয়াছেন—ভাবময় ছন্দোবদ্ধ ভাষায় মানবমনের যথাযথ অথচ কারুখচিত ললিত প্রকাশই কাব্য।

প্রায় সকল সংজ্ঞার মতেই কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ ছন্দ। যে কবির ভাব যত গভীর তাঁহার ছন্দও তত সাবলীল স্বচ্ছন্দগতি ও বিচিত্র হয়।

প্রাথমিক যুগের কাব্য উপাখ্যান মুলক এবং বিশেষ-উদ্দেশ্যমূলক হইয়া থাকে; কারণ, আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের আবরণে তত্ত্ব ও উপদেশ প্রচার করা হয় তাহার কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া কাব্য অনেক সময় এক মাপের পদে বিভক্ত গদ্য হইয়া পড়ে।

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য খুব বেশী দিনের পুরাতন নয়। বৌদ্ধগান ও দোহা পুস্তকে বাংলার আদিমতম রূপ দেখিতে পাওয়া যায়; খৃষ্টীয় ১০ম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন পালি ও প্রাকৃত ভাষা হইতে শিশুর অস্ফুট কাকলির ন্যায় বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করিতেছিল দেখিতে পাই। তাহার পরে একেবারে শূন্যপুরাণ ও কৃষ্ণকীর্ত্তন পরিপুষ্ট ভাষায় লিখিত সাহিত্যরূপে পাওয়া গিয়াছে; বৌদ্ধগান ও দোহা এবং শূন্যপুরাণ ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যবর্ত্তী ভাষার missing link কখনো আবিষ্কৃত হইবে কি না ভবিষ্যৎই জানে।

সেই আদিম অবস্থা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সকল সাহিত্যই পদ্যে রচিত—যদিও শূন্যপুরাণ ধর্ম্মপূজাবিধান প্রভৃতি গ্রন্থে অল্প স্বল্প গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। রচিত সাহিত্য ছাড়া লৌকিক মৌখিক গ্রাম্য সাহিত্যও পদ্যে রচিত হইত, তাহার নমুনা ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি।

বাংলার ঐ আট শত বৎসরের সমস্ত সাহিত্যই প্রায় ধর্ম্মমূলক। এরূপ হইবার কারণ সম্বন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে, তখনি সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিক ভাবে আপনাকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্ম্মে।

সেইজন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই আছে। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি।"

ধর্ম্মসাহিত্য

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রতিরোধ করিবার জন্য খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া তোলে তাহা পুরাণ নামে পরিচিত হয়—তাহা নূতন সৃষ্টি হইলেও পুরাতনত্ব দাবী করিয়া লোকের শ্রদ্ধা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রাথমিক পুরাণগুলি প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী অক্ষরে উত্তর ভারতে লিখিত হইয়া পরে সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগর অক্ষরে অনুবাদিত হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইল, তখন বৌদ্ধেরা নিজেদের দেবদেবীর উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নাম আরোপ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ছদ্মনামে নিজেদের দেবতাদের প্রচ্ছন্ন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সব ছদ্মবেশী দেবতার কতক পুরাতন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নাম গ্রহণ করিল, কতক বা ব্রাহ্মণ্য নামের অনুরূপ নূতন সংস্কৃতমূলক নাম গ্রহণ করিল; কিন্তু এই উভয়বিধ নামের দেবতাদের পূজাপদ্ধতি প্রধানতঃ পূর্ব্বাচরিত বৌদ্ধপ্রণালীসঙ্গতই থাকিয়া গেল। এইসব দেবতা ব্রাহ্মণ্য সমাজে অপরিচিত আগন্তুক। এজন্য ইহাদিগকে মঙ্গলকারী শক্তিসম্পন্ন প্রবল জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রচার করিবার ও তাহাদের পূজা ব্রাহ্মণ্যসমাজেও প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এক শ্রেণীর পুরাণ রচিত হইতে আরম্ভ করে; আদিম পুরাণ যেমন প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র যেমন প্রধানত পালি ভাষায় রচিত হয়, এইসব পরবর্ত্তী কালের পুরাণও তেমনি প্রাকৃত সাধারণের বাংলা ভাষায় রচিত হয়। শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজাবিধান ত ধর্ম্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতিপুস্তক। ঐ দুখানি ছাড়া এক শ্রেণীর বাংলা পুরাণ রচিত হয় এবং তাহা মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত হয়। প্রকাশ্য বৌদ্ধদেবতার মহিমাপ্রকাশক ধর্ম্মমঙ্গল, প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মরূপী দক্ষিণ রায়ের মহাত্ম্য-বিঘোষক রায়মঙ্গল, শীতলা নামে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শক্তি হারিতির পূজা প্রচারের জন্য শীতলামঙ্গল, মনসা নামে পরিচিত বৌদ্ধ শক্তি তরিতা বা তবিতার প্রতিষ্ঠার জন্য মনসামঙ্গল এবং বৌদ্ধশক্তি বজ্রতারা বিশালাক্ষী ও বাশুলি চণ্ডী নামে পরিচিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রবেশ লাভের জন্য চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। এইসব কাব্যের মধ্যেই দেখা যায় আদিম রচয়িতার কাব্যে বৌদ্ধ প্রভাব বেশী এবং পরবর্ত্তী রচয়িতাদের রচনায় সে প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে; এবং এই সব দেবতা যে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আগন্তুক তাহা সকল কাব্যের মধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী ভারতবর্ষই বর্ত্তমান ভাতরবর্ষ। সেই যুগের অন্তিম অবস্থায় যখন গৌড়ের রাজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল, তখন প্রজাসাধারণের মধ্যে সমাজ যে স্থিরভাবে ছিল তাহা সম্ভব নহে। তখন-

কার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যেন একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়াছিল—তখন সমস্ত সাজসরঞ্জাম সমেত এক দেবতার মন্দির আর-এক দেবতার অধিকার করিয়া পূজার্চ্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার বিগ্রহে আর-এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিতেছিল।"

সংস্কৃত পুরাণগুলি লেখা হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজনীয় দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে; সেই দেবতার ভক্ত বিশেষ কোনো রাজা বা দেবাংশসম্ভূত শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষের কীর্ত্তি-কাহিনী পুরাণগুলির উপজীব্য। সেইজন্য পুরাণের মধ্যে পরধর্ম্মবিদ্বেষ ও স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের চেষ্টা দেদীপ্যমান। পুরাণের মধ্যে পাঁচটি লক্ষণ থাকা প্রথা বা Convention হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো ম ন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥—কূর্ম্মপুরাণ।

প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি, তাহার পর মনুর প্রজাসৃষ্টি, মন্বন্তর, কোনো বিশেষ মনুর আমলে কোনো একটি বিখ্যাত বংশের ও সেই বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চরিতবর্ণন পুরাণের পাঁচ লক্ষণ। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই আদর্শ ও ছাঁচ রক্ষিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলি সভায় গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা প্রতিষ্ঠিত করা হইত। এই গান শুনিলে মঙ্গল হয়, এজন্য এই গানের বিশেষ একটি সুরও শেষে মঙ্গল নামে পরিচিত হয়। বাংলায় যাত্রা মানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দীতে তেমনি এখনও মঙ্গল মানে গান ও গমন দুইই বুঝায়; এবং হিন্দীতে মঙ্গল মানে মেলা; কাশীতে বুঢ়োমঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ মেলা হয়, তাহা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বুড়ামঙ্গল কবিতায় বাঙালী পাঠকের নিকটও পরিচিত হইয়াছে। যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মহিমা প্রচারিত হয়, যে গান মেলায় গীত হয়, এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া অষ্টাহ ব্যাপিয়া চলিতে থাকে তাহাকে মঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলা গান বলে। আগে মালদহ জেলায় এবং এখনও বরিশাল জেলায় সকল শুভকর্ম্মে মঙ্গল গান হইত ও হয়। বরিশাল জেলায় এই মঙ্গল গানের অপর নাম রয়ানি গান। কেউ কেউ এই রয়ানি শব্দকে রজনী শব্দের অপভ্রংশ মনে করিয়াছেন; কিন্তু মঙ্গল গান কেবল রজনীতেই হয় না, আটদিন ব্যাপিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় ষোলো পালায় অষ্টমঙ্গলা গান শেষ হয়। আমার মনে হয় এই রয়ানি শব্দের অর্থ রওনা হওয়া, যে গান একদিন রওনা হইয়া আটদিন চলে। এই অর্থের সঙ্গে মঙ্গল শব্দের গমন অর্থের মিল দেখা যায়।

যে দেবতাদের পূজা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না তাহাদের পূজা প্রচারের জন্য মঙ্গলকাব্য রচনা আরম্ভ হইলেও, অনেক প্রতিষ্ঠিত পুরাতন দেবতারও মহিমা কীর্ত্তনের জন্য পরবর্ত্তী কালে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়।

আর্য্যগণ প্রধানতঃ পুরুষদেবতা-পূজক ছিলেন; অনার্য্য প্রভাবে বঙ্গসমাজে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য মঙ্গলকাব্যে স্ত্রীদেবতারই প্রাধান্য দেখা যায়। এবং দেখাদেখি দেবতা নয় অথচ দেবতামন্য প্রাণী ও বস্তুর মহিমা কীর্ত্তনের জন্য কপিলামঙ্গল ঢেঁকিমঙ্গল পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছিল। রায়বাহাদুর ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—মনসা মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী সত্যনারায়ণ দক্ষিণের রায়—ইঁহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইঁহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূগণই ইঁহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত, ইঁহাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধূগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইঁহারা কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন।......এইসব ছড়া-পাঁচালী শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণরাশির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবমন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্য্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক গতিবিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় নূতন আগন্তুক এক দেবতা পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত অপর দেবতাকে পরাভূত করিয়া নিজের পূজা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। প্রতিষ্ঠিত ও পরাজিত দেবতা অধিকাংশ স্থলেই শিব; রায় মঙ্গলকাব্যে বড়গাজি খাঁ। এই ধর্ম্মকলহ ও দেব প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্য্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।"

নিতান্ত ঘরোয়া লৌকিক ব্যাপার লইয়া সাহিত্য কারবার করিতেছিল বলিয়া ভারতচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত সাহিত্য কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই গতানুগতিকতাকে দীনেশবাবু পুচ্ছগ্রাহিতা বলিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের শেষ ক্ষমতাবান্ কবি ভারতচন্দ্র ছাড়া আর কোনো কবি রচনায় বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে দীনেশবাবু বলিয়াছেন—"কতকগুলি ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল।......এইসব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিংবা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্ত্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই।......কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষচরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত-বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে

অন্যরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে?"

সাহিত্যে বৈচিত্র্য

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক ভারতচন্দ্র ছাড়া আর কোনো মঙ্গলকাব্যরচয়িতার রচনায় বৈচিত্র্য নাই। মঙ্গলকাব্য রচনা ছাড়া কয়েকজন কবি সংস্কৃত কাব্য পুরাণ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়াও গতানুগতিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিরা একটি রসসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বঙ্গসাহিত্যে সরসতা কবিত্ব ও বৈচিত্র্য দান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও রাধাকৃষ্ণের বা চৈতন্যদেবের প্রেমলীলা লইয়া নিজেদের রচনাকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারাও কেহ একতারা কেহ সেতারা বাজাইয়া গিয়াছেন, সপ্তস্বরা বীণা বঙ্গসাহিত্যে কেহ বাজাইতে পারেন নাই।

যদিও আমরা "নিশ্বাস রুধে দুচক্ষু মুদে তাপসের মতো যেন স্তব্ধ" হইয়া বসিয়া ছিলাম, গল্পের চাষাগাঁয়ের দাদাঠাকুরের মতন বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবার ভয়ে তুলা দিয়া নব দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, একজটা দেবীর ভয়ে অচলায়তনের উত্তরের দরজাটা পুরুষানুক্রমে বন্ধই ছিল, তথাপি শোণপংশুদল ত আমাদিগকে রেহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই, বারম্বার কবাট ভাঙ্গিয়া বাহিরের মুক্ত হাওয়া বদ্ধ ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল তথাপি আমাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় নাই, আমাদের সাহিত্যও 'রেখামাত্রং ন ব্যতিয়ু আমনোঃ বর্ত্মনঃ পরম্'।

কিন্তু মৈমনসিংহ আমাদের মান বাঁচাইয়াছে, মুখ রক্ষা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা লৌকিক ও ঘারোয়া সাহিত্য হইলেও তাহাতে বৈচিত্র্য আছে, প্রাণের ও হৃদয়ের পরিচয় আছে, নূতনত্ব আছে এবং প্রচুর স্বতঃ স্ফূর্ত্ত কবিত্ব আছে।

মুসলমানী সভ্যতা সাহিত্য ও ধর্ম্ম প্রবলভাবে আমাদের সমাজকে আক্রমণ করা সত্ত্বেও আমাদের কূর্ম্মবৃত্তির ফলে আমাদের নিকট একেবারে নিষ্ফল বন্ধ্য হইয়া গেছে; দুই দশটা আরবী ফার্সী তুর্কী শব্দ এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালী ছাড়া আমরা মুসলমান সংস্রবের আর কোনো পরিচয়ই দিতে পারি না; এত বড় একটা সুযোগ আমরা হেলায় হারাইয়াছি, বিশ্বজনীনভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজে ধর্ম্মে সাহিত্যে নবনব চিন্তার উন্মেষ করিয়া প্রাণের পরিচয় দিতে পারি নাই।

বাংলা সাহিত্যে নূতন বসন্তের হাওয়া বহিল ইংরেজদের আগমন ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজ মিশনারীগণ, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে চিন্তার নব নব ধারা ও প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া বসন্তের কুসুমাকর নাম সার্থক করিয়া তুলিলেন। মহাদেবের তপস্যাক্ষেত্রের স্তব্ধ শীতের জড়তার মধ্যে অকালবসন্তোদয়ে যেমন অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মহামহোৎসব লাগিয়া গিয়াছিল, এই সময় বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। সময়ের গুণে

আব হাওয়ার প্রভাবে ইংরেজ-সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়াও লেখকেরা সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব দান করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পরে বঙ্গসাহিত্যকানন কোকিলের কাকলিতে মুখর ও পুষ্পাভরণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে এবং এক এক পর্য্যায়মুখে যাহাঁরা আবির্ভূত হইয়া নব নব সৃষ্টির বৈচিত্র্য মণ্ডিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে আজ তাহার বর্ত্তমান সমৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ।

ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল গত হইয়াছেন; তাঁহাদের সাহিত্যও এখন গত কালের শাশ্বত (classic) সাহিত্য হইয়া গিয়াছে। এখন রবীন্দ্রনাথের যুগ, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বঙ্গসাহিত্যের গতি ভবিষ্যতের পথে প্রধাবিত হইয়া চলিয়াছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই দেবী বীণাপাণির সপ্ততন্ত্রী বীণা বাজাইয়া জগৎকে মোহিত করিতে পারিয়াছেন।

এরূপ সর্ব্বতোমুখী নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা কোনো কালের কোনো দেশের কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই; ভবিষ্যতেও দেখা যাইবে কি না তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। আমাদের পরম গৌরব ও আনন্দ এই যে আমরা রবীন্দ্রনাথের একদেশবাসী এবং সমসাময়িক।*

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষার অভিসার

হেরিনু দাঁড়ায়ে কল্প কালিন্দীর তীরে
প্রাবৃট ঘনালো দূর নভোবৃন্দাবনে,
শ্যাম হ'ল শুষ্ক গোঠ সজীবন নীরে
রঙিন হইল হর্ষ বর গুঞ্জবনে,
কদম্বের গন্ধভরা বনবীথিগুলি
সমীর হিল্লোল তুলে পল্লব সমাজে
কলাপ প্রসারি শিখী খেলায় বিজলি
দূর মধুবন হ'তে বাঁশী যেন বাজে,
চলিয়াছে বর্ষালক্ষ্মী আজি অভিসারে
কুমুদ কুটজে ডালি সাজায়ে মোহন
বিরহ জুড়াবে আজি মিলনাশ্রু ধারে
অভিসার পথে কুঞ্জ করিছে ব্যজন।
অম্বর মেদুর মেঘে, বরষা ঘনায়
বর্ষে বর্ষে বর্ষালক্ষ্মী অভিসারে ধায়।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

*গৌরীপুর-ময়মনসিংহে ২৫এ বৈশাখ পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত

টোটা

টোটা তাহার ডাক নাম। ভাল নাম না-ই বা বলিলাম। বয়স বেশি নয়, বারো কি তের, দেখিতেও সুন্দর, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি তাহার হাড়ে হাড়ে। জনপ্রবাদ নাকি এমন ছেলে সচরাচর মেলা ভার।

পাশের বাড়ী জামাই আসিয়াছে,—টোটা দিবারাত্রি সেইখানে। তাহার সমবয়সী মেয়েগুলা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়; জামাইকে নানাপ্রকারে অপদস্থ করিবার নিত্য নব নব কৌশল উদ্ভাবন করিতে একমাত্র সেই ওস্তাদ।

একটা খেজুর গাছের তলায় দাঁড়াইয়া টোটা ঢিল ছুঁড়িয়া খেজুর পাড়িতেছিল, একদল মেয়ে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল, চল্ টোটা, জামাই দেখে আসি।

হাতের ঢিলটা সে তখন সবেমাত্র ছুঁড়িতে উদ্যত হইয়াছে, সেকথার কোনও জবাব না দিয়া বলিল, সরে যা, পালা,—পালা বল্‌ছি টেবি, মাথায় লেগে গেলে আমি জানি না কিন্তু—বলিয়াই ঢিলটা সে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। টেবি সরিয়া দাঁড়াইল।

সেতী বলিল, আয় না ভাই টোটা, আয় শীগ্‌গির আয়, আর পাড়তে হবে না।

খেজুরগুলা কুড়াইতে কুড়াইতে টোটা বলিল, জমাই ঠকাতেও জানিস্‌নে? তোরা এক একটি আস্ত বোকার ডিম। তোদের কারও বিয়ে হবে না।—যাঃ, অমন সুন্দর পাকা খেজুরটা পড়ে গেল গুয়ের উপর। নে টেবি তুই এইটে কুড়িয়ে খা।

টেবি মুখ বিকৃত করিয়া হাসিল।

সেতী বলিল, হুঁ! বিয়ে হবে না! এই যে এর হয়েছে,—এই যে খেঁদির, এই যে বরুণীর—

টোটা হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, বরুণীর বরের নাকটা কেমন ভাই? এমনি—বলিয়া টোটা তাহার নিজের নাকের ডগায় হাত দিয়া তাহাই দেখাইয়া দিল।

লজ্জায় বরুণী তখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

টোটা বলিল, নয় বরুণী,—সত্যি বল্?

বরুণী রাগিয়া বলিল, তাই বলে' ত' কেউ কারো বাঁশীর মত নাকটা কেড়ে' নিতে যায় নি!—আয় লো আয় সেতী, আয়, ও যাবে না।

সেতী জিজ্ঞাসা করিল, যাবি নে টোটা? তবে কি করতে হবে বল্!

টোটার একটু খানি কাছে সরিয়া গিয়া খেঁদি বলিল, সেই ভাই সেই সেদিন কেমন, পানের ডিবের ভেতর আরসুলা—বলিয়া সে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। ইচ্ছা, তাহার বরের সম্বন্ধে টোটা কিছু বলে। বর তাহার দেখিতে ভারি সুন্দর।

টোটা বলিল, খানিক্‌টা গোবর নিয়ে আজ ওর জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে দিগে যা,—জান্‌তে পারবে না।

খেঁদি তেম্‌নি হাসিতে হাসিতে বলিল, পা দেবে আর প্যাচ্‌—

খুসী হইয়া তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সকলে চলিয়া যাইতেছিল, খেঁদি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর, আর একটা ?

একটা খেজুর মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে টোটা তাহার মাথার উপর সজোরে একটা চড় মারিয়া বলিল, আর তোর মাথা !

খেঁদি ছুটিয়া পলায়ন করিল।

কিন্তু টোটা সেদিন তাহাদের সঙ্গে না যাওয়ার জন্যই হউক্‌, কিম্বা সেই ছোট মেয়েগুলার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই হউক্‌, জামাইএর জুতায় গোবর পুরিতে গিয়া সেদিন তাহারা হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গেল।

বরুণী বলিয়া দিল, তাহারা কিছুই জানে না, যত দোষ টোটার। সেই তাহাদের প্রতিদিন শিখাইয়া দেয়।

কথাটা অতিরঞ্জিত হইয়া টোটার বাবার কানে গিয়া পেঁৗছিল। সে বড় শক্ত লোক, কিন্তু শক্ত হইলে কি হয়, মারিয়া মারিয়া ছেলেটাকেও সে শক্ত করিয়া তুলিতেছিল, আর কিছুই করিতে পারে নাই। টোটা সেদিন তাহার এই দুষ্কর্ম্মের জন্য পিতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল না, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিলে সে যৎপরোনাস্তি মার খাইল। মার খাইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন বৈকালে টোটা নিজেই সেই জামাইবাবুর কাছে গিয়া হাজির। ছোট-ছোট কয়েক্‌টা মেয়ে তাহাকে বিরক্ত করিতেছিল। চড়াইয়া চাপ্‌ড়াইয়া ভয় দেখাইয়া টোটা প্রথমেই তাহাদের সেখানে হইতে তাড়াইয়া দিল।

জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করিল, টোটা, কাল তুমি আমার জুতোর ভেতর গোবর দিয়েছিলে ?

টোটা নিতান্ত ভালমানুষের মত বলিল, না জামাইবাবু, কখ্‌খনো না।—এম্‌নি ভাব দেখাইল যেন সে ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

একটুখানি থামিয়া টোটা বলিল, ওরা ভারি বজ্জাত জামাইবাবু, খালি-খালি আমায় গিয়ে বলে, চল্‌ ভাই টোটা, জামাই ঠকাতে যাবি না,—চল্‌ ভাই লক্ষীটি ! আমি বলি যাব না, ওরা খালি টেনে টেনে নিয়ে আসে। আর ওই যে খেঁদি—হেই এম্‌নি-পারা মুখ, ওই কুঁইলি পেঁচি হারামজাদি ভারি বজ্জাত। একটা বলে' দিলে হয় না, বলে আর-একটা আর-একটা বল্‌, আর কেমন করে ঠকাতে হবে বলে দে।

জামাইবাবু বলিল,—তুমি নিজে না থাক্‌লেও কাল তোমার ও-বুদ্ধিটি শিখিয়ে দেওয়া সত্যি, না ? কি বল টোটা ?

টোটা জামাইবাবুর কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া হাসিয়া ফেলিল। এবং পরক্ষণেই জামাইএর একখানি হাত ধরিয়া নিতান্ত অনুনয়ের সুরে বলিল, চলুন জামাইবাবু, বেড়াতে যাবেন না? চলুন না ওই বনের দিকে।

জামাইবাবু বলিল, না তুমি ভারি দুষ্টু, তোমার সঙ্গে গেলেই বিপদে পড়তে হয়।

চট্ করিয়া টোটা বলিয়া উঠিল, মাইরি বল্‌ছি জামাইবাবু আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, কাল থেকে আমি আর কিচ্ছু করি না, আমি খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছি। বাবাঃ! যে মার খেয়েছি কাল্‌কে! না, চলুন জামাইবাবু, দেখ্‌বেন আপনি, আজ আমি কিছু করি কি-না! করি ত'——বলিয়া সে কি-একটা শপথ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল, কিছু না করি যদি, আজ আমায় একটি পয়সা দেবেন ত? সেই সেদিনের মত?

হাঁ দেব—বলিয়া জামাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইল।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা শালের বন। বৎসরান্তের এই সময়টিতে ছোট-বড় শালের গাছে চিকন্ কচি পাতা গজায়,—মহুয়া ফুলের গন্ধে বনপ্রান্ত আমোদিত হইয়া থাকে। মাঝে-মাঝে সাঁওতালের বস্তি। জামাইবাবু কলিকাতা অঞ্চলের সহুরে মানুষ, তাহার উপর সামান্য কি একটা চাকুরি করিয়া দিন চলে, কাজেই তাহার সেই ইট্-পাথরের বেড়াজালে—বদ্ধজীবনে প্রকৃতির এই অবাধ-মুক্ত শোভা সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর বড় একটা থাকে না। দুদিন বাদেই তাহাকে আবার চলিয়া যাইতে হইবে। তাই সেই মক্ষিকা-গুঞ্জন-মুখরিত তৃণ-পুষ্প-সুরভিত অনতিপ্রশস্ত বনপথটি আর একবার দেখিবার জন্য মন তাহার অজান্তে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, শুধু সেই কারণেই টোটাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সে আর কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেখান হইতে তাহারা বাড়ী ফিরিতেছিল। বড় একটা দীঘির পাড়ের উপর দিয়া গ্রামে ঢুকিবার পথ। মেয়েরা কলসী লইয়া ঘাটে জল লইতে আসিয়াছে, একদল সারি বাঁধিয়া এইমাত্র চলিয়া গেল, আর একদল ঘাট হইতে পথে উঠিতেছে। সেই পথ দিয়াই তাহাদের যাইতে হইবে।

জামাইবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; বলিল, টোটা, অন্য কোনদিকে যাবার পথ নেই?

টোটা আগে-আগে চলিতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, ধেৎ! আসুন না আমার সঙ্গে,—দিব্যি পাশ কেটে বেরিয়ে যাব আমরা।

জামাইবাবু নতমুখে টোটার পিছন ধরিয়া চলিতে লাগিল।

কিন্তু মেয়েদের ঠিক পিছনে আসিয়া টোটা যে কাণ্ডটা করিয়া বসিল,—এমন যে করিবে জামাইবাবু স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারে নাই।

সকলের পশ্চাতে যাইতেছিল ঘোষালদের মেজ-বৌ, দেখিতে খুব সুন্দরী, বয়স আঠারো

উনিশের বেশি নয়। টোটা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বাঁ-হাতটি নিজের বুকের উপর রাখিয়া ডান-হাত দিয়া ঘোষালদের বৌএর পিঠের উপর ডুগি-তবলা বাজাইতে সুরু করিয়া দিল,—গুঁক্ গুঁক্ তেরিখিটি-তাক্ তেরেখিটি-তাক্ ধড়াক্ ধড়াক্ ধাঁ——ধড়াক্ ধড়াক্ ধাঁ !

ভয়চকিত বধূটি পিছন ফিরিয়া টোটাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি হোঁচট্ খাইয়া দলের ভিতর ঢুকিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিল। টোটা তখন নির্ব্বিঘ্নে তাহার কর্ম্ম সমাধা করিয়া দিয়া জামাইবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেও তখন ভয়ে লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

মেয়েরা বেশিকিছু বাড়াবাড়ি করিল না। প্রফুল্ল-বৌ বলিল, আয় টোটা, তোর মায়ের কাছে আয় একবার, দেখি তুই কত বড় শয়তান। বলিয়াই তাহারা একটুখানি দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

জামাইবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া টোটার মুখের পানে তাকাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না।

টোটা নিজেই বলিল, মাইরি জামাইবাবু, ও ত' একবার, আজ সারাদিনের মধ্যে এই একবার,—ও হয়ে গেল এম্নি, আমি আর থাকৃতে পারলাম না,—আর কখ্খনো হয় যদিত' এই—রাম, দুই, সাড়ে-তিন,—বলিয়া সে তাহার দক্ষিণ কর্ণটি নিজের হাতেই বার-কতক্ মর্দ্দন করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

জামাইবাবুর মুখ দিয়া এতক্ষণে কথা ফুটিল। বলিল, পাজি ! ষ্টুপিড্ !

টোটা সবিনয়ে বলিল, নাঃ আর কখ্খনো এসব করব না দেখে নেবেন। —কই জামাইবাবু, দিন্ না একটা পয়সা, আমি আর যাব না আপনার সঙ্গে, এইদিক দিয়ে চলে যাই।

জামাইবাবু বলিল, না, তোমার মত ছেলেকে পয়সা দিতে নেই।

দিন্ না জামাইবাবু!

না।

দিন্ না, আপনার কত পয়সা। হুঁ—

ঘাড় নাড়িয়া জামাইবাবু বলিল, না, কিছুতেই না।

দিন্ না একটা—

ফের্ !

আর কোনও কথা না বলিয়া টোটা চোঁ করিয়া সোজা খানিক্‌টা দৌড়িয়া গেল। মেয়েরা তখনও সুমুখের পথ ধরিয়া চলিতেছিল। তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া টোটা একবার পিছন্ ফিরিয়া তাকাইল,—জামাইবাবু তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া। তাহার পর, মেয়েদের শুনাইয়া শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া জামাইবাবুর উদ্দেশে বলিতে লাগিল, এঁঃ! আমাকে শিখিয়ে দিয়ে

আবার এতক্ষণে চালাকি !—ছাখ গো, তোমরা সবাই ছাখ একবার, নিজে শিখিয়ে দিয়ে আমায় ও আবার মারতে আস্‌ছে উল্টো।

এই বলিয়া টোটা আর সেখানে দাঁড়াইল না, হন-হন করিয়া দৌড়িয়া গ্রামের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দূর হইতে তখন বুঝিতে পারা গেল না জামাইবাবু কি করিতেছে।

গ্রামের বারোয়ারি-তলায় কয়েকদিন ধরিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন চলিতেছিল,—কাল শেষ হইবে।

সেরাত্রে টোটার ভাল ঘুম হইল না, পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই হাবা, নারা ও মন্টু—গ্রামের মধ্যে তাহার এই তিনটি বিশ্বস্ত অনুচরকে ডাকিয়া আনিল।

হাবা বলিল, বারোয়ারি-তলায় চল্ কীর্ত্তন শুনে' আসি।

নারা বলিল, লোকে আজ মেলা বাতাসা ছুঁড়বে ভাই,—আজ ধুলোট্।

বাতাসার নামে মন্টুর জিবে জল সরিতেছিল, সে আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

তাহাদের সঙ্গে লইয়া টোটা পথ চলিতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সে যখন ছুঁড়বে তখন ছুঁড়বে। চ না আজ একটা ভারি মজা করা যাবে চল্।

পথের পাশে বিষ্ণু চাটুজ্যের পড়ো বাড়ীটার ভাঙ্গা একটা দেওয়ালের আড়ালে লোহার দুইটা সাবল লুকানো ছিল, চুপি চুপি সেদুটা বাহির করিয়া হাবা ও নারার হাতে দিয়া টোটা বলিল, এই নরু স্যাক্‌রার দোরের সাম্‌নে একটা, আর উই বোনোয়ারি লাএকের দরজার পাশে একটা—এই দুটো জায়গায় পথের উপরে বেশ ভাল করে দুটো গর্ত্ত খোঁড়া যাক্।

মন্টু বলিল, একেবারে পথের উপরেই, না ওই এক পাশ চেপে ?

ঘাড় নাড়িয়া টোটা বলিল, না, পথের ঠিক্ মাঝখানে। নে—চট্‌পট্।

মন্টু ছেলেটার ভয় একটুখানি বেশি। বলিল, আর ভাই কেউ যদি দেখ্‌তে পায়, আর বকে ?

নারা বলিল, হ্যাঃ! দেখ্‌তে পেলেই ত ? বলব,—খেলা করছি।

হাবা বলিল, বক্‌লেই হলো কিনা ! কারও বাবার পথ ?

টোটা বলিল, লাগা, লাগা, জল্‌দি লাগা, নইলে দে আমাকে দে সাবলটা।

নারা তখন খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, বলিল, এই ছাখ্-না কতবড় গর্ত্ত খুঁড়ে ফেল্‌ছি চটাম্ করে'।

হাবা বলিল, আমার এই গর্ত্তটাতে পড়ে শালা ওই ক্ষুদে তিলি, তাহ'লে ভারি মজা হয়। সেদিন আমাদের সেই ছাগলটার জন্যে পালা কাট্‌ছিলাম ওর ওই সার-ডোবার অশথ-গাছটায়, ওর

সেই বৌ-শালী ট্যাক্‌ট্যাক্‌ করে বেরিয়ে এসে বলে কি-না যা নেমে যা, পালা কাট্‌লে গাছ বাড়বে না আমাদের।

টোটা বলিল, দাঁড়া বাড়াচ্ছি,—গাছটাকে মুড়িয়ে কেটে নিয়ে যেতে হবে একদিন।

দেখিতে দেখিতে দুইটা বেশ বড় বড় গর্ত্ত তৈরী হইল। মণ্টুর উপর ভার ছিল এঁটো শালের পাতা ও সরু-সরু কাটি কুড়াইয়া আনিবার। সমস্তই আসিয়া পৌঁছিলে টোটা নিজের হাতে শাল পাতা কাটি ও তাহার উপর বালি দিয়া গর্ত্ত দুইটি এমন ভাবে বন্ধ করিয়া দিল যে, সেখানে গর্ত্ত আছে বলিয়া সহজে আর-কা'রও টের পাইবার উপায় রহিল না।

তাহার পর তাহারা সকলে মিলিয়া রাস্তার উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিন্ন গ্রামের একটা লোক সেই পথ দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ একটা গর্ত্তে পা দিতে যাইতেছিল, টোটা তাহাকে হাঁ-হাঁ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, বলিল, এই দিক দিয়ে সোজা চলে যাও, ওখানে কে খানিক্‌টা গু চাপা দিয়ে রেখেছে।

লোকটা চলিয়া গেলে হাবা বলিল, পড়্‌তো ত' পড়্‌তোই, বারণ কর্‌লি যে?

মুরুব্বির মত ভারিক্কি চালে টোটা বলিল, জানিস্‌নে তুই। ও ভিন্‌-গাঁয়ের লোক—ওকে ফেলে কি হবে? তার চেয়ে আর একটু পরে দেখবি মজা। গাঁয়ের লোক সব ধূলো-কাদা মেখে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আসবে দেখিস্‌ ঠিক্‌ এই পথ দিয়ে,—বাস্‌! ধুপ্‌ ধাপ্‌ পড়বে আর চেঁচাবে।

এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আবার বলিল, কিন্তু এই বলে রাখ্‌ছি তোদের, খবরদার কেউ হাসিস্‌ নে যেন। হেসেছ কি মরেছ।

বেলা প্রায় আটটার সময় কীর্ত্তন ভাঙিয়া গেল। ধূলোট্‌ সুরু হইল। গ্রামের ছেলে-বুড়ো ইতর-ভদ্র সকলে মিলিয়া নাচিতে নাচিতে বারোয়ারি তলায় গিয়া জড় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খোল-করতাল এবং অন্যান্য নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দে সমস্ত গ্রামখানা যেন মুখরিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন কিসের একটা তীব্র মাদকতায় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছে! কত রকমের নাচ, কত রকমের গান, কত হাসি, কত আনন্দ! সে এক বিরাট ব্যাপার! শত্রুমিত্র, দলাদলি, জাতিভেদ, সব যেন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল, মুচি-মেথর, চামার-চণ্ডাল কাদা মাটি মাখিয়া একসঙ্গে নাচিতে সুরু করিল।

বৎসরের মধ্যে শুধু এই একটি দিন! তাও আবার কোনও বৎসর অর্থের সঙ্কুলান হয় না। আজিকার দিনে তাহাদের এই প্রাণবন্ত সজীবতাটুকু তাহাদের অর্দ্ধমৃত শুষ্ক দগ্ধ হৃদয় হইতে সহসা কেমন করিয়া যে উৎসারিত হইয়া ওঠে কে জানে! মনে হয় না যে বৎসরের সকল দিবসে, দিবসের সকল প্রহরে ইহারাই আবার উপেক্ষিত পল্লীর ঘরে-ঘরে হিংস্র শ্বাপদের মত চারপায়ে হাঁটিয়া বেড়ায়, নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করিয়া মরে। করুণা

হয়,—অন্ধতমসাচ্ছন্ন অধঃপতিত এই বিরাট জনসঙ্ঘ যে কত বড় অসহায় সেই কথাটাই সর্ব্বপ্রথমে মনে হইতে থাকে।

বারোয়ারিতলা হইতে মাদল বাজাইয়া বাগ্‌দিদের প্রথম যে দলটা বাহির হইল তাহারা চলিয়া গেল পশ্চিমপাড়ার দিকে। দরবেশী বাউল গান করিবার জন্য ভিন্নগ্রাম হইতে একদল নেড়ানেড়ী আসিয়াছিল, আনন্দলহরী বাজাইয়া গান করিতে করিতে দক্ষিণপাড়ার একটা রাস্তায় গিয়া তাহারা ঢুকিল। কয়েকটা দল বারোয়ারিতলার আসর জমাইতে লাগিল, এবং বামুনপাড়ার দলটা আসিল টোটার সেই গর্ত্তখোঁড়া পথের উপর দিয়া।

বিষ্ণু চাটুজ্যের পড়োবাড়ীর দেওয়ালের আড়ালে নিতান্ত গোবেচারির মত টোটা দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গীদের বলিল, যা তোরা নাচ্‌গে যা!

কিন্তু আনন্দের এত আয়োজন, এত কষ্ট করা সত্ত্বেও বিধি বাধ সাধিলেন। হাসিতে গিয়া টোটার মুখের হাসি সহসা বন্ধ হইয়া গেল। প্রথম নম্বরেই গর্ত্তে পা দিয়া খোঁড়া হইল রাধু মল্লিক—টোটার বাবা। সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের মধ্যে একটা হৈ চৈ গোলমাল উঠিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় গর্ত্তে পড়িয়া পেতাপ্‌ বাগ্‌দির ডান্‌-পাটা মুচ্‌কাইয়া গেল। তাহার পর কাহার যে কি হইল গোলমালে আর-কিছুই ঠিক-ঠাহর পাওয়া গেল না। টোটা তখন সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

টোটা যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, পল্লীপথে দুপ্রহরের রৌদ্র তখন ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। গত কয়েক দিন ধরিয়া বারোয়ারি তলায় যে সমারোহ চলিতেছিল, উৎসব-শেষে আজ আর তাহার কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। পূর্ব্বের মত সমস্ত গ্রামখানা ইহারই মধ্যে আবার নিঝ্‌ঝুম হইয়া গেল। পেতাপ্‌ বাগ্‌দির পায়ের অবস্থা কিরূপ আছে দেখিবার জন্য টোটা একবার তাহার বাড়ীর দিকে গিয়াছিল কিন্তু তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। রাজার কাছারীতে কি একটা কাজের বেকার দিবার জন্য নায়েবের পেয়াদা আসিয়া সমস্ত বাগ্‌দিপাড়ার লোকগুলাকে মার-ধোর করিয়া ডাকিয়া লইয়া গেছে।

বারোয়ারিতলার সুমুখে টোটা একবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল লোকজন কেহ কোথাও নাই,—গেঁয়ো দুইটা কঙ্কালসার কুকুর ভোগ-মন্দিরের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। লাট-শালার পরেই সারি-সারি তিনটি মন্দির—একটি মনসার, দুইটি শিবের। কিন্তু মন্দিরের চত্বর দুপুরের রৌদ্রে এত বেশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সেখানে পা দিয়া দাঁড়ালো চলে না। টোটা সেই তপ্ত শানের উপর দিয়া মনসা-মন্দিরের চৌকাঠের সমুখে গিয়া দাঁড়াইল। আর-একবার এদিক-ওদিক্‌ তাকাইল; দেখিল, পথে তখনও জনমানব নাই। ধীরে ধীরে সেইখানে সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, মনসামন্দিরের চৌকাঠে মাথাটা ঠেকাইয়া মনে-মনে কি

যেন কামনাও করিল, তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া সে আবার পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। পথের গর্ত্ত দুইটা তখনও তেম্‌নি রহিয়াছে। টোটা আবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তপ্ত বালির উত্তাপে পা তখন পুড়িয়া যাইতেছে। কয়েক্‌টা ইঁট্‌-পাট্‌কেল আনিয়া তাড়াতাড়ি সে গর্ত্ত দুইটা নিজের হাতে আবার বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরের কাছাকাছি আসিয়াও টোটা বাড়ী ঢুকিতে পারিতেছিল না, দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিতে লাগিল। সেখান হইতে যদিও কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, তবু তাহার মায়ের তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ইহা তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে ভিতরে একটা গণ্ডগোল নিশ্চয়ই বাধিয়াছে। বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া সুরু হইয়াছে ;—এবং ইহা তাহাদের চিরাভ্যস্ত অভ্যাস,—প্রতি দিনের মধ্যে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্য না হইলেই নয়।

মা বলিতেছে, চাল ডাল নুন তেল কিছু নেই বাড়ীতে, আর বাবু এলেন এতক্ষণে নেচে পা ভাঙিয়ে।

বাপ্‌ বলিল, আঃ! তাতে আর হয়েছে কি ? এনে' ত' দিলাম এই ভাঙা পা নিয়েই।

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়াই সে আবার বলিল, বছরের-সাধ একটা দিন নাচ্‌তে যাব না—ফুর্ত্তি কর্‌তে ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব আসিল, না। যার ঘরে নাই ভাত, তার অত সখ কিসের ? কাজ-কি নাচা-নাচিতে ?

তাই বেশ বাপু বেশ, আর যাব না।

ঝগড়া এইবার আর অগ্রসর হয় না দেখিয়া টোটার মা কাঁদিয়া ফেলিল।—বাবা রে বাবা! আমার হয়েছে মরণ-মুস্কিল! শেষে জ্বলে 'পুড়ে' মর্‌তে যে হয় আমাকেই।

হ্যাঃ! উনি-ই যেন মর্‌ছেন জ্বলে-পুড়ে' ? আর-কেউ মরে না ?

টোটার মা বলিল, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। এম্‌নি কোন্‌দিন দেবে আর-কি ভাসিয়ে সবাইকে,—আমার হাড়ে হলুদ দিয়ে যাবে হয়ত কোন্‌দিন মরে'—বাস্‌!

স্ত্রীর মুখে নিজের মরণের কথা শুনিয়া রাধু মল্লিক একটুখানি রাগিয়া উঠিল। বলিল, আমার মরণ তাকিয়ে তুই ত' মাছ-পোড়া হাতে নিয়ে বসে আছিস্‌। তা কি-আর আমি জানি না ?

রান্না ঘর হইতে আবার কান্নার সুরে জবাব আসিল,—দেখ, ওই-সব কথাগুলো বলো না বল্‌ছি। দেব আখুনি মাথা খুঁড়ে আধ-সের রক্ত বের করে' তোমার পায়ে।

রাধু বলিল, না, আমার পা অত সস্তা নয়।

নাও, হাসি-ঠাট্টা রাখ। খুব হয়েছে—মরদ!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া রাধু বলিল, পায়ে চুণ হলুদ লাগাব বলে' এতক্ষণ ধরে বসে আছি,—কই দিলিনে যে ?

আমি পার্‌ব না। বলিয়া স্পষ্ট জবাব দিয়া সে আবার কহিল, নিজেই বা নিলে। কেন, কুঠে ত' নও!

রাধু মল্লিক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিল। এবং নিজেই খানিক্‌টা চূণ ও হলুদ আনিয়া মাটির একটা পাত্রের উপর উনানের একপাশে গরম করিতে দিল।

চূণ-হলুদ গরম হইতে দেরি হইল না। কিন্তু উত্তপ্ত সেই মাটির পাত্রটা উনান হইতে তুলিতে গিয়া হাতে তাহার হঠাৎ ছ্যাঁকা লাগিয়া গেল। একে ত' নাচিয়া গাহিয়া খোঁড়া হইয়া ক্লান্ত সে হইয়াই ছিল, তাহার উপর এত বেলা পর্য্যন্ত না খাইয়া কলহ-কিচ্‌কিচি করিয়া মনটাও তাহার ভাল ছিল না,— —হাতে আগুনের আঁচ লাগিতেই সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া গেল। টোটার মা তখন তাহার কাছে বসিয়াই রান্না করিতেছিল। তাড়াতাড়ি চূণ-হলুদ-সমেত গরম খোলাটা রাগের চোটে রাধু মরি-বাঁচি করিয়া হাতে তুলিয়া লইল এবং সেটাকে সে একটুখানি উর্দ্ধে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর পায়ের উপর তাহা ফুটাইয়া দিয়া সরোষে চীৎকার করিয়া উঠিল, তবে নে শালী এই রইলো এইখানে। হারাম-জা-দী—ইহার বেশি রাগে তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না,—আবার তেম্‌নি খোঁড়াইতে খোড়াইতে সে বাহিরে চলিয়া গেল।

দরজার বাহিরে তাহাদের আস্তাকুঁড়ের পাশে টোটা এতক্ষণ আধ-উড়ন্ত একটা শালিক পাখীকে ধরিবার চেস্টা করিতেছিল,—ঘরের ভিতরের কোলাহল কতক্‌টা সুম্‌সান্‌ হইয়াছে দেখিয়া শালিক পাখীর আশা সম্প্রতি সে পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ঢুকিল। বাবা তখন সুমুখ হইতে সরিয়া গেছে, সরাসর সে তাহার মায়ের কাছে গিয়া বলিল, দে ভাত দে,—ক্ষিদে পেয়েছে।

পায়ের উপর গরম চূণ-হল্‌দি পড়িয়া ফোস্কা না উঠিলেও জ্বালা করিতেছিল। বলিল, ভাত নেই আজ, যা পালা সব আমার সুমুখ থেকে।

ব্যাপার যে, কতদূর গড়াইয়াছে টোটা তাহার কিছুই জানিত না, বলিল, বাঃ সকাল থেকে কিছু খেয়েছি? ক্ষিদে পায়নি আমার?

টোটার মা বলিল, সে তোর বাপকে ডাক্‌—রাঁধুক্‌ বাড়ুক্‌ খা'ক্‌ খাওয়াক্‌—আমি কিছু জানিনে।

এই বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া সে অন্যত্রে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, টোটা তাহার আঁচল ধরিয়া বলিল, দিয়ে যা ভাত! ক্ষিদে পায়নি?

কথার কোনও জবাব না দিয়া আঁচলটা টানিয়া লইয়া তাহার মা চলিয়া গেল। টোটা তাহার পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, উনোনে ওই যে কি চড়ানো রইলো ওটা পুড়ে যাক্‌ তাহ'লে?—মুড়ি কোথায় আছে বল্‌ আমি নিজেই নিই-গে।

রান্নাঘরের পাশেই ঢেঁকি-শালের কাছে বসিয়া তাহার বাবা যে তামাক সাজিতেছিল টোটা

তাহা দেখিতে পায় নাই। রাধু তাহার রাগ ঝাড়িবার আর লোক পাইতেছিল না, টোটাকে দেখিতে পাইবামাত্র সে তাহার কাণে ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাত খাবার জন্মে চেঁচাচ্ছিস্ যে ? ভাত হয়েছে জানিস্ ?

টোটা চুপ করিয়া রহিল।

এতক্ষণ কোথা ছিলি,—ছিলি কোথা হতভাগা ? বলিয়া সে তাহার গালের উপর ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া দিল।

টোটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল, কোনও জবাব দিল না।

রাধু এইবার তাহার পেটের উপর এক লাথি মারিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, বেরো হারামজাদা বেরো ঘর থেকে। পড়া নেই, শোনা নেই এতক্ষণে এলেন ওঁকে বিরক্ত করতে !

এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া পুনরায় তাহার কলিকাটা সাজিতে সাজিতে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিল,—এঁঃ ! ভাত খাব—ভাত খাব, পিণ্ডি খেগে, আখার ছাই খেগে যা—

টোটা কাঁদিল না, কিছু বলিল না, মুখ ভার করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে ঘরের ভিতর হইতে তাহার মা ডাকিল, টোটা, টোটা, যাস্‌নে—

কিন্তু তাহাতে তাহার অভিমান যেন আরও খানিকটা বাড়িল বই কমিল না।

সরাসর গ্রামের পথ ধরিয়া বোধ করি সে তাহার কোনও অনুচরের কাছেই যাইতেছিল।—বারোয়ারি তলার কাছাকাছি একটা ছেলের সঙ্গে দেখা। নাম—ডেলাই ঠাকুর, ছেলেটা তাহারই সমবয়সী কি এক-আধ বছরের ছোটই হইবে। 'ঠাকুর' তাহাদের উপাধি—পূজা পৌরোহিত্য করিয়া দিন চলে। ফুলের একটা সাজি ও একটা গাড়ু হাতে লইয়া সে বারোয়ারিতলার দিকে যাইতেছিল। মনসা ও শিবের পূজা তাহারাই করে, এবং তাহার জন্য বিঘাকতক্ দেবোত্তর জমির ফসল তাহারা পায়।

টোটা জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাচ্ছিস্ ডেলো ?

পূজো করতে। কেন ?

এত দেরি হলো যে ?

ডেলাই ঈষৎ হাসিয়া চুপি-চুপি বলিল, পূজো বলে কারুর মনেই ছিল না,—বাবা ঘুমোচ্ছে।

টোটা বলিল, তুই পূজো করতে জানিস্ ?

হ্যাঁ জানি। বা, কতদিন থেকে করছি !

কই বল্ দেখি মন্তর্।

ডেলাই একটা ঢোঁক্ গিলিয়া বলিল, পেরথমে একবার এই ধর্ গাড়ুর জলে সব চান্-টান্ করিয়ে দিলাম, তারপর গায়িত্তি জপ্‌তে হয় দশবার; বাস্, আবার কি? আতপ চাল, ফুল আর বেলপাতা নিয়ে তিনবার,—শিব হলে, ওং শিবায় নম, ওং শিবায় নম; আর মনসার বেলায়, ওং মা মনসায় নম, ওং মা মনসায় নম। শেষে উঠে আসবার সময় গাড়ুর জল নিয়ে ওং রিং রিং ফট্—ওং রিং রিং ফট্।

টোটা জিজ্ঞাসা করিল, তুই ভাত খেয়েছিস্ ডেলো?

ডেলাই প্রথমে 'না' বলিতে গিয়াছিল, পরে থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল, হাঁ। আমি ত জানি না ভাই, যে আমাকেই পূজো করতে হবে বল্?

টোটা কহিল, ভাত খেয়ে পূজো হয়?

ঘাড় নাড়িয়া ডেলাই বলিল, হাঁ, মা বল্‌লে, হয়।

কই দেখি কি আছে তোর সাজিতে? বলিয়া টোটা উঁকি মারিয়া ফুলের সাজিটা দেখিতে যাইতেছিল, ডেলাই বলিল, চান্ করেছিস্ ত টোটা? তা নইলে বাবা হেঁ-হেঁ, জান না ত?

হ্যাঁ করেছি। বলিয়া টোটা দেখিল, সাজির মধ্যে কয়েকটি রক্ত করবীর ফুল, খান-দশ বারো বেল-পাতা আর একটি পিতলের ছোট রেকাবের উপর একমুঠা আতপ চাউল ছাড়া আর-কিছুই নাই।

টোটা জিজ্ঞাসা করিল. মনসা ঠাকুরটার পূজো করবি নে? ওই মনসার?

হাঁ, করব।

তবে, হেঁইও! বলিয়া টোটা অতর্কিতে সেই সাজিটার নীচে হাত দিয়া এমনভাবে তাহা উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিল যে, ফুল, বেলপাতা, রেকাবি ও আতপ চাল পথের ধুলামাটির উপর তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া পড়িল।

ব্যাপার দেখিয়া ছেলেটা প্রথমে অবাক্ হইয়া পথের মাঝে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই ভ'য়ে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিল, এ্যাঁ—এই চল্‌লাম আমি বাবাকে বল্‌তে, শা——লা——

আপন্ মনে চলিতে চলিতে টোটা একবার পিছন্ ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, যাঃ যাঃ!

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একবার

থেকে থেকে পড়ে মনে একবার এ জীবনে
এসেছিলে বসন্ত-হিল্লোল,
দক্ষিণে ফুলেল হাওয়া করেছিল আসা যাওয়া
প্রাণ মোর দিয়েছিল দোল!
ফুলে—ভরেছিল শাখী উড়ে—এসেছিল পাখী
গেয়েছিল কোকিল পাপিয়া,
সবুজ সোনালী সব করেছিনু অনুভব
হৃদয়ের প্রতি শিরা দিয়া!
দুটি কার আঁখি কালো চোখে লেগেছিল ভালো,
কালো করি দিল ত্রিভুবন,
লাজে ভয়ে অনুরাগে স্মরণে আজো সে জাগে
নিশিদিন সদা অনুখন!
সরস পরশে কার মুঞ্জরিল চারিধার,
গুঞ্জরিল ভ্রমর ভ্রমরী!
উর্ব্বরিল শুষ্ক মরু ফুটিল চম্পক তরু,
অশোক বকুল মরি মরি!
একবার এ জীবনে এসেছিলে পড়ে মনে
পূর্ণিমার জ্যোছনা-প্লাবন,
আকাশের বাঁধ ভেঙে হু হু করে এলো নেমে
স্নিগ্ধ শুভ্র অজস্র কিরণ!
সে আলোক-পারাবারে ডুবে গেনু একেবারে,
ডুবে গেল সৃষ্টি চরাচর,
মোহময় স্বপ্নময় মনে হোলো সমুদয়,
কি সুন্দর মরি কি সুন্দর!

স্বপ্নাবেশে তন্দ্রা চোখে সে প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে
যেন লক্ষ মণি-দীপ জ্বালা,
সরমে সঙ্কোচে লুটে কম্পমান করপুটে
কণ্ঠে মোর কে পরালো মালা!
যত কিছু ধুলো বালি সেখানে যা ছিল কালী—
সোনা হয়ে উঠিল ফুটিয়া,
কী অপূর্ব্ব রসায়নে! বসে তাই বাতায়নে
কাঁদি আজ আঁধারে লুটিয়া!
মাঝে মাঝে পড়ে মনে একবার এ জীবনে
এসেছিল আনন্দ উৎসব,
বসন্ত পূর্ণিমা রাতি বিস্তৃত চন্দ্রমা-ভাতি
হাসি গান গল্প কলরব!
কাণে প্রাণে বাজে বাঁশী, প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি
পেতেছিল বাসর শয়ন,
সোনার স্বপন এঁকে চোখে মোর দিল সে কে?
তপ্ত ভালে বুলালো চন্দন?
থুয়ে মুখ বক্ষোপরে গুঞ্জরিয়া মৃদুস্বরে
কে ডাকিল—'প্রিয় প্রিয়তম'!
চেয়ে দেখি নিশি ভোর, ঘুচে গেছে স্বপ্ন ঘোর—
—মুছে গেছে কুহেলিকা সম!
নেই আলো নেই বাঁশী নেই গান নেই হাসি,
স্বর্ণ বীণা গিয়াছে টুটিয়া,
একাকী এ গৃহ কোণে কাঁদিতেছি মনে মনে
ধূলি-শয্যা আঁধারে লুটিয়া!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

"বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান বাংলা"*

স্বামী বিবেকানন্দের মত অসাধারণ প্রতিভাশালী মনস্বী বাংলাদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এই কথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হইবে না। সুতরাং বর্ত্তমান বাংলাদেশের তিনটী প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীবিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা একবার অবহিত-চিত্তে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

(১) "হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা"

প্রথমতঃ, আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যার কথা বলিব। আজ বাংলাদেশে শতকরা ৫৫

* স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান ভারতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। রাজর্ষি রামমোহনের পর বর্ত্তমান ভারতের গঠনকর্ত্তাদের মধ্যে বিবেকানন্দের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান ভারতের বহু সমস্যাই স্বামীজি অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মাজির অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের যে আন্দোলন আজ স্থবির স্থিতিশীল হিন্দু সমাজকে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাভাসও ত স্বামীজি সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র শুধু বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল না, হিমালয় হইতে কুমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষেইত তিনি রামকৃষ্ণ-মিশনের কেন্দ্রস্থাপন করিয়াছে, একথা সকলেই জানেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ। এই বিশ্ববিশ্রুত ভুবনপূজিত বীর সন্ন্যাসীকে কেবল "বাঙালী" করিয়া রাখিলে বিষম ভুল করা হইবে। বাঙালী বিবেকানন্দ শুধু বাংলাদেশের নহে, তিনি গোটা ভারতের। বিবেকানন্দের মত সুসন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতমাতা আজ ধন্য হইয়াছেন। স্বামীজির মত অলোকসামান্য মহাপুরুষ যে সমগ্র জগতের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী, তাই ভারতবাসীমাত্রেই যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্য একটা গৌরবমিশ্রিত গর্ব্ব অনুভব করিবেন তাহাতে আর বেশী আশ্চর্য্য কি?

যাহা হৌক, বিবেকানন্দকে কোনমতে বাংলাদেশের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। সুতরাং এই প্রবন্ধটীর নাম "বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান ভারত" রাখিলেই বোধ হয় ভাল হইত। বাংলা দেশের পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষেইত তাহা প্রযোজ্য। বিবেকানন্দের বাণী বাংলা দেশের এক চেটিয়া সম্পত্তি নয়। আর স্বামীজি যখন যাহা বলিয়াছেন, সমস্ত ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়াইত বলিয়াছেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের আপামর সাধারণের মঙ্গল কামনায়ইত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সূর্য্যের কিরণ কি একটু সংকীর্ণ জায়গায় আবদ্ধ থাকিতে পারে? ঐ উন্মুক্ত উদার আকাশের পক্ষে সসীম লইয়া থাকা যে একেবারে অসম্ভব!

তবে বাংলার মাটী, বাংলার জলে পরিপুষ্ট, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার বিচিত্র আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত বলিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্কের কথা বাঙালী পাঠক পাঠিকার সমক্ষে "বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান বাংলা" নামেই প্রকাশ করা হইল।

জনেরও অধিক ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস। অতএব হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন ব্যতীত "স্বরাজ" লাভের আশা সুদূরপরাহত।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীবিবেকানন্দ কোন স্থানে বিশেষভাবে কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তবে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর আলমোরা হইতে নাইনীতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে স্বামিজী একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহাতে স্বামীজি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তবে হয়ত তাঁহাকে আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূতরূপে দেখিতে পাইতাম। এই চিঠিখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, উদারচেতা স্বামী-বিবেকানন্দের হৃদয়টা কত বিশাল ছিল,—তিনি সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষমুহূর্ত্তে কত সব সুখস্বপ্নে বিভোর থাকিতেন।

"যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে, প্রকাশ্যরূপে সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন তবে একমাত্র ইসলামধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী।

আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইস্‌লাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাই-বেলও নাই, কোরাণও নাই। "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা।" আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইস্‌লামীয় দেহ লইয়া ভবিষ্যৎ ভারত গৌরব মণ্ডিত হইয়া উঠিবে অর্থাৎ ইস্‌লামীয়দেহ এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এই দ্বিবিধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ আদর্শের বিকাশ সাধন করিয়া—ভারতবাসী কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে।"*

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজির মতবাদ কিরূপ হইত তাহার আভাস আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রখানির মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। একথা বলিলাম এই জন্য যে বাংলাদেশের তথাচ সমস্ত ভারতবর্ষের এইরূপ একটী বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজি একেবারে নীরব থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না—তবে বিবেকানন্দের সময় হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ এবং প্রতিযোগিতা এরূপ প্রবলভাবে দেখা দেয় নাই।—ভারতের রাজনৈতিক গগনে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সমস্যাও তাই এত ঘনঘটায় আবির্ভূত হয় নাই, আর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান এবং প্রথম ব্রত ছিল মৃতকল্প হিন্দু-ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করা—ভেদাভেদজ্ঞানে জর্জ্জরিত সংকীর্ণ হিন্দুসমাজকে নূতন

* For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam, is the only hope. *I see in my mind's eye, the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.*

ভাবে সংগঠিত করা—যাহা হৌক, এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সঙ্গে স্বামীজির সম্পর্কের কথা ১৩৩১ সালের মাঘমাসের "বঙ্গবাণীতে" প্রকাশিত "মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধটীতে আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে—সুতরাং এখানে সে সব কথার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তবে এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ না করিলে স্বামীজির উপর অবিচার করা হইবে। Orphanage বা অনাথাশ্রমে জাতিবর্ণনির্বিবিশেষে সকল ধর্ম্মের লোককে অকুণ্ঠিতচিত্তে আশ্রয় দিতে স্বামীজি রাজী ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর মরি হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে অনাথাশ্রমে "মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি।" কিন্তু স্বামীজি অখণ্ডানন্দকে আবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, মুসলমান বালকদের "ধর্ম্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলিয়া রাখ।"

এই উক্তি হইতেই আমরা বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। হিন্দু মুসলমানের মিলনের মূর্ত্ত অবতার যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীর বিশাল হৃদয়েরই মতন সুপ্রশস্ত ছিল স্বামীজির উদার হৃদয়টা। স্বামীজি, অখণ্ডানন্দকে লিখিয়াছেন যে, ভগবান প্রেমরূপে সর্ব্বভূতে প্রকাশমান—আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজা হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি পাতড়া এখন কিছু দিন শান্তি লাভ ক'রুক—প্রত্যক্ষ ভগবান্ দয়া প্রেমের পূজো দেশে হক্। ভেদ বুদ্ধিই বন্ধন, অভেদ বুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ অভীঃ। লোক না পোক্! হিন্দু মুসলমান, কৃশ্চান্ ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, ত'বে প্রথমটা আস্তে আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয় আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে"। আর স্বামীজির Missionই ছিল "অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষা-ভূষোর জন্য, আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য।"

(২) অন্ন-সমস্যা

বিবেকানন্দ-কেশবচন্দ্রের সময় বাংলা দেশে সে কি ধর্ম্মোন্মাদের যুগ গিয়াছে। তখন দেশময় একটা নবীন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রাণের সে কি আবেগ! আশা উৎসাহে দেশময় যেন একটা আনন্দ-স্রোত বহিয়া গিয়াছিল!! সে অদম্য উদ্যম, সে জ্বলন্ত উৎসাহ আজ আর নাই।

কিন্তু সেই "ধর্ম্মোন্মাদের যুগে"-ও ধর্ম্মপ্রচারক বিবেকানন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে অন্ন-সমস্যা আমাদের দেশে একটা মহা সমস্যা। তিনি বলিয়াছেন যে "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেনা, দারিদ্র্যের প্রতি দারিদ্র্যই তাহার এক

কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই এত ভয়ানক যে তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।”

মনে পড়ে চিকাগো “ধর্ম্ম মহাসভায়” ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারাভিলাষী মিশনারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে ভারতবাসী ভাতের—এক মুঠি অন্নের কাঙ্গাল—ধর্ম্মের কাঙ্গাল নহে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে আজ অন্ন প্রদান করিতে হইবে। কারণ, “ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগকে ধর্ম্মের কথা বলা, বা তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র”।

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়াছেন যে সাধারণ কুলিমজুরও প্রতিদিন ৯। ১০ টাকা রোজগার করে, আর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক অনাশন অর্দ্ধাশনে দিনপাত করে। তাই স্বামীজি বলিতেন যে “যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর্ত্তে পারে না,—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন করে সে জাতের আবার বড়াই। ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে ‘জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ’।”

এবং এই জন্যই বোধ হয় আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারক বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, “যে বিবেকানন্দের কোন ধর্ম্ম নাই—যত দিন পর্য্যন্ত ভারতের একটী বিড়াল, একটী কুকুর পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিবে, ততদিন বিবেকানন্দের কোন ধর্ম্ম নাই”। স্বামিজি অতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে যে-ধর্ম্ম বা যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না”। “যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না; মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম? যারা এক টুকরা রুটী গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে!”

আমাদের দারুণ অন্নকষ্ট দেখিয়া মর্ম্ম বেদনা লুকাইতে না পারিয়া কত গভীর ক্ষোভেই না স্বামীজি বলিতেন যে “অন্ন, অন্ন, যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।” স্বামীজির জীবনের মূলমন্ত্রই এই ছিল যে, “ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হৌন, সন্ন্যাসীই হৌন, আর যিনিই হৌন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার, এক বিন্দুও যাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে।” আমাদের “পুরোহিতদের” উপর স্বামীজী হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। “প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর কোরে দাও। কারণ, মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধ্‌রোবেনা। তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবেনা। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব, আগে তাদের নির্ম্মূল কর।” স্বামীজি আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে, “দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজে প্রত্যেক খুটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল, তাইতেইত লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন কষ্ট পাচ্ছে!”

(২) " সমাজ-সমস্যা ।"

তাই স্বামীজির মত ছিল যে, সকলকে সমান " opportunity " সুযোগ বা সুবিধা দাও— কাহাকেও পায়ের তলে চাপিয়া রাখিও না। তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে "জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারাই করিয়াছেন।" স্বামীজি জানিতেন যে, আমাদের এই জাতিভেদ একটা সামাজিক বিধানমাত্র—ধর্ম্মের সঙ্গে জাতির বড় একটা সম্পর্কই নাই অর্থাৎ জাতিভেদ ধর্ম্ম বিধান নহে। এবং জাতি "এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা উহার কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারত গগনকে উহার দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।" এবং হিন্দু সমাজ হইতে এই " পচাদুর্গন্ধ " দূর করিবার জন্য লোকের " সামাজিক সত্ত্ববুদ্ধি " জাগরিত করিতে আমরণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত, তথাকথিত পৌত্তলিক মৃতকল্প হিন্দুধর্ম্মের ভিতর, স্বামী বিবেকানন্দ শক্তি-সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন—সংকীর্ণ, অনুদার, অস্পৃশ্যতা-ও-ভেদাভেদ জ্ঞানে জর্জ্জরিত হিন্দুসমাজে অদ্বৈতবাদের সাম্যমন্ত্র প্রচার করিয়া, উক্ত সমাজকে উদারতা এবং একতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজির গ্রন্থাবলী— বিশেষতঃ "পত্রাবলী" "পরিব্রাজক" "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" "ভারতে বিবেকানন্দ" এবং স্বামিশিষ্য সংবাদ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ করিয়া এই মহাপ্রাণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এইরূপই ধারণা জন্মিয়াছে। " বিবেকানন্দ সাহিত্যের" সহিত যাহারা একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দাবী রাখেন, তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই প্রকার ধারণা একেবারে অমূলক নয়।

বিবেকানন্দের পরে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম্মের নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিয়া " উলট-পালট" করিয়াছেন। কিন্তু লম্বা লম্বা টিকিওয়ালা, ক্ষুদ্র চিত্ত আধুনিক পণ্ডিতদের মত স্বামী-বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক ব্যাখ্যার বুজরুকিতে কিম্বা "মাইর প্যাচে" বড়বেশী আস্থাবান ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অসামান্য তেজস্বী পুরুষ, অনন্তশক্তির আধার " বিগতভী " বৈদান্তিক—ভণ্ডামি ন্যাকামি, কিম্বা অন্য কোন রকম দুর্ব্বলতা তাঁহার ধাতে সইত না। বিবেকানন্দের প্রাণটা ছিল খুব বড়, হৃদয়টা ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত—গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা বিবেকানন্দ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। অলৌকিক প্রতিভাশালী আচার্য্য শঙ্করের অনুদার মতের নিমিত্ত স্বামীজি শঙ্করাচার্য্যকেও ক্ষমা করেন নাই—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে " ন শূদ্রায় মতিং দত্থাৎ।" "ন শূদ্রায় মতিং দত্থাৎ" বলার দরুণ শঙ্করকে স্বামীজি অগভীর হৃদয় বলিতেও কসুর করেন নাই। " ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবেনা, বেদান্তভাষ্যে শঙ্কর একথা সমর্থন করেছেন—তাঁর উদারতাটা অগভীর—হৃদয়টাও

ঐরূপ।” স্বামী বিবেকানন্দ আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে, “উপনিষদ লিখে ছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারীর, সকল জাতির, সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন, আর ব্যাস গরিব শূদ্রদের বঞ্চিত কর্‌বার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থ করেছেন।”

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের বড় উদার ভাব মহান্ উচ্চ আদর্শের জন্য তাঁহার নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে হয়। অধঃপতিত দরিদ্র, পদদলিত, ইতর, অস্পৃশ্য জাতিদের উদ্ধার প্রচেষ্টায়ও আমরা বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

মহাত্মাগান্ধীর মত স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কোন জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেনা, কিম্বা করিতে পারে না। তাই তিনি চিকাগোর “সর্ব্বধর্ম্ম মহাসমিতি”তে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে “যে ধর্ম্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী Exclusion অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য শব্দটী কোনওমতে অনুবাদিত হইতে পারে না, অমি সেই ধর্ম্মভুক্ত।”

স্বামীজি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র।” অথচ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ আজ সংকীর্ণতা, অনুদারতা, অস্পৃশ্যতা ও ভেদাভেদজ্ঞানে জর্জ্জরিত। ইহার কারণ কি? সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, স্বামীজি বলেন যে, কেবল ঐ তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা—সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”, ভগবান “সর্ব্বভূতান্তরাত্মা”—অদ্বৈত তত্ত্বের এই সমস্ত উচ্চতম জ্ঞানের কথা হিন্দুসমাজে কার্য্যে পরিণত হইল না, তাই হিন্দুসমাজ “যেই তিমিরে সেই তিমিরে”ই রহিয়া গেল। গীতা ও উপনিষদের জটিল তুরীয় আদর্শবাদ—শঙ্করের ভাষ্য এবং ব্যাখ্যা যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ত মুষ্টিমেয়—Microscopic minority. কোটী কোটী লোকের কাছে উহা আজ অর্থহীন—উহার কোন মূল্য নাই বলিলেও চলে—তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে ঐ বেদান্ত দর্শন বা Trancendental Philosophyর বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। আমাদের কথা অলীক, অত্যুক্তি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না—কয়জন লোক Practical life বা ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃত ধর্ম্মের ধার ধারেন? স্বামী বিবেকানন্দের কথায় “দেশশুদ্ধ লোক শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করেছে—কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে”।* তাই সংকীর্ণ হিন্দুসমাজে আজ এই অসংখ্য জাতিভেদ ও

* তাই হিন্দুর ধর্ম্ম আজ “বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই, ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম্ম বিচার মার্গেও নয়, জ্ঞান মার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, ব্যস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইওনা “আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু” কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে নাকি?...... যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease, সাবধান।”—“পত্রাবলী”।

ছুঁৎমার্গের বাড়াবাড়ি। স্বামী বিবেকানন্দ ভালমত জানিতেন যে ব্যবহারিক অদ্বৈতবাদ হিন্দুদের মধ্যে কস্মিনকালেও বিকাশ লাভ করে নাই। "Practical *Advaitism* was never developed among the Hindus." এই প্রাকৃটিকাল অদ্বৈতবাদই সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সমদর্শী—মানুষকে আপনার আত্মার ন্যায় সকল প্রাণীর প্রতি ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়। এবং বৈদান্তিক বিবেকানন্দ এই অদ্বৈতবাদকে হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে আমরণ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ স্বামীজির মতে ; এই অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াই আমরা সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতি ও প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারি। "*Advaitism* is the only position from which one can look upon all religions and sects with love."

তাই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজে প্রচার করিয়াছেন যে, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" "দরিদ্র পদদলিত অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হৌক।"* স্বামীজি আরও জানিতেন যে, যদি "Lower classদের education দিতে পারা যায়, তাহলে" ভারতের মুক্তির উপায় হতে পারে—তাই আমাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঐ যে "পশুবৎ হাঁড়ি ডোম" তাহাদের উন্নতির জন্য স্বামীজি "সেবাধর্ম্মে"র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—ইতর অস্পৃশ্য অজ্ঞ মুচি মেথর মুদ্দফরাস—এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত জাতিদের মঙ্গল কামনায় "রামকৃষ্ণ মিশনে"র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আমাদের হিন্দু সমাজে গলদের অন্ত নাই। সংকীর্ণতা, অনুদারতা প্রতিপদে, চারিদিকে শুধু দলাদলি † এবং আমাদের দলাদলির ভেদাভেদের মূলে শুধু গোঁড়ামি—সংকীর্ণতা। আমাদের হৃদয়ে বড় ভাব আসেনা—আমরা যেন "অচলায়তনে"র সংকীর্ণ গণ্ডীবেষ্টিত—তাই বোধ হয় স্বামীজি আমাদের "কূপমণ্ডুক" বলিতেন। স্বামীজি যথার্থই বলিয়াছেন যে "সংকীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে, তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব।" চিকাগোর ধর্ম্মসভায়ও তিনি বলিয়াছিলেন যে, "কুসংস্কার মনুষ্যের শত্রু বটে, কিন্তু সংকীর্ণতা তদপেক্ষা ঘোরতর শত্রু।"

আমেরিকায় বসিয়া স্বামীজি যখনই দেশের কথা ভাবিয়াছেন তখনই তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। "ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র ভারতের পতিত, ভারতের পাপীগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই, তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে। কিন্তু

* "The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God."

† "দলাদলি দলবাঁধা কূপমণ্ডুকের মধ্যে আমি নাই আর আমি যেথায় থাকি—"পত্রাবলী" ২য় ভাগ

তাহারা জানেনা কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।"

"আমেরিকায় যে কেহ জন্মিয়াছে সেই জানে আমি একজন মানুষ। ভারতে যে কেহ জন্মায় সেই জানে সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র।" "যদি কারওর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল, কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এ দেশের (আমেরিকার) সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, opportunities আছে, আজ গরীব কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎমান্য হবে।......হে ভগবান্, আমরা কি মানুষ, ঐ যে পশুবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দিবার জন্য কি করেছ বল্‌তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর দূর কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে আমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন তারা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন ছুঁয়োনা—আমায় ছুঁয়োনা! এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি করে ফেলেছি? এখন ধর্ম্ম কোথায়। খালি ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।"

নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি-মেথর স্বামীজির রক্ত ছিল, তাঁহার ভাই ছিল—স্বামীজি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন যে ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচজাতিরা আপনাদের জন্মগত অধিকার দাবী করিবে; এবং আমরা উচ্চ জাতিরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের উপর এতদিন অত্যাচার করিয়াছি, এখন এরা তাহার প্রতিশোধ নিবে—"তোরা হা চাক্‌রি, হা চাক্‌রি করে লোপ পেয়ে যাবি।"

কত গভীর দুঃখেই না স্বামীজি বলিতেন যে, "দেশে কি মানুষ আছে? ওত শ্মশানপুরী।" কিন্তু শক্তিমন্ত্র প্রচারক "মঙ্গলবাদী" বিবেকানন্দ ত কিছুতেই দমিবার পাত্র ছিলেন না। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা আজ সঙ্কীর্ণ, দুর্ব্বলচিত্ত, ধ্বংসোন্মুখ।—দলাদলি ও ভেদাভেদ জ্ঞানে জর্জ্জরিত সমাজের চিত্র তাহাকে যার-পর-নাই বেদনা দিত বটে কিন্তু তিনি তাঁহার কল্পনা নেত্রে ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইতেন, দুর্ব্বল ভীরু কাপুরুষ পরপদলেহী, পরমুখাপেক্ষী আমরা—তাই আমাদের লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারস্বরে বলিয়াছেন যে, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালো মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে; বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়াটা উল্‌টে দিতে পারবে; আধখানা রুটী খেয়ে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এ রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই।"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ

মরু-তৃষা

জীবন কোথায়? মরুতৃষাময়
জীবন-ভিখারী ফুকারি' কাঁদে,
স্বর্ণমৃগের বর্ণচাতুরী
মারীচের মায়া-আর্ত্তনাদে
ভুলায় নয়ন, ভুলায় শ্রবণ
টেনে নিয়ে যায় বিজন বনে
মিছে মৃগয়ায় ফেলে চলে যায়
জীবনের রাণী পরাণ ধনে।
দেহ মন প্রাণ করি সব দান
হৃদয়-রক্ত-কমল ফুলে
ডালি আপনারে পূজিলে যাহারে
তারে বঞ্চনা মনের ভুলে?
আমার বুকের রক্ত নিষেকি
জ্বলে সন্ধ্যার প্রদীপমালা
আমার অস্থি-সমিধে রয়েছে
ইষ্টযাগের আগুন জ্বালা
আমার মনের বাসনার ধূপ
আপনা দহিয়া দেবতা পূজে
অন্তর মাঝে চিরপ্রতীক্ষা,
দুটি চোখ মেলি দয়িতে খুঁজে
গেল' দরশন দেহ প্রাণমন
ভরিয়া উঠিল অমৃত রসে
জীবন হইতে জীবন অবধি
আনন্দ ধারা আসিয়া পশে'
জীবনদায়িনী, অমৃতবাহিনী
আনন্দময়ী হৃদয়-রাণী
সেদিন শুনালে অমর গাথায়
জরা মরণের অভয় বাণী!
শিরায় শিরায় জাগিল জীবন
নয়নে জাগিল সূর্য্যপ্রভা
শুষ্কহৃদয়-সায়রে বসিল
ভাব-কমলের উজল সভা
অন্তরে জাগে নববসন্ত
ফুটন্ত ফুলে ধরণী হাসে
কিশোরী বঁধুর অধর মধুর
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে লজ্জাত্রাসে
কল্পলোকের সঙ্গীত সুধা
নিমেষে নিমেষে ঝরিয়া পড়ে
অসম্ভবের দুর্গম শিলা
ভেদি' স্বর্গের সোপান গড়ে
দেখি মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছনা তার
বায়ুভরে মেলি সোনার পাখা
আকাশের গায় জ্যোতি-মহিমায়
আঁকে বিচিত্র অযুত রাকা
জোৎস্নায় ভরা, ভরা জোৎস্নায়
ভাব সাগরের জোয়ার জলে
মন ভেসে চলে, দেহপ্রাণমন,
কলকল্লোল নিতল তলে
জীবন মরণ আলোড়িয়া ওঠে
দেব-বাঞ্ছিত স্বর্গ-সুধা
ওরে ও তৃষিত অঞ্জলি ভরি'
মিটালি সেদিন প্রাণের ক্ষুধা
সেই একদিন এই একদিন
পিছনে মধুর স্বপন মায়া
আজি সম্মুখে মরু-তৃষা ধুঁকে
স্মৃতির আলোয় ফেলিছে ছায়া
কোথায় কি ফাঁকি রয়ে গেছে বাকী
আজিকে প্রাণের ব্যাসাতি মূলে
মন যারে চায় তারে দলি পায়
পূজিনু মিছায় মনের ভুলে।
বিশ্বের সাথে করি বঞ্চনা
কোন্ জনা হায় ইষ্ট পায়
বিড়ম্বনায় গঞ্জনা সার
জীবনের ক্ষতি রহিয়া যায়।
হৃদয়-পাত্র উপচিয়া পড়ে
স্বর্গের সুধা ফেনায়ে ওঠে
জীবন-ভিখারী শুধু চেয়ে রয়
মরু-তৃষা বুকে ধরায় লোটে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"ফ্রান্সে শিক্ষা-বিজ্ঞানের অনুশীলন"

Paul Lapie.

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ফরাসী গুরু মাত্রই একমত। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবত যে-সকল শিক্ষক সরকারী শিক্ষা কার্য্যের পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই কথায় পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন :—"সরল-পন্থী হও; পাঠ্যতালিকার মধ্যে কতকগুলি বিষয় বাছিয়া লও; যাহা তোমার ছাত্রদের বয়সের উপযোগী, যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিবে, কেবল তাহাই গ্রহণ কর। বস্তুনিষ্ঠ হও, বাগাড়ম্বর ও তোতাপাখীপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর; তোমার ছাত্রের মন ও তাহার শিক্ষার বিষয়—এই উভয়ের মধ্যে কোন মধ্যস্থ রাখিওনা; তাহাদের কৌতূহল উদ্রেক কর, বিচার বুদ্ধি উত্তেজিত কর; তাহাদের চেষ্টা চরিত্রকে নিয়মিত কর কিন্তু মনকে ছুটিতে দাও; জোর জবরদস্তি পূর্ব্বক তাহাদের দিক্ নির্দ্দেশ করিও না বা নিজের মত অভ্রান্ত বলিয়া চালাইও না।" যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে লড়ে, অথবা তাহা প্রচলিত বিদ্যালয়ের পাশে নিজে "নব বিদ্যালয়" সংস্থাপন করে, তাহারাও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীপ্সিত বিচার গুলিরই পুনঃ প্রচলন করে মাত্র। ভাবে মনে হয় যে, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা এক্ষণে উপলব্ধ এবং কোন প্রণালী বিশেষ সম্বন্ধে মতভেদ হইলেও, শিক্ষা কার্য্য কি ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

শিক্ষা বিজ্ঞানের স্থূল রেখাগুলি অঙ্কিত হইলেও, উহার অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্ম রেখাও যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ফরাসী শিক্ষা-পদ্ধতি এই সূক্ষ্ম কার্য্যের বিচারেই আপাততঃ নিযুক্ত। সুনিশ্চিত বস্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতি সকল গ্রহণ করিবার জন্য তাহার পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। একাল পর্য্যন্ত শিক্ষা শাস্ত্রের মূল সূত্র ছিল—হয় দার্শনিক অনুমান, নয় সাহিত্যিক উপন্যাস-নয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু আজিকার দিনে শিক্ষা সূত্রগুলি হয় মনোবিজ্ঞান কিম্বা সমাজ বিজ্ঞানের উপসিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ পায়।

কি নব প্রণালীর উদ্ভাবন, কি প্রাচীন প্রণালীর সমর্থন, উভয়তই গত বিশ বৎসর যাবত আমাদের শিক্ষাদাতাগণ মনোবিজ্ঞানের নিকটেই ব্যবস্থা লইতে উদ্যত। ফরাসী শিক্ষক-সম্প্রদায় প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন; ইহাতেই আশে পাশের অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে এমন কি যে বেল্‌জিয়ে সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের অতি নিকট সম্পর্ক সে সম্প্রদায় হইতেও তাঁহাদের পার্থক্য সূচিত হয়। অবশ্য ফরাসীরা শরীরতত্ত্বের তথ্য সমূহ অবহেলা করেন না। Thibot মনোযোগ সম্বন্ধে, স্মরণশক্তি সম্বন্ধে, অনুভূতি সম্বন্ধে, চরিত্র সম্বন্ধে, যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শিক্ষাশাস্ত্রের উপর তাহার প্রভাব অন্ততঃ ফরাসী-

দেশে কখনই অস্বীকৃত হইবে না। এমনকি উক্ত পণ্ডিতের সিদ্ধান্তগুলি যখন শিক্ষার কার্য্যক্ষমতা অত্যন্ত সংকীর্ণ (সীমাবদ্ধ) করিবার উপক্রম করে, তখনও তৎপ্রতি শিক্ষাদাতার বরং ঔৎসুক্যই লক্ষিত হয়। কারণ, কাজ করিতে হইলে, কোথায় থামা উচিত এবং কোথায় থামিতে পারা যায়, (অনাবশ্যক নহে) তাহাও জানা আবশ্যক। কিন্তু যদিও শরীরতত্ত্বের উপর তাহার নির্ভর (আস্থা) আছে, তথাপি ফরাসী শিক্ষাশাস্ত্র প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক। শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে, তাহার ভাষা, তাহার খেলাধূলা, তাহার কল্পনা, তাহার ইন্দ্রিয়বোধ বিষয়ক ফরাসী গ্রন্থ সকল সম্পূর্ণরূপে মনস্তাত্ত্বিক। Taine-এর কতকগুলি সংক্ষিপ্ত বচন হইতে আরম্ভ করিয়া ("বুদ্ধিবৃত্তি" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট) ফ্রান্সে এ সম্বন্ধে একটা সমৃদ্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এত সমৃদ্ধ যে বিষয়টা অশেষ হইলেও, মনে হয় যেন নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে আর এক জীবের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে; শিক্ষাদাতার পক্ষে সে জীব—অর্থাৎ কিশোর মানবশিশু—অপেক্ষা বরং বেশী ঔৎসুক্যজনক (চিত্তাকর্ষক)। শৈশবের পর্য্যবেক্ষকদিগের সহযোগী-রূপে সম্প্রতি কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষকের আবির্ভাব হইয়াছে। উহাদের মধ্যে Alfred Binet সর্ব্বাপেক্ষা ধীর ও সুদক্ষ। তাঁহার মহৎকাজ প্রতিদিনই তাঁহার অসংখ্য শিষ্যকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। Binet মনে করিতেন যে, পাঠশালাই (বিদ্যালয়ই) শিক্ষাসংক্রান্ত মনস্তত্ত্বের প্রকৃত পরীক্ষাগার। পাঠশালায় (বিদ্যালয়ে) শুধু (কেবলমাত্র) ইন্দ্রিয় বোধের তীক্ষ্ণতা নহে, পরন্তু স্মৃতির যাথার্থ্য, মনোযোগের স্থায়িত্ব, এমন কি বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য পর্য্যন্ত পরিমাপ করা যায়। তিনি মনে করিতেন, হয় ছাত্রদের ব্যক্তিগত পরিপ্রশ্ন (জিজ্ঞাসাবাদের) দ্বারা, অথবা সমষ্টীকৃত অনুসন্ধান দ্বারা প্রণালীবিশেষের সঠিক ফলাফল নিরূপণ (নির্দ্ধারণ) করা যাইতে পারে। Binet যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণের দ্বারা কি সেই সমস্ত ফললাভ হইয়াছে?—ইহা বলা বড়ই কঠিন।*

অন্যান্য পরীক্ষার তুলনায় এই পরীক্ষণে বিশেষভাবে নানাপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক; ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অসংখ্য; নিশ্চিততম ফলাফলেরও অর্থ নির্ণয় করা (সত্য) অতীব সূক্ষ্ম ব্যাপার। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে Binet এবং তাঁহার দলের কার্য্যকলাপের ফলে কতকগুলি প্রচলিত অথচ ক্ষতিকর পদ্ধতির সংস্কার সম্ভব হইয়াছে:—এবং দুই প্রকার কার্য্যকে ন্যায়ানুমোদিত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে:—(১) কতকগুলি চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি যাহা

---

* পূজনীয় পিতৃবাদেব এই পর্য্যন্ত লিখিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু লেখা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই অসুখই যে তাঁহার শেষ অসুখ, তাহা তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই। অন্তিমশয্যায় শুইয়াও আশ্চর্য্য সজ্ঞানভাবে আজীবনব্যাপী সাহিত্যসেবার শেষ নিদর্শন তাঁহার এই অসমাপ্ত "ফরাসীশিক্ষা-বিজ্ঞান" এর অনুবাদ সমাপ্ত করিবার ভার আমাকে দিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের শেষাংশ অনুবাদ ও প্রবন্ধটি সংশোধন ও প্রকাশ করিয়া তাঁহার শেষ অনুরোধ ভক্তিভরে সাধ্যমত রক্ষা করিলাম—শ্রীইন্দিরা দেবী।

উত্তম কিন্তু কেবলমাত্র নির্ব্বিকার অন্ধসংস্কারবশে অনুষ্ঠিত (২) কতকগুলি নবপ্রবর্ত্তিত সুপ্রণালী যাহার গতানুগতিক বাঁধা নিয়মের সহিত সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। তাহা ছাড়া অনেকানেক কর্ম্মীসঙ্ঘের সধৈর্য্য পরিশ্রমের দৌলতে ভিন্ন এরূপ কার্য্যপদ্ধতির পূর্ণ সুফল আদায় হইতে পারে না; এই প্রকার কর্ম্মীসঙ্ঘ ফ্রান্সের বহুতর ক্ষেত্রে গঠিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি-অনুপ্রাণিত অনুসন্ধানের ফলে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির অনেক অধ্যায়ে নবযৌবনের সঞ্চার আশা করা যায়। রোগীর মনস্তত্ত্বের সাহায্যে অন্যান্য অধ্যায় নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। আমাদের দেশে বিকৃতস্বভাব লোকের মনো-বিজ্ঞান-চর্চ্চার আদর খুব বেশী, সকলেই জানে। Valentin Haüy দ্বারা অন্ধদের জন্য সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং আর একজন ফরাসী, Abbé de L' Epeé মূক বধিরদের ইঙ্গিত দ্বারা শিক্ষা দানের অন্যতম প্রবর্ত্তক। সম্প্রতি অন্যরকম স্বভাবভ্রষ্টদের প্রতি মনোনিবেশ করা হইতেছে—যাহাদের স্নায়ুতন্ত্র অসুস্থ। যাহারা অল্পমাত্রায় রোগাক্রান্ত, তাহাদের জন্য ক্ষতিপূরণের শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ স্থাপিত হইয়াছে, ও তাহাদের সম্বন্ধে নিরীক্ষণ পরীক্ষণের ফলে নিশ্চয়ই শিক্ষাপদ্ধতির অনেক লাভ হইবে। ইতিপূর্ব্বেই উন্মাদ এবং অর্দ্ধোন্মাদের পরীক্ষা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ হইয়াছে। স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেবা করিতে করিতেই Charcot আবিষ্কার করিয়াছেন যে দর্শন, শ্রবণ ও চলন ঘটিত প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে মানুষকে ফেলা যায়; এবং এই আবিষ্কার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক মূল্য নিরূপণ করিবার (অনেক) কত না সাহায্য হইয়াছে। মনোভাবের গতিপ্রবণতা বা চিন্তা ও অঙ্গচালনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ফরাসী মনোবিজ্ঞানের দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত (প্রকাশিত) হয়। এই ধারণা কতকগুলি শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তনের হেতু। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অশুদ্ধ হস্তলিপি এবং কঠিন শ্রুতলিপি বানানের পক্ষে কত বিপজ্জনক, কারণ শিক্ষার্থী নিজের ভুল স্মরণ রাখিতে, সুতরাং সেই ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। নীতি শিক্ষাক্ষেত্রেও এই ধারণা সম্ভবতঃ বিপ্লব ঘটাইবে—কারণ নেতিবাচক অনুজ্ঞা বা উপদেশের (এই কাজ করিও না) যে কি বিপদ, তাহা সে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; এই-সকল উপদেশ যে কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে চায়, প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত করে; অপরপক্ষে ইহাও দেখাইয়া দেয় যে, ইতিবাচক ব্যবস্থা (এই কাজ কর) কত মূল্যবান এবং উৎসাহদান ও উত্তেজনা কত ফলদায়ক। ফলে ফরাসী মনোবিজ্ঞান অপ্রত্যাশিতরূপে আমাদের উদারপন্থা শিক্ষাপদ্ধতিরই সমর্থন করিয়াছে।

ফরাসী শিক্ষা-বিজ্ঞানের আদর্শ কি?—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে একটী মানবকে হয় বাহির হইতে নয় ভিতর হইতে গড়িয়া তোলা যায়; হয় পিটিয়া গড়া অথবা মানুষ করা যাইতে পারে। টুলো পণ্ডিতেরা প্রথম পক্ষই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পদ্ধতি প্রকৃতই মানসিক কসরতে পরিণত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আধুনিককাল (বর্ত্তমান যুগ) পর্য্যন্ত যিশু সম্প্রদায়ও এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পদ্ধতি যথার্থই শারীরিক, মানসিক ও

নৈতিক কসরৎ বিশেষ। টুলো পণ্ডিতী শিক্ষা পদ্ধতি অথবা যিশু সাম্প্রদায়িক শিক্ষা পদ্ধতি, কোনটিই বাস্তবিক ফরাসী জাতীয় ধারানুমোদিত (সংস্কার) নহে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথমোক্ত পদ্ধতি বর্জ্জিত হয় ; অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়োক্তটী বর্জ্জন করিবার চেষ্টা হয়। ফরাসী শিক্ষাপদ্ধতি, ইহা Rabelais ও Montaigue, Deseartes, Fénelon, Rousseau, Michelet ও Quinet, Durays ও Inles Ferryর পদ্ধতি, Port Royal এবং ফরাসী বিপ্লবের পদ্ধতি। ষোড়শ শতাব্দী অবধি তাহার রাজ্য (আশ্চর্য্যরূপ বিস্তারলাভ) বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং এমন সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—যাহা Rabelaisর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু উল্লিখিত লেখক মাত্রই একইভাবে অনুপ্রাণিত ; সকলই বাহিরের যন্ত্রব্য কসরৎ যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী ; বিদ্যাশিক্ষা যে প্রধানতঃ স্বাধীনতা ও সুবুদ্ধি পরিচালিত (প্রণোদিত) হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সকলেই একমত।

ফলতঃ ফ্রান্সে সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিবার সময় তাহার অনেক সিদ্ধান্ত যে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে ইহা অনিবার্য্য ; বিদ্যালয় সমাজের এমন একটী গুরুতর অনুষ্ঠান যে সামাজিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে বাধ্য ; এই পরিবর্ত্তনের নিয়ম অনুসন্ধান করা সমাজবিজ্ঞানের কাজ। পরন্তু সমাজতত্ত্বঘটিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থ, এমনকি প্রবন্ধও, এখনো দুর্লভ। যদিও সমাজ তাত্ত্বিকদের নিকট শিক্ষাবিজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা আশা করা যাইতে পারে, তবু আজ পর্য্যন্ত তাহা কেবল মাত্র মনোবিজ্ঞানের সহিতই জড়িত রহিয়াছে।

মনো-বিজ্ঞান অথবা সমাজ-বিজ্ঞান ইহার কোনটিই একা শিক্ষাবিজ্ঞানের উপাদান হইতে পারে না। শিক্ষা-পদ্ধতি শুধুই বিজ্ঞান নহে, সুনিয়মে প্রতিপন্ন কতকগুলি বিধিবদ্ধ সত্য মাত্র নহে ; তাহা একটী শিল্প কলা, একটী আদর্শ কার্য্যে পরিণতঃ করিবার উদ্দেশ্যে এই সত্যগুলির প্রয়োগ চেষ্টা। একবার শিক্ষকের গম্যস্থান স্থির হইলে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সেখানে পৌঁছিবার উত্তম দ্রুততম বা যোগ্যতম উপায় তাঁহাকে বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু আসল কথা এই, কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছিবার সাধনা করিতে হইবে ?—এ বিষয়ে যদিও মনো-বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান একেবারে নীরব নহে, কিন্তু কোন অভ্রান্ত উপদেশ বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের আদেশ তাহাদের নিকট পাওয়া যায় না। ইহার ফলে দাঁড়ায় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে শিক্ষার আদর্শ ভিন্ন হইতে পারে। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান অন্তর্জাতীয় বিজ্ঞান ; ফরাসী মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহার যদি কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য থাকে, তাহা হইলে বৈদেশিক মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক লব্ধ সিদ্ধান্ত সমূহের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারা সেরূপ নহে ; প্রত্যেক শিক্ষা পদ্ধতি যে জাতির অবলম্বন, সেই জাতির লক্ষণ দ্বারাই চিহ্নিত হয় ; বিদ্যা-শিক্ষার আদর্শ জাতীয় আদর্শের একটী রূপ মাত্র।*

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

---

* এই প্রবন্ধে কতকগুলি শব্দের পাশেই তাহারই অর্থবোধক শব্দ রহিয়াছে। বোধ হয় স্বর্গগত লেখক কোন্ শব্দটী অধিকতর উপযোগী হইবে তাহা প্রবন্ধ সংশোধনকালে বিচার করিয়া গ্রহণ করিবেন এই ইচ্ছায় এইরূপ করিয়াছিলেন। আমরা যথাযথভাবে মুদ্রিত করিলাম।—বং সং

খেয়ালী

মাঝে মাঝে এমন দু' একজন লোকের উদ্ভব হয় যে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, ইঁহারা বিধাতার নিকট হইতে একটা চাপরাস লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছেন এবং সেই জন্য পরিচিত প্রাণীগুলা ইঁহাদের জন্য সভয় সম্ভ্রম বহন করিতে বাধ্য হয়। রাজডাঙ্গার প্রাচীন জমিদার বংশের বর্ত্তমান কুলপ্রদীপ হরপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধেও এই কথাটা নিঃসংশয়ে প্রয়োগ করা যায়। তাঁহার বিপুল উন্নত দেহ, চির গম্ভীর মুখমণ্ডল এবং স্বভাবের স্থিরতার সঙ্গে ধন সংযোগেই হোক্, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক্, আমলা কর্ম্মচারী, প্রজা, পৌরজন, ভৃত্য, পরিচারিকা, গ্রামবাসীরা, এমনকি, পরিচিত লোক মাত্রই তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম করিয়া চলিত। তিনি কোন্ রাশিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেটা অনেকের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও লোকে বলাবলি করিত, তাঁহার সিংহ রাশি না হইয়া যায় না।

রাশিটা তাঁহার যাহাই হোক্ না কেন, অনেকে তাঁহাকে সর্ব্বদা ভয় করিয়া চলিলেও, তাঁহারও দু'একটা ভীতি স্থান থাকিতে পারে এবং ছিলও। সেই ভীতি স্থানটি ছিল তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী শৈলজা এবং সেই শৈলজার অভয় পতাকা তলে দাঁড়াইয়া আর একটি ক্ষুদ্র প্রাণী যে হরপ্রসাদের শাসন-ভয়, এমনকি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছিল, আজ তাহাকে লইয়াই দাম্পত্য কলহের আর একটা পর্ব্ব সুরু হইয়া গেল।

জমিদার ভবনের বৃহৎ ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া যে বাঁধান রাস্তাটি চওড়া লাল ফিতার মত সুরম্য বৈঠক খানার সিড়ির সহিত যুক্ত হইয়াছিল, তাহারই দুই ধারে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া ছিল ফুলের বাগান। বাগানে দেশী বিদেশী নানা রকম ফুল গাছের সহিত বর্ণ বৈচিত্র্যে ভরা অনেক পাতার গাছও ছিল। বাগানের বেষ্টনী ও দরজাগুলি রঙ্গিন ও সুদৃশ্য। বাগানখানির সৌষ্ঠব দেখিলেই তাহার উপর গৃহস্বামীর দরদের পরিমাণ বুঝা যাইত। এ হেন বাগানের উড়িয়া মালী আসিয়া যখন প্রভুকে সভয়ে নিবেদন করিল যে, তাহার অজ্ঞাতসারে খোকাবাবু বাগানে ঢুকিয়া কতকগুলা ডালপালা কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং এখন সেগুলি দিয়া অন্দরের উঠানের এক কোণে উদ্যান রচনা করিতেছেন, তখন তিনি নির্ব্বাক রোষে রুদ্রমূর্ত্তি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মালীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

অষ্টম বর্ষীয় খোকাবাবু তাহার সমবয়স্ক সঙ্গী রামুর সাহায্যে উদ্যান রচনায় এমন একাগ্রচিত্ত হইয়া গিয়াছিল যে, পিতার পদশব্দও তাহার কাণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পিতা ডাকিলেন, "অজিত!"

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সম্প্রতি সে পিতা-মাতার সহিত পুরী বেড়াইয়া আসিয়াছে। পিতার কণ্ঠস্বরে সমুদ্র গর্জ্জনের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াই হয় তো সে অত খানি চমকাইয়া উঠিল। অজিত ফিরিয়া দাঁড়াইতেই হরপ্রসাদ সজোরে তাহার একখানা কাণ ধরিয়া তেমনি কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল গাছগুলার ডাল কেন কেটেছিস পাজি? কি! এখনো চুপ ক'রে আছিস? কেন কাটলি শীগ্গির জবাব দে।"

এরূপ আকস্মিক আক্রমণের জন্য অজিত আদপে প্রস্তুত ছিল না। তাই একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আত্মস্থ হইল এবং পিতার হস্ত হইতে কাণ মুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় মাথাটা বিশেষ করিয়া ঝাঁকিয়া ক্রুদ্ধ দৃপ্ত ভঙ্গিতে পিতার পানে চাহিয়া বলিল, "আমার কি দোষ? মা আমাকে বাগান করতে বলেছে।"

"গাছগুলি কেটে কুটে তোমাকে বাগান করতে বলেছে! আচ্ছা, আমি দেখছি তাকে" বলিয়াই হরপ্রসাদ দ্রুতপদে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

শৈলজা দীর্ঘ মধ্যাহ্নটা নভেল পড়িয়া, ঘুমাইয়া শেষ করিয়া কিছু কাল পূর্ব্বে উঠিয়া শিশু কন্যা ধীরাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। স্বামীর উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার আরক্ত অধরের স্নেহমধুর হাসি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল।

হরপ্রসাদ রুষ্ট গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "অজিতকে বাগান করতে হুকুম দিয়েছ, সে বাগানের গাছগুলি কেটে উজাড় করে দিয়েছে। হুকুম করবার সময়ে তার সম্বন্ধে তোমার কোন হঁসই থাকেনা না কি? না, আমাকে বিরক্ত করে তোলা তোমার নিত্য কর্ম্মের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে?"

বিরক্তি ও বিস্ময়ের ভাবে ভ্রূভঙ্গি করিয়া শৈলজা বলিল, "কথার শ্রী দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়! আমি তাকে তোমার বাগানের গাছ কাটতে বলেছি নাকি? দুপুর বেলাটা ভয়ানক বিরক্ত করতে লাগল, তাই বল্লাম, যা, খেলা করগে'। তা সে জিজ্ঞেস করলে, 'মা, উঠানের এক পাশে বাগানে তৈরি করব'? বল্লাম, 'আচ্ছা, করগে'। তা সে যে বাগানের গাছ কেটে এনে বাগান করেছে; আমি তা জানব কি করে?"

"কি দিয়ে সে বাগানে করবে, সে কথাটা বলে দিলে কি মহাপাপ হতো? অমন দুরন্ত ছেলে এতক্ষণ কি করছে, সে খবরটা নেওয়াতো উচিত ছিল। সেদিন টেবিল থেকে ফুল আনতে বললে, আনতে গিয়ে অমন সুন্দর দামী ফুল দানীটা ভেঙ্গে ফেল্লে। অমন বেলোয়ারী ঝাড়টা ধরতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে। সে দিন আম বাগানে খেলতে অনুমতি দিয়েছ, নরেশদের বাগানে ঢুকে দু'টো গাছের সব আম পেড়ে নষ্ট ক'রে ফেলে দিয়েছে। কিছু প্রার্থনা করা মাত্র তা পূরণ করায় তার গোল্লায় যাওয়ার পথটাই পরিষ্কার করা হচ্ছে। মাষ্টার পড়াতে এলে এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই তাকে জলখাবার দিয়ে বিদায় ক'রে দাও। এ সব কি মায়ের উচিত কায?"

"মায়ের উচিত কায না হলেও সৎমায়ের উচিত হওয়া টা তো আশ্চর্য্য নয়।"

যে নিগূঢ় অব্যক্ত অভিমান বশে শৈলজা কথাটা বলিল, হরপ্রসাদ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহাকে খোঁচা দেওয়ার জন্যই কথাটা বলা হইয়াছে মনে করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, বলিলেন, "তা বটে। ওকে পেটে ধরনি বলেই অমন গোল্লায় দিতে পারছ, কিন্তু অমিয়কে তো কড়া শাসনে রেখেছ।"

বারুদস্তূপ অগ্নিস্পৃষ্ট হইল। ক্রোধঅধীরা শৈলজা মত্ত ঝড়ের মত প্রবলবেগে নামিয়া গিয়া দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া বিমূঢ় অজিতের পিঠে দুম্ দুম্ করিয়া কএকটা কিল বসাইয়া দিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "হতভাগা পাজি ছেলে, তোর জন্যে আমি জ্বলে পুড়ে মলাম। আমি এম্‌নি করেই এখন তোকে শাসন করব, সায়েস্তা করব।"

বলিতে বলিতে শৈলজা আবার তেমনি বেগে উপরে উঠিয়া নিজের শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কাণ ধরার দারুণ অপমানে ক্রোধান্ধ অজিত যখন নিজের অতি সাধের অর্দ্ধ রচিত উদ্যানের সদ্যপ্রোথিত ডালগুলি সজোরে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, কঞ্চির বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সিঁড়ির উপর গোঁজ হইয়া বসিয়া আশা করিতে ছিল যে, মা আসিয়া এখনই তাহাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া যাইবে এবং বাবাকে খুব বকিয়া দিবে, তখন সেই মা'র হাতেরই একান্ত অপ্রত্যাশিত অপরিচিত বিষম প্রহার! প্রহারটা অতর্কিত বজ্র পতনের মতই অজিতকে প্রথম কিছু সময় অসাড় নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়া মায়ের প্রহার সম্বন্ধে তাহাকে সম্পুর্ণ নিঃসংশয় করিয়া তুলিল তখন, সে সেই সিঁড়ির উপর লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চ চিৎকারে অত বড় বাড়ীটা ভরিয়া দিতে লাগিল।

শৈলজার যখন রাগ হইত, তখন সে গৃহের নির্জ্জীব পদার্থগুলির উপরই তাহার ঝাঁজ টা মিটাইয়া লইত। সজীবের মধ্যে অমিয় মায়ের রাগের কারণ ঘটাইয়া মাঝে মাঝে তাহার কটু ঝাঁজটাও উপভোগ করিত। কিন্তু অজিতের দুঃসহ অত্যাচারও শৈলজাকে কখনও এমন উত্তেজিত, এমন রোষবিহ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই। তাই আজিকার প্রহার পর্ব্বটা কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ঝি, চাকর সবাইকে বিস্ময়াহত করিয়া দিল।

হরপ্রসাদ ক্ষণকাল বোরুদ্যমান অজিতের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া জুতার শব্দে অঙ্গন যেন চকিত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর খাস পরিচারিকা তারা আসিয়া লুণ্ঠিত অজিতকে তুলিবার জন্য খানিক ব্যর্থ চেষ্টা করিল, কিন্তু তুলিতে পারিল না। কারণ অজিত হাত পা ছুঁড়িয়া এমনি কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল যে, কাহার সাধ্য তাহাকে তোলে? শৈলজার রুদ্ধদ্বার কক্ষেও অজিতের ক্রন্দন ধ্বনি বেশ স্পষ্টরূপেই পৌঁছিতে লাগিল। কিছুকাল শুনিয়া শুনিয়া শৈলজা তড়াক করিয়া উঠিয়া ঝনাৎ করিয়া কবাট খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর অত্যন্ত

ঝাঁজের সহিত উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "এ বাড়ীতে কি এমন কেউ নেই যে, ছেলেটার কান্না থামাতে পারে? বিকট চীৎকারে যে তিষ্টান যায় না।"

গৃহিণীর কণ্ঠ শুনিয়া জমিদার-গৃহে আশ্রয়প্রাপ্তা অনেক আত্মীয়াই ছুটিয়া যাইয়া অজিতকে উপরে তুলিয়া আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের মিলিত চেষ্টা এবার আর অজিত ব্যর্থ করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজিত ক্লান্ত হইয়া এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পরে শৈলজা যেন না জিজ্ঞাসা না করিলে নয়, এমনি বিরক্তিপূর্ণস্বরে পার্শ্ববর্ত্তিনী যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দস্যি ছেলেটার খাওয়া হয়েছে?"

যামিনী বলিল, "না, সে তো ঘুমিয়েই আছে।"

শৈলজা মুহূর্ত্তে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "আমি না বললে কি তোমরা একটা কাযও করতে পারনা? বাড়ীভরা এতগুলা লোক রয়েছে, সব যেন মাটীর পুতুল।"

যামিনী শৈলজার দূর সম্পর্কীয়া ননদ এবং তাহার স্বামী ভবতোষ সেরেস্তারই একজন কর্ম্মচারী। সস্ত্রীক ভবতোষ জমিদার ভবনের স্থায়ী বাসিন্দা। যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "অজিতের ঘুম ভেঙ্গে খাওয়াব নাকি?"

"যা খুসী করগে, আমি তার কি জানি" বলিয়াই শৈলজা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কর্ত্রীর আজিকার রুষ্ট অসন্তুষ্ট ভাবটা কি করিলে যে দূর করা যাইতে পারে, তাহা কেহই ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে গজ্ গজ্ করিতেছিল এবং আড়ালে সরিয়া গিয়া কেহ কেহ বলিতেছিল, "ঐ যে বলে, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খড়ের প্রাণ যায়,' আমাদের হয়েছে ঠিক তাই।"

যামিনী মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও শান্তভাবেই যাইয়া অজিতের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন তাহার নিজের চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিল, তখন আরও দু' তিনজনকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু অতটুকু ছেলের জেদ ভাঙ্গিয়া কেহই তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না। ছেলের জেদ শুধু শৈলজাই ভাঙ্গিতে পারিত। তাহা সে জানিয়া শুনিয়াও যে নিজে না আসিয়া যামিনীদের জ্বালাইতেছে, ইহাতে ধনের গৌরব ছাড়া আর কি বলা যায়,—ক্ষেতুর মা ও অন্যতমা ঝি আদুরীর সঙ্গে যামিনী অনুচ্চকণ্ঠে এই আলোচনাই করিতেছিল। কিন্তু বেশী সময় আলোচনা করিলে তো চলিবে না; খাওয়াইতে না পারার খবরটা কর্ত্রীকে তো জানাইতে হইবে, নহিলে আবার কি অনর্থপাত হইবে, কে জানে? ক্ষেতুর মা সম্পর্কে শৈলজার দিদিশাশুড়ী। যামিনী তাঁহাকে বলিল, "ঠান্‌দিদি, তুমি যেয়ে গিন্নীকে বলে এস। আমি আর মুখনাড়া খেতে পারব না।"

"যার ভাত খেতে হয়, তার মুখনাড়াটাও হজম করতে হয়।"—বলিয়া একটুখানি হাসিয়া

ক্ষেতুর মা শৈলজার কক্ষদ্বারে যাইয়া বলিলেন, "ওগো দিদিমণি, অজিতকে আমরা কেউ খাওয়াতে পারলাম না। এমন জেদী ছেলে আর দেখিনি বাবু।"

কক্ষমধ্যে একটা কৌচে অর্দ্ধশায়িত হইয়া হরপ্রসাদ আলবোলার নল মুখে পূরিয়া সুরভিত তাম্রকূটের ধুঁয়ায় কক্ষ পূর্ণ করিতেছিলেন এবং শৈলজা খাটের উপর পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া ছিল।

ক্ষেতুর মা প্রতীক্ষা করিয়াও কোন জবাব না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একবার আসবে নাকি?"

শৈলজা উত্তপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি পারব না। খায় খাক্, না খায় না খাক্, আমার বয়ে গেছে।"

যথাসময়ে হরপ্রসাদ আহার করিয়া আসিলেন, শৈলজা তখনও উঠিল না। তারা হাসিয়া বলিল, "মা, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেতে আসুন।" তখনও সে কোন জবাব দিল না। মৃদু হাসিয়া হরপ্রসাদ বলিলেন, "তারা, তুমি যাও। অজিত খায়নি, উনি কি আর খাবেন?"

স্বামীর কথা শুনিয়া শৈলজা উঠিয়া বসিল। তারার আহ্বান যেন শুনিতে পায় নাই, এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লি তারা?"

তারা বলিল, "আপনার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাই বল্‌লাম মা।"

শৈলজা চলিতে চলিতে স্বগতঃই বলিল, "আমি কারু জন্যে উপোস ক'রে থাকতে পারব না।"

কিন্তু সে খাইতে বসিয়া দু' একগ্রাস মুখে দিয়াই উঠিয়া বলিল, বামুন ঠাকুরকে বক্‌সিস্ দিতে হবে। এমনি আজ রেঁধেছে, মুখে করবে কার সাধ্যি!"

(২)

হরপ্রসাদ রাত্রে দু' তিনবার জাগিতেন। আজও তিনি দু' তিনবার জাগ্রত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পার্শ্বে শায়িতা নিদ্রিতা নহে। তবে তাহার নিদ্রার ভাণটি পরিপাটী। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "যথেষ্ট সাজা হয়েছে আমার! এখন——"

শৈলজা বাধা দিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে দিলাম সাজা! সাজাটা কি জন্যে—কি রকম শুনি?"

পুত্রটি প্রহৃত হইয়া অনশনে অজ্ঞানের মত ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে, প্রহার করিয়া প্রহৃতের অধিক বেদনায় স্ত্রীটি সমস্ত রাত্রি অনাহার অনিদ্রায় কাটাইয়া দিয়াছে, স্বামীর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে এই স্বীকারোক্তিটাই হয়তো শৈলজা আশা করিতেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদ গম্ভীরমুখে বলিলেন, "ভুলে কথাটা বলে ফেলেছি, সাজাটা নিজেই ভোগ করেছ বটে। যথেষ্ট হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি স্নানাহ্নিক সেরে কিছু খেয়ে সুস্থ হও গে।" নিতান্ত কর্ত্তব্যের দায়েই যেন কথাটা শেষ করিয়া হরপ্রসাদ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলজা ইহাতে বিস্মিতও হইল না, আহতও হইল না; খাটের আলিসায় হেলান দিয়া নিজের বিবাহিত জীবনের কথা ভাবিতে লাগিল।

সে দরিদ্রের ঘরেই জন্মিয়াছিল। কৈশোরে যখন একে একে তাহার সঙ্গিনীদের বিবাহ হইয়া যাইতে লাগিল এবং যখন সেই নব বিবাহিতাদিগের হাসিতে, গল্পে, চলনে সে একটা নিবিড় পুলকের স্নিগ্ধ রূপের আভাস পাইত, তখন সে তাহার পিতৃগৃহের মত কোন অনাড়ম্বর দরিদ্র গৃহের গৃহিণী পদেরই আশা করিত। তাহার কৈশোরের কল্পনাপ্রবণ মন সেই অপ্রাপ্ত গৃহটিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কত কি গড়িত, কত কি ভাঙ্গিত। কিন্তু কল্পনারাজ্যে হর প্রসাদের দাসদাসীপূর্ণ সুসজ্জিত সৌধের ছায়াও তো পড়িতে পায় নাই। বিধাতা যে তখন অন্তরালে বসিয়া তাহার অ-দৃষ্ট ললাট-ফলকে এই হর্ম্ম্যের অধিকার, এতগুলা আশ্রিত পরিজন এবং দাস দাসীর উপর অখণ্ড কর্ত্তৃত্বের কথা লিখিতেছিলেন, তাহা তো কেহ জানিতেও পারে নাই।

শৈলজার দুই অগ্রজার বিবাহের জন্য তাহার পিতা ঋণে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। যখন রাজডাঙ্গার জমিদারের ঘটক হরপ্রসাদের সহিত শৈলজার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া শৈলজার পিতার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শৈলজার পিতা একটুখানি ইতস্ততঃ করিলে ঘটক মহাশয় সবিস্ময় হাসির সহিত বলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি 'কিন্তু' হচ্ছেন কেন, আমাদের বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি বন্ধ্যা। আপনি আমাদের বৌমার কথা শোনেন নি কি? তাঁর কাছে আপনার মেয়ে পরম আদরে যত্নে থাকবেন। তিনি আর গিন্নিমাই তো বাবুর আবার বিয়ে দিচ্ছেন। বাবুর সঙ্গে সঙ্গে অত বড় জমিদার বংশ লোপ পাবে, এওকি হতে পারে? শুধু বংশ রক্ষার জন্যে বিয়ে। আপনার মেয়েটি সুলক্ষণা, তাই। নইলে রাজডাঙ্গার বাবুদের ঘরের জন্যে মেয়ে চাইলে মেয়ের বাপেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়বে।" এই বলিয়া তিনি হা হা করিয়া আর এক চোট হাসিয়া লইয়াছিলেন। শৈলজার পিতা জমিদার ভবনের বিপুলত্ব, আড়ম্বর এবং সজ্জা দেখিয়া আসিয়া আর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। স্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈলজাই যখন ভবিষৎ বংশধরের জননী এবং দ্বিতীয়া পত্নী হইয়া যাইতেছে, তখন কোন দিকেই অসুবিধা বা লোকসানের সম্ভাবনা নাই। তবে হরপ্রসাদ তরুণ যুবাপুরুষ নন্, অমন বড় লোকের তাতে কি আসে যায়? তিনি যদি নব্যযুবকই হইতেন, তবে তাঁহার মত অখ্যাত দরিদ্রের কুটীর হইতে শৈলজাকে কুড়াইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেন না। বিবাহের পাকা কথা হওয়ার পর বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত শৈলজা পিতাকে যেরূপ গর্ব্বিত প্রসন্নতায় বিহ্বল দেখিয়াছিল, তাহাতে সে অনুমান করিয়াছিল, সেই ক'দিন তিনি নিদ্রায় ও জাগরণে শুধু জমিদার গৃহের এবং জমিদারের ভাবী শ্বশুর পদের সুখ ও সম্মানের স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শৈলজার বিবাহ হইয়া গেল এবং তাহার পিতাও সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হইলেন। বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো পিতার সমস্ত কল্পনা নিছক কল্পনা হইয়াই রহিল। কেননা

তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ধনে এবং মর্য্যাদায় সমকক্ষ না হইয়া শুধু কুটুম্ব হইলেই ধনীগৃহে যাতায়াতের পথ তেমন সুগম হয়না এবং সে গৃহের দ্বার সাদর আহ্বানের জন্য সর্ব্বদা অবারিতও থাকেনা। এই জন্য পিতা যে কতখানি ক্ষুব্ধ ও পরিতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে জানিবার সুবিধা শৈলজার হয় নাই। কারণ বিবাহের পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে মাত্র দুইবার দু'চার দিনের জন্য পিতৃগৃহে যাইতে পাইয়াছিল। রাজডাঙ্গার জমিদার বধূর দরিদ্র পিতার গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত করিবার নিয়ম ছিলনা।

গৃহস্থের মুক্ত অঙ্গনের পাখীটি ধনীর গৃহে আসিয়াই সোণার খাঁচায় বদ্ধ হইয়া কতখানি সুখী হইয়াছিল, আজ দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু শৈলজা অভ্যস্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যের সম্ভ্রম ও ভোগটাকে নূতন করিয়া অভ্যাস করিতে যাইয়া অনেকখানি যে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্বামি-গৃহের আদবকায়দা শিখিতেও তাহার কিছু সময় লাগিয়াছিল। তাহার জন্ম-পল্লীর বাল্যসঙ্গিনীরা যখন গোপন ঈর্ষা-কুঞ্চিত ললাটে অতিশয় বিস্ময়ের সহিত তাহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এবং রাণীর মত সম্মান-গৌরবের আলোচনা করিত, তাহার মনটা তখন হয়তো তাহাদেরই সঙ্গে মিশিয়া পূর্ব্বের মত ঘাটে, বাগানে, অঙ্গনে, গল্পগুজবে, হাস্যপরিহাসে মসগুল হইবার জন্য রুদ্ধ আবেগে গুমরিয়া উঠিত। স্বামিগৃহে শৈলজার যত্ন, সেবা এবং আদেশ প্রতিপালন করিবার বহু লোকই মিলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা বুঝিতে বা জানিতে চেষ্টা করিল না যে, শৈলজার বহিঃরাজ্যের মত অন্তর রাজ্যটাও সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দস্তুর মত সেখানকার খোরাক যোগাইতে হয়, নহিলে শুধু বাহিরের জলুসের রস—তা যতখানিই হোক্‌না কেন—সর্ব্বদা সেখানে পৌঁছিয়া সেস্থানটা সর্ব্বদা রসার্দ্র করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়না। তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ী তাহার সপত্নী অন্নপূর্ণার প্রতি অতিশয় স্নেহপরায়ণা হইলেও তাহাকে অযত্নে বা অস্নেহে গ্রহণ করিলেন না। তাহার বসন-ভূষণ এবং সেবা-যত্নের যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। মায়ের হৃদয়-উৎস ধারার মত তাঁহার হৃদয় হইতে শৈলজার জন্য তেমন কিছু ঝরিয়া না পড়িলেও তিনি শৈলজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সে আকর্ষণের কারণ হইয়াছিল প্রায় চিররুগ্না সন্তানহীনা বধূর প্রতি সমবেদনাসিক্ত যথার্থ স্নেহ। সপত্নীর প্রতি শাশুড়ীর গভীর স্নেহ, কি জানি কেন, শৈলজার ঈর্ষা সঞ্চারের পরিবর্ত্তে ভক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্বশুর ঘরে আসিয়া অন্নপূর্ণা বড় একটা সুস্থ দেহে থাকেন নাই। নিজের কক্ষগুলি ছাড়িয়া তিনি প্রায় বাহিরে আসিতেন না। মাঝে মাঝে তিনি শৈলজাকে তাঁহার কক্ষে ডাকাইয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার নম্র কোমল হৃদয়ের পরিচয় তাঁহার কথা বার্ত্তার মধ্যে পাওয়া যাইত। তিনিও ছিলেন বড় ধনীর কন্যা। পিতৃদত্ত অর্থ এবং স্বামিদত্ত অর্থ তিনি অভাবগ্রস্তকে মুক্ত হস্তে বিলাইয়া দিতে পারিতেন। কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে তাঁহার চক্ষু দুটি করুণার উৎসের মতই সুন্দর

হইয়া উঠিত। তিনি উচ্চতার শিখর হইতে দানই করিতে জানিতেন; নত হইয়া খুঁজিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু লইতে পারিতেন না। তাঁহার সঙ্গে কাহারও হৃদয়-বিনিময় চলিত কিনা, শৈলজা তাহা জানিত না, কিন্তু তাহার সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্যও চলিত না। তিনি সতীন না হইয়া সোদরা হইলেও না। বুঝি তাঁহার বিধাতৃদত্ত প্রকৃতিই ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইত। শৈলজা যেমন কোন দিন তাঁহাতে বিদ্বেষের গন্ধও পায় নাই, তেমন তাঁহার হৃদয় দ্বারও কখন অনর্গল দেখে নাই।

তারপর স্বামী! যাঁহার কাছে নারীর হৃদয় সর্ব্বদা মুক্ত থাকিবার কথা—যাঁহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহের কাছে সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা দাঁড়াইতে পারে না, যাঁহাকে সুখের অংশ হইতে বঞ্চিত রাখিলে সুখকে সুখ বলিয়াই মনে হয় না, যাঁহাকে নিবেদন করিয়া দুঃখের গুরুভারও হাসিমুখে বহন করা যায়, পত্নী-জীবনে যিনি একাধারে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়, শৈলজার ভাগ্যদেবতা সেই স্বামীকে কিভাবে তাহার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন? যৌবনের সর্ব্ব শেষ সোপানে পদার্পণ করিয়াই হরপ্রসাদ শৈলজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শৈলজা তখন কিশোরী। কুমারী শৈলজার মন স্বামীর যে মূর্ত্তি কল্পনায় গড়িয়া রাখিয়াছিল, হরপ্রসাদের সঙ্গে যে তাহার অনেকখানি অমিল হইবে, তাহা শৈলজা জানিত এবং সেজন্য সে একটি দিনও দুঃখ অনুভব করে নাই। কিন্তু তিনি স্বামী, শুধু বয়সের খানিকটা পার্থক্যের জন্যই কি তিনি স্ত্রীর নিকট হৃদয় রুদ্ধ করিয়া রাখিবেন? শৈলজা দরিদ্রকন্যা বলিয়াই কি সেখানে তাহার প্রবেশ নিষেধ? শুধু সম্মান, শুধু ভোগের উপকরণ লইয়াই কি সে চিরকাল দ্বারপ্রান্তে—বাহিরে পড়িয়া থাকিবে? স্বামীর অটুট গাম্ভীর্য্য হিমাদ্রি শিখরের মতই যেন শৈলজার অনতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছিল। তা হোক্, স্বামীর কাছে সে একটি দিনও ইহার জন্য নালিস করে নাই, করিবেও না।

শৈলজার বিবাহের একটি বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই যে দিন অন্নপূর্ণা অজিতকে প্রসব করিয়া আত্মীয়, আশ্রিত সকলকে আনন্দে অভিভূত করিয়াছিলেন, তখনকার কয়েক দিনের উৎসবের মাতামাতির মধ্যে কেহ বড় একটা শৈলজার খোঁজ লইল না। এই শিথিলতার জন্যই হোক্, বা অন্য যে কারণেই হোক্ শৈলজা সেই উৎসব-আনন্দে অন্তরে, বাহিরে কোথাও যোগ দিতে পারিল না।

অজিতের জন্মের কয়েক দিন পরে একদিন অন্নপূর্ণা শৈলজাকে ডাকিয়া গোলাপকলির মত শিশু অজিতকে তাহার কোলে তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিলে, "শৈল, তোমারি ভাগ্যে ও এসেছে, ও তোমারি।" অচিন্ত্য প্রাপ্তির অপরসীম আনন্দ, অভাবনীয় মাতৃত্বের গৌরব সে দিন যেন সহসা অন্নপূর্ণাকে দ্রবীভূত করিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। শৈলজার মনে হইল, অজিতকে তাহার কোলে তুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন অজিতের জন্য তাহার কাছে অনেকখানি চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু তবু সে প্রসন্নচিত্তে শিশুকে গ্রহণ করিতে পারিল না। ছ'মাসের শিশুছেলেকে রাখিয়া অন্নপূর্ণা অত্যন্ত অনিচ্ছায় মায়ের অভিনব

সুখ ও সৌন্দর্য্য ইহলোকে ফেলিয়া রাখিয়া পরলোকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মৃত্যু-অশৌচ যাইতে না যাইতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীও স্বর্গারোহণ করিলেন। দাসী সুলোচনার কাছে অথবা কোন কুটুম্বিনীর কাছে আর অজিতকে ফেলিয়া রাখা চলে না, লোকনিন্দার ভয়তো আছে। সুতরাং শৈলজাকে একরকম বাধ্য হইয়াই অজিতের তত্ত্বাবধানের ভার নিতান্ত বিরক্তিকর গুরুভারের মতই গ্রহণ করিতে হইল।

শৈলজাকে রাত্রেও অজিতকে লইয়া শুইতে হইত, দিনেও খানিকটা সময় অজিতকে লইয়া থাকিতে হইত; হয়তো এই কারণেই ছেলেটা ধীরে ধীরে শৈলজাকেই নিজের মা বলিয়া চিনিয়া লইল। তাহাকে দেখিলেই দুষ্ট ছেলেটা ছোট্ট কচি বাহু দুটি বাড়াইয়া দিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইত। শৈলজা যদি বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত, তবে সে কাঁদিয়া খুন হইত। অজিত 'মা' বলিতেই আগে শিখিল। তাহার জড়িত মিষ্ট গলার 'মা' ডাকটাই হয়তো শৈলজার বিমুখচিত্ততলে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া ফেলিল। অন্নপূর্ণা জীবিতা থাকিতে অজিত পিতার বক্ষলগ্ন হইয়া অনেক সময়ে থাকিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হরপ্রসাদ পুত্রের নিকট হইতে দূরে বহু দূরে সরিয়া গেলেন। শৈলজার সংস্পৃষ্ট হইল বলিয়াই তিনি পুত্রের সঙ্গ একরকম ত্যাগ করিলেন। কিন্তু শৈলজা তাহার কি করিবে? ছেলেটাকে দূর করিয়া দিলেও যে সে আবার ছুটিয়া আসে। তাহাকে কিছুতেই দূর করা গেল না।

ক্রমে ক্রমে অজিত সম্বন্ধে শৈলজার সবই যেন ওলটপালট হইয়া গেল। অজিতের নামকরণের সময়ে স্বামীর মনোনীত 'শিবপ্রসাদ' নাম বাতিল করিয়া দিয়া সে-ই অজিত নাম রাখিল এবং বাড়ীর সকলের উপর হুকুম জারি করিল, খোকাকে 'খোকন', 'সোণা', 'মাণিক' বেশী না ডাকিয়া 'অজিত' ডাকিতে হইবে। কর্ত্রীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। হরপ্রসাদও কিছুদিন পরে ছেলেকে অজিত বলিয়াই ডাকিতে লাগিলেন। দিন দিনই অজিতকে লইয়া শৈলজা বিব্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। হরপ্রসাদের বিশ্বাস, শৈলজার শিক্ষার দোষেই ছেলে এমন দুরন্ত, অদমনীয়, অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। তেমন বিশ্বাসই যদি তাঁহার না হইবে, তবে অজিত কিছু করিলেই তিনি শৈলজাকে দশকথা শুনাইয়া যান কেন? এখন শৈলজাও দুইটি সন্তানের প্রসূতি। সতীনের ছেলে লইয়া সে এতখানি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িতে যাইবে কেন? এত করিয়াও শুধু দুর্নামের ভাগী হওয়া ছাড়া আরতো কোন লাভ নাই। যাঁর ছেলে, তাঁর উপরেই ছেলের সব ভার থাক্, শৈলজা আর পরের ছেলের ভার বহিয়া নানাদিকে আপনাকে এমন অশান্ত, এমন বিব্রত করিয়া রাখিতে পারিবে না।

৩

পশ্চাৎ হইতে দুইটি কোমল বাহু শৈলজার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিলে সে ফিরিয়া দেখিল, অমিয়। অমিয় উচ্চ হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "তুমি কাকে ভেবেছিলে? নিশ্চয় দাদাকে। নয় না?"

শৈলজা নিশ্বাস চাপিয়া বলিল, "তাকে ভাবতে যাব কেন? তুই কিছু খেয়েছিস?"

অমিয় বলিল, "না খাব কি করে? দাদা যে এখনো উঠে নি।"

"তা তুই একলা খেতে পারলি নে?"

অমিয় মায়ের কথার জবাব না দিয়া বলিল, "তুমি দাদাকে কাল বড্ড মেরেছ। তার গায় কি বেদনা হয়েছে? তাই বুঝি যে ওঠতে পারে নি?"

অমিয় ছয় বছরের শিশু, তাহা না হইলে সে বুঝিতে পারিত যে, তাহার কথাটা প্রচণ্ড আঘাতের মত শৈলজাকে আহত করিল। সে কোলের নিকট হইতে অমিয়কে সরাইয়া রাখিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সুলোচনা যখন অজিতকে নানা মিষ্ট কথায়, নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহার দুর্জ্জয় অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন শৈলজা যাইয়া কক্ষ দ্বারে দাঁড়াইতেই সে নিষ্কৃতি পাইয়া চলিয়া গেল। অজিত মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিল, শৈলজার মৃদু পদশব্দ সে শুনিতে পাইল না। শৈলজা ক্ষণকাল অজিতের পানে চাহিয়া থাকিয়া খাটের অতি নিকটে যাইয়া নত হইয়া অজিতের পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, "অজিত, বাবা আমার!"

শৈলজার আহ্বান অজিতকে অধিকতর রুষ্ট করিয়া তুলিল। সে ক্রোধভরে শৈলজার হাতখানা পিঠ হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টি তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহার অগ্নিবর্ষী আয়ত চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিল। মায়ের দুই চক্ষুর দুই ধারা পুত্রকে তাহার কণ্ঠলগ্ন করিয়া দিল। অজিত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, মা, তুমি কাঁদছ কেন? কেন কাঁদছ মা?"

শৈলজার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কোন শব্দ বাহির হইতে পাইল না। সে নিঃশব্দে অজিতকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

অজিত অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, "কি হয়েছে মা, কেন কাঁদছ মা?"

খানিক কাঁদিয়া, শৈলজা কিছু স্থির হইয়া অজিতের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মাণিক, বাবা, পিঠে কি তোমার ব্যথা হয়েছে?" অজিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ব্যথা হবে কেন মা?"

যে আঘাতের অভূতপূর্ব্ব দারুণ ব্যথায় সে সমস্ত রাত্রি ছট্ ফট্ করিয়াছে, সে আঘাতের উল্লেখ করিতে যাইয়া তাহার গলা বুজিয়া আসিল। কিছুকাল পরে সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কাল যে আমি তোকে মেরেছিলাম, বাবা!"

শৈলজার অশ্রু এবং স্পর্শ যে কথাটা অজিতকে এতক্ষণ ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, শৈলজার কথায়ই আবার তাহা তাজা হইয়া উঠিল। অজিত বিদ্যুদ্বেগে দূরে সরিয়া বসিয়া মুখ ফিরাইয়া ভারি গলায় বলিল, "ব্যথা হয়না বুঝি! সারা রাত আমার পিঠ ব্যথা করেছে।"

পিঠ ব্যথা করুক, আর নাই করুক, আর একটা যায়গা যে খুবই ব্যথা করিয়াছে, শৈলজা তাহাতে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহার দশগুণ ব্যথা যে আঘাতকারিণী ভোগ করিতেছে, সে কথা এইশিশু কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। সে কথা সে কাহাকেও বুঝাইতেও চায় না। কিন্তু এই অবোধ কচি ছেলেটা যে মার খাইয়াছে, সে কথাতো হরপ্রসাদের বুঝা উচিত ছিল। শৈলজাই যেন গরিবের কুঁড়ে হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে ; কিন্তু অজিত তো আর তাহা নয়। সে দেহের অংশ, হৃদয়ের অংশ দিয়া গঠিত। সেই তাহাকেই কড়া শাসন করিবার জন্ম যিনি শৈলজার ক্রোধ এমন উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি যে কেমন, শৈলজা তাহা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেল। অজিত—মা-হারা অজিত! কত সাধনার ধন! কত তপস্যার ফল! অজিতের পিঠের কিল গুলি ঠিক তীরের মত শৈলজার বুকে বিঁধিয়াছিল।

শব্দ পাইয়া চমকিত শৈলজা নত দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, অজিত খাট হইতে নামিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কোথা যাচ্ছিস অজু?"

অজিত কোন কথা না বলিয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়া বারান্দায় নামিয়া পড়িল। শৈলজা ছুটিয়া গিয়া দুই ব্যগ্র বাহু বন্ধনে অজিতকে বদ্ধ করিয়া ফেলিল, বলিল, "কিচ্ছু খাসনি রাত্তিরে, মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। না খেয়ে কোথা যাচ্ছিস আবার?"

অজিত বাহু মুক্ত হইবার জন্ম চেষ্টা করিতে করিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "না, আমি খাবনা।"

শৈলজা ছেলের মুখ চুম্বন করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "পাগল ছেলে! তুই না খেলে আমিও তো খাব না। না খেতে খেতে মরে যাব, তখন মজা টের পাবি। মা কোথায় পাবি? রাখালের মা নেই, জানিসনে কত কাঁদে?" কথাটা বলিতে বলিতেই শৈলজা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সত্যই যদি সে মরিয়া যায়, তবে তাহার মা-হারা অসহায় শিশু তিনটির কি অবস্থা হইবে? হরপ্রসাদ যে ইহাদের পানে ফিরিয়া চাহিবেন, তাহার তো কোন সম্ভাবনাই নাই।

খেলার সঙ্গী রাখালের অবস্থাটা মনে পড়ায় অজিতের রাগ অনেকখানি নিস্তেজ হইয়া আসিল। সে ঈষৎ ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি মা, না খেলেই কি মরে যায়? রাখালের মা উপোস করেই মরে গেল নাকি?"

শৈলজা অজিতের বিশৃঙ্খল চুলগুলা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিতে দিতে বলিল, "যায় বৈ কি। না খেলে অসুখ করে, ক্রমে ক্রমে অসুখ বেড়ে যায় ; তারপর মরে যায় আর কি।"

"মরে গেলে আর কারুর সঙ্গে দেখা করা যায় না? বাড়ী আসা যায় না? মানুষ ভূত হয়ে থাকে?"

"ভূত হয়ে না থাকলেও বাড়ী আসা যায় না, কারুর সঙ্গে কথা বলা যায় না, কাউকে দেখতে পায় না।"

"তা হলে আমি মরব না মা, আমার বড্ড ভয় করে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতেই পারব না। কালই যে সুলোচনার কাছে আমি ভাল ক'রে ঘুমোতে পারিনি!"

"বালাই! ষাট্! তুই আমাকে ছেড়ে থাক্‌বি কেন?"

"তা হলে তুমি কক্‌খনো মরবে না?"

"তোরা বড় সড় হলে, তখন আমি মরে যাব।"

"না মা, তুমি বুড়ো হলেও মরতে পাবে না। যদি মর, আমিও মরে তোমার কাছে চলে যাব।"

শৈলজা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, যম এলে তুই তার হাত থেকে তোর মাকে ছিনিয়ে রাখিস।"

"যম বড্ড খারাপ, নয় মা? সে কেন মরে যায় না?"

"তিনি হলেন মৃত্যুর দেবতা, তিনি মরবেন কিরে? তুই এখন খাবি, চল। অমিয়ও তোর জন্যে বসে আছে, সে এখনো খায়নি। এই যে অমিয় এসেছে। দুই ভাইকে একসঙ্গে খাইতে হইবে, এই ছিল মায়ের হুকুম। মায়ের হুকুম অমান্য করিবার শক্তি ও সাহস অমিয়র খুব বেশী ছিল না। দাদাকে ফেলিয়াও তাহার খাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। না খাইতে পারার এই দুইটা কারণের মধ্যে কোন্‌টা মুখ্য, আর কোনটা গৌণ, তা অমিয় এতক্ষণ স্থির করিতে না পারিলেও দাদার ভাগ্যে মায়ের সোহাগ এবং তাহার ভাগ্যে অনাহার দেখিয়া সে রুষ্ট অভিমানে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন শৈলজার কাছে আসে নাই, ভাবটা এমনি। শৈলজা হাসিয়া অমিয়কে কাছে টানিয়া বলিল, "আর রাগ করতে হবে না। চল, এখন দুভাইকেই খেতে দেব।"

এই বলিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "তারা।"

তারা আসিয়া কর্ত্রীর আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইল। শৈলজা ছেলেদের খাবার আনিতে বলায় সে অবিলম্বে খাবার আনিয়া দিল। অজিত ও অমিয় খাইতে বসিল। অজিত এক টুক্‌রা লুচি ও একটুখানি মোহন ভোগ মুখে দিয়া উঠিবার উপক্রম করিলে শৈলজা বলিল, "ওকি, এখনি উঠ্‌ছিস কেন?"

অজিত মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এ আমি খাবনা, ভাল লাগছেনা।"

শৈলজা জানিত, খাওয়া, নাওয়া, শোওয়া বা চলাফেরা সম্বন্ধে অজিতের খেয়ালের অন্ত নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি খাবি?"

অজিত বলিল, "মাছভাজা আর মাছের টক দিয়ে ভাত খাব। ঠাকুর কিচ্ছু ভাল রাঁধে না, তোমাকে রাঁধতে হবে।" বলিয়াই অজিত হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামী ও ছেলেদের জন্য মাঝে মাঝে শৈলজাকে কিছু কিছু রান্না করিতে হইত। তেতলার একটা ঘরে তাহার রন্ধনের সকল সরঞ্জাম থাকিত। শৈলজা একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া রান্নার আয়োজন করিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিতে চলিয়া গেল।

যখন ভিজা চুলগুলি পিঠে ছড়াইয়া দিয়া শৈলজা ভাতের হাঁড়ি নামাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন অজিত ছুটিয়া তাহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "ভাত হয়নি এখনো! ক্ষিধেয় পেট জ্বলে গেল।" "এই যে হয়েছে" বলিয়া শৈলজা ত্রস্ত হস্তে ভাত নামাইয়া মাছ ভাজিবার জন্য কড়া চাপাইয়া দিল।

অজিত হাত পা ছুঁড়িয়া কান্নার সুরে বলিল, "এত দেরী হলো! আমি ভাত খেতে চাইনে, আমি ভাত খাবনা। অমিয় খাক্ গে।"

শৈলজা, হাত বাড়াইয়া অজিতকে প্রসারিত লোকের উপর বসাইয়া নরম সুরে বলিল, "ছি, বাবা, অমন দুরন্তপনা করতে নেই। এখনি রান্না হয়ে যাবে। ততক্ষণ তুই একটা গল্প শুনবি?"

অজিত মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "বল মা, বল, বল।'

শৈলজা কড়ার মাছ উল্টাইয়া দিতে দিতে আরুণির গুরু ভক্তির কাহিনী বলিতে সুরু করিল। ভাতের কথা বিস্মৃত হইয়া অজিতের একাগ্র মন গল্পের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। রান্না হইয়া গেলে আরব্ধ গল্প মধ্যপথে বন্ধ করিয়া শৈলজা বলিল, "যা অজিত, অমিয়কে ডেকে নিয়ে আয়। রান্না হয়ে গেছে।" মাছ ভাজা বা গরম ভাতের প্রতি অজিতের তখন আর তেমন লোভ ছিলনা। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের খাইয়ে দিতে দিতে গল্পটা শেষ করবে তো?"

'না' বলিবার উপায় ছিলনা; তাই শৈলজা বলিল, "করব, করব, তুই যা।"

অজিত ছুটিয়া যাইয়া অমিয়কে ডাকিয়া লইয়া আসিল। ছেলেদের খাওয়াইতে খাওয়াইতে শৈলজা গল্প বলিতে লাগিল। গল্প শেষ হইতে তখন আর বেশী বিলম্ব ছিল না, অজিতের মুখে ভাতের শেষ গ্রাসটি তুলিয়া দিয়া গল্প শেষ করিবার মতলবই শৈলজার ছিল। গল্প শেষ হইয়া গেলে ভাতের আর একটি কণাও যে অজিতের মুখে দেওয়া যাইবে না, শৈলজা তাহা নিশ্চিত জানিত। তাই সে ইচ্ছা করিয়াই গল্প শেষ করিতে বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময়ে পরিচিত চন্দন কাঠের খড়মের খট্ খট্ শব্দ শুনিয়া শৈলজা চাহিয়া দেখিল, হরপ্রসাদ আসিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অধরে অস্ফুট হাসি। এই খাওয়ান ব্যাপারটাই যে হাসির কারণ শৈলজা তাহা অনুমান করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কোন সময়েই তাহার দুর্ব্বলতা হরপ্রসাদের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে পারে না, অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা।

হরপ্রসাদ শৈলজার লজ্জিত ভাবটা লক্ষ্যই করেন নাই, এমনি ভাবে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবকৃষ্ণের মেয়ের বিয়েয় কত দিতে হবে, সে তো কাল বলতেই পারলে না। এখন বলবে কি? সে এসে বসে আছে।"

কাহাকে কিছু দান করিতে হইলে বা কোন দায়িত্বপূর্ণকাজ করিতে হইলে হরপ্রসাদ পূর্ব্বে

অন্নপূর্ণার পরামর্শ লইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শৈলজার পরামর্শ লইয়া থাকেন। তিনি তাঁহার সখীত্বের সীমানায় অন্নপূর্ণাকে কখন আহ্বান করিয়াছেন কিনা শৈলজার তাহা জানা নাই, কিন্তু শৈলজাকে করেন নাই, ইহা তাহার স্থির বিশ্বাস। সখী না হইলেও সে স্বামীর গৃহিণী ও সচিব বটে।

স্ত্রীকে মৌন দেখিয়া হরপ্রসাদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, কিছু বল্‌লে না? সে অনেকক্ষণ বসে আছে যে।"

স্বামী শৈলজাকে উপস্থিত লজ্জার দায় হইতে মুক্তি দানের জন্যই একটা অবান্তর প্রশ্ন করিতেছেন মনে করিয়া শৈলজার রক্তাভ গৌর মুখ খানা আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। লজ্জাটা শেষে রোষে পরিণতি লাভ করিল। তিনি নিজে না আসিয়া কথাটা অন্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেও তো পারিতেন। এমন তো মাঝে মাঝে করিয়া থাকেন। শুধু শৈলজাকে অপদস্থ করিবার জন্যই এখন ওঁর এখানে আসা। সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "আমি কিছু বলতে পারব না, যা খুসী দাও গে।"

হরপ্রসাদ স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "খুসী মত কি সবই করা যায়? দাও, বলে দাও, কত দিতে হবে।"

শৈলজার অসহ্য হইল. সে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "দু'শ টাকা দাও গে। হলো? এখন আর আমাকে বকিওনা, যাও।"

হরপ্রসাদ নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা

কবি চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাব্যজীবনের সহিত তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মনে হয় তাঁহার জীবনের শেষ ভাব-পরিণতি তাঁহার কাব্য সাহিত্যের মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল। যে বৈষ্ণব সাহিত্যপ্রীতি তাঁহার কাব্যজীবনে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহাই ক্রমে তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী বৈষ্ণব ভক্তে পরিণত করিয়া সংসারাশ্রমে কর্ম্মযোগী করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার রাজনৈতিক জীবন ও কাব্যজীবনের মাঝে একটা অচ্ছেদ্য-বন্ধন আছে, এবং এই কারণেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনের আদর্শ বুঝিতে হইলে তাঁহার কাব্যজীবনের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

চিত্তরঞ্জনের বিলাত যাইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কাব্যশক্তির স্ফুরণ হইতেছিল এবং

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের কিছু পরে তাঁহার প্রথম কাব্য "মালঞ্চ" প্রকাশিত হইল। ইহা কতকগুলি খণ্ড কবিতা ও গীতি কবিতার সমষ্টি। তরুণ প্রাণের উপর দিয়া বসন্তের হিল্লোল বহিয়া যে উচ্ছ্বাস জাগাইয়া দিয়া যায় "মালঞ্চে" তাহারই কবিত্বময় প্রকাশ। সমগ্র জীবনটাকে সকল দিক দিয়া—রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিবার একটা উদ্দাম কামনা এই কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সেই সময়কার প্রেম সাধনা রূপের ধ্যানও সহজ সতেজ একটা আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। তরুণ বয়সের নূতন প্রেম একটা সুখ-স্বপ্নের মত রজনীর অন্ধকারে শ্রান্ত ইন্দুর ম্লান করলেখার মধ্যে কুসুমের সুরভি নিশ্বাসে কোনও অজ্ঞাত পুলক জাগাইয়া তোলে, সে প্রেম স্নিগ্ধ আলোকের মত নব বিকশিত প্রাণের তীরে স্বপ্নের তরী আনিয়া উপস্থিত করে, সে প্রেম ভুজঙ্গের জীবন জড়াইয়া যেন মরণ নিশ্বাস ফেলিয়া যায়।

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ।
দিবানিশি করিতেছে হৃদিরক্ত পান।
নিত্য নব সুখ ভরে,
ঝলসিছে রবি করে;
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ।

সে প্রেম নিষ্ঠুর অদৃষ্টের মত কখনও কখনও কাঁদায়, তবু জীবন মরণ যেমন অদৃষ্টের কাছে লুটিয়া থাকে, পরাণও যে তেমনি রাজীবচরণে লুটাইতে থাকে। তাই কবি বলিলেন—

তোমার ও প্রেম সখি! অমর জীবন—
শান্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন!
অসার স্বপন লয়ে,
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে,
ধূলাভরা ধরণীর ধূলি নিমগন।

অথবা—

তোমার ও প্রেম সখি! মরণ সমান
জীর্ণ শ্রান্ত জীবনের শান্তি-আবরণ!
কোমল তুষার কর,
রাখিয়া ললাট পর,
জুড়ায় জ্বলন্ত জ্বালা, আনিয়া নির্ব্বাণ।

একদিন সূর্য্যালোক-বিভাসিত সুন্দর প্রভাতে প্রস্ফুটিত-কুসুম-সৌরভ বহিয়া বসন্ত-বায়ু একটা চঞ্চল পুলক, একটা রঙীন স্বপ্ন ধরাবক্ষে মোহের সৃষ্টি করিতেছিল, সেই সময়ে তরুণ কবি জীবনের গান গাহিয়া উঠিলেন—

আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর !
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্তফুল তার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধুগন্ধ তার ;
স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর !

কোন্ সুরাঙ্গনা চরণ-আভাসে গগনে ফুল ফুটাইয়া স্মিতহাস্যে চারিদিক সৌন্দর্য্যে ভরিয়া নামিয়া আসিতেছে, তাই কবি গাহিলেন—

প্রাণপূর্ণ অপূর্ব্ব স্বপনে
অস্ফুট সঙ্গীত তালে
ফেলেছি চরণ ;
আনন্দে ফুটিছে পুষ্প
আরক্ত বরণ
ধরণীর বসন্ত কাননে !—
দেবতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে
অপূর্ব্ব স্বপনে।

একদিন যখন জীবনের আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে তরুণ প্রাণের আশাও লক্ষ্য হারাইয়া ভগবানের চরণে নিস্ফল আবেদন করিয়া উত্তর পাইলেন না, তখন কবির বিশ্বাসহীন হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—

বুঝেছি বুঝেছি তবে
কহিবেনা কিছু ! তৃষার্ত্ত জিজ্ঞাসা মোর
আসিছে ফিরায়ে তব লৌহবক্ষ হ'তে
রুদ্ধভাষা অশ্রুসিক্ত লজ্জানত আঁখি !
শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি পাষাণের মত।

তাই আর একটি কবিতায়ও কবি বলিতেছেন—মিথ্যা কথা, ঈশ্বর নাই, "সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন"—

ঈশ্বর ঈশ্বর বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া
আমাদের সুখশান্তি ল'তেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন !

তরুণ কবির নিকট ধরণীর সুখ দুঃখই সহানুভূতির সামগ্রী, পাপপুণ্যভরা গোটা মানুষটাই তাঁহার প্রিয়, তাই তিনি ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে কথায় কথায় ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সাধারণের পাপ দেখাইতে বারণ করিয়াছেন, কারণ ইহা তাহাদিগের চক্ষে মোহান্ধকার আনিয়া একটা অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। তাই কবি বলিয়াছেন—

তুমি উচ্চ হ'তে উচ্চ, ধার্ম্মিকপ্রবর !
তুচ্ছ করি এত তুচ্ছ আমাদের পাপ
ওগো ! কোন্ শূন্য হ'তে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবনে তাহারি কর আরতির গান ?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়োনা ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্ ;
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।

আর এই তথাকথিত ধার্ম্মিকদিগের আচরণ যে মিথ্যা ছলনা মাত্র; তাই কবি শুনাইতেছেন—

ওহে সাধু ! আমি জানি, অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায় ;
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায়।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ।

এই কারণেই ব্রাহ্মদিগের সঙ্কীর্ণ সহানুভূতিতে আঘাত পাইয়া কবি তাহাদিগের নিজের গণ্ডীর বাহিরে সকলকে তুচ্ছ করা ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

অসার সকল জ্ঞান ? ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !
তবে তুমি কার কর অত অহঙ্কার ?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ-অন্ধকার !
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তিমহা দেবতায় ;
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে ?
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার !

এই নিরীশ্বরবাদিতা বা নাস্তিকতা, যে নামে সাধারণতঃ আমরা এই ভাবকে অভিহিত করি, চিত্তরঞ্জনের তরুণ বয়সের কবিতাগুলিকে একটা গোলযোগের হেতু করিয়া তুলিয়াছিল। শুনিয়াছি ইহাতে মহারথী ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগের অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল। 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে বিজনী ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার স্বর্গীয় বরদা হালদার মহাশয়ের কন্যা বাসন্তী দেবীর সহিত চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয়। সেই বিবাহ সভায় নাকি অভিমানক্ষুব্ধ শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মরা উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাহাতে চিত্তরঞ্জন আপনাকে দোষী ভাবিয়া দুঃখিত হন নাই।

যাহা হউক মালঞ্চের যে কবিতাটিতে তরুণ কবির নির্ভীকতা ও করুণহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সে প্রসিদ্ধ কবিতাটির নাম "বারবিলাসিনী"। এ কবিতাটি এমন সহৃদয়তা মাখান

এবং এত সুন্দর করুণরসের ভাব ছড়ান যে, ইহা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "পতিতার" পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে। ইহাতে বারবিলাসিনীর চিরলাঞ্ছিত করুণ জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; তাহার অধররঞ্জন, তাহার পুষ্পগন্ধ, তাহার তনু ঢাকা নীলবাস, তাহার অলক্তক-রঞ্জিত-চরণে নূপুর-কিঙ্কিণী, তাহার মর্ম্মহীন আবেগ, তাহার শুষ্ক বিলাস, তাহার রজনীর কলঙ্ক সবটুকুই এমন করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা সহজেই আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। তারপর বিলাসিনীর শেষ কথা বড়ই করুণ—

"আমি যেন চিরদিন ঋণী
অপার ঐশ্বর্য্য ল'য়ে,
বিলাই ভিখারী হয়ে,
বাসনাবিহীন উদাসিনী!
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী!
কে করেছে মোরে চিরঋণী!

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ বিশ্বলালসা ছাই,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিণী!
মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন কলঙ্ক-বাহিনী!
চিরদিন যৌবনে যোগিনী!

কার অভিশাপে নাহি জানি!
কোন্ মহাপ্রাণে ব্যথা—
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী!
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী!
তারি পাশে চির-কলঙ্কিনী!"

'মালঞ্চে'র পর চিত্তরঞ্জনের আর একটি কবিতা পুস্তক "মালা" প্রকাশিত হয়। ইহার দুই একটি কবিতা মালঞ্চেরও আগেকার রচনা। চিত্তরঞ্জনের কাব্যজীবনের ক্রমবিকাশে মালার স্থান মালঞ্চের পরেই। ইহার প্রেম কবিতাগুলি অধিকতর সংযত, ভাব আরও গভীর—

কেমন সে ভালবাসা? বলা কি সে যায়?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায়!

এই 'মালা' কাব্যেই সেই ব্যাকুলতার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা "অন্তর্য্যামী" ও "কিশোর কিশোরী"তে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কবির জীবনে একটা নূতন আলো দেখা দিয়াছে, তাই তিনি বলিতেছেন—

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমরা ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!

তখন তাঁহার আবেগ বিহ্বল প্রাণে এই জিজ্ঞাসাই জাগিতেছিল—

"কি দিয়ে কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি?
কি দিয়ে জ্বালিলে বল, হে চির-কৌতুকময়ী
রহস্য প্রদীপ খানি?
সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া!
এরি মাঝে সত্যরূপে উজলি উঠিছে ওই!
তোমার প্রদীপ খানি!
কি সত্য সুন্দর রূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি!

এই প্রেমের প্রদীপ যখন কবির প্রাণে আলো ছড়াইয়া দিল, তখনই তিনি বলিয়া উঠিলেন—

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব্ব জীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত শত তপস্যার ফল!

তারপর তুমি যদি কখন এস—

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে, যত না স্বপন;
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র ওগো কর আমার জীবন
তোমার চরণ ভূমি!

তাই কবি আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন—

নিখিলের প্রাণ তুমি! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার;
জাগরণে কর্ম্মভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সর্ব্ব প্রাণময়। তুমি যে আমার!

এই প্রাণে প্রাণে মিলন কেমন করিয়া হইবে, তাই তিনি নিবেদন করিয়াছেন—

আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ!
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ হরষে!

"মালা"র পর "সাগর-সঙ্গীত" রচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হিসাবে ইহার "মালা"র পূর্ব্বগামী। সাগর হিল্লোলের তালে তালে কবির হৃদয়ে যে ভাব তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সাগর-সঙ্গীতের কবিতাগুলি তাহারই রূপ কাব্যের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে। মানসবীণায় নূতন ভাবের ঝঙ্কারের সঙ্গে কবি বলিয়া উঠিলেন—

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান,
হে অর্ণব! আলোঘেরা প্রভাতের মাঝে;
একি কথা! একি সুর!
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে!

প্রভাতের তরঙ্গে সঙ্গীত বাজিয়া যে সোনার স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে তাহাই আকাশে বাতাসে ভাসিয়া কবির হৃদয় ভরপুর করিয়া দিয়াছে, তাই কবির মনে হইতেছে কি যেন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—

কি মোহে করেছ আজ! মনখানি মম,
শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম,—
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
গরবে গৌরবে আজ উঠিছে বাজিয়া।

সিন্ধুর অঙ্গে তরুণ উষার আলো পড়িয়া যে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে, তাহারই রূপের লীলায় বিভোর কবির পরাণ সিন্ধুর চরণে লুটাইতে চায়, তাই কবি বলিতেছেন—

সোনার স্বপনে আমি মালিকা গেঁথেছি,
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়।
একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ উষার কোলে স্বপনে বিজনে!

তারপর যখন কবিহৃদয়ের দুকূল ছাপায়ে সাগরের ডাক আসিল, তখন তাঁহার অন্তরের এ পার ও পার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া গেল।

"যে দিন ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে,
অনন্তরাগিণী ভরা ধ্বনিতে তোমার;
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার।"

কবির মনে হইতেছে এক হৃদয় উদাস করা করুণ সুর—সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরিয়া কবির প্রাণে আসিয়া বাজিতেছে; নূতন মোহে নূতন সুরে ভরপুর কবি বুঝিয়া পান না কত যুগ যুগান্তর

হইতে সিন্ধু এই পাগল করা বেদনাভরা সঙ্গীত হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছে। তার পর সন্ধ্যা যখন নামে নামে, আধো আলো আধো অন্ধকারের মাঝে মেঘগুলি যখন ভাসিয়া যাইতেছে, এই অনিশ্চিত আলোক এই অপূর্ব্ব অন্ধকারের পানে আকাশ যখন অবাক নয়নে চাহিয়া আছে, মুখর তরঙ্গ-গুলি তখন শান্ত, চঞ্চল বায়ু তখন স্থির, গগন আলোকহীন, চরিদিক মহাশূন্যময়। মনে হইতেছিল যেন এই ধূসর অন্ধকারে সিন্ধু যোগাসনে বসিয়া আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তখন কবি আবেগ-বিহ্বল প্রাণে বলিতেছেন—

ওগো সিন্ধু! আজ তুমি কোন্ ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীত দ্বিধায় জড়িত সুরে?
জীবন মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি?
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠিছে বাজি?
তোমার পরাণ হ'তে আমার পরাণ পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।
পরাণ কাঁপিছে এই ছায়ালোকে ছায়াময়,—
একি সত্য? একি মিথ্যা? একি আশা? একি ভয়?

"অন্তর্য্যামী", "সাগর সঙ্গীতের" অনেক পরের লেখা। ইহা চিত্তরঞ্জনের কাব্য স্মৃষ্টির চতুর্থ স্তরের রচনা। ইহা পরিণত বয়সের লেখা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্মৃষ্টির প্রত্যেক স্তরই তাঁহার কাব্যের অভিব্যক্তিতে সুপরিস্ফুট, চিত্তরঞ্জনের কাব্য-জীবনের প্রতি স্তর তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। "মালঞ্চ" ও "অন্তর্য্যামী"র কবির মধ্যে দশ বৎসরের একটা নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা অমাবস্যার নিশীথের মত নিঝুম পড়িয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মাঝে মাঝে যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইয়াছে যে, কবির প্রাণ মরে নাই—বাঁচিয়া আছে; আলো নিভে নাই—শিখা জ্বলিতেছে। কবি-প্রতিভা "অন্তর্য্যামী"তে নূতন সুরে নূতন রূপে বাঙ্গালা কাব্যোদ্যানের নূতন ফুলটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। "অন্তর্য্যামী"র সুর বাঙ্গালার চিরন্তন সুরের বর্ত্তমান যুগে একটা অভিনব বিকাশ। "অন্তর্য্যামী"র কবিতাগুলির পূর্ব্বাপর ধারাবাহিক পারম্পর্য্যে অন্তর্য্যামীর কবির ধর্ম্মজীবনের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা;—
তবে ছেড়ে দিনু আমি করগো বচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও!—
পারাণের তারে তারে আপনি বাজাও।
আমি কাঁদিবনা আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে পড়ি রব।

মালঞ্চের কবির উপরে পাশ্চাত্য কবিদিগের, বিশেষতঃ সুইন্‌বার্ণের, প্রভাব লক্ষিত হয়,

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ উহাতে আছে. "অন্তর্যামী"তে আমরা উহার কিছুই পাই না। "অন্তর্যামী"র কবির মানসিক বিকাশের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অনেক স্থলে তাহা অনুমানসাপেক্ষ। মালঞ্চের কবি অন্তর্যামীর স্তরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে "মালা"র মধ্যে তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে একটা পরিবর্ত্তনের ছবি রাখিয়া গিয়াছেন। "মালা"—"মালঞ্চ" ও "অন্তর্যামী"র মধ্যপথের কবিতা। মালঞ্চের কবি যে অন্তর্যামীতে আসিয়া পৌঁছিবেন "মালায়" তাহার পূর্ব্বাভাস। অন্তর্যামীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বিজয়কৃষ্ণ যুগের যে সাধনা, এই সাধনার সাহিত্যিক রূপ ও সুর। আমরা দেখিয়াছি মালঞ্চে জীবনের অর্দ্ধ আলো অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে সমস্যা-সঙ্কুল সন্দেহের আবর্ত্তে পড়িয়া, কবির "সহস্র সঙ্কল্পভরা তরুণ জীবন", আশা প্রেম ও হৃদয়ের রক্ত দিয়া আগ্রহভরে রচিত "স্বর্ণ স্বপনের" রঞ্জিত যবনিকাখানি টানিয়া এক নির্ম্মম বেদনাবহ বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। দেখিয়াছি তিনি কেমন অভিমানক্ষুব্ধ হইয়া নিরীশ্বর বাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। অন্ধ সংস্কারের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার নির্ভীক তেজস্বিতা কবির আসিয়া দেখা দিল, তখনই হয়তো অজ্ঞাতসারেই বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের অন্তর্মুখীন সাধনার বার্ত্তা কবির অনুভূতিতে ধরা দিয়াছিল। এই অনুভূতির আভাস "মালা"তে দেখা দিলেও সম্যক্ ফুটে নাই। তাই "মনোমার্গের পথিক" হইয়া পথে ভাসিতে ভাসিতে ঈপ্সিত স্থান পাইবামাত্র ভাবানন্দে বিহ্বল কবি গাহিয়া উঠিলেন—

"বাজারে বাজারে তবে বাজা জয়ডঙ্কা
নাহি লাজ নাহি ভয় নাহি কোন শঙ্কা।
পরাণখানি কাঁপছে কত জয়মাল্য গলে,
ফুলের মত কি জানিগো ফুটছে হৃদিতলে।
সুখের মত দুঃখ আজ, দুখের মত সুখ!
কোন্ গানের গরবে গো ভরিয়াছে বুক?
প্রাণের মাঝে একি ধ্বনি? কি নীরব ভাষা
বুকের মাঝে কোন্ পাখীগো বাঁধিয়াছে বাসা!
পায়ের তলে বাজে পথ! প্রাণ আজিকে রাজা!
বাজারে বাজারে তবে জয়ডঙ্কা বাজা!"

"অন্তর্যামী"র সুর বৈষ্ণব কবিদিগের সুরের অনুকারী, অথচ বর্ত্তমানকালের অভাব অভিযোগ ও আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনা, সাধনার ঐকান্তিকতা ও ভাষার সারল্য ইহাতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আছে প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের গভীর তন্ময়তা, সাধকের অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা। ইহাতে সেই বৈষ্ণব যুগের আকুল সুর বাজিয়াছে—

"এস মনোবনবাসে! এস বনমালী!
চরণতলে ফোটা ফুল, তারি বরণ ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে!
পরাণ ভ'রে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে!
তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায়!
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায়!
এস মনোব্রজ বাসে এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি, তোমার বরণ ডালি!"

চিত্তরঞ্জনের যে সুর অন্তর্যামী'তে ফুটিয়াছে, তাহা তাঁহার শেষ কাব্য "কিশোর কিশোরী"তে আর্ট সৃষ্টির দিক হইতে আরও বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। অন্তর্যামীর কবি যে "দুএর" কথা হইতে এক চির কিশোরের রহস্যময় ব্যঞ্জনাপূর্ণ "তিনের কথা"য় আসিয়া পৌঁছিবেন অন্তর্যামীতে তাহারও পূর্ব্বাভাস চিরকিশোরের কিশোরীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ—

"সাঁঝের আঁধারে—
ধূসর গগন তলে
নব শ্যাম দূর্ব্বাদলে।"

কেমনে সে দেখা—

"সেই সে প্রথম বার দেখিনু তোমারে!
অধরে অমল হাস,
আঁখি কোণে লাজ ভাস,
কে ডাকিল? ছুটে গেনু সাঁঝের আঁধারে!"

প্রথম দেখাতেই যে কিশোরী সেই চিরকিশোরের মন অধিকার করিল

"সে কোন কুসুম সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে!
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে!"

তারপর কিশোরীর স্নিগ্ধ দুষ্ট হাসি দেখিয়া কিশোরী ভাবিল—এ বুঝি সন্দেহের হাসি। তাই সে বলিয়া উঠিল—

"নহ মিথ্যা সত্য তুমি! সত্য রূপাধার!
সত্যই সেদিন আমি নয়নে হেরিছি,—
সত্যই পরাণ ভরে পরাণে তুলেছি!
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির!
এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে
কেমনে বুঝাব তোমা; ওগো বক্ষবাসি,
আমি সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।"

কিশোর কিশোরীর সহিত কিশোরের স্ফুটনোন্মুখ প্রাণ মিশিয়া তিনের কথা রচিয়াছে—তাই অবুঝ প্রাণকে কিশোর সান্ত্বনা দিতেছে—

"তুমিও হেরিতে প্রাণ! আমি হেরি যদি!
চিত্ত-মাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি!
দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন-মরণ ভ'রে—জনমে জনমে।"

তখন কিশোরীর সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠিল তাই কিশোরী বলিল—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ!
প্রাণস্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ!

ক্রমে সেই মূর্ত্তি ধ্যান ধারণার সামগ্রী হইয়া পড়িল! কিশোরের

সকল রকম মাঝে সর্ব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায়।

কিশোরীর মিলন তখন ইন্দ্রিয় জগৎ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। তাই মিলনের দিনে কিশোরের তৃপ্তিভরা প্রাণের কথা—

"জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার
কোন দিন হেরি নাই;
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
পাই নাই কোন দিন;
এমন মধুর ক'রে
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার!
এমন পরাণ ভ'রে!
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার!"

এই যে চির পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে শেষকালে কিশোর কিশোরীর অপূর্ব্ব মিলন এক নূতন সুরের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ মূলক সাধক জীবনের এক বৈচিত্র্য ও রহস্যময় ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের অকুণ্ঠ আবেগ ও ভাষার অনাবিলতার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে কাব্যের রূপান্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনের স্তরে স্তরে যে রূপান্তরের চিত্র দেখিয়াছি কাব্যের দিক দিয়া "কিশোর কিশোরী"তে সেই রূপান্তরের কথা বেশ ফুটিয়াছে। অকৃত্রিম আবেগ, ধর্ম্মের জটিল রহস্যময় অভিজ্ঞতাকে কি করিয়া সহজ ও সরলভাবে প্রাণের কথায় মর্ম্মস্পর্শী করিয়া বলা যায়, "অন্তর্য্যামী" ও "কিশোর কিশোরী" তাহার এক নূতন পরিচয়।

চিত্তরঞ্জনের কাব্যবিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি উহা বৈষ্ণব আদর্শে অনেকটা গঠিত, বৈষ্ণবভাবে উহা ভরপূর। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যকে একটা নূতন রূপ দিবার জন্য চিত্তরঞ্জন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে "নারায়ণ" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন। ইহার নিয়মিত লেখকগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিক-গণের নাম দেখিতে পাই।

১৩২১ ফাল্গুনের নারায়ণে তিনি বাঙ্গালা কবিতার প্রাণের কথা বলিয়াছেন। চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী পর্য্যন্ত এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা বহিতেছে তাহার কথাই তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলি, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়। এই সে অপূর্ব্ব মিলন—জীবন তাহার মহামন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এ মিলন মন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই।"

বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ ১৯১৭ সালের বার্ষিক বঙ্গীয় সম্মিলনে বাঁকিপুরের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনকে সাহিত্য শাখার সভাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। পর বৎসর ঢাকা নগরীতে সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। বাঁকিপুরের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন "বাঙ্গালার গীতি-কবিতা" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধেও তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে বাঙ্গালার প্রাণের অভিব্যক্তি বলিয়াছেন। একস্থানে তিনি বলিতেছেন—

"কেহ কেহ বলেন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যরূপক। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব কবিতা বুঝিতে গেলে, বোধ হয়, রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই। বৈষ্ণব কবিদিগের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মের শতদলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগল সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছে।" প্রাণের মণিকোঠায় ধরে রাখা রূপ যখন কবিতার মধ্যে প্রকাশ হয়, তখনকার সে কথা—

"আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কতবার হই হারা।
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন তারা।"

চণ্ডীদাসের এই কবিতাই বৈষ্ণব কবিদের ভাবমাধুর্য্যের আদর্শ।

"রূপান্তরের কথা" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন এই রূপেরই বিকাশের কথা বলিয়াছেন। ইহার এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—

"রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয়, তখনই তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের আভাস নয়, তাহা সত্যরূপ, তাহাই সত্যরূপ। সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে, তাহাতে ভাব ও আকারের পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্য লোকের নিভৃত মিলনকেন্দ্র।"

চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনে এই রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহারা ভাবের মিলন-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৃষ্টিই উহার প্রমাণ।

চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্ত কবিদিগের প্রভাব চিত্তরঞ্জনের জীবনকে এতটা মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল যে, শেষজীবনে তাঁহার রচিত কতকগুলি কীর্ত্তন গানে বৈষ্ণবীয় বিরহ ও মিলনতত্ত্বটা বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। কীর্ত্তন গানগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। নিদর্শন স্বরূপ উহাদের মধ্যে দুটী কবিতা এখানে উদ্ধৃত হইল—

মিটায়োনো এই পিয়াসা,
এই ত আমার মিষ্টি লাগে।
ওগো বিরহী, চির বিরহী,
এই তৃষা যেন নিত্য জাগে !!
মিলন আমি চাইনা যে হে
এই তিয়াসা যেন থাকে !

চোখের জলে এত মধু !
প্রাণ বঁধু হে, প্রাণ বঁধু।
মুছায়োনা চোখের বারি
নাইবা এলে আঁখির আগে।
নাইবা যদি মিলন হোল
এই বিরহ যেন নিত্য জাগে।

এই কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের বিরহতত্ত্ব বেশ সুন্দররূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারপর আর একটী গান—

দাও দাও প্রাণের নিধি
প্রাণে প্রাণে বেঁধে দাও
সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও।
আমি সইতে নারি দূরে থেকে
তোমার কাছে ডেকে নাও।
বুকের ধন বুকের মাঝে বুকের পরে
বেঁধে দাও।

ভাবতে গেলে তোমার কথা
সকল অঙ্গ শিহরে,
ভুলতে গেলে তোমার কথা
প্রাণের মাঝে বিহরে।
আমি ভাবতে নারি,
আমি ভুলতে নারি,
তোমার কাছে ডেকে নাও।
বুকের ধন বুকের মাঝে বুকের পরে
বেঁধে দাও !!

এই খানেও প্রাণে প্রাণে মিলনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। বৈষ্ণব কবিদিগের সরলভাবে অনুপ্রাণিত এই গানগুলির পদবিন্যাসও এত মধুর যে, কাব্যসাহিত্যে উহারা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই।

চিত্তরঞ্জনের কাব্য সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে শব্দবিন্যাস অপেক্ষা প্রাণের অকুণ্ঠ আবেগ প্রকাশের চেষ্টাই অধিক। সেই জন্য উহাতে বিশেষ শব্দঝঙ্কারের আড়ম্বর নাই, আছে সরল ভাবের বিলাস এবং সে ভাববিলাস অনেকটা বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সমৃদ্ধ।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

মণিমালার সুখ

(১)

গড়জাত অঞ্চলের নিবিড় বনের মধ্যে কেবল পদ্মপুর সহরটিতে বর্ত্তমান সভ্যতার আলো কিছু প্রবেশ করিয়াছিল। ইংরাজ-রাজের খাসদখলের পর এখানে অনেক চাকুরে বাঙ্গালী বাবুদের আগমন হয়, আর তাঁহারাই এই আর্য্য-অনার্য্য-মিশ্রিত অসভ্য দেশটিকে দ্রুতবেগে সভ্যতার সোপানে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন সেখানে ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপের পরিবর্ত্তে কেরোসিনের লণ্ঠন ও মোটা কাপড়ের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ লোকের পরণে বিলাতি মিহি ধুতি।

সহরটির একপ্রান্তে এক মালী ও মালিনী বাস করিত। মালী বাগান করিত ও মালিনী দিনে তরি-তরকারি ও সন্ধ্যায় ফুলের মালা বেচিয়া পয়সা আনিত। বিদেশী বিলাসিতার স্রোতেও পুরাতন রাজার আমলের ফুল ও মালার সখটুকু এ দেশের লোকের মন হইতে ভাসিয়া যায় নাই। অবস্থাপন্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রতি সন্ধ্যায় ফুল ও মালা কেনা আলো জ্বালার মতই নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম ছিল। শুধু ভদ্র ঘরে কেন, কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা বাঁশি বাজাইয়া ও গানে রাজপথ মুখরিত করিয়া কোল যুবক-যুবতীর দল যখন ঘরে ফিরিত, তখন নিকষ কালো বক্ষের উপর একগাছি মালা দোলান, কিংবা সঙ্গিনীর খোপায় দুটি ফুল গুঁজিয়া দেওয়া তাহাদের মধ্যেও একটা মস্ত বিলাস ছিল। যে দেশে ছোট বড় সব ঘরে ফুলের এত আদর, সেখানে ফুলের ব্যবসায়ে মালী-মালিনীর যে বেশ দুপয়সা রোজগার হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বচ্ছল অবস্থা, বয়সও বেশ হইয়াছে, অথচ ঘরে এপর্য্যন্ত একখানি কচি মুখের আবির্ভাব হয় নাই, এই দুঃখে স্বামী-স্ত্রী মনমরা হইয়াছিল। বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাহারা সন্তানের অভাব বেশি পরিমাণে অনুভব করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ এক দুর্ভিক্ষের দিনে বিধাতা তাহাদের ভিক্ষা

পূর্ণ করিলেন। পিতৃমাতৃহীনা একটি কোল বালিকা তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িল। সমগ্র প্রাণের স্নেহে দুজনে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এক জাতির মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বজাতির নিকট পার পাইল। মেয়েটি বড় কালো, তা ব্রাহ্মণের ঘরেও ত কালো মেয়ে দেখা যায়, কালো হইলে কি হয়—মুখখানি দেখিলে বিশ্বাস হয় যে, কালোরূপেও দ্রৌপদীর সুন্দরী নাম থাকা অসম্ভব গল্প নয়। মালিনী বড় আদরে মেয়ের নাম রাখিল মণিমালা।

আদরে সোহাগে মণিমালা দিনদিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মালীর সঙ্গে রোজ গাছে জল দেওয়া ও মালিনীর সঙ্গে ফুল তোলা ও মালা গাঁথা এই সব কাজে সে দুজনেরই নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। বুড়ো বয়সে মালী-মালিনী আজন্মসঞ্চিত অপত্য স্নেহটুকু এই অনার্য্য-বালিকার উপর ঢালিয়া দিল। এই সময় মালীর স্বজাতি অনেক যুবক কিশোরী মণিমালার পাণিপ্রার্থী হইল। বুড়োবুড়ী খুঁজিতে ছিল একটি অনাথ যুবক, যাহাকে তাহারা চিরদিন কাছে রাখিতে পারিবে; কিন্তু তেমনটি জুটিল না বলিয়াই বোধ হয় তাহারা উপস্থিত কাহাকেও পছন্দ করিল না। আদরের মণিমালাকে কেমন করিয়া পরের ঘরে পাঠাইবে, এই ভাবনার কূল না পাইতেই হঠাৎ একদিন কলেরা রোগে দুজনেই মেয়েটিকে ফেলিয়া নির্ভাবনার দেশে প্রস্থান করিল। এইবার অনেক হিতৈষী বন্ধু আসিয়া মণিমালাকে সংসারী করিতে চাহিল, কিন্তু বন-হরিণীর স্বাভাবিক স্বাধীনতা-প্রিয়তা তাহাকে কোন বাঁধনে বাঁধিতে পারিল না। সে একলাই গাছ পুঁতিয়া, জল ঢালিয়া বাগানে শতশত ফুলের হাসি ফুটাইয়া তার সঙ্গে নিজের হাসিটুকুও জাগাইয়া রাখিল। সংসারের দুঃখ-নিন্দা তাহার সুখের কোন ব্যাঘাত করিতে পারিল না।

(২)

দিন যায়—ফুলের বাগানে হেলাফেলায় মণিমালার দিন যায়। এখন আর শুধু ফুলের সঙ্গে কথা বলিয়া মণিমালার প্রাণে তৃপ্তি হয় না; সে যেন আরও কি চায়, অথচ কি চায় তাও যেন ঠিক বোঝে না। এতদিন নিজের একাকিত্ব অনুভব করে নাই, এখন বড় একলা ঠেকে। আগে সে যেমন নীরবে দোকানে বসিয়া মালা বেচিত, এখন তা করে না; এখন ক্রেতাদের সঙ্গে নানা কথা না বলিয়া সে পারে না। তাহার চঞ্চলতা ও ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আবার নূতন করিয়া অনেক বিবাহার্থী জুটিল, কিন্তু তাহাতে মণিমালার মন উঠিল না। তাহার সুদূরের পিয়াসা হাতের কাছের জিনিসে মিটিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ফুলের মালা হাতে করিয়া সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় দুই তিনটি বাঙ্গালী বাবু সে দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন। বয়সে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা নবীন, তিনি একগাছি মালা কিনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অন্য বাবু কয়টি উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, "কিহে প্রভাত, ফুলের সখ আবার তোমার কবে থেকে হলো? ফুলের লোভে, না মেয়েটির লোভে, পয়সা বার করছ?" প্রভাত কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "এই জংলি দেশে খাসা ফুল পাওয়া যায় ত।

সাধে কালিদাস বলেছেন—সেই যে কি ছাই বনফুল আর উদ্যানফুলের তুলনাটা ?” এই বলিয়া হাসিয়া অগ্রসর হইয়া দ্বিগুণদামে একগাছি মালা কিনিয়া গলায় পরিল। মণিমালা বাবুদের রসিকতা বুঝিয়াও রাগ করিতে পারিল না। বাঙ্গালী যুবকের মিষ্ট হাসি ও চপল কথার মোহে এক মুহূর্ত্তে আপনাকে যেন সে হারাইয়া ফেলিল। প্রভাত সেইদিন হইতে মণিমালার কাছে নিত্য ফুল কিনিতে লাগিল, নিত্য নানা কথায় তাহাকে ভুলাইয়া ফেলিল। সরলা কুরঙ্গী এতদিনে ব্যাধের বাঁশিতে উতলা হইল।

প্রভাতের সহিত তাহার সম্পর্ক লইয়া পদ্মপুরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে সমাজ-সম্পর্কশূন্যা মণিমালার কি আসে যায় ? দুদিন পরে আন্দোলনকারীরা থামিয়া গেল। সত্যইত বাপু, মেয়েটা গোল্লায় গেলে তাহাদেরই বা ক্ষতি কি ? বাঙ্গালী-সমাজ বলিয়া সেখানে কিছু থাকিলে হয়ত প্রভাত অতটা খোলাখুলিভাবে চলিতে পারিত না, কিন্তু পদ্মপুরে বাঙ্গালী-সমাজ বলিতে একটি ছোট মেসের চার পাঁচটি বাবুকে বুঝাইত। তা ছাড়া, হাজার হোক, প্রভাত পুরুষ মানুষ, তার সাত খুন মাপ। মেসের বন্ধুবর্গের নিকট প্রভাত তিরস্কৃত হওয়া দূরে থাক, বরং বাহাদুর ছেলে নামে অভিহিত হইতে লাগিল। কোথায় গেল মণিমালার ফুলবাগান, প্রভাতের কাছে থাকিবার লোভে সে মেসের বাসন মাজিতে আরম্ভ করিল। প্রভাত গোপনে তাহাকে আশ্বাস দিয়া রাখিল যে, তাহার চাকরিতে একটু উন্নতি হইলেই সে মণিমালার জন্য নূতন বাড়ী করিয়া তাহাকে রাণীর মত আদরে রাখিবে। তা রাণীই হোক্, আর চাকরাণীই হোক্, মণিমালা কল্পনার সুখস্রোতে ভাসিয়া চলিল। মেসের দু-একজন বাবু প্রভাতের সরিয়া পড়ার কথা ইঙ্গিতে বলিলে তাহার বুকে ছুরির মত বিঁধিত বটে, কিন্তু তখনই আবার বিশ্বাসের বলে সে সব ভুলিয়া সুখের গান গাহিতে গাহিতে কাজে মগ্ন হইত। কোন মতেই তাহার সুখের জোয়ারে ভাটা পড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

(৩)

শীঘ্রই প্রভাতের বনফুলের সখ্ মিটিয়া গেল। মণিমালা যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝিত না। একদিন সকালে মণিমালা আসিয়া দেখিল, প্রভাত তাহার জিনিসপত্র সব গুছাইয়া বাক্সে তুলিতেছে। মণিমালা কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইল, “মার অসুখ, বাড়ী যাওয়া দরকার।” মণিমালা বিষণ্নমুখে বাহিরে আসিল। মেসের আর একজন বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “কি গো মণি, তোমার বাবু যে বৌ আন্‌তে যাচ্ছে, সে খোঁজ রাখ ?” চমকিয়া মণিমালা আবার ঘরে ঢুকিল। প্রভাতের মুখে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিয়ে করতে যাচ্ছ ?” প্রভাত একটু থামিয়া বলিল, “তোমায় খবর দিল কে ? যাক্, যখন জেনেছ, তখন আর উপায় নেই। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই নি বলেই বলি নি।” তারপর একটু ক্লেশের হাসি হাসিয়া বলিল, “চিরকাল আইবুড় থাক্‌ব নাকি ?” উত্তর না পাইয়া চাহিয়া দেখিল, মণিমালার চোখে আগুন

জ্বলিতেছে। ভয় পাইয়া প্রভাত ছোট লোককে ঠাণ্ডা করিবার অব্যর্থ ঔষধ মনে করিয়া দুইটি টাকা বাহির করিয়া মণিমালার হাতে দিতে গেল। মণিমালা হাত সরাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল। প্রভাত রাস্তা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না, তখন আর সময় নাই; সে বিরক্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া জিনিসপত্র বাঁধিতে লাগিল। মেসের সঙ্গীদের বলিল, "আপদ আর কি! ছুঁড়ীটা মনে করেছিল, ওকেই বুঝি বিয়ে করব। এমন জাতিভেদজ্ঞানশূন্য দেশেও মানুষ আসে! এখান থেকে বদলির দরখাস্ত দিলাম, দেখি কি হয়।"

বৈশাখের খর রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া মণিমালা তাহার লাঞ্ছিত বাগান খানিতে ফিরিয়া আসিল। এত অযত্নেও গাছে ফুলের অভাব ছিল না। তাহারা হাসিয়া মণিমালাকে অভ্যর্থনা করিল। মণিমালার চোখে জল-ধারা বহিল। সে চোখ মুছিয়া বাগান পরিষ্কার করিতে বসিল। দুদিনের মধ্যে বাগানের নষ্টশ্রী ফিরিয়া আসিল। মণিমালা আবার ফুলের ডালি লইয়া বাজারে বেচিতে চলিল, ফুল ও মালা পূর্ব্বের মত বিক্রি হইতে লাগিল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিদ্রূপের হাসিও তাহাকে অনেক সহিতে হইত। পুরাতন সঙ্গিনীরা হাসিয়া বলিত, "কি রে বাঙ্গালিনী বৌ, অন্দরমহল ছেড়ে আবার বাজারে ফুল বেচ্‌তে এলি যে?" মণিমালা কাহারও কথার উত্তর দিত না। প্রভাতের জন্য তাহার যে বড় দুঃখ ছিল, তাহা নয়; বরং তাহার প্রবঞ্চনাহীন সরল মনে বিশ্বাস-ঘাতকের প্রতি দারুণ ঘৃণারই সঞ্চার হইয়াছিল। লোকনিন্দার কষ্টও সে ধীরে ধীরে সামলাইয়া লইল। ব্যাধজালমুক্তা হরিণী এখন সহরের প্রত্যেক লোক সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলিত। লতা-পাতা ফুলের নীরব অথচ মধুর সঙ্গ তাহার লজ্জা ও ক্ষোভের ক্ষত সারাইয়া তুলিল।

এমন সময় এক অঘটন ঘটিল। মণিমালার যে মাসী দুর্ভিক্ষের সময় তাহাকে মালীর নিকট বেচিয়াছিল, সে এতকাল পরে পদ্মপুরে আসিয়া মণিমালার খোঁজ করিতে লাগিল। তখন সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মালীর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় আসিয়া বাগান অধিকার করিয়া বসিল। মণিমালার মাসী তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু মণিমালা রাজি হইল না। শেষে মালীর আত্মীয়টি বাগানে কাজ করিবার জন্য মণিমালাকে রাখিয়া দিল। এতেই মণিমালার পরম সুখ! নাই বা হইল তার নিজের জিনিস, তবু যে সে গাছগুলির যত্ন করিতে পায়, ফুলের মালা গাঁথিয়া বাজারে বেচিতে যায়—একি কম সৌভাগ্য?

মণিমালার বাঁধা খরিদ্দার ছাড়া আর একজন নূতন খরিদ্দার জুটিয়াছে। দূর গ্রামের একটি কোল যুবক সহরে কুলির কাজ করিতে আসিয়াছে। প্রতিদিন কাজের শেষে একগাছি মালা কিনিয়া নদীর ধারে বসিয়া বাঁশি বাজান তাহার কাজ। যুবকের নাম দুখ্‌নু। দুখ্‌নু কোন দিন মণিমালার সঙ্গে কথা বলে না; কিন্তু তাহার চোখে কি যে আছে, যাহাতে মণিমালাকে উন্মনা করিয়া দিয়া যায়, তার আসিতে দেরি হইলে মণিমালা অস্থির হইয়া পড়ে। রোজ নদীর ধার দিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মণিমালা দুখ্‌নুর বাঁশি শুনিতে শুনিতে আসে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুখ্‌মু দুগাছি মালা কিনিল। সেদিনও বাড়ী ফিরিবার সময় মণিমালা নদীর ধার দিয়া যাইতেছিল। পথে দুখ্‌মুর সঙ্গে দেখা হইল। সে বিনা বাক্যব্যয়ে একগাছি মালা মণিমালার গলায় পরাইয়া তাহার হাত ধরিয়া পাথরের উপর বসাইল। তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁশি বাজাইতে লাগিল। অভূতপূর্ব্ব সুখে মণিমালার বুক ভরিয়া গেল। সে নীরবে দুখ্‌মুর পাশে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাদের যে কথা হইল, নদীর জল তাহার সাক্ষী রহিল, আর আকাশের তারা তাহাদের সুখের পরিমাণ জানিল।

দুই চারিদিন পরে পদ্মপুরের লোক জানিল, দুখ্‌মু যা টাকা জমাইয়াছে, তাহা লইয়া গ্রামে ফিরিবে; সঙ্গে যাইবে তাহার নব-বিবাহিতা জীবন সঙ্গিনী মণিমালা। এবার আর বাগান ফেলিয়া যাইতে মণিমালার আপত্তি দেখা গেল না। সুদূরের পিয়াসী বনহরিণী তাহার পথের সাথীর সঙ্গে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে বনে চলিয়া গেল।

শ্রীসুনীতি দেবী

হিন্দু-রাষ্ট্রের গড়ন

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩৬০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্যের "মহাদণ্ড নায়ক" এক বিপুল "কাব্য" রচনা করেন। লেখকের নাম হরিষেণ। "কাব্যটা" গদ্যে এবং পদ্যে লিখিত। আগাগোড়া একটি মাত্র "বাক্যে" রচনা সম্পূর্ণ। "পদগুলা" সবই "বিশেষণ" অথবা "ক্রিয়ার বিশেষণ"। এ এক অদ্ভুত রচনা। লেখাটা তামার পাতে খোদা আছে;—কাজেই "লিপি"-সাহিত্যের অন্তর্গত।

"কাব্যের" কথা-বস্তু হইতেছে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়। সমসাময়িক ইতিহাস হিসাবে হরিষেণের রচনা বিশেষ দামী। গণ্ডাগণ্ডা দেশের ও রাজার নাম একসঙ্গে দেখিতে পাই। গুপ্ত বীর হেথায় এক রাজ্য লোপাট করিতেছেন। হোথায় আর এক রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের চরণসেবা করিতেছে। এক রাজার ধনসম্পত্তি লুটা হইতেছে। অপর রাজাকে পরাজিত করিবার পর তাহার ধনসম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই ধরণের সামরিক জীবনের তথ্যে হরিষেণের কাব্য ভরপুর।

সমুদ্রগুপ্তের সুন্দর দেহ অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত দেখিতেছি। তীর ধনুক, কুড়াল, বর্শা, বল্লম, খাঁড়া, তলোয়ার, লোহার গ্যাঁজ ইত্যাদির আওয়াজ কানে পৌঁছিতেছে অহরহ। রকমারি ব্যূহ রচনায় দিগ্‌বিজয়ী বীরবর সুপটু। "বলং বলং বাহু বলম্" ইহাই তাঁহার একমাত্র দর্শন।

নিজ বাহুর "পরাক্রম" ছাড়া তিনি অন্য কোন সুহৃদের ধার ধারেন না। হরিষেণের সমর-বৃত্তান্তে এই সকল চরিত্র-বিশ্লেষণও ঠাঁই পাইয়াছে।

কিন্তু পল্টনের ফৌজসংখ্যা কত ছিল জানিতে পারি না। সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সেনাপতি কয়জন বা কাহারা ছিলেন তাহাও জানিতে পাই না। দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইবার পর রাজধানী পাটলিপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের যোগাযোগ কিরূপ রক্ষিত হইতেছিল সে খবর হরিষেণ দেন নাই। পল্টনকে যথাস্থানে খোরপোষে মজবুত রাখা হইত কি উপায়ে সে সম্বন্ধেও কোনো তথ্য নাই। পাটলিপুত্রের "মন্ত্রি-পরিষৎ" অথবা "দেশ-সভা" তখন মামুলি রাজ্য-শাসন চালাইতেছিল কোন্ প্রণালীতে সে কথাও জানা সম্ভব নয়।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয় চলিয়াছিল ৩৩০ হইতে ৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর ধরিয়া কম সে কম ৩,০০০ মাইল বিস্তৃত পল্লীশহর বন জঙ্গল নদী পাহাড় ভাঙিয়া পাটলিপুত্রের পল্টন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল সেকালের গ্রীক আলেকজান্দার অথবা রোমাণ সীজার আর একালের ফরাসী নেপোলিয়ন সমুদ্রগুপ্তকে শক্তিযোগী বলিয়া সম্মান করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শাসন বিজ্ঞানের তরফ হইতে যে সকল তথ্য মূল্যবান্ তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যাহা হউক, হরিষেণ সমর-যোগের কবি। হয়ত পরবর্ত্তী কালে,—প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর,—হরিষেণের কিম্ভুতকিমাকার "প্রশস্তি"টাই কালিদাসের অমর কলমের আগায় "রঘুর দিগ্‌বিজয়"রূপে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। রণাবতার, লড়াই-ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি সমুদ্রগুপ্তের অভিযানই কালিদাসের ভাবুকতাপূর্ণ কল্পনার বাস্তব ভিত্তি।

আর্য্যাবর্ত্তের শার্ল্যামেঞ্রগণ

হিন্দু নরনারীর সামরিক ইতিহাস বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। বিভিন্ন হিন্দুরাষ্ট্রে সরমবিভাগ কিরূপে শাসিত হইত তাহাই এই "পাব্‌লিক্ ল" বা শাসন বিষয়ক আইন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য।

৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার ধর্ম্মপাল গঙ্গা উজাইয়া গিয়া কনৌজে এক মহাযুদ্ধ ঘটাইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের ফলে পশ্চিম হিমাচলে কেদার পর্য্যন্ত এবং বোম্বাই প্রদেশের উত্তর কানাড়া জেলার গোকর্ণ পর্য্যন্ত সমগ্র "উত্তর ভারত" কিছুকালের জন্য পাল সাম্রাজ্যের বশীভূত হয়।

এই সময় অভিযানের সামান্য খবর পাওয়া যায় তাম্রশাসনে। পাটলিপুত্রের নিকট গঙ্গার উপর নৌকার পুল তৈয়ারি করিতে হইয়াছিল। নৌকার সারি ঠিক যেন পাহাড়ের শিখের মতন দেখাইতেছিল।

দেবপালকে ও সার্ব্বভৌমের লঙ্কাকাণ্ডে মোতায়েন থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার অন্যতম সহকারী ছিলেন সেনাপতি সোমনাথ।

দশম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তে সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, বাংলার পাল এবং উত্তর ভারতের গুর্জ্জুর প্রতীহার বংশের মধ্যে পরস্পর সমর-যোগের টক্কর চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পালবংশ বিষয়ক ইংরেজি রচনায় (কলিকাতা ১৯১৫) এই বিষয়ে "লিপি" সাহিত্যের প্রমাণ আছে। কিন্তু " সমর-শাসন " বিষয়ক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

বাংলা দেশে সেন আমলে (১০৬৮-১২০০) পল্টনের কাজে মাঝি মাল্লারদের ডাক পড়িত। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত " ভারতীয় নৌবিদ্যা ও নৌশিল্পের ইতিহাসে" (লণ্ডন ১৯১২) জানিতে পারা যায় যে, "নৌ-বল" বাঙ্গালী সেনাবিভাগের অন্যতম সঙ্গ ছিল।

" শাস্ত্র " সাহিত্যে হাতী, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক এই " চার " অঙ্গের সেনার কথা বলা আছে, কিন্তু " লিপি " সাহিত্যে ''নৌ'' ও ''বল'' হিসাবে উল্লিখিত। ''ধর্ম্মনীতি'' এবং ''অর্থ'' ইত্যাদি বিষয়ক সাহিত্য যে ভারতীয় ''পাবলিক'' ল সম্বন্ধে আংশিক সাক্ষ্য দেয় মাত্র। এই তথ্য তাহার অন্যতম প্রমাণ। পরন্তু মেগাস্থেনিসের ভারত-বৃত্তান্তে ''লিপি''র প্রমাণই দৃঢ়ীভূত হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শার্ল্যমেঞ মধ্যযুগের ইয়োরোপে এক জবরদস্ত সেনানায়ক। আজকালকার জার্ম্মাণি এবং ফ্রান্স দুইই ছিল এই খৃষ্টিয়ান সার্ব্বভৌমের করজায়। আর্য্যবর্ত্তে এই সময়ে যে সকল সামরিক কাণ্ড চলিতেছিল তাহাতে প্রত্যেক জনপদেই একাধিক শার্ল্যমেঞ দরের লোক দেখিতে পাই। খৃষ্টিয়ান শার্ল্যমেঞের বংশধরেরা তাঁহার সাম্রাজ অটুট রাখিতে পারেন নাই। বাঙালী এবং অন্যান্য ভারতীয় শার্ল্যমেঞদের সমর-দক্ষতা ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জরীপ করিবার জন্য ইয়োরোপের মাপকাঠিটা কাছে রাখা মন্দ নয়।

চোল সাম্রাজ্যের সেনা-শাসন

শ্রীযুত কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার প্রণীত প্রাচীন ভারত নামক গ্রন্থে (মান্দ্রাজ ১৯১১) দেখিতে পাই যে চোল চোলমণ্ডলের খৃঃ ৮৫০-১৩১০ সেনা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র অনুসারে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত থাকিত। ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক ইত্যাদি বিভাগও প্রচলিত ছিল।

তামিল ''লিপি''র প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়, "তীরন্দাজের দল" নামে এক দল ছিল। রাজার দেহরক্ষীদের ভিতর "পদাতিক" ছিল অন্যতম "সেনাঙ্গ।" ''দক্ষিণ হস্ত'' নামক এক ''জাত'' দ্রাবিড়সমাজে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ কোন বিশেষ কারিগরশ্রেণী এই নামে পরিচিত ছিল। ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক এই দুই বিভাগের সেনাই ''দক্ষিণ হস্ত'' জাতি হইতে বাছাই করিবার ব্যবস্থা ছিল। হাতীসওয়ারের কথাও শুনা যায়। কোনো কোনো রাজপুত্র হাতীসওয়ারদের সেনাপতি হইতেন।

শ্রীযুক্ত আয়ার প্রণীত ''প্রাচীন দক্ষিণাত্যে নগরগঠন'' নামক গ্রন্থে (মান্দ্রাজ ১৯১৬)

কুচকাওয়াজের জন্য নগরে নগরে স্বতন্ত্র ময়দানের কথা জানিতে পাই। কাঞ্চীশহরের বাহিরে কিন্তু লাগাও একটা সামরিক সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইখানে লড়াইয়ের হাতী এবং ঘোড়া যুদ্ধের জন্য গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারী করা হইত। বূহ রচনা, সেনা-চালনা এবং রণ-শিল্প বিষয়ক অন্যান্য কছরত শিখানোও হইত এই সামরিক সহরে।

চোল সাম্রাজ্যের নৌ-বল ছিল সেনাবিভাগের এক বড় অঙ্গ। চের রাষ্ট্রের সঙ্গে এই রাষ্ট্রের এক সাগর-লড়াই ঘটে। বাদশা রাজরাজ চোল (৯৮৪-১০১৮) চেররাজ্যের জাহাজ সেনা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেন। এই নরপতির আমলে চোল সাম্রাজ্য যে বিস্তার লাভ করিতে থাকে তাহাই কালে গোটা দক্ষিণ-ভারত এবং লঙ্কা জুড়িয়া বসিয়াছিল। উড়িষ্যায় এবং বাংলায়ও চোলমণ্ডল কায়েম হইয়াছিল।

রাজেন্দ্র চোলের আমলে (১০১৮-১০৩৫) চোল নাবিকেরা লক্ষাদ্বীপ এবং মালদ্বীপ দখল করে। নিকোবর এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও চোলমণ্ডলের সামিল হয়। অধিকন্তু মান্দ্রাজীরা ব্রহ্মদেশে গিয়া পেগু পর্য্যন্ত স্ববশে টানিয়া আনিতে পারিয়াছিল। বঙ্গোপসাগর বাংলার সাগর না থাকিয়া "চোল সরোবরে" বা মান্দ্রাজী হ্রদে পরিণত হইয়াহিল। পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে যে, তামিল সাম্রাজ্যের নৌ-বিভাগ হইতে বন্দরে বন্দরে "আলোকগৃহ" রাখা হইত।

হিন্দু-সেনা-শাসনের চীনা বিবরণ

(১)

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন দিগ্‌বিজয়ে বাহির হন। এই সময়ে তাঁহার তাঁবে ছিল ৫০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৫,০০০ হাতী-সওয়ার। সাড়ে পাঁচবৎসর লড়াইয়ের ফলে ইনি আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র পাক্‌স্ সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক শান্তিস্থাপন করেন। ৬১২ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের পল্টন খুব ফুলিয়া উঠিয়াছিল। ১০০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৬০,০০০ হাতী-সওয়ার ছিল এই "বিশ্বশক্তি" রক্ষার কাজে বাহাল। সংখ্যাগুলা পাওয়া গিয়াছে যুয়ান-চুয়া-প্রণাত "সি-য়ুকি গ্রন্থে।

বাণ-প্রণীত হর্ষচরিত" (খৃঃ অঃ ৬২০) সমসাময়িক গ্রন্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু তবে এই জীবন চরিতের ভিতর "কাব্য" এবং "উপন্যাস" আছে অনেক। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার বিবরণটাকে সেকালের ভারতীয় "মোবিনিজেশ্যন বা সেনা চলাচলের" রোমাণ্টিক বৃত্তান্তরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই।

তাহা ছাড়া কয়েক জন লোকের নামও আছে দেখিতে পাই। কুন্তল ছিলেন ঘোড়-সওয়ারদের সেনাপতি। "হাতীসওয়ারদের সেনাপতি ছিলেন স্কন্দ গুপ্ত। সিংহনাদকে কেবলমাত্র সেনাপতিরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। সমর এবং শান্তি বিষয়ক অমাত্য, সন্ধিবিগ্রহিক—

ছিলেন অবন্তি। এই সকল নাম কাল্পনিক কি না বলা যায় না। তবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ভাণ্ডার হইতে রাষ্ট্রশাসনের সম্পর্কে রক্তমাংসের মানুষের নাম এত কম পাওয়া যায় যে, "হর্ষচরিতে" উল্লিখিত নামগুলা মনে রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

৬২০ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন দক্ষিণাত্যের উপর হামলা চালাইতে গিয়া নিজ পরাক্রমের সীমানা রাখিয়া আসেন। নর্ম্মদার পাহাড়ী বুক—সেকালের এক বিরাট হ্ব্যাদাঁ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌম চালুক্য (মহারাষ্ট্রীয়) পুলকেশী আর্য্যাবর্ত্তের অতিবৃদ্ধি রুখিতে সমর্থ হন। য়ুঝান-চুয়াঙ বলেন যে পুলকেশী হাড়ীর পল্টনে প্রবল ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার প্রণীত "দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস" গ্রন্থে (বোম্বাই ১৮৮৪) জানিতে পারি যে চোল এবং চের রাজাদের মতন চালুক্যেরাও লড়াইয়ের জাহাজ রাখিতেন। "শত শত জাহাজ" চাণক্য সেনার নৌবলের সামিল ছিল। আরব সাগরের ধন-কেন্দ্র পুরী সাগর-লড়াইয়ের ফলে পুলকেশীর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

(২)

য়ুয়ান-চুয়াঙ্ তাঁহার "সি-য়ুকি" গ্রন্থে মামুলি "শাস্ত্র"-সাহিত্যের "চতুর্ব্বিধ সেনাঙ্গে"র কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। "নৌ-বল" তাঁহার বৃত্তান্তে ঠাঁই পায় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা চলিতে পারে,—হর্ষবর্দ্ধনের সেনার নৌবল একদম ছিল না কি ?

হাতীগুলা বর্ম্মে আবৃত থাকিত। দাঁতে দাঁতে থাকিত লোহার গ্যাঁজ। রথ চলিত পাশাপাশি চার ঘোড়ার জোরে। দুই জন করিয়া লোক বাহাল থাকিত রথ চালাইবার জন্য। এই দুই জনের ভিতর বসিতেন রথী। সেনাপতি রথ হইতে চালাইতেন। রথের নিকটেই থাকিত শরীর রক্ষীর দল।

ঘোড়সওয়ার থাকিত সম্মুখে আক্রমণ রুখিবার জন্য। পদাতিকেরা ঢাল এবং বল্লমে সজ্জিত থাকিত। তলোআরের রেওয়াজও ছিল। খুব চোখা অস্ত্রশস্ত্র কায়েম করা হইত।

"শুক্রনীতি" গ্রন্থে বন্দুকের কথা আছে। হরিষেণের প্রশস্তি-কাব্যে বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রের নাম দেখিয়াছি। কিন্তু বন্দুক জাতীয় চিজ তাহার ভিতর মিলে না। চীনাবৃত্তান্তেও এই বস্তুর অভাব। বুঝিতে হইবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ভারতে,—অন্ততঃ উত্তর-ভারতে বন্দুকের আবির্ভাব হয় নাই। সেকালে ইয়োরোপেও "আর্টিলারি" বা গোলা-বারুদের "রেওয়াজ" ছিল না। "তীরধনুক"ই সেকালের দুনিয়ার সনাতন অস্ত্রশস্ত্র।

"সি-য়ুকি" গ্রন্থে আরও জানিতে পারি যে, যখন যেমন দরকার হইত তখন তেমন ফৌজ বাছাই করা হইত। সার্ব্বজনিকভাবে পল্টনে লোক বাহাল করিবার ব্যবস্থা ছিল। বাঁধা মাহিয়ানা দেওয়া হইত।

য়ুয়ান-চুয়াঙের রচনায় এই ধরণের আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সামরিক জীবনের

কোনো কোনো বিষয় খবর হয়ত বা আংশিক। কিন্তু মোটের উপর বাস্তব বৃত্তান্ত হিসাবে 'সি-যুকি''র তথ্যগুলা হিন্দুসমর-শাসনের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান্।

আন্ধ্ররাজ্যের সমর-বিভাগ

চালুক্য বংশ যে জনপদে সপ্তম শতাব্দীর সার্ব্বভৌম সেই জনপদ পূর্ব্বে ছিল আন্ধ্র বাদশাদের দুনিয়া। আন্ধ্র-সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি সম্বন্ধে মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু সীতারাম সুকৃথাঙ্কার ভাণ্ডারকার স্মৃতি-গ্রন্থাবলীতে "লিপি"-সাহিত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন (পুণা, ১৯২০)।

রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে আন্ধ্রদের ব্যবসাবাণিজ্য চলিত। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ছিল তাহাদের জাহাজঘাটা। রাধাকুমুদের গ্রন্থে জানা যায় যে, যজ্ঞশ্রীর আমলে (খৃঃ অঃ ১৭৩-২০২) যে সকল আন্ধ্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহাতে দুই মাস্তুল ওয়ালা জাহাজের ছাপ আছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আন্ধ্ররা বিশেষ প্রতাপশালী ছিল না। কমসেকম মৌর্য্যদের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া তাহাদের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। গ্রীক মেগাস্থেনিসকে সাক্ষী মানিয়া ল্যাটিন লেখক প্লিনি বলেন যে এই সময়ে (খৃঃ পূঃ ৩০০) আন্ধ্রদের পল্টনে ছিল ১০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ১,০০০ হাতী-সওয়ার।

পঞ্জাবের নৌ-সেনা

(১)

বাঙলার মতন পঞ্জাবও নদনদীবহুল জনপদ। পাল এবং সেন-বাঙালীদের মতন পাঞ্জাবীরাও সেকালে জলযুদ্ধে ওস্তাদ ছিল। দরিয়ার উপর লড়াই চালানো পাঞ্জাবী সেনাবিভাগের অন্যতম ধান্ধা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই।

আলেকজান্দার পাঞ্জাবে আসিয়া ভারতীয় নৌবলের বিরুদ্ধে লড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্সাথ্রয় বা ক্ষত্রিয় নামক জাতির নৌশক্তির এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাবের বিভিন্ন সামরিক জাতির নিকট হইতে নৌকা লইয়া আলেকজান্দারের নৌসেনাপতি নেআর্খস সিন্ধুভাটাইয়া আরব সাগরে পৌঁছিয়াছিলেন। ভিন্‌সেণ্ট-প্রণীত "প্রাচীন জাতিদের ব্যবসা এবং সাগর বাণিজ্য" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৮০৭) লিখিত আছে যে, পাঞ্জাবীরা নেআর্খসকে ৮০০ হইতে ২,০০০ নৌকা দিয়াছিল।

পাঞ্জাবীদের নৌশক্তি সম্বন্ধে আরও প্রাচীন কালের খবর শুনিতে পাই। আসিরিয়ার রাণী সেমিরামিসের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবী নৌসেনা নাকি ৪,০০০ বজরায় সাজিয়া লড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গজনির মামুদকেও ৪,০০০ পাঞ্জাবী "রণ-তরীর'' সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। এই সকল "গল্প" পাওয়া যায় রবার্টসন প্রণীত "ভারত সম্বন্ধে প্রাচীনদের জ্ঞান" নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৮২২)।

আলেকজান্দার বনাম হিন্দুপল্টন

(১)

দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজান্দারের গতি রোধ করিবায় পঞ্জাবের জলসেনা ও স্থল-সেনা সেকালের ভারতে অশেষ যশস্বী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। হিন্দুরাষ্ট্রের সমর-বিভাগের ইতিহাস সেই স্বদেশরক্ষার সমর এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। প্রত্যেক ছটাক জমিনের উপর ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণ মাটি কামড়াইয়া বিদেশীর বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল।

আলেকজান্দার বনাম হিন্দুপল্টনের কথা গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যে দেখিতে পাই। ঘটনার প্রায় সাড়ে তিনশ বৎসর পরে সিসিলি দ্বীপের "রোমাণ" লেখক দিয়োদোরুস "দুনিয়ার ইতিহাস" রচনা করেন গ্রীক ভাষায় (খৃঃ অঃ ৫০)। তাহাতে আলেকজান্দারের ভারত অভিজ্ঞতা ঠাঁই পাইয়াছে।

পরে গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক (খৃঃ অঃ ১০০) এবং "রোম" আরিয়নে (খৃঃ অঃ ১০০) গ্রীক ভাষায় আর কুর্ত্তিয়ুস (খৃঃ অঃ ২০০) এবং যুস্তিন (খৃঃ অঃ ৪০০) ল্যাটিন ভাষায় আলেকজান্দার কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইংরেজ ম্যাক্-ক্রিন্ড্‌ স্‌ প্রণীত "আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ" (লণ্ডন, ১৪৯৬) গ্রন্থে এই সকল গ্রীক এবং ল্যাটিন বিবরণ সহজে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বৃত্তান্তে কতখানি সত্য আছে আর কতখানি গল্পগুজব ঠাঁই পাইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সোজা নয়।

(২)

যাহা হউক, আফগানিস্থানের আসাকেনর জাতি মাসাগা দুর্গের সুরক্ষিত স্থান হইতে আলেকজান্দারকে হটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে। আরিয়ান এবং কুর্ত্তিয়ুস বলেন যে হিন্দু পল্টনে তখন ছিল ৩০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৩০ হাতী-সওয়ার।

পরে আলেকজান্দারকে "পুরুরাজের" সঙ্গে লড়িতে হয়। ৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ঝেলাম দরিয়ার কিনারায় লড়াই ঘটে। ২০০ হাতীসওয়ার ছিল হিন্দু পল্টনের কেন্দ্রস্থলে। প্রত্যেক হাতীকে একশ ফিট অন্তর অন্তর দাঁড় করানো হইয়াছিল। বোধ হয় হাতী-সেনা আট সারিতে বিভক্ত ছিল। হাতীর পশ্চাতে ছিল ৫০,০০০ পদাতিক। হাতী-সওয়ারের ফাঁকে ফাঁকে পদাতিক দলও সন্নিবেশিত ছিল। সেনার দুই ধারে ছিল ঘোড়সওয়ার এবং রথের ঠাঁই। ৩,০০০ ঘোড়া এবং ১,০০০ রথ পুরুরাজের সেনাবলের অন্তর্গত।

দিয়োদোরুষ এবং প্লুতার্ক এই বিবরণের জন্য দায়ী। দিয়োদরুস বলিয়াছেন যে, হিন্দ্যুব্যূহটা একটা দুর্গরক্ষিত নগরের মতন দেখাইতেছিল। হাতীগুলা ছিল ঠিক যেন দেওয়ালের চূড়া বা পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র বিশেষ আর পদাতিক শ্রেণী যেন নগর প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ। প্লুতার্ক বলেন

যে, এই যুদ্ধে আলেকজান্দারের পল্টন বিশেষ হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আলেকজান্দার ভারতের পশ্চিম সীমানাটা দেখিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

পুরুরাজের ঠ্যাঙা খাইয়া আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ পিপাসা মিটিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার কাণে খবর পৌঁছে যে পূর্ব্বভারতের গঙ্গাধৌতজনপদের বাদশা প্রায় তিন লাখ "হস্ত্যশ্বরথপাদাত" লইয়া ইয়োরোপীয়ান আক্রমণকারীর সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে আসিতেছেন।

(৩)

আলেকজান্দারকে হিন্দু সমর-বিভাগের ক্ষমতা আরও চাখিতে হইয়াছিল। পঞ্জাব হইতে ঘরমুখো হইবার পথে তাঁহার উপর হিন্দুরা অনেক হামলা চালায়। "গণতন্ত্রী" পাঞ্জাবীরা দলে দলে আলেকজান্দারকে ভারতীয় সমর যোগের নমুনা দেখাইয়াছিলেন।

আগালস্সয় জাতির তাঁবে নাকি ছিল ৪০,০০০ পদাতিক আর ৩,০০০ ঘোড়সোয়ার। মালব এবং ক্ষুদ্রক এই দুই জাতি সম্মিলিত হইয়া বিদেশী শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল। শুনা যায় তাহাদের সমবেত পল্টনে ৯০,০০০ পদাতিক ১০,০০০৯ ঘোড়সওয়ার এবং ১০০ রথ ছিল।

তিন গজ লম্বা ছিল হিন্দু ফৌজদের বর্শা। পাঞ্জাবী তীরন্দাজদের বাহুবল সম্বন্ধে আরিয়ান বলেন :—"ইহাদের ধনুকের ঘা হইতে আত্মরক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্যসাধন বিবেচিত হইত। ঢাল অথবা উরস্ত্রাণ অথবা অন্য কোনো বেশী টেঁকসই যন্ত্র যদি থাকে তাহার সাহায্যেও হিন্দু ধনুকের কি গতি রোধ করা সম্ভবপর হইত না।"

(৪)

সংখ্যা গুলা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলিতে পারে। আলেকজান্দারকে যে মস্ত মস্ত পল্টনের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছিল এইকথা প্রচার করাই ছিল দিয়োদোরুস ইত্যাদির উদ্দেশ্য। ইয়োরোপের গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যেও সেকালে "প্রশস্তি," "চাটু" বাক্য ইত্যাদি মাল "ইতিহাস" নামে পরিচিত ছিল।

হাজার হাজার, লাখ লাখ এশিয়ান ইয়োরোপীয়ান বীরবরের গতিরোধ করিতে পারে নাই এই হইতেছে আলেকজান্দার গাথার ধুআ। ভারতীয় পল্টন গুলাকে বহরে খুব বড় দেখানো কাজেই ঐতিহাসিক মহাশয়দের এক বিশেষ লক্ষ্য। হিন্দু সমর বিভাগের আলোচনায় পাশ্চাত্য "রিপোর্টার"দের অত্যুক্তি-প্রিয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে চলিবে না।

মৌর্য্য পল্টন ২ রোমাণ পল্টন+

আলেকজান্দার ভারতের পশ্চিম সীমানায় ছিলেন ৫২৭ হইতে ৩২৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত। পঞ্জাবের এক অংশে গ্রীক সেনা আরও কিছুকাল ইয়োরোপীয়ান প্রভুত্বের সাক্ষী স্বরূপ মোতায়েন ছিল। হিন্দু নরনারীর সমর সাধনা এই বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে শীঘ্রই বিজয় লাভ করে। ৩২২

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজান্দারের শেষ চিহ্নোৎ পর্য্যন্ত পঞ্জাবের পল্লীনগর হইতে মুছিয়া ফেলা হয়। সেই স্বাধীনতার সমরের হিন্দু সেনাপতি ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য।

এই ঘটনার উনিশ বৎসর পরে এশিয়া মাইনরের গ্রীক (হেলেনিষ্টিক) রাজা সেলিউকস ভারতের দিকে হামলা চালাইতেছিলেন আলেকজান্দারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। ৩০৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্য সার্ব্বভৌম সেলিউকসের সমরপিপাসা মিটাইয়া দিয়াছিলেন। সেলিউকস আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থান ভারত সম্রাটের নিকট সঁপিয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

চন্দ্রগুপ্ত তখন ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ ঘোড়সওয়ার, ৯,০০ হাতীসওয়ার এবং ৮০০০ রথের মালিক। প্রত্যেক হাতীর উপর তিন জন করিয়া তীরন্দাজ থাকিত। দুইজন করিয়া যোদ্ধার ঠাঁই ছিল প্রত্যেক রথে। সর্ব্বসমেত মৌর্য্য পল্টনে লোক সংখ্যা ছিল ৬৯,০০০০। রোমাণ লেখক প্লিনির "প্রাকৃতিক ইতিহাস" গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তী গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্কের "আলেকজাণ্ডার জীবনী"তে এই সকল তথ্য পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের আমলে মৌর্য্য নৌসেনার ছিপ বজরা পান্সী ও জাহাজ কতকগুলা ছিল সে খবর জানা যায় নাই।

এই পল্টন ছিল স্থায়ী। প্লিনি বলেন, ফৌজেরা বেতন পাইত দৈনিক হিসাবে এবং নিয়মিতরূপে।

(২)

এইখানে রোমাণ সাম্রাজ্যের পল্টনের বহর আলোচনা করা দরকার। ইংরেজ আর্ণল্ড প্রণীত "রোমাণ প্রাদেশিক শাসন" (অক্স্‌ফোর্ড ১৯১৪) গ্রন্থে জানা যায় যে, "গণতন্ত্রের" আমলে রোমে "স্থায়ী পল্টন" ছিল না! রোমাণরা স্থায়ী পল্টন প্রথম কায়েম করে বাদশা অগুস্তুসের আমলে। অগুস্তুস্ রোমাণ "সাম্রাজ্যে"র প্রথম বাদশা।

তিবেরিয়ুস্ (খৃঃ অঃ ১৪-৩৭) অগুস্তুসের পরবর্ত্তী সম্রাট। তাঁহার আমলে রোমাণ সাম্রাজ্যের পল্টন তাহার চরম বহর লাভ করিয়াছিল। ২৫ "লিজ্যনে" বিভক্ত ছিল "স্বদেশী" রোমাণ ফৌজ। আর ২৫ "লিজ্যন" ছিল "অক্‌সিলিয়া" বা সহকারী ফৌজের। সাম্রাজ্যের অধীনস্থ নানা জনপদ হইতে এই সকল "অক্‌সিলিয়ার" আমদানি হইত। বৃটীশ ভারতের অন্তর্গত "ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস্ ট্রুপ্‌স্" নামক ভারতীয় রাজারাজড়াদের পল্টনের সঙ্গে রোমাণ সাম্রাজ্যের "অক্‌সিলিয়া"-র সাদৃশ্য আছে।

রাম্‌জে প্রণীত "রোমাণ প্রত্নতত্ত্ব" গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৮৯৮) দেখি যে, তিবেরিয়ুসের তাঁবে সর্ব্বসমেত ৩২০,০০০ ফৌজ ছিল। বুঝিতে হইবে যে, মৌর্য্য সেনাপতিরা একসঙ্গে দুই দুইটা রোমাণ সাম্রাজ্যের পল্টনের চেয়েও বেশী বহরওয়ালা সেনা চালাইবার ক্ষমতা রাখিতেন।

সমর শাসনে মৌর্য্য সাম্রাজ্য

(১)

এই বিপুল পল্টনের খোরপোষ জোগানো মুখের কথা নয়। ফৌজদের শিক্ষা-বিধান, তাহাদের শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্যের আয়োজন করা আর যথা সময়ে তাহাদিগকে সেনাপতিদের হুকুম তামিল করাইতে অভ্যস্থ রাখা অসাধারণ পাণ্ডিত্যের এবং শাসন-দক্ষতার পরিচয়। বর্ত্তমান যুগের উড়ো জাহাজ, ডুবো জাহাজ, গ্যাস বিষ ইত্যাদির আবহাওয়ায়ও যে ধরণের সমর-শাসন বিষয়ক পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা দরকার হয়, সেকালের ইয়োরোপে এবং ভারতে ঠিক সেইরূপই দরকার হইত। হিন্দু সেনাপতিরা পল্টন গড়িবার এবং চালাইবার কাজে জগতের অন্যতম নং ১ শ্রেণীর বীরপুরুষ। তুলনামূলক সমর-বিজ্ঞান এই কথাই বলিবে।

পল্টনের জন্য মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রজারা কত টাকা করিয়া বার্ষিক খাজনা দিত, সে কথা জানা যায় না। সমর-বিভাগ মৌর্য্য রাজস্বের শতকরা অনেক অংশ হজম করিত সন্দেহ নাই। সামরিক শক্তিযোগ রক্ষা করিতে হইলে টাকা খরচ করিতে হয়। বিনা পয়সায় "পাক্‌স্ সার্ব্বভৌমিকা" বা "বিশ্বশান্তি" স্থাপিত হইতে পারে না।

মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন, ফৌজেরা সরকারী খরচে জীবনধারণ করিত। লড়াইয়ের জন্য চোপর দিন রাতই তাহারা প্রস্তুত থাকিত। আরিয়াণ বলেন, হিন্দু ফৌজেরা বেশ মোটা হারে বেতন পাইত। নিজেদের খরচ পত্র চালাইয়াও তাহারা অন্যান্য লোকজনের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হইত। অর্থাৎ মৌর্য্যেরা চর্ব্ব্যচোষ্য দিয়া পল্টনকে তোয়াজ করিতে অভ্যস্ত ছিল।

(২)

সমর-বিভাগের শাসন সম্বন্ধে মেগাস্থেনিসের সাক্ষ্য অনুসারে বলিতে হইবে যে পাটলিপুত্রের নগর-শাসন বিষয়ক প্রণালীই কায়েম করা হইয়াছিল। ত্রিশ জন ওস্তাদের এক সঙ্ঘ বাহাল ছিল। পাঁচ পাঁচ জন করিয়া ওস্তাদ এক এক উপ-সভায় বসিয়া সামরিক ধান্ধাগুলা নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ উপ-সভা ছিল ছয়টা।

এক উপসভার তাঁবে ছিল স্থল-সেনা এবং জল-সেনার ভার। জল-সেনার সংখ্যা অথবা অন্যান্য খবর পাওয়া যায় না।

রসদ জোগানো সংক্রান্ত সকল কাজ দ্বিতীয় উপ-সভার অধীনে পরিচালিত হইত। বলদের গাড়ীগুলা এই উপসভার তদ্‌বিরে থাকিত। লড়াইয়ের যন্ত্রপাতি, ফৌজের খোরাক, হাতী-ঘোড়ার খোরাক এবং অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জাম বহিবার জন্য এই সকল গাড়ী ব্যবহৃত হইত। ঢাক ও ঘণ্টা বাজাইবার লোক, ঘোড়ার সহিস, ছুতার মিস্ত্রী, কামার, চামার ইত্যাদি কারিগর সবই এই বিভাগের দায়িত্বে শাসিত হইত। যথাসময়ে যথানির্দ্দিষ্ট কাজ করাইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইত।

পদাতিকদের তদ্‌বির করিবার জন্য এক উপ-সভার উপর দায়িত্ব ছিল। ঘোড়সওয়ার, রথ, এবং হাতীসওয়ারও তিন স্বতন্ত্র উপসভায় শাসিত হইত।

ঘোড়ার আস্তাবল আর হাতীর আস্তাবল স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হইত। অস্ত্রশস্ত্রের গুদামে ফৌজেরা নিজ নিজ হাতিয়ার ফিরাইয়া দিত। আস্তাবলে আস্তাবলে ঘোড়া এবং হাতী সমঝাইয়া দেবার দস্তুরও ছিল।

লড়াইয়ের মাঠে যাইবার সময় ঘোড়া দিয়া রথ টানানো হইত না। ঘোড়া লইয়া যাওয়া হইত ধীরে ধীরে দড়িতে বাঁধিয়া। যাহাতে বাজে কাজে ঘোড়ার তেজ না কমিয়া যায় সেইদিকে সমর বিভাগের দৃষ্টি থাকিত। বলদের সাহায্যে রথগুলা মাঠে পৌঁছিবার পর ঘোড়ার লাগামে জুতিয়া রথের উপর যোদ্ধারা বসিত।

এই সমস্ত খবরই মেগাস্থেনিসের "ইন্দিকা" গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্দ্ধন-ভারতের চীনা-বিবরণের মতন মৌর্য্যভারতের গ্রীক বিবরণও বাস্তব এবং চাক্ষুষ বলিয়াই বোধ হয়।

পরিশিষ্ট

"সাহিত্যে" হিন্দু সমর-শাসন

(১)

১৮৮৯ সালের আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকায় হপ্‌কিন্‌স্‌ মহাভারত হইতে বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু সেনা-শাসন বিষয়ক সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতের মতও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও হিন্দু সমর-যোগের খুঁটিনাটি বিবৃত আছে। রামায়ণের বালকাণ্ডে (২৭ অধ্যায়) অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দেখিতে পাই। মনুসংহিতা, শুক্রনীতি ইত্যাদি গ্রন্থেও ফৌজ-বাছাই হইতে আরম্ভ করিয়া সেনাবিভাগের প্রায় সকল কথাই অল্পবিস্তর আছে। তাহা ছাড়া "ধনুর্ব্বেদ" নামক সাহিত্য ত আছেই।

এই সকল "সাহিত্যে"র বচন উদ্ধৃত করিয়া মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্বামী "প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ কাণ্ড" নামক পুস্তিকা (মান্দ্রাজ ১৯১৫) প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসন" নামক ইংরেজি গ্রন্থেও (লণ্ডন, ১৯১৭) "শাস্ত্র"-সাহিত্যের নজির অনেক আছে। সম্প্রতি হিল্লেব্রাণ্ট প্রণীত "আল্ট্‌-ইণ্ডিশে পোলিটিক" অর্থাৎ "প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব" নামক গ্রন্থেও (য়েনা ১৯২৩) এই ধরণের সমর বিষয়ক সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বৃত্তান্ত বিষয়কগ্রন্থে এই ধরণের সাহিত্য এখনো বিনা সন্দেহে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মনু, মহাভারত, শুক্র ইত্যাদির বচন কোন্ রাজবংশ সম্বন্ধে খাটে? এই

প্রশ্নের জবাব দিতে অসমর্থ বলিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের কোনো অধ্যায়েই প্রাচীন ভারতীয় "সাহিত্যে"র প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে না। হিন্দু সমর-শাসন সম্বন্ধেও কোনো সাক্ষ্য এই সকল গ্রন্থ হইতে লওয়া হইল না।

(২)

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের শাসন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এক বস্তু, আর রাষ্ট্র সম্বন্ধে মত, রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে চিন্তা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক উপদেশ আর এক বস্তু। প্রথম কথা ইতিহাসের অন্তর্গত; দ্বিতীয় কথা দর্শনের অন্তর্গত।

ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থের রাষ্ট্র-বিষয়ক অধ্যায় এবং শ্লোকগুলাকে সম্প্রতি রাষ্ট্র সম্বন্ধে হিন্দুমত, হিন্দু চিন্তা অথবা হিন্দু দর্শনরূপে গ্রহণ করিতেছি। এই "দর্শনে"র আলোচনার ভিতর "আদর্শ" কতখানি অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার, "ভবিষ্যদে"র জল্পন-কল্পন এবং ভাবুকতা কতখানি আছে কে জানে? আবার এই "দর্শনে"র উপর যে বাস্তব ইতিহাসের দাগ বা ছায়া নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে?

যতদিন পর্য্যন্ত "সাহিত্য" গ্রন্থের "ইতিহাস বনাম দর্শন" মামলা নিষ্পত্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন বুঝিবার সময় এই সমুদয়ের আওতা হইতে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"কে মৌর্য্যভারতের আবহাওয়ায় ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠিবে,—লড়াই সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে সকল কথা আছে সে সব কি চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক ইত্যাদির সেনাপতিরা মানিয়া চলিতেন? না জার্ম্মান সমর-পণ্ডিত ক্লাউজেহ্বিট্‌স্ প্রণীত "সমর" নামক গ্রন্থ অথবা ইংরেজ সেনাপতি হ্ব্যাল্‌থাম প্রণীত "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স অব্ ওয়ার" অর্থাৎ "সমর-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ (লণ্ডন ১৯১৪) ইত্যাদির মতন "অর্থশাস্ত্রে" ও সঙ্কলন কর্ত্তার স্বাধীন মতামত আলোচিত হইয়াছে? মৌর্য্য শাসনের দোষগুণ "সমালোচনা" করিবার দিকে কৌটিল্যের মাথা একদম খেলে নাই কি?

যাহা হউক, "অর্থশাস্ত্রে" সমর সম্বন্ধে যে সকল তথ্য ও মতামত আছে, সেই বিষয়ে বর্ত্তমান গ্রন্থের আকারের একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। রণ-নীতি যাঁহাদের দখলে নাই তাঁহারা কৌটিল্য বুঝিবেন না।

সম্পূর্ণ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

বারো মাস্যা

সাধারণতঃ কৃষকগণ এই গানকে "বারা'সে" বা "বারা'স্যা" বলে। বারাস্যার বহুল প্রচলন দেখা যায়। ধান-পাট নিড়ানের সময়, কাটার সময় ও ধোওয়ার সময় এই গানসমূহে পল্লীমাঠ মুখরিত হইয়া উঠে। বারাস্যা পল্লীগানের এক শক্তিশালী অঙ্গ। বারাস্যা সাধারণতঃ বিরহ, মিলন প্রভৃতি প্রণয় অবস্থার বিষয় লইয়া রচিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই ধরণের গান প্রকাশ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে আশানুরূপ গান পাওয়া গেলে অধিক সংখ্যক লোক নিয়োজিত হইবে শুনা যাইতেছে। দেশে যথেষ্ট গান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সংগ্রাহকের অভাব। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতকর বিভাগটী যাহাতে অকালে নষ্ট না হইয়া যায়, তাহার দিকে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, যাহার যা শক্তি সেই শক্তি অনুসারে পল্লীগান প্রকাশের চেষ্টা করিবেন। নিম্নে একটী গান দিলাম—

অগ্রাণ মাসে নূতন খানা, পুষ মাসে হয় 'নায়ার বাণা' (?)
মাঘ মাস্যা শীত নারীর বুকেতে, কত পাষাণ বেঁধেছো সাধু বিদ্যাশে ॥
ফাল্‌গুণ মাসে দ্বিগুণ জ্বালা, চৈত্র মাসে শরীর কালা,
সহেনা দুরন্ত জ্বালা নারীর বৈশাখে, হারে বৈশাখে ॥
জ্যৈষ্টি মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ় মাসে নুতন জল,
শ্রাবণ মাস গেল নারীর জিয়ার, হারে জিয়ার ॥
ভাদ্দোর মাসে তালের পিঠা, আশ্বিন মাসে শসা মিঠা,
কার্ত্তিক মাসো গেল নারীর কাতরে, হারে কাতরে ॥
বারো মাস পূর্ণ হ'ল, নারীর সাধু আশে আ'লো
এলো সাধু র'লো কার বা মন্দিরায়, হারে মন্দিরায় ॥
চাকুরে সোয়ামী যার, এনা দুষ্‌কের কপাল তার,
বচ্ছর অন্তে একদিন আসে নারীর মন্দিরায়, হারে মন্দিরায় ॥
হাল্যাচাষা স্বামী যার, কি না সুখের কপাল তার,
সন্ধ্যা লাগ্‌লে আস্যা বসে নারীর মন্দিরায়, হারে মন্দিরায় ॥ *

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

* পাবনা, পোঃ খলিলপুর, গ্রাম মুবারীপুরনিবাসী মুহম্মদ ছমির উদ্দিন মণ্ডল সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। ম.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

দক্ষিণেশ্বরে মণিরামপুর ও বেলঘরের ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নিজচরিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে, কখনও দাঁড়াইয়া কখনও বসিয়া, ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার ১০ই জুন ১৮৮৩ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা-পঞ্চমী, বেলা ১০টা হইবে। রাখাল, মাষ্টার, লাটু, কিশোরী, রামলাল, হাজরা প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

ঠাকুর নিজের চরিত্র, পূর্ব্ব কাহিনী, বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ওদেশে ছেলে বেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভাল বাসত। আমার গান শুন'ত, আবার লোকদের নকল ক'র্‌তে পারতুম সেই সব দেখ'ত ও শুন'ত। তাদের বাড়ীর বৌরা আমার জন্য আবার জিনিস রেখে দিত, কিন্তু অবিশ্বাস ক'রত না; সকলে দেখ'ত যেন বাড়ীর ছেলে।

"কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভাল সংসার দে'খলে আনাগোনা করতাম। যে বাড়ীতে দুঃখ বিপদ দেখ্‌তুম, সেখানে থেকে পালাতুম।

"ছোকরাদের ভিতর দু একজন ভাল লোক দেখলে খুব ভাব করতুম। কারু সঙ্গে স্যাঙ্গাত পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা খুব বিষয়ী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে; এসে বলে, ওমা পাঠশালেও যেমন দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখ্‌ছি।

"পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক্ ধাঁধা লাগ'ত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।

"সদাব্রত অতিথি শালা যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম; গিয়ে অনেক ক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তুম।

"কোন-খানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢংকরে প'ড়ত, তা হলে তার নকল করতুম আর অন্য লোকদের শুনাতুম।

"মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম; তাদের কথা, সুর, নকল করতুম। কড়েরাঁড়ি বাপকে শুর দিচ্ছে যা—ই—। মাগীরা ডাক্‌ছে 'ও তপসে মাছ ওয়ালা।' নষ্ট মেয়ে বুঝ্‌তে পারতুম; বিধবা সোজা সিঁতে কেটেছে আর খুব অনুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখ্‌ছে। লজ্জা কম, বস্‌বার কমই আলাদা।

"থাক বিষয়ীদের কথা।

রামলালকে গান গাহিতে বলিতেছেন। রামলাল গান গাহিতেছেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে।]

গান

১ম। কে রণে নাচিছে বামা নীরদ বরণী,
শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নব নলিনী।

এই বার শ্রীযুক্ত রামলাল রাবণ বধের পর মন্দোদরীর বিলাপ—গান গাহিতেছেন।

২। কি করলে হে কান্ত অবলারই প্রাণকান্ত,
হয়না শান্ত এ প্রাণান্ত বিনে।

শেষ গানটী শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর বলছেন আমি ঝাউ তলায় বাহ্যে করতে গিয়ে শুনেছিলাম নৌকার মাঝি নৌকাতে ঐ গান গাইছে। ঝাউতলায় যতক্ষণ বসে ছিলাম খালি কেঁদেছি; আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এল।

৩। শুনেছি রাম তারক-ব্রহ্ম, মানুষ নয় রাম জটাধারী।
পিতে কি নাশিতে বংশ সীতে তার করেছ চুরি॥

অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে রথে বসাইয়া মথুরায় লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া গোপীরা রথ চক্র আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, ও কেহ রথচক্রের সামনে শুইয়া পড়িয়াছেন। তাঁরা অক্রুরকে দোষ দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের ইচ্ছায় যাইতেছেন তাহা জানেন না। এইবার সেই ভাবের গান।

৪। ধোরোনা ধোরোনা রথ চক্র, রথ কি চক্রে চলে,
যে চক্রের চক্রী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। গোপীদের কি ভালবাসা, কি প্রেম! শ্রীমতী স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র এঁকেছেন কিন্তু পা আঁকেন নাই; পাছে তিনি মথুরায় চলে যান।

"আমি এ সব গান ছেলে বেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বল'ত আমি কালীয় দমন যাত্রার দলে ছিলাম।

একজন ভক্ত নূতন উড়ণি গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। রাখালের বালকস্বভাব, কাঁচি এনে তাঁর চাদরের ছিলা কাটতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, কেন কাটছিস্। থাক্না, শালের মত বেশ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ গা এর কত দাম? তখন বিলাতী চাদরের দাম কম ছিল। ভক্তটী বলিলেন, একটাকা ছয় আনা জোড়া। ঠাকুর বলিতেছেন, বল কি গো,—জোড়া একটাকা ছয় আনা?

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তটীকে বলিতেছেন, "যাও গঙ্গা নাও গে; এঁকে তেল দেরে।

স্নানান্তর তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাক হইতে একটী আম লইয়া তাহাকে দিলেন বলিতেছেন. এই আমটী একে দিই তিনটী পাশ করা। আচ্ছা, তোমার ভাই এখন কেমন?

ভক্ত। হাঁ, তাঁর ঔষধ ঠিক পড়ছে এখন খাটলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার একটী কর্ম্মের যোগাড় করে দিতে পার। বেশ ত তুমি মুরুব্বি হবে।

ভক্ত। স্বভাব ভাল হলে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মণিরামপুর ভক্ত সঙ্গে গৃহস্থাশ্রম কথা প্রসঙ্গে

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটীতে একটু বসিয়া আছেন। এখনও বিশ্রাম করিতে অবসর পান নাই। ভক্তদের সমাগম হইতে লাগিল। প্রথমে মণিরামপুর হইতে একজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; P. W. D. তে কাজ করিতেন এখন পেন্‌সন পান, একটী ভক্ত তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছেন। ক্রমে বেলঘরে হইতে একদল ভক্ত আসিলেন। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তরাও ক্রমে আসিলেন।

মণিরামপুরের ভক্ত-গণ বলিতেছেন। আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, না, না, ওসব রজোগুণের কথা—'উনি এখন ঘুমবেন'!

চাণক মণিরামপুর এই নাম শুনিয়া ঠাকুরের বাল্য সখা শ্রীরামকে উদ্দীপন হইয়াছে।

ঠাকুর বলিতেছেন, শ্রীরামের দোকান তোমাদের ওখানে। ওদেশে শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল।

মণিরামপুরের ভক্তেরা বলিতেছেন। কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায় একটু আমাদের দয়া করে বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটু সাধনভজন করতে হয়। দুধে মাখন আছে শুধু বললে হয় না। দুধকে দৈ পেতে মন্থন করে মাখম তুলতে হয়। তবে মাঝে মাঝে একটু নির্জ্জন চাই। দিন কতক নির্জ্জনে থেকে ভক্তি লাভ করে তার পর যেখানে থাক। জুতা পায়ে দিয়ে কাঁটা বনেও অনায়াসে যাওয়া যায়।

[উপায় :—বিশ্বাস, নামগুণ কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ, ব্যাকুলতা।]

"প্রধান কথা, বিশ্বাস। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।' বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই।

মণিরামপুর ভক্ত। আজ্ঞে, গুরু কি প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেকের প্রয়োজন আছে; তবে গুরু বাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবেরা বলে 'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব।'

"তাঁর নাম সর্ব্বদাই করতে হয়। কলিতে নাম মাহাত্ম্য। অন্ন গত প্রাণ, তাই যোগ হয় না। তাঁর নাম করে হাত তালি দিলে পাপ পাখী পালিয়ে যায়।

"সৎসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল হাওয়া পাবে ; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে।

"ঢিমে তেতালা হলে হয় না। যাদের সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে তারা বলে 'হবে, কখন না কখন ঈশ্বরকে পাব'।

"আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন বৎসর আগেই তার হিস্সে ফেলে দেয়।

"মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুষি দিয়ে গেছে। যখন চুষি ফেলে চীৎকার করে ছেলে কাঁদে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে করে মাই দেয়। এইসব কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

"কলিতে বলে একদিন, একরাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"মনে অভিমান করবে আর বলবে, তুমি সৃষ্টি করেছ দেখা দিতে হবে!

"সংসারেই থাক আর যেখানেই থাক ঈশ্বর মনটী দেখেন। বিষয়াসক্তি যেমন ভিজে দেশালাই, যত ঘস জ্বলে না। একলব্য মাটীর দ্রোণ সামনে রেখে, অর্থাৎ নিজের গুরুর মূর্ত্তি-সামনে রেখে, বাণ শিক্ষা করেছিল।

"এগিয়ে পড় ; কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে দেখেছিল চন্দন কাট, রূপার খনি, সোণার খনি। আরো এগিয়ে গিয়ে দেখলে, হীরে মাণিক! যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেলের ঘরের ভিতরে রয়েছে। ভিতরে তেমন আলো নাই আবার বাহিরের কোন জিনিস দেখতে পারছে না। জ্ঞান লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাঁচের ঘরের ভিতরে আছে। ভিতরেও আলো বাহিরেও আলো! ভিতরের জিনিস দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিস ও দেখতে পায়।

[যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যশক্তি। একম্ এব অদ্বিতীয়ম্।]

"এক বই আর কিছু নাই, সেই পরব্রহ্ম। 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন ততক্ষণ দেখান্ যে আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় করছেন। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যা-শক্তি। একজন রাজা বলেছিল যে আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বল্লে, আচ্ছা তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে। খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে যে সে এসে কেবল দুটা আঙ্গুল ঘুরাচ্ছে, আর বল্ছে রাজা এই দেখ এই দেখ। রাজা অবাক হয়ে দেখছে। খানিক ক্ষণ পরে দেখে, দুটা আঙ্গুল একটা আঙ্গুল হয়ে গেছে। যাদুকর একটা আঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে আবার বলছে, রাজা এই দেখ রাজা এই দেখ! অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথমে দুটা বোধ হয়, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না। অভেদ। এক। যে একের দুই নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেলঘরের ভক্ত সঙ্গে

বেলঘরে হইতে ৺গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তরা আসিয়াছেন। ঠাকুর যে দিন তাঁর বাটীতে শুভাগমন করিয়া ছিলেন সে দিন গায়কের 'জাগ জাগ জননী' এই গান শুনিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন। গোবিন্দ সেই গায়কটীকেও আনিয়াছেন। ঠাকুর গায়ককে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ও বলিতেছেন, তুমি কিছু গান কর। গায়ক গান গাইতেছেন।

গান

১। দোষ কারু নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
২। ছুঁসনারে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যদি বলিস ওরে শমন জাত গেল কিসে ?
কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
৩। জাগ, জাগ, জননী।
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন,
গত হ'ল কুল-কুণ্ডলিনী॥
স্বকার্য্য সাধনে চল মা শিরোমধ্যে
পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,
করি ষড়চক্র ভেদ, ঘুচাও মনের খেদ চৈতন্যরূপিণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই গানে ষড়চক্র ভেদের কথা আছে। ঈশ্বর বাহিরেও আছেন আবার অন্তরেও আছেন। তিনি ভিতরে থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন। ষড়চক্র ভেদ হ'লে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এরই নাম ঈশ্বর দর্শন।

"মায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। রাম, লক্ষ্মণ, আর সীতা, এক সঙ্গে যাচ্ছেন; সকলের আগে রাম, মাঝে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ যেমন সীতা মাঝে থাকাতে রামকে দেখতে পাচ্ছেন না; তেমনি মাঝে মায়া থাকাতে জীব ঈশ্বর-দর্শন করতে পাচ্ছে না।

(মণি মল্লিকের প্রতি) "তবে ঈশ্বরের কৃপা হলে, মায়া দ্বার ছেড়ে দেন"। যেমন দ্বারয়ানরা বলে, 'বাবু হুকুম করে দাও ওকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।

মণিলাল মল্লিক ব্রাহ্মভক্ত।

[জগৎ কি স্বপ্নবৎ ? বেদান্ত ও পুরাণ। জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগ।]

"বেদান্ত মত, আর পুরাণ মত। বেদান্ত মতে বলে, এই সংসার ধোঁকার টাটী; অর্থাৎ

জগৎ সব ভুল, স্বপ্নবৎ। কিন্তু পুরাণ মত বা ভক্তি শাস্ত্র বলে, যে ঈশ্বরই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। তাঁকে অন্তরে বাহিরে পূজা করো।

"যতক্ষণ 'আমি' বোধ তিনি রেখেছেন, ততক্ষণ সবই আছে; আর স্বপ্নবৎ বলবার যো নাই। নীচে আগুনের জ্বাল আছে তাই হাঁড়ীর ভিতরে ডাল, ভাত, আলু, পটল সব টগ বগ করছে। লাফাচ্ছে; আর যেন বলছে, আমি আছি আমি লাফাচ্ছি। শরীরটী যেন হাঁড়ী; মন বুদ্ধি, জল; ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন ডাল ভাত আলু পটল; অহং যেন তাদের অভিমান, আমি টগ্ বগ্ করছি; আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।

"তাই ভক্তি শাস্ত্রে, এই সংসারকেই মজার কুটি বলেছে। রাম প্রসাদের গানে আছে, এই সংসার ধোঁকার টাটী; তারই একজন জবাব দিয়েছিল, এই সংসার মজার কুটি। 'কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়'। ভক্ত দেখে, যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন। তিনিই জীব, তিনিই জগৎ হয়েছেন। 'ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ' এক দেখে। কোন ভক্ত সমস্ত রাম ময় দেখে। রামই সব হয়ে রয়েছেন। কেউ রাধাকৃষ্ণময় দেখে। কৃষ্ণই এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সবুজ চশমা পর্‌লে যেমন সব সবুজ দেখে।

"তবে ভক্তিমতে শক্তি বিশেষ। রামই সব হয়েছেন, কিন্তু কোন খানে বেশী শক্তি আর কোন খানে কম শক্তি। অবতারেতে তিনি এক রকম প্রকাশ, আবার জীবেতে এক রকম। অবতারেরও দেহবুদ্ধি আছে; শরীর ধারণে মায়া। রাম সীতার জন্য কেঁদে ছিলেন। তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কানা মাছি খেলে। কিন্তু মা ডাকলেই খেলা থামায়। জীবের আলাদা কথা। যে কাপড়ে চোখ বাঁধা, সেই কাপড়ের পিটে আট্‌টী ইস্‌কুরুপ দিয়ে বাঁধা। অষ্ট পাস। লজ্জা, জুগুপ্সা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, এই সব। এই অষ্ট পাস্ গুরু না খুলে দিলে হয় না।

বেলঘরের ভক্ত। আপনি আমাদের কৃপা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সকলের ভিতরেই তিনি রয়েছেন। তবে গ্যাস কোম্পানিকে আরজি কর। তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, আর গ্যাস জ্বালা হবে।

"তবে ব্যাকুল হয়ে আরজি করতে হয়। এমনি আছে যে, তিন টান এক সঙ্গে হলে ঈশ্বর দর্শন হয়। মায়ের সন্তানের উপর টান, সতীস্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।

"ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। বেহুলার গানের কাছে, জাতসাপ স্থির হয়ে শুনে; কিন্তু কেউটে নয়। ঠিক ভক্তের আর একটী লক্ষণ, ধারণা-শক্তি হয়। শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়েনা। কিন্তু কালি মাখান কাঁচের উপর বেশ ছবি উঠে; যেমন ফটোগ্রাফ। ভক্তিরূপ কালি।

"আর একটী লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়; তার কাম জয় হয়। গোপীদের কাম হত না।

"তা তোমরা সংসারে আছো, তা হলেই বা। এতে সাধনের আরও সুবিধা, যেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা। শব সাধন করে; মাঝে, মাঝে, শবটা হাঁ করে, ভয় দেখায়। তাই চাল ছোলা রাখতে হয়; তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটী ঠাণ্ডা হলে, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তাই পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করে দিতে হয়; তবে সাধন ভজনের সুবিধা হয়।

[ত্যাগীভক্ত ও সংসারীভক্ত। মৌমাছি ও সাধারণ মাছি]

"যাদের ভোগ একটু বাকি আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। নিতাইয়ের ব্যবস্থা ছিল, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল 'হরি বোল'।

"ঠিক ঠিক ত্যাগীর আলাদা কথা; মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে ব'সবে না। চাতকের কাছে 'সব জল ধুর্'; কোন জল খাবে না, কেবল স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে! ঠিক ঠিক ত্যাগী অন্য কোন আনন্দ নেবে না; কেবল ঈশ্বরের আনন্দ। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে, ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগী সাধু যেন মৌমাছী। গৃহীভক্ত যেমন এই সব মাছি; সন্দেশেও বসে, আবার পচা ঘায়েও বসে।

"তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। সব লোক বাগান দেখেই সন্তুষ্ট; বাগানের কর্ত্তার অনুসন্ধান করে দু একজন। জগতের সৌন্দর্য্যই দেখে; জগতের কর্ত্তাকে খুজেনা।

[সপ্তভূমি (seven mental planes) ও ষড়চক্র।]

(গায়ককে দেখাইয়া) "ইনি ষড়চক্রের গান গাইলেন। সে সব যোগের কথা। হঠ যোগ, আর রাজ যোগ। হঠ যোগে শরীরের কতকগুলো কসরৎ করে, উদ্দেশ্য সিদ্ধাই; দীর্ঘ আয়ু হবে, অষ্ট সিদ্ধি হবে, এই সব উদ্দেশ্য। রাজ যোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। রাজ যোগই ভাল।

"বেদের সপ্তভূমি, আর যোগ শাস্ত্রের ষড়চক্র, অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিন ভূমি; আর ওদের মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিন ভূমিতে অর্থাৎ লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে মনের বাস। মন যখন চতুর্থ ভূমিতে উঠে, অর্থাৎ অনাহত পদ্মে, জীবাত্মাকে শিখার ন্যায় দর্শন হয়। আর জ্যোতি দর্শন হয়। সাধক বলে, একি! একি! পঞ্চম ভূমিতে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরের কথা শুনতে ইচ্ছা হয়, আর ঈশ্বরের কথা কইতে ইচ্ছা হয়; বিশুদ্ধচক্র। ষষ্ঠ ভূমি আজ্ঞাচক্র; সেখানে মন গেলে ঈশ্বর দর্শন হয়। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো; ছুঁতে পারেনা, মাঝে কাঁচ ব্যবধান

আছে। জনক রাজা পঞ্চম ভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। জনক রাজা কখন পঞ্চম ভূমি কখন ষষ্ঠ ভূমিতে থাকতেন।

"ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তম ভূমি। মন সেখানে গেলে, মনের লয় হয়, নানাজ্ঞান চলে যায়, বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছিল, বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে। সপ্তম ভূমিতে, জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়; বাহ্য শূন্য, দেহ বুদ্ধি চলে যায়, একুশ দিনে মৃত্যু হয়!

"কিন্তু কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না।

"যে ঈশ্বর লাভ কোরেছে; তার লক্ষণ আছে। সে হয়ে যায়, বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিচাশবৎ। আর তার ঠিক বোধ হয়, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; তিনিই কর্ত্তা আর সকলেই অকর্ত্তা। শিখরা যেমন বলেছিল, পাতাটি নড়ছে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, এই বোধ। তাঁতি যেমন বলেছিল, রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা; রামের ইচ্ছাতেই, ডাকাতি হ'লো; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাত ধরা পড়ল; রামের ইচ্ছাতেই আমাকেও পুলিসে নিয়ে গেল; আবার রামের ইচ্ছাতেই আমাকে ছেড়ে দিল।

সন্ধ্যা আগত প্রায়, ঠাকুর একবারও বিশ্রাম করেন নাই। ভক্ত সঙ্গে অবিশ্রান্ত হরি কথা হইতেছে। এইবার প্রণাম করিয়া, ভক্তেরা ঠাকুর বাড়ীতে ঠাকুরদের দর্শন করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

শ্রীম——

রাজ-সন্ন্যাসী

তখনো বাতাসে ভাসে বিজয়-কৌতুক;
পূর্ণগর্ব্ব-প্রশংসায় সকলের বুক।
অপূর্ব্ব-কৌশলী রথী! জননীর প্রাণ,
আশার-তড়িৎস্পর্শে দ্রুত স্পন্দমান।
ধন্য বীর! অকস্মাৎ—বজ্রহানি সাধে
আকাশ ফাটিয়া পড়ে তীব্র আর্ত্তনাদে,
"নাই, নাই!" অসম্ভব! একি সত্য শুনি,
মহা-ভারতের যুদ্ধে পড়িল ফাল্গুনী?
দ্বৈপায়ন গেয়েছিল দ্বাপরের গাথা,
এ কাব্যের রচয়িতা স্বয়ং বিধাতা।

সহিয়া যে জন্ম-জন্ম তপস্যার ক্লেশ,
যুগান্তরে পেয়েছিল, এ দুর্ভাগ্য দেশ,
দরিদ্রের নিধি এক, দেবতার দান—
এত শীঘ্র কেড়ে নিলে তা-ও, ভগবান!
আশা আশঙ্কার মাঝে আসিল আষাঢ়,
ধূসর গম্ভীর ঘন লয়ে মেঘভার,
স্নিগ্ধ-গুরু। আর্ত্ত দেশ চেয়েছিল জল,
অশনির উপহার লভিল কেবল।
অলক্ষ্যের অলক্ষণা হাসিল নিদয়া,
না আসিতে আগমনী আসিল বিজয়া?

তবু আজ, শুধু অশ্রু, শুধু দীর্ঘশ্বাস
নহে। তুচ্ছ করি অদৃষ্টের পরিহাস,
তোল জয়ধ্বনি, বল, "নির্ম্মম মরণ,
তোমার সকল শক্তি করিয়া হরণ,
অমর সে আজ! অফুরন্ত প্রাণ তার,
জীবনে জীবনে করে জীবন-সঞ্চার,
তারি আশা স্পন্দে প্রতি বুকের ভিতরে,
লক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিতেছে তার কণ্ঠস্বরে।
এক চিত্ত, জীবনের আড়াল সরায়ে,
নিখিল চিত্তের মাঝে পড়িল ছড়ায়।"

একদা শুনিলে কবে হেমন্ত-নিশীথে,
নীরব আহ্বান জননীর! সে ইঙ্গিতে
ভরা ছিল কি বেদনা, কত না ক্রন্দন!
সৌভাগ্যের, সম্পদের সহস্র বন্ধন
বাঁধিতে ত পারিল না তাই। মায়াপাশ
কাটিতে যে পড়িল না একটি নিশ্বাস;
বিশ্বের অঙ্গনে তুমি দাঁড়াইলে আসি,
সর্ব্বরিক্ত, গর্ব্বহারা, হে রাজসন্ন্যাসী!
সে মহাবৈরাগ্যে নাহি ছিল কোন ক্ষোভ,
সে অতুল ত্যাগে নাহি ছিল কোন লোভ,
শুধু এক আশা ছিল, শুধু এক ব্যথা,
চেয়েছিলে স্বদেশের তুমি স্বাধীনতা।

শুধু শব্দ, শুধু ছন্দ, শুধু ভাব নহে,
আপনার প্রাণ দিয়া, অনন্ত আগ্রহে,
জীবনের মহাকাব্য করিলে রচনা।
সারা ভারতের তাই সকল কল্পনা
সেই সুরে আবর্ত্তিত। স্বরাজের রবি,
রাষ্ট্রনীতিবিদ্ নহ শুধু, তুমি কবি!
প্রতি কথা, প্রতি কায, হৃদয়ের রাগে
বিচিত্র হইয়া উঠে; প্রাণতটে লাগে
ব্যাগ্র মরমের ঢেউ। ডেকে-ডেকে বাজা,
তাই বাঁশী কাড়ে মন, হৃদয়ের রাজা!

তুমি ছেড়ে দিলে, তাই, ধরিল আঁকড়ি
তোমারেই তারা, নেতারূপে নিল বরি;
অস্থি দিয়া, শক্তি দিয়া, গড়িলে শায়ক
তাই সে দুর্জ্জয় হল, হে মহানায়ক,
বজ্রের মতন; গর্জ্জি উঠি বার বার
তোমার অপূর্ব্ব অস্ত্র হল দুর্নিবার,
চূর্ণ করি ক্ষমতার দম্ভ-অহঙ্কার!

তুলে নিলে নিদারুণ বেদনার ভার,
আপন মস্তকে। প্রতি শিরা-উপশিরা,
আঘাতে আঘাতে হল যন্ত্রণা-অধীরা।

কি তীব্র সে অনুভূতি! আজি হা-হা হানে
ব্যাকুলতাময় সেই বাণী প্রাণে প্রাণে—
"এ ভারত সুবিরাট এক কারাগার,
নহি বন্দী, তবু লৌহ-শৃঙ্খলের ভার
সর্ব্ব-সঙ্গে করি অনুভব। কবে কবে,
চূর্ণ হবে এ বন্ধন, ওরে মুক্তি হবে?"

মুক্তি চেয়ে ছিলে তাই, মৃত্যু আসি ধীরে,
তাহার সান্ত্বনা-হস্ত বুলালো কি শিরে,
হে ব্যথিত বীর? জানি, নিশ্চিন্ত আরাম
সে তোমার নয়, বন্ধু! তাই কি মরিয়া,
মৃত্যুর অমৃত তুমি এলে বিতরিয়া
সারা দেশময়? শুধু সে তোমারি লাগি
নব-জাগরণে দেশ উঠিল যে জাগি।

উঠেছিলে লোকপ্রীতি দুর্জ্জয় শিখরে;
মেঘলোক—আর কিছু নাই তার পরে।
উঠিতে জানিতে ঊর্দ্ধে, নামিবার পথ
অজ্ঞাত তোমার। তাই হে চির-মহৎ,
শঙ্কর সে শিবলোকে রচিল পরম,
চির-বিশ্রামের তরে তোমার আশ্রম।

কেন? কেন? কেন? এই বৃথা প্রশ্নজাল
বুনে চলি। প্রাণ তার নিল মহাকাল,
সন্তানের দেহ কোলে, হেথা মহাকালী
তুলে নিল স্নেহে। তার জীবনের ডালি
দেওয়া হয়ে গেল। কিন্তু ওগো জন্মভূমি,
অশ্রুভরা সে মিনতি শুনেছিলে তুমি!—
"কিছুত চাহি না, যেন, জিতি আর হারি,
তোমারে স্বাধীন দেখে, মরিতে মা পারি!"
অপূর্ণ কি সাধ? তাই আজি মনে হয়,
এ বিশ্রাম মুহূর্ত্তের, মরণের নয়।
তাই ভাবি, সে আবার উঠিবে কি জাগি?
আবার সে স্বদেশের স্বাধীনতা লাগি,
সম্মুখে দাঁড়াবে আসি—নির্ভীক সুন্দর;
গম্ভীর নির্ঘোষে তার কম্বুকণ্ঠস্বর
নিনাদিত হবে, "বন্ধু, হও অগ্রসর।"
সে জীবন্ত বিশ্বাসের আগুনে তাতিয়া,
নিবন্ত জীবন পুন উঠিবে মাতিয়া
নূতন আগ্রহে; তার হৃদয়ের বেগে,
উদ্দাম আনন্দে মত্ত বয়ে যাবে জেগে
বদ্ধ কোটি প্রাণের প্রবাহ! শ্লথ গতি—
পথের নির্দ্দেশ আজ কর, সেনাপতি!
দূরে যাক দ্বিধা কর সন্দেহ ভঞ্জন,
আবার ফিরিয়া এস, হে চিত্তরঞ্জন!

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা——শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

(একাদশ গীত)

নারীগণ।

আমার ভরা কলসী বঁধু খালি করো না—
খালি করো না, খালি করো না; আমার নূতন সোহাগ-বারি গড়িও না।
ওপারে তুফান বঁধু সাঁ সাঁ সাঁ; এ পারে মিঠা হাওয়া বাহবা বা!
ওপারে উঠুক ঢেউ বারণ করো না কেউ; এ পারে বঁধুয়া জলে ঢেউ দিও না-
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না; মাঝ্ দরিয়ায় তরী ডুবিও না।
এ পারে উঠে গান, গুন্ গুন্ মৃদু তান, চিড়িয়া মিঠি বোলে
বঁধু বাধা দিও না, বাধা দিও না, বাধা দিও না॥

সুর——সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী।

স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

মিশ্র——খেম্‌টা।

•			০			১			২´		
{ ৳	।	রা ।	পপা	মা	পা ।	মা	-গা	রা II	পা	পা	-া
•	•	আ	মার্	ভ	রা	ক	ল্	সী	বঁ	ধু	•

৩　　　　　　০　　　　　　　১　　　　　　২´
। । রা | গা মা গা | (ন্সরা -গা -া I -রসন্‌া -সা -া)} |
• • খা লি ক রো না•• • • ••• • -

১　　　　২´　　　　৩　　　　০
রা -া -া I {া রা সা | রা মা মা | -া মা গা |
না • • • খা লি ক রো না • খা লি

২
মা ধা পা I া পা পপা | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া
ক রো না • আ মার্‌ ন্‌ ত ন্‌ সো হা গ্‌

১　　　　২´　　　　৩　　　　০
র্রা র্সা -া I ণা ণা ধা | (পা -া -া | -া -া -া
বা রি • গ ড়ি ও না •

১　　　　৩　　　　০　　　　১
| -া -া -া)} | পা া রা | পপা মা পা | মা -গা রা I
• • • না • আ মার্‌ ভ রা ক• ন্‌ সী

I পা পা -া | া া রা | গা মা গা | রা া রা I
বঁ ধু • • • খা লি ক রো না • ও

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I{র্রা র্রা -া | র্রা র্রা -া | র্রা র্রা -া | -া -া র্সা I
পা রে • তু ফা ন্‌ বঁ ধু • • • সাঁ

৩　　　　০　　　　১
I -না না -র্সা | র্সা -া -া | -া -া -া | া া র্সা I
• সাঁ • সাঁ • • • • • • • • এ

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া | -র্রা -া ণা I
পা রে • মি ঠা • হাও য়া • • • বা

২´ ৩ ০ ১
I র্সা ণা -ধা | (পা -া -া | -া -া -া | া া রা)}I
হ বা • বা • • • ◦ • • • "ও"

৩ {০ ১ ২´
| পা া পা | {পা পা -া | পা পা -া I পা -া -া |
বা • ও পা রে • উ ঠু ক্ ঢে • •

৩ ০ ১ ২´
| ধা া মা | মমা মা -া | গা গা -া I রা -া -া |
উ • বা রণ্ ক • রো না • কে • উ

৩ ০ ১
| া া সা | সা সা -া | রা রা রা I -া রা গা |
◦ • এ পা রে ◦ বঁ ধু য়া • জ লে

| মা -া মা | ধা পা -া | পা -া পা I র্সা র্সা -া |
ঢে উ দি ও না • ঢে উ দি ও না •

৩ ০ ১ ২´
| ণা -া ণা | ধা পা -া | মা -া মা I মা মা -া |
ঢে উ দি ও না • মা ঝ্ দ রি য়া য়

৩ ০ (১ ২´
| র্সা র্সা -া | ণা ণা ধা | (পা -া -া I -া -া -া |
ত রী • ডু বি ও না • • • • •

৩ ১ ২´ ৩
| -া া পা)}| পা া রা I পপা মা পা | মা -গা রা |
• • "ও" না • আ মার্ ভ য়া ক ল্ সী

২´
| পা. পা -া | া -া রা I গা মা গা | রা া রা
বঁ ধু • • • খা লি ক রো না • এ

০ ১ ২´ ৩
| {রা গমপধা -ণা | ণা ণা -া I ণা -া -া | া া ণা |
পা রে০০০ ০ ও ঠে ০ গা ০ ন্ ০ ০ শু

১
| র্রা র্সা র্সা | ণণা ণা -র্সা I র্সা -া -া | া া ণা |
ন শু ন মৃ দু ০ তা ০ ন্ ০ ০ চি

| ণা ণা -া | ধা ধা ধা I পা পা পা | পা পা -া |
ড়ি য়া ০ মি ঠি বো লে বঁ ধূ বা ধা ০

০ ১ ২´ ৩
| পা পা -মা | পঃ -ধাঃ -া I -া -া -পমা | মা মা -া |
দি ও ০ না ০ ০ ০ ০ ০০ বা ধা ০

| মা মা -জ্ঞা | পা -া -া I -া -া -মজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া |
দি ও ০ না ০ ০ ০ ০ ০০ বা ধা ০

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞা রজ্ঞা -রা | (সা -া -া I -া -া -া | -া া রা)}
দি ও০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ "এ"

সা া রা I পপা মা পা I মা -গা রা | পা পা -া |
না ০ আ মার্ ভ রা ক ল্ সী বঁ ধু ০

| া া রা I গা মা গা | রা -া -া | -া রা সা |
০ ০ খা লি ক রো না ০ ০ ০ খা লি

১ ২´
| রমা ধা পা I -া -া -া II II
ক০ রো না ০ ০ ০

১। সুরের পরিচয় সম্বন্ধে ১ম গীতের শেষে দ্রষ্টব্য।
২। তাল সম্বন্ধে ২য় গীতের শেষে দ্রষ্টব্য।

——লেখিকা।

হিন্দু মুসলমান

(১)

আমি চিনি তব আফগানী তোপ, তাস্কানী তলোয়ার,
তুমি যেন মোর গিহ্লোটী খাঁড়া, বর্শার খরধার।
ঢুকেছ আমার রাণার ভবনে হাহাকারে গৃহ ভরি,
আমিও তোমার দিল্লী প্রাসাদে ঢুকিয়াছি জোর করি।
কবর চিতায় স্মৃতি কঙ্কাল রাখিয়াছি আমানৎ,
সজীব সাক্ষী সেতারা চিতোর টিরাবরি পাণিপথ।
শোণিত সরিতে এক ঘাটে দোঁহে নিত্য করেছি স্নান
ভারত মাতার দুই সন্তান হিন্দু মুসলমান।

(২)

তুমি এসেছিলে প্রবাসী সোদর নিতে আপনার ভাগ,
মন্দির গায়ে মসজিদ তুলে খড়ি ধরে দিয়ে দাগ।
জোর করে নিতে, জোর করে দিতে, দুজনার ছিল যাহা,
ভাগাদি বিবাদ চিরদিন আছে নূতন নহে ত তাহা।
একসাথে ভোগ করিতে চেয়েছ, চাহনি রাখিতে দূরে,
ভাই ভাই হয়ে থাকিতে চেয়েছ এক জননীর পুরে।
ভাব নাই পর, কর নাই ঘৃণা, দাওনি নিয়েছ স্থান,
ভারত মাতার দুই সন্তান হিন্দু মুসলমান।

(৩)

আঁজল ভরিয়া আঙুর দিয়েছ পেস্তা বস্তা ভবে,
ডাল ভেঙ্গে নেছ হিঙ্গুল কমলা আম জাম কুল পেড়ে।
আদর করিয়া আতর দিয়াছ গোলাপ দিয়াছ ঢেলে
রোষ ভরে গাছ কাটিতে গিয়েছ বেল চাঁপা নাহি পেলে।
মণি হার গলে দোলায়ে দিয়েছ যাচিয়া নিয়েছ রাখী
এ সব বদলে শাল মখমল আপনি দিয়াছ ডাকি।
লড়েছি যতই ভিতরে ভিতরে ততই বেড়েছে টান
ভারত মাতার দুই সন্তান হিন্দু মুসলমান।

(৪)

তোমার হাফিজ, ফেরদৌসী সাদী, খৈয়ুম নিজামী জামী,
দিয়াছ রত্ন করিয়া যত্ন কোহিনূর চেয়ে দামী।
দিয়াছ কোরাণ মহামানবের চাপিয়াছ নব দাবী
নিয়েছ যা তার কতগুণ দেছ এখন নিয়ত ভাবি।
তোমার 'কবীরে' ছলিয়াছি আমি, আবার 'নানকে' তুমি
আজও 'আজমীর' দূর 'হিংলাজে' একই মৃত্তিকা চুমি।
যুদ্ধ করেছি ধরেছি মেরেছি আবার ধরেছি গান
ভারত মাতার দুই সন্তান হিন্দু মুসলমান।

(৫)

দুখে দুর্দিনে কেঁদেছি দুজনে দুজনের গলা ধরি
দেশের শত্রু দুজনে নেশেছি একসাথে সলা করি।
আমার লাগিয়া তুমি যুঝিয়াছ তোমার লাগিয়া আমি
সৌখ্য মোদের বক্ষ মোদের একই মোক্ষ কামী।
তোমার 'দরাফ' তব হরিদাস নিতি লভে মোর পূজা
স্নেহের টান যে অন্তরে আছে নিশিদিন যায় বুঝা
হিংসার বিষ কতকাল আর দুজনে করিব পান
ভারত মাতার দুই সন্তান হিন্দু মুসলমান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাহিত্য-বীথি

জাতিভেদ প্রবন্ধের একটা কৈফিয়ৎ

জাতিভেদের উৎপত্তির ও প্রসারের বিচারে যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রবন্ধের একটি মন্তব্য লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন ব্যক্তি লেখককে জানাইয়াছেন যে, সেই মন্তব্যটি সমাজ মেরামতের কাজে বাধা ঘটাইতে পারে। প্রবন্ধগুলি যে সমাজ মেরামতের জন্য নয়—উহাদের উদ্দেশ্য যে খাঁটি ইতিহাসটুকু ধরা, তাহা প্রথম প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা হইয়াছে। যে মন্তব্যটি লইয়া কথা উঠিয়াছে সেটি এই, যাহারা ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজের বাহিরের লোক, তাহাদের অনেকে নিজেদের সুবিধা খুঁজিয়া স্বেচ্ছায় ঐ সমাজের আওতায় আসিয়াছিল; এই বাহিরের দলের লোকেরা ব্রাহ্মণ্যবিধির অবিচারে ও অত্যাচারে ছোট জাতি হয় নাই। একথাটি যদি অস্বীকৃত হইতে না পারে, তবে ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে উদ্দিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা পুরা মাত্রায় সামাজিক অধিকার না পাইলে ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। আমার বাড়ীর পাশে যাহাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছি, তাহার অধিকার নাই যে সে জোর করিয়া আমার বাড়ীতে ঢুকিয়া আমার ঘরখানির অংশ-বিশেষ দখল করিবে। ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজে যে সকল দেবমন্দির গড়া হইয়াছে, তাহার ভিতরে বাহিরের দলের লোকদের জোর করিয়া ঢুকিবার অধিকার নাই। মন্দির যাঁহাদের গড়া, তাঁহাদের পক্ষে এমন স্বার্থ রক্ষার জন্য উচিত হইতে পারে—সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া; কিন্তু তাঁহাদের এবুদ্ধি না জাগিলে জোর করিয়া কেহ তাঁহাদিগকে নিজের সিদ্ধান্তের মতে কাজ করাইতে পারেন না। অন্য দলের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য প্রথাকে ষোল আনা অমান্য করিয়া নিজেদের জন্য সম্মানিত স্বাধীন ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু বল্‌শেভিকি রীতিতে নিজের স্বাধীনতার নামে পরের স্বাধীন বুদ্ধিকে গলা টিপিয়া মারিতে পারেন না! এই বাহিরের লোকেরা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় প্রজা, ও তাঁহাদের টাকায় নগরের পথ ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; এ হিসাবে অবশ্যই তাঁহারা রাষ্ট্রীয় প্রজার সকল অধিকার সমানে দাবি করিতে পারেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে পরের সামাজিক বা ধর্ম্মবিষয়ক ব্যবস্থার কোন সংশ্রব নাই।

সত্যনির্দ্ধারণের উপায়

সত্যনির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ধরিয়া চলা। যে সকল মত পুরুষ বিশেষের মাহাত্ম্যের জোরে বা নামের দোহাইয়ে চলে, অর্থাৎ যাহা লোকেরা প্রত্যক্ষ বিচারে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না, তাহা লোকে যত অবলম্বন না করে ততই জ্ঞানবিকাশের পক্ষে মঙ্গলকর। যে শ্রেণীর বিদ্যা একালে বিজ্ঞান নাম পাইয়াছে, সে বিদ্যা কোন পুরুষের নামের জোরে প্রতিষ্ঠিত নয়; কেবল সুবিধার জন্য কোন কোন তথ্য উহার প্রথম আবিষ্কারকের নামে পরিচিত হয়। ডারবিন ও তাঁহার পুর্ব্ববর্ত্তীরা যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে ধরিয়াছিলেন, তাহার তিলমাত্রও এপর্য্যন্ত অসত্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; তবে প্রমাণিত ঘটনাগুলি জুড়িয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা আন্দাজে এই সকল উপপত্তি গড়িয়াছিলেন, তাহার অনেক সমালোচনা হইয়াছে ও হইবে। বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে যাঁহারা শোনা কথার উপর নির্ভর করেন, ও এখনও যাঁহারা নামের দোহাই মানিয়া চলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ কলিকাতার একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে গোটাকতক নামের দোহাই জুড়িয়া লিখিতেছেন যে, ডারবিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের নির্দ্ধারিত ক্রমবিকাশ-বাদ নাকি একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইহাতে বিচলিত হইয়াছেন, ও এই পত্রিকায় প্রকাশিত "উৎপত্তির ইতিহাস"-নামক প্রবন্ধের লেখককে ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। এই পত্রিকায় নৃতত্ত্ব ব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, উহাতেই পরোক্ষভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর থাকিবে।

জীবন-সন্ধ্যায়

প্রাণে প্রাণে পুঞ্জ হয়ে ছিল
শত লক্ষ বেদনার ভার
জীবনের অনন্ত আগ্রহে
অন্তহীন ব্যথা ব্যর্থতার।
জীবনের বসন্ত-উদয়ে
যা-কিছু চেয়েছি যতদিন
সুখ-স্বপ্ন মরুর আগুনে
ব্যর্থতায় হয়েছে বিলীন।
কামনার পারুল-মুকুল
গন্ধামোদে উঠিয়াছে জাগি'
কতনা তরুণ হিয়া চাহি,'
একবিন্দু প্রেম-সুধা লাগি,'
নিষ্ফল বাসনারাশি মোর
অগ্নিদাহে গেছে ঝলসিয়া,
আকাঙ্ক্ষার মায়া-মরীচিকা
দূরান্তরে গিয়াছে সরিয়া।
শুধু তৃষ্ণা—মরু-বহ্নি-জ্বালা
আপনার ক্ষুদ্র বুকে বহি'
মরিয়াছি পুড়িয়া আপনি
আপনারি অগ্নিদাহে দহি'।
যাদেরে বেসেছে ভালো প্রাণ,
তাহারাই অবহেলা করি'
এ-বুকে আগুন জ্বেলে দিয়ে
দূর হ'তে দূরে গেছে সরি'।
আজি এই অপরাহ্ণ-বেলা
জীবনের দিগন্তে দাঁড়ায়ে
দাহ-শেষ ভস্মময় বুকে
মরণের সুশীতল ছায়ে,
নাহি আর কামনা বাসনা,
নাহি মরি ব্যর্থতার দুখে
সব শেষ, সব অবসান!
শীতলতা ছেয়েছে এ বুকে।

* * *

তুলিতেছ বয়সের কথা?
মিছে তোলা সে-সকল কথা!
বুকে হাত দিয়ে দেখ দেখি,
সব শেষ, শুধু শীতলতা!
দেখ দেখি নাড়ী কত ক্ষীণ,
রক্ত-স্রোত শুব্ধ হ'য়ে আসে,
কত ক্ষীণ আজি রক্তস্রোত,
আনন্দ, সে গিয়াছে শুকায়ে
প্রাণটুকু চাহে কোন্ ছায়া
কোথা চাহে পড়িতে লুকায়ে!

* * *

হাসিটুকু? ভুল, সবি ভুল!
এ যে ক্ষীণ মরণের হাসি।
বুকের আনন্দ কই প্রিয়?
শ্মশানের শান্ত ভস্ম-রাশি।
আনন্দে দোলেনা আর বুক,
বেদনায় উঠেনা শিহরি'
পরাণের পরতে-পরতে
আঘাত কাঁপেনা হিয়া ভরি'।
পরাণের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি
ব্যর্থতার আঘাতে-আঘাতে
ছিন্ন আজি, কোনো সুর আর
কেঁপে' কেঁপে' বাজেনা তাহাতে।
তরুণ চাঁপার কলি সম
উগ্র-গন্ধ-মদে ভরা হিয়া
গন্ধহীন, বৃন্তহীন আজি
শুষ্ক, দগ্ধ, ধূলায় ঝরিয়া।
অশ্রুরাশি আঁখিকোণে সব
কালি লেপে' গিয়াছে শুকায়ে
আনন্দের উচ্ছ্বলিত হাসি
মরু-পথে গিয়াছে লুকায়ে।
রক্ত রেখা মুছে গেছে আজি
জীবনের অস্ত গোধূলিতে
বিশ্রামের সুষুপ্তি ঘনায়
শ্রান্ত প্রাণ আবরিয়া নিতে।

* * *

অবেলায় ঝরিল কুসুম,
থামিল এ বুকের কাঁপন,
দুঃখ নাই, নাহি কোনো সুখ
নাহি হাসি, নাহিক কাঁদন।
শুধু শেষ, শুধু অবসান,
অন্ধকার, স্নিগ্ধ অন্ধকার!
চেয়ে দেখ, দূর দূরান্তরে
কোন্ তারা ফুটে পর-পার।

জীবের মৌলিক প্রকৃতি

(১) প্রাকৃতিক টানের বর্ণনা

আমাদের ভাষায় জীব বা প্রাণী প্রভৃতি শব্দে গাছ-পালা প্রভৃতি সূচিত হয় না। যাহা, কিছু জীবিত বা জীবনে নিয়ন্ত্রিত,—যাহারা জন্মে, বৃদ্ধি পায়, বংশ বাড়ায় ও মরে, তাহাদের জন্য একটা সাধারণ শব্দ নাই। বৈদিক যুগের ভাষায় জীব শব্দটি প্রায় সাধারণ সংজ্ঞাবাচী ছিল; মৌলিক অর্থ ধরিয়া এই জীব শব্দটিকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত অ-জড় পদার্থ-বোধক করা চলে। সকল জীবের জীবনের মূল যে সুসম্বদ্ধ আঠার মত পদার্থ, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত জৈবনিক নামে অভিহিত হইতেছে ও হইবে। বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ না থাকা, আর একই ভাব প্রকাশের জন্য নানা শব্দ থাকা, ভাষার দুর্ভাগ্য। যে ভাষা হেঁয়ালিতে পত্ত লেখার অনুকূল, তাহা স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব ফুটাইবার বিরোধী।

ছোট-বড় সকল শ্রেণীর জীবের উদ্ভব জৈবনিক হইতে; ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিবেষ্টনাদির ফলে একই জৈবনিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রকমের শরীর বিকাশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীব হয়। পূর্ব্বে ইহার আভাস দিয়াছি। যাহা জৈবনিকের ধাতুগত প্রকৃতি বা ধর্ম্ম, তাহা সকল শ্রেণীর জীবের ক্রিয়াতেই প্রকাশ পায়। জৈবনিকের ধাতু এই, অথবা উহার ধাতুগত রাসায়নিক ক্রিয়া এই, যে, যাহা উহার বাঁচিবার ও বাড়িবার অনুকূলে, সেই দিকেই উহার গতি বা আকর্ষণ বা টান জন্মে; উহা প্রসারিত হয় অথবা নড়ে অথবা চলে সেই দিকে যেদিক্ তাহার ক্ষয়ের দিক্ নয়। যাহাতে উহার ক্ষয় হয় বা মরণ হয়, সে অবস্থার স্পর্শে আসিলেই উহা দেহের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে গুটাইয়া সঙ্কুচিত হয়, ও সে অবস্থা এড়াইবার দিকে উহার গতি হয়। যে জীবের চেতনায় "আমি" জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহার শরীরের এই টানটিকে তখনই "প্রবৃত্তি" বলি যখন টান জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অনুকূল টানের বোধ জন্মে—অর্থাৎ ইচ্ছা জন্মে; "আমি"-জ্ঞানশূন্য জীবে যেমন ঐ টান বিনা ইচ্ছায় হয়, সেইরূপ আমি-জ্ঞানের শরীরেও বিনা-ইচ্ছার টান আছে। এই আপনা আপনি জাত বিনা-ইচ্ছার টানকে ইংরেজিতে reflex ক্রিয়া বলে,—আমরা উহাকে (সহজাত বলিয়া) "সহজগতি" বলিতে পারি। লোএব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা সযত্ন পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন যে আমাদের শরীরের সকল গতি ও ক্রিয়া নানা রাসায়নিক অবস্থার লীলা; তাই শারীরিক ক্রিয়ার সকল নড়ন চড়নকেই reflex বা "সহজগতি"র দলে ফেলিয়াছেন। যে সকল শ্রেণীর জীবের আমি-জ্ঞান নাই, তাহাদের গতিবিধিকে সহজ-গতি বলিতে অথবা সহজ-জ্ঞান (instinct) বলিতে আমাদের আপত্তি হয় না; আমাদের শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জাত অনেক নড়ন-চড়ন আমাদের আমি-জ্ঞানের ভূমিতে হয় বলিয়া, সেগুলিকে আমাদের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত বলি। আমাদের

অনুকূল টানের সহজ-গতি যে আমি-জ্ঞানের আভাসে ফুটিয়া উঠিয়া "ইচ্ছা" will নাম পায়, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এক রকম চেতনাযুক্ত টানের নামই হইল ইচ্ছা।

জৈবনিকের প্রকৃতিগত সহজ-গতির দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঘরের মাঝে জানালার কাছাকাছি যদি একটা পাত্রে একটি গাছ বা লতা বাড়ান যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গাছের ও লতার ডগা মাথা বাঁকাইয়া আলো খুঁজিয়া জানালার পথে বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই আলোকাকাঙ্ক্ষা (heliotropism) যে, জৈবনিকের ভিতরের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে হয়, তাহা শলভের দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছি।

জৈবনিকের নিগূঢ় প্রকৃতি এই, সে মরণ এড়াইতে চায়; তবুও দেখিতে পাই, শলভেরা আলোকের দিকে ছুটিয়া আগুনে পুড়িয়া মরে। উহাদের পাখার উপাদানের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পাখার গায়ে এমন পদার্থের বিকাশ হইয়াছে, যাহার রাসায়নিক ক্রিয়া শলভকে এরূপ-ভাবে আলোকের দিকে টানে যাহাতে শলভের পক্ষে দাহ এড়াইবার ক্ষমতা থাকে না, শলভদের পাখা, অন্যবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া-উৎপাদক রসে সিঞ্চিত করিয়া দেওয়ার পর দেখা গিয়াছে, শলভেরা স্বচ্ছন্দে জীবণ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে, আর আলোকের দিকে ছুটিবার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে। কেবল শলভের পরীক্ষায় নয়, অন্য নানাবিধ জীবের শরীরে রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাইয়া তাহাদের "প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি" বদলাইয়া নূতন প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারা গিয়াছে।

স্বভাবে বা প্রকৃতিতে জীবের শরীরে যাহা কিছু জন্মে, সে সকলগুলিই জীবন রক্ষার অনুকূল হয় না।

জীব-শরীরের টান বা প্রবৃত্তির টান যে, শারীরিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যত আবিষ্কৃত হইবে মানুষের পক্ষে ততই মঙ্গল। মানুষেরা দুশ্চরিত্র হইয়া ক্ষয়ের পথে চলে, আর দণ্ড বিধানে বা ধর্ম্মের উপদেশে তাহাকে সুপথে আনা যায় না; শলভের পাখায় নূতন রসায়নিক ক্রিয়া ঘটাইবার মত, মানুষের শরীরে কোন বিধান করিলে যে সংস্কারের সম্ভাবনা আছে, সেরূপ আশা করা দুরাশা নয়। এক শ্রেণীর আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় (endochryme organs), যেরূপভাবে রসক্ষরণ করিলে স্বাস্থ্য ও সুপ্রবৃত্তি বাড়িতে পারে তাহার গভীর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চলিয়াছে। যেখানে 'চোরায় না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী' সেখানে হয়ত একদিন চোরকে জেলে না পুরিয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া, তাহার শরীরের ভিতরকার দুইটি গ্লাণ্ডের (gland) রসক্ষরণের সুব্যবস্থা করিলে, চোরের পক্ষে চুরি করিবার প্রবৃত্তি একেবারে উড়িয়া যাইবে। এইরূপ ভাবে চরিত্র সংস্কারের পরীক্ষা স্থানে স্থানে (বিশেষভাবে আমেরিকায়) আরব্ধ হইয়াছে। পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়গুলির সহিত পরিচিত, তাঁহাদের কাছে এই আশার কথাটুকু বলিতে পারি যে, হয়ত Supra renal গ্লাণ্ডের Medullar ও তাহার সঙ্গে Pituitary গ্লাণ্ডের পিছনকার অংশের রসক্ষরণ ঘটাইতে পারিলে দুশ্চরিত্রের ইন্দ্রিয় চপলতা ধ্বংস হইতে

পারিবে। আশা করা যায় বৈজ্ঞানিক সাধনায় মানুষের চরিত্র গড়নের কাজ সুসাধ্য হইবে,—আর ঐ কাজের জন্য কেবল উপদেশ শুনাইয়া নিরস্ত হইতে হইবে না। যত শিক্ষা ও উপদেশ দিলেও মানুষের ধাতুগত পাপ প্রবৃত্তি যে যায় না, তাহা সকল যুগেই লোকে বুঝিয়াছে। তাই প্রাচীন কালের সাহিত্যে এইরূপ বচন পাই যথা :—(১) জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ, (২) মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ, (৩) যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ, ইত্যাদি। প্রকৃতিতে যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মানুষ সুচরিত্র অথবা দুশ্চরিত্র হয় তাহা জানিয়াই এখন কাজ করিতে হইবে।

অতি অল্প কথায় জীবন-বিজ্ঞানের (biology) যে সুপরীক্ষিত তথ্যের সংবাদ দিতেছি, তাহা এই :—(১) মানুষের শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের শরীরের নানা রোগ-উৎপাদক অতি ক্ষুদ্র জীব পর্য্যন্ত জীব-সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যাহা কিছু আছে, তাহারা সকলেই গড়িয়া উঠিয়াছে জৈবনিক নামের আঠার মত সুসম্বদ্ধ পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিকাশে, (২) প্রতি জীব অন্যজীব হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত; জলে জল মিলাইবার মত কোন শ্রেণীর জীবই পরস্পরে এক সঙ্গে মিলাইয়া ও গুলাইয়া যায় না, (৩) সকল জীব-শরীরেই জীবনের ক্রিয়া বলিয়া যাহা বুঝি, তাহা শারীরিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার রূপান্তরে ঘটে,—অর্থাৎ যাহা রাসায়নিক ক্রিয়া তাহাই জীবনরূপ ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হয়, (৪) জীবশরীরে যত কিছু ক্রিয়া আছে,—সে তাহার নড়া চড়া হোক্, প্রবৃত্তির টান হোক্, চেতনা হোক্ অথবা সে "আমি-বুদ্ধি" হোক—যাহার ফলে এক জীব ভাবিতেছে ও দেখিতেছে সে অন্য হইতে স্বতন্ত্র, সে সকলই হইতেছে শারীরিক পদার্থের প্রাকৃতিক্ গতিতে। ইহা ছাড়া একথাও বলা গিয়াছে যে, শরীরের একমাত্র ভিত্তিমূলক জৈবনিকের অপরিহার্য্য স্বাভাবিক প্রকৃতি এই, সে মরণকে এড়াইয়া বাঁচিবার দিকে ছুটিতে চায়। শলভের দৃষ্টান্তে বলিয়াছি যে, শরীরে এমন পদার্থ ও রাসায়নিক ক্রিয়াও জন্মে, যাহাতে জীবেরা জীবনের আনন্দময় আকর্ষণে তাহার পরিহার্য্য মরণের দিকে ছুটিয়া যায়। মানুষের পক্ষে যে ইহার তথ্য জানিয়া বিপদ এড়াইবার উদ্যোগ হইতে পারে, তাহাও বলিয়াছি।

জীব-শরীরের নানা রকম স্বাভাবিক টানের মধ্যে কেবল আলোকাকাঙ্ক্ষারূপ টানের কথাই বলিয়াছি; অন্য অনেক টানের কথা মানুষের সামাজিক ব্যবহারের পরিচয় দিবার সময় বলিব। এখানে জৈবনিকের অন্য শ্রেণীর একটি মৌলিক টানের বা সংস্কারের উল্লেখ করিব; সেটি প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের নিজের শ্রেণীর জীবটিকে চিনিবার প্রাকৃতিক সংস্কার। চেতনা জন্মিলে শরীরের অবস্থা বিশেষে একটি জীবের পক্ষে যেমন ভাবা সম্ভব হয় যে, সে নিজে একটি স্বতন্ত্র "ব্যক্তি" সেইরূপ আর একটি ভাব দেখা দেয়—যথা সে আপনার শ্রেণী ও অন্যের শ্রেণী আলাদা করিয়া বুঝিতে পারে। যে জীবে পূর্ণ আমি-জ্ঞান বিকাশ পায় নাই, তাহারই দৃষ্টান্ত দিয়া এই অবস্থাটি আগে বুঝাইব ও পরে দেখাইব যে, যেখানে আমি জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই সেখানেও সশ্রেণী অনুভব করিবার প্রাকৃতিক টান আছে। আগে দৃষ্টান্তটি দিতেছি।

ধর, একটি প্রজাপতি—একা একটা পাতার উপর বসিয়া ডিম পাড়িল ও উড়িয়া গেল, আর পরে কখনও সেই ডিমের কি হইল দেখিতে আসিল না। এখানে লিখিতেছি ঠিক তাহাই, যাহা ঘটে। প্রজাপতির পাড়া ডিমের মধ্যে একটা ডিমই প্রায় বাঁচে, অথবা প্রজাপতি অনেক সময়ে একগাছের একটি পাতায় ডিম পাড়িয়া আবার অন্য গাছের পাতায় ডিম পাড়িতে উড়িয়া যায়। একটি পাতার উপরকার একটা ডিম একটা কীটের মত আকারের জীব হয়, ও সেই কীটটি কচি কচি পাতা খাইয়া বড় হইবার পর কোন একটা পাতাকে গুটাইয়া তাহার মধ্যে বাসা করিয়া একাকী ঘুমাইবার মত পড়িয়া থাকে। ঐ রকমের কোন কোন কীট বা পলু নিজের শরীর হইতে সূতা বাহির করিয়া নিজের বাসা বাঁধে; সেই রেশমের কোষ অনেকেই দেখিয়াছেন। ঘুমন্ত কীটটি যখন প্রজাপতি হয়, তখন পাতার বাসা হইতে বাহির হইয়া আকাশে উড়িতে থাকে। ঐ প্রজাপতি বাপ-মায়ের সংসর্গে নিজের ও নিজের দলের পরিচয় পায় নাই, দর্পণে বা জলে আপনার ছবি দেখিয়া আপনার রূপ চেনে নাই, কিন্তু উড়িয়া বেড়াইবার সময় নানা শ্রেণীর নানা প্রজাপতির মধ্যে নিজের শ্রেণীর প্রজাপতিকে পাইয়া তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করে, প্রেম করে ও প্রজাপতিলীলা শেষ করে। এই যে আপনার শ্রেণী চিনিবার আকর্ষণ, উহা বুদ্ধির সঙ্গে না জড়াইয়াই শরীরের মধ্যে আছে; সেই রাসায়ণিক আকর্ষণেই মিলন হয় ও যৌন সম্বন্ধ ঘটে।

এই যে সংস্কার বা টান, যাহার ফলে প্রতি জীব আপনার শ্রেণীকে চেনে (every animal knows its kine), তাহা অতি ক্ষুদ্র একমাত্র "কোষ" বা অঙ্গ-বিন্দু দিয়া গড়া জীবেও আছে। এই একমাত্র কোষে-গড়া জীবের হাত-পা প্রভৃতি নাই, চোখ-কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নাই, মুখ নাই,—আছে কেবল এক কোষের একসা গড়ন একটা পিণ্ড। এই জীবেরাও এক সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া কাছাকাছি বাস করে। সমাজ বাঁধিবার প্রবৃত্তির যে গোড়া, তাহা নিম্নতম জীবে পাওয়া যায়। জীবের স্বাভাবিক টান বুঝাইবার পক্ষে যে দুই রকমের টানের কথা বলিয়াছি, উহাই হয় ত আপাততঃ যথেষ্ট হইল।

জীবের বিচিত্র লীলা বুঝিবার গোড়ায় এই কয়েকটি সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে:—(১) যাহাকে জড় বলি তাহা যে নিয়মে বা আইনে শাসিত, ঠিক সেই নিয়মে ও আইনেই জীবেরাও শাসিত, (২) জড়ে ও জীবে একই দৈহিক উপাদান পাই, আর জড়ের শরীরেও যেমন একই গতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত ও প্রকাশিত হয়, জীব শরীরেও তাহাই ঘটে, (৩) জড়ের গতিতেও যেমন দেখি যে তাহার ছুটিয়া পলাইবার ও আকৃষ্ট হইবার গতির অনমুরূপ আলোক বিদ্যুৎ প্রভৃতি মৌলিক গতির রূপান্তরে ঘটে, জীবের শরীরেও সেইরূপ খাঁটি জীবন গতির অবস্থান্তরে চেতনা, বেদনা, ও প্রবৃত্তির টান বিকশিত হয়। এমন কেন হইল, তাহা গভীর রহস্য বটে, তবে ইহা ঠিক যে, সৃষ্টিতে পরমাণুর উপাদানের প্রকৃতিতে যাহা বদ্ধ, তাহাই জড়ের ও জীবের সকল রকমের লীলায় ফুটিয়া ওঠে।

জীব মাত্রেই স্বতন্ত্রভাবে, নিয়ন্ত্রিত শরীর, আর উহারা সকলেই আপনার ফলে আপনি বাড়ে,

আপনার ফলে নানা প্রবৃত্তির টান ফুটায়, ও সেই দেহজাত প্রবৃত্তির গতিতে বা ক্রিয়ায় জীবনের বিচিত্র লীলার অভিনয় করে।

(২) জীবনের অবস্থার বর্ণনা

রোগের তত্ত্ব না জানিয়া যেমন চিকিৎসা করা চলে না, জীবনের তত্ত্ব না বুঝিয়াও সেইরূপ আমাদের জীবনের কাজগুলির সংস্কার করিতে চেষ্টা করা অথবা উহাদিগকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। জীবনের কোন মৌলিক প্রকৃতিকে আমরা কিছুতেই বদলাইতে পারিব না, অথবা কোন্ প্রবৃত্তিতে কিরূপ প্রাকৃতিক টান বাড়াইয়া উহাকে নিয়মিত করিতে পারিব, তাহা আমাদের প্রকৃতির বিকাশের ইতিহাস ধরিয়া শিখিতে হইবে। নহিলে ধর্ম্মসংস্কারের, সমাজ সংস্কারের ও রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা নিষ্ফল আয়োজনে, উৎসাহে ও কোলাহলে শেষ হইবে। আমাদের প্রকৃতির বিশ্লেষণের উদ্যোগে এবারে কয়েকটি কঠিন কথার সহজ ব্যাখা দিতে চেষ্ট করিতেছি।

জড় পরমাণুরা বিশিষ্ট অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের ক্রিয়ার বৈচিত্র্যে যেখানে জৈবনিক হইয়াছে, —জীবদেহের ভিত্তি হইয়াছে, সেখানেও তাহাদের আদিম প্রকৃতি বদলায় নাই। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ধর্ম্মে পরমাণুতে পরমাণুতে মিলিয়া যেমন জড়পিণ্ডের গড়ন হয়, তেমনি জীবিত কোষগুলি অন্তর্গূঢ় আকর্ষণে মিলিয়া বড় বড় জীবের শরীর গড়িয়া তোলে, মানুষ গড়িয়া তোলে। আবার জড় পরমাণুদের যেমন স্বতন্ত্র হইয়া একা ছুটিয়া যাইবার প্রাকৃতিক গতি আছে, জীব শরীরের উপাদানেও সেই গতি জাগ্রত আছে। চিতাবাঘ বরং তাহার গায়ের দাগ সুদ্ধ চামড়াখানা নূতন করিয়া নিতে পারে, কিন্তু পরমাণুরা তাহাদের কোন প্রকারের বিকাশেই মৌলিক প্রকৃতি বদলাইতে পারে না।

আকর্ষণের গুণে কোষে কোষে মিলিয়া জীবশরীর গড়িবার, বৃদ্ধি পাইবার ও বাঁচিবার প্রকৃতি যেমন জাগ্রত তেমনই অন্যদিক বিচ্ছিন্ন হইবার, ক্ষয় পাইবার অর্থাৎ মরিবার প্রকৃতিও তেমনই জাগ্রত, আমাদের শরীরের অণুতে অণুতে, কোষে কোষে জীবন ও মরণ একেবারে হরগৌরীর মত একত্র রহিয়াছে; মিলন ও বিরহ, জীবন ও মরণ, একই প্রকৃতির দুইটি দিক্ মাত্র।

আমরা নিঃশ্বাস টানিয়া, খাদ্য খাইয়া, নড়িয়া চড়িয়া ও নানারূপে নানা জঞ্জাল শরীর হইতে ঝাঁটাইয়া দিয়া যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি, বাঁচি; কিন্তু যে প্রক্রিয়াগুলির ফলে বাঁচিয়া থাকি, সেই প্রক্রিয়াগুলিই বুঝাইয়া দিতেছে, আমরা যত পারি ক্ষয়ের ক্ষতি পূরণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকি,—অর্থাৎ জীবনের সাথে সাথে ক্ষয়ের কাজ সমানে চলিয়াছে। অথবা বলিতে পারি ক্ষয় না থাকিলে জীবন হয় না; ক্ষয়ের কাজে যে গতির চঞ্চলতা জন্মে, ও বাড়িবার আকর্ষণের কাজে ক্ষতি পূরণের জন্য যে বেগ বাড়ে, তাহা হইতেই জীবনের স্ফূর্ত্তি, চেতনার উদ্ভব, আমিত্বের গৌরব,—অর্থাৎ জীবের জীবত্ব সাধিত হয়। এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার পূর্ব্বে জীবের মরণ সম্বন্ধে একটি সংস্কারের কথা বলিতেছি।

এক শ্রেণীর লোকেরা বলেন, আমাদের ভাগ্যে দুঃখ ও মরণ আসিয়াছে—মানবের আদিম জনক-জননীর পাপে ; ইঁহারা যদি প্রাকৃতিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের নিয়মের দিকে দৃষ্টি দেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, দুঃখ ও মৃত্যু যদি পাপের ফল হয়, তবে সে পাপ করিয়াছিল জড়পরমাণু বা ইথর তাহাদের জন্মের পূর্ব্বে, কারণ উহাতেই ঐ দুর্ভাগ্যের বীজ রহিয়াছে। জড়ের কথা ছাড়িয়া ইঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, পশু-পক্ষীরা মানুষের আগে সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রে লেখে, তাহারাও গর্ভধারণ করিতেছিল ও করিতেছে, আর মরিতেছিল ও মরিতেছে ; গাছ পালারাও জন্মে ও মরে। সৃষ্টির মৌলিক প্রকৃতিকে মানুষের পাপের ফল বলিলে চলিবে কেন ?

গাছ যেমন বাড়ে, ডালপালা ছড়ায় ও ফুল ফোটায়, তেমনই ভাবেই মানুষেরা বাড়ে,—শিশুর শরীরে (বুদ্ধি বা ইচ্ছার সঙ্গে বিনা যোগে) কেবল বৃদ্ধি পাইবার অনুকূলে অদম্য চঞ্চলতা ও খেলা জন্মে। এই মৌলিক প্রাকৃতিক অবস্থাটিকে বা বিকাশকে যদি "আনন্দ" বল, তবে সে আনন্দকে ইথরের তরঙ্গলীলার গোড়ায় পৌঁছাইতে হয় ; তাহা হইলে স্বীকার করা যায় যে, আনন্দ হইতেই (অবশ্য প্রত্যক্ষ ভাবের কথায়) সারা বিশ্বের উৎপত্তি। আনন্দের যে এপিঠ ওপিঠ আছে, সেকথা আপাতক ছাড়িয়া দিলাম। তাহা হইলে যাহাকে আনন্দ বলি, তাহা নিম্নতম জীব হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকল শরীরেই "অননুভূত" সামগ্রী। কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

এক কোষের একটি জীবে যখন বিকশিত হইতেছে, তখন তাঁহার সে বিকাশের আনন্দ ধরিবার একটা "আমি" নাই ; সে জীব যখন জীবনের প্রতিকূল অবস্থার স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়, তখন তাহার সে সঙ্কোচে (বিদ্ বা জানা অর্থমূলক) বেদনা জন্মে না। উচ্চজীবেও যেখানে চেতনা জন্মিয়াছে, সেখানে সে চৈতন্য জাগিয়াছে জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতে ; অর্থাৎ একসা এক রকমের অবস্থার মধ্যে চেতনা অসম্ভব। একজন কবি শিশুর আনন্দ ও মৃত্যুর অনভিজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—যাহার অঙ্গে অঙ্গে জীবন খেলিতেছে, সে বুঝিতে পারেনা মৃত্যু কি। "জানা" অর্থই হইল এক অবস্থার সঙ্গে অন্য অবস্থার সংঘর্ষের জ্ঞান। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই যেখানে আছে, সেখানে অবস্থার বিরোধ নাই ; সে বিচিত্রতা হীনতার মধ্যে কোনদিকে মনোযোগ বা দৃষ্টি পড়িতে পারেনা,—অর্থাৎ জানা বা চেতনা হয় না। ইহার সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একজন মানুষ যখন নিরুদ্বেগে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যভোগ করিতেছে, তখন সে তাহার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেন অনুভবই করে না ; যখন মাথা ধরে, দাঁতে ব্যথা হয়, তখন মানুষে তাহার মাথা ও দাঁতের অস্তিত্ব অনুভব করে, নহিলে বিনা উদ্বেগে ও বিনা স্বপ্নে ঘুমাইবার মত থাকে ও শরীরের বিকাশ বা স্বাস্থ্যজনিত অবস্থাকে ভাল লাগিতেছে বলিয়া অর্থাৎ আনন্দ বলিয়া অনুভব করে। শারীরিক উপাদানের ধাতুতে যে ক্ষয়ের ক্রিয়া আছে অর্থাৎ স্থিতির যোগ ভাঙ্গিবার টান আছে, তাহা যখন সুসম্বদ্ধ শরীরটাকে নাড়াইয়া দেয়, তখনই দুঃখ বা বেদনার অনুভব হয়, অর্থাৎ

চেতনা জাগে। কোন অঙ্গে ব্যথা হইলে অথবা প্রবৃত্তির উদ্বেগ জন্মিলে আমাদের যেরূপ চেতনা হয়, তাহার মধ্যেই "অনুভব" নামক অবস্থাটি ফোটে।

শরীরের উপাদানে একদিকে রহিয়াছে স্থিতি রক্ষা করিয়া বাড়িয়া উঠিবার প্রাকৃতিক টান, আর একদিকে রহিয়াছে যোগ ভাঙ্গিবার প্রাকৃতিক টান; এই দুই টান একসঙ্গে কাজ করে বলিয়াই আমরা শারীরিক গড়নের অবস্থা বিশেষে জীবের পরম গৌরবের চৈতন্য ও সংজ্ঞা পাই। শুধু যে "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্", তাহা নয়, দুঃখও আমাদের অপরিহার্য্য প্রকৃতি। দুঃখের এই নিত্যত্বের দিকে তাকাইয়া শ্রীমতী সরযূ দেবী তাঁহার অতি সুরচিত ত্রিবেণী গ্রন্থে ভগবানকে দুঃখময় বলিয়াছেন।

দুঃখ না থাকিলে আমাদের চৈতন্যময় জীবন অসম্ভব। আমাদের প্রকৃতি এই, দুঃখ থাকিবেই—জরা মৃত্যু আসিবেই। কোন মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত শীলধর্ম্ম পালন করিয়া কেহ দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিবে না,—কোন অবতারের নামে মাথায় জল ছিটাইয়া ও দেবস্তুতি গাইয়া কেহ দুঃখ ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কোন শ্রেণীর মুক্তিতে যদি দুঃখ উড়িয়া যায়, তবে চেতনাও উড়িয়া যাইবে; এক কোষের জীবের মত, না হয় গাছের মত একটা আনন্দময় অবস্থা যদি পাই, তবে সে আনন্দ ভোগে লাগিবে না,—সে মুক্তির অবস্থা জড়ত্ব হইতে অভিন্ন মুক্তির নামে "নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ" অর্থে যদি কেহ ভাবেন যে তাঁহার আত্মার কোন কাজের বা ভাবনার বালাই থাকিবে না, আর ক্রমাগত সে আত্মাতে একটা শুষ্‌শুড়ি লাগিতে থাকিবে ও সে শুষ্‌শুড়িতে আত্মা আড়ষ্ট না হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর আরাম পাইবে, তবে একটা কিছু হয় বটে; কিন্তু উহা আমাদের চিন্তার আয়ত্ত নয়।

আমাদের আনন্দের ভিটার সারা মাটি দুঃখের রসে ভিজা, অথবা আমাদের আনন্দ-সাগর নিরন্তর দুঃখের তাড়নায় ঢেউ তুলিতেছে। এই ঢেউএর ফেণার নাম ব্যথা আর ফেণাটুকু উপিয়া যাইবার সময়কার অবস্থার নাম সুখ। অলঙ্কারের ভাষা ছাড়িয়া বলিতে পারি, আমাদের বাঁধা স্থিতি যখন ক্ষয়ের টানে কাঁপে, তখন ব্যথা জন্মে; আর সুসম্বদ্ধ স্থিতির প্রভাবে যখন বাধাজনক অবস্থা দূর হইতে থাকে তখন যে ভাব অনুভব করা যায় তাহার নাম সুখ। বিকাশের আনন্দের সঙ্গে দুঃখের যে নিরন্তর ধারা বহিতেছে, তাহাতে সর্ব্বদাই ব্যথা জন্মে না; উহাতে মনোযোগ, চেষ্টা, উৎসাহ প্রভৃতি ফুটিতে থাকে। ব্যথা যেমন অল্প সময়ের জন্য, সুখ ও হু হু করিয়া হাসিয়া লইবার মজা সেইরূপ ক্ষণিকের জন্য; রাত্রিদিন কেহই শুষ্‌শুড়ি পাইবার মত আরাম বা সুখ পায় না,—সুস্থ থাকে ইহাই যথেষ্ট। যখন দুঃখের ধাক্কায় আনন্দের বা বিকাশের সুসম্বদ্ধ অবস্থা বেশি মাত্রায় বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না,—অর্থাৎ বিকাশ যখন দুঃখের ধাক্কা সহিয়া নিজের স্থিতিকে অটল রাখিতে পারে, তখন সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া ফুটিয়া ওঠে "প্রফুল্লতা"। এই প্রফুল্লতা জীবনকে তাজা রাখে, যদিও উহা ঠিক সুখের মত স্পষ্ট অনুভূত মজা নয়। যে জীবে ব্যথা ও সুখ প্রফুল্লতা ও নির্জীবতা

প্রভৃতি চেতনায় অনুভূত ও সংজ্ঞায় জাগরূক সেই জীবকে প্রাণ-সম্পন্ন বা "প্রাণী" নামে নির্দ্দেশ করিতে চাই। স্নেহ বলিতে যাহা বুঝি ও যৌন আকর্ষণে জাত প্রেম বলিতে যাহা বুঝি তাহাদের টান ও কাজ আমি জ্ঞানশূন্য জীবেও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; সেইজন্য স্নেহ ও প্রেমকে প্রাণের অন্তর্ভুক্ত করিলাম না। উহারা অন্যান্য ভাবের মতই জৈবনিকের ক্রিয়া হইলেও, সকল জীবেই দেখা যায় বলিয়া উহাদিগকে জীবনের সাধারণ স্থায়ী টানের শ্রেণীতে রাখিলাম। এই শ্রেণী-বিভাগ, কেবল কথা বুঝাইবার সুবিধার জন্য।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিয়োগ-বেদনা

(স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিয়োগে)

আবার এ বঙ্গ-বক্ষ-কুরুক্ষেত্র মাঝে—
কোন মহারথী হায়, পাতিল শয়ন ?
আবার যে মাতৃপ্রাণে শক্তি শেল বাজে,
হারাইলা আজি শূর সুরেন্দ্র রতন!
মনে আসে—সে বীরত্ব, নির্ভীক পরাণ,
সেই তেজস্বিতাভরা—উচ্চ অভিলাষ,
সেই অধ্যাপন ব্রত, উদার মহান,
সেই মাতৃপূজা আর সেই কারাবাস।
শত অবজ্ঞায় প্রাতে প্রসন্ন আনন,
সেই ক্ষমা সে সংযম শত অপরাধে
বিশ্ব তত্ত্বদর্শী বীর বিজ্ঞতম জন,
হায় আজি কাল-রাহু গ্রাসিল সে চাঁদে।
ত্যজিয়া আনন্দ মঠ সত্যানন্দ যায়,
কাঁদে অভাগিনী বঙ্গ অনাথার প্রায়—
সত্য, দেশে "একে একে নিভিছে দেউটি"
মৃত্যু কি খেলিছে খেলা উলটি পালটি!

শ্রীমানকুমারী বসু

পথের দাবী*

(২৫)

একে একে ঘরের মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত। ডাক্তার মুখ তুলিয়া কহিলেন, এস। কিন্তু সেই মুখের ভাবেই ভারতীর মনে হইল, অন্ততঃ, আজিকার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সুমিত্রার খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই যে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এপারে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে এ সম্বাদ তাঁহার জানা ছিল না। ইহা কিছুতেই আকস্মিক ব্যাপার নহে, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন একটা গূঢ় পরামর্শ যে হইয়া গেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগন্তুকের দল মেঝের উপরে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন, কাহারও আচরণে লেশমাত্র বিস্ময় বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না; স্পষ্টই বুঝা গেল, ভারতীর সম্বন্ধে না হৌক, ডাক্তারের আসার কথা তাঁহারা যেমন করিয়াই হৌক আগে হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন। অপূর্ব্বর ব্যাপার লইয়া দলের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবে এ আশঙ্কা ভারতীর ছিল, হয়ত, আজই ইহার একটা কঠিন বুঝা-পড়া হইয়া যাইবে, ইহাই মনে করিয়া ভারতীর বুকের ভিতরটায় যেন কাঁপুনি সুরু হইল।

সুমিত্রার মুখ শুষ্ক এবং বিষণ্ণ। ভারতীর সহিত সে কথা কহিল না, ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার গেরুয়া রঙের মস্ত পাগ্‌ড়ী খুলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা চাপা দিয়া পাশে রাখিল, এবং নিজের বিরাট বপু কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। তাহার গোলাকার চক্ষের হিংস্র দৃষ্টি একবার ভারতী ও একবার ডাক্তারের মুখের পরে যেন পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রামদাস তলওয়ারকর নীরব ও স্থির, ব্যারিষ্টার কৃষ্ণ আইয়ার সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন, এবং সকলের হইতে দূরে গিয়া বসিল নবতারা। কিছুর সঙ্গেই যেন তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, আজ ভারতীকে সে চিনিতেও পারিল না। মুখে কাহারও হাসি নাই, বাক্য নাই, সর্ব্বনাশা ঝড়ের পূর্ব্বাহ্নের মত এই নিশীথ সম্মিলন কিয়ৎকালের জন্য একান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সে দিনের ভয়ানক রাত্রির মত আজও ভারতী উঠিয়া আসিয়া ডাক্তারের অত্যন্ত সন্নিকটে ঘেঁসিয়া বসিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকে ভারতী ভয় করতে সুরু করেছে, শুধু ভয় নেই ওর আমাকে।

এইরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং ভারতী ভিন্ন বোধ হয় কেহ দেখিতেও পাইল না যে সুমিত্রা চোখের ইঙ্গিতে ব্রজেন্দ্রকে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু ফল হইল না। হয়

সে ইহার অর্থ বুঝিল না, না হয় গ্রাহ্য করিল না। তাহার কর্কশ ভাঙাগলার স্বরে সকলকে চকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার স্বেচ্ছাচারের আমরা নিন্দা করি এবং তীব্র প্রতিবাদ করি। অপূর্ব্বকে যদি কখনো আমি পাই ত তার—

এই অসম্পূর্ণ পদ ডাক্তার নিজেই পূর্ণ করিয়া বলিলেন, তার প্রাণ নেবে। এই বলিয়া তিনি বিশেষ করিয়া সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সবাই কি এই লোকটিকে সমর্থন কর? সুমিত্রা মুখ নীচু করিয়া রহিল, এবং অন্য কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, ভাবে মনে হয় তোমরা সমর্থন কর। এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আলোচনাও হয়ে গেছে—

ব্রজেন্দ্র কহিল, হাঁ হয়ে গেছে, এবং এর প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক মনে করি।

ডাক্তার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমিও তাই মনে করি, কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, খুব সম্ভব অত্যন্ত ক্রোধের বশেই তোমাদের তা মনে ছিলনা। আহমেদ দুরাণি ছিল আমাদের সমস্ত উত্তর চীনের সেক্রেটারি, অমন নির্ভীক, কর্ম্মদক্ষ লোক আমাদের দলে আর ছিলনা। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার মাস খানেক পরেই সে মাঞ্চুরিয়ার কোন্ একটা রেলওয়ে ষ্টেসনে ধরা পড়ে। সাংহাইয়ে তার ফাঁসি হয়। সুমিত্রা, দুরাণীকে তুমি দেখেছিলে, না?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, আমি তখন ছিতায় ভাঙা দল পুনর্গঠনে ব্যস্ত, একটা খবর পর্য্যন্ত পেলামনা যে আমার একখানা হাত ভেঙে গেল। অথচ তার বিপক্ষে আদালতে বিচারের তামাসা যখন পুরোদমে চল্‌ছিল তখন রক্ষা করা তাকে একবিন্দু কঠিন ছিলনা। আমাদের অধিকাংশ লোক তখন ঐ খানেই বাস কর্‌ছিল। তবুও, এত বড় দুর্ঘটনা কেন ঘটলো জানো? ফয়জাবাদের মথুরা দুবে তখন অতি তুচ্ছ অবিচার কুবিচারের পুনঃ পুনঃ অভিযোগে দলের মন একেবারে বিষ করে তুলেছিল। দুরাণীর মৃত্যুতে সবাই যেন পরিত্রাণ পেলে। আমি ফিরে আসার পরে ক্যান্‌টনের মিটিঙে যখন সকল ব্যাপার জানা গেল তখন দুরাণীও নেই, মথুরাও টাইফয়েড জ্বরে মরেছে। প্রতীকারের কিছুই আর ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ে সে রাত্রের গুপ্ত-সভা অতিশয় কঠিন দুটো আইন পাশ করে। কৃষ্ণ আইয়ার তুমি ত উপস্থিত ছিলে, তুমিই বল।

কৃষ্ণ আইয়ারের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আপনি কাকে ইঙ্গিত কর্‌ছেন আমিত বুঝতে পারচিনে ডাক্তার।

ডাক্তার লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, ব্রজেন্দ্রকে। একটা আইন এই ছিল, আমার আড়ালে আমার কাজের আলোচনা চল্‌বে না,—

ব্রজেন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করিল, আলোচনাও চল্‌বে না?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, না, আড়ালে চল্‌বে না। কিন্তু চলে তা' জানি। তার কারণ, সেদিনকার ক্যান্টনের সভায় উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, তুরাণীর মৃত্যুতে তাঁরা যতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আমি ততটা হইনি, সুতরাং এ বস্তু চলেও আস্‌চে, আমিও অবহেলা করেই আস্‌চি। কিন্তু দ্বিতীয়টা গুরুতর অপরাধ, ব্রজেন্দ্র।

ব্রজেন্দ্র তেম্‌নি উপেক্ষাভরে কহিল, সেটা প্রকাশ করে বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, প্রকাশ করেই বল্‌চি।. আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। তুরাণীর মৃত্যুর পরে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার দরকার।

ব্রজেন্দ্র কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, সাবধান হওয়ার দরকার অপরেরও ঠিক এম্‌নি থাক্‌তে পারে। জগতে প্রয়োজন শুধু আপনারই একচেটে নয়। এই বলিয়া সে সকলের দিকেই চাহিল, কিন্তু সকলেই মৌন হইয়া রহিল, কেহই তাহার জবাব দিলনা।

ডাক্তার নিজেও অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, এর শাস্তি হচ্ছে চরম দণ্ড! ভেবেছিলাম যাবার পূর্ব্বে আর কিছু কোর্‌ব না, কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমার আপনারই সবুর সইল না। পরের প্রাণ নিতে ত তুমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু নিজের বেলা কিরকম মনে হয়?

ব্রজেন্দ্রর মুখ কালো হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া দম্ভভরে কহিয়া উঠিল, আমি এনার্কিস্ট, আমি রেভোলিউশনারি, প্রাণ আমার কাছে কিছুই নয়,—নিতেও পারি, দিতেও পারি।

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বলিলেন, তাহলে আজ রাত্রে সেটা দিতে হবে,—কিন্তু বেল্ট থেকে ওটা টেনে বার কর্‌বার সময় হবে না, ব্রজেন্দ্র, আমার চোখ আছে,—তোমাকে আমি চিনি। এই বলিয়া তিনি পিস্তল সমেৎ বাঁ হাত তুলিয়া ধরিলেন। ভারতী ব্যাকুল হইয়া সেই হাতটা তাঁহার চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ডান হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া শুধু বলিলেন, ছি।

ঘরের মধ্যে চক্ষের নিমিষে যেন একটা বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

সুমিত্রার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, বলিল, নিজেদের মধ্যে এ সব কি বলুন ত?

তলওয়ারকর এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, এখন সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দলের সকল নিয়ম আমি জানিনে। আপনার সঙ্গে মতভেদের শাস্তি কি এখানে মৃত্যু? অপূর্ব্ববাবু বেঁচে গেছেন এতে আমি মনে মনে খুসিই হয়েছি, কিন্তু আপনার অন্যায় তাতে কম হয়নি; এ সত্য বল্‌তে আমি বাধ্য।

কৃষ্ণ আইয়ার ঘাড় নাড়িয়া ইহাতে সায় দিল। ব্রজেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে আর উপহাসের স্পর্দ্ধা ছিল না, কিন্তু সে অনেকের সহানুভূতিতে বল পাইয়া বলিল, একজনের প্রাণ যাওয়া যখন চাই, তখন আমারই নাহোক্‌ যাক্‌। আমি প্রস্তুত।

সুমিত্রা বলিল, ট্রেটরের বদলে যদি একজন ট্রায়েড কম্‌রেডের রক্তেই তোমার প্রয়োজন, তখন আমিও ত দিতে পারি ডাক্তার।

ডাক্তার স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, এই উচ্ছ্বাসের সহসা কোন জবাব দিবার চেষ্টা করিলেন না। মিনিট দুই পরে নিজের মনেই একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, সে সব বহুকালের কথা, তখন কোথায়ই বা তোমরা? এই ট্রায়েড কম্‌রেডটিকে তখন থেকেই আমি জানি। সে যাক্। টোকিওর একটা হোটেলে বসে সুনিয়াৎ সেন একদিন বলেছিলেন, নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন এ রাস্তা থেকে ততখানি দূরে দূরেই চলে। অতএব, এ আমার সইবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমাকে আমি মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করিনি। আমাকে অন্যত্র যেতে হচ্চে, কিন্তু ডিসিপ্লিন ভেঙে গেলে ত আমার চল্‌বে না। সুমিত্রাকে যদি তোমার দলেই পাও, আই উইশ ইউ গুড ল্যক। কিন্তু আমার পথ তুমি ছাড়। সুরাভায়ায় একবার এ্যাটেম্‌ট করেছ, পরশু আর একবার করেছ, কিন্তু এর পরে ইফ্‌ উই মিট—ইউ নো!

সুমিত্রা উদ্বেগে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কথার মানে? এ্যাটেম্‌ট করার অর্থ?

ডাক্তার এ প্রশ্ন কাণেও তুলিলেন না, কহিলেন, কৃষ্ণ আইয়ার, আই অ্যাম সরি!

আইয়ার মুখ অবনত করিল, কিন্তু উত্তর দিল না। ডাক্তার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, ভারতীর হাত ধরিয়া একটুখানি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এইবার চল তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি যাই। ওঠ।

ভারতী স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়াছিল, ইঙ্গিত মাত্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শুধু দ্বারের কাছে হইতে একবার সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, গুড্‌ নাইট!

এই বিদায় বাণীর কেহ প্রত্যুত্তর দিল না, আচ্ছন্ন অভিভূতের ন্যায় সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভারতী নীচে নামিয়া গিলে, ডাক্তার উপরের দিকে চোখ রাখিয়া যখন ধীরে ধীরে নামিতেছিলেন, অকস্মাৎ কবাট খুলিয়া শশী মুখ বাহির করিয়া বলিল, কিন্তু আমার যে আপনাকে ভয়ানক প্রয়োজন ডাক্তার? এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধ-শ্বাসে কহিল, আমি ত মানুষের মধ্যেই নই ডাক্তারবাবু, কোনদিন আপনার কোন কাজে লাগবার শক্তিই আমার নেই, কিন্তু আপনার ঋণ আমি চিরদিন মনে করে রাখ্‌বো। এ আমি ভুলব না।

ডাক্তার সস্নেহে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, কে বলে তোমাকে মানুষ নয়, শশি? তুমি কবি, তুমি গুণী, তুমি সকল মানুষের বড়। আর আমার কাছে তোমার ঋণ যদি কিছু সত্যিই থাকে, সে তো না ভোলাই ভাল।

শশী বলিল, না, আমি ভুলবনা। কিন্তু, যেখানেই থাকুন, যা কিছু আমার আছে সমস্তই আপনার—এ কথা কিন্তু আপনিও ভুলতে পাবেন না।

উভয়ে ভারতীর কাছে আসিয়া পৌঁছিতে সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা ?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, অসময়ে ওর ত কোন বিপদই ছিলনা, কিন্তু হঠাৎ সময়টা ভাল হয়ে পড়াতেই ওর মহা চিন্তা হয়েছে, পাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ আর মনে না থাকে। তাই ছুটে বল্‌তে এসেছে, ওর যা' কিছু আছে সমস্তই আমার।

ভারতী বলিল, তাই নাকি শশীবাবু ?

শশী চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার সকৌতুক স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, মনে থাক্‌বে হে শশি, থাক্‌বে। এ বস্তু জগতে এত সুলভ নয় যে কেউ সহজে ভোলে।

শশী কহিল, আপনি কবে যাবেন ? তার আগে কি আর দেখা হবেনা ?

ডাক্তার বলিলেন, ধরে রাখো দেখা হবেইনা। কিন্তু তুমি ত আমার বয়সে ছোট, আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি তুমি যেন সুখী হতে পারো।

শশী সবিনয়ে কহিল, আস্‌চে শনিবারটা পর্য্যন্তও কি থাক্‌তে পারেন না ?

ভারতী কহিল. শনিবারে যে ওঁদের বিয়ে।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সম্মুখে নদী, কাঠের মাড়ের পাশে ক্ষুদ্র তরণী শেষ ভাঁটায় কাদার উপরে কাত হইয়া পড়িয়াছে। সোজা করিয়া ভারতীকে সযত্নে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজেও উঠিয়া বসিলেন। শশী বলিল, শনিবারটা আপনাকে থেকে যেতে হবে। জীবনে অনেক ভিক্ষে দিয়েছেন, এটিও আমাকে দিন। ভারতী, আপনাকেও সেদিন আস্‌তে হবে।

ভারতী মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার বলিলেন, ও আস্‌বে না শশী, কিন্তু আমি যদি থেকে যেতে পারি অন্ধকারে গা ঢেকে এসে তোমাদের একবার আশীর্ব্বাদ করে যাবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। আর যদি না আসি, নিশ্চয় জেনো সব্যসাচীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু যেখানেই থাকি, সেদিন তোমার জন্যে এই প্রার্থনাই কোরব, বাকি দিনগুলো যেন তোমার সুখে কাটে। এই বলিয়া তিনি হাতের লগী দিয়া কাঠের স্তূপে সজোরে ঠ্যালা দিতেই ছোট নৌকা কাদার উপর দিয়া পিছলাইয়া নদীর জলে গিয়া পড়িল।

জোয়ার তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভাঁটার টানে থিমা পড়িয়া আসিয়াছে। সেই মন্দীভূত স্রোতে উচ্চ তীর ভূমির অন্ধকার ছায়ার নীচে দিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র তরণী ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিতে লাগিল। ও-পারের জন্য পাড়ী দিতে তখনও বিলম্ব ছিল, ডাক্তার হাতের দাঁড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

শ্রান্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর কনুই রাখিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, আজ একলা থাক্‌লে আমি এমন কান্না কাঁদতাম যে নদীর জল বেড়ে যেতো। দাদা, ভবিষ্যতে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে, নেই কি কেবল তোমার ? শশীবাবু অতবড় বিশ্রী কাজ করতে উদ্যত, তাকেও

তুমি মন খুলে আশীর্ব্বাদ করে এলে,—শুধু কেউ নেই পৃথিবীতে সুখী হও বলে তোমাকেই আশীর্ব্বাদ করবার ? তুমি গুরুজন হও আর যাই হও, তোমাকেও আজ আমি ঠিক ওই বলে আশীর্ব্বাদ কোরব, যেন তুমিও ভবিষ্যতে সুখী হতে পারো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ছোটর আশীর্ব্বাদ খাটেনা। উল্টো ফল হয়।

ভারতী বলিল, মিছে কথা। তা'ছাড়া আমি শুধু ছোট নয়, আর একদিক দিয়ে তোমার বড়। যাবার আগে তুমি সমস্ত লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে সুমিত্রা দিদির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখে যেতে চাও। সে আমি হতে দেব না। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিতে লাগিল, তুমি বল্‌বে সুমিত্রাকে ত তুমি ভাল বাস না। নাই বাস্‌লে। তোমাদের পুরুষ মানুষের ভালবাসার কতটুকু দাম দাদা, যা আজ আছে কাল নেই ? অপূর্ব্ববাবুও আমাকে ভালবাস্‌তে পারেন নি, কিন্তু আমি ত পেরেছি। আমার পারাই যা কিছু সব। বোল্‌তার মধু সঞ্চয়ের শক্তি নেই বলে ঝগ্‌ড়া করতে যাবো কার সঙ্গে ? কিন্তু আজ তোমাকে বল্‌চি দাদা, এই বিশ্ব বিধানের প্রভু যদি কেউ থাকেন নারী-হৃদয়ের এত বড় প্রেমের ঋণ শুধ্‌তে তাঁকে আমার হাতে এনে অপূর্ব্ব বাবুকে সঁপে দিতে হবেই হবে। এই বলিয়া ভারতী কিছু একটা উত্তরের আশায় ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া কহিল, দাদা, তুমি মনে মনে হাস্‌চো ?

কই, না।

নিশ্চয়। নইলে তুমি জবাব দিলে না কেন ? এই বলিয়া সে অন্ধকারে যতদূর পারা যায় সব্যসাচীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডাক্তার হেঁট হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া এইবার হাসিলেন, বলিলেন, জবাব দেবার কিছু ছিল না ভারতী। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিকে যদি এই জবরদস্তিই মেনে চল্‌তে হোতো, তোমার সুমিত্রা দিদির কি হোতো জানো ? ব্রজেন্দ্রের হাতেই নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে সঁপে দিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌তে হোতো।

ভারতী বিশেষ চমকিত হইল না। আজিকার ব্যাপারের পরে এই সন্দেহই তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, ব্রজেন্দ্র কি তাঁকে তোমার চেয়ে,—আমি বল্‌চি, এত বেশি ভাল বাসেন ?

ডাক্তার সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপরে কহিলেন, বলা একটু কঠিন। এ যদি নিছক একটা আকর্ষণই হয় ত মানুষের সমাজে তার তুলনা হয় না। লজ্জা নেই, সরম নেই, সম্ভ্রম নেই,—হিতাহিত বোধলুপ্ত জানোয়ারের উন্মত্ত আবেগ যে চোখে না দেখেচে সে তার মনের পরিচয়ই পাবে না। ভারতী, তোমার দাদার এই হাত দুটো বলে কোন বস্তু যদি সংসারে না থাক্‌তো সুমিত্রার আত্মহত্যা ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথ খোলা থাক্‌ত না। তোমার বিশ্ব-বিধানের

প্রভুটিও এতদিন এদের খাতির না করে পারেন নি। এই বলিয়া তিনি ভারতীর আনত মাথার পরে সেই হাত দুটি রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপ্‌ড়াইতে লাগিলেন।

এতক্ষণে ভারতী শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, দাদা, এত জেনেও তুমি এঁরই হাতে সুমিত্রাকে ফেলে রেখে যেতে চাচ্চো? এত বড় নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো, আমি ভাব্‌তেই পারিনে।

ডাক্তার কহিলেন, তাই ত আজ যাবার আগে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম,—কিন্তু সুমিত্রাই ত হতে দিলেনা।

ভারতী সভয়ে প্রশ্ন করিল, হতে দিলেনা কি রকম? তুমি কি সত্যিই ব্রজেন্দ্রকে মেরে ফেল্‌তে চেয়েছিলে না কি?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ, সত্যিই চেয়েছিলাম! ইতিমধ্যে পুলিশের লোকে যদি না তাকে জেলে পাঠায় ত ফিরে এসে আর একদিন আমাকেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিল, এই কথার পরে উঠিয়া বসিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যে অন্তরের মধ্যে একটা কঠিন আঘাত পাইল ডাক্তার তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া পরপারের জন্য প্রস্তুত হইয়া পার্শ্বে রক্ষিত দাঁড় দুটা দুই হাতে টানিয়া লইলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, আমি যদি তোমার সুমিত্রা হোতাম এম্‌নি করে কি আমাকেও ফেলে যেতে পারতে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, কিন্তু তুমি ত সুমিত্রা নও, তুমি ভারতী। তাই তোমাকে আমি ফেলে যাবোনা, কাজের জন্যে রেখে যাবো।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তোমাদের এই সব খুনোখুনি রক্তা-রক্তির মধ্যে আমি আর নেই। তোমার গুপ্ত সমিতির কাজ আমাকে দিয়ে আর হবেনা।

ডাক্তার বলিলেন, তার মানে এঁদের মত তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেতে চাচ্চো?

এই উক্তি শুনিয়া ভারতী ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এত বড় অন্যায় কথা তুমি আমাকে বল্‌তে পারো দাদা? তুমি যা' ইচ্ছে করতে পারো, কিন্তু, আমি নিজে থেকে তোমাকে ত্যাগ করে গেছি, এ কথা মনে হলে কি একটা দিনের জন্যে বাঁচতে পারি তুমি ভাবো? আমি তোমারই কাজ করে যাবো, যত দিন না তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ছুটি দাও। একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আমিত জানি, মানুষ খুন করে বেড়ানোই তোমার আসল কাজ নয়, তোমার কাজ মানুষকে মানুষের মত করে বাঁচানো। তোমার সেই কাজেই আমি লেগে থাক্‌বো, এবং সেই ভেবেই ত তোমাদের মধ্যে আমি এসেছিলাম দাদা।

ডাক্তার এক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড় টানা বন্ধ রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কাজটা আমার কি?

ভারতী বলিল, আমাদের পথের দাবীর ত কোন প্রয়োজন ছিলনা গুপ্ত সমিতি হয়ে ওঠা!

কারখানার মজুর মিস্ত্রীদের অবস্থা ত আমি নিজের চোখেই দেখে এসেছি। তাদের পাপ, তাদের কু-শিক্ষা, তাদের পশুর মত অবস্থা,—এর একবিন্দু প্রতীকারও যদি সারাজীবনে করতে পারি, তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার আর কি হতে পারে ? সত্যি বোলো দাদা, একি তোমারই কাজ নয় ?

ডাক্তার তখনই কোন জবাব দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে কত-কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা দাঁড় দুটা জল হইতে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু তোমার এ কাজ নয় ভারতী, তোমার অন্য কর্ত্তব্য আছে। এ কাজ সুমিত্রার,—তাই, তার 'পরেই আমি এ ভার ন্যস্ত করে রেখেচি।

তখন নদীতে ভাঁটা শেষ হইয়া মোহানায় জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাগরের স্ফীত জলবেগ এখনও এতদূরে আসিয়া পৌঁছে নাই,—সেই স্তব্ধপ্রায় নদীবক্ষে তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণী মন্থর মন্দ গতিতে ভাসিয়া চলিতে লাগিল, ডাক্তার তেম্‌নি শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তোমাকে বলাই ভাল ভারতী, জনকতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্যে পথের দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এই লক্ষের মুখে হয়ত একদিন এদের ভেড়া-ছাগলের মতই বলি দিতে হবে,—তার মধ্যে তুমি থেকোনা বোন্‌, সে তুমি পার্‌বেনা।

ভারতী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এ সব তুমি কি বোল্‌চ দাদা ? মানুষকে বলি দেবে কি !

ডাক্তার তেম্‌নি শান্তস্বরে বলিলেন, মানুষ কোথায় ? জানোয়ার বই ত নয় !

ভারতী ভীত হইয়া কহিল, মানুষের সম্বন্ধে তুমি ঠাট্টা করেও অমন কথা মুখে এনোনা বল্‌চি। সকল সময়ে সব কথা তোমার বোঝা যায় না—বুঝতেও পারিনে, তা' মানি ; কিন্তু তোমার মুখের কথার চেয়ে তোমাকে আমি ঢের বেশি বুঝি দাদা, মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কোরোনা।

ডাক্তার বলিলেন, না ভারতী, মিথ্যে নয়, তোমাকে সত্যি ভয় দেখাবারই চেষ্টা করচি, যেন আমার যাবার পরে আর তুমি কারখানার কুলি মজুরদের ভাল-করার মধ্যে না থাকো। এমন করে এদের ভালো করা যায় না,—এদের ভালো করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের-দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আস্‌তে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হংগেরিতে তাই হয়েছে, রুসিয়ায় বার বার এম্‌নি ঘটেছে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আসে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন সহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল। এই ত সেদিনের জাপান,—সেদেশেও দিন-মজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চল্‌বার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয়না ভারতী।

ভারতী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, সে আমি জানিনে, কিন্তু ওই সব ভয়ানক উৎপাত কি তুমি এদেশেও টেনে আন্‌বে না কি ? যাদের এক ফোঁটা ভালো করবার জন্যে আমরা অহর্নিশি পরিশ্রম করচি, তাদেরি রক্ত দিয়ে কারখানার রাস্তায় নদী বহাতে চাও না কি ?

ডাক্তার অবলীলাক্রমে কহিলেন, নিশ্চয় চাই। মহামানবের মুক্তি-সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এত কালের পর্ব্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ধোয়ার কাজে তোমার দাদার দু ফোঁটা রক্তেরও যদি প্রয়োজন হয়ত আপত্তি কোরবনা, ভারতী।

ভারতী কহিল, ততটুকু তোমাকে আমি চিনি, দাদা। কিন্তু দেশের মধ্যে এই অশান্তি ঘটিয়ে তোলবার জন্যেই এত বড় ফাঁদ পেতে বসে আছো? এর চেয়ে বড় আদর্শ আর তোমার নেই?

ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেচি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেও বলেছি, ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্য মন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নর-নারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করেনা। তাইত হয়েছে, তাইত আজ দীন দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে! তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদ্‌তে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হবেনা। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক্,—মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙে ফেল্‌তেই হবে। ধূলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইঁট পাথর খসে মানুষের মাথাতে ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।

ভারতী বলিল, তাও যদি হয়, দাদা, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে আগে থেকেই অশান্তির পথে পা বাড়াবো কেন?

ডাক্তার বলিলেন, তার কারণ, শান্তির পথ ঐ সনাতন, পবিত্র, ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে বলে। কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমরা যে সেদিন কারখানার কারিগরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নিরুপদ্রব ধর্ম্মঘট করাবার আয়োজন করেছিলাম সেও কি তবে তাদের মঙ্গলের জন্যে নয়? তুমি চলে গেলে পথের-দাবীর সে প্রচেষ্টাও কি আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে?

ডাক্তার বলিলেন, না। কিন্তু সে কর্ত্তব্য তোমার নয়, সুমিত্রার। তোমার কাজ আলাদা। ভারতী, ধর্ম্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব-ধর্ম্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্ম্মঘটই কখনো সফল হয়না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

ভারতী বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কাকে দিতে হয়? শ্রমিককে?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ! তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্ম্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাঁকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদ্‌তে থাকে,—তাদের অবিশ্রান্ত [illegible] —তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া

ছাড়া জীবন ধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ বল, সৈন্য বল, অস্ত্র বল সবই তার হাতে,—সেই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করেনা,—তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলের জয় জয়কার হোক্, সেদিন নিরস্ত্র নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।

ভারতী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন সেই সব পীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

ভারতী কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে? তার পরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতীকারের আশায় ধর্ম্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরভিনয় হয়।

ভারতীর মন মুহূর্ত্তকালের জন্য একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, তবে এমন ধর্ম্মঘটে আর লাভ কি দাদা?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারেও জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, লাভ? এই ত পরম লাভ ভারতী! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপ্‌চে উছ্‌লে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূল ধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না,—ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই-চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ এ কথা জানেনা, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্ম্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্ব্বনাশ করে, দেশেরও করে।

ভারতী সহসা কহিল, নৌকো বোধ হয় আমাদের অনেকখানি পেছিয়ে এসেছে দাদা।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, সে দিকেও চোখ আছে দিদি, কোথায় যেতে হবে, তা ভুলিনি।

ভারতী কহিল, কেন যে এর মধ্যে থেকে আমাকে তুমি বিদায় দিতে চাও এতক্ষণে তা' বুঝেচি। আমি ভারি দুর্ব্বল। হয়ত, তাঁরি মতই দুর্ব্বল। আমি কিছু নয়,—আজও তোমার সমস্ত ভরসা সেই সুমিত্রা দিদির পরেই। কিন্তু এ কথা আমি কিছুতে মানবো না যে, এ ছাড়া আর পথ নেই,—মানুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনের মঙ্গলের জন্য আর একজনের অমঙ্গল করতেই হবে,—এ আমি কোনমতেই চরম সত্য বলে নেব না,—তুমি বল্‌লেও না।

সে আমি জানি বোন্।

ভারতী কহিল, কিন্তু তোমার কাজ ছেড়েই বা আমি যাই কি করে? থাক্‌বো কি নিয়ে? ফিরে যদি আর না এসো আমি বাঁচবো কি করে?

সেও আমি জানি।

ভারতী বলিল, জানো তুমি সব। তবে?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। উত্তর না পাইয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, বিপ্লব যে কি, কেন এর এত প্রয়োজন মনের মধ্যে আমি ধারণাই করতে পারিনে। তবু, তোমার মুখ থেকে যখন শুনি বুকের ভেতরটায় কেমন যেন কাঁদতে থাকে। মনে হয় মানুষের দুঃখের ইতিহাস তুমি কতই না চোখে দেখেচ। নইলে এমন করে তোমাকে পাগল করেছে কিসে? আচ্ছা, যাবার সময় কি

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তুমি ক্ষেপেচ ভারতী ?

ক্ষেপেচি ? তাই হবে। একটুখানি থামিয়া বলিল, মনে হয় আমি যেন তোমার কাজের বাধা। তাই, যেন কোথায় আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে যাচ্চো। কিন্তু, আমি কি দেশের কোন ভাল কাজেই লাগ্‌তে পারিনে ? এমন সুযোগ কি কোথাও কিছু নেই ?

ডাক্তার বলিলেন, দেশে ভাল কাজ করার অসংখ্য অবকাশ আছে ভারতী, কিন্তু সুযোগ নিজে তৈরি করে নিতে হয়।

ভারতী আদর করিয়া বলিল, আমি পারিনে দাদা, তুমি তৈরি করে দিয়ে যাও।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাসিমুখ সহসা যে গম্ভীর হইয়া উঠিল, অন্ধকারে ভারতী তাহা দেখিতে পাইল না। কহিলেন, দেশের মধ্যে ছোটবড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের ঢের ভাল কাজ করে। আর্ত্তের সেবা, নরনারীর পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা। লোকের জ্বর ও পেটের অসুখে ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সান্ত্বনা দেওয়া—তাঁরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই,—পাপ পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই-সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলে খেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ, —এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নেই। ভারতী, আমাকে আর তুমি টেনোনা।

ভারতী অন্ধকারে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিল, রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শোক-বার্ত্তা

সুরেন্দ্রনাথের তিরোধান

সুরেন্দ্রনাথ যদি এখনকার নূতন পদ্ধতির রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিতেন, তবে যে প্রকার শোকে, ক্ষোভে ও ব্যাকুলতায় এদেশে বিচলিত হইত, তাহা এখন অসম্ভব। এখনকার রাষ্ট্র-নীতির চালকেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও পরোক্ষভাবে সুরেন্দ্রনাথের দেশ-হিতৈষণার মন্ত্রে উজ্জীবিত ও জাগরিত হইলেও দেশের লোকেদের অনেকেই তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছেন। লোকসাধারণের কাছে যশ ও সম্মান বড়ই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। তাই ভারতের রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা অসাধারণ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ৬ই আগষ্ট অপরাহ্নে যখন তাঁহার মণিরামপুরের আবাসে ৭৭ বৎসর বয়সে জীবনলীলা শেষ করিলেন, তখন বহু জনতায় সে আবাসের নিস্তব্ধতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের রচিত "A Nation in Making" গ্রন্থখানির আলোচনা প্রসঙ্গে এই পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ মাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখন তাহা আর একবার

পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। সিবিল সারবিসের চাকুরি হারাইবার পর কি অবস্থায় তিনি ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ও ১৮৭৬ অব্দে দেশের লোকের অধিকার বাড়াইবার সঙ্কল্পে কিরূপে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের প্রতিযোগিতায় ভারতসভা স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন সে বিবরণ এখন বহু সংবাদপত্রে আলোচিত ও বিচারিত হইতেছে। ভারতসভা গড়িবার উদ্যোগ হইয়াছিল ১৮৭৬ অব্দে কিন্তু উহা পূর্ণাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৭৭-৭৮ অব্দে; এই ১৮৭৭ অব্দে গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন যে রাজদরবার করিয়াছিলেন, সেদিনে সাহসে ভর করিয়া কেবল দুইজন ব্যক্তি উহার প্রকাশ্য সমালোচনা করিয়াছিলেন; তাহার একজন সাহিত্য-বিশারদ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও অপর ব্যক্তি বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতসভার অন্দোলনের ফলেই যে এদেশে রাজনীতির আলোচনার নূতন ধারা বহিয়াছে ও কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছে পাঠকদিগকে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। যে ক্ষুদ্র জীর্ণ বাড়ীটিতে ভারতসভাব অফিস্ বসিয়াছিল সেটি এখন ইডেন হাঁসপাতালের প্রসারে বিলুপ্ত। হিতৈষণার উদ্যোগকে পাগলের পাগলামি বলিয়া উপহাস করিবার জন্য এই সময়ে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারত উদ্ধার" নামে কবিতা লিখিয়াছিলেন ও সেই কবিতায় ভারতসভার ঘরটিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেঁড়ে। পরিহাসের কবি বোঝেন নাই যে, যাহা তাঁহার কাছে উপহসিত তাহা এই ভারতসভার বিশেষ গৌরব। তখনকার দিনে ইন্দ্রনাথের এই পরিহাসের উক্তি খ্যাতিলাভ করিয়াছিল—"দেশ ত দেশেই আছে কি তার উদ্ধার?" কিন্তু এখনকার দিনে যে সেরূপ উক্তি পড়িয়া কেহ আনন্দ ভোগ করে না, তাহা সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মের প্রসাদে। ইন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বঙ্গবাসী পত্রে যখন ১৮৮৬ অব্দে কংগ্রেসের উদ্যোগ তিরস্কৃত হইয়াছিল, তখন ঐ পত্রখানি ছিল দেশ সাধারণের বিশেষ আদৃত; এখন অতি অল্পমাত্র আদৃত পত্রেও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের উদ্যোগ উপহসিত বা তিরস্কৃত হইতে পারে না। যখন ১৮৮৩ অব্দের বৈশাখ মাসে হাইকোর্টের বিচারকবিশেষের অবমাননা করার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বিচারিত ও দণ্ডিত হ'ন, তখন কলিকাতার সকল কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা কোন আন্দোলনকারীর তিলমাত্র ইঙ্গিত বা প্ররোচনা না পাইয়া স্বেচ্ছায় ও উৎসাহে যে ভাবে হাইকোর্টের নিকট সমবেত হইয়াছিলেন ও পুলিশের কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা এই মন্তব্যলেখকের চোখের দেখা। সেদিনে আন্দোলন করিবার জন্য চর নিযুক্ত হইত না অথবা বহু সভার উদ্যোগ ছিল না, অথচ সুরেন্দ্রনাথ যখন জেলমুক্ত হইয়া মণিরামপুরের আবাসে ফেরেন, তখন লোকের জনতা দূর করিবার জন্য বারাকপুর ষ্টেসনে অনেক সঙ্গীনধারী ইংরাজ সৈন্যকে খাড়া করা হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের তখন কিরূপ প্রভাব ছিল, ইহাতেই সুস্পষ্ট। এই ঘটনাটি কবিবর হেমচন্দ্র যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

হায় কি হলো?—বঙ্গদেশের কপাল গেল ফিরে?
গুলি পূরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে!
আসছে সুরেন্ ঘরে ফিরে—এইত কথা সাদা,
এতেই এত আড়ম্বরি—ইংরেজ কি গাধা!

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গবাণীতে লিখিয়াছি যে, কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত হইবার পূর্ব্বে ১৮৮৫ অব্দে স্যর হেনরি কটন্ তাঁহার New India গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ যেরূপ আদৃত ও সম্মানিত, কোন শ্রেষ্ঠতম রাজপুরুষ দেশের লোকের কাছে সেরূপ আদৃত বা সম্মানিত নন্। বঙ্গবিচ্ছেদের আন্দোলনের সময়ে ইউরোপের ও এদেশের



ভারতের প্রথম রাজনৈতিক গুরু

সুরেন্দ্র নাথ

জন্ম—নভেম্বর ১৮৪৮

মৃত্যু—৬ই আগষ্ট ১৯২৫



চির বিদায় সুরেন্দ্র নাথ

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ইংরেজদের চালিতপত্রে সুরেন্দ্রনাথকে ভারতের অনভিষিক্ত রাজা (Uncrowned king) বলা হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ যখন লণ্ডন সহরে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বাগ্মিতায়, তেজস্বিতায় ও প্রতিজ্ঞার অটলতায় বিরোধীদলের ইংরাজেরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র-নাথের প্রতিজ্ঞার অটলতা বুঝাইবার জন্য Review of Reviews পত্রের সম্পাদক খ্যাতনামা ষ্টেড্ সাহেব সুরেন্দ্রনাথ নামটির উচ্চারণের ধ্বনি লইয়া ইংরেজিতে তাঁহার নাম লিখিয়াছিলেন Surrender-not ; বঙ্গচ্ছেদ তিরোহিত হইবার পক্ষে যে এই আন্দোলন বিশেষ সহায় হইয়াছিল তাহা ইউরোপের কোন কোন পত্রিকায় একাধিকবার স্বীকৃত হইয়াছিল।

এখনকার দিনে যাঁহারা সরকারের অসন্তোষ ও নির্য্যাতন ভোগ করেন, সারা দেশের লোক তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন ও তাঁহাদের মাথায় গৌরবের মুকুট পরাইয়া দেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পক্ষের লোকেরা যখন সরকারের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া নানা ক্লেশ সহিতেছিলেন, তখন দেশের বেশির ভাগ শিক্ষিত লোকেরা সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দলের লোকদিগকে উপহাস করিতেন। কালের পরিবর্ত্তনে অথবা অবস্থার উন্নতিতে এখন কর্ত্তব্য-বিষয়ে মতভেদ ঘটিয়াছে, কিন্তু এই মতভেদে কেহ যেন মনে না করেন যে, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দলের লোকেরা তাঁহাদের আমলে একালে নির্য্যাতন অপেক্ষা অল্প নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ অব্দে যে তেজে সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বচর অম্বিকাচরণ মজুমদার সরকারের Prestige কে (দব্দবাই) উপহাস করিয়া বলিয়া-ছিলেন—"Lies there on the street the mangled corpse of your false *prestige* trodden over by the insulted people of India," তাহা এ যুগেও অসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সুরেন্দ্রনাথের নিজের লেখা নূতন প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁহার বাল্য জীবনের ইতিহাস আছে, কাজেই সে বিষয়ে কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই ; তবে সে প্রসঙ্গে যে বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে নাই, তাহার দু-একটা ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ কলিকাতা সহরে ধন্বন্তরী ডাক্তার নাম পাইয়াছিলেন ও তাঁহার খ্যাতির অনুরূপে বহু অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাষায় বিশেষভাবে দক্ষ করিবার ইচ্ছায় ডাঃ দুর্গাচরণ তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে ডব্‌টন্ কলেজে পড়াইয়াছিলেন ; যে ব্যবস্থায় দেশের লোকের প্রতি সহানুভূতি জন্মে তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সে ব্যবস্থা করা হয় নাই। ডব্‌টনে এদেশের ছাত্র ভর্ত্তি করিবার প্রথা ছিল না ; সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কলেজে একা বাঙ্গালী ছাত্র ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার শরীরে বল ছিল ও আত্ম-সম্মান-বোধ ছিল বলিয়া তাঁহার সমপাঠীরা তাঁহাকে কখন অপমান করিতে পারেন নাই। কেন যে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড পাইয়া তিনি সিবিল সার্‌বিসের পদ হারাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে একটি জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্য কি না নির্ণীত হয় নাই। জনরব উঠিয়াছিল যে সুরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার পর কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কয়েকজনের সঙ্গে এমন ভাবে কথা কহিয়াছিলেন যে যাহাতে তাঁবেদারি সূচিত না হইয়া সমকক্ষতা সূচিত হয় ; কোন ছুতা পাইলেই তাঁহাকে জব্দ করা হইবে, ইহাই নাকি কোন একজন রাজপুরুষের লক্ষ্য ছিল।

চরিত্রের সংযম ও প্রফুল্লমনে সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিবার ক্ষমতা, সুরেন্দ্র-নাথের বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার বাল্য জীবনে তিনি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাড়িয়াছিলেন, তাহাতে মদ্যপানে অনুরাগী না হইবার কোন কারণ ছিল না ; অথচ তাঁহার জীবনের ইতিহাস এই, তিনি এদেশে বা বিদেশে কখনও এক ফোঁটা মদ স্পর্শ করেন নাই। ব্যারিষ্টারি শিক্ষার সময়

বিনা পয়সায় কিছু মদ পাইবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এ বিষয়ে আনন্দমোহন বসু ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মত সুরেন্দ্রনাথের নামের খ্যাতি থাকিবে যে তিনি কখনও নেশা করিবার দিকে প্রলুব্ধ হন নাই। এ সময়ে যে কথার উল্লেখ না করাই ভাল, ইঙ্গিতে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি যে, কংগ্রেসের একটি সমিতিতে তরুণ বয়স্কেরা সুরেন্দ্রনাথকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিবার পরেও তিনি প্রফুল্ল মুখে আপনার কাজ শেষ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কখনও উত্তেজিত না হইয়া অটল প্রতিজ্ঞায় প্রফুল্ল মুখে আপনার কাজ করিতে পারিতেন। জীবন চরিতে যাহা মানুষের পক্ষে সাধারণ কথা, তাহার উল্লেখের কোন প্রয়োজন দেখিনা।

জ্যৈষ্ঠ মাসে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার একটি কথার পুনরুল্লেখ করিতেছি; আমি এ জীবনে কখনও সুরেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিকে রাজনীতি ক্ষেত্রের উপযুক্ত পদ্ধতি মনে করিতে পারি নাই, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য কখনও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে ভুলি নাই। সমাজের উন্নতির লক্ষণই এই যে, বহু শ্রেণীর মতভেদের সৃষ্টি হইবে, এই মত ভেদ সহিয়া আমরা যদি পূজ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধা না ঘটাই, তবেই আমাদের সামাজিক স্থিতি কল্যাণকর হইবে। এই নবযুগের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক সুরেন্দ্রনাথ মণিরামপুরের বিজনে প্রাণত্যাগ করিলেন, আর সে সময়ে দেশের লোকেরা বহু সংখ্যায় উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঢালিল না, ইহা ক্ষোভের কথা।

১৯১৩ অব্দ হইতে এপর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের দৈহিক পরিবর্ত্তন কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অবস্থা বিশেষের ফলে আমি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ স্মৃতিতে জাগিতেছে সুরেন্দ্রনাথের অবিশ্রান্ত কর্ম্মক্ষম সবল সুঠাম শরীর, বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি ও প্রফুল্ল মুখচ্ছবি, তাঁহার তেজস্বী ও প্রাণস্পর্শী ভাষা ও অটল প্রতিজ্ঞাজনিত দৃঢ়তা। যাহা ভস্মে পরিণত হইয়াছে তাহার অন্তরালে ছিল যে মহত্ত্ব, তাহার কাছে গভীর শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতেছি।

ভাদ্রে

বাঙ্গলার প্রসার বৃদ্ধির গুজব—আকার-ইঙ্গিতে ইহা স্পষ্ট জানা গিয়াছে যে, মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলাটিকে ওড়িষার সঙ্গে জোড়া হইবে; কিন্তু এই নূতন যুক্ত ওড়িয়াকে বেহারের সঙ্গে রাখা হইবে কি না, তাহা লইয়া নানা অনুমান ও গুজব চলিয়াছে। গঞ্জামের লোকেরা যে পাটনায় তাঁহাদের রাজধানী চান্ না, সরকার বাহাদুর তাহা জানেন; উহার সমাধানে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারেন না। একটি প্রবল গুজব এই যে, নূতন যুক্ত ওড়িষাকে একটি উপপ্রদেশ বা Sub-province করা হইবে, কটকের কলেজ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র হইবে, উপপ্রদেশের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা হইবে, আর উপপ্রদেশের বিচার-বিভাগ কলিকাতার হাইকোর্টের অধীনে আসিবে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে বেহার প্রদেশ আয়তনে যেরূপ ছোট হইয়া পড়িবে, তাহাতে একটি প্রদেশের শাসন চালাইবার মত ব্যবস্থা রাখা কঠিন। বেহারের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমের যুক্ত প্রদেশটির পূর্ব্বাঞ্চলের একটি অংশ জোড়া হইবে কি না, তাহাও কেহ কেহ

ভাবিতেছেন; জনরব এই যে, ওড়িষ্যার সঙ্গে গঞ্জামের মিলনের কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে, আর আগামী এপ্রিল মাসেই নূতন ব্যবস্থা রচিত হইয়া নূতন উপপ্রদেশের সৃষ্টি হইবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ওড়িষায় নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবারে একটি কল্যাণকর সুব্যবস্থা হইলে দেশের লোক রক্ষা পায়।

* * *

আয়-শুল্ক—ভূমির রাজস্বরূপে সরকার যাহা পান, তাহার অধিকাংশ চিরস্থায়ী নিয়মে নির্দ্দিষ্ট আছে, ও সেই রাজস্ব রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়; কাজেই বিবিধ টেক্স বা শুল্ক আদায় করিতে হয়। ইন্‌কম্ টেক্স বা আয়-শুল্ক বসাইবার যে নিয়ম আছে, তাহাতে চাষের কাজের লাভের উপর শুল্ক বসে। চাষারা হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমে সকলের পেটের ভাতের জন্য যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার উপর টেক্স বসান যে বহু কারণে অন্যায়, তাহা সকলের স্বীকৃত। কিন্তু সরকার বাহাদুরের রাজবৈঠকে বিচারিত হইতেছে যে, ধনী জমিদারেরা কররূপে যে টাকা পান, তাহার উপর আয়-শুল্ক বসান চলে কি না। যে যুক্তিতে এই বিচার চলিতেছে, তাহার পরিচয় দিতেছি। যাহারা মানসিক ক্ষমতার বলে ও শরীরের বলে সারা দিন খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাকুরি করে, কি ব্যবসা করে, বা শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয় করে, তাহাদের আয়ের উপর শুল্ক বসান যদি ন্যায়সঙ্গত, তবে যাহারা বিনাশ্রমে কর আদায় করিয়া সুখে খাইয়া পরিয়া নানা বিলাসে টাকা ব্যয় করে, ও লোহার সিন্দুকে টাকা সঞ্চয় করে, তাহারা আয়-শুল্ক দিবে না কেন?

এপ্রসঙ্গে দু-একটা অবশ্য অবলম্বনীয় সাবধানতার কথা বলিতেছি। জমিদার শ্রেণীতে এমন লোক থাকা আশ্চর্য্য নয়, যিনি নিজের দেয় আয়-শুল্কের টাকা ছলে বলে কৌশলে দরিদ্র প্রজাকে পিষিয়া আদায় করিতে পারেন না; দুর্ব্বল প্রজার পক্ষে যে সবল জমিদারের বিরুদ্ধে কথা কওয়া পর্য্যন্ত অনেক স্থলে অসম্ভব, তাহা স্মরণ রাখিয়া প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন। তাহার পর আর একটি কথা এই, যাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরকারকে রাজস্ব দেন, তাঁহাদের আয় অতি অল্প হইলেও জমিদার শ্রেণীতে পড়েন। এই অল্প আয়ের জমিদার ও তালুকদার পদবাচ্যেরা যে অনেক চাষাদের চেয়েও দুঃস্থ ও আপনাদের ভদ্রতা ও সুশিক্ষা বজায় রাখিবার জন্য অনেক স্থলেই ঋণগ্রস্ত, তাহা দয়ার্দ্রচিত্তে বিচারিত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর ও ইঁহাদের পরবর্ত্তী শ্রেণীর লোকেরাই নানা ক্লেশে লেখা-পড়া শিখিয়া দেশের গৌরব ও মান রক্ষা করিতেছেন। আয়-শুল্ক বসাইবার সময় যদি নামে মাত্র তিন-চার হাজার টাকা আয়ের ভূম্যধিকারীদিগকে বাদ দেওয়া যায়, তবে আমাদের দেশের বিশেষ হিতসাধন করা হয়। আমাদের প্রস্তাব, যে সকল জমিদার নামে খ্যাত লোকেরা আয়ের অল্পতার বিচারে ব্যবস্থাপক সভায় জমিদারদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার সময় ভোট দিতে ও সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না, তাঁহাদের উপর আয়-শুল্ক না বসান উচিত।

বিদেশের কথা।—চীন দেশের রাষ্ট্র-বিপ্লবে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে বহু ইউরোপীয় জাতির লোকেরা যে চীনের লোকেদের সভ্যতা বাড়াইবার জন্য ও চীন দেশের পণ্যসামগ্রী বাড়াইবার জন্য দেশের দ্বার জুড়িয়া বসিয়াছেন, তাহাতে চীনের লোকেরা ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ও পীড়িত। চীনের এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আমাদের সহায়তা ও সহানুভূতি পাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধিজিকে এক পত্র লিখিয়াছেন। আমরা আছি "চাচা আপ্‌না বাঁচা" লইয়া, কাজেই ইচ্ছা থাকিলেও পরের ভাবনা ভাবিতে পারি না। চীনের পশ্চিম ভাগের রাষ্ট্র-চালকেরা তিব্বতকে জাগাইবার জন্য সেদেশের অনেক লোকের সাহায্যে পুরাতন প্রথা ভাঙ্গিয়া নূতন ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া অনুমিত হয়। সর্ব্বত্রই জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু এসিয়ার ভাগ্য-বিধাতা কি করিবেন তিনিই জানেন।

একদিকে তুর্কীর সাম্রাজ্য, অন্যদিকে ব্রিটিশের অভিভাবকত্বে পালিত নূতন মুসলমান রাজ্য—আর এই দুইএর মধ্যে ফরাসীদের অভিভাবকত্বে রক্ষিত সিরিয়ান প্রমুখদের দেশ। এই মাঝে-চাপা দেশের লোকেরা ফরাসীদের দয়া ও অনুগ্রহ চায় না, তাই তাহারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছে। এদেশের একজন কবি দেশের দুঃখের কথায় যে অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি। এ যুদ্ধে ফরাসীরা একটু কাহিল হইয়াছেন বটে, তবে জয়লক্ষ্মী কি ভাবে কাহাকে বরণ করিবেন তাহা অনিশ্চিত। একদিকে মরোক্কো দেশে যুদ্ধ, আর একদিকে এইখানে; ফরাসীরা কি ভাবে শান্তি স্থাপন করিবেন তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

সম্প্রতি সারা বিশ্বের জ্ঞানের উন্নতির জন্য ইউরোপে একটি বিদ্যাসঙ্ঘ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য যে, এমন স্থানে একটি নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে কোন ক্ষমতাশালী জাতির প্রভুতা না থাকে। সকল দেশের জ্ঞানপিপাসুরা আপনাদের রুচি অনুসারে যাহাতে সেখানে বাস করিতে পারেন, মনের মত সকল বিদ্যা শিখিতে পারেন ও নানা জাতির সঙ্গে মিশিয়া বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন, সেইরূপ উদ্যোগ হইতেছে, শুনিতেছি। পৃথিবীতে একসঙ্গে বিশ্বপ্রীতির ও ধ্বংস নীতির বাতাস বহিতেছে।

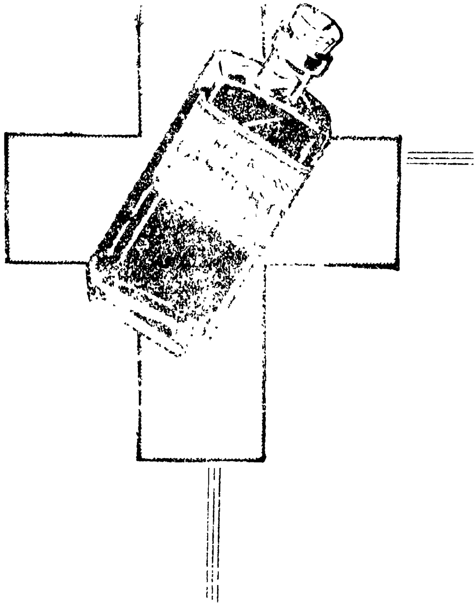
* * *

ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি—নূতন ব্যবস্থার কাউন্সিলে এই প্রথম কাউন্সিলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন; এই নির্ব্বাচিত সভাপতি হইলেন রাজসাহীর তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের সুশিক্ষিত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়। ইনি এই ৩৮ বৎসর বয়সে যেরূপ স্বদেশ-হিতৈষণা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কাছে অনেক আশা আছে।

ed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.



গোল্ড-মেডেল হারমোনিয়ম



রেড ক্রশ

ক্যাষ্টর অয়েল

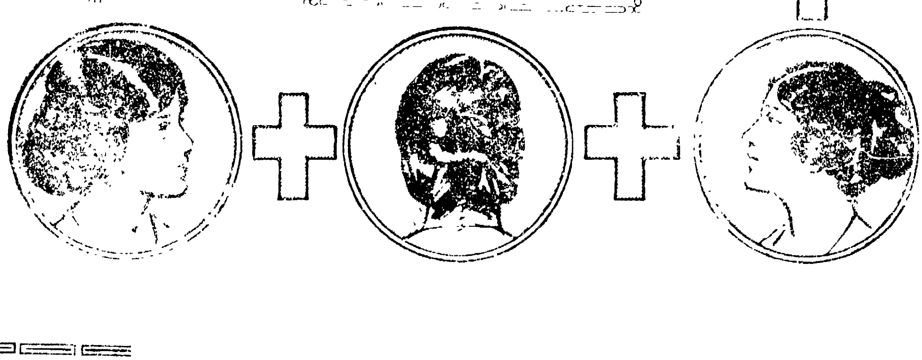
NATURE'S OWN HAIR GROWER



কেশ প্রসাধনে, মনোমত কবরী বন্ধনে, কেশরাজির স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে ইহা

প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।





“ধারে [illegible]লে”

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

আশ্বিন

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
২য় সংখ্যা

হিন্দু মুসলমান

ভগবদ্গীতায় পাই—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

যাহারা আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই ভজন করি; মানবগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করে। ৪।১১

অন্যত্র,

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

যে শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তেরা অন্য দেবতার ভজনা করেন তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক হইলেও আমারই ভজনা করেন। ৯।২৩

এই উদার মতের অবমাননাই ধর্ম্মবেষিতার মূলে। মানুষের মন অনেক স্থলেই স্বভাবতঃ খুব সঙ্কীর্ণ; উদার শিক্ষা বা উপদেশ তাহার প্রসার বৃদ্ধি না পাইলে নিজের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে না। এই সঙ্কীর্ণতা হইতেই এত সাম্প্রদায়িক বিবাদ।

ধর্ম্ম-বিরোধ ভারতবর্ষে নূতন জিনিস নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার আভাষ দেখা যায়। বৈদিক ঋষিকে বিপক্ষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইত, কালে এই

বিপক্ষের মধ্যেও যজ্ঞানুষ্ঠান দেখা দিল। বিরাট হিন্দু সমাজ মূলতঃ রক্ষণশীল হইলেও চিরকালই অন্য সমাজকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। নতুবা এত বড় দেশটায় এত বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন জাতীয় লোক হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না। কত হুন ও শক, কত মঙ্গোলিয়ান ও পারসীক সন্ততি যে এক্ষণে বিশুদ্ধ হিন্দু বলিয়া পরিচিত ইতিহাস তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। কোন বৈদেশিক রাজনীতিবিৎ বলিয়াছিলেন—যে কেহ অন্য কিছু নহে, সেই হিন্দু। এই সংজ্ঞা অতিশয়োক্তি দোষান্বিত নহে, বরং কিছু সঙ্কীর্ণতাভাবাপন্ন। উন্নতি বৈদান্তিকও হিন্দু, ঘোর জড়োপাসকও হিন্দু। একান্নভোজী শুদ্ধাচারীও হিন্দু, পর্য্যুষিত গোমাংস খাদকও হিন্দু। বর্ত্তমান হিন্দু মহাসভা ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধদিগকে স্বদলে গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকায় যে ভারতবাসীমাত্রই হিন্দু নামে পরিচিত সেটাও তত দোষাবহ বলা যায় না। বাস্তবিক সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী ও তাহার পূর্ব্বস্থ সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোককে হিন্দু বলিলেও কোন মারাত্মক দোষ হয় কিনা সন্দেহ। তবে কতক লোক নিজকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, কতক লোক দেয় না। ইহা হইতেই এতটা ভেদজ্ঞান এবং সেই ভেদজ্ঞান সময়ে সময়ে এতটা বিকট আকার ধারণ করে। মুসলমানের কোন কোন আচার এই হিন্দু নামে পরিচিত লোকের মর্ম্মে আঘাত করে এবং হিন্দুর কোন কোন ব্যবহার মুসলমানের মধ্যে অনেকে অধর্ম্মজনক মনে করে।

এই ভেদবুদ্ধি সত্ত্বেও, যখন উভয়ের একদেশে বাস, তখন উভয়েরই মাথা ঠিক রাখা আবশ্যক। এত বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসের একত্র সমাবেশ যে বিরাট হিন্দু সমাজে, তাহার মধ্যে পানাহার বিবাহ স্পর্শ বিষয়ে যতই বিভিন্ন গণ্ডী থাকুক, সময়োপযোগী সংস্কারের আবশ্যকতা যতই পরিস্ফুট হইয়া উঠুক, অন্য সমাজের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজে করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে। দান ও গ্রহণে সে সমাজ এত দীর্ঘকাল হইতে অভ্যস্ত যে, বাহিরে যতই গোঁড়ামি থাকুক, অন্য সম্প্রদায়ের সহযোগিতা তাহার মজ্জাগত। উপনিষদ্ ও গীতার উপদেশ যে সমাজের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ তাহার নিম্নস্তরে যতই সঙ্কীর্ণতা দেখা যাউক, আত্মাটী নিশ্চয়ই খাঁটি।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজও হজরত মহম্মদ অথবা বসোরা বা বোগদাদের খলিফাগণের সমকালীন আরবীয় সমাজ নহে। গজনীর বাদসাহ যতই দেবমূর্ত্তি বিধ্বস্ত করুন, দীর্ঘকালের সাহচর্য্যে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানকে ঘরের লোক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম সাম্যমূলক হইলেও এক সময়ে অসির সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। সে অসি এখন কোষবদ্ধ। উচ্চ অঙ্গের হিন্দু ধর্ম্মেরও মূলমন্ত্র সাম্য, তবে এই সাম্য বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুও কোনও সময়ে অসিদ্বারা রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল কিন্তু অসিদ্বারা কোন সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির হইয়াছে, ইতিহাস এমন কথা বলে না; বরং বৈষম্যকে অতিরিক্তমাত্রায় স্থান দিয়াছে।

এদেশে আগন্তুক মুসলমানদিগের সন্ততি অপেক্ষা স্থানীয় ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীর সন্ততিই অধিক (অন্ততঃ ইহাই সাধারণ মত)। অনেকস্থলেই মুসলমান হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া দৈনন্দিন

কাৰ্য্য নির্ব্বাহ করে। মুসলমানের হাতে প্রস্তুত চাউল ও ডাইলই প্রধানতঃ বঙ্গের হিন্দুর দেহ পোষণ করে, হিন্দুর নিকট প্রাপ্ত অর্থই মুসলমান নানা সাংসারিক কাজে লাগায়। এখনও বঙ্গদেশীয় পল্লীতে অনেক সময়ে হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে মুসলমান দর্শকের জনতা ভেদ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মহরমের সময়েও হিন্দুদর্শকের জনতা কম হয় না। হিন্দুতে হিন্দুতে অথবা হিন্দু মুসলমানে জমী লইয়া বিবাদ——লাঠালাঠি করে দুই পক্ষে মুসলমান। মুসলমান হিন্দু পণ্ডিতের নিকট শুভাশুভ কার্য্যের দিন দেখাইতে আসে, হিন্দু মুসলমানের পীরকে সিন্নি দিতে যায়।

সাধারণ প্রজার এ অবস্থা সত্ত্বেও দেশে এত হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কেন হয়? বকরিদ বা মহরম উপলক্ষে অথবা হিন্দুর দেবপ্রতিমার শোভা যাত্রার সময়ে এত স্থানে এত সুসজ্জিত পুলিস প্রহরী সত্বেও এত দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয় কেন? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এত দলাদলি, এত মত-দ্বৈধ কেন?

এটা সকলেই বোঝেন যে, এই অনৈক্য উভয় পক্ষেরই উন্নতির প্রতিবন্ধক। যতদিন এই দাঙ্গাহাঙ্গামা, এই মত-বৈষম্য দেশকে আলোড়িত করিবে, ততদিন দেশের ঐহিক বা পারত্রিক উন্নতির আশা খুব কম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'স্বরাজ' নামক পদার্থটীকে পাওয়া গেলেও তাহা উপার্জ্জিত হইবে না।

আমরা জানি হিন্দু মুসলমানের হাতে ভাত খায় না, (অবশ্য আজকাল শিক্ষিত কেন্দ্রে এ নিয়মের যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিতেছে), মুসমলমানের ছোঁয়া জলও তাহার পানের অযোগ্য। এ নীতি মুসলমানেও অনেকটা সংক্রমিত হইয়াছে, গ্রাম্য মুসলমানও সাধারণতঃ হিন্দুর ভাত খায় না। হিন্দু পূর্ব্বমুখে দৈবক্রিয়া করে, মুসলমান পশ্চিম মুখে নমাজ পড়ে, হিন্দু জল দ্বারা শৌচক্রিয়া করে, মুসলমান অবস্থাবিশেষে মাটী ব্যবহার করে; হিন্দু (যেখান হইতেই আমদানী হইয়া থাকুক) চাপকান ব্যবহার করে, মুসলমান ব্যবহার করে আস্‌কান; হিন্দু যে ভাবে কাপড় পরে, মুসলমান সাধারণতঃ সে ভাবে পরে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার সাধারণের চক্ষে উভয়ের পার্থক্য দেখাইয়া দেয় কিন্তু বৈষয়িক কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি এগুলির এতই মূল্য? কোন কোন মুসলমান বলিয়া থাকেন, "ঘরে বিড়াল কুকুর ঢুকিলে অন্নজল নষ্ট হয় না, কিন্তু মুসলমান ঢুকিলে হয়, মুসলমান কি এতই ঘৃণ্য?" কিন্তু মুসলমান সম্বন্ধে যে কথা, উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ সম্বন্ধেও ত তাই। হিন্দু তাহার ইংরেজ প্রভুকে যথেষ্ট সম্মান করে, কিন্তু পানাহারের বেলা ত তাহা হইতেও সম্পূর্ণ আলগা। হিন্দু যে পানাহার সম্বন্ধে এত সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ, সেটা ঠিক মুসলমান বা ইউরোপীয়ের প্রতি ঘৃণাবশতঃ নহে। দীর্ঘকালের ধর্ম্মজড়িত সামাজিক সংস্কার তাহাকে কিছু অদ্ভুত রকম আচারসম্পন্ন করিয়াছে। হিন্দুতে হিন্দুতেও এরূপ আচারজনিত অনৈক্যের অভাব নাই। তাহাতেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে গোলযোগ না বাধিতেছে এমন নহে। কিন্তু সে গোলযোগ অনতিক্রমনীয় নহে। হিন্দুর সামাজিক সংস্কারে হিন্দুকে ক্রমে

মনোযোগ দিতেই হইবে। কিন্তু হিন্দুর আচার ব্যবহারের জন্য বৈষয়িক ব্যাপারে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী তাহার সহিত একত্র কার্য্য করিতে পারে না, একথা অস্বীকার্য্য। আদতে আবশ্যক—মনের উদারতা, ধর্ম্মজগতে রেসারেসির ভাব ত্যাগ, আর কর্ম্মজগতে—বৈষয়িক ক্ষেত্রে—ধর্ম্মপার্থক্য ভুলিয়া যাওয়া।

হিন্দু-মুসলমানে যে সকল বিবাদ বিসংবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ নগরে বা নগরের প্রভাববিশিষ্ট স্থানে। অনেক সময়ে গোঁড়া বা স্বার্থান্বেষী লোক এই সকল স্থানে এরূপ উত্তেজনামূলক ভাব প্রবেশ করাইয়া দেয়, যাহাতে সাধারণ লোকের মস্তিস্ক ঠিক রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর একটা কথা এই যে ভারতীয় মুসলমান অনেক সময়ে ভুলিয়া যায় যে, হিন্দুস্থান তাহার জননী, তাঁহারই বক্ষে সে লালিত। যখন ধর্ম্মের কথা উঠিবে তখন আরব বা মক্কার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ মুসলমানের পক্ষে স্বাভাবিক—তাহাতে কোনও আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার স্বার্থ হিন্দুর স্বার্থের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। এখানে বোগদাদ বা এঙ্গোরার পরিবর্ত্তে নিজের প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপই তাহার স্বাভাবিক হওয়া উচিত। বর্ত্তমান জগতে জাতীয়তা সাধারণতঃ ধর্ম্মাচরণ হইতে বিচ্ছিন্ন; ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা, পূর্ব্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করিত আজকাল সভ্য জগতে তাহা নাই। খৃষ্টান জগতে এককালে পোপের যে ক্ষমতা ছিল তাহা বহুকাল হইতে লুপ্ত। অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের নামে আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে, এখন প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক্ পাশাপাশি গৃহে বাস করে; কে প্রোটেষ্টাণ্ট, কে রোমান কাথলিক তাহা চেনা যায় না। খৃষ্টান ও য়িহুদিতে পূর্ব্বে যে এত বিবাদ বিসংবাদ ছিল, এখন বৈষয়িক ক্ষেত্রে কে খৃষ্টান কে য়িহুদী কেহই তাহার বিচার করে না। বিলাতে য়িহুদী মুষ্টিমেয় হইলেও বিরাট খৃষ্টান সমাজের সহিত তুল্য অধিকার বিশিষ্ট। ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা বেশী কিন্তু মুসলমানও মুষ্টিমেয় নহে আবার মুসলমানের অনুপাত দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এক ধর্ম্ম ও আচারবিশিষ্ট বলিয়া মুসলমান অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ। এখানে মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর সংখ্যাধিক্যে ভীত বা সন্দিগ্ধ হইবার কি আছে? যেখানে যেখানে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হইয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলেই হিন্দু মুসলমানের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাতে মুসলমান-সমাজের তেজোবত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বেশী পরিমাণে পাইয়াছে, বেশী পরিমাণে উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও রাজকর্ম্মচারী হইয়াছে। মুসলমান চাহে রাজকার্য্যে ও জনসাধারণের প্রতিনিধিসভায় নিজেদের সংখ্যা বাড়াইতে। উকীল ও ডাক্তার সাধারণতঃ স্বাধীন ব্যবসায়জীবী, মুসলমান চেষ্টা করিলেই তাহার সংখ্যা বাড়াইতে পারে—চেষ্টা ভিন্ন এ ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধির কোন রাজপথ নাই। সরকারী অফিসে বা ব্যবস্থাপক সভায়, মিউনিসিপ্যাল বা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভায় কোন ধর্ম্মালোচনা হয় না, দেশের ও দশের ঐহিক উন্নতিই কার্য্যাবলীর লক্ষ্য। সুতরাং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশী তাহা লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন ততটা আবশ্যক নহে। যে সকল কার্য্য আলোচিত ও সম্পাদিত হয় তাহা কাহা কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলা ও সদ্‌বুদ্ধির

সহিত সম্পাদিত হইবে তাহা দেখাই বেশী আবশ্যক। হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকও দেশে আছে। খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, জড়োপাসক কাহারও স্বার্থই উপেক্ষণীয় নহে। প্রয়োজন শিক্ষিত, নিরপেক্ষ, সদ্‌বুদ্ধিশালী, কার্য্যদক্ষ লোকের। এরূপ লোক বাছিয়া দিবার অবাধ অধিকার নির্ব্বাচকদিগের থাকা উচিত। কর্ম্মচারি-নিয়োগ গবর্ণমেণ্টের হস্তে। গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সর্ব্বদাই বিবেচনা করেন কিন্তু কেবল মাথা গণিয়া অনুপাত রক্ষার নিয়ম কি বিষম? এই নীতির অনুসরণ করিতে গেলে কোথাও ইহার সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ত আছেই। তাহা ছাড়া হিন্দুর মধ্যেই এত বিভিন্ন জাতি যে, একবার অনুপাতের ফাঁদে পা দিলে ইহার প্রত্যেক জাতিই অনুপাত চাহিয়া বসিবে। শেষে এই অনুপাতের যে কোথায় শেষ হইবে তাহা ভগবানই জানেন। ভারতবর্ষে পার্শীজাতি সংখ্যায় অল্প কিন্তু যোগ্যতায় বড়। বাসিন্দা ইউরোপীয়গণ সম্বন্ধেও ঐ কথা। যোগত্যার হিসাবে ইহাদিগকে সংখ্যার অনুপাত ছাড়াইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিয়োগ কি অন্যায়? সরকারী কার্য্য দাসত্বমূলক হইলেও ইহাতে অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার কিছু সুযোগও জন্মে, তাহাতে একটু সাম্প্রদায়িক মোহ আছে। কিন্তু যাহার কার্য্যের সহিত দশের স্বার্থ সংস্পৃষ্ট তাহাকে বাছাই করিবার সময়ে দশের স্বার্থ দেখাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। মিথ্যার মধ্য দিয়া সত্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি যাহার কম তাহাকে বিচারাসনে বসাইবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে তাহার হস্তে বিচারপ্রার্থীর কি দশা ঘটিবে। যে কার্য্যে উৎকোচ দ্বারা উদরপূরণ সনাতন প্রথা, সেখানে দেখিতে হইবে নিয়োজ্য লোকটীর ধর্ম্মজ্ঞান কতদূর জাগরিত। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যোগ্যতার মুখ্য উপাদান স্থির হইলে এই সকল বিবেচনা নিশ্চয়ই কম আসিবে। যে দশজনকে লইয়া কাজ তাহাদিগের দলভুক্ত হওয়া, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি থাকা, তাহাদের কার্য্যাকার্য্য আচার ব্যবহার জানাও আবশ্যক কিন্তু মিশ্র জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত লোকের এ যোগ্যতাটুকু খুব অসাধারণ নহে।

কর্ম্মবিভাগ সংসারের নিয়ম। কতক লোক কৃষিকার্য্য করিবে, কতক অন্য দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কতক ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবে, কতক দেশের শাসন সংরক্ষণ ও কেরাণীগিরি করিবে। ইহার কোন কার্য্যই হেয় নহে; জোর করিয়া এক কার্য্যের উপযুক্ত লোককে অন্য কার্য্যে বসাইয়া দিলে কেবল অবিচার নহে, বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। পরীক্ষায় পাশই কার্য্যে যোগ্যতার একমাত্র পরিচায়ক নহে, ইহা ঠিক। যোগ্যতা দেখিয়া লও, দশের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয় তাহা বিবেচনা কর, ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থও ভাল করিয়া দেখ কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গণ্ডী ধরিয়া অনুপাত কষিতে বসিও না।

হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের বিরোধ অপেক্ষা সমতা অনেক বেশী। এই সমতার উপর মিলন প্রতিষ্ঠিত না করিয়া বিরোধকে যতই আমল দেওয়া যাইবে, দেশে আভ্যন্তরিক শান্তি বা একতা স্থাপনে ততই বিলম্ব ঘটিবে। নেতৃগণের এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। সমতা

যাহাতে স্বাভাবিক ভিত্তি বিশিষ্ট হয় সেটা নিশ্চয়ই আবশ্যক। বালির বাঁধ কতক্ষণ থাকে? যখন মুসলমানের খলিফার অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন খিলাফত আন্দোলনের সহিত অসহযোগ মিশাইয়া দিয়া দেশের রাজনৈতিক নেতারা একটা বড় রকমের দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের খলিফা ধর্ম্মজগতের নেতা, সকল দেশের মুসলমানের সহিত, তাঁহার সংস্রব, আর হিন্দুর জাতীয়তা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুইটী আদর্শ বিভিন্ন, একটীর মধ্যে অন্যটীকে জোর করিয়া কলম বাঁধিয়া দিলে সে কলমের গাছ কখন স্থায়ী হইতে পারে না। তাহা হইলও না। খলিফা এক্ষণে স্থানচ্যুত; মুস্তাফা কামালপাশা তুরুস্কের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে খলিফাকে বিদায় দিয়া মুসলমানের ধর্ম্মজগৎ হইতে তুরস্কের রাজনৈতিক জীবন স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষীয় মুসলমানের শিক্ষা হওয়া উচিত। মুসলমানের ধর্ম্মবন্ধন ও হিন্দুর দেশমাতৃকার বন্ধন এই দুইয়ের একত্র গ্রথিত হওয়ার সূত্র দাঁড়াইয়াছিল ইংরেজরাজের প্রতিকূলতা। কিন্তু ইংরেজরাজের যে সকল কার্য্যে হিন্দু নেতারা সংস্পৃষ্ট ছিলেন খিলাফতের উন্নতি বা অবনতি, অস্তিত্ব বা বিলোপের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। কাজেই খিলাফতের সহিত ইংরেজের সম্পর্ক উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃত্রিম বন্ধনও ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

প্রকৃত বন্ধন সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে আসিতে পারে না। ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতি জাতীয়তা গঠনের সহায় সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম ভিন্ন সেখানে সাধারণ বৈষয়িক কার্য্যনির্ব্বাহের সময়ে সকলেরই ভুলিয়া যাওয়া উচিত আমি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান, আর একের ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান যদি অপরের অপ্রীতিকর হয় তাহা হইলেও তাহা সহিয়া লওয়া উচিত। গীতার ভাষায়—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

ভগবানের প্রিয়পাত্র অন্য লোককে উদ্বিগ্ন করেন না এবং অন্য লোকের কার্য্যেও উদ্বিগ্ন হন না। যাহা ধর্ম্মের অনুশাসনে অবশ্য কর্ত্তব্য নহে তাহা যদি অপরের মনে কষ্ট দেয় তবে ভাল লোকের কখনই তাহা কর্ত্তব্য নহে। মুসলমানপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশীরা সাধারণতঃ ইহা বোঝে। তাই সেখানে ধর্ম্মের নামে খুন জখম এত কম। পূর্ব্ববঙ্গে খুনজখম যথেষ্ট কিন্তু তাহা সাধারণতঃ জমী লইয়া। মুসলমানের স্বার্থ প্রতিবেশী হিন্দু এবং হিন্দুর স্বার্থ প্রতিবেশী মুসলমান যদি না দেখিবে তবে মিলন আসিবে কোথা হইতে?

ব্যবস্থাপক সভায় ও মিউনিশিপ্যালিটী প্রভৃতিতে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে পৃথকভাবে পৃথক পৃথক গণ্ডী নির্ব্বাচন সভ্যদেশে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এত বড় বিভিন্নতা সকল দেশে না থাকুক, অল্পবিস্তর ধর্ম্ম বা সমাজ-সংক্রান্ত বিভিন্নতা সকল দেশেই আছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই কোন নির্দ্দিষ্ট জনপদবাসী একত্র হইয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, নতুবা কেবল ভেদনীতির বিস্তৃতি

হয় মাত্র। ভেদনীতি দ্বারা কখন বিবর্ত্তন বলে জাতীয় জীবন গঠিত বা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার জন্য মুসলমান ও বে-মুসলমান ভেদে পৃথক পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ইহা কিয়ৎকালের জন্য কার্য্যকরী থাকিবে এইরূপ ভাবিয়াই করিয়াছিলেন; ইহা যে জাতীয়তার বিরোধী ও পরিত্যজ্য তাহা বলিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোককে আপন আপন গণ্ডীর ভিতর হইতে প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার নিয়ম করিলে না মেলে তেমন উপযুক্ত লোক, না জন্মে সমবেত ভাবে কার্য্যকরার ক্ষমতা। হিন্দু যদি মুসলমান বা খৃষ্টান প্রতিবেশীকে নির্ব্বাচন করিতে ইচ্ছুক হয় অথবা মুসলমান যদি হিন্দু প্রতিবেশীকে উপযুক্ত প্রতিনিধি মনে করে, তাহা হইলে আইনের সাহায্যে এরূপ নির্ব্বাচনে বাধা দেওয়া গণতন্ত্রের মূল সূত্রের বিরোধী।

কোন স্থানেই হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যায় সমান থাকিতে পারে না। সাধারণের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাসমিতিতেও প্রতিনিধি একদলে বেশী, এক দলে কম থাকিবেই। যে দিকে ভোট বেশী, সেই দিকেই যখন জয়, তখন পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ভিন্ন উপায় কি? যদি হিন্দু হিন্দুপ্রতিনিধি পাঠাইবে, মুসলমান মুসলমান প্রতিনিধি পাঠাইবে—এই নীতিই স্থায়ী হয়, তবে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। যতদিন সে বিশ্বাস না আসিবে, ততদিন মিলন আসিবে কোথা হইতে?

মুসলমানেরা বীরের জাতি বলিয়া একটা প্রসিদ্ধি আছে, আর হিন্দু হইল ধীরের জাতি। হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর খাদ্য হিন্দুকে ধীর করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ধীর হইলে যে সে বীর হইতে পারে না এ মতও স্বতঃসিদ্ধ নহে। বীরত্ব সাধারণতঃ দেশের জলবায়ু এবং লোকের স্বাস্থ্য ও অভ্যাসের ফল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে সকল মুসলমান আছে, পার্ব্বত্য ভুমির কঠোর জীবনসংগ্রাম ও জলবায়ুর উগ্রতা তাহাদিগকে উগ্র ও তেজস্বী করিয়া দেয়। পূর্ব্ববঙ্গের নবোত্থিত ভূমির মুসলমান রৌদ্র, জল ও মানুষের সহিত লড়াই করিয়া বীর হইয়া উঠে। আবার এদিকে বিলের কৃষিব্যবসায়ী মুসলমান ও নমঃশূদ্রের মধ্যে বীরত্বের কোন তারতম্য দেখা যায় না। তবে হিন্দু বহু শাখায় বিভক্ত এবং মুসলমানের ন্যায় একত্র উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা মিলিত নহে, তাই হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধতায় মুসলমানের সমকক্ষ নহে। হিন্দু বিভিন্নতা ভুলিয়া আরও সঙ্ঘবদ্ধ, আরও সাহসী ও বিক্রান্ত হইলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের সহিত এতটা সংঘর্ষ বাধিবে না, অনেক হিন্দু নেতা এইরূপ বলেন। মতটা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। শারীরিক বলের উৎকর্ষ ও একত্র কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত নৈতিক বল সংগ্রহ হিন্দুর এক্ষণে একান্ত আবশ্যক। ইহাকে "সঙ্গঠন" বল আর যাহাই বল, জিনিষটা এই। ইহার মধ্যে হিংসা বা বৈরিতা থাকা কর্ত্তব্য নহে, নিজকে যত উন্নত করা যাইবে, ততই অন্যের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করার অধিকার জন্মিবে। প্রবলের বিরুদ্ধে সহসা কেহ উত্থিত হইতে সাহসী হয় না। হিন্দু জাতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর কিন্তু নির্জ্জীব। তাহাকে সজীব করিতে হইলে বিস্তৃতভাবে

ব্যায়ামচর্চ্চা ও সমবেতভাবে কার্য্যশক্তির জাগরণ আবশ্যক। হিন্দু মুসলমান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করুক বা শিক্ষা লাভ করুক একথা আমি বলি না। বৈষয়িক ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান যতই একত্র কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইবে, ততই উভয়ের মিলন নিকটবর্ত্তী হইবে। মহাত্মা গান্ধি চরকা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ মহাত্মাজীর চেষ্টাসত্ত্বেও চরকার ভক্ত হয় নাই, কোনকালে যে হইবে এমন লক্ষণও দেখাইতেছে না। নিজ নিজ ঘরে বসিয়া সূতা কাটিলেই যে হিন্দু মুসলমানের একতা আসিবে তাহাও মনে হয় না। যদি কোন কুটীর শিল্প পরিবর্দ্ধিত আকারে স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টা ও যত্ন আকর্ষণ করে, তবে তদ্দ্বারা হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের সহায়তা হইতে পারে। সমবায় সূত্রে গ্রথিত হিন্দু ও মুসলমান বৈষয়িক ব্যাপার উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত হইলে অনেকটা একতা তাহা হইতে আসিতে বাধ্য। এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, একত্র ব্যায়াম, একত্র যৌথব্যবসায় প্রভৃতি একতার পক্ষে নিশ্চয়ই সহায়। যাহারা কোনকালে দেশপ্রচলিত বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষার ধার ধারে না, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দূ বা অন্য কোন ভাষা প্রচলনের চেষ্টা এই একতার পক্ষে অনুকূল নহে। বাস্তবিক মাতৃভাষার সাহায্যে বিস্তৃত ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা, ইতিহাস বিজ্ঞানাদির প্রচুর চর্চ্চা হিন্দুর মধ্যে যতটা আবশ্যক হইয়াছে, মুসলমানের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বেশী বই কম নহে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গোঁড়ামি জাগাইয়া দেন তাঁহারা ভেদবুদ্ধিরই প্রচারক। ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশ মূলতঃ পল্লীগ্রামে, তবে নগরের ঢেউ গ্রামে পৌঁছিয়া লোককে উত্তেজিত করে। যাঁহারা এই ঢেউ তোলেন তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কারণ এই ঢেউ একবার জোর করিলে তাহার বেগ থামান তাঁহাদেরও সাধ্যের অতীত হইয়া পড়ে।

ইংরেজরাজ আমাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি (responsible government) দিবেন প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। যাহারা আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষায় অসমর্থ, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার যে অন্তঃসারশূন্য একথাও অনেক ইংরেজ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। বিরুদ্ধভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলমানের অস্তিত্ব যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের একটী প্রধান অন্তরায় একথা যে রাজপুরুষেরা বলেন, তাঁহাদিগকে মুখে যতই তিরস্কার করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে দোষ দেওয়া চলে না। আমাদের বুভুক্ষু প্রতিবেশীর অভাব নাই। ইংরাজের সবল বাহু ও বৈজ্ঞানিক সামরিক জ্ঞানই যে আমাদিগকে এই বুভুক্ষার হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। হিন্দুর ধর্ম্মভূমি, কর্ম্মভূমি, গৌরবের স্থান সমস্তই ভারতবর্ষ; মুসলমান যদি মনে করে অগ্রে স্বদেশ ও স্বদেশবাসী, পরে সম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, তবেই একটা গুরু সমস্যার সমাধান হয়।

হিন্দু ভারতবর্ষে সংখ্যায় বড়; বঙ্গদেশে সংখ্যায় কম হইলেও প্রতিপত্তিতে বড়। হিন্দুর উচিত কার্য্যে দেখান যে, মুসলমানের স্বার্থরক্ষায় হিন্দু উদাসীন নহে। তবে সরকারী কার্য্যে বা প্রতিনিধি নিয়োগের অনুপাত কষিয়া দেওয়া সুনীতি নহে; উহা ভেদনীতি। উদারহৃদয় চিত্তরঞ্জনের

"প্যাক্ট" দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইয়াছে। অচিরে উহার ভাগীরথী গর্ভে আমূল নিমজ্জন আবশ্যক। আদত কথা হৃদয় লইয়া। একদেশে বাস, এক জলবায়ুতে অবস্থান, এক দেশমাতৃকার স্তন্যে শরীরের পুষ্টি, এক শাসনপদ্ধতির বিধানে সুখদুঃখ ভোগ, এই সকল যদি ভ্রাতৃভাব আনয়ন না করে, তবে "প্যাক্ট" দ্বারা ভেদজ্ঞান দৃঢ়তর করিয়া দিলে স্থায়ী সুফলের আশা কি ? ব্যবস্থাপক সভায় কয়টা ভোট বেশী হইল, কি কম হইল তাহাতে কি আসে যায় ? ঢোঁড়া সাপের গর্জ্জনে যে রাজ্যশাসন অসম্ভব হয় না তাহা সকলেই বোঝে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে মতভেদ থাকিবেই। মতভেদ সত্বেও দেশকে বড় করিবার একটী ইচ্ছা যদি থাকে এবং ভেদকে প্রাধান্য না দিয়া ভেদের মধ্য দিয়া একতা আনয়ন যদি সম্ভব হয়, তবে প্রকৃত নেতার কার্য্য সেই দিকে শক্তি প্রয়োগ। এইরূপ একতা আসিলে, ধর্ম্মবিরোধ আপনা হইতেই লয় পাইবে।

হিন্দুর নিকট মুসলমানের এবং মুসলমানের নিকট হিন্দুর এখনও অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। মুসলমানের সঙ্ঘবদ্ধ ভাব হইতেই তাহার বাহুবল। এই সঙ্ঘবদ্ধতা মুসলমানের নিকট হিন্দুর শিক্ষার বিষয়, আবার হিন্দুর পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুরাগ মুসলমানের অনুকরণীয়। এই দান ও প্রতিগ্রহণের ফলে পরস্পর পরস্পরকে আরও ভাল করিয়া চিনিবে এবং আমাদের মনে হয় সঙ্ঘর্ষও কমিয়া আসিবে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে হিন্দু নগণ্য নহে। সঙ্ঘবদ্ধ ও শারীরিক বলসঞ্চয়ে অধিকতর উদ্যমশীল হইলে পার্ব্বত্য মুসলমানের হস্ত হইতে ধনমান রক্ষার জন্য তাহাকে গবর্ণমেন্টের সমরবিভাগের উপর এতটা নির্ভর করিতে হইবে না। বঙ্কিম বাবু এক সময়ে তাঁহার উপন্যাসে বঙ্গের মুসলমান যোদ্ধাকে ইংরাজের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—সরবত খুঁজিয়া বেড়ায়।" কথাটায় সায় দেওয়া যায় না; অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলাই মুসলমান রাজ্যের পতনের কারণ।

ইংরাজের নিকট আমরা অনেক শিখিয়াছি আরও অনেক শিখিবার আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রাষ্ট্রগঠন তাহার একটী। সমাজের নিম্নস্তর এইভাবে কবে অনুপ্রাণিত হইবে জানি না, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত ভেদবুদ্ধিকে দূর হইতে নমস্কার করা।

এ ত গেল উভয়ের কর্ত্তব্যের কথা। কিন্তু মুসলমান যদি পৃথক্ ভাবে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেই ইচ্ছুক হয়, হিন্দুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তবে বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুর কর্ত্তব্য কি ? আমাদের মনে হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া। বেশী চাকরীর লোভ দেখাইয়া অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে লইয়া একটী গণ্ডী পাকাইয়া ফল নাই। যাহার যাহার কর্ত্তব্য, নিজের নিকট। মুসলমানের অহিত চিন্তা না করিয়া মিলনের পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিয়া হিন্দু উন্নতির পথে চলিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। মুসলমান যখন বুঝিবে সাম্প্রদায়িক আদর্শ বিসর্জ্জনই উভয়ের পক্ষে হিতকর তখন আপনা হইতে সেও এই পথ ধরিবে। সাময়িক সুবিধার জন্য হিন্দুর পক্ষে আদর্শের বিকৃতি কোন ক্রমেই অনুমোদনীয় নহে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

একা

এসেছিনু এ ধরায়, পরাণের পসরায়
বহে লয়ে অনেক বেসাতি ;
লাগেনিক কোন কাজে,— ঢেকে রেখেছিনু লাজে ;
মেলে নাই জীবনের সাথী !
শিশুর মনের দাবী স্নেহের সোণার চাবী
খুলে নিয়ে দেখে নাই কেহ,
কেমন সে মনভরা, পুলকে কাঁপন-ধরা
নবনীত নব তনু-দেহ !
কিশোর মাধব মাসে, কিশলয়ে ফুলবাসে,
পরাণের কামনা স্বপন,
কেহ দেখে নাই চোখে, অন্তরে অন্তর লোকে
চিরদিন রহিল গোপন !
লোকে যারে বলে প্রেম, নিকষে কষিত হেম,
সে কি কারে দিয়েছিনু আমি ?
স্মৃতি যার পরিচয়, লিখেছে পরাণময়,
সেই একা মোর অন্তর্য্যামী !
ভূষণে যা নয় গড়া,— খনির তিমিরে পড়া
ধূলির পাঁজর তলে লীন,
তারে আর কেন আজ মিছে হায় দেবে লাজ ;
রূপ যার বিফল মলিন !
গান মোর যা'র লাগি, যার নাম অনুরাগী,
যা'র সুরে সাধা এ বাঁশরী,
আমার স্মরণ মাঝে, যদি তার বীণা বাজে,
তাও যেন আপনা পাশরি !
শুধু ক্ষণিকের বেশী, পরাণের প্রতিবেশী
করিতে চাহেনা কারে মন,
দুকথা বলিয়া ফেলে, পরাণ নয়ন মেলে,
বলে কেন করিনু এমন ?
নিমেষে নিমেষ গাঁথি, যায় দিন, কাটে রাতি,
অনিমেষ বন্ধু তারি মাঝে,
সেই তাঁর সঙ্গ-সুখে, পলে অনুপলে বুকে
অনাহত বীণাখানি বাজে ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

জ্যোতিষ্কদের শক্তি

আয়ের উপায় না রাখিয়া কেবল ব্যয় করিতে থাকিলে রাজার ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া যায়। সূর্য্য ও দূরবর্ত্তী নক্ষত্রেরা কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া তাপ ও আলোক বিলাইয়া আসিতেছে, অথচ তাহাদের শক্তির ভাণ্ডার এপর্য্যন্ত ক্ষয় পায় নাই। ইহা দেখিলে বুঝিতে হয়, জ্যোতিষ্কগুলি হইতে যেমন তাপ বাহির হইয়া যায়, তেমনি কোনো উপায়ে সেগুলিতে তাপ জন্মিয়া ক্ষয়ের পূরণ করে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে "যত্র আয় তত্র ব্যয়ের" কোনো ব্যবস্থা আছে; নচেৎ তাহারা ক্রমেই শীতল হইয়া আসিত। ব্যয় কোন্ পথে চলিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়; কিন্তু আয়ের পথ সুস্পষ্ট নজরে পড়ে না। এইজন্য জ্যোতিষ্কেরা কি প্রকারে দেহের তাপ রক্ষা করে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বৈজ্ঞানিকদিগের নিকটে শুনা যায়।

অন্য নক্ষত্রদের কথা ছাড়িয়া আমাদের নিকটতম নক্ষত্র সূর্য্যের তাপ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যের তাপরক্ষার কারণ সম্বন্ধে বলিতেন, আমাদের পৃথিবীতে যেমন নিয়ত উল্কাপাত হয়, সূর্য্যেও ঠিক সেইরকম উল্কাপাত চলে। যে সকল উল্কা-পিণ্ডকে পৃথিবী টানিয়া আনে, তাহা ছোটো। মহাকায় সূর্য্য যে-সকল উল্কাপিণ্ডকে টানিয়া দেহস্থ করে, সেগুলি প্রকাণ্ড বড়। এই উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষণে সূর্য্যমণ্ডলে যে তাপ জন্মে, তাহাই ক্ষয়ের পূরণ করে। বলা বাহুল্য প্রাচীনদের এই কথাগুলি এখন উপকথাবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। আধুনিকেরা বলেন, যেমন দিন যাইতেছে তেমনি তাপ ক্ষয় করিয়া সূর্য্য নিজের দেহটিকে সঙ্কুচিত করিতেছে, এবং এই সঙ্কোচন-জাত তাপেই ক্ষয়ের পূরণ হইতেছে। কিন্তু এখন এই মতবাদেও বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ আসিয়াছে। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিতেছেন, সূর্য্য নিজের দেহখানিকে সঙ্কুচিত করিয়া এখনকার মতো ছোটো আকারে আসিতে যে তাপ উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাতে কেবল দুই কোটি বৎসর পর্য্যন্ত তাহার তাপ রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সূর্য্যের বয়স দুই কোটি বৎসরের অনেক অধিক। সমুদ্র-জলে যে-লবণ জমা আছে এবং ভূগর্ভে যে-সকল শিলাস্তর নিহিত আছে, তাহা লইয়া হিসাব করিলে পৃথিবীর বয়স হইয়া দাঁড়ায় অন্ততঃ ত্রিশ কোটি বৎসর। আবার আজকাল প্রাচীন শিলাগুলিকে তেজোনির্গমণ-প্রথায় (Radio-active method) পরীক্ষা করিয়া যে হিসাব করা হইতেছে, তাহাতে পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ এক-শত ষাইট কোটী বৎসর হইতে দেখা যায়। খুব অল্প দিন হইল চেম্বার্লেন্ ও লর্ড রেলে (Lord Rayleigh) যে-হিসাব দাঁড় করাইয়াছেন তাহাতে পৃথিবীর বয়স হইয়াছে তিন হাজার কোটি হইতে নয় হাজার কোটির মধ্যে। পৃথিবী সূর্য্যেরই আত্মজ। সন্তানের বয়স যদি এক শত ষাইট কোটি বা নয় হাজার কোটি বৎসর হয়, পিতার বয়স যে তাহা

অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। কাজেই সূর্য্যের তাপের জমা খরচে যে দুই কোটি বৎসরের আয়ের অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহা কিছুই নয়। কোথায় নয়-হাজার কোটি, আর কোথায় দুই কোটি! সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কেবল দেহ-সঙ্কোচ করিয়া সূর্য্য তাপ রক্ষা করে না,—ইহার তাপ-অর্জ্জনের অন্য কোনো উপায় আছে। কিন্তু সে-উপায়টা যে কি, তাহা আজও নিঃসন্দেহে স্থির হয় নাই। নানা পণ্ডিত সে সম্বন্ধে নানা অনুমান প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এখানে সেগুলির মধ্যে কেবল একটিরই কথা আলোচন করিব।

অধিক চাপ-প্রয়োগে পদার্থের প্রকৃতির কি কি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আমাদের অতি অল্পই জানা আছে। চাপ বৃদ্ধি করিলে সাধারণ পদার্থকে গলাইতে ও ফুটাইতে অধিক উষ্ণতার প্রয়োজন হয়, এবং চাপ কমাইলে অল্প তাপেই সে-সকল কাজ চলে। ইহা আমাদের জানা আছে। তা' ছাড়া চাপে পদার্থের ঘনতা ও কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়, ইহাও আমরা জানি। বায়ুমণ্ডলের চাপ খুব অধিক নয়। প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চিতে ইহার পরিমাণ কেবল সাড়ে-সাত সের মাত্র। যন্ত্রের সাহায্যে বা অপর কোনো কৃত্রিম উপায়ে আমরা ইহারি এক লক্ষ গুণের অধিক চাপ উৎপন্ন করিতে পারি না। চাপের প্রভাবে পদার্থের গুণের যে-সকল পরিবর্ত্তনের কথা বলা গেল, তাহা এইপ্রকার সামান্য চাপ লইয়া পরীক্ষা করায় ধরা পড়িয়াছে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ পদার্থে তাহার উপরকার মাটি-পাথরের ভারে যে চাপ পড়ে, তাহার পরিমাণ সাধারণ বায়ু-চাপের ত্রিশ লক্ষ গুণের কম নয়। আমাদের পরিচিত নানা বস্তুর মধ্যে পৃথিবীই সকলের চেয়ে বৃহৎ। অনন্ত মহাকাশ জুড়িয়া যে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক চলা ফেরা করিতেছে, সেগুলি পৃথিবীর চেয়ে যে কত বড় তাহার হিসাবই হয় না। কিন্তু তাহাদের কোনোটিই পৃথিবীর মতো কঠিন অবস্থায় নাই। ইহা দেখিয়া আজকালকার একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, আমরা যে সকল কঠিন বা তরল পদার্থের সহিত পরিচিত আছি, তাহাদের চাপ সহিবার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া চাপ পাইলে সেগুলি আর কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না,—তখন আপনা হইতেই বায়ব অবস্থা পাইয়া সেগুলি জ্বলিয়া পুড়িয়া দেহনিহিত সুপ্ত শক্তিকে প্রকাশ করিতে থাকে।

চাপের পরিমাণ যে-সীমায় পৌঁছিলে কঠিন ও তরল বস্তু বাষ্পীভূত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা সাধ্যাতীত। কারণ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা ইহা নির্ণয় করার উপায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রে যে সেই চরম চাপ পড়িতেছে না, তাহা নিশ্চিত। পড়িলে ভূগর্ভের গভীর স্থানের মাটি-পাথর কখনই কঠিন অবস্থায় থাকিতে পারিত না। সূর্য্যের দেহের ভিতরকার পদার্থে যে চাপ পড়ে তাহা সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সেইজন্যই পৃথিবীর মাটি ও জলের মতো কঠিন বা তরল পদার্থ সূর্য্যে নাই। তাহার দেহের সমস্ত বস্তুই চাপ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া ভিতরকার শক্তি নানা আকারে প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্যের তাপ ও আলোক সেই শক্তিরই প্রকাশ। কেবল সূর্য্যে নয়, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া লোকে-লোকে নক্ষত্রে-নক্ষত্রে চাপের এই লীলা

চলিতেছে এবং চাপের প্রভাবে জড়ের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশমান হইয়া জ্যোতিষ্কদিগকে শক্তিশালী করিতেছে।

যে-সকল পণ্ডিত এই মতবাদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। সকল যুক্তির আলোচনা এইপ্রকার প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমরা এখানে কেবল দুই একটির উল্লেখ করিব। দূরস্থিত নক্ষত্রলোকের সকল খবর আমাদের জানা নাই; কিন্তু সৌরজগতের অনেক গ্রহ-উপগ্রহের মোটামুটি পরিচয় একে একে আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহা হইতে দেখা যায়, ছোটো গ্রহদের মধ্যে আকারে ইউরেনস্ই পৃথিবীর তুলনায় এক ধাপ উপরে আছে এবং তাহার পরে আছে নেপচুন্। পৃথিবীর তুলনায় ইউরেনাসের বস্তুমান (mass) প্রায় সাড়ে-চৌদ্দ গুণ এবং নেপ্চুনের বস্তুমান সাড়ে-ষোল গুণ। কিন্তু ইহারা যে-সকল উপাদানে গঠিত তাহার ঘনতা জানা নাই। পৃথিবীর শিলামৃত্তিকার ঘনতা আমাদের জানা আছে। পৃথিবী যে-উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানে ইউরেনস্ ও নেপ্চুনকে গড়িলে, তাহাদের দেহের ব্যাস কত হইত, তাহা হিসাব করা কঠিন নয়। সেই হিসাবে উহাদের ব্যাস হইয়া দাঁড়ায় পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় আড়াই গুণ এবং তাহাদের কেন্দ্রে চাপ পড়ে পৃথিবীর কেন্দ্র-চাপের প্রায় সাতগুণ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরেনস্ ও নেপ্চুনের উপাদানের ঘনতা পৃথিবীর ঘনতার সমান নয়। পৃথিবীর গড় ঘনতা জলের ঘনতার প্রায় সাড়ে-পাঁচ গুণ এবং ইউরেনসের ঘনতা জলের ঘনতার দেড়গুণ। এই সকল তথ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন, যে-চাপে জড়বস্তু কঠিন ও তরল অবস্থায় থাকিতে পারে, ইউরেনসের কেন্দ্রস্থ বস্তু তাহা অপেক্ষা অধিক চাপ পাইয়াছিল,—ইহাতেই দেহের অধিকাংশ বাষ্পীভূত হইয়া ইউরেনস্কে ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। নেপ্চুন সম্বন্ধেও ঠিক্ সেই কথাই বলা যায়। ইউরেনসের তুলনায় নেপ্চুনের বস্তুমান বেশি, কিন্তু ঘনতা এত কম যে, তাহার দেহের আগাগোড়াই বাষ্প দিয়া প্রস্তুত মনে হয়। সুতরাং বলিতে হয়, যে চাপে জড়বস্তু তরল ও কঠিন অবস্থায় থাকিতে পারে, নেপ্চুনের কেন্দ্রে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক চাপ পড়িয়াছিল। তাই ইহাতে এখন কঠিন বা তরল পদার্থ দেখা যায় না। শনিগ্রহের বস্তুমান পৃথিবীর বস্তুমানের প্রায় চুরানব্বই গুণ অধিক, কিন্তু দেহের ঘনতা জলের ঘনতার অর্দ্ধেকের সমান। অর্থাৎ ইহার দেহটার অধিকাংশই বাষ্পময়। শনির দেহ যদি পৃথিবীর মাটিপাথরের মতো ঘন পদার্থে গঠিত হইত, তাহা হইলে উহার ব্যাস হইয়া দাঁড়াইত পৃথিবীর ব্যাসের সাড়ে চারি গুণ; অর্থাৎ তাহার কেন্দ্রে চাপ পড়িত পৃথিবীর কেন্দ্রীয় চাপের পঁচিশ গুণ। এই চাপে কোনও বস্তুই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না। ইহাতেই শনির দেহ বাষ্পময় এবং অত্যন্ত উষ্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে চাপে সাধারণ জড়বস্তুর অণু-পরমাণু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বাষ্পীভূত ও উষ্ণ হয়, তাহার ঠিক পরিমাণ নির্দ্দেশ করার উপায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রীয় চাপ সেই চরম চাপের কত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অন্য গ্রহদের অবস্থা বিচার করিয়া তাহা অনুমান করা চলে।

এই প্রকার অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, দেহ-সংকোচের সঙ্গে পৃথিবীর কেন্দ্রে এখন যে চাপ পড়িতেছে, তাহা সেই চরম চাপের খুব কাছাকাছি হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে কোনো দিন যদি ভূগর্ভের মাটি-পাথর হঠাৎ বাষ্পীভূত হইয়া মহা-প্রলয় উপস্থিত করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিবে না।

পাঠক হয় ত "নূতন নক্ষত্রের" কথা শুনিয়াছেন। আকাশের যে অংশে কোন নক্ষত্র নাই, কখনো কখনো সেখানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডকে আমরা দূর হইতে "নূতন নক্ষত্রের" আকারে দেখি। ইহার উৎপত্তি-প্রসঙ্গের জ্যোতিষীরা বলেন, দুইটা অনুজ্জ্বল নক্ষত্র প্রচণ্ড বেগে চলিতে চলিতে যখন পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন সেই ঘর্ষণের তাপে নক্ষত্রেরা জ্বলিয়া উঠে। আলোচ্য নূতন মতবাদের সাহায্যে এই ব্যাপারের আর একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। এই মতবাদীরা বলিতেছেন, যখন নক্ষত্রদের দেহ কালক্রমে শীতল ও ঘন হইয়া পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কেন্দ্রীয় চাপ বাড়িয়া চলে। শেষে সেই চাপের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন তাহাদের দেহের কোনো বস্তুই কঠিন বা তরল অবস্থায় না থাকিয়া বাষ্পীভূত হইয়া পড়ে। আমরা দূর হইতে এই বাষ্পীভূত জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কগুলিকে "নূতন নক্ষত্রের" আকারে দেখি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে লাপ্লাসের যে সিদ্ধান্ত আজও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহার সহিত এই নূতন মতবাদের যথেষ্ট বিরোধ আছে। লাপ্লাসের মতে, বায়ব বস্তু জমাট বাঁধিতে গিয়াই জ্যোতিষ্কদের সৃষ্টি করে। এই জমাট বাষ্প কিছুকাল তাপালোক বিতরণ করিয়া শেষে শীতল ও অনুজ্জ্বল হয়। তখন দূর হইতে তাহাদের অস্তিত্ব জানা যায় না। অনাদি কাল হইতে এই সৃষ্টি-লীলা চলিতেছে বলিয়া উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের চেয়ে মহাকাশে অনুজ্জ্বল মৃত জ্যোতিষ্কেরই সংখ্যা অধিক। প্রাণীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহে যেমন নূতন প্রাণের সঞ্চার হয় না, তেমনি তাপ হারাইয়া একবার অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িলে জ্যোতিষ্কেরা আবার তাপ সঞ্চয় করিয়া উজ্জ্বলতা লাভ করে না। কিন্তু নূতন মতবাদীরা যাহা বলিতেছেন, তাহা কতকটা ইহার বিপরীত। তাহাদের মতে, বৃহৎ জ্যোতিষ্কের দেহ তাপ বিকিরণ করিয়া জমাট ও অনুজ্জ্বল হইলে, তাহাদের মৃত্যু ঘটে না। শীতল ও জমাট দেহের চাপে সেই মৃতপ্রায় জ্যোতিষ্কেরা আবার বাষ্পীভূত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অনন্ত কাল ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ডে এই প্রকারেই পুরাতন হইতে নূতনের সৃষ্টি চলিতেছে।

বলাবাহুল্য আলোচিত তত্ত্বটি এখন অনুমান মাত্র। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানে আসন পাইবে কিনা, তাহা আজো ঠিক্ বলা যাইতেছে না।

শ্রীজগদানন্দ রায়

জাগরণ

রাক্ষসী সব মরে গেছে রাজার মেয়ে চোখ্ মেলো
মরণ-কাঠির ভয়.ঘুচেছে, সোনার সেজে দীপ জ্বালো।
অভিশাপের অন্ত আজি ওগো রাজার নন্দিনী
আজ হ'তে আর নওগো তুমি আপন ঘরে বন্দিনী।
নাগের বাধন পড়লো খসে মুক্তি-গরুড় নিশ্বাসে
জাগ্‌লো পরাণ জগত মাঝে সরল, সহজ বিশ্বাসে।
সোনার আকাশ নীল হয়েছে, শ্যাম হয়েছে দূর্ব্বা যে
সোনার কোকিল কালো হয়ে সাধা গলায় সুর ভাঁজে
মতির শিখি সত্যি হয়ে মধুর কেকা রব করে,
সত্যি হয়ে সোনার তরু পড়ছে নুয়ে ফল ভরে।
সোনা মোহর হীরা জহর লজ্জা পেয়ে অন্তরে
পাতালপুরে পালিয়ে গেছে অভিচারের মন্তরে।
নিঠুর তারা, কঠিন তারা, থাকে তারা যার শিরে
তারি শোনিত শোষণ করে তীক্ষ্ণ নখে বুক চিরে।
বনের সীতা ঘরে এল, সোনার সীতা যা'ক্ চলে
ঠাঁই মিলেছে আকাশ তলে, জতুগৃহ যা'ক্ জ্বলে।
কাঠির শাপে মরা বাঁচার শেষ হয়েছে যন্ত্রণা,
জীবন মরণ ধন্য করা কার এসেছে মন্ত্রণা।
ছিন্ন করে জীর্ণ বাঁধন, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র চুক্তি গো,
বিরাট-বিশাল জগতমাঝে প্রাণ পেয়েছে মুক্তি গো।
আজকে জীবন জগৎ-যোড়া নাইক আদি অন্ত তার
মৃত্যু শুধু করবে তাহার জীর্ণবাসের সংস্কার।
ঘুম ভাঙ্গো গো রাজ-দুলালী, ডাক্‌ছে তোমায় বিশ্ব যে,
তোমার হাতে সকল দিয়ে আজকে হবে নিঃস্ব সে।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বুনো ভোম্‌রার স্বপ্ন

[Olive Schreiner থেকে]

খোলা জানালার ধারে মা একা বসে। বাহির থেকে ক্রীড়ারত ছেলেদের কোলাহল আর তারই সাথে নিদাঘ সন্ধ্যার উত্তপ্ত হাওয়া ভেসে আস্‌চে। ঘরের ভেতরে ও বাইরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো ভোম্‌রা উড়্‌চে—ফুলের রেণু লেগে তাদের পা গুলো হল্‌দে...কণ্ঠে অবিশ্রাম গুণ্‌ গুণ্‌।

মা টেবিলের সাম্‌নে একটা নীচু চেয়ারে বসে সেলাই করছিলেন। একটা ঝুড়িতে কতগুলো কাপড় চোপড়; কোলের ওপর একখানা বই,...তার ওপরেও কাপড়ের দু একটা ছেঁড়া টুক্‌রো। তাঁর নিবিষ্ট দৃষ্টি ছুঁচটার দিকে। ভোম্‌রার গুণ্‌ গুণ্‌ আর ছেলেদের কলরোল ঐকসাথে হয়ে একটা অবোধ্য গুঞ্জনের মতো তাঁর কাণে আস্‌ছিল, সাথে সাথে তাঁর হাতের গতিও ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে আস্‌ছিল।

হঠাৎ বোল্‌তার মতো লম্বাঠেঙ্গো ভোম্‌রা গুলো গুণ্‌ গুণ্‌ করতে করতে তাঁর মাথার খুব কাছে এসে উড়্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর চোখের পাতা ঢিলে হয়ে এল। সেলাই শুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর ছিল, তারই ওপর তাঁর মাথা ঢুলে পড়ল। মনে হতে লাগ্‌ল ছেলেদের অশ্রান্ত ক্রীড়া কল্লোল কোন্ দূর স্বপ্নরাজ্য থেকে আস্‌চে... ..ক্ষীণ.......ক্ষীণতর হতে হতে ক্রমে একেবারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু বুকের ঠিক্ মাঝ খানটায়—মগ্নমানসে যেখানে তাঁর অজ্ঞাত নবম ছেলে ঘুমিয়েছিল, তাঁর মনে হল সেখানে নড়াচাড়ার সাড়া পাওয়া যাচ্চে।

ভোমরার অস্পষ্ট মৃদুগুঞ্জনের মধ্যে তাঁর স্বপ্নালস চোখদুটী ঘুমে জড়িয়ে এল।

ভোম্‌রাগুলো বাড়্‌তে বাড়্‌তে যেন ঠিক্ মানুষের মতো হয়ে গেল।

একজন তাঁর কাছে এসে খুব আস্তে বল্‌ল,......তোমার ছেলেটী যেখানে ঘুমুচ্চে, সেখানে একবার আমায় ছুঁতে দাও। তাহলে সে ঠিক্ আমার মতো হয়ে যাবে।

মা বল্‌লেন,......তুমি কে?

সে বল্‌ল,......আমি স্বাস্থ্য। যাকে ছোঁব, টক্‌টকে তাজা রক্তধারা তার শিরায় শিরায় টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌বে.......ব্যাধি, অবসাদ, বেদনা, তার ত্রিসীমানা দিয়ে ঘেঁস্‌তে পারবে না। হাসি খুসী হবে তার জীবনের চির সাথী......

আর একজন এসে বল্‌ল,......না, না আমায় দাও ছুঁতে। আমি সম্পদ্। আমি ছুঁলে টাকাকড়ির জন্যে তাকে কোনদিনই বেগ পেতে হবে না। অন্য মানুষ রক্ত জল করে তাকে অর্থ জোগাবে। চোখ যা চায়, হাত তাকে তাই এনে দেবে......অভাব অভিযোগ কাকে বলে সে তা টেরও পাবে না......

মাতৃ-মানসে ছেলেটী নিস্পন্দ হয়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল।

আর একজন বল্‌ল,........আমি ছোঁব। আমি যশ। আমি যাকে ছুঁই, সে এত উচুঁতে উঠে যায়, যেখান থেকে সকলেই তাকে দেখ্‌তে পায়। মৃত্যু তার সমাপ্তি আন্‌তে পারে না,........ যুগ যুগ ধরে সকলের মনে তার নাম অক্ষয় হয়ে থাকে........

মা যেমন শুয়েছিলেন তেম্‌নি রইলেন। ভোম্‌রা মানুষেরা তাঁর আরো কাছে এগিয়ে এল।

একজন বল্‌ল,......আমায় দাওনা ছুঁতে........আমি ভালবাসা, আমি ছুঁলে জীবন পথে একা চল্‌তে হবে না ওকে। ঘন অন্ধকারের মধ্যেও হাত বাড়ালে আরকটী হাতের পরশ এসে পৌঁছ্‌বে। পৃথিবীর সবলোক যদি ওর বিরুদ্ধে যায়, একজন অন্ততঃ এসে ওর পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌বে........তুমি একা নও......

ছেলেটী মার বুকে কেঁপে উঠ্‌ল।

আরেক জন কাছেই ঘুরছিল। সে ভালবাসাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে বল্‌ল,...... দাও আমায় ছুঁতে, আমি প্রতিভা। সাফল্যের দূত আমি......ওকে আমি ছুঁলে পরাজয়ের দুঃখ ও কোনদিনই পাবে না........

ভোম্‌রাগুলো মায়ের মাথার খুব কাছে উড়তে লাগ্‌ল,......তাদের পাখা তাঁর মাথার চুল ছুঁয়ে যেতে লাগ্‌ল।

স্বপ্নলোকে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ঘন অন্ধকারের মধ্যে থেকে একজন মার কাছে এগিয়ে এল। মুখ শুক্‌নো, গাল ভাঙা,......শুধু পিঙ্গল ঠোঁট দুটী ঈষৎ হাসির আলোয় কাঁপ্‌চে।

সে এসে ছেলের দিকে হাত বার করে দিল। মা একটু সরে বসে বল্‌লেন,......কে তুমি?

সে জবাব দিল না।

মা তার চোখের দিকে তাকালেন, বল্‌লেন,......কি দিবে তুমি আমার ছেলেকে? স্বাস্থ্য?

সে বল্‌ল,......যাকে ছোঁব আমি, জ্বরের জ্বালায় তার রক্তধারা জ্বল্‌বে। সে জ্বালা জোঁকের মতো তার বুকের রক্ত শুষে খাবে। জ্বালা থাম্‌বে সেইদিন, যেদিন তার বুকের স্পন্দনও চিরকালের মতো থেমে যাবে!

মা শিউরে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন......তবে? কি দেবে তাহলে? সম্পদ্‌?

সে মাথা নাড়্‌ল। ......মাটীতে সোণার মুঠো দেখে সে যদি তুল্‌তে যায়, তবে তখুনি তার মাথার ওপর আকাশের গায় আলোকরেখা ফুটে উঠ্‌বে......সেই আলোর ডাক তার সোণার লোভের চেয়েও বড় হবে......হাতের সোণা তার অপরে নিয়ে যাবে.......সে আলোর দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে......

......তাহলে যশ?

সে একটু চিন্তিতভাবে বল্‌ল,.. ...না..........ধূ ধূ করচে বালুরাশি......তারই ওপর দিয়ে

অদৃশ্য হাতে আঁকা পথ......পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে......গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে......সেই তার পথ। তাই ধরেই চল্‌তে হবে তাকে।

......ভালবাসা ?

......ভালবাসার সন্ধানেই সে ঘুরবে......কিন্তু পাবে না। হাত বাড়িয়ে যখন সে কাউকে ধরতে যাবে, অথবা কাউকে বুকে টেনে নিতে যাবে, তখনি তার চোখে পড়বে দূরদিগন্তে আলোর রেখা! তাকে যেতে হবে তারই দিকে। একা......একেবারে একা......আর কেউ এ পথের সাথী হবে না। সে যখনি বল্‌বে—"এ আমার......একান্ত আমার"—তখনি তার কাণে বাজ্‌বে—"ছাড়তে হবে—এ তোমার নয়"!

......তাহলে কি দেবে তুমি ? সফলতা ?

......উঁহুঁ। তাকে বিফলকাম হতে হবে। দৌড়ের পাল্লায় সবাই পৌঁছে যাবে, শুধু সে থাক্‌বে পেছনে পড়ে। বিচিত্র কত কিছু তার কাণে বাজ্‌বে—চোখে পড়বে। তাকে দাঁড়াতে হবে—শুন্‌তে হবে। দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশি—সবাই দেখ্‌বে শুধু মরুভূমির হাহাকার—কিন্তু তার চোখে পড়বে তারই মধ্যে অনন্ত নীল সমুদ্র! সূর্য্য বিনিদ্র চোখে চেয়ে আছে সে সাগরের ওপর......নীলকান্তমণির মত স্বচ্ছ সুনীল জলরাশি ফেনিল উচ্ছ্বাসে কূলে আছড়ে পড়ছে—সেই সাগরের বুকে দ্বীপ। সেখানে পাহাড়ের সব চেয়ে উচু চূড়াটা থেকে উজ্জ্বল আলো তার চোখে এসে ঝল্‌সে পড়বে......

......সে পৌঁছবে সেখানে ?

লোকটীর ঠোঁট অদ্ভুত হাসিতে রঙীন্ হয়ে উঠ্‌ল।

......এ সব সত্যি ত ?

......সত্যি আবার কি!

মা তাঁর আধ-বোঁজা চোখের পাতার ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন......ছোঁও।

লোকটী নুয়ে পড়ে শিশুর গায়ে হাত রাখ্‌ল। অস্পষ্টকণ্ঠে কি বল্‌ল, সব বোঝা গেল না। মা শুধু শুন্‌লেন, ...এই তোমার পুরস্কার.. ...আদর্শ বাস্তব হবে তোমার......ছেলে কেঁপে উঠ্‌ল। মা অঘোরে ঘুমুতে লাগ্‌লেন। ধীরে ধীরে তাঁর মাথার ভেতর থেকে স্বপ্নালোক অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু তাঁর বুকের ভিতর শিশুটীর চোখ স্বপ্নালোকে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল। যে চোখে তখনো দিনের আলো পৌঁছয়নি......একটা অপূর্ব্ব আলোর রেখা সেই চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল।

এ আলো সে আগে কখনো দেখেনি, হয়ত দেখ্‌বেও না। কিন্তু এ সত্যি! বাস্তব! যেখানেই হোক্, আছে এ আলো।

পুরস্কার পাওয়া তার হয়ে গেচে। কল্পলোক তার সত্যি হয়ে দেখা দিয়েচে!

শ্রীমণীশ ঘটক

বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্র্যের লীলা বয়ে যায়

বিশ্বমাঝে ব'য়ে যায় বৈচিত্র্যের লীলা চারিভিতে
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে নিখিল সঙ্গীতে
খেলে নিত্য নবীন হিল্লোল
—পরাণ বিভোল।

রৌদ্রতপ্ত ধরণীর ক্লিষ্ট অঙ্গে অকুল-শ্রাবণে
শান্তিবারি ঢেলে দেয় অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে ;
কুন্দশুভ্র মেঘমালা ভেসে যায় শরৎ অঙ্গনে
কুতূহলী সূর্য্য চায় অভ্র বাতায়নে
পূর্ণশস্য এই পৃথ্বীপরে
হরিৎ প্রান্তরে।

শীতের তুহিনস্পর্শে ধরাতল যবে মুহ্যমান
সন্দেহ কুহেলী মাঝে আশঙ্কায় ভরে ওঠে প্রাণ,
আচম্বিতে আশাবাণী ভেসে আসে মলয়ের সাথে,
বিস্ময়ে কৌতুকে জাগে কোন মধুরাতে
তৃণ পুষ্প বৃক্ষের বল্লরী
মাধবী মঞ্জরী।

ঝঙ্কারিয়া ওঠে লোকে শতসুর দূর দূরান্তরে,
সমুদ্রের বজ্রমন্দ্রে পাখী গানে বনানী মর্ম্মরে ;
উদ্ভাসিয়া ওঠে বিশ্বে, পত্রে পুষ্পে সুনীল আকাশে
মধ্যাহ্নে প্রভাতে সাঁঝে পূর্ণচন্দ্র হাসে,
শত শত মায়া রঙিমার
নিত চারিধার।

বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্র্যের লীলা ব'য়ে যায়
আমি শুধু ক্ষুব্ধ মনে চেয়ে থাকি, হায়
ল'য়ে মোর এ জীবন দীন
—বৈচিত্র্যবিহীন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী

মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ *

(২)

"জাতিভেদ"

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অসংখ্য জাতি বা বর্ণ বিদ্যমান আছে—সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরও আর এক নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। মহাভারতের মতে ইহলোকে বর্ণের কোন ইতর বিশেষ নাই, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, পরে ক্রমশঃ গুণ ও কর্ম্মের শ্রেণী বিভাগ হওয়াতে মানুষেরও শ্রেণী বা বর্ণ বিভাগ অর্থাৎ এই জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

---

* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা লইয়া আলাপ করিবার সুযোগ পাইলে পারিৎসাধ্যে তাহা উপেক্ষা করি নাই। জাতিভেদ সম্বন্ধে মহাত্মাজির অভিমত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে যে সব কথা বলিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কারণ, এই প্রবন্ধটী পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বের লেখা। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে এ বিষয়ে মহাত্মাজির মতামত অপেক্ষা আচার্য্য দেবের মতামত অধিকতর উদার এবং অগ্রসর। "আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

সংপ্রতি (১০ই শ্রাবণ, ১৩৩২) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাসাদাৎ মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং আলোচনা করিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। প্রথমে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহোদয় মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিল; এবং শেষে আচার্য্য দেবের নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া রসারোডে মহাত্মার সন্দর্শনে যাই। সুতরাং এই সুযোগে সুবলের নিকট, এবং আচার্য্যদেবের নিকট বিশেষভাবে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতেছি। বস্তুতঃ ডক্টর রায়ের চিঠি লইয়া না গেলে, পূর্ব্বের বিনা নির্দ্ধারণে, সকাল বেলা হঠাৎ গিয়া মহাত্মার সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া অত-কথা আলোচনা করা সম্ভবপর হইত না। মহাত্মা কর্ম্মবীর, তাঁহার কাজের অন্ত নাই, অসংখ্য কাজ, বাজে কথা কখন বলিবেন, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিবারও সাধ্য নাই। কথাবার্ত্তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি নিজে নিজে ক্ষৌরী হইতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিঠি কি প্রবন্ধের মুসাবিদা কহিয়া যাইতেছেন, আর শ্রীযুক্ত দেশাই পাশে বসিয়া শুনিয়া শুনিয়া সব টুকিয়া লইতেছেন। তাই মহাত্মার কাছে যাইয়া তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার কোন অধিকারই আমার ছিলনা। তবুও স্নেহান্ধ আচার্য্যদেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে "You have every right to see Mahatmaji." মহাত্মার সম্বন্ধে কয়েকটী অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ লিখিয়াছি বলিয়া আমার মত অপদার্থের উপরও আচার্য্যদেবের কি অপরিসীম স্নেহ।

পাঠকপাঠিকা ক্ষমা করিবেন, ভূমিকাটা একটু দীর্ঘ হইল। মহাত্মার সঙ্গে আলোচনার ফলে যে সব নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি তাহা কয়েকটী নূতন প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে চাই (যথাঃ—(১) ছুঁৎমার্গ (২) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম (৩) বর্ণভেদ (৪) ব্রাহ্মণ (৫) অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি) এই প্রবন্ধটীর কিছুই বদলান গেল না, যেমন ছিল, তেমনই ছাপা হইল। ইতি

——লেখক।

"নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা সৃষ্টপূর্ব্বং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।" "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া আমি চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছি।" এই চারি জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, হিন্দুসমাজের চারিটী প্রধান বর্ণ।

বেদ উপনিষদ অথবা রামায়ণ মহাভারতের যুগের বর্ণভেদ এবং আমাদের হিন্দুসমাজের এই আধুনিক জাতিভেদ—ইহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তখন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিল গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী, এখন জাতিভেদ হইয়াছে জন্মতঃ, বংশানুক্রমিক। জাতিভেদের জন্য বর্ত্তমান যুগে গুণ এবং কর্ম্মের উপর কেহ নির্ভর করে না।

আর শ্রীকৃষ্ণ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিলেও, আজ হিন্দুসমাজ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; বর্ণ-সঙ্করে যে ছত্রিশ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা লইয়াই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ গঠিত।

এই সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হইলেও, ইহলোকে ব্রহ্মার কাছে বর্ণের কোন ইতর বিশেষ না থাকিলেও, আজ 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ'; তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পর্য্যায়ক্রমে সম্মানের অধিকারী; মমতায় হৌক, স্বার্থের বশে হৌক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হৌক হিন্দুসমাজে বর্ণ বিশেষের এই যে উচ্চতা নীচতা ইহা আজ যেন চিরদিনের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। আর কর্ম্মফল ও জন্মান্তর বাদে আস্থাবান্ হিন্দুর নিকট বর্ণের ইতর বিশেষও অবশ্যম্ভাবী।

"কৌষিতকী ব্রাহ্মণের" মতে ব্রাহ্মণ সোমের একখানি মুখ—"ব্রাহ্মণস্তে একং মুখম্"—মহাভারতের মতানুসারে ব্রাহ্মণ নারায়ণের মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু যুগল, "ব্রহ্মবক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রম্" আর উরুদ্বয় অবশ্য বৈশ্য আর "পাদৌ শূদ্রঃ"—"বিক্রম্ ও দ্রুত গমনের জন্য শূদ্র তাঁহার দুই চরণ যুগল।" ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের মতেও ব্রাহ্মণ প্রজাপতির মুখ।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

"ব্রাহ্মণ ইহার (পুরুষ বা প্রজাপতির) মুখ ছিলেন, বাহু যুগল ক্ষত্রিয় করা হইয়াছিল; যাহা বৈশ্য তাহা ইহার উরুযুগল, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল।"

আর মানুষের (বা দেবতার!) যেমন উত্তমাঙ্গ অধমাঙ্গ আছে, সমাজ দেহেও তেমনি উচ্চজাতি নীচজাতি থাকা স্বাভাবিক, গোঁড়া হিন্দুর কাছে এ কথাত অতি সহজ, সরল, সুন্দর।

তাই ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠবর্ণ এবং পদদ্বয় হইতে জাত বলিয়া শূদ্র যে সকলের নিকৃষ্ট বর্ণ একথা বিশ্বাস করিতে হিন্দুসমাজের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। গোঁড়া হিন্দুর আরও বিশ্বাস

আছে যে, ভগবানের এই অসংখ্য বর্ণ বা জাতি সৃষ্টির একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, পুণ্যবলে কর্ম্মফলের দরুণ জন্মজন্মান্তরে মানুষ নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট জাতি বা বর্ণে জন্মগ্রহণ করে।

মহাত্মা গান্ধীও কর্ম্মফল এবং জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসবান্। তবে তিনি জাতি বা বর্ণের উচ্চতা-নীচতা স্বীকার করেন না। "The caste system is not based on inequality, there is no question of inferiority" অর্থাৎ জাতিভেদে ছোটবড়র কোন প্রশ্ন ওঠে না, উচ্চ নীচ এই ভেদাভেদের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত নয়, বড়ছোটর প্রশ্ন আদৌ উঠিতে দেওয়া উচিত না। কারণ "All are born to serve God's creation, a Brahman with his knowledge; a Kshatrya with his power of protection, a Vaishya with his commercial ability, and a Shudra with bodily labour."

ব্রাহ্মণ লোকসমাজে শিক্ষা দান করেন, ক্ষত্রিয় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, বৈশ্য ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, এবং শূদ্র সেবা দ্বারা সমাজের উপকার করেন। সকলেই স্বস্ববৃত্তি দ্বারা সমাজ সেবার জন্য জন্মগ্রহণ করে—যাহার যেমন শক্তি, ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাই তিনি যজনযাজন ও লোকশিক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। ক্ষত্রিয় রণকুশল ও রাজনীতি বিশারদ; তাই তিনি আর্ত্তের ত্রাণ, রাজ্যরক্ষা ও প্রজা পালনে তৎপর আছেন। বৈশ্যের ব্যবসায় বুদ্ধি আছে, তাই তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। শূদ্র গায়ে খাটিয়া শুধু এই তিন জাতির সেবা করিবেন। শূদ্রের শারীরিক শ্রম, বৈশ্যের বাণিজ্য শক্তি, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র তেজ, ব্রাহ্মণের জ্ঞান ভাণ্ডার—সকলই ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত। সুতরাং হিন্দুসমাজের এই জাতিভেদে বড়ছোটর কথা উঠিতেই পারেনা, তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "It is against the genius of Hinduism to arrogate to oneself a higher status or assign to another a lower." জ্ঞানচর্চ্চা ও লোকশিক্ষায় রত থাকেন যে ব্রাহ্মণ তাঁহার আসন সমাজের শীর্ষস্থানে, একথা মহাত্মা গান্ধী অস্বীকার করেন না। যে জ্ঞানী ও শিক্ষাগুরু তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন আর কেহ অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানের জোরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন, মহাত্মা গান্ধী বলেন, তিনি পতিত হয়েন, তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। যাহারা নিজ নিজ গুণ লইয়া বড়াই করেন, তাহাদের সকলেরই ঐ দশা হয়। মহাত্মাজির মতে বর্ণাশ্রম হচ্ছে সংযম এবং শক্তির সঞ্চয় এবং অনপচয় "Varnashrama is self-restraint and conservation and economy of energy."

তথাকথিত নিম্ন জাতিদের উচ্চজাতিকে হিংসা করিবার কিছুই নাই। হিন্দুরা ত পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী—সুতরাং নিম্নজাতিদের আক্ষেপ করিবার কি আছে? এ জন্মে সৎকাজ করিলে পরজন্মে উচ্চবর্ণে জন্ম হইবে। যাহারা সন্দেহবাদী, পুনর্জন্মে অবিশ্বাসী, শুধু এই জন্ম লইয়াই ব্যস্ত আছেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তবে কর্ম্মফলে আস্থাবান্ গোঁড়া হিন্দুর বিশ্বাস, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে মানবের উত্থানপতন স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই সঙ্ঘটিত হয়, পুনর্জ্জন্মবাদী গান্ধীজিও এ বিষয়ে গোঁড়া

হিন্দুর সঙ্গে একমত। মহাত্মাজি লিখিয়াছেন, "If Hindus believe, as they must believe in reincarnation, transmigration, they must know that nature will, without any possibility of mistake, adjust the balance by degrading a Brahmin, if he misbehaves himself, by reincarnating him in a lower division, and translating one who lives the life of a Brahmin in his present incarnation to Brahminhood in his next." অর্থাৎ কোন্ ব্রাহ্মণ ইহজন্মে যদি কুকাজ করে, পরজন্মে সে পতিত হইবে; ভগবান্ কোন ভুলচুক করিবেন না। কদাচারী ব্রাহ্মণকে নিম্নতর শ্রেণীতে জন্ম লইতে হইবে; এজন্মে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মত জীবনযাপন করেন, পরজন্মে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন, হিন্দুরাও সাধারণতঃ বিশ্বাস করে যে, পুণ্যবানেরা বিপুল তপস্যাবলে ভারতভূমে জন্মিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুযায়ী "জাতি" প্রাপ্ত হয়েন।

গোঁড়া হিন্দুরা বলেন যে, তাঁহাদের এই 'জাতি' স্বয়ং ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—"বিধির বিধান" উল্টাইবার যো নাই, মানুষের হাতে কি আছে, মানুষের ইচ্ছায় কি কুলায়? মানুষের কিছুই সাধ্য নাই, মানুষ ইচ্ছা করিয়া কখনো জাতি গড়িতে বা ভাঙ্গিতে পারে না, মহাত্মা গান্ধীও বলেন যে, বর্ণাশ্রম মানুষের প্রকৃতিগত—"Inherent in human nature", হিন্দুধর্ম্ম মানুষের এই ধাতুগত স্বভাবটীকে একটা বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে মাত্র। জন্মের সঙ্গে বর্ণ সংশ্লিষ্ট, মানুষ ইচ্ছা করিয়া তাহার "বর্ণ" বদলাইতে পারে না।. "A man cannot change his varna by choice. It does attach to birth." সুতরাং এই 'বর্ণ' না মানার অর্থ হচ্ছে "কুলধর্ম্মে" (Law of heredity) প্রত্যাখ্যান করা—"Not to abide by one's Varna is to disregard the law of heredity."

তবে মহাত্মাজির মতে চারি বর্ণই যথেষ্ট, "The four divisions are all sufficient." হিন্দুসমাজ আজ যে এই ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে, গান্ধিজী বলেন, ইহা বর্ণাশ্রমতন্ত্রের যথেচ্ছাচার মাত্র। তিনি "ইয়ং ইণ্ডিয়া"য় "জাতিভেদ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,--"I consider the four divisions alone to be fundamental, natural, and essential." তাই তিনি হিন্দুসমাজের এই অসংখ্য বর্ণের ব্যভিচার দূর করিতে বলেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া আপনার অখণ্ড শক্তিকে টুকরা টুকরা করিয়া আজ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। নানাজাতিতে বিভক্ত হওয়াতে একটু উপকার হয় বটে কিন্তু তাতে উপকারের চাইতে ক্ষতিই বেশী। সমাজের অঙ্গাঙ্গী যোগসাধনের বিষম অন্তরায় এই বিচ্ছিন্নভাব—সমাজ দেহের শেষে এমত অবস্থা হয় যে, এক অঙ্গে আঘাত করিলে, অপরাঙ্গ তাহা অনুভব করে না—বহুধা বিভক্ত হিন্দুসমাজের আজ সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাই মহাত্মা গান্ধী বলেন, "The sooner there is a fusion, the better."

তবে চিরকালই অতি সঙ্গোপনে 'জাতি'র ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে। পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির নিয়ম।

এই চিরন্তন নীতির কখনো ব্যত্যয় হয় না—'জাতি'র গঠন আপনাআপনিই চলিতে থাকিবে, সুতরাং হিন্দুসমাজের নানাজাতিকে মিশাইয়া শুদ্ধ চারিটী বর্ণে পুনরায় গঠন করিবার জন্যে ব্যস্ত না হইয়া "সামাজিক 'চাপ'ও জনমতের উপরই আমরা সচ্ছন্দে নির্ভর করিতে পারি।"

হিন্দুরা ধর্ম্মের সঙ্গে জাতির যোগ সাধন করিয়াছেন, ধর্ম্মের সঙ্গে 'বর্ণের' মিলনেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মাহাত্ম্য। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে জাতি, ধর্ম্মের উপর মোড়লী করিতেছে—এখন ধর্ম্ম না থাকিলেও জাতি থাকিতে পারে কিন্তু জাতি না থাকিলে ধর্ম্ম থাকে না। যাহার জাতি নাই সেত হিন্দুই না! জাতি হারাইলে মহাধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও "হিন্দু" নাম এবং হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিতে হয়। আমরা যদি জাতি হারাই, আমাদের জ্ঞাতি, ইষ্টবন্ধুবান্ধব এমন কি ভাইবোন পিতামাতা পর্য্যন্ত আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য, আর জাতি বজায় রাখিয়া আমরা যদি পাপপঙ্কে ডুবিয়াও থাকি, কাহার সাধ্য আমাদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে তাড়ায়?

আমাদের এই সাধের জাতিটী আবার কাচের মত নিতান্ত ভঙ্গপ্রবণ—সচরাচর "ভাতের পাতিল ও জলের কলসী"র ভিতরে অবস্থান করে—অপর জাতির অন্নগ্রহণ করিলে কোন্ নিষ্ঠাবান হিন্দুর জাতিপাত হইবে না। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনবাদী মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুর এখানে মোটেই বনিবোনাও খাইবে না —যে গান্ধী ইংরেজ ও মোছলমানের সাথে এক টেবিলে খাওয়া দাওয়া করেন, একটী অস্পৃশ্য জাতির মেয়েকে আপন কন্যার মত লালন-পালন করিয়াছেন, তিনি আবার নিজকে সনাতনী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। "অস্পৃশ্যতা" আন্দোলনকারী গান্ধীর আস্পর্দ্ধা দেখিয়া কত লোক "খম্‌খমাইয়া" মরে—যাহার জাতি নাই সে আবার হিন্দু হয় কিপ্রকারে?—গোঁড়া হিন্দুরা মহাত্মাজিকে মনুপরাশরশাসিত হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর ঠাঁই দিবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেস্ট সন্দেহ আছে।

গোড়া হিন্দুর সঙ্গে গান্ধীজির অমিলের মূল সূত্র এই যে গান্ধিজী অস্পৃশ্যতা মানেন না, "ছুঁৎমার্গ" পরিহার করিতে চায়েন। মহাত্মাজি বলিয়াছেন, "I do not believe that inter-dining or even intermarriage necessarily deprives a man of his status that his birth has given him." মহাত্মাজির মতে শুধু "খাওয়া ছোঁওয়া"র ব্যাপারেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে না, লোপও পায় না। কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার শূদ্র ভাইর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিলেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব আকাশে উড়িয়া যায় না—শূদ্রের সাথে খাইলেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকে, এবং ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানের দ্বারা সেবার ব্রত ভঙ্গ করে তবেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়া যায়—নতুবা সে আমরণ ব্রাহ্মণই থাকে। জাতির গৌরবে, বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বোধে যদি কোন হিন্দু অপর কোন হিন্দুর সাথে আহার করিতে অস্বীকার করে তবে গান্ধীজি বলেন, সে তার ধর্ম্মের ভুল ব্যাখ্যা করে—

ধর্ম্মের মর্ম্ম সে রীতিমত বোঝে নাই। খাওয়া দাওয়াতেই ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া মহাত্মাজি বিশ্বাস করেন না—তাই "যুক্তাহারী" সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, "অনেকে মাংস খায়, যার তার সঙ্গে বসিয়া আহার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভয় করে, সাধুভাবে জীবন যাপন করে। আর কেহ হয়তঃ মাছ মাংস স্পর্শও করে না, আহারে আচারের শ্রাদ্ধ করে, কিন্তু জীবনের প্রত্যেক কাজে ভগবানের কোন 'তোয়াক্কা'ই রাখে না—ইহাদের মধ্যে কাহার মোক্ষ লাভ হইবে? প্রথমোক্ত ব্যক্তিরাই যে মুক্তির পথে অধিকতর অগ্রসর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ও আহার আদি নিষেধ করার তাৎপর্য্য এই যে উহাতে আত্মোন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। মহাত্মাজির মতে ত বিবাহই জন্মের মত একটী পতন, Marriage is a 'fall' even as birth is a 'fall"। অসবর্ণ বিবাহাদিতে আত্মার আরও অকল্যাণ হয়, নতুবা ওসব বর্ণের কোন টেষ্ট (test) নয়। সুতরাং ভিন্ন জাতিতে বিবাহ বা ভোজনাদি করিলে 'জাতি' লোপ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; 'জাতি'পাত হওয়া অত সোজা নয়, জাতি বা বর্ণ ঘুচাইতে হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। মহাত্মাজির মতে কোন কারণেই 'জাতি' বা 'বর্ণ' 'ধুঁইয়া মুছিয়া' যাইতে পারে না—কারণ "The Law of heredity is an eternal Law.

এই শাশ্বত "কুলধর্ম্মে" বিশ্বাস করেন বলিয়াই তিনি বর্ণাশ্রমে বর্ণভেদের এত পক্ষপাতী, তাই সমস্ত হিন্দু সমাজকে তিনি চারি জাতিতে বিভক্ত দেখিতে চাহেন; বর্ণাশ্রমের "চতুর্ব্বর্ণ"ও তিনি চিরকালই সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। এই জন্যই মহাত্মাজি বলিয়াছেন, "I am one of those who do not consider caste to be a harmful institution." "কুলধর্ম্ম" বা Law of heredity"কে তিনি সনাতন চিরন্তন মনে করেন, তাই হিন্দু সমাজের "জাতিভেদ" উচ্ছেদ অর্থাৎ মৌলিক চতুর্ব্বর্ণের ধ্বংসেরও ভয়ানক বিরোধী, এবং সেইজন্যই তিনি ইয়ুরোপের class system" অপেক্ষা ভারতের বর্ণভেদকে শ্রেষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত মনে করেন—হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে যাঁহারা class system প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে মহাত্মাজি বলিয়াছেন যে "শাশ্বত জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মের উৎসাদন করিলে সমাজে কোন শৃঙ্খলা থাকিবে না, বিশৃঙ্খল সমাজে যথেচ্ছাচার রাজত্ব করিবে।"

জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান্ হইলে মানুষ 'স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়' মনে করে, যতদিন জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে ততদিন মানুষ 'পরধর্ম্ম ভয়াবহ' মনে করিবেই করিবে। "কুলধর্ম্মে" বিশ্বাস করেন বলিয়া মহাত্মাজি বলিয়াছেন, "I can see very great use in considering à Brahmin to be always a Brahmin throughout his life." আর ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার না করেন তবে প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে মর্য্যাদা প্রাপ্য তাহা হইতে তিনি স্বভাবতঃই বঞ্চিত হইবেন, ব্রাহ্মণের গুণ না থাকিলে তাঁহাকে কেহ সম্মানই করিবে না—সনাতনী হিন্দুর কাছে একথা সোজা, অতি স্বাভাবিক।

মহাত্মা গান্ধীও একজন সনাতনী হিন্দু, "I have always claimed to be a Sanatani Hindu." বেলগাঁয়ে প্রকাশ্য কংগ্রেসেও তিনি বলিয়াছেন 'I am a true Sanatanist Hindu."

মহাত্মাজি নিজকে কি জন্য সনাতনী হিন্দু বলেন তাহার কারণও তিনি তাহার "হিন্দুধর্ম্ম" (Hinduism) প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মাহাত্মাজি বেদ উপনিষদ পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন—অবতার ও জন্মান্তর বাদেও তাই তাঁহার বিশেষ আস্থা আছে।

মহাত্মাজি বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিশ্বাস করেন—"In a sense strictly Vedic but not in its present popular and crude sense." তাই মহাত্মা গান্ধী আমাদের এই লৌকিক জাতিভেদে বিশ্বাস করেন না, আধুনিক জাতিভেদকে তিনি বর্ণাশ্রমের ব্যভিচার বলিয়াই মনে করেন। সুতরাং বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের এই লৌকিক জাতিভেদ তিনি মানেন না। স্বামী বিবেকানন্দও এই আধুনিক জাতিভেদ মানিতেন না।

মহাত্মাজি বেদ মানেন সত্য, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুর মত বেদকে "অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়" বলিয়া বিশ্বাস করেন না ; বোধ হয়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির রচিত বেদকে তিনি বাইবেল, কোরাণ ও জেন্দাবেস্তার মতই ঈশ্বরানুপ্রাণিত (Divinely inspired) মনে করেন।

মহাত্মাজি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই অক্ষরে অক্ষরে (to the letter) প্রতিপালন করিতে রাজী-নহেন—সত্যাগ্রাহী গান্ধী সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সার মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। বেদবিশ্বাসী গান্ধী তাই বেদেরও spirit বা সার কথা আয়ত্ত করিয়াছেন এবং সেই জন্য বৈদিক যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে বর্ণবিভাগ ছিল তাহাতেই তিনি সবিশেষ আস্থাবান, তাহাই বর্ত্তমান ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। মহাত্মাজি বলিয়াছেন যে, বর্ণভেদ জাতির ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির পক্ষে যারপর নাই সাহায্য করিয়াছে।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতন সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতও প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমাজের আদিম অবস্থায় কার্য্যবিভাগ সম্ভবপর নহে। কার্য্যবিভাগ (Division of labour) সমাজের উন্নতি ও সভ্যতার পরিচায়ক। বৈদিকযুগে আর্য্যজাতি একটী অখণ্ড সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের মত শতধা বিছিন্ন, ভেদাভেদ জ্ঞানে জর্জ্জরিত ছিল না, এবং প্রথমাবস্থায় আর্য্যজাতির মধ্যে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এদেশে বসতির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন শাস্ত্রচর্চ্চা, যুদ্ধবিদ্যা, ও কৃষিবাণিজ্যে একই ব্যক্তির নিযুক্ত থাকার কোন আবশ্যকতা রহিল না। সমাজে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, কাজকর্ম্ম ভাগ করিয়া লওয়াই সুবিধা। প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি না থাকাই স্বাভাবিক—ঐতিহাসিকেরা বলেন এই ভাবেই ভারতে বর্ণভেদ বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ যে বুদ্ধিমান সে শাস্ত্রচর্চ্চা ও লোকশিক্ষায়ই নিযুক্ত রহিল, যাহার শরীরে সামর্থ্য ছিল, সে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে গেল, কেহ বা

কৃষিবাণিজ্যে মন দিল, অনেকে আবার গোপালন, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতির বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিল। একটী জাতির পক্ষে সকলই দরকার। মেথর ও ঝাড়ুদার হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সব ব্যবসায়ের লোক না হইলে সমাজ চলে না, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। কিন্তু বৈদিক যুগে একটা সুবিধা ছিল—বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেও আজকাল 'কালের কুটিল' গতিতে প্রকারান্তরে সে সুবিধার পরিবর্ত্তন হইতেছে—বৈদিকযুগে কাহারও কোন ব্যবসায় অপরিহার্য্য ছিল না। একই ব্যক্তি নানা সময়ে হয়তঃ নানা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। ভৃগুসন্তানেরা ঋগ্বেদের ঋষি হইয়াও প্রত্যেকে সূত্রধরের কর্ম্ম করিতেন। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রে আছে :—

"ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি ও কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন, আমাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্ম তেমনি পৃথক। দেখ, তক্ষক কাষ্ঠ ভক্ষণ করে, ভিষক রোগী প্রার্থনা করে এবং স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তাকে চাহে। দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র ভিষক, এবং কন্যা প্রস্তরের উপর ভর্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি।"

ঋগ্বেদের সময় একই পরিবারের নানা ব্যক্তি নানা কর্ম্ম করিতেন, ইহাতে কাহারও কোন মর্য্যাদা হানি হইত না, যাহার যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিত তিনি তাহাই করিতেন, কেহ কেহ বা দুই তিনটী ব্যবসায়ও চালাইতেন—আজ একর্ম্ম কাল ওকর্ম্ম করা চলিত, তাহাতে কাহারও কিছু আটকাইত না ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ব্রাহ্মণের কর্ম্মে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে খাওয়া দাওয়া এবং বিবাহাদিও বৈদিকযুগে চলিত।

মহাত্মা গান্ধীর জাতিভেদের ধারণা অনেকটা বৈদিকযুগের এই বর্ণভেদেরই মতন। তিনি বলিয়াছেন, "The four divisions define a man's calling, they do not restrict or regulate social inter-course." অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের চতুর্ব্বর্ণ মানুষের ব্যবসায়ই নির্দ্দেশ করে, তাহাতে সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়মিত করে না, সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে খাওয়া দাওয়া বিবাহাদিরও কোন প্রতিবন্ধক ঘটায় না। মহাত্মা গান্ধীর মতে এই জাতি বিভাগ শুধু নিজেদের মধ্যে কর্ত্তব্য বণ্টন করিয়া লওয়ার জন্য, বর্ণবিভাগ বর্ণবিশেষকে কোন privilege দেয় না। "The divisions define duties, they confer no privileges."

কাজেই ব্রাহ্মণ জ্ঞান চর্চ্চা করিবেন বলিয়া তিনি আত্মরক্ষা কি আর্ত্তের ত্রাণ কিম্বা শারীরিক পরিশ্রম হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইবেন এমন কোন কথা নাই—তাঁহার জন্ম শুধু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জ্ঞানের অধিকারীই করে। ব্রাহ্মণ, মহাত্মাজির মতে, ব্রাহ্মণ শিক্ষা ও কুলধর্ম্মানুসারে জ্ঞান বিতরণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র—এই মাত্র, আর কোন ইতর বিশেষ নাই। মহাত্মাজি আরও বলেন "To say that a Brahman should not touch the plough is a parody of Varanshrama," আর বর্ণবিশেষে যে গুণবিশেষ করিয়া আরোপ করা হইয়াছে, অন্য বর্ণের বেলা সে সব গুণ অস্বীকার করা হয় নাই—সংযম কি শুধু ব্রাহ্মণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইবে?

তেজবীর্য্য কি ক্ষত্রিয়ের একারই থাকিবে, অন্য কোন জাতির থাকিতে পারিবে না ? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা এই যে, ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ—সংযম, আর ক্ষত্রিয়ের প্রধান গুণ—হচ্ছে তেজবীর্য্য।

তাই মহাত্মা গান্ধীর মতে শূদ্রেরও উচ্চতর জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে অধিকার আছে,—"There is nothing to prevent the Shudra from acquiring all the knowledge he wishes. Only, he will best serve with his body."

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অনেকে মহাত্মাজির এই মত অনুমোদন করিতে পারিবেন না। তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টাই বিষদৃষ্টিতে দেখেন। শূদ্র ও নীচ অস্পৃশ্য জাতির প্রতি মহাত্মাজির গভীর টান বা সহানুভূতির জন্য তিনি অনেক গোঁড়া হিন্দুর চক্ষুশূল।

হিন্দুসমাজ শূদ্রকে বেদপাঠের অধিকার হইতে বহুদিন হইল বঞ্চিত করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মতন্ত্র বলে যে, শূদ্র যদি ইচ্ছা করিয়া বেদপাঠ শোনে তবে তাহার কর্ণকুহরে গলিত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি সে বেদমন্ত্র আওড়ায় তবে তাহার জিহ্বা কাটিতে হইবে, বেদমন্ত্র যদি সে মনে করিয়া রাখে তবে তাহার দেহ দুই ভাগ করিয়া ফেলিতে হইবে। "The ears of a Sudra who listens, intentionally, when the Veda is being recited, are to be filled with molten lead. His tongue is to be cut out if he recite it. His body is to be split in twain if he preserve it in his memory." ধর্ম্মতন্ত্রের এই জবরদস্তিতার ফলাফল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ এই অধিকার ভেদের ব্যবস্থাটাকে আগা গোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্ম্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশী কিছু করিতে হয় নাই—তারপর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল।

জ্ঞান চর্চ্চা যে দিন হইতে ব্রাহ্মণকুলের এক চেটিয়া হইয়া গেল সেই দিন হইতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধোগতির সূত্রপাত আরম্ভ—অনেকের এই রকম ধারণা আছে। আমাদেরও বিশ্বাস হিন্দুজাতি যেদিন হইতে গুণ এবং কর্ম্মের আদর ত্যাগ করিয়া শুধু জন্মের উপরই ব্রাহ্মণত্ব আরোপ করিয়াছে, জন্ম দ্বারাই জাতিভেদের উঁচু দেয়াল গাঁথিয়া তুলিয়াছে, সেইদিন হইতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যভিচার ও হিন্দুজাতির অধঃপাতের সূচনা হইয়াছে। ইতিহাসে পড়িয়াছি স্পেনদেশে এককালে অভিজাতবংশের লোক ব্যতীত স্পেনীয় রণতরীর সেনাপতিপদে কাহারও অধিকার ছিল না—হিন্দু সমাজেও উচ্চতর জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে যখন নৈপুণ্য অপেক্ষা কৌলীন্যের কদর বাড়িয়াই চলিল, তখনই কর্ম্ম সংসারে হিন্দুর পরাভব ও অপমান অবশ্যম্ভাবী হইয়া রহিয়া গেল।

মহাত্মা গান্ধীও বলেন যে আমাদের লোভ এবং গুণের অনাদরই আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। যাহারা মনে করেন যে, শুধু 'জাতি ভেদই হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে,

তাহাদের সঙ্গে মহাত্মাজির মতের ঐক্য হইবে না '। মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস জাতিই হিন্দু ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—তিনি বলিয়াছেন, "In my opinion, it is not caste that has made us what we are. It was our greed and disregard of essential virtues which enslaved us. I believe that caste has saved Hinduism from disintegration.

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ

পাপিয়া

পাপিয়া পাপিয়া পিয়া পিয়া পিয়া
ডেকোনা ডেকোনা আর,
জীবনের সার পিয়া কি তোমার
গিয়াছে সাগর পার ?

বুক চিরে যায় পাষাণী নিশার
কাঁপে গগনের গলে তারা-হার—
একি সকরুণ তব অভিসার—
ওলো বিরহিণী পাখী।

দূর হতে দূরে কোথা চলে যাও
পাগলিনী পিছে ফিরে নাহি চাও
শুধু এক সুরে পিয়া পিয়া গাও
কাঁপায়ে কানন-শাখী।

তুমিত চলেছ আপনার গানে
মাতি অজানায় পিয়া-সন্ধানে
কত শত শত সচকিত কাণে
বেদনার সুধা ঢালি।

জানোনা ত কত স্মৃতির দুয়ারে—
লাগে করাঘাত কঠিন প্রহারে
কত হৃদয়ের রুদ্ধ জুয়ারে
ভাসে বাঁধনের বালি ;

কত চেপে-রাখা আকুল নিশাস
কত ভুলে-যাওয়া করুণ ইতিহাস
কত দুরাশায় মরা অভিলাষ—
জেগে ওঠে দিকে দিকে,—

রঞ্জিত হয়ে শোণিতের ধারে
সুর-তীর তব বিশ্ব মাঝারে—
ছুটিছে খুঁজিছে তৃষিত শিকারে
আপন লক্ষ্যটিকে।

পাপিয়া পাপিয়া পিয়া পিয়া পিয়া
ডেকোনা ডেকোনা ফেটে যায় হিয়া,
তবে যদি মোরে করুণা করিয়া—
সাথে লয়ে যাও যাই,

কাঁদিবারে শিখি তোমারি মতন
আপনা-মথিত তীব্র রোদন
সে রোদনে যদি হারাণো রতন
পিয়ারে আমিও পাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

খেয়ালী

(৪)

তিন চারিদিন পরে রাগের উত্তাপ অনেকখানি কমিয়া গেলে শৈলজা হরপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "নবকৃষ্ণকে সেদিন কত টাকা দিয়েছিলে ?"

হরপ্রসাদ জবাব দিলেন, "দু'শ টাকা।"

শৈলজা বলিল, "সেকি, দু'শ টাকাই দিলে !"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ও দৃষ্টিতে বিস্ময়ের প্রকাশ দেখিয়া হরপ্রসাদ নিজের বিস্ময় দমন করিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "দু'শ টাকাই বোধ হয় তুমি দিতে বলেছিলে।"

"বলেছিলাম বটে, কিন্তু তখন আমার মাথার কিছু ঠিক ছিল না, ভেবে বলিনি। ওকে পঞ্চাশটা টাকা দিলেই ঠিক যথেষ্ট হ'তো সে তুমিও জান। দু'শ টাকা দিয়েছ—"

"কি জন্যে ?"

"শুধু আমাকে জব্দ করবার জন্যে।"

"তা হবে" বলিয়া হরপ্রসাদ টেবিলের কাছে আসিয়া বসিলেন। সরকার তাঁহার সহির জন্য কএক খানা হিসাবের খাতা সেখানে রাখিয়া গিয়াছিল। তিনি খাতাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তি বা বিস্ময়ের চিহ্নও ছিলনা। এমন দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে সমস্ত তর্কের মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, তাঁহাকে আর একটি কথাও বলা চলিল না। শৈলজার চোখে জল আসিতে চাহিল, কিন্তু সে কঠোর ভাবে আপনাকে সংযত করিয়া সেলাইয়ের বাক্স লইয়া বসিল।

হিসাব পরীক্ষা এবং সেলাই লইয়া বাক্‌শূন্য দম্পতীর একঘণ্টা কাটিয়া গেলে তারা দ্বারে আসিয়া বলিল, "মা, খোকাবাবুর মাস্টার এসেছেন।"

"বলগে, আজ তার শরীর ভাল নেই" বলিয়া শৈলজা আবার হাতের কাযে মন দিল।

হরপ্রসাদ এবার মুখ তুলিলেন, বলিলেন, "মাষ্টার আসার সময় হলেই অজিতের শরীর খারাপ হয় বুঝি ? তা রোজই এই রকম শরীর খারাপ চলছে নাকি ?"

কথার খোঁচা এবং আক্রমণের ভাবটা শৈলজাকে ভাল রকমেই বিদ্ধ করিল, কিন্তু সে শান্ত ভাবে বলিল, "তুমি আমায় যতই বেঁধ না কেন, আমি আর তেমন রাগছিনে। আমার অনেক কথাই তো তুমি বিশ্বাস করতে চাওনা। অজিতের মাথা ধরেছে কিনা, সেটাতো তুমি এখনি নিজে দেখে আসতে পার। সে এই পাশের ঘরে শুয়ে আছে।"

"আমার অত দেখাদেখিতে কায নেই, হাতের কাছে তার চেয়ে ঢের দরকারী কায রয়েছে।"

"তা বটে। কিন্তু আজ যদি অজিতের মা বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে যে কাযটাকে আজ সব চেয়ে তুচ্ছ মনে করছ, সেটাই সব চেয়ে উঁচু হ'য়ে দাঁড়াত। পুরুষ জাত এমনি কর্ম্মী বটে !"

নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটা কি ভাবে বিদ্ধ হইল, তাহা দেখিবার জন্য শৈলজা কথা শেষ করিয়া স্বামীর মুখে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু সেখানে অবিচল গাম্ভীর্য্য ছাড়া আর কিছুর ছাপ না দেখিয়া পরাভব মানিয়া চুপ করিল। প্রশস্ত কক্ষটি আবার কিছুকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল।

কিছু কাল পরে অজিত ও অমিয় হাসিতে হাসিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পিতাকে দেখিয়া অজিতের উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ সংযত হইয়া আসিল, সে মায়ের কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। অমিয় ছুটিয়া গিয়া পিতার জানুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হরপ্রসাদ হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া সাদরে সস্নেহে অমিয়কে কোলে তুলিয়া লইলেন। শৈলজা এরূপ কাণ্ড অহরহ দেখিয়া আসিতেছে। সে ইহাতে নূতন করিয়া আশ্চর্য্য বা বিরক্ত হইল না। কিন্তু সভয়ে অজিতের মুখ পানে চাহিল। অজিত বাপের অনুরূপ ছেলেই বটে। সে এমনিভাবে মায়ের সেলাই দেখিতেছিল যে, তাহার নিবিষ্ট চিত্ত যেন সেই সেলাই ছাড়া এই বিপুল বিশ্বের আর সবই অগ্রাহ্য করিতেছিল। শৈলজা খানিক বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মাথা ধরেছে, শুয়েছিলি, আবার উঠে এলি কেন অজু?"

অজিত বলিল, "অমিয় আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সুলোচনার কাছে গল্প শোনাতে। এমন একটা মজার গল্পই সে বলেছে মা।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মাথা ধরা কমেছে?"

অজিত বলিল, "না, কিন্তু মা, মাষ্টার বদলাতে হবে। আমায় কেবল বকে।"

হরপ্রসাদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মাষ্টার বদলালে কি হবে আর? একেবারে মাষ্টার তুলে দেওয়া যাবে। তুই তোর মার কাছে বিদ্যালাভ করবি অজিত।"

শৈলজা এই খোঁচাটাও নীরবেই সহিয়া গেল। কিন্তু অজিত সোৎসাহে হাত তালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "সেই বেশ হবে মা, আজ থেকে আমি তোমার কাছেই পড়ব।"

অজিতের ললাটের দুই প্রান্তের স্ফীত শিরা দু'টির উপর শৈলজার দৃষ্টি পড়ায় সে অজিতের বুকে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোর যে জ্বর হয়েছে রে। কিছু হুঁস বোধ নেই, খোলা গায় ধেই ধেই করে বেড়াচ্ছিস।"

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি, জ্বর হয়েছে?"

"হয়েছেই তো। আমার যেমন কপাল! কত ভোগাবে, কে জানে? কাল কত বারণ করলাম, শুনলিনে। পুকুরে অতক্ষণ ডুবোডুবি করলে জ্বর না হয়ে যায়?" বলিয়া শৈলজা জামা আনিয়া অজিতকে পরাইয়া দিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। তারপর থার্ম্মোমেটার বাহির করিয়া অজিতের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সেই জড় যন্ত্রটা যখন অজিতের জ্বরের নিশ্চিত সংবাদ জ্ঞাপন করিল, তখন শৈলজা উৎকণ্ঠায় খানিকটা ম্লান হইয়া গেল।

পরদিন স্তব্ধ গভীর নিশীথে শৈলজার ঠেলাঠেলিতে হরপ্রসাদ জাগিয়া নিদ্রাজড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

শৈলজার ভয়-বিহ্বল কণ্ঠ শুনা গেল, "অজিতের জ্বর বড় বেড়েছে, উঠে একবার দেখ।"

হরপ্রসাদ উঠিয়া ছেলের তাপ দেখিলেন। জ্বর কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু খুব বেশী নয়। অজিত সম্বন্ধে তিলকে তাল করিয়া তোলাই শৈলজার চিরন্তন অভ্যাস, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। স্বামীকে নিষ্ক্রিয় এবং নীরব দেখিয়া শৈলজা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, চুপ করে রইলে কেন? খারাপ কিছু দেখছ নাকি?"

হরপ্রসাদ বলিলেন, "না, না, কিছু নয়। তুমি পাগল হলে নাকি? জ্বরটা সামান্য বড়েছে মাত্র।"

"ডাক্তারকে এখনি ডাকাও।"

"সন্ধ্যার পরে দেখে গেল, আবার এখন ডাক্তার কি হবে?"

"বলকি? জ্বর বেড়ে গেছে, এখন ডাক্তার আসবে না?"

ডাক্তার না ডাকিলে তিষ্ঠান যাইবে না জানিয়া হরপ্রসাদ পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে শায়িতা তারাকে জাগাইয়া ডাক্তারকে খবর পাঠাইতে বলিলেন। হরপ্রসাদের বৈঠকখানা সংলগ্ন ঔষধালয়ে বেতনভোগী ডাক্তার থাকিতেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার আসিয়া হাজির হইলেন।

ডাক্তারের কন্যা শৈলজার সমবয়স্কা এবং সর্ব্বদাই ডাক্তারকে অন্দরে যাতায়াত করিতে হইত, তাই শৈলজা ডাক্তারের সম্মুখে বাহির হইত এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহার সঙ্গে কথাও বলিত। ডাক্তার আসিয়া অগত্যা অজিতের তাপ পরীক্ষা করিয়া এবং মাথা পেট টিপিয়া অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের বিরক্তি মনে মনে দমন করিয়া বলিলেন "জ্বর একটু বেড়েছে, আর তো কিছুই হয়নি।"

শৈলজা বলিল, "ঘুমোতে পারছেনা কেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেলে ঘুম হবে।"

ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত শৈলজা চক্ষু নামাইয়া কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলে, "সহর থেকে একজন ডাক্তার আনান কি দরকার মনে করেন?"

টাকা খরচ করিবার সুযোগ পাইলে বড় লোকেরা তাহা বিফল করেনা, ইহা ডাক্তারের জানা ছিল। তিনি বলিলেন, "মন্দ কি? কাল বিজয় বাবুর জন্যে লোক পাঠান যাবে। মা, এখন কি আমি—"

শৈলজা বলিল, "হাঁ আপনি এখন যেতে পারেন। এত রাত্তিরে আপনাকে খুব কষ্ট দেওয়া গেল। তারা, আলো নিয়ে ডাক্তার বাবুকে পৌঁছে দিতে বল কাউকে।"

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে অজিতের জ্বর বিশ্রাম তো হইলই না, চতুর্থ দিনে অজিতের অসুখটাকে নিউমোনিয়া বলিয়া সহরের ডাক্তার ঘোষণা করিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাজোচিত ভাবেই হইল। কিন্তু তবু আশঙ্কায় শৈলজার দেহমন ভাঙ্গিয়া পড়িল। রোগ যেদিন প্রচণ্ড বেগে অজিতের সুকুমার ক্ষুদ্র দেহ আক্রমণ

করিল, সেদিন শৈলজা অশ্রুবন্যা বহাইয়া কোন রূপে নিজের কম্পিত দেহটা টানিয়া লইয়া প্রতিষ্ঠিত কুল দেবতা কাত্যায়নীর মন্দিরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। মা, মা, তুমি সকলের মা। তুমি তো মায়ের ব্যথা জান। আজ এই বিবশা মায়ের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া লইও না। শিশু অজিতের অস্ফুট কণ্ঠের কাকলি—সেই আধ আধ 'মা' ডাক, যে অপূর্ব্ব রসে শৈলজার শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই স্নেহ যে অমিয়র জন্য মায়ের বুকে স্নেহ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। স্বামীর বৃহৎ ভবনটা প্রাণ শূন্য হইয়াই যেন শৈলজাকে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু শৈলজার কণ্ঠ লগ্ন হইবার জন্য শিশু অজিতের প্রসারিত কোমল হাত দু'খানির ভিতর দিয়া অবারিত অকুণ্ঠ প্রাণের মুক্ত ধারা বহিয়া আসিয়া শৈলজার সকল ক্ষতির পূরণ করিয়া দিয়াছে। সে যে আজ শৈলজার কত খানি, সে শুধু শৈলজা অনুভব করিতে পারে, প্রকাশ তো করিতে পারেনা। আজ অজিত ও অমিয় তাহার হৃৎপিণ্ডের দুই অংশ, কোন অংশ বাদ দিয়া তো তাহার বাঁচিয়া থাকা চলেনা।

শৈলজার সঙ্গে সুলোচনা এবং একজন ভৃত্য আসিয়াছিল। তাহারা নাট মন্দিরে দাঁড়াইয়াছিল। শৈলজাকে তেমন ব্যাকুলভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত ত্রস্তে মন্দিরের এককোণে সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার নির্নিমেষ দৃষ্টি মন্দিরের শুভ্র মর্ম্মর মেঝেতে শৈলজার অশ্রুপতনই দেখিতেছিল। শৈলজার নিঃশব্দ রোদনে পুরোহিতের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "ভয় নেই মা, মা কাত্যায়নীর আশীর্বাদে অজিত ভাল হবে।"

শৈলজা চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। একি দৈববাণী! বিহ্বলতায় পুরোহিতের চিরশ্রুতস্বর সে তন্মুহূর্ত্তেই চিনিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিয়া ফিরিয়া চাহিল। তাহার নিমগ্ন-প্রায় চিত্ত সহসা একটা অবলম্বন পাইয়া সতেজ ও আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "হবে, মায়ের আদেশ আপনার মুখ দিয়েই কি বেরুল ?"

পুরোহিত শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "মা, সকলের মুখ দিয়েই তো মায়ের কথা বেরোয়।"

শৈলজা তর্ক করিল না। সে বৃদ্ধ পূজারীর শুভ্র সৌম্য মুখের পানে চাহিল। পূজারীর দৃষ্টি হইতে তাঁহার অন্তরের শান্ত সংযত ভাবটা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। সংসারবন্ধনহীন কোমল নির্ম্মলচিত্ত এই ব্রাহ্মণকে সে চিরকালই শ্রদ্ধা করিত। সে বলিল, "তবে কিছু আশীর্ব্বাদী ফুল আর চরণামৃত দিন অজিতের জন্যে। আর আপনি তার জন্যে সোনার জবা মায়ের পায় মানত করুন।"

এই বৃদ্ধ পুত্রকলত্রহীন হইয়া বহুকাল এই মন্দিরেই পৌরোহিত্য করিতেছেন। মন্দিরে কৃষ্ণকেশ লইয়া আসিয়াছিলেন, এখন তাহা শুক্ল হইয়া গিয়াছে। বিগ্রহের মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণা-ভরণ, মন্দিরের শত বিলাসোপকরণ, তিনি তো আশৈশব দেখিয়া আসিতেছেন। মন্দিরে অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্যলীলার মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রকাশ্যে কোন তর্ক, কোন প্রশ্ন কোন দিনই করেন নাই।

আজও শৈলজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন না। প্রার্থিত জিনিস পাইয়া শৈলজা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরেও শৈলজা স্পন্দিত বক্ষে অজিতের মুখ পানে অপলক চক্ষু দু'টি মেলিয়া তাহার শিয়রে বসিয়াছিল। বিশীর্ণ গোলাপ গুচ্ছের মত অজিতের মুখখানি রোগম্লান। সেই মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া শৈলজার চক্ষু বার বার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। অল্পক্ষণ হইল, অজিতের একটু ঘুম আসিয়াছে। পাছে একটুখানি শব্দে সেই ঘুম টুকু—রোগ যন্ত্রণা মুক্তির ক্ষণিক আরাম টুকু নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে শৈলজা মৃন্ময়ী প্রতিমার মত বসিয়াছিল; নিজের নিঃশ্বাস শব্দটাও যথাসাধ্য মৃদু করিয়া লইতেছিল। অদূরে একটা আসনে হরপ্রসাদও তেমনি স্তব্ধ হইয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ছিলেন। নীরব ভৃত্য আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল এবং পাশের কক্ষে সুলোচনাও জাগিয়া বসিয়াছিল; যে কোন মুহূর্ত্তে তো তাহাকে প্রয়োজন হইতে পারে।

হরপ্রসাদ কয়েকবার নিদ্রিত রুগ্নপুত্র এবং জাগরিতা মাতার শঙ্কা-বিবর্ণ মুখ চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া শৈলজার পাশে দাঁড়াইতেই শৈলজা ত্রস্ত ইঙ্গিতে কথা বলিতে তাঁহাকে নিষেধ করিল। তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া হরপ্রসাদের হাত ধরিয়া কক্ষের এক প্রান্তে লইয়া যাইয়া অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কিছু বলবে?"

হরপ্রসাদ কএক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর তেমনি অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন "তুমি নাকি দু'দিন উপোস ক'রে আছ?"

শৈলজা, বলিল, "হাঁ, মা কাত্যায়নীর কাছে মানত করে এসেছি, অজুর জীবনের আশা হলে ভাত খাব।"

হরপ্রসাদ আবার কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কি খাচ্ছ দু'দিন?"

"মায়ের প্রসাদ দু'টো একটা ফল খাচ্ছি।"

"উপোস ক'রে ক'রে দুর্ব্বল হয়ে গেলে অজিতের শুশ্রূষায় ত্রুটি হবে না কি?"

"দুর্ব্বল কেন হতে যাব? অজুর কল্যাণের জন্যে মানত করে মনে বেশ বল পাচ্ছি।"

হরপ্রসাদ আর কথা বলিলেন না।

(৫)

সেদিন বেলা একটার সময়েই জমিদারের প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের ছুটি হইয়া গিয়াছিল। মুক্তির স্ফূর্ত্তিতে মেয়েরা বাঁধমুক্ত জলস্রোতের মত স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের পুলকোচ্ছ্বাস রব কল কল্লোলের মত স্কুল মুখর করিয়া তুলিল। অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষক-শাসন-ভীতি অথবা স্কুলের নিয়ম কানুন কিছুই তাহাদের মনে থাকিল না। মেয়েরা কএক দলে বিভক্ত হইয়া হাসির ঝলকে দুলিতে দুলিতে গল্প করিতে করিতে বাড়ীর পথ ধরিল। জমিদারের অন্তঃপুর সংলগ্ন ফল বাগানের প্রাচীর ঘেঁসিয়া যে সরু পথটি গতিশীল সর্পের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া

গিয়াছিল, সেই পথটি মুখর করিয়া একদল মেয়ে চলিতেছিল। দলের মেয়েদের বয়স দশ বছর পার হইয়া যাইতে পায় নাই।

সহসা একটি মেয়ের হাতের উপর বাগানের কোন গাছ হইতে একটা বড় আম আসিয়া পড়িল। মেয়েটি আঘাতে বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার আহত শিথিল হাত হইতে বইগুলি পড়িয়া ছিটকাইয়া গেল এবং শ্লেটখানা পড়া মাত্রই ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনায় ভৌতিক যোগ আছে মনে করিয়া মেয়েরাও ভয়ে শৃঙ্খলা হারাইয়া দল ভাঙ্গিয়া ছিটকাইয়া পড়িল। তাহারা অনেকেই দিদিমা ঠাকুরমাদের কাছে অনেক ভূতের গল্প শুনিয়াছে। হয়তো সীতাকে সুন্দর দেখিয়াই নির্জ্জন বাগানের দৈত্যদানার মত গাছের অধিবাসী ভূতরা তাহার হাতে আম ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। পলকে মেয়েদের হাসি গল্পের ফোয়ারা বন্ধ হইয়া গেল। ভীতা মেয়েরা অতি দ্রুত গতি সেই ছায়াচ্ছন্ন পথের ধূলি উড়াইয়া অবিলম্বে গৃহে পৌঁছিল।

সীতা কিন্তু সেখান হইতে এক চুলও নড়িল না। সঙ্গিনীদের অকরুণ হৃদয়ের পরিচয় অথবা ভূতের ভয় সেই অসম সাহসী মেয়েটিকে বিচলিত করিতে পারিল না। সে কি একটা সন্দেহ করিয়া সেই আমগাছটার দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া সে কিছু আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং রোষে তাহার নিবিড় কালো চোখ দু'টির মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। সে খোলা দরজা দিয়া বাগানে ঢুকিয়া সেই আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া ঝাঁজাল গলায় বলিল, "তুমি আমায় আম ছুঁড়ে মেরেছ। ভেবেছ, আমি তোমাকে দেখতে পাব না দাঁড়াও, আমি তোমার মাকে বলছি গে।"

সর্ব্বনাশ! শৈলজার কাছে এহেন অপরাধের নালিস হইলে বিনাদণ্ডে অজিতের নিষ্কৃতির কোন আশাই নাই। অজিত গাছের ঘন পল্লবের আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া শাসাইবার সুরে সীতাকে বলিল, "তুই যদি মাকে বলবি রাণি, তবে এখানেই তোকে মেরে তোর হাঁড় গুঁড়ো করে দেব। বুঝেছিস?"

আট বছরের তন্বী বালিকা সীতা। চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বলিষ্ঠ দেহ অজিত যখন প্রহারের উদ্যমের ভঙ্গিতে আসিয়া সোজা হইয়া সীতার নিকট দাঁড়াইল, তখন সেও তেমনি দৃপ্তভাবে দাঁড়াইয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "মার দেখি! যদি আমার গায় হাত দাও তো, এই শ্লেটের টুক্‌রো দিয়ে তোমার কপাল ফুটো করে দেব।" উত্তেজনায় সীতার স্বচ্ছ গৌর কপোল দুটি ও ললাট খানিতে গোলাপের আভা ফুটিয়া উঠিল। প্রতিবাসী কন্যা সীতাকে অজিত উত্তমরূপেই চিনিত। সুতরাং সুর অত্যন্ত খাদে নামাইয়া সে বলিল, "রাণি, লক্ষ্মীটি, রাগ করিসনে ভাই, আমি তোকে ঠাট্টা করছিলাম। আয়, তোকে দু'টো লিচু পেড়ে দি। আম যদি চাস, তাও দিতে পারি। তবে ও-গুলো কাঁচা টক।"

সীতা অজিতের মিনতিতে খানিকটা নরম হইলেও নালিস না করিবার জন্য ঘুষ লইতে রাজি

হইল না। অজিতের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও সে তাহার একরাশ ঝাঁক্‌ড়া চুলভরা মাথাটি নাড়িয়া বলিল, "না, আমি চাইনে তোমার কিছু।"

অজিত সেই একরোখা জেদী মেয়েটার কাণ্ডে মনে মনে বিষম বিরক্ত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া হঠাৎ যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইল। কিছুই যেন ঘটে নাই, এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে রাণি, তোদের আজ এত সকালে ছুটি হলো কেনরে?"

সীতা বলিল, "পণ্ডিত মশায় কি যেন বললেন, আমার তা মনে নেই।"

অজিত অবজ্ঞার হাসির সহিত বলিল, "তবে তো তুই খুব লেখা পড়া শিখেছিস্। যার কিছু মনে থাকেনা, সেকি শিখতে পারে?"

সীতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি বল দেখি, কেন শীগগির ছুটি হলো?

"আজ যে বৈশাখী পূর্ণিমা—পুষ্পদোল।"

"তোমাদেরও কি শীগগির ছুটি হয়েছে?"

"হয়েছে বোধ হয়, জানিনে ঠিক। ঘণ্টা খানেক পরেই আমি স্কুল থেকে চলে এসেছি।"

"তুমি ভারি দুষ্টু, ইস্কুল পালাও। আমি তোমার মাকে বলে দেব।"

"তোদের বাড়ীর ঠাকুর আজ ফুল দিয়ে সাজাবে না?"

"জানিনে। আচ্ছা, তুমি আমাকে চারটি ফুল দাওনা।"

"দিচ্ছি, আয়" বলিয়া অজিত সীতাকে অন্তঃপুরের বাগানে লইয়া গেল।

বৈশাখ মাস, বাগান ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। অজিত কতকগুলি ফুল তুলিয়া সীতার আঁচলে বাঁধিয়া দিল। ফুল বাঁধা আঁচলটি পিঠে ফেলিয়া সীতা খুসী মনে বাড়ীর দিকে চলিল। খেয়ালী অজিত যে শুধু কৌতুকবশে আম ছুঁড়িয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছে, সে কথা হয়তো সে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

অজিত কর্ত্তৃক সীতার 'রাণী' নাম করণের একটা ইতিহাস আছে। ছ' মাস পূর্ব্বে অজিতদের বাড়ী একপালা যাত্রা হইয়া গিয়াছিল। তাহার দু' একদিন পরে সীতা তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে যাত্রা খেলিতেছিল। খেলায় সীতাকেই রাণী সাজান হইয়াছিল। খেলাটা হঠাৎ অজিতের চোখে পড়িয়া যায়। সেই দিন হইতে অজিত এবং তাহার দেখাদেখি আরও কএকটি ছেলে মেয়ে সীতাকে রাণী বলিয়া ডাকিতে সুরু করিল। সীতা ইহাতে বিষম ক্ষেপিয়া যাইত। তাহার ঝগড়া ও কান্না-কাটিতে অন্য ছেলে মেয়েরা রাণী ডাকা ছাড়িলেও অজিত ছাড়িল না। অনন্যোপায় হইয়াও বটে এবং শুনিতে শুনিতে কাণে সহিয়া যাওয়াতেও বটে, সীতা এখন আর অজিতের রাণী ডাকে আপত্তি করিত না।

মধ্যপথে সীতার সহিত তাহার পিসিমা করুণার দেখা হইল। করুণা সীতাকে দেখিতে পাইয়াই উৎকণ্ঠা ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতা, আম পড়ে তোর হাতে খুব লেগেছে নাকিরে?"

সীতা বেদনার কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। এখন হাতখানা তুলিয়া দেখিল, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটী স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অজিতের দেওয়া বাগানের সেরা সেরা ফুলগুলি তখনও তাহার আঁচলে বাঁধা রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি স্ফীত হাতখানা নামাইয়া যথাসম্ভব তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, "বেশী লাগেনি পিসিমা।"

করুণা বলিলেন, "পরি, অপু, ওদের কাছে শুনলাম, বাবুদের বাগান থেকে কে নাকি তোর হাতে আম ছুঁড়ে মেরেছে। কে আর মারতে যাবে, অমনিই পড়েছে। কোন্‌খানটায় পড়েছেরে?"

অজিতের উপর এখন আর সীতার রাগ ছিল না। পাছে অজিত এই অপরাধের জন্য তাহার মায়ের কাছে শাস্তি পায়, এই ভয়ে সীতা অজিতের নামও করিল না, হাতও তুলিল না। কিন্তু করুণা তাহার স্ফীত হাতটি তুলিয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আহা ফুলে উঠেছে যে! চল্‌ শীগগির, বাড়ী যেয়ে কিছু লাগিয়ে দি; ফুলো, ব্যথা কমে যাবে।"

সীতা করুণার সহিত পথ চলিতে চলিতে তাঁহাকে আঁচলের ফুল দেখাইয়া সোল্লাসে বলিল, "দেখ পিসিমা, কত ফুল এনেছি আমি! এ দিয়ে আজ ঠাকুর সাজাবে না?"

করুণা স্মিতমুখে বলিলেন, "দূর পাগলি! ও-ফুল দিয়ে কি ঠাকুর সাজান যায়?

সীতা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন যায় না পিসিমা?"

"কাচা কাপড়ে ঠাকুরের ফুল আনতে হয়। এ কাপড় পরে যে ভাত খেয়েছিস। আমি তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছি, আর তুই বুঝি ততক্ষণ বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলেছিস্‌। কখন ইস্কুল হয়ে গেছে, সব মেয়ে বাড়ী ফিরেছে, তোর দেরী দেখেতো আমার ভাবনাই হয়েছিল।"

সীতা কথা কহিল না। তাহার আনীত ফুল ঠাকুর পূজায় লাগিবেনা জানিয়া তাহার খুব দুঃখ হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তাহার পিসিমার সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের চারিদিকে চারিখানি খড়ো ঘর। ঘরগুলির ছাউনি খড়ের হইলেও পরিচ্ছন্ন এবং সুদৃশ্য। একপাশে গোয়াল, সেখানেও পরিচ্ছন্নতার অভাব নাই। উঠানের বাঁধান তুলসী মঞ্চটি চন্দনলিপ্ত পুষ্প দ্বারা সজ্জিত। মঞ্চের সজ্জা ও নির্ম্মলতা দেখিলেই মনে হয়, কাহারও সেবাপরায়ণ হাতের ভিতর দিয়া এখানে আন্তরিক ভক্তির নির্ম্মল ধারা ঝরিয়া পড়ে। বাড়ীর ঘরগুলি এবং তাহার আসবার ধনীর সম্পদের পরিচায়ক না হইলেও গৃহবাসীদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের কোন অভাব জ্ঞাপন করে না।

সীতাকে উঠানে দেখিতে পাইয়া ঘর হইতে একটি দু'বছরের শিশু বাহির হইয়া আসিয়া জড়িতকণ্ঠে "দিদি", "দিদি" বলিয়া তাহার সরু কোমরটি বেষ্টন করিয়া ধরিল। সীতা হাতের বইগুলা দাওয়ায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল। এমন সময়ে শিশুর মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শিশুটিকে সীতার কোল হইতে টানিয়া লইয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "থাক্‌, ওকে তোমার আদর করতে হবে না। এতক্ষণ ওকে যদি আমি রাখতে পেরে থাকি, তবে এখনো পারব।"

সীতা একবার বিমাতা কিরণবালার সদ্য নিদ্রাভঙ্গজনিত রক্তিম চক্ষুর পানে তাকাইয়াই নত করিল। ভাইটিকে এমন করিয়া কাড়িয়া লওয়ায় নিগূঢ় অভিমান ও দুঃখে তাহার চক্ষু দু'টি ছল ছল করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তবু সে কথা বলিল না। মায়ের এরূপ কার্য্য তাহার কাছে এই নূতন নহে।

দাওয়ায় ছড়ান বইগুলির উপর দৃষ্টি পড়ায় কিরণের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "রাজরাণি, ইস্কুলের নাম করে বাড়ী থেকে বের হয়ে এতক্ষণতো পথে পথে ঘুরে এসেছ। এখন বইগুলি গুছিয়ে রাখবারও কি সময় হলো না তোমার? শ্লেট কি করেছ? কথা বলছ না কেন? শ্লেটখানা স্কুলে ফেলে এসেছ না কি?"

কিরণের প্রশ্ন-গর্জ্জনে ভয়ে সীতার চক্ষুর জল নিমেষে শুকাইয়া গেল। তাহার আড়ষ্ট জিহ্বা কোন শব্দই উচ্চারণ করিতে পারিল না।

করুণা বাড়ী আসিয়াই ঠাকুরের বৈকালীর আয়োজনের জন্য ঠাকুরের ঘরে ঢুকিয়া ছিলেন। কিরণের পুনঃপুনঃ ক্রুদ্ধ গর্জ্জনেও সীতা জবাব না দেওয়ায় তিনি বাহির হইয়া আসিয়া কিরণকে বলিলেন, "একটা আম ওর হাতে পড়ে শ্লেটটা ভেঙ্গে গেছে।"

আওয়াজ কিছুমাত্র নরম না করিয়াই কিরণ করুণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাতে আম পড়ল কি করে?"

"বাবুদের বাগানের ধারের পথ দিয়ে আসছিল কি না, বাগানের গাছ থেকেই আম পড়েছে।"

"সে পথ দিয়ে আসা হয়েছিল কেন? নিশ্চয়ই অজিতের সঙ্গে দস্যিপনা করবার মতলবে ছল করে সেই পথ ধরা হয়েছিল। কারু শ্লেট ভাঙ্গল না, তোর শ্লেট ভাঙ্গল কি ক'রে? সেদিন নতুন শ্লেটখানা কিনে দিয়েছি। মেয়েকে বিদ্বান করবার জন্যে ক'খানা শ্লেট মাসে কিনতে হবে শুনি? কতদিন আমি অজিতের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছি ওকে, সেটা গ্রাহ্যই নেই। এমন নির্ভয় মেয়ে আর আমি কোথাও দেখিনি। অজিতের সঙ্গে হাতাহাতি করতে যেয়েই শ্লেট ভেঙ্গেছে, সেকি আমি বুঝিনে?"

করুণা বলিলেন, "আমার কথা বিশ্বাস কর বড়বৌ, অজিতের সঙ্গে হাতাহাতি করে নয়, দৈবাৎ ভেঙ্গে গেছে।"

"একদল মেয়ের মধ্যে দৈব শুধু ওর শ্লেট খানাই ভেঙ্গে গেল! ইচ্ছা করেই ও শ্লেট ভেঙ্গেছে। সীতা, এক ঘণ্টা তোকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই তোর শাস্তি।

কিরণ পিতার সঙ্গে কিছুদিন সহরে থাকিয়া কোন স্কুলে পড়িয়াছিল। সুতরাং সেখানকার শাস্তির নিয়মগুলা তাহার 'অভ্যস্ত ও মুখস্থ' হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু করুণার নিকট ইহা একান্তই অপরিচিত। কিরণ তাহার শিশু পুত্রটির উপরও মাঝে মাঝে এমনি দু'একটা হুকুম জারি করিয়া বসিত। তখনও বৈশাখী রৌদ্র উঠানের অনেকখানি ভরিয়াছিল। অপরাহ্ন হইলেও রৌদ্রের

উত্তাপ খুব কম ছিল না। অদূরবর্ত্তী রৌদ্রের ঝাঁজটা সীতার গায় লাগিতেছিল। করুণা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "সেকি বড়বউ, উঠানে কি মেয়ে এক ঘণ্টা দাঁড়ায়ে থাকতে পারে?"

কিরণ গম্ভীর ও দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তাই থাকতে হবে। পয়সা রোজগার করতে কি কষ্ট হয় না? পয়সার জিনিস নষ্ট করলে' শাস্তি পেতে হয় বৈকি।"

করুণা মৃদু হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "বলি, বড়বৌ, সে পয়সাগুলি কি তোমার ভাইদের বাড়ীথেকে আসে? তাই তার ওপর এত দরদ তোমার?"

কিরণ তাহার উদ্দীপ্ত রোষ দমন করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, সবাই তো আর বাপ ভাইয়ের পয়সা দখল করে থাকতে পারে না, অনেকের শ্বশুর ঘর, স্বামীর ঘরও করতে হয়। কাযেই সেখানকার পয়সার ওপরও দরদ দেখাতে হয় যে।"

কিরণের কথার ভিতরকার শ্লেষ ও ইঙ্গিতটা ভ্রাতৃগৃহ-বাসিনী করুণার বুকে যাইয়া বাজিল। তাহার শান্তশ্রীমণ্ডিত প্রসন্ন মুখে বেদনার কালো ছায়াপাত হইল। উত্থিত নিঃশ্বাসটা সজোরে চাপিয়া তিনি ঠাকুর ঘরে' যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

"মেয়েকে কিছু বলতে গেলেই পাঁচ দিক থেকে পাঁচ জন ছুটে আসবে, আমি যেন এ বাড়ীর কেউ নই। আর পয়সা যায়—অনিষ্ট হয়—তারই লাগে, অন্যের কি? মৌখিক দরদ দেখানোতে তো যার কোন লোকসান নেই। সব কাযেই এই রকম বাধা, এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আসুক আজ বাড়ী, এর একটা বিহিত করতেই হবে" বলিতে বলিতে কিরণ তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। করুণা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া ঠাকুর ঘরে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা

মরণ

কোন সে অতীতে মরিয়া গিয়াছ তুমি
আমিও মরেছি সেদিন তোমার সাথে,
বেঁচেছ' তুমি সে মরণ-চরণ চুমি
আমি যে কেবলি ডুবিয়া নয়ন পাতে।

মরণ বরিয়া নবীন জীবন লভি'
ফুটেছো আপনি পেলব কুসুম সম,
আমি যে আমার হারায়ে যা' ছিল সবই
জাগিয়া মরণের নিবিড় আঁধারতম।

বলিয়া গিয়াছ—"আমিই মরেছি আজ
মরণ পরশ লাগেনি তোমার গায়"
আমি বলি—"না—না—আমারই বক্ষমাঝ
ঘুমায়ে মরণ নিদ্রিত শিশু প্রায়"।

পেয়েছো জীবন মরিয়া নিমেষ তরে
আরত' তোমার নয়নে আঁধার নাই,
এখন আমি যে তোমার আশীষ বরে
তোমারই মতন মরিয়া বাঁচিতে চাই।

শ্রীরেণুকা দাসী

সাহিত্যে বিষাদের সুর

আনন্দই, সাহিত্যের প্রাণ, সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা এবং সাহিত্যরসিকের সাহিত্যালোচনার প্রধান আকর্ষণ। মানুষ যখন হইতে মনের গভীর ভাবগুলি ভাষায় সম্যক প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে তখন হইতেই সাহিত্যসৃষ্টির আরম্ভ। যখন একটী ভাবের স্রোত মনকে আলোড়িত করে তখন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিলে একটা আনন্দ হয় এবং অপরেও সেই ভাষায় নিজ নিজ অব্যক্ত ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করে। এই আনন্দ সাধারণ স্বার্থসিদ্ধজনিত আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এবং কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে ও ভাস্কর্য্যে, যে কোনও সুকুমার কলায় প্রকাশিত হউক না কেন এই রস উপলব্ধিজনিত আনন্দকে সৌন্দর্য্যানুভূতির আনন্দ (æsthetic pleasure) বলে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মানুষ সাধারণতঃ দুঃখকে বরণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইলেও, দুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে নিজেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখিতে চাহিলেও, দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। মানবজীবনের বেদনার অভিব্যক্তি, সে বাস্তবই হউক কি কাল্পনিকই হউক, চিরকালই মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছে। শিশুদের অতি পুরাতন রূপকথাতেও আমরা মধ্যে মধ্যে একটী করুণ সুর কাহিনীগুলিকে আরও মর্ম্মস্পর্শী করে দেখিতে পাই। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ অলঙ্কার শাস্ত্রে করুণ রসকে সাহিত্যিক রসসৃষ্টির একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত এই তৃষ্ণা মিটাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যের উপাসক গ্রীকেরা তাঁহাদের সাহিত্যের, এবং অনেকের মতে বিশ্বসাহিত্যের, শীর্ষস্থানীয় Tragedyর সৃষ্টি করিয়া মানবজীবনের ব্যর্থতার চিত্র খুব হৃদয়গ্রাহী করিয়া আঁকিয়াছেন। মহাপরাক্রান্ত বীরেরাও কিরূপে একটী অজ্ঞেয় মহাশক্তির ক্রীড়ণক মাত্র, বিশ্বজয়ী সম্রাটও কিরূপে একটী স্রোতের তৃণের মত নিতান্ত নিরুপায়ভাবে নিয়তির আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছে—তাহাই Tragedyর বর্ণনীয় বিষয়। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই রহস্যময় জগতের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বগুলির মধ্যে দুঃখ রহস্য সকল যুগেই ভাবুক মাত্রেরই গভীর চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে এবং Greek Tragedy ঐ দেশীয় মনিষিগণের সেই সকল চিন্তাধারার সাহিত্যিক রূপান্তর মাত্র।

আনন্দ সৃষ্টিই যাহার প্রধান লক্ষ্য সেই সুকুমার শিল্পের একটী প্রধান উপাদান মানবজীবনের শোকতাপ, এই অসঙ্গতির আলোচনা প্রাচীন কাল হইতেই সাহিত্যরসিকেরা করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক Aristotle তাঁহার অলঙ্কার শাস্ত্রবিষয়ক Poeticsএ Tragedyর স্বরূপবর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন—"Tragedy is a thing grave and great, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, ...through pity and fear effecting the pengation of the emotion. যে-সে

লোমহর্ষণ ঘটনার বর্ণনা করিলেই Tragedy হইবে না। সাহিত্যিক আনন্দ দিতে হইলে ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে হইবে, বিষয়টী মহৎ হইতে হইবে এবং হৃদয়ে ভীতি ও করুণার উদ্রেক করিয়া দর্শকগণের মনের ভাবগুলিকে মার্জ্জিত করিতে হইবে। এই শেষোক্ত বাক্যটী সুস্পষ্ট নহে। বোধ হয় Aristotle যে মানসিক ক্রিয়া সকল পরে aesthetic আনন্দরূপে উপলব্ধি হয় তাহাই নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। Tragedy বর্ণিত ভীষণ সংঘর্ষের মধ্যে মানব চরিত্রের মহত্ব যেরূপ প্রকট হয় সেরূপ কোথায়ও হয় না। Tragedyর হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলি আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোকতাপগুলি কিরূপ অকিঞ্চিৎকর তাহা বুঝাইয়া দেয় ও আমাদের মন, অন্ততঃ সে সময়ের জন্য শুদ্ধ ও মার্জ্জিত করে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নাই। আমার বিশ্বাস হিন্দুজাতির চিন্তাধারাকে এইরূপ সাহিত্যিক রূপ দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই মহাপ্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের অতুলনীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র এই জটিল বিষয় সম্বন্ধে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই কৌতূহল মিটাইতে পারিয়াছিল। ভারতে ধর্ম্মতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বিষয়ীভূত হয় নাই—এবং কঠিন কঠিন মীমাংসাগুলিও সমাজের নিম্নস্তরে সহজ-বোধ্য রূপে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। মায়াবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি মীমাংসাগুলি জনসাধারণের মধ্যে মজ্জাগত সংস্কার রূপে বদ্ধমূল হইয়া দুঃখের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিল; এবং ভাবুক মাত্রেই সাধনা দ্বারা সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় পৌঁছানই মানবজীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিল। সুতরাং যদিও সংস্কৃত সাহিত্যে করুণ কাহিনীর অভাব নাই এবং যদিও সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে করুণ দৃশ্যও অনেক আছে তথাপি সেগুলি সাহিত্যে রস সৃষ্টির একটী অঙ্গ মাত্র। সেগুলি সুখদুঃখময় মানবজীবনের আংশিক ছবি মাত্র—তাহারা মানব-জীবন ব্যার্থতায় সমষ্টি মাত্র এই মত প্রচার করেনা। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের হিন্দু এই বিচিত্র জগতের সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া জগৎ আনন্দময়, মানব অমৃতের পুত্র এই বাণীই প্রচার করিয়াছে এবং দুঃখের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া তাহা অকিঞ্চিৎকর এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছে।

ফলত: মানবজীবনের বিষাদের দিক সাহিত্যসৃষ্টির আরম্ভ হইতেই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হইলেও—মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটী দুঃসহ দুঃখের বোঝা বহন করিতে বাধ্য—মানব জীবনে সুখের আশা মরীচিকা মাত্র, এই যে বিষাদবাদ, ইহা সাহিত্যে একটী অপেক্ষাকৃত নূতন জিনিষ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে যে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য ধ্বনিত তাহা সাহিত্যে একটী নূতন সুর।

From too much love of living
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
Whatever gods may be

That no life lives for ever ;
That dead men rise up never,
That even the weariest river
Winds somewhere safe to Sea.

(Swinburne)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই বিষাদের সুর সাহিত্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই কথাটী আমি এই প্রবন্ধে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

Chaucerকে ইংরাজী সাহিত্যের আদি কবি বলা যায়। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যদিও তিনি মানুষের সুখদুঃখের ইতিহাসই বর্ণনা করিয়াছেন ও যদিও মধ্যে মধ্যে করুণ কাহিনী খুব মর্ম্মস্পর্শী করিয়া বলিয়াছেন, মোটের উপর তিনি মানবজীবনের সুখশান্তির দিক্‌টাই বেশী উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁহার হাসির উদ্রেক করিয়াছে মাত্র, তাঁহাকে অভিভূত করে নাই।

Edmund Spenser ষোড়শ শতাব্দীর লোক—তাঁহার জীবনে তিনি দুঃখ বড় কম পান নাই। তাঁহার ছাত্রাবস্থা দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে কাটিয়াছে। যৌবনে তিনি রাজসভায় অনুগ্রহ-ভিখারীরূপে ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় Irelandএ শত্রুমধ্যে ভয়ে ভয়ে কাল কাটাইতেন। তথাপিও তিনি দুঃখবাদী হ'ন নাই। তাঁহার প্রধান পুস্তক "Faerie Queene"এ তিনি গল্পচ্ছলে নৈতিক গুণগুলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার প্রধান আকর্ষণী শক্তি তাঁহার সৌন্দর্য্যের অনুভূতি। সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য তিনি তীব্র আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছেন ও নিপুণ শিল্পচাতুর্য্যের সাহায্যে পাঠককেও করাইয়াছেন।

Shakespeare মানবজীবনকে মোটের উপর বিষাদময় ভাবিতেন কি না এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ তিনি কোনও নাটকেই তাঁহার মনের কথা বা অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নাটকগুলিতে নানাবিধ লোক নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সেগুলি বক্তাসকলের নিজ নিজ মানসিক অবস্থার পরিচায়ক ; সেগুলিকে Shakespeareএর মনের কথা বলিয়া ধরিবার কোনই কারণ নাই। যেখানে Macbeth বলিতেছেন—

It (life) is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing—

তাহা যেমন Shakespeare এর মত বলিয়া লওয়া চলে না, সেরূপ যেখানে Hamlet বলিতেছেন—What a piece of work is man ! how infinite in faculty ! in form

and moving, how express and admirable ! in action how like an angel ! in apprehension how like a god ! তাহাও সেইরূপ নাটকোচিত অব্যক্তিক উক্তি। এইরূপ নায়ক-নায়িকার উক্তির মধ্য দিয়া Shakespeare নিজেকে কোথায়ও ধরা ছোঁওয়া দেন নাই। ইহাই তাঁহার চরম কৃতিত্ব।

কিন্তু নাটক ছাড়া তাঁহার আর কতকগুলি কবিতা আছে যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়িয়াছে কিনা সে বিষয়ে সাহিত্যিকমাত্রেরই কৌতূহল স্বতঃই উদ্দীপিত হয়। তাঁহার Sonnet গুলি যে জাতীয় কবিতা সে গুলির, প্রাণের নিভৃততম কোণের বহিপ্রর্কাশ হিসাবেই, প্রধান মূল্য। সাহিত্যিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে সময়ে তিনি sonnet গুলি রচনা করিয়াছিলেন সেই সময়েই তাঁহার প্রধান Tragedy গুলি লিখিত হয়। Sonnet গুলিতে তিনি এক প্রিয়তম বন্ধুর ও এক প্রেমাস্পদার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সে যুগে ঐ ধরণের Sonnet লেখা একটা ঢং (fashion) ছিল। কিন্তু ইহা আমি ধারণাই করিতে পারি না যে, যে কবিতায় হৃদয়ের গভীরতম ভাবগুলি এইরূপ অনুভূতির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে—সেগুলি কেবল সাহিত্যিক কসরত মাত্র। সে সময়ের সব নাটকগুলিতেই একটা বিষাদের গভীর ছায়া ঘেরিয়া আছে। কোন বেদনাময় অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবন মধ্যাহ্নে তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্তির উপর একটা বিষাদের মেঘ দিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, সে রহস্য আজিও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস স্বাভাবিক যে যদিও Tragedy সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, এবং যদিও তিনি তাঁহার art এর চরমোৎকর্ষের সময় এইগুলি রচনা করিয়াছিলেন—তথাপিও এই সময়ে তাঁহার জীবনে এমন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল যাহার ফলে মানব জীবনের বিষাদের দিকটা তাঁহার কাছে বেশী স্পষ্ট হইয়া প্রকট হইয়াছিল।

কিন্তু এই মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি আবার তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার শেষ বয়সের নাটকগুলিতে করুণ চিত্রের অভাব নাই, কিন্তু সেগুলি মানবের বিচিত্র জীবনের আংশিক ছবি মাত্র; শরৎ কালের বৃষ্টি যেরূপ আকাশের নীলিমাকে আরও মনোরম করে, সেগুলিও সেইরূপ জীবনকে আরও আনন্দময় করিয়া প্রতিফলিত করিয়াছে। মানব জীবনের ব্যর্থতা জনিত বিষাদ আর নাই—তাঁহার প্রশান্ত হাস্যের কিরণ সব দৈন্যকে ঢাকিয়া চতুর্দ্দিক উদ্‌ভাসিত করিতেছে।

Milton এর কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি করুণ সুরে গান বাঁধিবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। Lycidas এর বন্ধুবর king এর জন্য শোক প্রকাশ করিতে গিয়া অতুলনীয় কাব্য সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়াছেন। সে শোকে নৈরাশ্যের তীক্ষ্ণতা নাই। কবি শেষ জীবনে পার্থিব শত অশান্তির মধ্যে থাকিয়াও নৈরাশ্যের বাণী প্রচার করেন নাই। যদিও তিনি নিতান্ত অসহায়, দৃষ্টিহীন—"On dark days though fallen, and evil tongues," তিনি অন্তরের

আলোকের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন যেন তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানের লীলা বর্ণনা করিতে পারেন। যদিও তাঁহার Paradise Lost এর বিষয় মানুষের অবাধ্যতার ফলে পতন—তিনি এই কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন ভগবানের বিচারের নিরপেক্ষতা প্রতিপাদন করিবার জন্য—to justify the ways of God to man. তাঁহার শেষ গ্রন্থ Samson Agonistes এও এই প্রশান্ত নির্ভরশীলতা দেখিতে পাই। যদি কোনও কবি তাঁহার হৃদয়ের গভীর বেদনা বাহিরে প্রকাশ করিবার সুযোগ খুঁজিতেন তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর বিষয় আর কি পাইতেন? বৃদ্ধ, অন্ধ, Philistineর হস্তে বন্দী Samson, Royalistদের দ্বারা নির্য্যাতিত Milton এর প্রতিচ্ছবি মাত্র। কিন্তু এত কষ্ট পাইয়াও তিনি জীবনের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন নাই, বরং

Just are the ways of God,
And justifiable the men,

এই সান্ত্বনাই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন।

তৎপরবর্ত্তী সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা এখানে আবশ্যক। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যে বিষাদের সুর কোন লেখকেরই রচনায় সুস্পষ্ট হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে একটী নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল। ইহা পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সমস্ত জাতিগণের মনোরাজ্যে একটী ভাবের প্রবল বন্যার ফল। জগতের সমস্ত প্রশ্নগুলি আবার নূতন করিয়া আলোচিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে চারিদিকেই সামাজিক আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব এবং সাহিত্যে একটী যুগ পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। এই নূতন প্রাণের স্পন্দনে কেহই আর পুরাতন চিন্তাধারাকে বিনা বাক্যে মানিয়া লইতে রাজী নহে। সকলেরই মনে বিদ্রোহের ভাব। ইহার ফলে ভাবের সংযম ও মার্জ্জিত ভাষা অপেক্ষা অন্তরের নিভৃততম বৃত্তিগুলির বহিপ্রকাশ সাহিত্যে বেশী আদরণীয় হইল। ফলতঃ এই অন্তর্মুখী সাহিত্যে মানবাত্মার ইতিহাস বহির্জগতের ইতিহাস অপেক্ষা বেশী আগ্রহের সহিত আলোচিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে কোনও কোনও লেখকের লেখায় যে একটী গভীর নৈরাশ্যের ভাব ধ্বনিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

ইংরাজী সাহিত্যে এই যুগ প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে প্রধান Wordsworth এবং Coleridge. Wordsworth জীবনের দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার প্রধান উপায় স্বভাবের ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া এই মত প্রচার করিলেন। Coleridge দার্শনিক আলোচনায় ও অহিফেনে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন। তাঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ Byron এবং Shelley এর লেখাতেই এই বিষাদের সুর সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। সমাজের হস্তে নির্য্যাতিত Byron সাহিত্যে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেন। তিনি প্রধানতঃ বিদ্রূপের কষাঘাতে সমাজের অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য বিধানগুলিকে

ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কপটতাকে জর্জ্জরিত করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক কবিতায় বেশীর ভাগেই তাঁহার এই কথা প্রযোজ্য—

If I laugh at any mortal thing
'Tis that I may not weep.

তাঁহার কাব্য একটু মনোযোগের সহিত পড়িলেই এই ব্যঙ্গবিদ্রূপের, এই তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে যে একটী গভীর বিষাদের সুর প্রচ্ছন্ন আছে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। পদে পদে জীবনের ব্যর্থতায় যে গভীর বিষাদ তাঁহার অন্তরে পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে রচিত এই কবিতায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—

My days are in the yellow leap ;
The flowers and fruits of love are gone ;
The worm, the canker, and the grief
Are mine alone !
The fire that on my bosom preys
Is lone as some volcanic isle,
No torch is kindled at its blaze—
A funeral pile.
The hope, the fear, the jealous care,
The exalted portion of the pain
And power of love. I cannot share,
But wear the chain.

তিনি এই বলিয়া কবিতাটী শেষ করিয়াছেন—

If thou regrettest thy youth, why live ?
The land of honourable death
Is here : Up to the field, and give
Away thy breath.

Shellyর কাব্যে এই বিষাদের সুর অনেক সময়ে হতাশার আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে। কল্পনারাজ্যবিহারী এই কবির দৃষ্টি সর্ব্বদাই স্বর্গরাজ্যে নিবদ্ধ। সুতরাং মর্ত্ত্যের আবিলতায় তাঁহার শুদ্ধ আত্মা অতিশয় ব্যথিত হইত। তাই সংসারের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি শিশুদের মত কাঁদিয়াছেন—

O lift me as a wave, a leaf, a cloud !
I fall upon the thorns of life ! I bleed !

মানবজীবনের নৈরাশ্যের এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী অভিব্যক্তি আর কোথাও দেখা যায় না।

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the realms of our sorrow !

ইহাই তাঁহার তৃষ্ণা। অসীমের প্রতি এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা পার্থিব অসম্পূর্ণতার মধ্যে মিটিবার নহে। সেইজন্য তাঁহার অধিকাংশ গীতিকবিতাই এই দারুণ অতৃপ্তির মূর্চ্ছনায় অনুরঞ্জিত। যেমন এই কবিতাটীতে—

O world ! O life ! O time !
On whose last steps I climb
Trembling at that where I stood before ;
When will return the glory of your prime ?
No more—Oh ! never more !
Out of the day and night
A joy has taken flight :
Fresh spring and summer and winter hoar
Move my heart with grief, but with delight
No more—oh ! never more !

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে Shelly কেবল নৈরাশ্যের কবি নহেন, তিনি মানবাত্মায় মুক্তি-মন্ত্রের ঋষি। যখন মুক্তির জয়োল্লাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি গাইতে থাকেন তখন তাঁহার সেই কবিত্বপূর্ণ ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে আমরা শুনিতে পাই জয়ের তূরি ধ্বনি। যেমন তাঁহার Ode to the West Wind এর শেষ কয় পংক্তিতে—

Be thou, spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !
Drive my dead thoughts over the Universe
Like withered leaves to quicken a new birth ;
... ...
Be through my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy ! O Wind !
If winter comes, can spring be far behind ?

নৈরাশ্যবাদীদের মধ্যে James Thomsonকে সম্রাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে আশায় ক্ষীণতম জ্যোঃতিও প্রবেশ করে নাই। একটী বিরাট অবিশ্বাস ও নিরাশা তাঁহাকে যে চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল যাহা হইতে মুক্তি অসম্ভব। এই ভাবটী তাহার City of Dreadful Night এ খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে—

The City is of Night, but not of Sleep ;
    There sweet sleep is not for the weary brain ;
The pitiless hours like years and ages creep,
    A night seems termless hell This dreadful strain
Of thought and consciousness which never ceases,
Or which some moments' stupor but increases,
    This, worse than woe, makes wretches thene insane.
They leave all hope behind who enter there
    One certitude while same they cannot leave,
One anodyne for torture and despair ;
    The certitude of death, which us reprieve
Can put off long ; and which, divinely tender,
    But waits the outstretched hands to promptly render
That draught whose slumber nothing can bereave.

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Darwin Huxley প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের ফলে চিন্তারাজ্যে একটী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। অনেকের মতে ধর্ম্মতত্ত্বগুলির আবার নূতন করিয়া পরীক্ষার প্রয়োজন হইল। ফলে অনেকে নাস্তিকতার দিকে চলিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ Keble, Newman প্রভৃতি মনীষিগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ধর্ম্মজগতে বিশ্বাসই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু ; তর্ক, স্বাধীন চিন্তা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ চলে না। এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া সেই যুগের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মনোভাব Matthew Arnold এর কবিতায় খুব প্রাঞ্জলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

Matthew Arnold নিজে বেশ রসিক আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন, তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীতে কোথায়ও বিষাদের ছায়া পড়ে নাই, বরং সেগুলি সরল রসিকতায় সজীব। কিন্তু তাঁহার কাব্যে সর্ব্বত্র একটী বেদনার সুর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন সেই যুগের লোকেরা দুই যুগের সন্ধিস্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—"Standing between two worlds, one dead, and the other powerless to be born." অতএব কোনও একটী বিশেষ আদর্শে তিনি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে জীবন একটী ব্যর্থতার সমষ্টি মাত্র—এই ধারণা অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসে নির্ভর করিতে দিতেছে না—অথচ প্রাণ একটী কিছুর উপর নির্ভর না করিলে বাঁচে না—তাই তিনি সতৃষ্ণনেত্রে পুরাতন জগতের সরল বিশ্বাসগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার এই মানসিক ব্যষ্টি আধুনিক অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহার Scholar Gypsy নামক কবিতায় তিনি একজন Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র Gypsy (বেদে) সম্প্রদায়ের গুপ্তবিদ্যা লাভ করিবার জন্য কিরূপ সভ্য জগত

ছাড়িয়া তাহাদের মধ্যে তাহাদেরই একজন হইয়া বাস করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বিদ্যা লাভ করিতে হইলে ভগবানের নির্দ্দেশ আবশ্যক। তাই সেই দুই শত বৎসর পূর্ব্বের Scholar Gypsy এখনও সেইস্বর্গীয় আলোকের অপেক্ষায় স্বর্গের পথে চাহিয়া রহিয়াছে। ইহাই কবি কল্পনা করিয়াছেন। কবি তাহাকে বলিতেছেন—

But fly our paths, our feverish contact fly!
For strong is the infection of our mental strife,
Which though it gives no bless, yet spoils for rest;
And we should win thee from thy own fair life,
Like us distracted, and like us unblest.

মানব জীবন তাঁহার কাছে ব্যর্থতার সমষ্টিমাত্র—

Though beneath, seems hardly worth
This pomp of worlds, this pain of birth.

পরস্পরের মধ্যে স্নেহের বাঁধ যতই দৃঢ় বলিয়া বোধ হউক না কেন প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ নিতান্তই একা—

Yes, in the sea of life misled
With echoing straits between us thrown,
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions live alone.

ইহা সত্ত্বেও কবি নৈরাশ্যে অভিভূত হন নাই। বীরের মত সমস্ত দুঃখ সহ্য করাই প্রকৃত মনুষ্যের ধর্ম্ম এই stoict আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—

Hath man no second life? Pitch this one high!
Sits there no judge in Heaven, our sin to see?
More strictly then the inward judge obey.

এইজন্যই Arnold এর কবিতা এই যুগের শিক্ষিত সমাজের এত প্রিয়।

আধুনিক সাহিত্যের এই যে বিষাদের সুর—তাহার কারণ কি? একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই যুগে ধর্ম্মবিশ্বাসের বাঁধন আল্গা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ জীবনের প্রধান অবলম্বন হারাইয়াছে। মানুষ যখন সংসারিক আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া এজগত দুঃখময় দেখে তখন তাহার নৈরাশ্যের অন্ধকারে একমাত্র আশার জ্যোতি ধর্ম্মবিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক যুগের স্বাধীন চিন্তাপ্রণালী সে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা ত শুদ্ধ বিজ্ঞানের আলোচনায় মিটেনা—তাহার প্রাণ একটী ধর্ম্মবিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়—কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্মের বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাও এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান জীবনের জটিলতা—কবির ভাষায়—"the sick hurry, the divided aims,

the heads overtaxed, the palsied hearts"—সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের স্ফূর্ত্তির পক্ষে নিতান্ত পরিপন্থী; সুতরাং জীবনের প্রকৃত শান্তি কোথায় তাহার সন্ধান খুব কম লোকই পাইতেছে। Matthew Arnold সত্যই বলিয়াছেন—

We never once possess our souls
Before we die.

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী Art এর রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছে। ফলে মানব জীবনের সমস্ত দিকই এখন নগ্ন নির্ম্মম বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত হইয়াছে। পূর্ব্ব যে বিষয়গুলি Art এর বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইত, সেগুলি এখন সাহিত্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে। কথা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার একজন প্রধান প্রবর্ত্তয়িতা ফরাসী ঔপন্যাসিক Zolaর বই পড়িলে মনে হয় যেন তিনি ইচ্ছা করিয়াই মানবজীবনের অসুন্দর দিকটা আঁকিয়াছেন। আধুনিক রুষীয় ঔপন্যাসিকগণ বিশেষতঃ Tourgineff এবং Dostoivesky যেন কঠোর ভাবে জীবনের দুঃখের দিকটা দেখানই Art এর একমাত্র উদ্দেশ্য এই ভাবে লিখিয়াছেন। তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা ও মানবচরিত্র বিশ্লেষণে অপূর্ব্ব ক্ষমতা আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহাদের পুস্তকপাঠে তৃপ্তি পাওয়া দূরে থাকুক, আমাদের মানসিক অশান্তি যেন আরও ঘনীভূত হয়।

ইংরাজী কথা সাহিত্যেও এই সুর আধুনিক যুগে বেশ স্পষ্ট হইয়াছে। Dickens এর পূর্ব্বে কোন ঔপন্যাসিকই নিম্নশ্রেণীর লোকের জীবনী যে Art এর উপাদান হইতে পারে তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। Dickens এই সকল লোকের জীবন সম্বন্ধে লিখিলেন বটে কিন্তু তিনি তাহাদের জীবনে যতটুকু মাধুর্য্য, যতটুকু romance তাহাই চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকেরা, যেমন Gissing, শুধু এইটুকু দেখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রামে কতজীবন ব্যর্থ, কত সংসার ছিন্ন ভিন্ন হয়, কত পাপ, কত অনাচার, কত বীভৎসতা সমাজে প্রবেশ করে তাহাই দেখাইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের পুস্তক বেদনাময়।

Thomas Henry জীবিত ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে মানবজীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের চিত্রের আধিক্য থাকায় অনেকে তাঁহাকে Pessimism আখ্যা দিয়াছেন। তিনি তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। "While I am quite aware that a thinker is not expected, and indeed, scarcely allowed, now more than here to fore, to state all that crosses his mind concerning existence in this universe, in his attempts to explain or excuse the presence of evil and the incongruity of penalising the rironsible—it must be obvious to open intelligences that, without denying the beauty and faithful service of

certain venerable cults, such disallowance of "obstinate questiens" and "blank misgivings" tends to a paralysed intellectual stalemate...and what is today, in allusion to the present author's pages, alleged to be "pessimism is, in truth, only such "obstinate questionigs" in the exploration of reality and is the first step towards the soul's betterment and the body's also." ফলতঃ এই শ্রেণীর লেখকেরা মনে করেন যে, সত্যের উপলব্ধির ও জগতের মঙ্গলের জন্য পার্থিব দুঃখদৈন্য বাদ দিলে চলিবেনা—বরং সমাজদেহকে ব্যাধিমুক্ত করিতে হইলে চিকিৎসকের মত অসুন্দর জিনিষও ঘাঁটিতে হইবে। কিন্তু সকল দেশেই সকল যুগেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি তিনিই যিনি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই সংসারের সমস্ত দুঃখদৈন্যের ভেদদ্বন্দের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দের অভিব্যক্তি দেখিতে পান ও অপরকে দেখিতে সাহায্য করেন। এই প্রসঙ্গে একথাটী স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে বাঙ্গালী ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়াছে এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যেও ঘোরতর বস্তু তান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এই পাশ্চাত্য ব্যাধি যে আমাদের সাহিত্যকেও আক্রমণ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বর্ত্তমান যুগের দুই একজন প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী গ্রন্থকারের উপন্যাসে এই বেদনাময় অভিজ্ঞতার অত্যধিক ছায়াপাত বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই, ইহা যুগধর্ম্ম এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাহিত্যে সজীবতার লক্ষণ। তবে বাঙ্গালীর ইহা পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যাঁহার কাব্যে ভারতের বাণী আধুনিক যুগে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, সেই বাঙ্গালীর কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে অভিনব সুরে "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদের" সন্ধান দিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তিলক চরিত্র

চতুর্থ অধ্যায়

তিলক যে বার L. L. B. উপাধি লাভ করেন সে বৎসর সার রিচার্ড টেম্পল্ চ্যান্সেলর হিসাবে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের অন্যতম উদ্দেশ্য সরকারি চাকুরি, কিন্তু বড় বড় চাকুরির সংখ্যা তখনও বেশী বাড়ে নাই। রাজস্ব বিভাগে মামলাদারের চাকুরি অনেক ছিল কিন্তু ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত উচ্চ-শিক্ষিতের দাবি পদবিবিহীন উমেদারের দাবি অপেক্ষা প্রবল বলিয়া বিবেচিত হইত না। সার রিচার্ড টেম্পল্ স্থির করেন যে, অতঃপর মামলাদার নিয়োগের সময় উপাধিধারি উচ্চ-শিক্ষিতদের দাবি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। এবং ১৮৮০ সালের পদবি-দান সভায় এই নূতন নীতি ঘোষণা করেন।

টেম্পল্ সাহেব ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হইলেও মোটের উপর শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। কেবল পুথিগত বিদ্যায় কাজ হইবে না বলিয়া তিনি B. Sc. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করিবার ও অন্যান্য কয়েকটী সংস্কারের আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইর বাহিরে অন্যান্য যায়গায় Matriculation পরীক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া মফঃস্বলের ছাত্রদিগের অধিকতর সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। টেম্পল্ সাহেব বলিয়াছিলেন, "I should consider the success of the natives as civil administrators to be the truest test of that combined mental and moral training which our education seeks to give."

কিন্তু সকল উপাধিধারি কিম্বা উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি যে কোন ব্যবহারিক পেশা গ্রহণ করিবে অথবা সরকারি চাকুরিতে মজিয়া যাইবে এমন কোনও কথা নাই। টেম্পল্ সাহেব তাঁহার বিলাতি অভিজ্ঞতা হইতে বেশ ভালরূপেই অবগত ছিলেন যে, শিক্ষা দ্বারা মানুষের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক। কেহ হয়ত অসন্তুষ্ট হইবে, কাহারও মনে হয়ত সরকারের বিরুদ্ধে অপ্রীতির সঞ্চার হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদের চিন্তা সাধারণে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এবং হয়ত অন্য লোকের মনেও সেই অসন্তোষ বিস্তারিত হইবে। এইরূপে শিক্ষিত সমাজে সরকারি কার্য্যে সমালোচনাকারী একদল লোকের সৃষ্টি হইবে ইহা টেম্পল্ সাহেব জানিতেন। কিন্তু ইহাতে তিনি ভীত না হইয়া আপনার অভিভাষণে ইহার সম্ভাবনা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত যুবকেরা মুক্ত হৃদয়ে মনের কথা প্রকাশ করিলে আমরা তাহাকে রাজদ্রোহী মনে করিব না; সুশিক্ষিত শ্রেণী যদি কৃতঘ্ন হয় তবে সে পাপের দায়ি তাহারাই হইবে। তজ্জন্য আমরা শিক্ষা দানের হস্ত সঙ্কুচিত করিব না। অসন্তোষের ভাবনা সুশিক্ষিতদিগকে শোভা পায় কি না তাহা বিচার করিবার ভার আমরা তাহাদিগের বিবেক বুদ্ধির উপর সমর্পণ করিব। এইরূপ উদার মতবাদ টেম্পল্ সাহেব আপনার অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়েই বড়লাট লর্ড লিটন দেশী সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করিবার আইন পাশ করিযাছিলেন বলিয়া টেম্পল সাহেবের মুখের ও মনের কথায় বাস্তবিক কতখানি প্রভেদ ছিল তাহা সেকালের লোকেরা ভাল রূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিলক এল, এল, বি, পাশ করিবার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিবন্ধমালা বাহির হইয়াছিল। টেম্পল্ সাহেব যখন উপরোক্ত বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন যে তাহার মনে এংগ্লো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র কর্ত্তৃক চিত্রিত সুশিক্ষিত মহারাষ্ট্রিয় যুবকদিগের বিকৃত চিত্তের উদয় হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে ?

১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রে ওকালতি পেশার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সে কালের তালিকা হইতে দেখা যায় ১৮৭৪ সালে পুণা সহরে ৩৫ কি ৩৭ জন উকিল ছিল।. আইনের কেতাব হইতে আইনের ধারা বাহির করিয়া দেখাইতে পারাই সেকালে ছিল ভয়ানক বাহাদুরির

কথা। ১৮৬৫ সালে পুণার আদালতে ওকালতির লেখা পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩১। পুঁথি দেখিয়া উত্তর লিখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। পরীক্ষার্থীরা সকলে গায়ে গায়ে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লিখিতেছিল। সেকালের একজন পরিহাস-রসিক লিখিয়াছিলেন, পরীক্ষার্থীদিগের পরস্পরের প্রতি স্নেহভাব ও পরীক্ষক মহাশয়ের তাহাদিগের উপর স্নেহের নজর দেখিয়া আমরা খুসি হইয়াছি। এই পৃথিবীতে আসিয়া যথাসাধ্য বন্ধুজনের সাহায্য করিবে ইহাই ত মানুষের ধর্ম্ম, পরীক্ষার সময় পরীক্ষক ও পরিক্ষার্থী সকলেই যে এই ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া কাহার না আনন্দ হইবে। প্রধান পরীক্ষক এসিষ্টেন্ট জজ সাহেব যে ভাষায় পরিক্ষার্থীরা উত্তর লিখিয়াছিল সেই মারাঠি ভাষার এক বর্ণও জানিতেন না, তথাপি দুই একজন উপদেষ্টার সাহায্যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি কাগজ দেখা শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যেখানে ব্যবহারপণ্ডিত উকিলদিগেরই এই অবস্থা সেখানে এসেসর ও জুরিদিগের অবস্থা কেমন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নিমন্ত্রিত এসেসররা মনে করিতেন যে, বিচারকার্য্যের সহায়তার জন্য আদালতে যাওয়া এক উপদ্রব বিশেষ। সে সময়কার একজন লেখক লিখিয়াছেন, একবার আমি একজন এসেসরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আসামীর বিরুদ্ধে আপনারা কি প্রমাণ পাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, "রাখিয়া দাও প্রমাণ। প্রমাণ আর অপ্রমাণ আবার কি? জজ সাহেবকে ত কিছু বলিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় অব্রাহ্মণেরা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিলেন। তথাপি তিলকের সঙ্গে সঙ্গেই কিম্বা তাহার চারি পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বেই তাহাদের মধ্যেই সুশিক্ষিত শ্রেণীর উদয় হইয়াছিল। এই শ্রেণীর অগ্রণীর সম্মান যতি রাও গোবিন্দ রাও ফুলের প্রাপ্য। তাঁহার প্রপিতামহ সাঁতারা জিলার অন্তর্গত খাতগুণ গ্রামে বতনদার চৌগুলা ছিলেন। সেখানকার কুলকর্ণির অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া তাহাকে খুন করিয়া তিনি পুণা জিলার অন্তর্গত পুরন্দর তালুকের অধীন খানবড়ী গ্রামে উঠিয়া আসেন। তাহার পুত্র শেটিবা পরে পুণায় আসে। তাহার তিন পুত্র মালির কাজ করিত। পেশোয়া সরকারে নিত্য ফুলের যোগান দিত বলিয়া তাহাদিগের নাম হইল ফুলে। এই তিন ভ্রাতার অন্যতম গোবিন্দ রাওযের ঔরসে জ্যোতি রাও ১৮২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার লেখাপড়ার দিকে মন ছিল। প্রতিবেশী এক মুসলমান মুন্সির উপদেশে ও লিজিড্ সাহেবের সাহায্যে জ্যোতি রাও ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করেন। পরে তখনকার পুণা-ব্রাহ্মণসমাজের অগ্রণী সদাশিব রাও গোবণ্ডে, সখারা যসবন্ত পরাঞ্জপে প্রভৃতির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। বালককাল হইতেই জ্যোতি রাওর মনে স্বদেশানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। এবং বাসুদেব বলবন্ত ফড্‌কের মত ফুলেও ফড্‌কের গুরু লহুজী বুবার নিকট গুলি চালাইতে এবং লাঠি ও তরবারি খেলিতে শিখিয়াছিলেন। গোলামগিরি নামক পুস্তকে জ্যোতি রাও লিখিয়াছেন যে, "এই বিদ্যা শিখিয়াছিলাম ইংরেজ সরকারকে দূর করিয়া দিবার জন্য।

আর এই কাজে উৎসাহ পাইয়াছিলাম ভট্ট বিদ্বানদিগের নিকট।" পরে তিনি আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সত্য-সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ইংরেজী, মারাঠি ও গণিত উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। এবং বিদ্যানুরাগের জন্য তিনি আজীবন বিদ্যার্থী ছিলেন বলিলেও চলে। ১৮৩৮ সালে বুধবার পেঠে অবস্থিত ভিড়ের বাড়ীতে তিনি মারাঠা বালকদিগের জন্য একটী মারাঠি বিদ্যালয় খোলেন। তাঁহার পত্নীকে তিনি স্বয়ং মারাঠি শিখাইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনিও শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন। বালিকাদিগকেও এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। আপনার পুত্রবধূ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন, ইহা জ্যোতি রাওয়ের পিতা মোটেই পছন্দ করিতেন না। সুতরাং শিক্ষাকার্য্যে তিনি পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট বাধা পাইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে সরকারি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে জ্যোতি রাও এই বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেন। অস্পৃশ্যদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় কিছুদিনের জন্য চালাইয়া তিনি মিউনিসিপাল কমিটীর হাতে ছাড়িয়া দেন। ১৮৫২ সালে বিশ্রাম বাগের বাটীতে প্রকাশ্য দরবারে সরকার হইতে স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের চেষ্টার জন্য জ্যোতি রাওকে ২০০৲ শত টাকা মূল্যের একখানি শাল উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৭৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সত্যসাধক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমাজের উদ্দেশ্য সকলেই জানেন। অব্রাহ্মণেরা শিক্ষা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণের গোলামী ছাড়িয়া দিবে ইহাই ছিল এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। অব্রাহ্মণ সমাজে সামাজিক সংস্কার, মদ্যপান, প্রভৃতি ব্যসন নিবারণ করিবার চেষ্টাও তিনি এই সমিতির দ্বারা করিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমি যে-কোন জাতির ঘরে ভোজন করিব।" বোম্বাইয়ের তুকারাম তাত্যা পড়বল জাতিভেদের বিরুদ্ধে জাতিভেদ-বিবেকসার নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, আর কেহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সাহস না করায় জ্যোতি রাও এই বইখানি ছাপিয়াছিলেন। তিনি স্বজাতির উন্নতির জন্য গোলামগিরি সৎসাগর এবং সার্ব্বজনিক সত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষের পরিতোষ হিসাবে এই গ্রন্থগুলি বিশেষ মূল্যবান।

সত্যসাধক সমাজ স্থাপিত হইলে ব্রাহ্মণেতর পক্ষ হইতে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবার কল্পনা হয়। এই কার্য্যের জন্য জ্যোতি রাওয়ের বন্ধুগণ তাহাকে ১২০০ শত টাকা মূল্যের একটী ছাপাখানা খরিদ করিয়া দেন। কিন্তু জ্যোতিরাও সংবাদপত্র বাহির না করায় কৃষ্ণাজী-পাণ্ডু-রঙ্গ-ভালেকর নিজের পয়সায় ছাপাখানাটী কিনিয়া ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী মাস হইতে দীনবন্ধুনামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পয়সা ও লেখকের অভাবে ১৮১৯ সালে কাগজখানি তিনি অন্য লোকের হাতে ছাড়িয়া দেন। এই সংবাদ পত্রখানির বিগত

ইতিহাস এখানে বিস্তারিতভাবে দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এইটুকু মাত্র দেখাইতে চাই যে, নিউ ইংলিশ স্কুল স্থাপনের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণেতর সমাজে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। এবং সেই সমাজের একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্রও কেশরীর তিন বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তথাপি তিলক, আগোরকর প্রভৃতি সুশিক্ষিত হইয়াও যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অব্রাহ্মণ সমাজেরও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। তিলক ও আগোরকর যখন কারামুক্ত হন তখন ব্রাহ্মণেতর নেতৃগণও তাহাদের অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কোলাপুরের মামলায় জ্যোতি রাও ফুলেই রামশেঠ উরবণেস্কে তিলকের জন্য দশ হাজার টাকা জামিন হইতে রাজী করিয়াছিলেন, রায়গড়ে অবস্থিত শিবাজী মহারাজের জীর্ণ সমাধির কথা দীনবন্ধু পত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত হয় এবং চাফল মঠের স্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে শিবাজী স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত পুণায় যে সভা হয় জ্যোতি রাও তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯০ সালের ২৭শে নবেম্বর জ্যোতি রাও ফুলে পরলোক গমন করেন।

সেকালের সরকারি রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, বোম্বাই এলাকায় অনেকগুলি ছাপাখানা স্থাপিত ও বহু-গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৮৬। ইহার মধ্যে ২ খানি ইংরাজী ও ৩ খানি এঙ্গলো মারাঠি এবং দেশী ভাষায় লিখিত ৭১ খানি। দেশী ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রের মধ্যে ৩৪ খানি মারাঠি ও ৩১ খানি গুজরাটী। গুজরাটী সংবাদ পত্রই বিক্রয় হইত বেশী। কিন্তু তাহাও বড় জোর ১৬৫০ খানির বেশী ছাপা হইত না। মাত্র ৬ খানি কাগজের ১০০০ হাজারের অধিক গ্রাহক ছিল এবং ১৪ খানি সংবাদপত্র ৫০০ শত করিয়া বিক্রয় হইত। সেকালের সংবাদ পত্রের মধ্যে কোন কোনটির নাম এখনও সুপরিচিত এবং কোন কোনটি এখনও চলিতেছে।

মহারাষ্ট্রে মুদ্রণ কলার জন্ম ১৮২২ সাল পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রের প্রথম ছাপাখানাওয়ালা পেশোয়া রাজ্যের পতনের ১৮ বৎসর পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইঁহার নাম গণপতি কৃষ্ণজী। তাঁহার জীবিতকালে ও তাঁহার মৃত্যুর পরে অনেক ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে নূতন ধরণের সুদৃশ্য অক্ষর নির্ম্মাণ করেন তাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গণপত কৃষ্ণজী জাতিতে ভাণ্ডারি ছিলেন। তিনি প্রথমে ইমান্ গ্রাহাম নামক একজন মিশনারির ছাপাখানার চাকুরি করিতেন। অতি সামান্য যন্ত্র লইয়া—নিজে কালী প্রস্তুত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে ছাপাখানার কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৮৩১ সালে সর্ব্ব প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা বাহির করেন। নূতনত্বের জন্য এই পঞ্জিকা তখন আট আনা দরে বিক্রয় হইত। ১৮৩৬ সালে দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ তাঁহার ব্যাকরণ গণপত কৃষ্ণাজীর ছাপাখানায় মুদ্রিত করেন। সাত বৎসর পরে গণপত কৃষ্ণাজী একটী টাইপের কারখানা খোলেন। বিশেষ লেখা পড়া না জানিলেও কেবল স্বাবলম্বন ও উচ্চাভিলাষের সাহায্যে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের ক্যাকস্‌টন বলা যাইতে পারে।

১৮৪৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পুণা হইতে জ্ঞানপ্রকাশ বাহির হয়। এ পত্রের প্রকাশক ছিলেন কৃষ্ণাজী ত্রম্বক রাণাডে নামক এক ভদ্রলোক। কাগজখানি প্রত্যেক সোমবার বাহির হইত। প্রথম তাহার আকার ছিল ১০×৮ ইঞ্চি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট। তখনকার দিনে এই ক্ষুদ্র কাগজ খানির বার্ষিক মূল্য ছিল দশ টাকা! বোধ হয় বেশী বিক্রয় হইবেনা বলিয়া সত্বাধিকারী মূল্যের হার বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বোম্বাইর হিন্দুপ্রকাশ পুণার জ্ঞানপ্রকাশের মতই প্রাচীন এবং সেকালে বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এই কাগজখানি ১৮৬৪ সালে বিষ্ণু পরশুরাম পণ্ডিত বাহির করেন। ১৮২৭ সালে সাঁতারা নগরে তাহার জন্ম হয়। সেইখানেই রাঘবেন্দ্রাচার্য্য গজেন্দ্র গড়করের নিকট তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা করিবার জন্য পুণায় আসেন। ১৮৫১ সালে তিনি শিক্ষা-বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করিয়া ধারোয়ার মালেগাঁও প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া ইন্দুপ্রকাশ বাহির করেন। বিধবা বিবাহ উত্তেজক সভা স্থাপনকারীদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৮৭১ সালে তিনি স্বয়ং বিধবা বিবাহ করেন কিন্তু ২ বৎসর পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

ব্রজ-কমল

ভক্তিঅশ্রু-সরোবর নীরে ফুটেছ বৃন্দাবন,
শতদলে সুশোভন,
বাঙ্গালী কবির মানসমৃণালে আনন্দ হরষণ,
প্রাণমন্থন ধন!
সৌরভে তব মোদিত বঙ্গ
গৌরব বহে শত তরঙ্গ;
তোমা ঘেরি', করে অযুতভৃঙ্গ মুখর সঞ্চরণ,
সুরভি বৃন্দাবন!
চির কিশোরের নৃত্যচপল চরণ পদ্মাসন,
চিরলীলা নিকেতন,
আমি বঙ্গের ভৃঙ্গ এসেছি তেয়াগি কুঞ্জবন,
শোন' এ গুঞ্জরণ।
ব্রজ-পঙ্কজ, ও রজে অঙ্গ
দিয়া গড়াগড়ি করি পিশঙ্গ,
করি মাধুকরী, প্রেম মধুকণা মধুকরে বিতরণ
কর শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীকালিদাস রায়

কীর্ত্তন ও উচ্চসঙ্গীত

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা সঙ্গীতের মধ্যে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য নয় মনে করার কয়েকটি কারণ আছে। সেই কারণগুলি নিয়ে আজ কয়েকটি কথা লিখ্‌তে চাই। সঙ্গীত বলতে আমরা কি বুঝি? অর্থাৎ সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বা আদর্শ কি?—না, সুর। একথা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না। সুর ছাড়া সঙ্গীত হয় না, কিন্তু কথা ছাড়া সঙ্গীত হয়, যেমন যন্ত্র-সঙ্গীত অথবা কণ্ঠ-সঙ্গীতের মধ্যে আলাপ বা তেলেনা ইত্যাদি। তাই বিশুদ্ধ গান তাকেই বলা চলে যে গানের কথা ও ভাব লতা স্বরূপ সুরকেই একান্ত ভাবে অবলম্বন ক'রে, আত্মপ্রকাশ করে—নিজেই সর্ব্বে সর্ব্বা হয়ে ওঠেনা। কীর্ত্তন বাঙালীর কাছে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাই বলে ভারতবাসীর কাছে শ্রেষ্ঠ কিনা এইটেই বিচার্য্য। সঙ্গীত তো শুধু বাঙালীরই সম্পদ নয়—সেটা ভারতবাসীর ও জগতবাসীর। জগতকে তার একটা দেবার আছে, কাযেই সঙ্গীতের মধ্যে কীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ বলার অন্তরায় অনেক আছে বলে মনে হয়। কীর্ত্তন বাঙালীর কাছে মধুর—প্রধানতঃ তার ভাবের জন্য। কীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ তার ভাব এবং তার ব্যাখ্যা। সুর মাত্র তার ছায়ারূপে তাকে অনুগমন করে যাবে। কেননা ভাল সুর ছাড়া কীর্ত্তন অনেকেই গেয়ে থাকেন এবং খুব ভাল গাইবার ক্ষমতা নেই এমন লোকের কীর্ত্তনও আমাদের খুব স্পর্শ করতে পারে দেখা যায়, যদি তাতে ভাব যথেষ্ট থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে কীর্ত্তনের প্রাধান্য সুরের চাইতে ভাবেই বেশী। অবশ্য কীর্ত্তনে ভাল সুর নেই একথা বলা হচ্ছেনা, কীর্ত্তনেও সুরের বিস্তার ও বৈচিত্র্য খুব বেশী আছে এবং সেটি যে বড় জিনিষ সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলেই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না, যেহেতু বড় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ দুটি কথার অর্থ এক নয়। কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে একটি করুণ ভাব প্রায়ই আমাদের খুব স্পর্শ করে থাকে, যা থেকে আমাদের মধ্যে শুধু করুণ নয় একটু উদাস ভাবও জেগে ওঠে। একটা প্রাণ-মাতান সব-ছাড়ান ভাব কীর্ত্তনে খুব বেশীই আছে। যে সুরের বা অনুভূতির আমাদের এ রাজ্য ছেড়ে বাইরের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। সেটা যে খুব বড় জিনিষ একথা অস্বীকার করা চলেনা; তবে একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, সে অনুভূতি কেবল সুরের জন্যই নয়, তার একটু আগে যে কথা বা আঁখর গাওয়া হয়েছে তারই রেশ বাঙালীর হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠ্‌তে থাকে। শুধু বাঙালীরই প্রাণে আর কারুর নয় একথা যদি সত্য হয় তবে দেখা যাচ্ছে, যে যে জিনিষের আবেদন কেবল একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর—একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ তার স্থান উচ্চ হবার বাধা না থাকলেও অভ্রভেদী হতে পারে না। একথা বলার মানে এ নয় যে, কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের কোনও দাবীই থাকতে পারে না। কীর্ত্তন বাঙালীর একান্ত নিজের সম্পদ, কীর্ত্তন বাঙালীর রত্ন, সঙ্গীতরাজ্যে বাঙালীর একটি নিজস্ব দান; এবিষয়ে বোধহয় দুমত

থাকতে পারে না, তবে সঙ্গীতের মধ্যে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ—এরূপ মতপ্রকাশ করার বিপদ অনেক আছে একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে। সমস্ত দেশের সঙ্গে আমার স্বকৃত জিনিষের তুলনা করতে গেলে, কেবল আমি বা আমার আত্মীয়ের গণ্ডীর ভেতর রেখে তার গুণের বিচার করা চলে না। কিছুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার কর্ত্তে গেলে তাকে তুলে ধরতে হবে; আমাদের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যেতে হবে; দেখতে হবে তার আবেদন অন্যকে কি ভাবে ও কতখানি স্পর্শ করে তবেই তার শ্রেষ্ঠত্বের বিচার সম্পূর্ণ হবে। বিশেষতঃ সঙ্গীত হচ্ছে বিশ্বের সম্পত্তি—যার আবেদন সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করে থাকে ও সকল জাতির মধ্যেই সমাদৃত হয়ে থাকে। সুতরাং তাকে আমার বলে দাবী করবার ক্ষমতা আমাদের থাকলেও মূল্য নির্দ্ধারণের দাবী আমার মানবে কে? এ দাবী করতে গেলেই দেখা যায় যে উচ্চ সঙ্গীতে অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর তার সূক্ষ্মকাজ বিস্তার ও বৈচিত্র্য নিয়ে কত সমৃদ্ধ হয়ে বিকাশ পেয়েছে, কলাকারুর দিক দিয়ে যার গরিমা গগনচুম্বী বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। কাজেই সঙ্গীতের প্রধান আদর—অর্থাৎ সুরের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে উচ্চ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বেশী থাকে, একথা অস্বীকার করা চলেনা। কারণ উচ্চ সঙ্গীতের কথার আবেদন অকিঞ্চিৎকর হলেও তার সুরের মধ্যে যে গভীর প্রাণ ও রস নিহিত আছে সেই সঙ্গীতের অনুরাগীকে গভীর ভাবে স্পর্শ না করেই পারে না। যত শোনা যায় ক্লান্তি আসাতো দূরের কথা, তলিয়ে যাওয়ার, ভিতরে প্রবেশ কর্ব্বার, নিহিত তত্ত্ব খুঁজবার বা আবিষ্কার করবার ইচ্ছা মনপ্রাণকে নিয়তই মাতিয়ে উত্তেজিত করে তোলে। উচ্চ সঙ্গীতে ভাষার কোনও মূল্যই নেই বা থাকতে পারেনা একথা অবশ্য বলা হচ্ছে না। আসল বলবার কথাটি হচ্ছে এইটুকুমাত্র যে, উচ্চ সঙ্গীতের ভাষার অর্থ বুঝতে না পারার দরুণ তার সুরের মহিমা উপলব্ধি করার বিশেষ কোনও বাধা ঘটে না। উচ্চ সঙ্গীত শুনলেই বোঝা যায় এ জিনিষ সাধনা ছাড়া হয়না—হবার নয়; এ মানুষ ইচ্ছে করলেই পারে না—একে আয়ত্ত করতে গেলে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন। কীর্ত্তনের যদি কথা বাদ দিয়ে খালি সুর শোনা যায় তাহ'লে শুধু যে তার সুরের মধ্যে বিশেষ কোনও নতুন প্রাণের বা তত্ত্বের সাড়া পাওয়া যায় না তাই নয়, উপরন্তু ক্লান্তি আসে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। কারণ কীর্ত্তনের মধ্যে পদাবলীর ভাবের প্রাধান্য বেশী বলেই বিশুদ্ধ স্বর-বৈচিত্র্যে তা পূর্ণ করা যায় না, তাই শুধু কীর্ত্তনের সুর খানিকক্ষণ শুনলে মনে হয় আবার কখন ভাল পদ বা ভাবপ্রবণ আঁখর শুনব। কীর্ত্তনের সুরের অপেক্ষাকৃত দৈন্যের অভিযোগের উত্তরে ভক্ত বলতে পারেন যে, শ্রীভগবানের লীলা বা ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমাদের মন সেই তত্ত্বকথার মধ্যে এত মগ্ন হয়ে পড়ে যে সুরের গভীরতার মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়ে ওঠেনা বা চলেনা বা সুরের মহত্ত্বের পরিচয় দেবার সময় বা নেওয়ার ধৈর্য্য থাকে না। কিন্তু তা বললে তো চলবেনা। কীর্ত্তনকে যে সঙ্গীতের মধ্যে দাবী করা হচ্ছে। কথকতার বা ভাগবত পাঠের এলাকার মধ্যে তাকে সরিয়ে দিলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তিরস উদ্রেকের ক্ষমতার দিক দিয়ে

বিচার করলে এ কথার উত্তরে কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু কীর্ত্তনকে সঙ্গীতের দিক দিয়ে বিচার কর্ত্তে গেলে তার সুরের মাহাত্ম্যকে বাদ দিয়ে এ বিচার করা চলে না।

আর একটী কথা। সঙ্গীতের প্রধান সম্পদ যে সুর তার একটী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সুরের আবেদন ভাষার আবেদনের চেয়ে কম সঙ্কীর্ণ বলে একটী ভাষায় কোন গান গাওয়া হলে সে ভাষা অনভিজ্ঞ লোকও শুধু সে গানের সুর থেকে অনেকখানি আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতে পারেন। এখন আমাদের কীর্ত্তন যদি অ-বাঙ্গালীর কাছে গীত হয় তবে তাঁরা তার থেকে কতখানি আনন্দ পাবেন সে কথাটি চিন্তনীয়। তাঁরা যে সুরের মধ্যেই বড় উপলব্ধি বা অনুভূতির সন্ধান কর্ব্বেন—তাঁরা ত কথার আবেদন বুঝবেন না। তাই তাঁরা যে তখন কীর্ত্তন শুনে যথেষ্ঠ আনন্দ পাবেন না একথা বোধ হয় সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, যেহেতু ইতিপূর্ব্বেই দেখান হয়েছে যে কীর্ত্তন সুর ও কবিত্বের মিলনে গড়ে উঠেছে, একের অভাবে সে মিলন সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। সঙ্গীতরাজ্যে ঐ সুরের মধ্যে দিয়ে যাঁরা অতুল ধনসম্পদ লাভ করে অসীমের পরিচয় পেয়েছেন তাঁদের কাছে সেই সুরেরই দিক দিয়ে কীর্ত্তনকে কি অতি সামান্য মনে হবে না? না, সামান্য মনে হলে সেটী আশ্চর্য্যের বিষয় বল্‌তে হবে? আমাদের মধ্যে একটু ভাল গানের ও নকল করবার ক্ষমতা থাকলে অনেকে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনগায়কের নকল করে গাইতে পারেন দেখা গিয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত সঙ্গীতের কোনও শ্রেষ্ঠ ওস্তাদকে নকল করা যে শুধু ভাল কণ্ঠ থাকলেই সম্ভব হয় না তাই নয়, রীতিমত সাধনা করেও তাকে আয়ত্ত করা সুকঠিন হয়ে পড়ে।

এখানে একটী কথা বলা দরকার সেটী এই যে, এসব যুক্তির ফলে কীর্ত্তনকে অবজ্ঞেয় বা হেয় প্রতিপন্ন করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ কীর্ত্তন সঙ্গীতে একটী সত্যই মহৎ বিকাশ—যার প্রাণ হচ্ছে কথা ও সুরের মিলন। কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ তার ভাবের দিক দিয়ে, কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ তার কবিত্বের দিক দিয়ে, তার ব্যাখ্যার মহিমার দিক দিয়ে। সুরের মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত ভাবকে বিশদ করে সার্থক করে ফুটয়ে তোলা; একেবারেই একটী নতুন ধারা। এমন কি একে একটী নতুন সৃষ্টি বা creation বলা যেতে পারে। অতএব এদিক দিয়ে কীর্ত্তন খুবই বড়। এ কথায়ও সন্তুষ্ট না হয়ে কেউ হয়ত বলতে পারেন, কীর্ত্তনের ধারাই আলাদা, তুলনা করা চলে না, কারণ কারণ কীর্ত্তনের সৃষ্টি বা উদ্দেশ্যই হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল। প্রেম ও ভক্তির ভাবকে সুর, ভাগ, পদ ও আঁখরের মধ্য দিয়ে মানুষকে মর্ম্মে পৌঁছে দেওয়া। একথার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যদি কীর্ত্তন এর বেশী দাবী না করে তবে একথায় আপত্তি করার কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু গোল বাধে তখনই, যখন কীর্ত্তনকে অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করে বিশুদ্ধ সঙ্গীত হিসাবেও শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করা হয়। কারণ বিশুদ্ধ সঙ্গীত হিসেবে তুলনামূলক সমালোচনা করলেই আলোচনাটী সুরের এলাকার মধ্যে না এসেই পারে না, সে কথা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার বলা হয়েছে, এবং বিশুদ্ধ সুরের বিকাশ যে কীর্ত্তনের কেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের কোটায় পড়তে পারে না সে কারণ নির্দ্দেশও হয়ে গেছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে কীর্ত্তনকে খর্ব্ব করতে চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কীর্ত্তন আমাদের আদরের গর্ব্বের জিনিষ। তার কারণ, প্রথমতঃ কীর্ত্তন বাঙালীর নিজস্ব দানের অন্যতম ও দ্বিতীয়তঃ কীর্ত্তন ভক্তি সাধনার দিক দিয়ে একটী মস্ত জিনিষ। যে সঙ্গীত-ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে শ্রীভগবানের লীলা এমন মধুরভাবে প্রকট হয়ে উঠে; যে সঙ্গীতের নিহিতভাব বহুদিন ধরে ভক্তের "কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশে" তার নিহিত আবেদনটিকে অপূর্ব্বভাবে মূর্ত্ত ক'রে এসেছে; এক কথায় যে কীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমের জোয়ার বইয়ে গিয়েছেন;—সে কীর্ত্তন বাঙালীর কাছে চিরদিন আদরের ধনই থেকে যাবে। তবে ঠিক সেই জন্যেই কীর্ত্তনকে বিশুদ্ধ সঙ্গীত হিসাবে গণ্য করা বা বড় বলা উচিত নয় এইটুকু মাত্র এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধ্যমত দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি। কারণ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ বিলানো নয়—তার লক্ষ্য ভিন্ন।

শ্রীমতী সাহানা দেবী

পাওয়া

জীবন ব্যাপী সাধন দিয়ে তোমায়
আমি চেয়েছি।
হৃদয়ভরা বেদনা নিয়ে তোমায়
হৃদে পেয়েছি।
ফুলের হাসি উষার আলো
ভূষার মত নিয়ত ঢালো
কত যে মোরে বেসেছ ভালো
তোমারি গানে গেয়েছি।
দুঃখানলে দহন করে　　আমায় নিলে আপন করে
রাখিয়া পাশে যাবেনা সরে
সে আশা আজ পেয়েছি।

আপন হারা গানের তালে
ভুবন ভরা সুরের জালে
আমার চিত কমল দিয়ে
তোমায় আমি ছেয়েছি।
আঁধার রাতে জ্বালায়ে আলো
আমার তরে করুণা ঢালো
ভুবন ভরা সুধার স্রোতে
ভাসিয়া কূল পেয়েছি।
জীবন-ব্যাপী সাধনা দিয়ে
তোমায় শুধু চেয়েছি।

৺ইন্দিরা দেবী

বয়সের বিজ্ঞতা

(১)

আষাঢ়ের অপরাহ্ন। আজ রথ। দুপুর হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ছেলেমেয়েরা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছিল। মায়ের সঙ্গে জোরজবরদস্তি করিয়া ছেলেরা ভাল কাপড় জামা পরিয়া লইয়াছিল; কিন্তু বৃষ্টির জন্য বাহিরে যাইতে পারে নাই। মাঝে মাঝে এক আধবার জল কমিয়াছে কিনা দেখিবার ছুতা করিয়া একটি বালক বাহিরে আসিবামাত্র মায়ের ধমক শুনিয়াছে—'হ্যাঁরে জলে ভিজ্‌ছিস্ যে বড়!' সে অমনি চট্ করিয়া ভাল মানুষের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিয়াছে—'এই দেখ মা, একটুও জল পড়্‌ছে না!'

'বৃষ্টি পড়্‌ছে না তো জামা কি করে ভিজ্‌লি রে পাজী?'—মা মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন।

ছেলে মিষ্ট হাসিয়া বলিল 'কই, ভিজে মা! এতো জল ছিট্‌কে লেগে ভিজে গেছে।'

বাড়ীর উঠানে, সাম্‌নে রাস্তার স্থানে স্থানে জল জমিয়াছে। ছেলেরা রথ দেখিবার লোভে সেই জলে ছুটাছুটি করিবার এবং কাগজের ও পাতার নৌকা ভাসাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া মেলার মাঠে অভিভাবকদিগের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

(২)

প্রভাত ও নলিনীদের পাশা-পাশি বাড়ী। দুজনেরই বয়স সমান। ৭।৮ বৎসর হইবে। রথের মেলা হইতে দুইজনে সবেমাত্র দুটি বাঁশী আনিয়াছে। বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া দুইজনে পাড়াটা মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। দুইজনে জলের উপর দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছিল। প্রভাত নলিনীকে বলিল—তোর বাঁশীটা দেখি।

নলিনী বাঁশীটা দিল। প্রভাত বাঁশীটা বাজাইয়া ফিরাইয়া দিল।

নলিনী বলিল—তোর বাঁশীট দেতো একবার। প্রভাত বাঁশী নলিনীর হাতে দিল। বাঁশীটা বাজাইয়া ফিরাইয়া দিতে গিয়া বাঁশীটা নলিনীর হাত হইতে জলে পড়িয়া গেল।

"আমার বাঁশী জলে ফেলে দিলি?"—প্রভাত রাগিয়া বলিল।

নলিনী ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—হাত ফস্‌কে পড়ে গেছে ভাই।

কেন ফেল্‌লি আমার বাঁশী—বলিয়া প্রভাত নলিনীর গালে এক চড় বসাইয়া দিল।

নলিনী চড় খাইয়া চটিয়া গেল। খানিকটা জল লইয়া প্রভাতের গায়ে ছিটাইয়া দিল।

'দাঁড়া রাক্ষুসী, আগে বাঁশীটা খুঁজে নেই তারপর তোরে মজা দেখাচ্ছি'—বলিয়া প্রভাত নীচু হইয়া বাঁশী খুঁজিতে লাগিল।

প্রভাত বাঁশী পাইল বটে কিন্তু জামাকাপড় খানিকটা জলে ভিজিয়া গেল। তার উপর

বাঁশী বাজাইতে গিয়া দেখে ভাল বাজেনা। প্রভাত ভারী রাগিয়া গেল ও নলিনীকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল 'তোর জন্যেই তো আমার বাঁশী খারাপ হ'ল, কাপড় ভিজে গেল।'

নলিনী সে ধাক্কার টান সাম্‌লাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল ও জলের ভিতর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

কান্না শুনিয়া নলিনীর মা আসিয়া মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া রাগিয়া আগুন হইলেন। নলিনী মাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কান্নার বেগ বাড়াইয়া দিল ও বলিল, প্রভাত তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

মা তাড়াতাড়ি আসিয়া নলিনীর পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ড চড় কসাইয়া দিয়া বলিলেন, 'হতভাগী, পোড়ারমুখী, তোকে বলিনে যে ও দস্যি ছেলের সঙ্গে বেড়াস্ নি,—বলিয়া হিড় হিড় করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

নলিনীর কাকা বাড়ীর ভিতর ছিল। তাহার বয়স বেশী নহে—বছর ২০ হইবে। সে নলিনীর অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কাছে সব শুনিয়া রাগিয়া বাহিরে আসিল। প্রভাত তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল।

নলিনীর কাকা প্রভাতকে বলিল—কেন মেরেছিস্ নলিনীকে ?

প্রভাত বলিল—ও কেন আমার বাঁশী ফেলে দেয় ?

"তাই বলে তুই গায়ে হাত তুল্‌বি বাঁদর" বলিয়া প্রভাতকে ঘা কতক বসাইয়া দিল।

প্রভাত চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দনের শব্দে প্রভাতের বড় ভাই আসিল। তখন দুই যুবকে বেশ ঝগড়া বাধিয়া গেল। শেষটা দুই বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া বেশ একটা দাঙ্গা বাধাইয়া দিল।

ব্যাপার এখানেই শেষ হইল না। নলিনীর পিতা আস্ফালন করিয়া থানায় কেস্ লিখাইতে গেল। প্রভাতের পিতাও আত্মরক্ষার্থ থানায় গিয়া নালিস লিখাইল।

(৩)

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে। পথ ও জমির জল নামিয়া গিয়াছে। সিক্ত, ঈষৎ কর্দ্দমাক্ত পথ ও মাটির উপর জ্যোৎস্নাধারা ক্ষতের উপর প্রলেপের মত ঝরিয়া পড়িতেছে।

নলিনী ও প্রভাতের মা আপন আপন রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত। পুরুষরা থানায়। বড় ছেলেরা ভাঙ্গা মেলায় গিয়াছে।

এই অবকাশে নলিনী ও প্রভাত বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। দুজনে দেখা হইল। প্রভাত ডাকিল—'নলিনী, আয় এখানে বসি।'

নলিনী ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। দুইজনে প্রভাতদের বাহিরের রোয়াকের উপর পাশাপাশি পা ঝুলাইয়া বসিল।

প্রভাত বলিল—আমি ভাই তোমায় আর মারব না।

নলিনী বলিল—আমার একটা ভাল বাঁশী আছে। সেইটে তোমায় দেব, কেমন?

প্রভাত বলিল—না ভারি তো একটা বাঁশী, আমি কিনে নেব।

এমন সময় দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি বিপরীত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন প্রভাতের, অপর জন নলিনীর পিতা। উভয়ে থানা ও মোক্তার বাড়ী হইয়া একই সময়ে বাড়ী ফিরিয়াছে।

দূর হইতে দুজনেই সমস্বরে বলিল—কে রে?

প্রভাত ও নলিনী ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—'আমরা'। আর একটু অগ্রসর হইয়া উভয়ে দেখিল সরল নিষ্পাপ বালক বালিকা দুটি পূর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া হাসি মুখে পাশাপাশি বসিয়া আছে, আর চন্দ্রালোকে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। *

শ্রীমাণিক ভট্টচার্য্য

সূর্য্যমতী

(১)

"এখনও যাও বৎস! পিতার চরণে ধরিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিয়া এস, তুমিতো জান তোমার পিতা কিরূপ দুর্জ্জয় অভিমানী! কেন অনর্থক একটা অনর্থের মধ্যে পতিত হ'বে, এখনও সময় আছে, প্রতিকার চেষ্টা কর।"

"মা! মা হ'য়ে সন্তানের মর্ম্মব্যথা না বুঝে যখন স্বামীর পক্ষই গ্রহণ করিলে, তখন তোমাকে আর আমার বল্‌বার কিছুই নাই!—"

"কলশ! এমন নিষ্ঠুরবাক্য কেমন ক'রে তুমি আমায় বল্‌তে পারলে? আমি 'স্বামীর পক্ষ অবলম্বন' করে সন্তানের মর্ম্মব্যথা বুঝিনা? আমি? তুমি কি ভুলে গেছ কলশ! কার একান্ত প্ররোচনা ও চেষ্টায় পিতৃবর্ত্তমানেই তুমি সিংহাসন লাভ করে কাশ্মীরের রাজচক্রবর্ত্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিলে? সে কি তোমার এই মা'র জন্যই নয়? এরও পর তুমি আমায় 'স্বামীর পক্ষাবলম্বিনী' দেখলে? অথচ আমার এই দুর্ব্বলতার জন্য সমস্ত কাশ্মীরে আমি নিন্দিতা হচ্চি। হায় কৃতঘ্নতা!"

রাজপ্রাসাদের মধ্যস্থ একটী সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে মাতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

* টলষ্টয় অবলম্বনে

সময় গোধূলী, অস্তোন্মুখ তপনের স্বর্ণরশ্মি মহারাণী সূর্য্যমতীর উন্নত শরীরে পতিত হইয়া যেন তাঁহার দীপ্ত সৌন্দর্য্যের রশ্মিচ্ছটার ন্যায় জ্বলিতেছিল, তাঁহার আয়তনেত্র আজ অশ্রুভারাকুল, অভিমানে ও বেদনায় পুষ্পপেলব তুল্য অধরোষ্ঠ মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছিল।

সম্মুখের দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্যখচিত আস্তরণযুক্ত খট্টার উপর অলসভাবে শায়িত থাকিয়া মহারাজাধিরাজ অনন্তদেবাত্মজ কলশ রণানিত্য মাতার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত উত্তরপ্রত্যুত্তর করিতেছিলেন। তাঁহার শিয়রে বসিয়া তাঁহার আপত প্রিয়তমা শ্রীমতী দিদ্দা তাঁহার অঙ্গে মৃগাঙ্গচূর্ণবাসিত চামরব্যজন করিতেছিল, পদতলে তাঁহার অন্যতরা প্রেয়সী রাজ্যশ্রী তাঁহার পদযুগল সিত-চন্দন পঙ্কে বাসিত করিয়া দিতেছে।

মাতার এই সুযোগ্য তিরস্কারে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ না করিয়াই কলশরাজ উত্তর করিলেন—"ওরূপ রাজ্যলাভে আমার ফল কি? দু'দিনের জন্য রাজ্য সাজাইয়া আবার কি না একটা সামান্য দাসের পরামর্শে সেই দত্ত-রাজ্য পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে শুধু লোকচক্ষে হীন করা হইল! কেন সে সময় তুমি কোথায় ছিলে? ঐ নীচ কার্য্য হ'তে তোমার পুণ্যবান স্বামীকে তখন বিরত রাখ্‌তে পার নাই?

মহারাণী সূর্য্যমতীর মুখ অপমানে কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি উত্তপ্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "নিজের আচরণ তোমার স্মরণ থাকে না কলশ? কিজন্য রাজশক্তি তোমার হস্তচ্যুত হইয়াছে তোমার মনে নাই? তুমি পিতৃ কৃপায় এত বড় সাম্রাজ্য লাভ করে এমনই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হয়ে পড়লে যে সেই পিতাকেই আদেশ করে বস্‌লে যে তাঁকে তোমায় 'দেব' বলে সম্বোধন করতে হবে, যেহেতু তিনি এখন রাজা নন, তুমি এখন রাজা! ধৃষ্টতার তো একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে!

কলশ একান্ত অসন্তোষের সহিত অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিল "বাঃ আমি কি কিছু অসঙ্গত প্রস্তাব করেছিলাম না কি? ডামররাজ, চম্পারাজ, সাহীরাজগণ, কম্পনপতি সকলেই যখন কাশ্মীরাধিপতিকে 'দেব' সম্বোধন করিয়া থাকেন, তখন রাজ্যচ্যুত পিতাই বা তাহা না করিবেন কেন? আমি এখনও বলিতেছি তাহা করিতে বলায় আমার কোন অপরাধ হয় নাই!

পুত্রের এই উদ্ধত যুক্তি শুনিয়া সূর্য্যমতীর যত্নরোধিত অশ্রু র নেত্রদ্বয়ের সীমা মধ্যে আর যেন রুদ্ধ থাকিতে সময় হইতেছিল না, তথাপি তিনি গভীর বাৎসল্য দ্বারা স্বীয় ক্ষুণ্ণ মাতৃত্বের সকল অভিমানকে রোধ করিয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে মৃদুবাক্যে কহিলেন "সে যাহোক, এবারকার এই মনোমালিন্যটাকে তুমি এখনও সযত্নে পরিহার করে ফেল। এক্ষেত্রে তুমিই অপরাধী—পিতা যদি তোমার দুর্নীতির জন্য শাসন করিয়াই থাকেন, তোমার তাঁহাকে অপমান করা উচিত হয় না, উঠ যাও তাঁর কাছে বিনীত হ'য়ে ক্ষমা চাহিয়া লও।"

কলশ মায়ের মুখের দিকে বারেক চাহিয়াই চোক ফিরাইয়া লইল—মৃদু অবজ্ঞার হাস্যের সহিত সে কহিল,—

"তোমার দৌত্য নিষ্ফল জানিও।" এই বলিয়া নবীনা প্রেয়সীর হস্ত হইতে চামর কাড়িয়া লইয়া মায়ের দিকে তাহা বাড়াইয়া দিল। "দিদ্দার হাত ব্যথা হয়ে গিয়াছে, হয় আমায় একটু বাতাস দাও, না হয় কাহাকেও পাঠাইয়া দিও। কিন্তু দেখ, তোমার বৃদ্ধা দাসীদের মধ্যে কাহাকেও যেন পাঠাইও না, পাকাচুল ও লোল চর্ম্ম দেখিলে আমার অত্যন্ত ঘৃণা বোধহয়, ন্যক্কার উঠিয়া আসে।" সূর্য্যমতী তাঁর একমাত্র পুত্রের দিকে কোপকটাক্ষ হানিয়া চলিয়া গেলেন।

(২)

"রাজন্! একি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিতেছেন? অসময়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্র-হস্তগত হ'য়ে আপনি নিজের ও তার উভয়তঃই অমঙ্গল সাধন করেছেন, তার উপর ক্রোধ বশতঃ আপনার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন সেই নষ্টচরিত্র উচ্ছৃঙ্খল পুত্রহস্তে ন্যস্ত করে নিজে এই যে তীর্থবাসী হইতে চলিলেন এর কি পরিণাম হইবে, ভাবিতেছেন না? তদ্ভিন্ন যেমন তীক্ষ্ণধার অসি কোষ শূন্য হ'লে কেহ তাহা স্পর্শ করে না, তেমনি বংশপরম্পরায় পরাক্রমশালী সদ্বংশীয় ও পবিত্রস্বভাব ব্যক্তিও যদি ধনহীন হন তা'হলে কে তাহাকে স্পর্শ করে?"

মহারাজাধিরাজ অনন্তদেব, বিশ্বাবটের এই উপদেশ বাক্যে ক্ষণকাল চিন্তাযুক্ত হইয়া রহিলেন, পরে বিষাদক্লিষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ! যার নিজপুত্রই তার সহিত এত বড় অসৎ ব্যবহার করিতে পারিল, তার সঙ্গে অপরে কি ব্যবহার করিবে? না, অর্থবল পরিত্যাগ করা বিধেয় নয়—কিন্তু কেমন করিয়া আবার সেই পরিত্যক্ত পুরী—"

"ঐ দেখুন মহারাজ! আমি জানি কলশ আমাদের নিশ্চয়ই ফিরাইয়া লইতে আসিবে! দেখুন, দেখুন দ্বিতীয় অশ্বে কলশের পার্শ্বে দ্বিতীয়া বধূ রামলেখাও আমার জন্য আসিতেছেন! শুনুন! প্রভু! কলশ আসিলে আর তাহাকে অনাদর দেখাইবেন না, সে ফিরিয়া যাইতে বলিলে বিনা দ্বিধায় তাহাতে সম্মত হইবেন, যেহেতু, কলশ অপরাধী হইলেও আপনারও তো অন্যায় রহিয়াছে, আপনিও তো তাহার রাজমর্য্যাদা সত্বেও সহস্তে শারীর দণ্ড দান করিয়াছিলেন। সেটা সঙ্গত হয় নাই।"

"সেকি মহাদেবী! তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, কি নির্ঘৃণ অপরাধের জন্য সেই দণ্ডদান! কুলবধূর প্রতি অত্যাচারের দণ্ডে অনেক রাজা স্বীয় পুত্রেরও প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত আর্য্যবর্ত্তে উত্তরাপথে একাধিকবার শুনা গিয়াছে। আমি তো যৎসামান্য—

"থাক্—থাক মহারাজ! পুত্র সমীপাগত! এস কলশ! স্বাগত! বধূবেশে আস নাই কেন মা? এবেশ কেন?"

"প্রণাম দেব! প্রণাম দেবী! —দেবি! ক্ষমা করিবেন! আপনার পুত্র পাছে কোন কুপরামর্শদাতার চক্রান্তে পতিত হইয়া নিজ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলেন, তাই এইভাবে সঙ্গ

লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদের ভয় দূর করুন। আমরা নিশ্চিন্ত হই। নতুবা আমাদেরও সঙ্গে লউন।”

সূর্য্যমতী বধূর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজ অঙ্গুলির চুম্ব গ্রহণ করিলেন “যাইব বই কি মা, উঠুন মহারাজ!”

মহারাজাধিরাজ অনন্তদেব বারেক অদূরস্থিত সুসজ্জ ও সশস্ত্র পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ নিম্নস্বরে কহিলেন “কই, কলশ তো আমায় যাইতে বলিল না।”

মহারাণী সূর্য্যমতীর উৎফুল্ল মুখ গাম্ভীর্য্যময় হইয়া উঠিল, তাঁহার আয়তবক্ষে ক্রোধভাব দেখা দিল। তিনি সবিরক্ত অথচ মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন “সে তো আপনাকে ফিরাইতেই আসিয়াছে, আপনি কি চান সে আপনার পায়ে ধরে! একালের ছেলের কাছে এত বেশী আশা করা কি সঙ্গত?” পুত্রের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন কলশ! কাছে এস বাপ আমরা তোমায় দেখি।”

কলশ মাতার আহ্বানে বিশেষ অনিচ্ছুকভাবেই নিকটস্থ হইলেন,—“মেঘ উঠিতেছে, বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইলে পথে বৃষ্টি পাইতে হইবে। যাও যদি, বিলম্ব করিও না”।—

“আসুন আসুন মহারাজ! বাস্তবিকই মেঘ দেখা দিয়াছে।”

(৩)

তীর্থরাজ বিজয়ক্ষেত্র। বিজয়েশ্বরের বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণ, রাজাত্মীয় মন্ত্রিবর্গ রক্ষীসৈন্য প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। ত্রম্বঙ্গরাজ, তুঙ্গপুত্র, সূর্য্যবর্ম্ম চন্দ্র প্রভৃতি রাজবংশীয় ও নিকট জ্ঞাতিবর্গ এবং ডামরেরা রাজা অনন্তদেবের অনুগমন করিয়া এখানে আসিয়াছেন, রাজমহিষী সূর্য্যমতী তাঁহার সপত্নীবর্গ, বহুতর দাসদাসী এবং কাশ্মীরের বহু পুরাতন কাল সঞ্চিত অপর্য্যাপ্ত ধনবল লইয়া রাজা এবার স্বল্পমাত্র দিন পরেই রাজধানী ছাড়িয়াছেন। পুত্রের নিকট সুব্যবহার আশা করা বাতুলতা বুঝিয়াই তিনি এবার চিরদিনের জন্য পুত্র সংসর্গ ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

ক্রমে বিজয়েশ্বরের ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল ও বৃদ্ধ নৃপতির জনবলে ও ধনবলে সেই স্থান ভ্রষ্টশ্রী রাজধানী অপেক্ষাও সুসমৃদ্ধি লাভ করিল। রাজপুত্র অশ্বারোহী সৈন্য ও ডামরগণ রাজপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক নবস্থাপিত রাজধানী রক্ষা করিতে লাগিল। বৃদ্ধরাজা ইচ্ছাসুখে স্বর্গভোগ করিতে লাগিলেন, কেবল শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না—মহারাণী সূর্য্যময়ী।

এদিকে কলশ রঙ্কানাগ প্রস্থান করিলে রত্নশূন্য নিধি ভূমির ন্যায় পিতৃপরিত্যক্ত অর্থসম্বল-শূন্য রাজ্যলাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি নিরুৎসাহিত হইলেন না, বরং স্বেচ্ছাপরিত্যক্ত মন্ত্রিত্ব সেনাপতিত্ব প্রভৃতি নিজ স্বভাবানুরূপ অনুচর ও বন্ধুবর্গকে প্রদান করিয়া তাহাদের পরামর্শে পিতার সহিত যুদ্ধযাত্রা জন্য বিপুল উদ্যমে অর্থ সংগ্রহ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদল

রাজ পক্ষে যোগ দিয়াছে, কলশ কতকগুলি পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়ানন্দ বিজ্জ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, পথে অবন্তিপুরে উপস্থিত হইয়া রাজবন্দী জিন্দুরাজকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া সাগ্রহে সমভিব্যাহারী করিলেন।

রাজপক্ষীয়েরাও এই অভিযান সংবাদে রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল, বিজয়েশ্বরের সমুদয় সত্রারণ্য অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অস্ত্র ঝন্‌ঝনা শুনিয়া যুদ্ধাশ্ব সকল গ্রীবা বাঁকাইয়া ক্ষণে ক্ষণে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিতে লাগিল। পুত্রের যুদ্ধোদ্যমের কথা শুনিয়া অনন্তদেব ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বিপুলভাবে যুদ্ধায়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

মহারাণী সূর্য্যমতী বিস্রস্ত বসনে, মুক্তকেশে জগদশ্রুলোচনে আসিয়া রাজার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন—"মহারাজ! দুটি দিন অপেক্ষা করুন, দেখিবেন কলশ নিজ কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া আপনার পদতলে উপস্থিত হইবে।"

রাজা বিষাদমলিনমুখে মাথা নাড়িলেন "বৃথা এ আশ্বাস দেবি! কুসন্তান গর্ভে ধরিয়াছ, ফলভোগ অনিবার্য্য।"

সূর্য্যমতী বিশ্বস্ত দূত মুখে পুত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন "নির্ব্বোধ! তোমার এ বিনাশ বুদ্ধি কোন হতভাগ্যে প্রদান করিল? যাঁহার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে দরদরাজ প্রভৃতি নিহত হইয়াছে, তুমি পতঙ্গ হয়ে সেই কালানলে কি সাহসে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছ! তোমার পিতা দৈবাৎ স্বরাজ্য ত্যাগ করে এসেছেন, সেই অখণ্ডিত সাম্রাজ্য তুমি উপভোগ কর, অনর্থক তীর্থবাসী পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, ঈর্ষাপরতন্ত্রেরা তোমায় বিপদে ফেলিবার জন্যই তোমাকে এ বিপদে ফেলিয়াছে। একে ত তুমি অর্থহীন তার উপর এ যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে পার। আমি জীবিতা থাক্‌তে পিতার হস্তে তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। ইনি বড়ই সরলচেতা বরং পারতো স্বয়ং এসে এঁকে প্রসন্ন করিয়া যাও।"

পরদিন সংবাদ আসিল পুত্র সৈন্য, যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে। দূত আসিয়া নবনৃপতির প্রণাম নিবেদন করিল।

কিন্তু শতবার সীবন করিলেও যেমন ছিন্ন বস্ত্র পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হয় তেমনি এই দুই বিরক্ত হৃদয়ের মিলন পুনঃপুনঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। রাজা অনন্তদেব যখন বাহিরে থাকিতেন, তখন পুত্রের কার্য্যকলাপের সংবাদে তাঁহার চিত্ত ক্রোধে সন্তপ্ত হইয়া উঠিত, আবার গৃহে আসিলেই সূর্য্যমতীর বাক্যে সে ক্রোধ উপশান্ত হইয়া যাইত। বর্ষা শেষে জলহীন জলাধারের মীনের মতই তাঁহার দুরবস্থা ঘটিল। একদিকে পুত্র স্নেহান্ধবতী সূর্য্যমতীর অনুনয় বচন, অন্যদিকে অত্যাচার-পীড়িত ক্ষুব্ধ অনুচরবর্গের কঠোর বাক্য, সরলচিত্ত রাজা নিতান্ত দুঃখিত মনে বাস করিতে লাগিলেন। পুত্রও অতর্কিতে পিতৃপক্ষীয়দিগের প্রতি অত্যাচার চালাইতে লাগিল।

অবশেষে একদিন অনন্তদেব তিক্ত বিরক্ত হইয়া সূর্য্যমতীকে বলিলেন "আমার মনে আর

ওই পাষণ্ডের প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ নাই; আমি স্থির করেছি আমার জ্ঞাতিদের মধ্যে উপযুক্ত দেখিয়া রাজা নির্ব্বাচন করিব। রাজধানী আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছি। তুমি এবার আর বাধা দিও না।"

শুনিয়া সূর্য্যমতী ক্ষণকাল অধোমুখে রহিলেন, তার পর তিনি মুখ তুলিয়া সবেগে কহিলেন, "হর্ষের কথা একেবারে ভুলিয়াছ মহারাজ! পিতার পাপে তোমার আদরের হর্ষকে তুমি ত্যাগ করিবে কিজন্য?"

রাজার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হইল। হর্ষের চাঁদমুখ মনে পড়িল। তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "কিন্তু তাকে কি পাষণ্ড আমায় দিবে?"

সূর্য্যমতী প্রসন্নমুখে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিলেন "সে ভার আমার উপর রহিল।"

কলশ বুঝিলেন এইবার রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা। হর্ষ রাজপুরী হইতে অপহৃত হইয়া অনন্তদেবের হস্তগত হইয়াছে, পিতৃপক্ষে অর্থবল, জনবল এবং এসময়ে রাজ্যের ভবিষ্য উত্তরাধিকারীও তাঁহার হস্তগত হইল। মাতার দ্বারা এতদিন যে বিপ্লব নিবৃত্ত রহিয়াছে তাহা আর বুঝি রক্ষা পায় না। কতকগুলি বিদ্বান ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া কলশ পিতার নিকট সন্ধি প্রস্তাব করিল এবং মায়ের চেষ্টায় এবারেও ইহাতে কৃতকার্য্য হইল।

কলশের মনে সুখ নাই প্রাণে শান্তি নাই; পিতামাতাকে রাজধানীতে আনাইয়া বন্দী করার অভিপ্রায় ব্যর্থ হইল। রাজা রাণী পুনর্ব্বার বিজয়েশ্বরে ফিরিয়া গিয়া মহাসমারোহে স্বুবর্ণময় তুলা পুরুষদ্বয় দান করিলেন ও দানধর্ম্ম ব্রতাচরণ সকল সমারোহ সহকারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কলশ গোপনে গোপনে পিতৃপক্ষীয় নরেদের আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠন হত্যা ও তাহাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করাইতে লাগিলেন, নারীদের অপহরণ পূর্ব্বক নিজের বিলাসাগারের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমতী স্বামীকে যুদ্ধনিবৃত্ত রাখিলেন। কলশের বন্ধুরা রাজারাণীকে উপহাস করিয়া এক নাট্যাভিনয় করিল,—তাহাতে বৃদ্ধপতি তরুণী পত্নীর আদেশে আকাশের চাঁদ পাড়িতে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতারোহণ চেষ্টা করিতেছেন, ঊর্দ্ধ পদও নিম্নাভিমুখ হইয়া মধ্যাহ্ন আতপতাপে দাঁড়াইয়া আছেন, অগ্নিতে ঝাঁপ দিতেছেন। স্বহস্তে নিজের নেত্রোৎপাটন পর্য্যন্ত করিয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে উদ্যত! রাজা কলশ এই নাট্যাভিনয় দেখিতে দেখিতে মৃদু মৃদু হাসিয়া নটকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন "বাস্তবিক বুড়োর ভাবভঙ্গিটী ঠিক আয়ত্ত করে নিয়েছিস্। সুন্দর!"

কলশ যখন দেখিল ধনবলে পিতামাতা পুনর্ব্বার বেশ সুখস্বচ্ছন্দেই কাল কাটাইতে লাগিলেন অথচ তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্রতাজন্য সুখবিলাসের যথেচ্ছ উপকরণে অভাব পড়িতে লাগিল, তখন দারুণ ঈর্ষায় জ্বলিয়া সে বিজয়েশ্বরে অগ্নি প্রদান করাইল। সেই অগ্নিতে বৃদ্ধ রাজার সমস্ত দ্রব্যাদি সহ বিজয়েশ্বর ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্ব্বনাশশোকে আকুলা হইয়া রাজ্ঞীও সেই অগ্নি মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দিতেই উদ্যত হইলে তাঁহাদের জ্ঞাতি পুত্রেরা তাঁহাকে নিজেদের প্রাণের মায়া

ত্যাগ করিয়াও সেই অগ্নিরাশিপূর্ণ হইতে টানিয়া বাহির করিল, নিদ্রিত রাজসৈনিকদের শিরোস্ত্রাণটী পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, প্রাণকয়টী কোনরূপে রক্ষা পাইল মাত্র।

রাজা কলশ আপনার সৌধশিরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত ব্যাপার দেখিলেন ও প্রবল অগ্নি শিখা সকল লেলিহান হইয়া উঠিয়া যখন আকাশ চুম্বন করিতে লাগিল, তখন তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া রাজারাণী বিতস্তার পরপারে চলিয়া গেলেন ও অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। একটী রত্নলিঙ্গ মাত্র সূর্য্যমতী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন পরদিন উহাই একটী পশ্চিম দেশীয় রত্ন বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়া মহারাণী সত্তরলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন ও সেই অর্থে নিজেদের খাদ্য ও বস্ত্রাদি কিনিয়া লইলেন। তারপর কিছু সুস্থ হইয়া সকলে আবার সেই ভস্মাব শেষ বিজয়েশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। ভস্মস্তূপ মধ্যে অগণিত স্বর্ণনিষ্ক ও রৌপ্যাকরণ সুবর্ণ এবং সুবর্ণ ও রজতপাত্র সকল গলিত স্বর্ণ রৌপ্যের বাট হইয়া গিয়াছে কিন্তু যাহাহোক সোনা রূপার পিণ্ডগুলারই দাম বিশ কোটী নিষ্কের কমই হইবে না।

ইচ্ছা সত্বেও আর রাজা অনন্তদেব দগ্ধ নগরীরও পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না, সুপুত্রের ভয়েই তাঁহার এই অনাসক্তি। নলখাগাড়ায় ঘর ছাওয়াইয়া কাশ্মীরের প্রবলপ্রতাপ রাজচক্রবর্ত্তী তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন।

(৪)

মধুর মধ্যাহ্ন কাল কাশ্মীরের কেশরক্ষেত্র সকল লোহিত ও হরিদ্রা পুষ্পে ও অতুলনীয় সুবাসে নরনারীগণের নয়ন বিমুগ্ধ ও চিত্ত আনন্দিত করিতেছিল। যে সকল অত্যুচ্চ শৈলমালা চতুর্দ্দিক দিয়া কাশ্মীর রাজ্যকে সুদৃঢ় শৈল প্রাকারের ন্যায় বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সমুন্নত চির তুষারাবৃত শৃঙ্গসকল সূর্য্যালোকে সহস্র সহস্র সমস্তক মণির ন্যায় ঝলকিয়া উঠিতেছিল, নিম্নস্থ পর্ব্বতের বর্ণ আকাশের মেঘের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল। বিজয়ক্ষেত্রে বিজয়েশ্বরের প্রস্তর মন্দিরের এক পার্শ্বে ভীষণ দগ্ধ শ্মশানের মধ্যভাগে নবনির্ম্মিত কুটীর মধ্যে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র অঙ্গনে বসিয়াছিলেন ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীরাধিপতি মহারাজাধিরাজ অনন্তদেব, তাঁহার চির-প্রিয়তমা-পত্নী দেবী সূর্য্যমতী ও তাঁহাদের পরমহিতৈষী বন্ধু অনন্তদেবের জ্ঞাতিপুত্র তক্ষণ --এই কয়জনে মিলিয়া কথোপকথন হইতেছিল। রাজা কলশ এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের উৎপীড়িত করিতে ছাড়িতেছিল না, সম্প্রতি তিনি পিতার প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিজয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পর্ণোৎসে গিয়া বাস করিতে হইবে। জিত-ভর্তৃকা রাজ্ঞীও পুত্রবাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিতেছিল, 'তাই হোক মহারাজ। আমরা দূরে গেলেই যদি কলশ শত্রুতা ত্যাগ করে, তবে সেই যুক্তিই লওয়া সঙ্গত।'

অনন্তদেব অনেক সহিয়াছিলেন আর পারিলেন না, কুপিত সিংহের ন্যায় তিনি আরক্তচক্ষে রাজ্ঞীর দিকে চাহিলেন।

"তোমার পরামর্শে চলিয়াই আমি ধনেপ্রাণে যাইতে বসিয়াছি। লোকে বলে, নারী পুরুষের ভোগ্য পদার্থ—আমিতো তার ঠিক উল্টাই দেখিতেছি! পরিণামে পুরুষই নারীহস্তের ক্রীড়ণক হয়ে পড়ে। স্বামী বৃদ্ধ হলে স্ত্রীলোক পুত্রের বশীভূত হয়। মনে করে এই অকর্ম্মণ্য স্বামী আর ক'দিন' পুত্রবশ থাকিলে বরং অনেক সুবিধা হইবে, তাই স্বামীর ধনমান এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত তারা নিজ পুত্রের স্বার্থের জন্য বিসর্জ্জন দেওয়াইতে পারে। এসব জেনেও আমি কেবলমাত্র সম্মানের অনুরোধে কখন তোমার বিরুদ্ধে কথা কহি নাই—কিন্তু তুমি এম্‌নি হীন স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ—

কুমার তক্ষণ হাতযোড় করিয়া মিনতি পূর্ব্বক কহিতে গেল,—"চুপ করুন জ্যেষ্ঠতাত!—"

অনন্তদেব ক্রোধোত্তেজিত তীব্র কণ্ঠে বাধা দিলেন—"তুমি থাম তক্ষ! এই নির্ম্মমহৃদয়া স্ত্রী আমার ইহলোকের সকল সুখসম্পদ নষ্ট করেও তৃপ্ত হয় নাই, আমার পরলোকের সুখের আশার পথেও সে কাঁটা দেওয়াতে চায়! বৃদ্ধলোলচর্ম্ম জরাজীর্ণ আমি, এই পুণ্যধাম বিজয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে দুর্গম কুপথে জীবন বিসর্জ্জন করি—আমার ইহলোকের শান্তিদাতা ও পরলোকে ত্রাণকারী পুত্রের তাহাই ইচ্ছা; আর আমার সহধর্ম্মিণীও তাহারই জন্য আমায় উত্তেজিত করিতেছেন। ধন্য আমার জীবন, এখানে মন্দির দ্বারে বসিয়া দেবাদিদেবের পূজা করি, প্রসাদ পাই, এখানের মাটীতে মরিলে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে তাঁহার চরণে স্থান পাইব, আমার এতটুকু শান্তিও যাদের সহ্য হয় না, তারাই এ পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে আপন! অদৃষ্ট!"

মহারাণী সূর্য্যমতী ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে অভিমানে অভিভূত হইয়া গিয়া অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

তখন রাজা পুনশ্চ উত্তেজিতস্বরে কহিতে লাগিলেন "পূর্ব্বে যে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে সুতিকাগারে নিজ সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় সূর্য্যমতী অন্য কুলোৎপন্ন পুত্রকে গোপনে আনাইয়া পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এখন সেই নিন্দিত প্রবাদ আমার মনে পড়িল। যে পুত্রের আকৃতি বা প্রকৃতি কিছুই পিতার মত নয়, সেই পিতৃদ্রোহী কুপুত্র কখনই নিজ পুত্র নয়—"

সূর্য্যমতী দণ্ডাহতা বাঘিনীর মতই গর্জ্জিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন "তোমাদের বংশের নারীরা যেরূপ হ'য়ে থাকেন, তোমার কাছে নারীর তারচেয়ে বেশী বড় আদর্শ কোথা হইতে মিলিবে? কি বলিব, পুত্র যাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে আমিও যদি তাঁহাকে এ সময়ে ফেলিয়া যাই, লোকে আমাকেই তাহাতে মন্দ বলিবে, লোকনিন্দাকে আমি ভয় করি, তা না হইলে দেখাইতাম আমার বশীভূত না থাকায় কতই সুখ হয়!—"

মহারাজ অনন্তদেব এই কঠোর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া নীরব রহিলেন। তাঁর নিজ

বংশীয়া নারীদের সম্বন্ধে এই তীব্র শ্লেষ বাক্যে জননী শ্রীলেখার কথা স্মরণ হইল। ক্রোধে দুঃখে আত্মহারা হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া আপনার উদরের একপ্রান্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

"কি হইল জ্যেষ্ঠতাত! এত রক্ত কিসের!" বলিয়া বজ্রস্তম্ভিত তক্ষণ চিৎকার করিয়া উঠিল। সূর্য্যমতী আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ধীর স্বরে রাজা কহিলেন—"তক্ষণ! লোকের কাছে একথা প্রকাশ করিওনা, সকলে জানুক আমার রক্তাতিসার রোগে মৃত্যু হইয়াছে। লোকলজ্জার হাতে আমি আমার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাইতে চাহিনা। কিন্তু মনে রাখিও বৎস! স্ত্রীপুত্রের প্রতি অতি প্রবলতর স্নেহ ও বিশ্বাসের ফল শুভ নহে। এ কর্ম্মভূমিতে কোন কার্য্যেরই ত্রুটী সহে না।"—

জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা মধ্য যামিনীতে পূর্ণিমার পরিণত দেহ শশধর আনন্দের প্রসন্ন হাসি হাসিতেছিলেন, মহারাজ অনন্তদেব বিজয়েশ্বরের সমীপে তাঁহারই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পত্নী পুত্রের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলাভ পূর্ব্বক চির শান্তি লাভ করিলেন। রাজরাজ্যেশ্বর ভূমিশয্যায় নিদ্রিত হইলেন। জীবনে ঐ একবারের জন্যই তাঁহার স্নেহপ্রবল চিত্তের বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, যেন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

এতবড় প্রবল আঘাতেও সূর্য্যমতী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি স্বামীর ধনবল ও পৌত্র হর্ষকে তক্ষণ প্রভৃতি চিরবিশ্বস্ত বন্ধুদের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। সৈনিক কর্ম্মচারী পরিজনবর্গ যথাযোগ্য সকলকেই বেতন ও পারিতোষিকে পরিতুষ্ট করিলেন। হর্ষকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"আমি আমার ছেলেকে যতই ভালবাসি তথাপি উচিত বোধে বলিয়া যাই তুমি তাহাকে বিশ্বাস করিওনা।" তারপর সাগ্রহে ও সাদরে স্বামীদেহ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাকে রাজোচিত সমারোহে সুবর্ণময় শিবিকায় শ্মশানে প্রেরণ করিলেন। সেরূপ সাড়ম্বর শোভাযাত্রা কাশ্মীরবাসী বহুদিন প্রত্যক্ষ করে নাই।

দিনশেষে সেই শব শরীরের শোভাযাত্রা বিতস্তাকূলে আসিয়া পৌঁছিলে রথারোহিণী মহাদেবী পুত্রকে একবার শেষ দর্শনের জন্য সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু কুমন্ত্রণাকারীদিগের প্ররোচনায় কলশ মায়ের সে অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিল না। তখন সূর্য্যমতী শান্তচিত্তে বিতস্তা সলিলে স্নানদান করিয়া বিতস্তা বারি তিন গণ্ডুষ পানান্তে আচমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতী হই, তবে যে পাপিষ্ঠগণ আমার সন্তানের ইহপরলোক কণ্টকাবৃত করিল, তারা সবংশে ধ্বংস হইবে, এবং আমার সেই অকৃতজ্ঞ সন্তানও এই পিতারই স্মৃতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে পূজা করিতে করিতে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া মরিবে। যতদিন এঘটনা না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্তই সে জীবিত থাকুক!"

সূর্য্যমতী জ্বলন্ত চিতা মধ্যবর্ত্তী মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে কহিলেন "ফাঁকি দিয়া চলিয়া

যাইবে ভাবিয়াছ ? তুমি তো জানোনা স্বামিন্ ! পুত্র সে তোমারই পুত্র বলিয়াই আমার অত প্রিয়, তোমাপেক্ষা প্রিয়তর আমার এজগতে আর কিছুই নাই।”

রথ হইতে ঝাঁপ দিয়া সূর্য্যমতী সেই জ্বলন্ত বহ্নি পর্ব্বতে পতিত হইলেন, সতীর অঙ্গস্পর্শে সেই অগ্নিশিখা যেন শতগুণে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। দেবীর আগমনে দেবগণের আনন্দোৎসব চিহ্নস্বরূপে সান্ধ্য গগন ঘোর লোহিত রাগে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল ও সেই দৃশ্যের দ্রষ্টা হইতেই যেন সন্ধ্যাকাশে অসংখ্য সকৌতূহলী নেত্রের ন্যায় তারকাগুলি দ্রুত আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সুখের ব্যথা

সরস্বতী সকালবেলা কয়লার ধোঁয়ায় চক্ষু আরক্ত করিয়া এক বালতি কাপড় হাতে কলতলায় ছুটিতেছিলেন, উনুনটা ধরিয়া উঠিবার আগেই যাহাতে কাপড় ক'খানাতে সাবান দিয়া ফেলা যায়। চার পয়সায় একখানার বেশী সাবান মেলে না, তাও কাপড়ে ঘসিতে গিয়া অর্দ্ধেক জলের সঙ্গে নর্দ্দমায় গড়াইয়া গিয়া বৃথাই নষ্ট হয়, কি করিয়া ইহারই ভিতর আটখানা কাপড়-জামা সাদা করিয়া তুলিবেন ইহা ছিল এক মহা সমস্যা। সরস্বতী একখানা কাপড় কলতলায় পাতিয়া বাকি সাত খানা তাহার চারিপাশে বেড়া দিলেন, যাতে সাবান জলটা অকারণে নষ্ট না হয়। গরম জলে কাপড় সাবান শুদ্ধ ফুটাইয়া লইলে এত হ্যাঙ্গাম করিতে হইত না, কিন্তু এত সকালে গরম জল পাওয়া যায় কোথায় ? উনুন ধরিতে না ধরিতে ভাত চড়ানো চাই, নহিলে আপিসের ইস্কুলের বেলা হইয়া যাইবে ; আবার ফর্সা কাপড়ও তারি ভিতর শুকাইয়া রাখিতে হইবে, পুরুষ মানুষ ময়লা কাপড় পরিয়া ত আর আপিস আদালত করিতে পারে না। আর একটু ভোরে উঠিলে হইত, কিন্তু শেষ রাতটা জ্বরো ছোট ছেলের কান্না থামাইতেই কাটিয়া গিয়াছে, বাইরে আসিবেন কি করিয়া ?

কোলের উপর কাপড়গুলা তুলিয়া লইয়া সরস্বতী দুই হাতে সেগুলি দলিতেছিলেন, ময়লা সাবান জলটা লাগিয়া তাঁহারও পরণের কাপড়খানা যাহাতে একটু পরিষ্কার হইয়া উঠে ; এমন সময় পুত্র মহীমোহন ডাকিল, “মা, তুমি না বলেছিলে বাবা মাইনে পেলে টাকা দেবে, কাল ত বাবা তোমায় টাকা দিলেন, তবে যে ভারি মুখ বুজে কলতলায় ঢুকেছ। সাত শ' বার না চাইলে বুঝি একটা পয়সা দিতে নেই। ঢের ঢের মা দেখেছি বাপু, তোমার মত কিপ্টে আর একচোখো কোথাও দেখিনি। এদিকে বই না নিয়ে গেলে মাষ্টার মশাই আমাকে তাড়িয়ে দেবে বলেছে।”

সরস্বতী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, “ভগবান করুন, তোকে যেন এ দুঃখু না বুঝতে হয়, মহী ; সাধ করে কি কিপ্টে হয়েছি, বাছা !.......”

মহী বিরক্ত হইয়া বলিল, "নাও, নাও, তোমার সেকেলে বক্তৃতা রাখ, আমার টাকাটা আগে দিয়ে যাও। তোমার জ্বালায় পরের ঠাট্টা শুনতে শুনতে আমার প্রাণ গেল।"

কাপড় ফেলিয়া কলের জলে হাত ধুইয়া সরস্বতী উঠিলেন; ভিজা হাত আঁচলে মুছিতে মুছিতে দাদা শ্বশুরের আমলের ভাঙা কাটের আলমারী খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে শ্বশুরের আমলের শেষ চিহ্ন রূপার কৌটা বাহির করিলেন। কৌটায় ছেঁড়া কাপড়ের কোণে কোণে আলাদা করিয়া করিয়া টাকা বাঁধা। সরস্বতী কাপড়ের তিন দিক একহাতে ছেলের চোখ হইতে আড়াল করিয়া চতুর্থ কোণটি সন্তর্পণে খুলিয়া তাহা হইতে চারিটি টাকা বাহির করিয়া ভয়ে ভয়ে মহীর হাতে দিলেন। মহীর মুখে চোখে বিরক্তি ও ক্রোধ ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া সরস্বতী যেন অপরাধীর মত মুস্‌ড়াইয়া গিয়া জবাবদিহির সুরে বলিলেন, "এমাসে ওই রাখ্ বাছা, আস্‌ছে মাসে বাকিটা দেব। রাজুর পূজোর তত্ত্বটা সেরে ফেল্‌লে আর আমার ভাবনা থাকে না। মেয়েটা চার বছর পড়ে রয়েছে, একবার আন্‌তে পারি না। একটা চিঠি লিখ্‌তেও ভয় হয়। মহী টাকা কয়টা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "রাজু আর রাজু! রাজু ছাড়া ত তোমার মুখে কথা নেই, তা ও টাকা চারটেও তাকেই দিও। আমাকে আর অত দরদ দেখাতে হবে না। আমি ভিক্ষে করেই না হয় দিন কাটাব। এদিকে ওঁর রাজু ত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ছেন। তোমার ছাদ পড়া আস্তাকুড়ে আসবার জন্যে ত তার ঘুম হচ্ছে না। তার বাড়ীর হেঁসেলের ঝিও এমন ঘরে থাকে না। আর তুমি মর্‌ছ তাকে আন্‌বার ভাবনায়।"

সরস্বতী আঁচলে চোখ মুছিয়া ছেঁড়া কাপড়ের আর এক কোণ হইতে আর একটি টাকা খুলিয়া মহীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "নে বাবা, আর এ হাড় ক'খানা দগ্ধাস্‌নে। মেয়ের বাপ কখনও হস্ যদি ত বুঝ্‌বি মায়ের দুঃখু।"

মহী ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে টাকা ক'টা লইয়া চলিয়া গেল। আজই সে দিদিকে মায়ের একচোখোমীর কথা লিখিয়া দিবে। সরস্বতী রান্নাঘরে ছুটিলেন, এতক্ষণে হয়ত একসের কয়লা পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে।

সরস্বতীর দাদাশ্বশুর অবনীমোহন চিনির কারবার করিয়া কলিকাতায় পাকাবাড়ী করিয়া ছিলেন। তাহার পর লোহার সিন্ধুক কিনিয়া মাসের পর মাস লাভের টাকা তাহাতেই জমা করিতেন। পাঁচশ'কে হাজার ও হাজারকে দেড় হাজার করিয়া তোলার খেলা তাঁহাকে এমনিই পাইয়া বসিয়াছিল যে, টাকা খরচ করিতে তাঁহার বুকের শিরায় যেন টান পড়িত। একটি টাকা হাতে করিলেই মনে হইত 'হাতে রাখ্‌লে ত্রিশ দিনে এই টাকাই ত ত্রিশটা হবে, তিন মাসে নব্বুই তার পর একশ' হতে আর কতক্ষণ! নাঃ এ টাকাটা আর খরচ করব না। এক টাকার দই সন্দেশের সুখ আর কতক্ষণ? মুখে দিতে না দিতে ফুরিয়ে যায়, তার জন্যে অভ্যাস খারাপ করে টাকার থলেটা হাল্কা করে রাখ্‌ব না।' এই ভাবিয়া বৃদ্ধ আজীবন ডালভাত খাইয়াই কাটাইয়া দিলেন।

তাঁহার পুত্র ধরণীমোহন যখন লোহার সিন্দুকের চাবি হাতে পাইল, তখন এ পুরাণো খেলা তাহার পছন্দ হইল না, তাহাকে আর এক নূতন খেলায় পাইয়া বসিল। সিন্দুকের ভিতর বন্দী *সোনা-রূপার হাসি তাহার মনে নানা রঙের হাসির আমেজ ফুটাইয়া তুলিল।* *বন্দীকে মুক্তি দিয়া* তাহার ঘর বাহির উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার কাজে সে মাতিয়া উঠিল। অবনীমোহনের দেহী আত্মা পার্থিব সকল সুখে বঞ্চিত থাকিয়াই পরলোকযাত্রা করিয়াছিল, সুতরাং ধরণী সবার আগে বিদেহী পিতার সুখসমৃদ্ধির দিকেই মন দিল। ধরণীমোহন পিতৃশ্রাদ্ধে যে জাঁকটা দেখাইল তাহাতে তাহাকে ভক্তিমান পুত্র বলা ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু পিতৃআদর্শে নিষ্ঠাবান কিছুতেই বলা চলে না। ধরণীর পিতৃভক্তিতে ইহলোকে তাহাকে হাজার লোকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, কিন্তু পিতৃলোক হইতে অবনী একাই বোধ হয় সে সব আশীর্ব্বাদ অভিশাপে খণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন। হইলে কি হইবে? ধরণীর ত দৈববাণী কি প্রেতবাণী শুনিবার ক্ষমতা ছিল না; তাই মৃত পিতাকে হিসাব হইতে অনায়াসে বাদ দিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতে সে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করিল না।

শ্রাদ্ধ না চুকিতেই অবনীমোহনের পঁচিশ বৎসরের ক্যাওড়া কাঠের তক্তাপোষখানা ধরণী অনায়াসে পঁচিশ দিনে জ্বালানি কাঠে পরিণত করিয়া মেহগনির পালঙ্ক খাটে ঘর হাসাইয়া তুলিল। খাট ঘরে আনিতে দেখা গেল খাটের অমন চোখ বাঁধানো পালিশের সঙ্গে ঘরের সানের মেঝে মোটেই খাপ খায় না, এযেন নিতান্তই গোবরে পদ্মফুল ফুটিয়াছে। ধরণী রাজমিস্ত্রী ডাকিতে এতটুকুও দেরী করিল না। ঘরের মেঝে ঘরের দেয়াল সব আসবাবের সঙ্গে রং মিলাইয়া পাথরে পঙ্কে চমক লাগাইয়া বদল করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু শুধু আসবাবে ত ঘরের শোভা হয় না, ঘরের আসল শোভা ঘরণীকেও ত মনের মত সাজানো চাই। ধরণীর স্ত্রী গরীবের মেয়ে কৃপণের ঘরের বধূ অনেক গহনা কাপড় পরা তাহার অভ্যাস নাই; কিন্তু বলিলে কি হইবে, ধরণী তাহাকে দিবারাত্রি অষ্ট অলঙ্কারে না সাজাইয়া ছাড়িত না। স্ত্রী বলিল, গহনায় তাহার গায়ে ছড় লাগে, ধরণী সব পুরাতন গহনা ভাঙাইয়া পালিশ করা নূতন গহনা গড়াইয়া দিল। স্ত্রী বলিল, এত গহনা পরিতে গরম লাগে, স্বামী ঘরে বিজলির পাখা বসাইয়া দিল। স্ত্রী বলিল, এত গহনা কাপড় পরিয়া কি নড়া চড়া যায়, স্বামী দুইটা দাসী রাখিয়া দিল, স্ত্রীকে যেন একপাও না হাঁটিতে হয়, একখানা হাতও না নাড়িতে হয়। কিন্তু এত গহনা কাপড় রাখিবে কোথায়? ধরণী দুইটা নূতন আলমারি কিনিয়া দিল। আলমারী যে ঘরে ধরে না। ধরণী নূতন ঘর ফাঁদিয়া বসিল। এত ঘর দোর জিনিষপত্র তোয়াজ করা ত কম কথা নয়, ধরণী আর একটা বেহারা রাখিল। চাকর বাকর ঝি দাসীতে নিত্য কলহ বাধিয়া উঠিল, তাহাদের সামলানো ধরণীর স্ত্রীর সাধ্য নয়, ধরণী একটা সরকার রাখিয়া দিল। বসিয়া বসিয়া গরীবের মেয়ের অম্বলের ব্যথা আর বাতের অসুখ জুটিয়া গেল, ডাক্তার বলিল পরিশ্রম করিতে, হাওয়া লাগাইতে। ঘরে কি পরিশ্রম করিবে, অগত্যা হাওয়া

খাইবার জন্য একটা গাড়ী কিনিতেই হইল। অবনীর সিন্ধুক অন্ধকার করিয়া সোনারূপা ধরণীর ঘর বাহির আলো করিতে লাগিল। কিন্তু নিত্য নূতন ইন্ধন না জোগাইলে আলো টেঁকে না, পতঙ্গের দলের নৃত্য থামিয়া যায়। পিতার সিন্ধুকের চাবি হাতে পাইয়া ধরণী সিন্ধুক উজাড় করার বিদ্যাতেই হাত পাকাইয়া তুলিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন দেখিল যে, সিন্ধুকের একটা সীমা আছে যার পরে হাতে লোহার কঠিন আঘাত ছাড়া আর কিছু ঠেকে না; তখন সিন্ধুক ভরাট করার বিদ্যা আয়ত্ত করিবার আর তার বয়স ছিল না। ঘর সংসার সাজাইবার খেলায় কখন যে এতখানি বয়স কাটিয়া গিয়াছে, কখন যে শরীরমন পাকা আয়েসী ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে, মান-মর্য্যাদার মাপকাঠি বদলাইয়া গিয়াছে, সে বুঝিতেই পারে নাই। দুদিনের খেলার ছলে যাহা সুরু করিয়াছিল তাহা যে উগ্র নেশার মত দেহমনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছাইয়া গিয়াছে, নিজে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেও আজ যে সে নেশার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত, ধরণীমোহন তাহা বুঝিল বড় অসময়ে। যতদিন রক্তের জোর ছিল, ভাবিত দিন কয়েক সুখের খেলা হাসির খেলা খেলিয়া লই, তারপর কারবারে মন দিলেই হইবে। আর যদি তাহা নাই পারি, ঘরের কোণে অল্প পুঁজিপাটা লইয়া শাক ভাত খাইয়া যেমন করিয়া হউক চলিবে। এতকাল এমনি করিয়াই ত কাটাইয়াছিলাম, পরেই বা কেন না পারিব?

কিন্তু গরম রক্তে ক্যাওড়াকাঠের তক্তা ফেলিয়া মেহগনির ছাপরখাট বিছানো যত সহজ, বালাপোষ ছাড়িয়া কাশ্মীরী শাল অঙ্গে তোলা যত অনায়াসসাধ্য, চিংড়িমাছের অম্বল ঠেলিয়া দিয়া কোপ্তা কালিয়ায় রসনা তৃপ্ত করা যত নগণ্য ব্যাপার, শেষ বয়সে বায়ুরথ ছাড়িয়া চটিপায়ে ভীড়ঠেলা, পায়স পরমান্ন ভুলিয়া বাজারের থলি হাতে ঝুলাইয়া শাক ও ঝিঙ্গার দর কষাকষি করা, কি পালঙ্ক খাট হইতে নামিয়া রান্নাঘরের ন্যাতা হাতে করা মোটেই তত সহজ—তত নগণ্য ব্যাপার নহে। ধরণী দেখিল এককালে যে সহজ জীবনযাত্রায় কোনো অসুবিধাই কল্পনা পর্য্যন্ত করে নাই, আজ পরিবারের সব কটি মানুষই সে দীনতার সীমা স্মরণ করিতে শিহরিয়া উঠিতেছে। সে শিহরণ শুধু যে দারিদ্র্যের ভয়ে তা নয়, অপমানের একটা দারুণ লজ্জা তাহার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, নিজেদের সচ্ছন্দ যাপিত প্রথম জীবনই আজ নিজেদের কাছে দুঃস্বপ্নের মত মিথ্যা ও বিভীষিকাময় মনে হইতেছে। কিন্তু সেই জীবনেই যে আবার মাথা হেঁট করিয়া সুখলালিত ক্লান্ত দেহ লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে ইহা যে নিষ্ঠুর কঠিন সত্য! এখানে স্বপ্নের কোনো চিহ্ন নাই।

সুখের অভ্যাস সহজে ছাড়া গেল না, দারিদ্র্যের লজ্জা সহজে পরের কাছে স্বীকার করা গেল না, তাই জীবনযাত্রা সহজ হইবার আগে শেষ পর্য্যন্ত ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টায় একে একে সোনারূপা অলঙ্কার তৈজসগুলিই প্রথমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যখন সে সম্বলও ফুরাইয়া আসিল, তখনই চোখের জলে আবার শাকভাত ও রেলির থান বরণ করিতে হইল। বুঝিবা দশের কাছে আড়ম্বরের মুখোস খুলিয়া ফেলিতে হয়! কিন্তু শরীর এ বয়সে এ সব অত্যাচার সহিল না। মনও

লজ্জায় ব্যথায় ভাঙিয়া পড়িল, কারণ ধনী যখন দরিদ্র হয় তখন ধনের চেয়ে মানের হানিই তাহাকে বেশী আঘাত করে। সুখের দিনে ফাঁদা বৃহৎ অট্টালিকার নিরাভরণ খোপে বসিয়া তিনি দিন গুণিতে আর অতীতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এই পুরাতন সাথীটি ছিল তাঁহার শেষ সম্বল।

বিদায় লইবার আগে একবার আশ মিটাইয়া দুই চোখ ভরিয়া ভোগ ঐশ্বর্য্যের রূপ দেখিয়া লইবার সব দারিদ্র্যের লজ্জা ঝাড়িয়া'ফেলিবার তাঁহার বড় সাধ ছিল। এমন দিনেই রাজু তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী ছিল তাঁহার বড় আদরের নাত্‌নী। সেকালের জাঁকজমকের যখন শেষ অবস্থা, সেই সময় সে আসিয়া তাঁহার লুপ্তশ্রী সংসারে হাসির শোভা ছড়াইয়া ছিল। তাহাকে ঘিরিয়া ভোগ ঐশ্বর্য্যের আরো বহু রূপ ধরণীর মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিত। সংসারের আর দশটা শিশুর মতই কোনো প্রকারে বাড়িয়া উঠিতেই যে সে সংসারে আসে নাই, দশজনকে তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করিত। পিতার আমলে নিজ পুত্র মুনিকে লইয়া যে সব সাধ মিটাইতে পারেন নাই, আজ নিজে গৃহকর্ত্তা হইয়া এই প্রথম পৌত্রীকে লইয়া সেই সব সখ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু পুঁজি তখন শূন্য, কি লইয়া সে সাধ মিটিবে?

রাজু যখন মা'র কোল আলো করিয়া কাঁসার ঝিনুক বাটিতে দুধ খাইতে খাইতে কান্না জুড়িয়া দিত এবং আশে পাশে বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দাদাকে দেখিলেই যেন নালিশ করার ভঙ্গীতে ঠোঁট ফুলাইয়া পা দিয়া দুধের বাটি ঠেলিয়া তাঁহার দিকে হামা দিয়া ছুটিত, তখন বৃদ্ধ হাসিয়া বলিতেন, "বৌমা, কাকে ফাঁকি দিচ্ছ? শিশু বলে কি আর ও বোঝে না যে, কার ঘরে জন্মেছে। তোমার ও মরা-কাঁসার বাটিতে দুধ খাবে কেন—ধরণীর নাত্‌নী! একটু সাম্‌লে নি, তারপর দেখাব মেয়ের আদর কাকে বলে। কাঁদিস্‌নে আমার রাজরাজেশ্বরী, এই পূজোতেই তোকে রূপোর ঝিনুক বাটি গড়িয়ে দেব।" রাজলক্ষ্মী কিছু না বুঝিয়াই দুধ খাওয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আনন্দে কচি দাঁত ক'টি বাহির করিয়া ঠাকুর্দ্দাদার কাঁধে চড়িয়া বেড়াইতে যাইত। পূজার পর পূজা চলিয়া গেল, রাজুর রূপার ঝিনুক বাটি আর হইল না। রাজু কিছুই বুঝিল না—এই মহা সান্ত্বনা।

টলিয়া টলিয়া রাজু হাঁটিতে সুরু করিল। তাহার অসম ছন্দের এলোমেলো চলার তালে তালে যে নূপুর বাজেনা ইহা ধরণীর প্রাণে বড় ব্যথা দিত। যত দিন যাইত তত নূতন নূতন সাধ জাগিত, কিন্তু পুরাণোগুলিও মিটিতনা। দিনে দশবার রাজু শুনিত "আস্‌ছে পূজোয় আমার রাঙাদিদিকে বিশ ভরির মল গড়িয়ে দেব।" প্রথম কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বলিতে সুরু করিল, "দাদু, মল কই দাদু পূজো কই?" পূজা বার বার আগের মতই আসিল, কিন্তু মলের দেখা পাওয়া গেল না। না দিতে পারার লজ্জা ধরণীকে যতই পীড়া দিত, ততই নূতন প্রতিশ্রুতি করিয়া তিনি তাহা ঢাকিতে চেষ্টা করিতেন। কোনো একটা অদূর কি সুদূর পূজায় মল নামক মহা সম্পদটা পাওয়া যাইবে মনে করিয়াই রাজু খুসী হইত, কারণ কল্পনার রঙে ঠাকুর্দ্দাদা তাহাকে এমন একটা অপার্থিব রূপ দিয়া রাখিতেন যে, পার্থিব ছোট খাট রঙীন খেলনার মত তাহা সারাক্ষণই

তাহাকে প্রলোভন দেখাইত না। তার চেয়ে পাশের বাড়ীর তিনু কি ওপাড়ার ননীর হিঙ্গুলের পুতুল, শোলার ঝারা ও টিনের বাঁশীই তাহাকে অনেক বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিত। তিনু তাহার হিঙ্গুলের পুতুলগুলিকে হলুদ ছোপানো শাড়ী ও পুঁথির মালা পরাইয়া বিস্কুটের টিনের ভিতর সার দিয়া বসাইয়া রাখিত, আর রাজু তৃষিতনয়নে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া অতৃপ্ত বাসনাগুলি আনিয়া ধরণীকে জানাইত। রাজু বলিত, "দাদু, ন্যাকড়ার পুতুলের খোঁপা নেই, লাল রং নেই, ও ভাল লাগেনা। মা খালি খালি বোকার মত বলে, সাদা পুতুল ভাল। আচ্ছা, তুমি দেখো ত—তিনুর কেমন লাল পুতুল, তার আবার গলায় মালা আছে, ছোপানো শাড়ী আছে। দাদাভাই, মা'টা কিচ্ছু বুঝ্‌তে পারেনা; তুমি বলে দিও যে তিনুর মত লাল পুতুল নিয়েই খেল্‌তে হয়।" ধরণী কয়েকটি পয়সা সংগ্রহ করিয়া আপনি বড় বড় রাঙা হিঙ্গুলের পুতুল আনিয়া দিতেন। কিন্তু এই তুচ্ছ উপহার রাজুকে যতই খুসী করুক না কেন, দাতার মাথা লজ্জায় হেঁট করিয়া দিত। ধরণীকে কে যেন বলাইয়া লইত, "দিদি, এখানে ত এরচেয়ে ভাল পেলাম না। যত কেরাণীর পাড়ায় কি আর মিল্‌বে বল্‌। এবার হগ সাহেবের বাজার থেকে তোকে মেমপুতুল এনে দেব। সে পায়ে জুতো দেয়, কেমন ঘাঘ্‌রা পরে, মাথায় টুপি দেয়।" নূতন লোভে নাচিয়া উঠিয়া রাজু বলিত, "কবে দাদু, কবে?" ধরণী বলিত, "তোর বিয়ের সময়।" পূজার প্রতিশ্রুতিটা বড় পুরাতন হইয়া গিয়াছিল, সেটা আর বলা চলে না। দিন যত যাইতে লাগিল, রাজুর বুদ্ধিরও যত বিকাশ হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে শিখিল গহনা কাপড়, খেলনা, টাকা পয়সা মিঠাই মণ্ডা ইত্যাদি সব রকম পাওনা তাহার সে বিবাহের সময় সুদে আসলে মিটাইয়া পাইবে। এমন পাওয়া সচরাচর কেহ পায় না। ইহাতে বিবাহ জিনিষটার উপর লোভ তাহার বাড়িত বটে, কিন্তু দাদুর উপর রাগও হইত। কেন, বিবাহ না হইলে কি কিছুই দিতে নাই! তিনু ননীর ত বিবাহ হয় নাই, তাহারা ত বেশ রাঙা শাড়ী পরে, সোণার চিরুণি মাথায় দেয়। ধরণীমোহন বলিতেন, "আরে বোকা মেয়ে! এখন দিলে যে সব পুরাণো হয়ে যাবে। কোনো মজাই থাক্‌বে না। তার চেয়ে বিয়ের সময় সব আন্‌কোরা নূতন পাবি, তোর ননীরা কেউ তেমন জিনিষ চোখেও কখন দেখে নি। ওরা ত সেই ঠাকুমার আমলের চিরুণি মাথায় দিয়েই শ্বশুর বাড়ী যাবে। নতুন দিচ্ছে কে ওদের?"

রাজলক্ষ্মীর সুন্দর মুখখানি দেখিয়া শাঁখা-শাড়ী লইয়াই অনেকে তাহাকে ঘরে বরণ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু ধরণীর শেষ সাধটা আশা মিটাইয়া না পূর্ণ করিতে পারিলে তিনি মরিয়াও তৃপ্তি পাইতেন না। সংসারের দৈনন্দিন ব্যাপারে অনেক ত্যাগ স্বীকার তিনি করিয়াছেন, ঘরের কোণে বহু দুঃখ বরণ করিয়াছেন, কিন্তু দশের কাছে এই দীনতার লজ্জা স্বীকার করিয়া অর্থাভাবে যে কোনো যাচকের হাতে রাজুকে তুলিয়া দিতে তিনি পারিবেন না। তিনি সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন, বলিলেন, "আমার নাতনীর আমি ভাল ঘর বর না হলে বিয়ে দেব না। কে টাকা নেবে, না নেবে সে কথা ভাব্‌বার আমার দরকার নেই, আগে বর মনের মত, তারপর অন্য

কথা। ভাল ঘর বর খুঁজিয়া বাহির করা হইল। তাহারা উঠ্‌তি ঘর, তাহাদের চালচলনে টাকার তেজ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে—দেখিয়া ধরণীর চিনিতে বিলম্ব হইল না। ইহা তাহার নিজেরই অতীত দিনের যেন প্রতিবিম্ব। সমস্ত পৃথিবীটাকেই যেন তাহারা পায়ের তলায় দেখিতেছে, মাটিতে তাহাদের পা পড়িয়াও পড়ে না। এমনি ঘরই ত তিনি চাহিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার মান থাকে কি করিয়া? কন্যা দেখিয়া নূতন বৈবাহিকের পছন্দ হইল; আর কিছু পছন্দ করিবার তাহাদের প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং পছন্দ যে হইল না তাহা বলাই বাহুল্য। বরকর্ত্তা বলিলেন "মেয়েটি মন্দ নয়, একটু আধটু খুঁৎ আছে বটে, কিন্তু অত বাছতে আর চাই না। সাজিয়ে দিলে এতেই চল্‌বে।" ধরণী বলিলেন, "আমার নাতনী বলে বল্‌ছিনা। রাজুর মুখ দেখে মানুষ অমনিই নিতে চায়। আমি নেহাৎ যার তার ঘরে দিতে চাই না তাই, হ্যাঁ, তার পর দেনা পাওনার কি হবে?" বরকর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "সে আর কি বল্‌ব? আট দশ হাজার নিয়ে ত দু বেলা লোক আস্‌ছে। তবে এক আধ হাজার কম বেশীতে ত আমাদের কিছু যায় আসে না, মেয়েটি সাজিয়ে দেবেন। মেয়েটি ভাল, আর ঘরটি ভাল হলে তারপর আমরা সব করে নেব এখন।" আট দশ হাজারের কথায় ধরণীর বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল, কিন্তু ইহার কমে বিবাহটা তাঁহার মনের মতও যে হইবে না, এবং এই লইয়া দর কষাকষি করিয়া নূতন বৈবাহিকের কাছে মান খোয়াইতেও তিনি পারেন না। সুতরাং হয় তাঁহাকে এ ঘরের আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে, নয় যেমন করিয়া হউক টাকা জোগাড় করিতে হইবে। নিজে পৌত্রীকে কোনো সম্পদ দিয়া যাইতে পারিলেন না, বিবাহ দিয়া যদি অমন ঘরে তুলিয়া দিতে পারেন এ লোভ সাম্‌লানো কঠিন হইল। তিনি বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি? রাজুকে আমি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সাজিয়ে দেব।" ধরণীমোহন শেষ সম্বল বাড়ীটি বাঁধা দিলেন। কিছু টাকা হাতে আসিল।

তার পর সুরু হইল বড় মানুষের সহিত কারবার। হাতে টাকা পড়িতে না পড়িতে ধরণীর পুরাতন নেশা পাইয়া বসিল। মেয়ের আশীর্ব্বাদেই একশত লোক নিমন্ত্রিত হইল। বরের বাড়ীর লোকে ভারি গহনা দিয়া আশার্ব্বাদ করিল, ধরণীর অমনি রেসারেসি জাগিয়া উঠিল, তিনিও পাঁচ খানা মোহর দিয়া জামাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিলেন। এই বিবাহের অবসরে মনে পড়িয়া গেল, ছেলে বেলা হইতে রাজু কবে কি খেলনা, কেমন শাড়ী, কোন্ খাবারের জন্য বায়না ধরিয়াছিল, কোন জিনিষটা তাহাকে হাজার বার দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াও আজিও দেওয়া হয় নাই। আজ সব কিছুর জন্য ফরমাস্ হইতে লাগিল। কোনো সখ আর তিনি পুষিয়া রাখিবেন না। ধরণী মোহনের বেশী হাঁটা চলা অভ্যাস নাই, দোকানে দোকানে দিবারাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক জিনিষ সাত বার বদল করিয়া ফিরাইয়া গাড়ী ভাড়াতেই মুঠা মুঠা টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন। কাশীতে ফরমাস দিয়া শাড়ী তৈরী হইল, ঘরে স্যাকরা বসাইয়া গহনা গড়াইলেন, বন্ধকী বাড়ীর উপরও আজ রাজ মিস্ত্রীর হাত পড়িয়া তাহার জৌলুষ বাড়াইল, নহিলে বর যাত্রীরা যে হাসিবে; বাড়ীর ছেলে

মেয়ে বউ সকলের জন্য নূতন কাপড় জামা আসিল, একমাস আগে হইতে বিবাহ রাত্রের *নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ হিসাব আয়োজন মহা উৎসাহে চলিতে লাগিল। দরিদ্রের সংসার হইতে দারিদ্র্যের ছায়া কে যেন নিঃশেষে মুছিয়া লইয়াছিল। তাহারা ঐশ্বর্য্যের এই ক্ষণিক অভিনয় করিতে গিয়া দারিদ্র্যের কোন অতল অন্ধকারে তলাইয়া যাইবার পথ যে সমারোহ করিয়া গড়িতেছে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না। ধনীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইতে গিয়া হার না মানার একটা রোখ তাহাদের চাপিয়া ধরিয়াছিল। তার কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত হইলেও অনেকটা অনিচ্ছাকৃতও ছিল। রাজুর মুখে হাসি আর ধরে না। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর্দ্দাদার সব প্রতিশ্রুতিকে সে ছেলে ভুলানো কথা মনে করিয়া অভিমান ভরে চাওয়ার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিল। আজ পুরাণো সব প্রতিশ্রুতি রক্ষার পালা আসিয়াছে দেখিয়া তাহারও যেন নূতন নূতন সখ জাগিয়া উঠিল। সেও নানা আবদার সুরু করিল। ধরণী আজ দিলদরিয়া, তিনি সবেই রাজি। কোনো দিকেই যে হার মানিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

কিন্তু হার তাঁহাদের মানিতেই হইল। বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বরকর্ত্তা খবর পাঠাইয়াছেন বরযাত্রীর অভ্যর্থনার যেন উপযুক্ত আয়োজন হয়। পুত্র মুনিমোহন সেই কাজে ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছে। চাঁদোয়া, কার্পেট, ফরাস, তাকিয়া, আলবোলা, ফুল পান আতর গোলাপে হাতের নগদ টাকা দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল। উপযুক্ত অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ধরণীর ধারণার সহিত তাঁহার দরিদ্র পুত্রের ধারণা মেলেনা, ধরণীর পুত্র তাই সভয়ে বলিল, "বাবা, টাকা আর হাতে নেই, এ দিকে যে সব আবার বাকি পড়ে রয়েছে। কি হবে? একটু সাম্‌লে চল।" ধরণী বলিলেন, "যেমন করে হোক মান রাখ্‌তে হবে। কি আর কর্‌বে বল? কিছু ধার কর।" কিন্তু কিসের উপর নির্ভর করিয়া আর ধার করা যায়। শেষ তৃণগাছিও যে দেওয়া হইয়াছে। পিতার আজ্ঞা পালন করা চলে না। পুত্র আর কাহারও কাছে ঋণের জন্য হাত পাতিতে পারিল না। পিতা চোখ বুজিলে সে শুধিবে কি দিয়া?

আধ মাইল ব্যাপী মিছিল করিয়া এক সঙ্গে বিলাতী, দেশী ও মান্দ্রাজী বাজনা বাজাইয়া গ্যাসের আলোর ফটক, রথ, মন্দির, প্রাচীর, পাহাড়, ঝরণা, কুলির মাথায় চাপাইয়া রঙীন কাগজের অপূর্ব্ব শিল্প নিদর্শনের অরণ্যে পথ দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়া, সদলে সোল্লাসে জড়িজড়ওয়ায় মোড়া বর ষোল ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া আসিয়া দেখা দিল। ঐশ্বর্য্য দেখাইবার "নেশা" বিবাহের দিনে কি ছাড়া যায়? কন্যা-গৃহে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে কাহাকে কেমন করিয়া আদর অভ্যার্থনা করিবে তাহার ঠিক্ নাই। দাসদাসী সরকার পাইক বরকন্দাজ সকলেরই এমন সাজ যে, কাহাকে যে পায়ের ধূলা দিতে হইবে, আর কাহার যে পায়ের ধূলা লইতে হইবে—বোঝা যায় না। কাহাকে কোথায় বসাইবে ভাবিয়া পায় না। কন্যাপক্ষ বিব্রত হইয়া পড়িল দেখিয়া বরপক্ষ মুখ নীচু করিয়া হাসিয়া আপনি আসন করিয়া লইল। তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল

কিন্তু পায়ে পায়েই যে বিভ্রাট। বরকে সাজাইতে গিয়া দেখে বরের চাকর তাহার কাপড় দেখিয়া হাসিতেছে। বর পিতৃগৃহের মহা মূল্যবান পোষাক ছাড়িয়া সেই কাপড়ই পরিল, কিন্তু কন্যাপক্ষের গায়ে অপমানটা লাগিল। বরযাত্রীরা সোডা লেমনেড পান হইতে সুরু করিয়া স্যাম্পেন পর্য্যন্ত হাঁকিতে লাগিল। যাহারা ঐশ্বর্য্যের ভান করিয়া অভাব লুকাইয়া রাখিতে চায়, তাহাদের দারিদ্র্যের নগ্নরূপ লোকচক্ষে উদ্‌ঘাটন করিয়া ধরিতে মানুষের একটা নারকীয় আনন্দ আছে। আজ সুযোগ দেখিয়া বরযাত্রীরা সেই খেলায় মাতিয়া উঠিল। বরকর্ত্তা হাসিয়া তাহাদের থামাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু কন্যাকর্ত্তা হুকুম দিলেন সব আনিয়া দিতে হইবে। রাজলক্ষ্মীর পিতা মুনিমোহন অন্দরে যাইয়া স্ত্রী সরস্বতীকে ভীতমুখে বলিলেন, "আজকের দিন কি করে উদ্ধার করব জানি না। যে যা ঠাট্টা করে চাইছে, বাবা সভার মাঝখানে তাই আন্‌তে হুকুম করে দিচ্ছেন। আর ছোট-লোকগুলো আরো মজা পেয়ে যাচ্ছে। ওদের দিন যেন কখনও আসবে না। আমি 'না' বলিই'বা কোন লজ্জায়, আর আন্‌তে বলিই বা কি দিয়ে। কিছু টাকা আছে ত দাও।"

সরস্বতী বলিলেন, "হাতে ত্রিশটা টাকাও নেই। এদিকে আজকের পরীক্ষা যদি বা উদ্ধার হই ত ফুলশয্যা পাঠাব কি করে? তারপর হাঁড়ি চড়াবার চালটুকুও আর থাক্‌বে না। আমার মাথাকুটে মর্‌তে ইচ্ছা করছে।"

সরস্বতীর স্বামী বলিলেন, "একটা কথা বলি শোন। রাজুর গায়ে অনেক গহনা আছে, কেউ লক্ষ্য করিবে না। ভারি দেখে দু'তিন খানা খুলে নাও, এই বেলা। ওই দিয়ে কোন রকমে ফুলশয্যার তত্ত্বটা সেরে দেব। তারপর আমরা না হয় না খেয়েই মরব। এদায়ের শেষ রক্ষা ত হয়ে যাবে।"

স্ত্রী শঙ্কিত মুখ করিয়া জিভ কটিয়া বলিল, "ওমা, কি সর্ব্বনেশে! কনের গায়ের গহনা কি করে খুলে নেব! অমন কথা বোলো না।" স্বামী বলিলেন, "তুমি চুপ কর। গহনা খুল্‌তে হবে, নইলে উপায় নেই। রাজু, দে দেখি মা কাঁকণ জোড়া আর মোটা চেন ছড়া।" রাজু একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল, এমন প্রস্তাব সে কখনও শোনে নাই; তাহার পর গহনা দুটি খুলিয়া দিল। মনে তাহার একটা অভিমান জাগিয়া উঠিল।

বিবাহরাত্রির পরীক্ষা অনেক গুপ্ত অপমানের খোঁচা ও শ্লেষ বিদ্রূপের হাসির ভিতর দিয়া শেষ হইয়া গেল। এক রাত্রির ব্যাপারেই বর-পক্ষীয়েরা কন্যাপক্ষের দুর্ব্বলতাটা বুঝিয়া নিল। ইহাদের কিছু নাই, অথচ সব বিষয়ে বরপক্ষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার স্পর্দ্ধা আছে, ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া তাহারা যেন ইহাদের কথায় কথায় উস্কাইয়া তুলিবার একটা মজা পাইয়া গেল।

বর কন্যা বিদায়ের সময় রাজলক্ষ্মী যখন ধরণীমোহনকে প্রণাম করিতে আসিল তখন হঠাৎ

তাঁহার চোখে পড়িল যে, রাজুর অলঙ্কারের বোঝা যেন একটু কম দেখাইতেছে। ধরণী হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "রাজু, তোর গহনা দুখানা কম দেখাচ্ছে কেন দিদি? কোথায় রেখেছিস?"

রাজু একবার মুখ তুলিয়া দেখিল, শ্বশুর বাড়ীর লোকজন চারিদিক গম্ গম্ করিতেছে। অভিমানে তাহার ঠোঁট দুটি ফুলিয়া উঠিল। সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। রাজুর পিতা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সে গহনা দুখানা দিয়ে যায় নি বাবা শুধু এই গহনাই গড়ানো হয়েছিল।"

ধরণী বলিলেন, "না, না, আমি যে—" ধরণীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সন্ত্রস্ত মুনিমোহন বলিল, "না, তুমি ভুল করছ বাবা, আমি পরে তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

চারিদিকে নীরব হাসির একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। রাজুর মাথা ঘোমটার ভিতর একেবারে মিশাইয়া গেল। সরস্বতী কন্যার সহিত কথা বলিবার বিদায়কালে তাহার মুখ চুম্বন করিবার লোভও সম্বরণ করিয়া লজ্জায় তাড়াতাড়ি অন্দরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ধরণী তখনও মানের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যাচিয়া বলিলেন, "মেয়ে আন্‌তে যাবার সময় আমি সব ঠিকঠাক করে দেব।" একজন বরযাত্রী হাসিয়া বলিল, "সে কথা বলাই বাহুল্য। আপনি এত জিনিষ ঠিক করলেন আর এইটুকু পারবেন না!"

তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। ধরণীকে মেয়ে আনিবার সমস্যায় আর পড়িতে হয় নাই; তিনি তাহার আগেই সকল সমস্যার ও লজ্জার হাত এড়াইয়া গিয়াছেন।

বন্ধকী বাড়ী দেনার দায়ে বিকাইয়া পুত্র মুনিমোহন ভাড়াটে বাড়ীর একতলার একখানা ঘর সম্বল করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। মাঝখানে চটের পরদা ঝুলাইয়া সেই একখানা ঘরই দুইখানা হইয়াছে। ঘরে শুইবার বসিবার ঠাঁই হয় না, ভাঁড়ারে চাল আনিতে ডাল ফুরাইয়া যায়, পরণে কাপড় জোটে ত জামা ছিঁড়িয়া যায়, এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। রাজলক্ষ্মীকে এসব দুঃখের কথা কেহ বলে নাই। বিয়ের কনে রাজলক্ষ্মী সেই যে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে আর তাহাকে আনিতে যাওয়া হয় নাই। বিবাহের গহনা খুলিয়া লওয়ার ইতিহাস ছড়াইয়া পড়ার পর শুধু হাতে আর কি সে মুখে যাওয়া যায়? গায়ে হলুদের দিনে বরের বাড়ীর ঝি সে গহনা দেখিয়া গিয়াছিল, বধূ বাড়ীতে পৌঁছিতেই সেই গল্প লইয়া মেয়ে মহলে হাসি টিট্‌কারি লাগিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী মাকে লিখিয়া দিল, "মা, আমার গহনা না নিয়ে আর তোমরা আমাকে নিতে পাঠিওনা। বড়-মানুষের বাড়ীর ঠাট্টা তামাসা আমার ভাল লাগে না। গয়না যদি তোমরা খুলেই নেবে ত দিতে গিয়েছিলে কেন? বেশ! আমি চিরকালই না হয় এইখানে থাক্‌ব।"

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর এ পণ বেশী দিন রহিল না। যখন তখন যাহাকে তাহাকে দিয়া সে বলিয়া পাঠাইতে লাগিল "কবে আমাকে নিয়ে যাবে?" সেই পুরাতন পূজার প্রতিশ্রুতি আবার জাগিয়া উঠিল। নহিলে কি বলিয়া মেয়েকে ঠেকাইয়া রাখা যায়! শ্বশুরবাড়ীর লোকেও ঠাট্টা করিত, "বৌমা, তোমার বাপ কেমন গা, সেই বিয়ের কনে এসেছ আর একবার ঘরে তোলবার

নাম করে না। ধন্যি মায়া!" কেহ বলিত, "বিয়ের গহনা খুলে নিয়েছে, সে গহনা না নিয়ে মেয়ে আর আন্‌ব না কথা দিয়েছিল, তাই কথা রাখ্‌ছে। চালাক আছে, বুঝে কথা বলেছিল।" গহনা দেওয়া যে ঠিক কতখানি শক্ত তাহা রাজলক্ষ্মীর ধারণা করিবার বয়স হয় নাই। তাই সে আবার লিখিল, "পূজার সময় আমার গহনা না আন্‌লে কিন্তু যেতে পারব না। লক্ষ্মীটি মা আমার গহনা পাঠিও।"

এমন চিঠির উত্তরে মা কি চিঠি লিখিবে ভাবিয়া পাইত না। ভয়ে কতকাল চিঠির উত্তর দেওয়া হইত না। এদিকে ভিতরে ভিতরে মনটা কেমন করিত—মেয়ের খবর জানিবার জন্য। আলমারি খুলিয়া দেখিত অনাহারে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত অর্থ, একখানা গহনার মতও হয় নাই। এখনও বহুদিনের সংগ্রাম বাকি। অনেক কাল পরে শেষে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিয়া মেয়ের কুশল প্রশ্ন করিল। মেয়েও শুধু কুশল প্রশ্নের আদান প্রদান করিয়া চিঠি শেষ করিয়া দিল। মা'র প্রাণে লাগিল, মেয়ের বুঝি অভিমান হইয়াছে, তাই আর যাওয়া আসার কথা তোলে না। ক্রমে চিঠিও বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মীর ভাই তাহার কথা যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। সত্যই সে টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিত। বাড়ীর প্রথম বউ, প্রথম বড়মানুষ হইবার পর ঘরে তাহাকে লইয়াই প্রথম উৎসব। সুতরাং বড়মানুষের ছেলেটি তাহাকে ঘিরিয়া জীবনের বহু বিলাস ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়িই করিয়া লইতেছিল। রাজু যাহা চাহিত তাহা ত পাইতই, যাহা না চাহিত তাহাও তাহার উপর অজস্র ভাবে বর্ষিত হইত। এই না-চাওয়ার উপহারই ছিল তার বেশী, কারণ অভিমান তাহাকে চাহিতে বাধা দিত। এবং তাহার স্বামীর ভালবাসা তাহাকে দিতে ব্যস্ত করিয়া তুলিত।

সেদিন সকালে রাজলক্ষ্মী ঝিদের দিয়া বেনারসী কাপড়ের আলমারি খালি করিয়া ভাদ্রের রৌদ্রে কাপড় শুকাইতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল, এময় সময় ডাক হরকরা দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। বহুকাল পরে পাওয়া বাপের বাড়ীর চিঠি, রাজলক্ষ্মীর মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তাহার যে বাপের বাড়ী আছে তাহাই সে ভুলিতে বসিয়াছিল। স্বামীর আদরে এবং বাপের বাড়ীর হতাদরে সে এই বাড়ীটাকেই তাহার একমাত্র আপনার করিয়া লইতেছিল। যে অভিমান কেহ শুনিল না, সে অভিমান লইয়া কতকাল আর পথ চাহিয়া থাকা যায়? এমন সময় পুরাতন শত স্মৃতি জাগাইয়া মা ও ভাই চিঠি লিখিয়াছে। তাহাদের হতাদর যে কত দুঃখের বেদনার ইতিহাস বুকে লইয়া জমা হইতেছে, আজ এক নিমিষেই রাজলক্ষ্মী তাহা বুঝিল। বেনারসীর বোঝা ফেলিয়া সে ঘরে গিয়া খিল দিল। একখানা চিঠি লিখিয়াছে মহী, আর একখানা তাহার মা। প্রথমখানা আগাগোড়াই অনুযোগ আর অভিযোগ, দ্বিতীয় খানা আগাগোড়াই অনুনয় আর বিনয়। মহী লিখিয়াছে, তাহারই জন্য আজ ছ মাস ধরিয়া চাহিয়াও বই কিনিতে সে পাঁচটা টাকা পায় না।

পরণে জামাকাপড় ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছে ইত্যাদি, তাহার ত অনেক আছে, তবে কেন সে এমন নির্ম্মমভাবে ভাইকে বঞ্চিত করিতে চায় ?

রাজলক্ষ্মী আজ এক মুহূর্ত্তেই বহুদিনের ইতিহাস বুঝিয়া ফেলিল। কেন যে সেই শিশুকাল হইতে পূজার পর পূজা উপহারের প্রতিশ্রুতি ক্ষুণ্ণ করিয়া বহিয়া যাইত, কেন যে নানা ওজরে আপত্তিতে তাহাকে ভুলাইয়া সাম্‌লাইয়া রাখা হইত, আবার কেন যে ওই দীন ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর কোলে একদিন অমন সমারোহ করিয়া আড়ম্বরের আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং সে আলোর আগুনে দরিদ্র পরিবার কেমন করিয়া নিঃশেষে পুড়িয়া মরিল, তাহার কিছুই বুঝিতে রাজুর বাকি রহিল না। তাহার এতদিনের অভিমান আজ ব্যথায় গলিয়া পড়িল। যাহাদের সে পথে বসাইয়া আজ ভোগ ঐশ্বর্য্যে গা ঢালিয়া দিয়াছে, প্রতিদান দিবার বদলে তাহাদের উপরেই কিনা অভিমান করিয়া উপেক্ষা-ভরে নীরব হইয়া থাকা !

রাজলক্ষ্মী স্বামীকে গিয়া বলিল "আমি বাপের বাড়ী যাব।"

স্বামী বলিল, "সে কি কথা। সে হয় না, আজ চার বছর এসেছ, একদিনের তরে কেউ খোঁজ করতে এল না ; আর তুমি আপনি ধেয়ে চল্‌লে সেখানে !" রাজু বলিল, "তা হোক্ গে ! তুমি তোমার মাকে বুঝিয়ে বল, আমার বাবার অসুখ, তাঁরা পূজোয় নিতে আস্‌বেন বলেছেন কিন্তু আমি আগেই যেতে চাই।" গহনা চাওয়ার মূর্খতা তাহাকে এমনি লজ্জা দিতেছিল যে, পিতার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা সে করিতে পারিতেছিল না। স্বামী বলিল, "লোকে যে ঠাট্টা করবে ! তোমারই বাপের মুখ হাস্‌বে।"

রাজু বলিল, "বাপের মুখ আগে দেখ্‌তে পাই, তারপর হাসে কি না হাসে সে কথা পরে হবে।" তাহার জেদের কাছে হার মানিয়া তাহাকে পাঠাইতে হইল।

বিকালের দিকে রাজু যখন তাহার বাপের বাড়ীর গলির দরজায় নামিল, তখন সরস্বতী ঘরের মেঝেয় পাতা মাদুরের উপর ছেঁড়া কাঁথা বিছাইয়া রুগ্ন ছেলেটির বিছানা করিয়া দিতেছে। বিছানায় চাদর নাই, তৈলাক্ত মলিন বালিশে ওয়াড় নাই। ছোট ছেলেটি ঘরের কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া এক পয়সার মুড়ি লইয়া বিরক্তমুখে খাইতেছে ও বাতাসার অভাবটা নাকিসুরে ক্রমাগত ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া জানাইতেছে "মা, শুধু মুড়ি বিচ্ছিরি লাগে।" রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার পা দুইটি সরু হইয়া গিয়াছে, জলভরা চোখের রং একেবারে হলদে, ঠোঁট দুটি সাদা। মা কাজের মাঝে মাঝে শীর্ণ আভরণহীন কড়াপড়া হাতটা তাহার মুখের উপর বুলাইয়া দিতেছে ; আর একদৃষ্টে পাংশুমুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। ছেলে তাহাতেও বিরক্ত হইয়া বলিতেছে, "তোমার হাতটা বড় শক্ত।" মা লজ্জা পাইয়া হাত সরাইয়া লইতেছে।

জীর্ণ চৌকাঠ পার হইয়া এঁটো পাতা ও বাসনের রাশির ভিতর দিয়া ঘরে উঠিয়া রাজলক্ষ্মী এক গা গহনা ঝলকাইয়া মার কাছে যাইয়া দাঁড়াইল ; পরস্পরকে দেখিয়া পরস্পরেই চমকাইয়া

উঠিল। সরস্বতীর শুষ্ক ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির একটা রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু রাজু এ দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সরস্বতী মেয়েকে খুসী করিবার জন্য বলিল, "ওমা রাজু, সেই উনি গেলেনই যখন তোকে আন্‌তে আর একটু দেরী করলে পারতিস, ওঁর আন্‌তে যাওয়ার নামটা সার্থক হত। এ লোকে বল্‌বে কি মা! আমরা যেন তোর কোনো খোঁজই করি না।"

রাজু বলিল, "খোঁজ করে তোমরা আর আমার অপরাধ বাড়িও না, মা। বিয়ে দিয়েই আমাকে অপরাধের ভারে ডুবিয়ে দিয়েছ। কেন এমন কাজ করলে? আমায় কি তোমরা নরক ভোগ করাবে?"

রাজলক্ষ্মী ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর একে একে গায়ের সমস্ত গহনা খুলিল। মার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল, "মা এ সব গহনা যদি তোমরা না ফিরে নাও ত আমার দিব্যি রইল। আমার গহনায় কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আর একটি কথা শুন্‌ব না। আজ আসি, গিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দেব।"

মা খুসী হইয়া ভাবিলেন, রাজু আমার বড় ঘরে পড়েছে, তার দুঃখ কি?

রাজু নিরাভরণ বেশে ফিরিয়া গেল। শ্বশুর বাড়ীতে পা দিবামাত্র শুনিল, "বৌমার বাপ এসেছিল, সেই বিয়ের সময়কার দু খানা গহনা নিয়ে বৌমাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে। খুব সকাল সকাল মেয়েকে মনে পড়েছে। বৌমা ত আগে ভাগেই পালিয়েছিলেন, তাই গয়না দুখান রেখে গেল। একটু বস্‌লেও না, বাড়ীতে ছেলের অসুখ বলে চলে গেল। তা বৌমা, আজই ফিরে এলে, হ্যাঁগা, এ কি রকম বাপের ঘর যাওয়া?"

রাজু কিছু বলিল না। গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিল। শাশুড়ীর চোখ পড়িল বধূর নিরাভরণ দেহের উপর। তিনি বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "একি বৌমা, তোমার গয়না গাঁটি কোথায় গেল? পরে' গিছ্‌লে না!"

রাজু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "সে গহনা আমি ফিরে দিয়ে এলাম।" অন্দরে বিস্ময়ের বান ডাকিয়া গেল। শাশুড়ী দুই হাত কপালে ঠুকিয়া বলিলেন, "ওমা, একি অনাছিষ্টি কথা! এমন কথা ত বাপের জন্মে কখনও শুনিনি। হ্যাঁ বৌমা, তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি বাছা! আমরা কি মরিছি নাকি? এমন কাজ কার হুকুমে তুমি করলে?

রাজু শুধু বলিল, "সে আমি বল্‌তে পারব না, মা।"

রাজুর ননদ বলিল, "বৌদির বাবা ঠিক কথা রেখেছেন। দুখানা গহনা সঙ্গে করে মেয়ে আন্‌বার কথা ছিল, তা ত করেছেন। কিন্তু এবার বাকি সব গুলো খুলে না নেবার ত কোনো কথা ছিল না; তাই দুখানা দিয়ে ও ক' খান খুলে নিয়েছেন। আমি ত আগেই বলেছিলাম, বৌদির বাপের কথার কখনও নড়চড় হয় না।"

বাড়ীতে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। রাজু কোনো মন্তব্য করিল না। ম্লানমুখে

ছোট বৌ সাম্‌নে আসিয়া পড়িল। শাশুড়ী বলিলেন, "ছোট বৌ মা, তুমি বাছা বড় বোয়ের সঙ্গে অত ঢলাঢলি কোরো না। এখনও শিক্ষে বাকি আছে, বাকি থাক্। ছোটলোকপনা আর শিখে কাজ নেই। মুখখানা লাল করিয়া সে আপনার ঘরে গিয়া উঠিল। স্বামীকে দেখিয়াই তাহার রুদ্ধ বেদনা চোখের জলে ভাঙিয়া পড়িতে গেল। সে আছড়াইয়া স্বামীর বুকের উপর পড়িল। স্বামী কিন্তু কাঠের মত কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল; একটু নরম হইয়া সমবেদনায় নীচু হইয়া আসিল না। চোখের জল প্রাণপণে ঠেলিয়া রাজু উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বামী বলিল, "রাজু, এ বীরত্বটা কি তুমি খুব বাহাদুরির কাজ মনে কর?"

রাজুর বেদনা এই একটি মানুষ বুঝিবে মনে করিয়া সে সকলের কাছ হইতে এইখানে পলাইয়া আসিয়াছিল কাঁদিতে। কিন্তু সেও ত বুঝিল না। রাজলক্ষ্মী বুঝিল এ ব্যথার অশ্রু তাহার কোথাও ফেলিবার নয়। এ তাহার পিতৃমাতৃঋণের বোঝা। একলাই তাহাকে বহিতে হইবে। রাজু কঠিন হইয়া বলিল "যা আমার নয় তা ফিরে দেওয়ার ভিতর আমি কোনো বাহাদুরি দেখ্‌তে পাইনা।" বাহির হইতে রাজুর শাশুড়ী তখন হাঁকিতেছিলেন, "বাবা, হাঘরের মেয়েকে আদর দিলে এমনিই হয়। কুকুরকে আদর দিলে কুকুর মাথায় উঠ্‌তে চায়।"

রাজুর কাণে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। এ দুঃখের কথা সে আর কাহাকে বলিবে?

শ্রীশান্তা দেবী

সমুদ্রগুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাসুদেব দেবকুল

গঙ্গাতীরে একটী পুরাতন দেবমন্দিরের উপর একটী অতি বৃহৎ অশ্বত্থ জন্মিয়াছিল। কাকের মুখে আসিয়া অসহায় অশ্বত্থবীজ যখন মন্দিরের ছাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তখন মন্দির দয়া করিয়া এক কোণে আশ্রয় দিয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। শেষ দশায় মন্দিরটী বোধ হয় প্রাণের দায়ে অভিমান ভুলিয়া অশ্বত্থের সাহায্য চাহিয়াছিল, সেইজন্য অশ্বত্থ দয়া করিয়া তিনটা পা বাড়াইয়া দিয়া মন্দিরের তিন চারিখানা পাথর ধরিয়া রাখিয়াছে। জগতে উপকারক ও উপকৃতের সম্বন্ধ এইরূপ।

মালবজাতি মালবদেশে বসতি করিবার তিনশত ছিয়াত্তর বৎসর পরে পাটলিপুত্রনগরে

গঙ্গাতীরে এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ দ্বিপ্রহর রৌদ্রের ভয়ে মন্দিরের আশ্রয়দাতা অশ্বত্থের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। ব্রাহ্মণ মন্দিরটী ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল যে, এককালে মন্দিরটী অতি বৃহদাকার ছিল; কিন্তু আশ্রয়দাতা অশ্বত্থের কৃপায় এখন কেবল গর্ভগৃহটী অবশিষ্ট আছে। বৃহদাকার পাষাণ নির্ম্মিত চত্বরের উপরে মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জননী জাহ্নবী অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও কৃতজ্ঞ অশ্বত্থের সহিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উদরসাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহার চেষ্টার কোনই ত্রুটী ছিলনা কারণ বর্ষার জলে ক্রমে মন্দিরের চত্বরের তিনদিকে মৃত্তিকা ক্ষয় করিয়া তাহাকে একটী দ্বীপে পরিণত করিয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের গৈরিক পদরজ অঙ্গে মাখিয়া বর্ষায় জাহ্নবী যখন যোগিনী সাজিতেন তখন এই পুরাতন মন্দিরের চত্বরের চারিদিকে উন্মত্ত তরঙ্গরাশি নাচিয়া বেড়াইত। তখন শীতের শেষ সুতরাং পথিক অনায়াসেই অশ্বত্থের তলে আসিতে পারিয়াছিল।

পথিক চাহিয়া দেখিল যে, মন্দিরের গর্ভগৃহের দুয়ার পাষাণ দিয়া রুদ্ধ কিন্তু পার্শ্বের একটী গবাক্ষ কাষ্ঠের কবাটে আচ্ছাদিত। মন্দিরের দুয়ার পাষাণ দিয়া কে রুদ্ধ করিল তাহা ভাবিতে ভাবিতে পথিক ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা পড়িয়া আসিল, অশ্বত্থের ছায়া সরিয়া গেল, রবিকরস্পর্শে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ উঠিয়া দেখিল যে, কাষায়পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক একব্যক্তি জীর্ণ মন্দিরের পাষাণ-রুদ্ধ-দ্বারে বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বেটা যখন নেড়া এবং পরণে গৈরিক নাই তখন বৌদ্ধভিক্ষু না হইয়া যায় না; সুতরাং ইহার সহিত সাবধানে কথা কহিতে হইবে। উঠিয়া জাহ্নবী প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভিক্ষু ঠাকুর, তোমার কল্যাণ হোক্, এ মন্দিরটী কি বুদ্ধদেবের?" ভিক্ষু অবজ্ঞাভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমরা পর পাষণ্ডের মঙ্গলেচ্ছাও শুনিনা। তুমি বোধ হয় পাটলিপুত্রে নতুন এসেছ, দেবপুত্র শাহি মহারাজধিরাজের রাজ্যে ভগবান বুদ্ধ ভট্টারকের মন্দিরের কখনও এমন দশা হতে পারে? তুমি কোথা থেকে আসছ?" ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "নতুন এসেছি বলেইতো জিজ্ঞাসা করছি ঠাকুর, আমি বিদেশী লোক, রাঢ় দেশ থেকে এসেছি।" "রাঢ় দেশ? সেটা বুঝি গৌড়রাজ্যে? সে দেশে শুনেছি পাষণ্ড ব্রাহ্মণেরা এখনও দেব পূজা করে থাকে। তুমি কখন এসেছ?" "এই তো আসছি ভিক্ষু ঠাকুর, এখনও আশ্রয় পাই নি।" "কপোতিক সঙ্ঘারামের দুয়ারে গেলে ভিক্ষা পাবে।" "ভিক্ষাটা ঠিক এখনও আরম্ভ করিনি ঠাকুর, এ দেশে কি কেউ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দেয় না?" "দেবেনা কেন, গোপনে দেয়। জান্তে পারলে দণ্ডনায়ক নাসিকা কর্ণ ছেদন করে।" "সুন্দর ব্যবস্থা ভিক্ষু ঠাকুর, ব্রাহ্মণদেরও কি নাসিকা কর্ণ ছেদন করা হয়?" ভিক্ষু এইবার হাসিয়া ফেলিল, সে বলিল, "বিশেষ গোলমাল না করলে ব্রাহ্মণদের কিছু বলা হয় না, তবে যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা এই সব ভণ্ডামী আরম্ভ করলেই তাদের কণ্ঠাস্থি ছেদন করা হয়।" "অতি উত্তম ব্যবস্থা, ধন্যরাজা পুণ্যদেশ! বলি ভিক্ষু ঠাকুর, অন্নপ্রাশনে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধে কাদের কণ্ঠাস্থি ছেদন করা হয়?" "তুমি এখন কোথায় যাবে বল দেখি?" "বল্লাম

তো যে আশ্রয় দেবে তার কাছেই যাব।" "দেখ তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি যখন ব্রাহ্মণ তখন বিনয়স্থিতিস্থাপকারিকরণের কাছে আগমন সংবাদটা জানাতে ভুল না।" ভিক্ষু উঠিল দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "বলি ঠাকুর যাও যে? তোমার এতগুলি কথার উত্তর দিলাম, কই আমার কথাটার উত্তর তো দিলেনা?" ভিক্ষু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?" "বলি এ ভাঙ্গা মন্দিরটা কার?" "দেবপুত্র শাহি শাহানুশাহি রাজাধিরাজ কুষণপুত্রের।" "অত লম্বা চওড়া কথা না বলে সোজা কথা বল্‌লেই তো হতো যে রাজার। তা দেশ যখন রাজার তখন ঠাকুর ঘর মন্দির তাঁরই বটে কিন্তু আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিনি ভিক্ষু ঠাকুর। আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম কি ভিক্ষু ঠাকুর, এ মন্দিরটা কোন বিগ্রহের?" ভিক্ষু রোষকষায়িত নেত্রে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া কহিল, "ওরে পাষণ্ড, এ মন্দির সেই জঘন্য পরস্ত্রীচোর বাসুদেবের। ভগবান বুদ্ধের রাজ্যে এ মন্দিরের দ্বার চিররুদ্ধ, আর বাসুদেবের উপাসনার শাস্তি কি জানিস? নয়নে তপ্ত শলাকা।" ভিক্ষু ব্রাহ্মণের দিকে না চাহিয়া দর্পভরে চলিয়া গেল, আর ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে উঠিয়া মন্দিরের পাষাণরুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "তবে তুমি সত্যপথেই এনেছ, দৈত্যদর্পহারী মধুসূদন! এই তোমার বিহার! ভক্তের ভগবান, তোমার ভক্তির রাজ্যে ভক্তের কি সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছে ঠাকুর! এতদিন পরে যখন খুঁজে পেয়েছি তখন তোমার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে তবে পাটলিপুত্র ছেড়ে যাব।" ব্রাহ্মণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গঙ্গাজলে নামিল এবং স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রে মন্দিরের পাষাণরুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে ধ্যানাসনে বসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইল, দূর হইতে সেই ভিক্ষু অন্ধকারের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গেল। ব্রাহ্মণ উঠিল না। রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইল, দূরে পাটলিপুত্রনগরে কোলাহল থামিয়া আসিল তথাপি ব্রাহ্মণ ধ্যানাসন পরিত্যাগ করিল না। আরও এক প্রহর অতীত হইল, পাটলিপুত্রনগরের দীপমালা নিভিয়া আসিল। মন্দির মধ্যে সামান্য শব্দ হইল, পার্শ্বের এক গবাক্ষ দিয়া কলস স্কন্ধে এক বৃদ্ধ নির্গত হইয়া ঘাটের সোপানের নিকটে আসিল। নিশীথের অন্ধকারে ঘনীভূত ছায়ার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া বৃদ্ধ তাম্রনির্ম্মিত কলস ফেলিয়া পলায়ন করিল। ধাতুপাত্রের বিষম শব্দে ব্রাহ্মণের ধ্যানভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, "ভিক্ষু আমি জাগিয়া আছি।" যে কলস ফেলিয়া পলাইয়াছিল সে দূরে অশ্বত্থতলে ঘন অন্ধকারে লুকাইয়া ছিল; আগন্তুকের কথা শুনিয়া সে নিকটে আসিল।

ব্রাহ্মণ তখন পাষাণরুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, "তোমার বিহারের রুদ্ধদ্বার তুমিই মুক্ত কর প্রভো, তোমার আদেশে সেই সুদূর বঙ্গভূমি হ'তে তোমার চরণ দর্শন কর্ত্তে এই নিষ্ঠুর মগধে এসেছি; দর্শন না পেলে ফিরে যাব না। কতদিন তোমার দ্বার তুমি মুক্ত করেছ? কতদিন পুষ্পচন্দনের পরিবর্ত্তে ভক্তের রক্তে অনন্ত তৃপ্তি লাভ করছ, ভাগবতের জগতে তাতো ব্যক্ত করনি প্রভু?" যে কলস ফেলিয়া দিয়াছিল সে ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ভরসা পাইয়া নিকটে—

আসিল, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ আবার বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু, তোমার শরীরীরূপে ভয় পাইনি, গৌড়ব্রাহ্মণ অশরীরী ছায়া দেখে ভয় পাবে না। বাসুদেবের আদেশে শত ক্রোশ দূরে থেকে বাসুদেব দর্শন করতে এসেছি, রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দর্শন করে যাব।" বৃদ্ধ তখন আগন্তুকের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি কে?" ব্রাহ্মণ বলিল, "পূর্ব্বেইতো বলেছি আমি ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রী।" বৃদ্ধ নম্রভাবে বলিল, "ঠাকুর, আপনি আমাকে পরিচয় দেননি।" "তবে তুমি ভিক্ষু নও, ভিক্ষুর চর?" "না ঠাকুর আমি ব্রাহ্মণ।" "ব্রাহ্মণ—মাগধেয় ব্রাহ্মণ!—ব্রাহ্মণ, তোমার কি নাসিকা কর্ণ আছে? যদি না থাকে তা হ'লে দূর হ'তে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমি গৌড়ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের দাস—বাসুদেবের চরণাশ্রয় ভিখারী।" বৃদ্ধ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নাক কাণ থাকবে না কেন ঠাকুর?" সহসা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "তোর নাসিকাকর্ণ এখনও আছে—তোর রক্ত এখনও বাসুদেবের তৃপ্তির জন্য প্রবাহিত হয়নি—তবে তুই ব্রাহ্মণ নস্—চণ্ডাল—চণ্ডালের কুক্কুর। না, কুক্কুরও পুরুষ, তুই চণ্ডালের কুক্কুরী। ঐ পাষাণের চিররুদ্ধদ্বারের পিছন থেকে ভগবান চীৎকার করে বলছেন—'আর্য্যবর্ত্তে কে পুরুষ আছ, কে মানুষ আছ—আমার রুদ্ধদ্বার মুক্ত কর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমস্ত মগধ বধির হয়ে আছে, মুক্ত বায়ু—সূর্য্যরশ্মি—চন্দ্রের শীতল কিরণ তা' দেশ থেকে দেশান্তরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—কেবল মগধের পুরুষ—মগধের মানুষ তা শুনতে পাবার ভয়ে নারীর বসনাঞ্চলে কর্ণ রুদ্ধ করে আছে। ফিরে যা ভিক্ষুর চর—পাটলিপুত্র নগরে ফিরে যা—বলে আয়—প্রাচীন বাসুদেবের চিররুদ্ধদ্বার আজ মুক্ত—ব্রহ্মরক্তে কাপুরুষ মগধের শতাব্দীব্যাপী মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে—মগধনাগরিক যেন নারী বেশে তা দূর থেকে দেখে যায়।" বৃদ্ধ আগন্তুকের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সহসা আগন্তুক ব্রাহ্মণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল, সে তাহার সমস্ত দেহের বল একত্র করিয়া মন্দিরদ্বারের জীর্ণ পাষাণ আবরণের উপর নিক্ষেপ করিল, আবরণ সশব্দে পড়িয়া গেল, তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

মন্দিরমধ্যে রক্তবর্ণ পাষাণনির্ম্মিত বাসুদেব প্রতিমার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রতিমা দেখিয়া আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "এসেছি প্রভু—এসেছি—বহুকষ্টে—বহুদূর থেকে এসেছি—আর যাব না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত

বর্ত্তমান পাটনা নগরের যে অংশ এখন মহারাজখণ্ড নামে পরিচিত, ষোড়শ শতাব্দী পূর্ব্বে সেই অংশ লিচ্ছবীপুর নামে বিখ্যাত ছিল। তখন পাটলিপুত্র নগরের সমস্ত ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই লিচ্ছবীপুরে বাস করিতেন। গঙ্গা ও শোন সঙ্গমের পূর্ব্বকূলে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটদিগের

বিশাল প্রাসাদে তখন মথুরার শকবংশীয় রাজার সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী একজন সম্ভ্রান্ত শকও বাস করিতেন। পুরাতন দুর্গ ও প্রাসাদের সীমার মধ্যে শকগণ ভারতবর্ষী কোন লোককে প্রবেশ করিতে দিত না,—বাস করাতো দূরের কথা। সেইজন্যই সম্ভ্রান্ত সম্প্র অধিকাংশ ভারতবাসী লিচ্ছবীপুর নামক পাটলিপুত্রের উপনগরে আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গৌড়বাসী ব্রাহ্মণ যেদিন গঙ্গাতীরে পাষাণবেষ্টিত বাসুদেবের প্রাচীন মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সেই দিন নিশীথ রাত্রিতে লিচ্ছবীপুর উপনগরের এক সঙ্কীর্ণ পথে অকস্মাৎ কতকগুল কুকুর ডাকিয়া উঠিল। সেই গলিতে অনেকগুলা ক্ষুদ্র, বৃহৎ অট্টালিকা ছিল; একটী ক্ষু অট্টালিকার সম্মুখে মুক্ত অলিন্দে এক ব্যক্তি আপাদমস্তক কম্বলে আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্র যাইতেছিল। কুকুরগুলার চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে কম্বল হইতে মুখ বাহি করিয়া দেখিল যে, অন্ধকারে এক ব্যক্তি নিঃশব্দপাদক্ষেপে তাহার দিকে আসিতেছে। সে তখ অন্ধকারে লুকাইয়া আগন্তুক কি করে তাহাই দেখিতে লাগিল। আগন্তুক অলিন্দ পার হইয়া পার্শ্বে তোরণের নিকটে দাঁড়াইল, আর কুকুরগুলা তাহাকে বেষ্টন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে ব্যক্তি অলিন্দে শুইয়াছিল সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল যে, আগন্তুক তোরণের ইষ্টক বহিয়া উপরে উঠিতেছে। আগন্তুককে চোর মনে করিয়া সে অলিন্দের বাহির হইয়া যাইতেছিল এমন সময়ে দূর হইতে নিক্ষিপ্ত একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক আসিয়া তাহার গায়ে লাগিল, তখন সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইষ্টকখণ্ড অলিন্দে আসিয়া পড়িল, তখন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সে বুঝিতে পারিল যে, অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি তাহাকে ডাকিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে কম্বলখানা জড়াইয়া সে যখন পাষাণ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র অট্টালিকার বাহিরে আসিল, তখন আগন্তুক তোরণের ইষ্টক বাহিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

অল্পদূরে অন্ধকারে তৃতীয় ব্যক্তি লুক্কায়িত ছিল, সে কম্বলাবৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কে, গণপতি নাকি?" গণপতি মুখ বাহির করিয়া বলিল, "বামুনের বুদ্ধি কিনা? আমি যদি গণপতি না হয়ে মহাদণ্ডনায়ক হতাম, জনার্দ্দন ঠাকুর, তা হলে যে তোমার টিকিশুদ্ধ মাথাটী কাল সকালে পাটলিপুত্র সহরের তোরণে ঝুলতো।" জনার্দ্দন বলিল, "ব্যাটা গয়লা কিনা! তাই এমন বুদ্ধি! শকরাজাধিরাজের মহাদণ্ডনায়ক তোর মত অন্ধকারে কম্বল মুড়ি দিয়ে একা বেড়াবেন কিনা!" "হার মেনেছি ঠাকুর। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করেছ কেন বলত? বাড়ীতে একটু কাজ।" "বিষম বিপদে পড়ে এসেছি গণপতি! ভট্টারক কোথায়? এখনি তাঁকে সংবাদ দিতে হবে।" "আহা কি মধুর কথাই শোনালে, এই তিন পহর রাত্তিরে আমি ভট্টারককে ডাকতে যাই আর মনুয়ার মার ঝাঁটা খেয়ে মরি। যাও যাও ঠাকুর বিরক্ত করো না, ঘরে যাও। ঠাকুরাণী এক নূতন লাউগাছ পুঁতেছেন, পাড়ার ছেলেগুলোর জ্বালায় এপর্য্যন্ত একটা লাউও ঠাকুরের ভোগে আসেনি। আমি যাই, তা নইলে ছোঁড়াগুলো এক্ষুনি

নতুন লাউটা ছিঁড়ে নিয়ে যাবে।" "রহস্য নয় গণপতি, বিষম বিপদে পড়ে এসেছি। তুমি যেমন করে পার ভট্টারককে ডেকে তোল। গৌড় থেকে এক উন্মত্ত ব্রাহ্মণ এসে বাসুদেবের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দিয়েছে, সকাল বেলায় এ সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেলে পাটালিপুত্রের নাগরিকদের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হবে। তুমি যদি ভট্টারককে না ডাক তা হলে আমিই চীৎকার করে ডাকতে আরম্ভ করব।" "বিষম বিপদে ফেল্লে ঠাকুর। মনুয়ার মা বেটী বুড়ীকে যতই মিষ্ট কথা বলি সে ততই দাঁত খিঁচিয়ে আসে। তুমি আসবার সময়ে পথে লোক দেখতে পেলে?" "আমার আগে আগে বোধ হয় একটা ন্যাড়া আস্‌ছিল সেইজন্যে একটু সাবধানে আসতে হয়েছে।" "তুমি এখনও সাবধান থাক ঠাকুর, আমি ভট্টারককে ডাকতে যাই, কে একটা লোক বোধহয় আমাদের লাউমাচায় লুকিয়ে আছে।"

জনার্দ্দন ঠাকুরকে অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়া গণপতি ক্ষুদ্র অট্টালিকায় ফিরিয়া গেল। সে অলিন্দের একটী বাতায়নের কপাটে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিল, অল্পক্ষণ পরে কে ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "কেরে?" গণপতি অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, "আমি, মনুয়ার মা একবার শীঘ্র ওঠ।" অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় মনুয়ার মা অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, সে বলিল, "আমি উঠ্‌তে যাব কেন রে মিনসে, তোর ঘুম না হয় তুই পাড়া বেড়াতে যা।" তৃতীয় ব্যক্তি তখনও লুক্কায়িত আছে জানিয়া গণপতি অতি ধীরে ধীরে বলিল, "মনুয়ার মা তোর পায়ে পড়ি, ওঠ, বড় দরকার আছে।" মনুয়ার মাতা গণপতির কথা ভাল বুঝিতে না পারিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌, যদি এরকম করে জ্বালাতন করবি তা হলে এখনি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করবো।" বিপদ বুঝিয়া গণপতি আবার বলিল, "সে কথা না মনুয়ার মা, সে কথা না। তোর যদি এত সন্দেহ হয় তা হলে একবার ঠাকুর কে ডেকে দে।" "ঠাকুরকে কেনরে? চোর এসেছে বুঝি? তবে ভাই আমি উঠতে পারব না, দেখ্‌ গণপতি তুই খবরদার অলিন্দ ছেড়ে যাসনি। ঠাকুরকে ডাকতে হয় কাল সকালে ডাকিস।"

মনুয়ার মা ভয় পাইয়াছে এবং উঠিবে না বুঝিয়া গণপতি সর্ব্বাঙ্গে কম্বল জড়াইয়া ধনুকহাতে লইয়া বাহির হইল। সে যখন অলিন্দের বাহিরে পা দিল তখন রন্ধনশালার চালের উপরে অলাবু পাতা নড়িয়া উঠিল, গণপতি তাহা দেখিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। জনার্দ্দন যেখানে অন্ধকারে লুকাইয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়া সে ধনুকে গুটিকা যোজনা করিল এবং দ্বিতলের বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিল। গণপতি দূর হইতে দেখিতে পাইল যে দূরে রন্ধন শালার চালে অলাবু পত্রগুলি আবার নড়িয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় গুটিকা নিক্ষেপ করিল। তখনও দ্বিতলের গবাক্ষ মুক্ত হইল না দেখিয়া প্রথম গুটিকার অর্দ্ধদণ্ড পরে গণপতি তৃতীয় গুটিকা নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতায়ন মুক্ত হইল। তাহা দেখিয়া গণপতি তিনবার পেচকের রব করিল এবং তৎক্ষণাৎ অলিন্দে ফিরিয়া আসিল।

অল্পক্ষণ পরে অলিন্দের গবাক্ষ মুক্ত করিয়া এক ব্যক্তি অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "গণপতি?" কিন্তু গণপতির উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মনুয়ার মাতার বিকট চীৎকারে সুষুপ্তিময় পল্লীর

নৈশনিস্তব্ধতা সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া নবাগত ব্যক্তি কক্ষের দুয়ার মুক্ত করিয়া অলিন্দে আসিলেন। গণপতি তাহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "ভট্টারক, জনার্দ্দন ঠাকুর এসেছেন।" নবাগত ব্যক্তি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রিতে জনার্দ্দন ঠাকুর কেন এলেন?" "কোথা থেকে এক পাগলা ঠাকুর বাসুদেবের মন্দিরে এসেছে, সে মন্দিরের দুয়ার ভেঙ্গে ফেলেছে, তাই ভয় পেয়ে জনার্দ্দন ঠাকুর আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছে।" "কোথায় তিনি?" "তাকে বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে এসেছি। বোধ হয় একটা ন্যাড়া এসে রান্নাঘরের চালে লুকিয়ে আছে, সেইজন্যে আপনাকে চীৎকার করে ডাকতে ভরসা করিনি। আপনি ভিতরে দাঁড়ান, আমি ঠাকুরকে ডেকে আনি।" নবাগত ব্যক্তি কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া কপাট রুদ্ধ করিলেন এবং মনুয়ার মাতাকে দ্বিতলে যাইতে আদেশ করিলেন। মনুয়ার মাতা চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল, তখন গণপতি জনার্দ্দনের সহিত ফিরিয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

অন্ধকারে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ কহিল, "গণপতি, ভট্টারক কোথায়?" অন্ধকারে নবাগত ব্যক্তি কহিলেন, "ঠাকুর, আমি এইখানেই আছি, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে কোন্ উন্মাদ ব্রাহ্মণ বাসুদেবের চিররুদ্ধ দ্বার মুক্ত করেছে?" জনার্দ্দন কহিল, "বাসুদেব ভট্টারকের মঙ্গল করুন। বড় বিপদে না পড়লে এত রাত্রিতে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতুম না। গৌড়দেশ থেকে এক ব্রাহ্মণ এসে অপরাহ্নে বাসুদেবের চত্বরে আশ্রয় নিয়েছে। তখন থেকেই সঙ্ঘস্থবিরের চর তার পিছনে লেগে আছে। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে হঠাৎ আমাকে দেখে ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, অমানুষিক শক্তির বলে বাসুদেবের চিররুদ্ধ দ্বার একাই ভেঙ্গে ফেলেছে।" "বলেন কি ঠাকুর? একজন ব্রাহ্মণ একা পষাণরুদ্ধ দ্বার ভেঙ্গে ফেলেছে? বাসুদেব মন্দিরের দ্বার কে কবে রুদ্ধ করেছিল পাটলিপুত্রের নাগরিক তা ভুলে গিয়েছে।" জনার্দ্দন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখন কি হবে ভট্টারক? আমার মত যে কয়জন ব্রাহ্মণ এখনও লুকিয়ে পাটলিপুত্রে বাস করে, কাল সকালে তাদের নাক কাণ কাটা যাবে, সংবাদ শুনলে সমস্ত ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্র নগর থেকে পলায়ন করবে, আর শ্বেত শক সেনার অমানুষিক অত্যাচারে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর মরুভূমিতে পরিণত হবে।" নবাগত ব্যক্তি বলিলেন, "ঠাকুর আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি অস্ত্র নিয়ে আসি। যেমন করে হোক বাসুদেবের মুক্ত দ্বার আবার রুদ্ধ করতে হবে।"

গণপতি ও জনার্দ্দনকে নিম্নতলের কক্ষে রাখিয়া আগন্তুক দ্বিতলে চলিয়া গেলেন। দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দুইটী অপরিণত বয়স্ক যুবা নিদ্রিত ছিল এবং তাহাদিগের পার্শ্বে বসিয়া এক প্রৌঢ়া রমণী মনুয়ার মাতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে, চোর আসে নাই। পুরুষকে দেখিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ভট্টারক?" পুরুষ হাসিয়া বলিলেন, "সংবাদ শুভ নয় দেবী, শত শত বৎসর পরে বাসুদেবের চিররুদ্ধ দ্বার আবার মুক্ত হয়েছে। মুক্ত করেছে এক উন্মত্ত দুর্ব্বল গৌড় ব্রাহ্মণ।" "এখন কি করবে?" "করব আর কি, বৈষ্ণব হয়ে নিজের হাতে ইষ্ট-

দেবতার মন্দিরের মুক্তদ্বার আবার রুদ্ধ করে আসব।" "না—না, ছিঃ ছিঃ—মগধের দিন কি এমন ভাবেই কাটবে? কখনই না—শত শত বৎসর পরে দিন যখন আবার আসবে তখন মাগধ নাগরিক বলবে যে ভীরু কাপুরুষ আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ শকের ভয়ে বাসুদেবের মুক্ত দ্বার আবার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। না ভট্টারক ভগবান বাসুদেব অন্তর্য্যামী—তাঁর প্রাচীন মন্দিরের চিররুদ্ধ দ্বার ভীষণ বৈষ্ণবী শক্তিতে মুক্ত হয়েছে, তুমি ক্ষুদ্র মানব হয়ে সে শক্তির প্রতিরোধ করতে যেওনা।" পুরুষ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝছনা দেবী, এখনও এই প্রাচীন নগরে শত শত বৈষ্ণব স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করে, ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা বিশাল মগধদেশে এখনও সহস্র সহস্র মাগধ গোপনে বিষ্ণুপাদ সেবা করে—দেশের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শক কিন্তু মগধ দেশে বৈষ্ণবের রক্ষক গুপ্তবংশ। প্রভাতে যখন কাপোতিক মহাসঙ্ঘারামের সঙ্ঘস্থবির শুনবে যে মহারাজাধিরাজ বাসুদেবের প্রাচীন মন্দিরের চিররুদ্ধ দ্বার মুক্ত হয়েছে তখন বর্ব্বর শক সেনার পদাঘাতে পবিত্র বাসুদেবের বিগ্রহ চূর্ণ হয়ে যাবে—নিরপরাধ নরনারী ও শিশুর আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হবে—তখন কে—কোন্ শক্তি পাটলিপুত্রের অসহায় নর-নারীকে রক্ষা করতে আসবে?" সহসা রমণীর নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভট্টারক, তুমি মানব, আর আমি মানবী। অমানুষিক বৈষ্ণবীশক্তির কথা তুমি আমি কি বলতে পারি? যে শক্তি বাসুদেবের মন্দির দ্বার রুদ্ধ করেছিল সেই শক্তি ক্ষুদ্রকায় গৌড়ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি গ্রহণ করে পাষাণ মন্দিরের চিরপাষাণরুদ্ধ-দ্বার মুক্ত করেছে, আবশ্যক হলে সেই শক্তি ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে পবিত্র মগধে বৈষ্ণবধ্বংস নিবারণ করতে আসবে। আর্য্য, তুমি নারায়ণের চরণাশ্রিত হয়ে বাসুদেবের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করতে যেয়োনা।" "তা হয়না দেবী, পুরুষের কর্ত্তব্য কঠোর, আমি এখন পুরাতন পাটলিপুত্রের প্রতি বীথিতে মদমত্ত শ্বেতশকের চীৎকার শুনতে পাচ্ছি, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, 'মগধভূমি নিরপরাধ রমণী ও শিশুর রক্তে রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। নিবারণ করোনা দেবী। কচ্—কচ্, সমুদ্র—সমুদ্র——"

পুত্রদ্বয় জাগিয়া উঠিল। চন্দ্রগুপ্ত তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পল্লীতে পল্লীতে যাও, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বৈষ্ণবদের ডেকে নিয়ে বাসুদেবের প্রাচীন মন্দিরে নিয়ে এস। বলে এস যে আজ বৈষ্ণব নাগরিকের বিষম বিপদ। এক উন্মত্ত গৌড় ব্রাহ্মণ বাসুদেবের চিররুদ্ধ দ্বার মুক্ত করেছে। প্রভাতের পূর্ব্বে দ্বার রুদ্ধ না হলে মাগধ নাগরিকের সর্ব্বনাশ হবে। সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আচ্ছাদিত করে অস্ত্র নিয়ে যাও।"

তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে পুত্রদ্বয়ের সহিত চন্দ্রগুপ্ত গণপতিকে গৃহরক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়া বাসুদেব মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদ-লক্ষ্মী

আজিকে শরতে কেন পথে পথে
শঙ্খ বাজে ?
কে এলরে মরি সঙ্গীতে ভরি'—
বঙ্গ মাঝে ?
কেন চারিদিক সিত গৈরিক
কুসুমে ঢাকা ?
শ্যামল অবনী আজিকে নবনী
মাধুরী মাখা।
মেঘে রোদে খেলা আজি সারা বেলা
বনের ছায়ে,
অযুত বলাকা দুলাইছে পাখা
আকাশ গায়ে।
কাশ বনে অই ঢেউ থই থই
বাতাসে দুলে।
প্রাঙ্গণ তল ভরেছে সজল
শিউলি ফুলে।
সোণার বরণ হাসিছে কিরণ
ধানের ক্ষেতে,
নদীর পুলিনে কে রাখিল তৃণে
আসন পেতে ?

জ্যোছনা ধারায় তারায় তারায়
রজত পরী,
আজি ছায়াপথে ভাসায় শরতে
মেঘের তরী।
অঞ্চল হতে খসে পড়ে স্রোতে
কুসুম রাশি,
সুরভি পবন সকল ভুবন
উঠিল হাসি!
আজি উৎসব জাগরণ নব
সবার প্রাণে,
যতেক বেদনা হলো মূর্চ্ছনা—
কাহার গানে ?
নব শালি মঞ্জরী বাম করে ধরি
আজিকে ধীরে—
হেসে রমা প্রেমে এসেছেন নেমে
ধরার তীরে।
তাঁর আবাহন চলে অনুখন
ভুবন মাঝে,
তাঁর যশোগীত আজি ঝঙ্কৃত
সকাল সাঁঝে।

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী

উদ্বোধন

[রচনা———শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর]

বোধন-বাঁশী বেজেছে অই, অলস আবেশ ছেড়ে দে ভাই !
রুদ্ধ অসাড় জীবনটাকে উৎসাহে আজ নেড়ে নে' ভাই !
জুড়িয়ে নে' ছিন্ন বীণাই, কুড়িয়ে নে' ভগ্ন সানাই ;
ছেঁড়া কাপড় গিঁঠিয়ে নে', ছেঁড়া কাঁথা ঝেড়ে নে' ভাই !
নয়ন জলের বোধন ঘটে, সাজায়ে নে' হৃদয় তটে ;
শীর্ণ করে বরষ পরে, ভাঙা কুটীর সেরে নে' ভাই ;—
আসছে মা যে কুটীর দ্বারে, আগায়ে কর বরণ তারে ;
দেখতে ফিরে পাস্ কি না-পাস্ চরণ কমল হেরে নে' ভাই !!

[সুর ও স্বরলিপি———শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মিশ্র খাম্বাজ———একতালা।

স্থায়ী।

০ ১ ২´
| [মা মা -া | গা রা -গা I গা মা পা | পা -া -পা |
{র্সা র্সা -পা | পা পা -া I ণা ণা মা | মা -া -মা |
{বো ধ ন্ বাঁ শী ০ বে জে ছে অ ০ ই

০ ১ ২´ ৩
| গা গা -মা | ধা ধা -া I পা র্সা ণা | ধা -া -ধা] |
| রা রা -গা | মা পা -া I গা গা গা | মা -া -মা} |
অ ল স্ আ বে শ্ ছে ড়ে দে ভা ০ ই}

০ ১ ২´ ৩
| {না -া না | না না -া I র্সা র্রা -া | না র্সা -া |
রু দ্ ধ অ সা ড়্ জী ব ন্ টা কে ০

০ ১ ২´ ৩
| {গা -মা মা | পা ধা -া I গমা পধা র্সা | ণা -ধা -ধা] II
| গা -মা মা | পা র্সা -ণা I ধা ধা পা | ধা -া -ধা}
উ ৎ সা হে আ জ্ নে ড়ে নে ভা ০ ই} |

অন্তরা।

০ ১ ২ ৩
| [র্সা র্সা র্গা | র্রা -া র্রা I -র্সা র্সা নধা | না -না া |
II { র্সা র্সা র্সা | ণা -ধা ধা I -মা মা পধা | গা -মা া |
জু ড়ি য়ে নে • ছি ন্ ন বী• ণা ই •

১ ২ ৩
| পা পা ধা | না -া নর্সা I ধা ধা র্রা | না -র্সা া]
| গা গা মা | পা -র্সা ণধা I -া ধা ধা | ধা -ধা া }
কু ড়ি য়ে নে • ভ• গ্ ন সা না ই •

০ ১ ২ ৩
| [র্সা র্সা -র্গা | র্গা র্মা -া I র্গা র্রা র্রর্সা | না -র্সা -া |
| { না র্সা -ণা | ধা পা -া I মা মা মগা | রা -া -া |
ছেঁ ড়া • কা প ড়্ গিঁ ঠি য়ে• নে • •

০ ১ ২ ৩
| গা গা -মা | পা ধা -া I গমা পধা র্সণা | ধা -া -ধা] II
| সা রা -া | মা পা -া I ধা পা ধা | ধা -া -ধা } |
ছেঁ ড়া • কাঁ থা • যো ড়ে নে ভা • ই

সঞ্চারী।

০ ১ ২ ৩
| [না র্সা -র্সণা | ণা ধা -া I মা পমা -পা | মা গা -া
II { মা মা -মগা | গা রগা -া I রা গমা -পা | পা পা -া
ন য় •ন্ জ লে• র্ বো ধ• ন্ ঘ টে •

০ ১ ২ ৩
| সা ন্া সা | গা -া গা I মা -পা -ক্ষা | পা পা
| গা গা মা | পা -র্সা ণা I ধা -পা -ধা | ধা ধা
সা জা য়ে নে • হৃ দ • য় ত টে

০ ১ ২´ ৩

| [র্সা -া ণা | ধা ধা -মা I মা ধা -া | মা মা -গা |

| {না -া না | ধা না -া I র্সা র্রা -া | না র্সা -া |

শী র্ ণ ক রে ০ ব র ষ্ প রে ০

০ ১ ২´ •

| সা ন্া -সা | গা মপা -ক্ষপা I পা পা পা | পা -া -পা] |

| গা মা -া | পা র্সা -পা I ধা ধা ধা | ধা -া -ধা} |

ভা ঙা ০ কু টী র্ সে রে নে ভা ০ ই

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩

| [র্সনা -র্সা র্সা | ণা ধা -া I মা পা -া | মা -া গা

| {গমা -া মা | পা না -র্সা I না র্সা -া | না -া পা

আ০ স্ ছে মা যে ০ কু টী র্ দ্বা ০ রে

০ ১ ২´

| সা সা সা | মা -গা -া I মা মা -পা | ক্ষগা পা -া]

| গা মা মা | পা -নর্সা -া I না র্সা -া | র্সা র্সা

আ গা রে ক ০০ র্ ব র ণ্ ডা রে

০ ১ ২´

| [র্সা -র্গা র্গা | র্রা র্রা -া I র্সা -া ণা | ণা ধা -া |

| {র্সা -র্গা র্গা | র্গা র্মা -া I র্গা -র্রা র্রা | র্সা র্সা -না |

দে খ্ তে ফি রে ০ পা স্ কি না পা স্

০ ১ ২´

| গা মা -া | পা ধা -া I গমা পধা পর্সা | ধণা -ধা -] II II

| গা গা -মা | পা না -র্সা I না র্সা র্সর্সা | র্সা -া -র্সা} |

চ র ণ্ ক ম ল্ হে রে নে০ ভা ০ ই

দেশবন্ধু-স্মৃতিকথা

I love contemplating,
Apart from all his *patriotic* glory,
The traits that made him great
Deshbandhu's story.

নেপোলিয়নের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া ইংরাজ কবি যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আজ আমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। দেশবন্ধুর অলৌকিক স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগজনিত গৌরবের কথা আর না বলিলেও চলে। কারণ সে সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন এবং এখন তাহা 'প্রবাদের মত বঙ্গে যথা তথা' আপামর সাধারণের মুখে মুখে ঘোষিত হইতেছে। প্রতিভায়, বীরত্বে, সাহসে ও সঙ্ঘগঠন শক্তিতে তিনি যে বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়নের সঙ্গেই তুলিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন একথা তাঁহার মৃত্যুর পরদিন ভারতবৈরী ষ্টেটসম্যানকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শত্রুমিত্র সমস্বরে আজ তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং তাঁহার যে সকল অসামান্য কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বজনবিদিত তাহারই পুনরুক্তি করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ভাগলপুরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেই দশ বছর আগেকার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া আজ তাহা তাঁহার উদ্দেশে এই দীন শোকার্ত্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে চিত্তরঞ্জন একটা খুব বড় উইল কেসে ভাগলপুরে আসিয়া প্রায় সাত মাস কাল এখানে অবস্থান করেন। অপর পক্ষে সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন (তখনও তিনি লর্ড সিংহ হন নাই) এবং চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্লরঞ্জন (এখন পাটনা হাইকোর্টের জজ) নিযুক্ত ছিলেন। দীপনারায়ণ সিংহের বৈঠকখানা বাড়ী তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে কিছুদিন তিনি একাকী ছিলেন। তারপরে তাঁহার স্ত্রীপুত্র ও কন্যাদ্বয় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। চিত্তরঞ্জন তখন দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও একজন বিশিষ্ট সাহিত্যকরূপে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাহার বিপুল অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বদান্যতার খ্যাতিও চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি তখনও ভাল করিয়া নামেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস এখন মডারেটদের হাতে, উহাতে যোগ দেওয়া বৃথা। ব্যারিষ্টারিও যে তিনি ভালবাসিতেন তা' নয়। তিনি ইহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া প্রায়ই বলিতেন যে, ইহাতে একটা গুণের খুব দরকার হয়, তাহা হইতেছে a species of low cunning (একপ্রকার নীচ শঠতা)। তখন হইতেই তাঁহার

জীবনের কামনা ছিল ব্যারিস্টারি ছাড়িয়া দিয়া এমন একটা শান্তিময় জীবন যাপন করা যাহাতে সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারেন।

ব্যারিষ্টারি যে তাঁহার ভাল লাগিত না, এই কূট পথে অর্থোপার্জ্জন করিতে তাঁহার অন্তর দেবতা যে সায় দিত না, তাহার প্রমাণ আমরা অন্যপ্রকারেও পাইতাম। আমরা চার পাঁচ জন বন্ধু প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতাম। পূর্ব্বে একদিন তাঁহাকে আমরা এখানকার ইন্‌ষ্টিট্যুট্ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার বাসায় যাইবার জন্য তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। পরদিন হইতেই আমরা কয়জনে গিয়া তাঁহার বাসগৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলাম। আমি ছাড়া আর সকলেই ছিলেন উকিল; আবার এই উকিল কয়জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সেই কেসে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তথাপি কোনদিন সেই মোকদ্দমার কথা কিংবা আইন সংক্রান্ত কোন আলোচনা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেন তাঁহার ব্যারিস্টারি ও মোকদ্দমার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য আমাদের লইয়া নিত্য নূতন মজলিসি আনন্দের সৃষ্টি করিতেন। অত বড় একটা জটিল মোকদ্দমার ভাবনা যে তাঁর মাথায় রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতেই পারিতাম না। তথাপি তিনি যখন জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া গেলেন তখন আমরা ইহাই ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি আইন ব্যবসায়ের জন্য জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে সর্ব্বত্র সাফল্যে মণ্ডিত করিবেই।

এইবার আমাদের সেই প্রাত্যহিক বৈঠকের কথা বলি। সাধারণতঃ জন পাঁচেকে মিলিয়া আমরা মজলিস্ করিতাম বলিয়া রবিবাবুর 'পঞ্চভূতের ডায়ারির' অনুকরণে বাহিরের লোকে ইহার নাম রাখিয়াছিল 'পাঞ্চভৌতিক সভা'। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমাদের মজলিস চলিত। কখনও কখনও আমাদের বাড়ী ফিরিতে রাত্রি একটা বাজিয়া যাইত। চিত্তরঞ্জনের সাহায্যে, গানে, গল্পে, আলোচনায় ও পুস্তক পাঠে যে অনাবিল আনন্দ স্রোতে আমরা ভাসিয়া যাইতাম তাহাতে রাত্রি যে কত হইল সেদিকে কাহারও হুঁস থাকিত না। আর যদিও বা কেহ উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন চিত্তরঞ্জন সেদিকে কর্ণপাত করিতেন না। তা' ছাড়া, আহার না করিয়া কাহারও চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না। আমাদের সকলকে লইয়া একসঙ্গে আহার করায় তাঁহার একটা আনন্দ ছিল। আহারান্তে আমাদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিজের মোটরটী প্রস্তুত থাকিত। ভবানীপুরের বাড়ীতেও ঠিক এই ব্যাপারই দেখিয়াছি। একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। কবিবন্ধু কালিদাস রায়কে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে লইয়া গিয়াছি। চিত্তরঞ্জন কালিদাস রায়ের কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; তাই কালিদাস তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেখি কবিবর অক্ষয় কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে আগে থেকেই আসর জমাইয়া

বসিয়া আছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। চণ্ডীদাস বড়, কি বিদ্যাপতি বড় এই বিষয় লইয়া খানিকক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল। কিন্তু অক্ষয়বাবুর মুখ বন্ধ থাকে না। আবার কবি ও কাব্য সমালোচনা চলিতে লাগিল। কাহারও খেয়াল নাই, রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। তারপর চিত্তরঞ্জন সকলকে লইয়া আহারে বসিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি পূর্ব্বেই সকলকে এই অনুরোধ করিয়া আমাদের উঠিবার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার শেষ হইলে সকলের জন্য তিনি গাড়ী আনাইয়া দিলেন। বাড়ী ফিরিলাম রাত্রি দু'টায়।

যাহা বলিতেছিলাম, আমাদের ভাগলপুরস্থ এই পাঞ্চভৌতিক সভার প্রধান কাজ ছিল সাহিত্য চর্চ্চা। বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যের তিনি যে একজন খুব ভাল সমজদার ছিলেন প্রতিপদে তাহার পরিচয় পাইতাম। পাশ্চাত্য সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ (এখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল)। কেবল একটি বিষযে তাঁহার সহিত আমাদের মতের মিল হইত না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি তত পছন্দ করিতেন না। আর আমরা ছিলাম সকলেই রবি ভক্ত। এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের অনেক দিন অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন নিজে কবি হইয়া আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য আদর করিতে পারিতেন না দেখিয়া আমাদের বিস্ময়বোধ হইত। কিন্তু একজন কবি অপর কবির কাব্য বুঝিতে পারেন না এরূপ ব্যাপার সকল সাহিত্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। দৃন্টান্ত দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশ ঘোষের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য মাঝে মাঝে পড়া হইত, বিশেষতঃ সেই স্থানটা যেখানে কলুর ছেলে ভাত খাইতে বসিয়াছে, আর একটা কুকুর কিছু পাইবার জন্য ঘেউ ঘেউ করিতেছে, কিন্তু পাইতেছে একটা মাছের কাঁটা কিংবা একটা ডাঁটার ছোব্‌ড়া। এদিকে একটা ষাঁড় ধীর-গম্ভীর পদে সেখানে আসিয়া তার যাহা খাইবার খাইয়া চলিয়া গেল। চিত্তরঞ্জন বলিতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সহজে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের গলদটা দেখাইয়া দিয়াছেন। যতদিন না আমরা কুক্কুরবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ষণ্ড-নীতি অবলম্বন করিতে পারিব ততদিন আমাদের কোন আশা নাই। তারপর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আসিয়া পড়িত। তখন একটা বিষাদ ও নৈরাশ্যের ভাব তাঁহার বদনমণ্ডল ছাইয়া ফেলিত। কয়েক বৎসর পরেই যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁহারই অঙ্গুলি সঞ্চালনে নিয়ন্ত্রিত হইবে সে ধারণা তখন বোধ হয় তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

ইংরাজ কবিদের মধ্যে ব্রাউনিং ছিলেন তাঁহার প্রিয় কবি। ব্রাউনিংয়ের কবিতা পড়া হইত। তাঁহার সব চেয়ে বেশী ভাল লাগিত One word more নামক কবিতাটি। কবি এই কবিতাটি লিখিয়া তাঁহার Men and Woman নামক কাব্য গ্রন্থখানি পত্নীর করে অর্পণ করেন। ইহাতে কবির স্বীয় দাম্পত্য-প্রেম জ্বলন্ত ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের মুখে এই কবিতাটির প্রশংসা ধরিত না। সত্যই কবিতাটি অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। তিনি বলিতেন যে

জগতের সাহিত্যে এমন সুন্দর প্রেম কবিতা আর নাই। অন্যান্য কবিতা লইয়াও আলোচনা হইত। The Statue and the Bustএর অন্তর্নিহিত শিক্ষা যে কয়ছত্রে প্রকটিত তাহা আবৃত্তি করিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, And the sin I impute to each frustrate ghost was the unlit lamp and the ungirt loin. মানুষ যখন মনে মনে পাপ করিয়া সুযোগের অভাবে তাহার পাপ কামনা চরিতার্থ করিতে না পারে তখন তাহার সেই কাপুরুষতা তাহাকে যে আরও বেশী ঘৃণ্য করিয়া তুলে, ইহাই হইল এই কবিতাটির শিক্ষা। সম্ভ্রান্ত বংশের বিবাহিতা নারী পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হইয়া স্বামীর কড়া পাহারায় প্রণয়ীর সহিত মিলিত হইতে পারিল না, কিন্তু সে তাহার প্রাণের অশান্ত কামনা লইয়া গবাক্ষ হইতে রাজপথের পানে চাহিয়া থাকিত, কখন তাহার প্রণয়ী তাহার 'সমুখ দিয়া স্বপনসম' অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে তাহার দিকে একবার প্রেমপূর্ণ নয়নপাত করিবে। পুরুষটিরও অবস্থা তাহারই মতন। তাহারও এমন মনের জোর নাই যে, সে তাহার অভীপ্সিত বস্তু বলপূর্ব্বক লাভ করিতে পারে। ফলে, দিনের পর দিন এই মূক প্রেমাভিনয় চলিতে লাগিল—গবাক্ষপার্শ্বে উৎসুক রমণীমুখ আর তাহারই সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্বারোহণে একটি পুরুষের গমন। ক্রমে তাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সহরের লোকের নিকট এই দুই নরনারীর প্রণয়কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না। উভয়ের মৃত্যুর পর তাহারা সেই গবাক্ষপার্শ্বে রমণীটির আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি ও তাহার সম্মুখস্থ পার্কে পুরুষটির অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি এরূপভাবে স্থাপিত করিল যেন দুইজনে উৎসুকভাবে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আছে। নীতিবাগীশদিগের মধ্যে ব্রাউনিংয়ের এই কবিতাটি ঘোর দুর্নীতিমূলক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এবং জীবদ্দশায় এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন কবির বিরুদ্ধে এই দুর্নীতির অপবাদ অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন এবং কবিতাটির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতেন। এ সম্বন্ধে আমরাও তাঁহার সহিত একমত ছিলাম। সমাজের চক্ষে যাহা পাপ তাহাত ঐ দুই নরনারীর মন ঘোরতররূপে কলুষিত করিয়াছেই, শুধু সুযোগ বা সাহায্যের অভাবে যদি তাহারা স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের সেই সংযমের মূল্য কি?

ব্রাউনিংয়ের Andrea Del Sarto, Fra Lippo Lippi প্রভৃতি কবিতাও তিনি বিশেষ উপভোগ করিতেন—এই সব কবিতায় মানব চরিত্রের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণের জন্য। Evelyn Hope নামক কবিতাটি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু যে কবিতাটি তাঁহার হৃদয় মন করুণা ধারায় সিক্ত করিয়া দিত তাহা হইতেছে হুডের The Bridge of Sighs. পতিতাদিগের দুর্দ্দশার জন্য সমাজের দায়িত্ব যে বড় কম নয়, এবং এই হতভাগিনীদিগকে ঘৃণা করিবার অধিকার যে আমাদের কাহারও নাই, এই কথাই তিনি উক্ত কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিতেন। তাঁহার যৌবনে রচিত 'মালঞ্চ' কাব্যের 'বারাঙ্গনা'ও অতি করুণ ভাষায় স্বীয় মর্ম্মব্যথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে—

রেখে যেয়ো রক্ত জ্বালা,
তুলে নিয়ো পুষ্পমালা,
রজনী প্রভাতে যেয়ো ভুলে,
আমার সকলি লও তুলে।

এই বিলাপোক্তির সত্যতা আমরা যখন উপলব্ধি করিতে পারিব তখন ঘৃণার পরিবর্ত্তে সহানুভূতি ও অনুকম্পায় আমরা তাহাদের পাপের সমালোচনা করিব। পতিতা ধর্ম্মত্যাগ করিলেও ধর্ম্ম যে তাহাকে ত্যাগ করে না এবং তাহাকে লুকানো দেবত্বের উদ্বোধন করিয়া দিবার জন্য এক শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথ তাহা অতি চমৎকারভাবে তাঁহার 'পতিতা' কাব্যে দেখাইয়াছেন। Anatole France এর Thaisও এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। অধুনা শরৎ বাবুর উপন্যাসে পতিতাদিগের প্রতি এই সহানুভূতি লক্ষিত হয়। কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে এই ভাবের সাড়া বড় পাওয়া যাইত না। জানি না, এই কারণেই তিনি ঠিক সেই সময়ে তাঁহার 'নারায়ণে' বারাঙ্গনাচরিত অঙ্কিত করিতেছিলেন কি না। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা-ভোগও করিতে হইয়াছিল। আমরাও এ সম্বন্ধে বেশী খোলাখুলিভাবে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে একটু সঙ্কুচিত হইতাম। তবে ব্যক্তি বিশেষকে কেবল ঐ একই বিষয়ে গল্প লিখিতে তিনি কেন প্রশ্রয় দিতেছিলেন এই কথা আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে এই লোকটির খুব প্রতিভা আছে ; যদি এই একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া তার প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহাকে একটু প্রশ্রয় দেওয়ায় দোষ কি ?

চিত্তরঞ্জন তখন তাঁহার 'কিশোর কিশোরী' রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। কখনও কখনও তাহাই আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। 'মালঞ্চ' ও 'সাগর সঙ্গীত' তার আগেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি সুন্দর সুমিষ্ট গানও সেই সময়ে রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভার উপেন্দ্রবাবু, সত্যসুন্দর বাবু (এখন পাটনা হাইকোর্টের উকিল) ও সুধাংশুবাবু (অধুনা ভাগলপুরের পাব্লিক্ প্রসিক্যুটার) ছিলেন সুগায়ক। কিছুদিন পরে তিনি একজন মাইনে করা গায়কও নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। তাঁহাকে মাসে দেড়শত টাকা বেতন দিতেন। উপেন্দ্রবাবু অনেকগুলি গানে সুর দিয়া দিয়াছিলেন। দুই তিনটি গানের স্বরলিপিও 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোনদিন সমস্ত সময়টা সঙ্গীত চর্চ্চায় কাটিয়া যাইত। তখন বর্ষাকাল। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। উপেন্দ্রবাবু গান ধরিলেন—

আজিকে সখা থেকোনা দূরে,
গেয়োনা অমন করুণ সুরে,
ঝড়ের আগে বাদ্‌লা হাওয়ায়
ঝড় উঠেছে হৃদয় পুরে।

চিত্তরঞ্জনের রচিত এইসব গান সুগায়কের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত, হৃদয়মন অপূর্ব্ব আবেশে ভরিয়া দিত। এইসব গান এখনও অপ্রকাশিত। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল গানগুলি স্বরলিপি সংযোগে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা। গত মার্চ্চ মাসে উপেন্দ্রবাবু পাটনায় যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তখন চিত্তরঞ্জন সেই দশবৎসর আগেকার পুরাণো গানের খাতা বাহির করিয়া তাঁহাকে তাহা হইতে গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আর সেই সঙ্গে এই ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উপেন্দ্রবাবু সেই গানগুলি স্বরলিপি দিয়া

পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ভার লইবেন। চিত্তরঞ্জনকে যাঁহারা কেবল রাজনৈতিক যোদ্ধারূপে জানেন তাঁহারা তাঁহার বজ্রকঠোর অদম্য মনের সহিতই পরিচিত, কিন্তু এই মনটি যে আবার কুসুমের চেয়ে কোমল ছিল, তাঁহার দান, ত্যাগ ও পরোপকার বৃত্তি যে এই কুসুম কোমল হৃদয়েরই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ছিল তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার ঐ গানগুলির সহিত পরিচয় থাকা দরকার। কাব্যের কল্পকুঞ্জে বিচরণ করিয়া অনেকেই কবি নাম অর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত না হইলে, আপ্না-ভোলা দরদী প্রেমিকের প্রেমবন্যায় কবি-প্রাণটি উচ্ছ্বলিত না হইলে এমন মন মাতানো মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি হইতে পারে না।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, চিত্তরঞ্জনের স্বরচিত গানই কেবল আমাদের বৈঠকে গাওয়া হইত। বৈষ্ণব পদাবলী না গাহিলে তাঁহার মন তৃপ্ত হইত না। ভাদ্রের বর্ষণমুখর রজনী 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানে সার্থক করিয়া তোলা হইত। 'সুন্দরি রাধে আওয়ে বলি', 'কানু কহে রাই কহিতে ডরাই' ইত্যাদি অনেক গান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। গিরিশ ঘোষের গানও তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন। রবীন্দ্রনাথকেও অবশ্য বাদ দেওয়া হইত না।

কোন কোন দিন উপেনবাবু একটি ছোট গল্প লিখিয়া লইয়া যাইতেন। মজলিসে তাহাই পড়া হইত এবং পাঠের পর তাহার উপর সমালোচনা চলিত। তাহার পর আরম্ভ হইত হাসির ও ভূতের গল্প। চিত্তরঞ্জন এইসব গল্প শুনিয়া কখনও বা বালকের ন্যায় হাসিতেছেন, কখনও আবার গম্ভীরভাবে অপদেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, ঐ দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

কিছুদিন পরে পুত্র ও কন্যাদ্বয় সহ শ্রীমতী বাসন্তী দেবী আসিলেন। যেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁহার পত্নীর সহিত আমাদের আলাপ করাইয়া দিলেন সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। তাঁহার সাদা সিধা চাল চলন ও আত্মীয়বৎ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পায়ে কোনদিন জুতা দেখি নাই। এতদিন পাশের একটি ছোট ঘরে আমাদের বৈঠক বসিত; এখন হইতে সম্মুখের বড় হল ঘরে বসিবার বন্দোবস্ত হইল। মেয়েরা আসিয়া আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে লাগিলেন। একদিনের কথা। ভূতের গল্প হইয়া গিয়াছে। হাস্যকৌতুক চলিতেছে। চিত্তরঞ্জন যে জাতি খোয়ান নাই, তিনি যে বৈদ্য, এমন কি ব্রাহ্মণত্বেরও দাবী করিতে পারেন এইসব কথা এমন ভাবে বলিতেছেন যে, সকলেই হাসিতেছেন। বাসন্তী দেবী বলিলেন, 'তোমার আবার ব্রাহ্মণত্ব কোথায়?' অমনি চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, 'কেন, তোমাকে বিবাহ করিয়া। আর পাছে কেউ আমার ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ করে সেইজন্যই ত আমার নামের দাশ তালব্য শ দিয়া লিখি।' আবার নূতন করিয়া হাসির রোল উঠিল। তিনি নিজেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। তাঁহার সেই মধুর অকপট প্রাণখোলা শুভ্র হাসি তাঁহার হৃদয়ের শুভ্রতা যে কতখানি প্রকাশ করিত তাহা যিনি সেই হাসি দেখিয়াছেন তিনিই জানেন। তারপরে অন্য কথা আসিয়া পড়িল। বিলাতে একদিন তিনি বক্তৃতা

দিতেছিলেন, লবণকর সম্বন্ধে। এই ট্যাক্সের বোঝা গরীব ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া গভর্ণমেণ্ট যে কত অন্যায় করিয়াছে ইংরাজ শ্রোতৃগণকে তাহাই তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন। "যখন আমি বক্তৃতার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি এবং মনে করিতেছি সবাই আমার বক্তৃতার খুব তারিফ করিতেছে, ঠিক সেই সময়ে আমাকে বাধা দিয়া একটি লোক বলিয়া উঠিল, 'তোমরা সবাই কেন নুন খাওয়া ছাড়িয়া দাওনা।' তখন আর আমি তার সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাইত, লোকটা ঠিক কথাই বলিয়াছে ত। বিনা নুনে কি খাওয়া অসম্ভব? আচ্ছা, দু'একদিন পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাক্ না। তারপরে নুন খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। দিনকতক পরেই অভ্যাস হইয়া গেল। তখন আর কোন কষ্ট হইত না। কয়েকমাস এইরকম চালাইয়াছিলাম। চেষ্টা করিলে সকলেই আলুনি খাইতে পারে।" অসহযোগ মন্ত্রের বীজ এইসব ধারণার অন্তরালে নিহিত ছিল কি না তাহা কে বলিতে পারে? এই সকল সুপ্ত বীজই হয়ত মহাত্মাজীর প্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁর সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। সেই পূজার বন্ধে তিনি সপরিবারে ভাগলপুর হইতে মায়াবতী আশ্রমে গিয়া তথায় একমাস কাটাইয়া আসিয়াছিলেন। উপেনবাবু সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি 'নারায়ণে' 'মায়াবতীর পথে' নামক প্রবন্ধে এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন যে একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখানেও তিনি মাঝে মাঝে কীর্ত্তন দিতেন। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া তাহা শুনিতে যাইতেন। তিনি বলিতেন যে, শুধু গানে নয় কীর্ত্তনীয়াদের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে এমন সব মধুর ভাবের অভিব্যক্তি হইতে থাকে যে তাহা বড়ই উপভোগ্য হয়। ইহারা আশাতীত পারিশ্রমিক পাইয়া মহানন্দে বিদায় হইত।

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় তিনি এখান হইতে চলিয়া যান। তিনি পড়িবার জন্য আমার ব্রাউনিংখানা নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের বৈঠকে তাহা মাঝে মাঝে পড়া হইত তাহা আগেই বলিয়াছি। যাইবার দিন তাহা ফেরৎ দিয়া যাইতে ভুলেন নাই। এই তুচ্ছ বিষয়টির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, এইরূপ সামান্য খুঁটিনাটি হইতেই লোকের প্রকৃত ব্যক্তিত্বটি ফুটিয়া বাহির হয়। বই পড়িতে লইয়া ফিরাইয়া দিতে মনে থাকে না, ইহা একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, বই সম্বন্ধে আমাদের conscience নাই। তাঁর অনেক বই নাকি এইরূপ করিয়া খোয়া গিয়াছে।

ইহার পর কয়েকবার আমি তাঁহার ভবানীপুরের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। একবারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যখনই গিয়াছি তখনই তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল, হাস্যবিকশিত মুখ দেখিয়াছি, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সৌজন্য সে শ্রেণীর ছিল না যাহার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন 'শীলতার অন্য নাম শুভ্র মিথ্যা কথা।' তাঁহার আন্তরিকতা

হৃদয় স্পর্শ করিত। একবার গ্রীষ্মের বন্ধে আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম তখন আমার একটি বি-এ পাশকরা ছাত্র আসিয়া আমাকে ধরিয়া পড়িল, তাহাকে একবার সি, আর দাশের কাছে লইয়া যাইতে হইবে। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন কাজকর্ম্ম জোগাড় করিতে পারে নাই। তাঁহার দয়ার প্রাণ সে শুনিয়াছে, কোনও প্রার্থী নিরাশ হইয়া ফেরে না। তিনি সুপারিশ করিলে তাহার একটা কাজ হইতে পারে। তাহার অবস্থা দেখিয়া ও তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে লইয়া ভবানীপুর রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তখনও তিনি হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নাই। অল্পক্ষণ পরেই তিনি আসিলেন এবং পোষাক ছাড়িয়াই তখনই আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে বসিয়া গেলেন। বুঝিতে পারিলাম যে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তিনি বিলক্ষণ ক্লান্ত; কিন্তু তথাপি তিনি অতি নিবিষ্টভাবে সেই যুবকটির আবেদন শুনিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি তাকে বলিলেন, 'যখন আপনি কোন কর্ম্মের জন্য আবেদন করিবেন, আমার সুপারিশ যদি দরকার হয় আমাকে জানাইবেন, আমি তখনই আপনাকে 'রেকমেণ্ড্' করিয়া দিব।' ছেলেটি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, 'এই আশাতেই ত আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। এখন আর আমার কোন ভাবনা রহিল না।' অতঃপর সেই অবস্থাতেই তিনি সাহিত্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। কথায় কথায় আমি বলিলাম, 'দেখুন, আপনার একটা বড় বদ্‌নাম রটিয়াছে।'

তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বলুন ত?'

আমি বলিলাম, 'আপনি নাকি রবি-দ্বেষী।'

তিনি বলিলেন, 'কথাটা ঠিক হইল না। আমি রবিবাবুর ক্রিটিক্ বটে, কিন্তু বিদ্বেষী নই। আমি তাঁর অলৌকিক প্রতিভা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাঁর কবিতা আমার ভাল লাগে না।'

আমি বলিলাম, 'অজিৎ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মহর্ষির জীবনচরিতের যে ধারাবাহিক সমালোচনা 'নারায়ণে' বাহির হইতেছে তাহাও বিদ্বেষ প্রসূত বলিয়া লোকে মনে করিতেছে।'

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, 'লোকে যদি মনে করে ত' হলে আমি নাচার। অজিৎ চক্রবর্ত্তীর বই খানাতে অনেক ভুল আছে। সেগুলোর সংশোধন হওয়া দরকার বলিয়াই এই সমালেচনা প্রকাশিত হইতেছে।'

খানিকক্ষণ এইরূপ আলোচনা চলিল। জলযোগান্তে আমরা বিদায় হইলাম।

আর একদিন সকালে তাঁর বাড়ীতে গিয়া দেখি তিনি প্রফেসার নায়াড়ু নামক একজন মাদ্রাজী ব্যায়াম শিক্ষকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। লোকটি কলিকাতায় ব্যায়াম শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খুলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে বিলক্ষণ উৎসাহ দিয়া শেষে বলিলেন,—'আমি নিজে কিছুদিনের জন্য আপনার ছাত্র হইতে চাই। আমি বড় মোটা হইয়া পড়িতেছি, একটু মেদ কমাইয়া দিতে পারেন?'

লোকটি সোৎসাহে বলিল, 'আমার একটা chart আছে, তদনুসারে ব্যায়াম করিলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।'

তিনি বলিলেন, 'বেশ, আপনি আর একদিন আসিবেন। আপনার চাট্‌ ও ব্যায়াম পদ্ধতি কি রকম তাহা দেখিব।'

তাঁহার এই সঙ্কল্প সত্যই তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা আর জানিতে পারি নাই। কারণ যতদূর মনে পড়িতেছে ইহাই বোধ হয় তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

অল্পদিন পরেই সাহিত্য-ব্রজে তাঁহার বংশীধ্বনি নীরব হইল। মহত্তর কর্ত্তব্যের আহ্বান তাঁহার কর্ণে আসিয়া তাঁহাতে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' শৃঙ্খলিতা জননীর বন্ধন পাশ মোচন করিতে হইবে। আর কি ভোগ লালসার মোহাবরণে স্বীয় প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তিকে ঢাকিয়া রাখা যায়, আর কি কাব্যের কল্পনা বিলাসে মর্ম্মদাহী কঠোর সত্যকে ভুলিয়া থাকা চলে? বিভু-প্রেরিত সত্যের দূত আসিয়া তাঁহার কর্ণে ত্যাগের মন্ত্র, কর্ম্মের মন্ত্র ঢালিয়া দিয়াছে, 'চল, চল, শীঘ্র চল, ঐ যে কংশ কারাগারে তোমার মা কাঁদিতেছেন; সে কান্না কি শুনিতে পাইতেছ না?' তিনি সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া এই মন্ত্রদাতা অক্রূর দূতের সঙ্গে চলিলেন:—

তাঁহার এই জীবন সন্ধির কথা ছন্দে বলিতে গেলে বলিতে হয়—

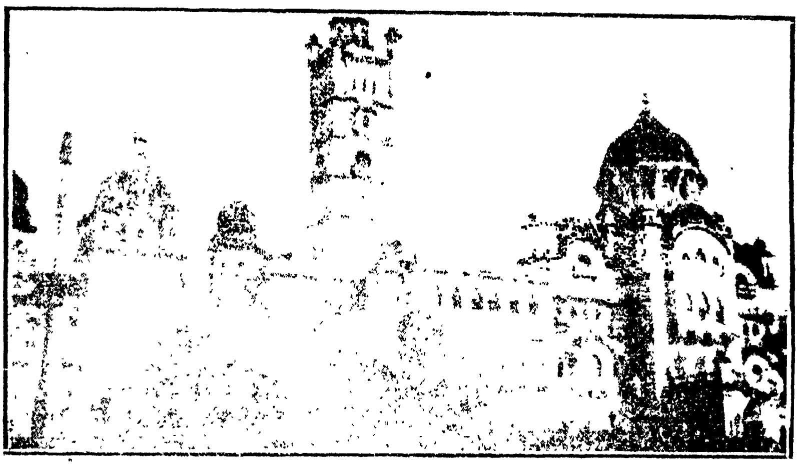
"কেমনে হেথায় রহি
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায় নিদেশ বহি'।
ডাকিছে সত্য বিষাণ বাদনে
জীবন মরণ—রণ-প্রাঙ্গণে,
ডাকে মথুরার কাতর কাকুতি আতুরের আঁখিলোর,
পাষাণ কারার আকুল রোদন
করিছে সুপ্ত তেজের বোধন,
ভাঙিতে হয়েছে 'রাগের' স্বপন—ফাগের রঙীন ঘোর,
মিছে আর আঁখি জল,
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টল মল।"

মায়াকুমারিগণের হাহাকারে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি ভিখারী বেশে বাহির হইলেন। কিন্তু অপূর্ব্ব মহিমার স্বর্ণমুকুট শিরে পরিয়া তিনি দেশবাসীর হৃদিরাজ্যের রাজা হইয়া বসিলেন। তারপর? তারপর সেই সেদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ত ভুলিবার নয়, যখন তিনি আমাদের জাতীয়রথের সারথিরূপে পাঞ্চজন্য নিনাদে সহস্র সহস্র মুক্তিকামীকে সমরাঙ্গনে আহ্বান করিয়া আনিলেন। আমরা, যাহারা তাঁহার সুখসম্পদের দিনে তাঁহার নর্ম্ম-সহচর ছিলাম, অনেকেই দূর হইতে তাঁহার গুরুগম্ভীর শঙ্খনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াছি মাত্র, তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। শুধু 'সম্ভ্রম ভরে আছিনু দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে'। যুদ্ধ শেষ না হইতেই তিনি কালের আহ্বানে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

বরদা দৃশ্যাবলী

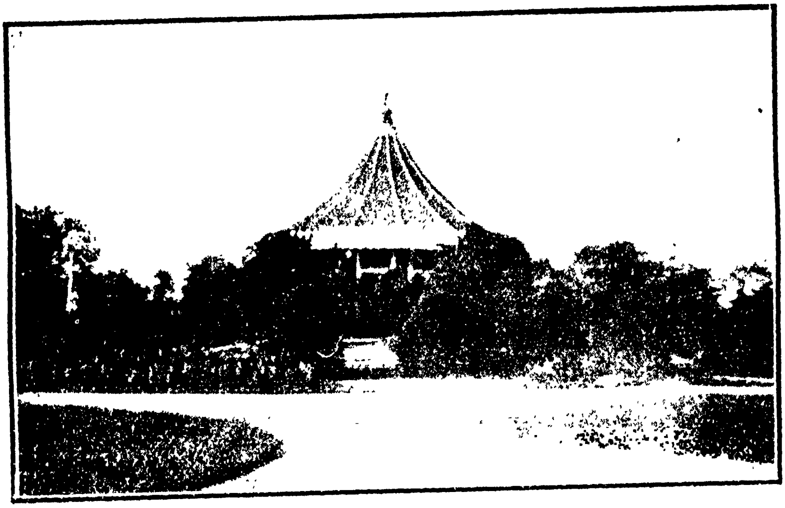
(কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে)



বরদা মহারাজের প্রধান প্রাসাদ



রাজকুমারের প্রাসাদ



ফুলবাগে-কুঞ্জ



ফুল বাগিচার দৃশ্য

মানুষেরা ধর্ম্মবুদ্ধি পাইল কোথায় ?

(প্রথম প্রস্তাব)

ইহা অসাধুতা উহা সাধুতা, এটা পাপ সেটা পুণ্য, একাজ অনুচিত সে কাজ উচিত, এবুদ্ধি ও বিচার মানুষের মনে কোথা হইতে আসিল ? মানুষে দেখে, এ বুদ্ধি ও বিচার শিশুদের মধ্যে গোড়ায় দেখা যায় না, আর শিশুরা বাপ মায়ের বা অন্য অভিভাবকদের কাছে উহা শিখিয়া বাড়িয়া ওঠে; তাই অনেকের মনে এটা বিশেষ রকমের সমস্যা বা খট্‌কা যে, যখন প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয়—যখন নূতন সৃষ্ট মানুষকে শিখাইবার মত মানুষ ছিল না, তখন শিশুর মত বুদ্ধির মানুষকে উচিত ও অনুচিতে প্রভেদ বুঝিবার বুদ্ধি দিয়াছিল কে ?

জীবন-বিজ্ঞান (Biology) ধরিয়া যতদিন এ সমস্যার আলোচনা হয় নাই, ততদিন সকল দেশের লোকেই নানা কল্পনায় এই হেঁয়ালির সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যতদিন মানুষের জ্ঞানে এই সত্য প্রকাশ পায় নাই, যে "প্রায় মানুষের" জীবের বংশে মানুষের উৎপত্তি, আর "প্রায়-মানুষদের" উৎপত্তি অন্য প্রাচীন জীব হইতে, ও সেই অন্য প্রাচীন জীব ও তাহাদের বংশ-কারক পূর্ব্ববর্ত্তী জীবেরা ধীরে ধীরে গোড়াকার আঠার মত সন্নিবিষ্ট জৈবনিক নামক পদার্থ হইতে বাড়িয়া উঠিয়াছে, ততদিন কিছুতেই মনে করিতে পারে নাই যে, আদি মানুষ পাকা বুদ্ধি না লইয়াও যৌবন-পুষ্ট শরীর না পাইয়া কিরূপে পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। কি যে মানুষের ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল, কি যে তাহার কর্ত্তব্য বা পরিহার্য্য, তাহা যদি মানুষের স্রষ্টা নিজে মানুষের সাথে সাথে ফিরিয়া না বুঝাইয়া থাকেন, তবে যে কোন উপায়ে আদি মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত, তাহা প্রাচীনকালে কেহ ভাবিতে পারে নাই। বিনা বীজে যখন গাছ হয় না, আর গাছ না থাকিলেও যখন বীজ হয় না, তখন প্রাচীনের অলিখিত ও লিখিত তর্কশাস্ত্রে, বীজ আগে না গাছ আগে লইয়া বিচার চলিয়াছিল; আর সকল হেঁয়ালির সমাধানে মানুষেরা ধরিয়া লইয়াছিল যে, বিশ্বের সকল পদার্থই এখন যেমন দেখিতে পাই, তেমনই আস্ত আস্ত ভাবে স্রষ্টা তাহাদিগকে গড়িয়াছিলেন, আর মানুষকে সর্ব্বশেষে নিজের মানস হইতে পূর্ণ যৌবন দিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কালের এই যে বিশ্বাস—আদিম মানুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্রষ্টাকে আস্ত মানুষের মত প্রত্যক্ষ দেখিত, আর পদে পদে স্রষ্টার নিষেধ বাণী শুনিয়া বিপদ এড়াইত ও নিদেশ পালিয়া সুখে বাঁচিত, তাহারই ফলে সৃষ্টির সর্ব্বাদি যুগটি সুখময় সত্যযুগ কল্পিত হইয়াছে, আর সত্যযুগে পালিত বলিয়া বিবেচিত বিধি নিষেধগুলি শাস্ত্রে বদ্ধ হইয়াছে মনে হওয়ায় পৃথিবীর সকল জাতিতেই অভ্রান্ত শাস্ত্র জন্মিয়াছে। একালে তুমি যদি স্পষ্ট বুঝিতে পার যে অমুক ব্যবহারে দোষ নাই অথবা অমুক খাদ্য খাইলে স্বাস্থ্যের হানি হয় না, তবুও অনেক প্রাচীন বিধি নিষেধ তোমার মাথার উপর

ঠিক্ ঠিক্ করিবে ও তোমাকে ইচ্ছামত কাজ করিতে দিবে না। তুমি যদি না বাণীর যুক্তিযুক্ততার প্রমাণ চাও, তবে হয় শুনিতে পাইবে—দিব্য জ্ঞানের প্রমাণ ধরা বুদ্ধির অতীত, আর না হয় কেহ তোমাকে টানিয়া বুনিয়া একটা জোড়াতালির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনাইবে। যাঁহারা ব্যাখ্যা শুনাইয়া থাকেন, তাঁহারা চালাকি করেন না; নিশ্চয়ই প্রাচীনের সকল বিধি-নিষেধ অভ্রান্ত—এই দৃঢ় বুদ্ধিতে মানুষকে সৎপথে রাখিবার উপায় করেন। এখানে এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে বহুযুগের অভিজ্ঞতায় মানুষ যাহা কল্যাণকর জানিয়াছে, কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারিলেই তাহা অকল্যাণকর হয় না। তবে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য বিধি-নিষেধ ধরিয়া না চলিয়া, মানুষের পক্ষে যে সুগম্য পথ ধরিয়া চলিবার উপায় আছে,—কেন যে সমাজে প্রচলিত অনেক রীতিনীতি বল্‌শেভিকি গোঁয়ারতামিতে উড়ান যায় না, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আঠার মত ঘন সন্নিবিষ্ট যে জৈবনিক পদার্থ জীবমাত্রেরই শরীরের ভিত্তি, তাহা যখন নিম্নতম জীবরূপে জলে বিচরণ করিতেছিল (আর এখনও করে), সে জীবে আত্মজ্ঞান ছিল না ও নাই, নিজের জাগ্রত ইচ্ছায় কিছু করিবার মত তাহার একটা মন ছিল না ও নাই। অতি সহজ প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখা যায়, যে ওই জীবের শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সে নড়ে-চড়ে, ও যাহা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে তাহার মধ্যে যাহা তাহার পুষ্টির উপযোগী খাদ্য, তাহা জীবের শরীরটি শুষিয়া লয়, আর যাহা তাহার পক্ষে বিষ, তাহার স্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া বিষকে পরিহার করে। এই নিম্নতম জীবে স্ত্রী পুরুষের ভেদ নাই; এক একটি জীব যখন খাদ্যের জোরে পুষ্ট হয়, তখন দুইভাগে তাহার শরীরটি ভাঙ্গিয়া আলাদা আলাদা হয়, ও দুইটিই আবার বাড়িয়া উঠিয়া ওইরূপে বংশ বৃদ্ধি করে। এখানে দেখা গেল যে, এই শ্রেণীর জীবের খাওয়ার কাজ হয় বিনা-বুদ্ধির রাসায়নিক আকর্ষণে, ও বংশবৃদ্ধি হয় শরীরে জাত বিনা-বুদ্ধির স্বাভাবিক ক্রিয়ায়।

কিরূপে ধাপে ধাপে ঐ আদি জীবের বংশে উন্নততর জীব ক্রমে ক্রমে জন্মিয়াছে, তাহার অল্পমাত্র পরিচয় দেওয়াও এখানে অসম্ভব। এই ক্রমবিকাশ বুঝাইবার মত বই বঙ্গভাষায় আছে কিনা জানিনা। যে জীবের মধ্যে দেখা যায় যে একই শরীর ভাগ হইয়া দুইটি জীব হয়, তাহাদের ক্রমবিকাশে জাত উন্নততর জীবের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ দেখা যায়, কিন্তু সে জীবেও আত্মবোধ বা ইচ্ছাশক্তি নাই। এই উন্নততর জীবেরাও খাইয়া থাকে শরীরের রাসায়নিক আকর্ষণে উপযোগী পদার্থের প্রতি টানে পড়িয়া, আর সেইরূপ রাসায়নিক আকর্ষণেই কিছু না বুঝিয়া স্ত্রী-পুরুষে জোড়া বাঁধে ও বংশ রক্ষা করে। অজ্ঞানে জীবেরা তাহাই খাইতে পাইত যাহা তাহাদের খাদ্য, ও তাহাই করিত যাহা তাহাদের নিজের রক্ষার ও বংশ রক্ষার সহায়। কাজেই বহু উন্নত জীবে যে সময়ে চৈতন্য ফুটিল, আত্ম-বোধ জাগিল, ও প্রবৃত্তির টানকে বুদ্ধির সঙ্গে জড়াইয়া নিজের "ইচ্ছা"রূপে পাইল, তখন সে জীবদের কি খাদ্য তাহা বুদ্ধির বলে ঠিক করিতে হয় নাই; পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে যাহা খাদ্য ছিল, তাহার অনেক পদার্থ ত স্বাভাবিকভাবে খাদ্য হইয়াছিলই, তাহা ছাড়া নূতন

শরীরের নূতন রাসায়নিক আকর্ষণেও নূতন খাদ্য পাইয়াছিল। একজন বড় মার্কিণ সাহিত্যিক বেশ মজা করিয়া তাঁহার একখানি বইয়ে লিখিয়াছেন, যে যদি একটি শিশু বালক ও শিশু বালিকাকে একটি নির্জ্জন দ্বীপের দুই দিকে দূরে দূরে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইত, তবে দেখা যাইত যে যৌবনের সীমায় আসিবামাত্র তাহারা দুইজন দুইজনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে ও হাতে হাত ধরিয়া বেড়াইতেছে ও প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছে।

মানুষেরা যে সকল পূর্ব্ববর্ত্তী জীবদের বংশের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়া মানুষ হইয়াছে, সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবদের সংস্কারে পাওয়া ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া খাদ্যপদার্থ, গোড়ায় মানুষদের খাদ্য হইয়াছিল। কাজেই মানুষের খাদ্য কি ও যৌনসম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য পরমেশ্বরকে আস্ত মানুষের মত রূপ লইয়া গুরু সাজিয়া আসিতে হয় নাই। বিধাতার সৃষ্টিপদ্ধতি এমন একটা সুশৃঙ্খল বাঁধা নিয়মে চলিয়াছে যে, জীববিশেষের কালোপযোগী অভাব দেখিয়া তাঁহাকে নূতন বুদ্ধি ফাঁদিয়া নূতন কাজ করিতে হয় নাই। যাঁহারা স্রষ্টার সৃষ্টির গৌরব বাড়াইবার অভিসন্ধিতে স্রষ্টাকে বারে বারে বিচলিত হইয়া কাজ করিবার ইতিহাস দেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বিধাতার গৌরবের হানি করিয়া তাঁহাকে বোকা সাজান। জৈবনিকের প্রাকৃতিক ধর্ম্মে ও টানে যে সকল কাজ চলিয়াছিল ও চলিতেছে, তাহা বুঝিলে ধর্ম্মের হানি হয় না। সৃষ্টি করিতে করিতে পদে পদে পরমেশ্বর সৃষ্টিতে দোষ দেখিতে পাইতেছেন,—মানুষের অবাধ্যতা দেখিয়া চমকিতেছেন,—পৃথিবীর উপরে দুষ্কৃতির ভার দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন, আর সেগুলি শোধরাইবার জন্য অবতার হইতেছেন, এসকল কথা কল্পনায় গড়িলে পরমেশ্বরকে করা হয় অতি ছোট জীব ও আহাম্মক। ক্রমবিকাশের তথ্যই ঈশ্বরের যথার্থ গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

জীবমাত্রেরই জীবনের উপাদান ও ভিত্তি জৈবনিক নামে সুসম্বদ্ধ পদার্থ; উহারই স্বাভাবিক প্রকৃতিতে ও ধর্ম্মে আমাদের সকল শ্রেণীর জীবলীলা ও ভাগ্য সম্পূর্ণ নিয়মিত ও শাসিত হইতেছে। আমাদের প্রবৃত্তি বলিতে যাহা কিছু আছে, চেতনা বলিতে যাহা কিছু বুঝি, ইচ্ছা-শক্তিরূপে যাহা অনুভব করি, সে সকলই জৈবনিকের লীলা। বর্ব্বর হোক্ বা সভ্য হোক্, সকল মানুষের সামাজিক ক্রিয়ার ও পাপ-পুণ্যের ইতিহাস খুঁজিতে হইলে জৈবনিকের অপরিহার্য্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে হয়। কিরূপে নানা শ্রেণার সামাজিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে ও মানুষের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগিয়াছে, তাহা জৈবনিকের প্রাকৃতিক টানের আলোচনা ছাড়া অন্য উপায়ে ধরা অসম্ভব। কি কাজ করা উচিত বা অনুচিত, তাহা বুঝিবার একমাত্র শাস্ত্র—জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য যাহা বৈজ্ঞানিকদের তপস্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

উৎপত্তির ইতিহাস ও জীবের মৌলিক প্রকৃতি—নামের প্রবন্ধ দুইটিতে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে আমাদের শরীর-মনের একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ জৈবনিকের প্রধান প্রকৃতি ও ধর্ম্ম এই, সে মরণ

এড়াইয়া বাঁচিতে চায় ও প্রসারিত হইতে চায়। এই যে স্বতন্ত্রভাবে আপনার স্থিতি রক্ষা করিবার প্রাকৃতিক টান বা প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা, উহাই আমাদের সকল লীলার মূলে। এইজন্য প্রত্যেক ইচ্ছাবিশিষ্ট প্রাণীর ইচ্ছা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। ইচ্ছা ও বিচারবিহীন বনের লতা, আপনার আশ্রয়ের পাত্র গাছটিকে চাপিয়া মারিয়া আপনার বৃদ্ধি ও প্রসার চায়; বিচারবিহীন মানুষের শিশু চেঁচাইয়া ও কাঁদিয়া যখন নিজের বৃদ্ধি চায়, তখন মায়ের বা অন্যের ক্লেশ বা অসুবিধা লক্ষ্য করে না,—যদিও মা ও অন্যেরা না থাকিলে তাহার বৃদ্ধি অসম্ভব। স্বার্থ রক্ষা করিবার যে প্রবৃত্তি, উহা অতি মৌলিক ও উহার বেগ সকল প্রবৃত্তির বেগ অপেক্ষা অধিক প্রবল। স্বার্থনাশ করিবার নামে যে একটা কথার ধুয়া আছে, উহা যে কিরূপ অসার ধর্ম্মদ্রোহী ধুয়া, আর যথার্থ পরার্থপরতা যে স্বার্থ-সেবারই নামান্তর মাত্র, তাহা ধীরে ধীরে পরে দেখিতে পাইব।

শিশু স্বার্থপর, কিন্তু শিশুর প্রতি তাহার মায়ের স্নেহ আত্মহারা; এই আত্মহারা স্নেহ অথবা পরসেবার জন্য নিগূঢ় অনুরাগ যখন মৌলিক স্বার্থপরতার অনুরূপ নয়, তখন ইহার প্রকৃতি গভীরভাবে বুঝিবার প্রয়োজন। মায়ের এই স্নেহের টান যে অতি নীচের স্তরের জীবের মধ্যেও দেখা যায়, যে জীবে আত্ম-চৈতন্য অথবা ইচ্ছাশক্তি নাই সে জীবেও দেখা যায়, তাহাই প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে। পশু তাহার শিশুকে দুধ খাওয়ায়, শিশুর গা চাটিয়া দেয় ও তাহাকে অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, কিন্তু নিজের ক্ষুধার সময়ে তাহার খাইবার জিনিষটি শিশু খাইতে আসিলে সে তাহার শিশুকে তাড়াইয়া দেয়। সন্তান প্রসবের সময়ে স্তনে দুধের সঞ্চার হয়, আর সেই দুধ শিশুকে দিয়া চোষাইয়া না নিলে মায়ের শরীরে উদ্বেগ ও অশান্তি জন্মে। ইচ্ছাশক্তি-বিহীন পশুরা কলের মত শরীরের এই উদ্বেগ মিটাইয়া শিশুকে দুধ খাওয়ায়; অর্থাৎ শিশু যখন রাসায়নিক আকর্ষণে মায়ের দুধ চোষে, পশু মা—তখন দুধ চোষাইয়া সুখী হয়।

স্নেহের ব্যবহারের অন্য কাজগুলির মূলে প্রাণীদের শরীরের 'এক প্রকার রসের ক্ষরণ আছে বলিয়া কিয়ৎপরিমাণে ধরিতে পারা গিয়াছে। পরীক্ষা হইয়াছে উচ্চ শ্রেণীর পশুর শরীরে ও অল্প পরিমাণে মানুষের শরীরে। সন্তান প্রসব আসন্ন হইবার সময় হইতে জননেন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত কোষ হইতে এক রকম নূতন রসের ক্ষরণ হইতে থাকে। শিশু সঞ্চারের সময়ে ও পূর্ব্বে ঐ কোষ হইতে যে শ্রেণীর রস বিশেষভাবে ক্ষরিত হয়, তাহা গর্ভ-পুষ্টির পর কোন কোন জীবের শরীরে একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ও অন্য জীবশরীরে প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, আর উহার পরিবর্ত্তে নূতন এক শ্রেণীর রসের ক্ষরণ হয়; খুব সম্ভব, সন্তান প্রসবের পর হইতে এই নূতন রসের ক্ষরণ অধিক হয়, ও শরীর গর্ভ ধারণ করিবার উপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নূতন রসের ক্ষরণ চলিতে থাকে। কোন পশুতে বা মানুষে যদি দেখা যায় যে তাহার সন্তান পালন করিবার ও সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হইবার পক্ষে বাধা ঘটিয়াছে, আর তখন যদি অন্যশরীর হইতে উক্ত বর্ণিত রস সেই পশুতে বা মানুষে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেখা যায় যে, পশু বা মানুষ-মায়ের রাক্ষসী ব্যবহার ঘুচিয়া সন্তান-স্নেহ

ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা হইলেই এই বর্ণিত রসের স্নেহ বর্দ্ধনের ক্ষমতা সুপরীক্ষিত হয়। ঠিক এই পথ ধরিয়াই অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু এখনও অস্বাভাবিক স্নেহবিমুখ জন্তুদের অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই পরীক্ষা বেশী অগ্রসর হয় নাই। তবে শরীরের কোন রসের সঞ্চারের ফলেই যে স্নেহপ্রবণতা জন্মে, তাহা অনেক পরোক্ষ প্রমাণে ধরা পড়ে। প্রথমে ত দেখা যায় যে আত্মবোধ প্রভৃতি যাহাদের নাই সে সকল জীবেও সন্তানকে কিছুদিন কাছে টানিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি থাকে ও নূতন সন্তান ধারণের সময় হইলে সেই আকর্ষণ চলিয়া যায়। তাহার পর দেখা গিয়াছে যে, ভ্রূণের ফুলের গায়ে এক রকম রস জন্মে, তাহা যদি কোন যৌবন পথে অগ্রসর কুমারীর শরীরে অনু প্রবেশ (inject) করা যায়, তবে স্তনে দুধ জন্মে, দুধ চোষাইবার প্রবৃত্তিও জন্মে ও একটুখানি বিশেষভাবে কুমারীর মন কচি শিশুর প্রতি বেশী স্নেহপ্রবণ হয়। এখানেও স্তনে দুধ সঞ্চার হইবার সময়ে জননেন্দ্রিয়ের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত অন্তর্ম্মুখী ইন্দ্রিয়ে (endochryne organএ) অল্প পরিমাণে রস ক্ষরণের পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পরীক্ষা এখনও সুস্পষ্ট না হইলেও নীচের স্তরের বহু জীবের দৃষ্টান্তে অসঙ্কোচে বলা চলে যে স্নেহের টান, শরীরের এক প্রকার ব্যগ্রভাব ও উদ্বেগ দূর করিবার ও আপনাকে শান্তিতে রাখিবার টান। স্নেহের রসের এই ব্যাখ্যায় কবিতার রস তেমন অধিক নাই, তবে কবিতার রসের নির্ঝর যখন অন্তর্ম্মুখী ইন্দ্রিয়ের রসের ধারায়, তখন এ রসের ইতিহাস উপেক্ষিত না হওয়া উচিত।

স্নেহের আকর্ষণ সম্বন্ধে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিয়াই মানুষের অন্যদিকের সামাজিক আকর্ষণের কথা বলিব; সেই প্রসঙ্গেই প্রেম ও স্নেহ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে।

মানুষের শিশুরা অন্যান্য জীব-জন্তুর শিশুদের মত অতি অল্প সময়েই স্বাধীন হইয়া চলিতে ফিরিতে পারে না,—অনেক বৎসর ধরিয়া অভিভাবকদের রক্ষণে ও পালনে বাড়িতে হয়। সকল জন্তুর পক্ষেই আপন শ্রেণীর জন্তুদের সঙ্গে অল্প বিস্তর দল বাঁধিয়া বাস করার প্রয়োজন আছে; এই প্রয়োজন মানুষের পক্ষে অতি অধিক। সংস্কৃত ভাষায় মানুষের মিলিত দলের নাম, **সমাজ** আর অন্য জন্তুদের দলের নাম **সমজ**; পশুদের "আকার" হীন সমজ মানুষের সমাজের তুলনায় সত্যই পূর্ণ আকারবিহীন, অর্থাৎ সুশৃঙ্খলায় বদ্ধ নয়।

শৈশব হইতেই মানুষের শিশু এই জ্ঞানে ও শিক্ষায় বাড়িয়া ওঠে, যে প্রতি পদে পরের সঙ্গ ও সাহায্য ছাড়া তাহার পক্ষে বৃদ্ধিলাভ ও সুখ-সুবিধা ভোগ অসম্ভব। নানা দৃষ্টান্ত দিয়া এই সোজা কথাটা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, যে ষোল আনা নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া বাড়িতে হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজন, যে সে পরকে বাঁচাইয়া চলে, অর্থাৎ পরের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলে। এখানে পরের স্বার্থ বজায় রাখিবার প্রবৃত্তি, সম্পূর্ণরূপে নিজের স্বার্থরক্ষার বুদ্ধিতে জন্মে; এখানে সুবিকসিত ও বিস্তৃত স্বার্থের নামই পরার্থপরতা। বহু যুগের অবিরত

অভ্যাসে এই শ্রেণীর পরার্থপরতা যখন সংজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তখন এই পরার্থপরতাকে স্বার্থ হইতে আলাদা বলিয়া মনে হইবে। এই দিক ধরিয়া অল্প একটু ভাবিলেই বোঝা যাইবে যে, মানুষের সমাজ যতই সংখ্যায় ও প্রসারে বাড়িতে পায় ততই সমাজের লোকেদের পক্ষে পরকে সহিবার ও পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া ওঠার সম্ভব হয়। অন্য দিকে যে সমাজ যত ছোট ও কোণঠেসা থাকিবে, নিজেদের সমাজের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ থাকিবে, যতই নিজেদের দলের সকলের সঙ্গে সমানে মেলামেশার বাধা থাকিবে, যতই নিজেদের দলকে প্রসারিত করিয়া পরের দল বা সমাজের সঙ্গে মিত্রতা ঘটাইবার বাধা থাকিবে, ততই পর-বাদ সহিবার ক্ষমতা ও পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি কম জাগিবে। এ অবস্থায় ঠিক ধরিতে পারা যায় যে, পরকে সহিবার ও উপকার করিবার প্রবৃত্তি কেতাবি উপদেশের মন্ত্র আওড়াইয়া অভ্যস্ত হয় না,—ঐ প্রবৃত্তি জাগে, বাড়ে ও সংজ্ঞাবদ্ধ হয় শুধু নানা মানুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্বার্থরক্ষা করিবার চেষ্টায়। সমাজবৃদ্ধির এই নিয়ম লক্ষ্য করিয়াই একদিন ফরাসী পণ্ডিত কোম্‌ৎ লিখিয়াছিলেন—Man grows more and more religious as his society goes on expanding. মানুষ যাহা ঠেকিয়া শেখে ও নিজের স্বার্থের টানে যাহা করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাই তাহার সংজ্ঞাবদ্ধ হয় ও অভ্যস্ত পুণ্য কর্ম্ম হইয়া চরিত্রে ফুটিয়া পড়ে।

সাধু প্রবৃত্তি সংজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মৌলিক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মত ফুটিবার কয়েকটি ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। ওড়িষা ও মধ্য প্রদেশের বনে ও পাহাড়ে এমন অনেক জাতি আছে, যাহারা একদিকে সংখ্যায় অল্প ও অন্যদিকে নিকটস্থ জাতির লোকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। এই সকল জাতির লোকদের মধ্যে ও সে অঞ্চলের অনেক হিন্দুজাতির লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিল আর দু-চারজন লোক মরিল, অমনি সমাজের অন্য লোকেরা একেবারে এক বন ছাড়িয়া অন্য বনে পালাইয়া গেল, আর যতদিন মৃত শবগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া না গেল ও বৃষ্টিতে স্থানটি ধুইয়া না গেল, ততদিন পলাতকেরা সে বনে বা গ্রামে ফিরিল না। যে সকল স্থানে লোকেরা কাছাকাছি ঘর বাঁধিয়া বাস করে, সেখানে একের ঘরে আগুন লাগিলে আর দশজন আসিয়া খুব যত্ন করিয়া আগুন নিবায়; নিজেদের ঘর বাঁচাইবার জন্য যে দশে মিলিয়া এ কাজ করে, তাহা স্পষ্টভাবে লোকদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

নিশ্চয়ই একদিন সকল সমাজেরই এই দশা ছিল। সমাজ সঙ্কীর্ণ না থাকিয়া যেখানে আটা-সাঁটা রকমে উহার প্রসার বাড়িয়াছে, সেখানে কি পদ্ধতিতে পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি স্থায়ী হইয়াছে, তাহা অল্প আয়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সংক্রামক রোগগ্রস্ত লোককে যদি যত্নে আলাদা না রাখা যায়, যদি রোগীর রোগকে বিনাশ না করা যায়, তবে রোগটি সকলকে অথবা অনেক লোককে যে সংহার করিতে পারে, তাহা অনেক লোকে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল। সেই জন্য গোড়ায় পরকে যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছিল ও রোগের মূল নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এক-

দিনের এই স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধির কাজ বহুদিন ধরিয়া সংজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর মানুষেরা নিজের কাজে স্বার্থের কোন গন্ধ বা সাড়া না পাইয়াই সর্ব্বসাধারণের জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকে। এখন দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির দিনে আমরা স্বার্থত্যাগের কথা বলি, ও অনেককে সাধারণ বিপদের সংবাদ পাইবামাত্র হিতৈষণার জোরে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখি ; ইহা যে স্বার্থে প্রবর্ত্তিত ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে সংজ্ঞাবদ্ধ সাধুতা, তাহা ধরিতে পারি না। গোড়ায় অ-আ, ক-খ চিনিয়া বই পড়িতে শিখি, কিন্তু পড়ার অভ্যাস পাকা হইলে মনে হয় না যে আমরা বর্ণমালা চিনিয়া ও জুড়িয়া বই পড়িতেছি।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ উন্নত না হইলে ও সকল প্রদেশগুলি একতায় গাঁথা না পড়িলে যে, কোন প্রদেশ বিশেষ উন্নত বা স্বাধীন হইতে পারে না, অর্থাৎ আমার একার অবাধ উন্নতির জন্য যে সারা ভারতের উন্নতির প্রয়োজন, ও আমাকে যে প্রাদেশিক না করিয়া ভারতবাসী করিবার প্রয়োজন, আমাদের মনে অল্প বিস্তর সে বোধ না জন্মিলে, অর্থাৎ দেশের কাজে যে প্রতিলোকের গভীর স্বার্থ আছে, তাহা খানিকটা অনুভব করিতে না পারিলে দেশের উন্নতির জন্য ব্যগ্রতা জন্মিতে পারে না। বড় বড় কথার মন্ত্র গাঁথিয়া যাঁহারা কংগ্রেস করেন, তাঁহারাই যখন এ সম্প্রদায় বা সে সম্প্রদায়ের স্বার্থের কোলাহল তোলেন, আমাদের বিহার বা আমাদের ওড়িষা বলিয়া অপরের সঙ্গে ঝগড়া করেন, তখন স্পষ্ট বুঝি যে আমাদের বিস্‌মোল্লায় গলদ আছে। ধোঁয়াটে কবিতায় ভাবের ক্ষণিক উত্তেজনা খাটাইয়া “বন্দে মাতরম্” মন্ত্র জপাইয়া কাহারও মনে দেশের কাজের জন্য খাঁটি অনুরাগ জন্মান অসম্ভব। মানুষ যদি খুব ঠাণ্ডা মাথায় আপনার স্বার্থ বুঝিয়া নিতে না পারে, তবে কোন কাজের দিকেই মনের স্থায়ী বেগ বাড়ে না। কবিতার বস্তু-নিরপেক্ষ কল্পনায়, অথবা দশের কোলাহলের দঙ্গলের উত্তেজনায়, অথবা পরের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধির ছট্‌পটানিতে মানুষ কখনও স্থির-বুদ্ধিতে স্থায়ী স্বার্থ বুঝিতে পারে না, আর স্বার্থের টান না জন্মিলে কখনও পাকা কাজ হইতে পারে না। স্বার্থের বুদ্ধিই যে খাঁটি কাজের বুদ্ধি, আর উহা যে গোলমালে হরিবোল দিয়া বাড়ে না, তাহা পরে পরে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে।

স্বার্থত্যাগ নামে যে একটা মধুর বাণী চলিত আছে, উহার মত অতি বড় মিথ্যা কথা অল্পই পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আপনার মুক্তির স্বার্থের বিচারে বুঝিয়াছে যে এই সংসারটা বিষের ভাঁড়, আর গায়ে ছাই মাখিয়া মন্ত্রবিশেষ জপ করিলেই খাঁটি স্বার্থ হাঁসিল হইবে, তখন তাহার সংসার ছাড়ার কাজে কোন ত্যাগ নাই ; তোমার চোখে যাহা ছাই-ভস্ম, তাহা ঐ লোকের বিচারে ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া ভাল নূতন কাপড় পরা। বাঁচিয়া যেখানে একজন মানুষের কাছে নিরন্তর জ্বালা ও ছট্‌পটানি ভোগ, সেখানে সে তৃপ্তি খুঁজিয়াই মরণে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সে অবস্থায় থাকা তোমার বিচারে সুখের, সে অবস্থা যাহার কাছে অসুখকর,—অথবা যে ব্যক্তি বিজনে আরাম লাভ অপেক্ষা দশজনের কাছে নাম পাইয়া যশস্বী হইবার জন্য অধিক লোলুপ, সে যখন তোমার বিচারের সুখের

ভোগ ছাড়ে, তখন তাহার কাজে "ত্যাগ" নাই,—"গ্রহণ"ই আছে। Victor Hugo রচিত Toilers of the sea গ্রন্থে একজন কাপ্তেনের চরিত্র আছে, যে কাপ্তেন আপনার দুষ্কৃতির দুর্নাম ডুবাইয়া মরণের পর যশস্বী হইবার লোভে ছল করিয়া জাহাজ ডুবাইয়া মরিয়াছিল। মানুষ তৃপ্তি পাইতেছে স্বার্থের সাধনায়, স্বার্থত্যাগ করিয়া নয়। স্বার্থের টান মানুষের জীবন-ধাতুর মৌলিক টান; প্রত্যক্ষ হোক্ অপ্রত্যক্ষ হোক্, ঐ টানেই আমাদের সামাজিক স্থিতি চলিয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ছিটে-ফোঁটা

দুজনে

বহিতেছে দেশে নূতন বাতাস!
এখনও বসিয়া দাওয়াতে!
ছাড় বিলাসের জুতা, মোজা, টুপি,—
শুয়ে পড় এই হাওয়াতে।

"ছি-ছি, একি কথা কহিলে বন্ধু!
যে-সে কথা নিয়ে তামাসা!
একালে এখন শুইলে বাহিরে
হ'তে পারে ঘোর আমাশা।"

* * *

ত্যাগ

চাইনা এ বিভূষণ,—আমি বিংশ শতাব্দীর নারী!
নিয়ে যাও অলঙ্কার,—এযে গিল্টি, চিনিতে তা পারি।

* * *

সত্যবাদী

পুলিস—উড়ায়ে নিজের অর্থ কি করিয়া খাও? তুমি চোর!
সত্যবাদী—করিয়াছি স্বার্থনাশ,—পরার্থের পরে দৃষ্টি মোর।

* * *

প্রার্থনা ও উত্তর

প্রার্থনা পত্র—আমি মহাশয়ের আশ্রিত,—অভাবের সময় কিছু চাই ; চাই—ভাত, কাপড় ও কিছু পয়সা।

পত্রের উত্তর—আমার ঘরে ভাত, কাপড় ও পয়সা নাই ; ভাত নাই,—রুটি ও লুচি খাই, কাপড় নাই,—কোট-পেন্টেলুন পরি, আর পয়সা নাই—আছে রূপার টাকা ও গিনি মোহর।

প্রার্থনা—অভাবের দিনে আমাকে ভাল-মন্দ যাহা কিছু হয় দিবেন।

উত্তর—যাহা মন্দ অর্থাৎ অধম, তাহা কাহাকেও দিতে পারি না ; দিতে পারি—উত্তম-মধ্যম।

প্রার্থনা—এই পূজার সময় আমাকে কিছু না দিলেই নয়, কেননা দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে।

উত্তর—পূজার সময় কিছু দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু দেখিতেছি এটা তোমার পূজার সময় নয়,—বিসর্জ্জনের সময়।

প্রার্থনা—মা-ঠাকুরাণীর বড় অসুখ, আর স্ত্রীও বড় রুগ্ন।

উত্তর—শ্রাদ্ধে খরচ-পত্র করিও না ও আর বিবাহ করিও না।

রামগোপাল ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কলিকাতা ময়দানে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি ও ভারতবর্ষীয় ডেমস্থিনিস

লর্ড হার্ডিঞ্জ সম্বন্ধে ডিরেক্টাররা যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। দেশ-বাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি যে দেশবাসীর মঙ্গলেচ্ছু তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ভারতবাসী উপকৃত হইলে তাহা কখনও বিস্মৃত হয় না। রামগোপাল বলিয়াছিলেন, "I can bear the indifference of a pretended friend, I can bear the harshness of a superior, but I cannot bear the thought of being called ungrateful. All the amiable and kindly feelings of human nature would be undermined and ultimately destroyed, if we should fail to cherish a sense of our obligations to those who have laboured earnestly though unsucessfully for our benefit."

লর্ড হার্ডিঞ্জের বিদায় উপলক্ষে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতাবাসীর একটি

সাধারণ সভা হয়। তাঁহাকে বিদায়কালীন অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে কিনা সেই সভায় নির্ব্বাচিত হয় এবং দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন তাহার প্রতিষ্ঠা কল্পে কিরূপ ব্যক্তিগত স্মৃতি রক্ষিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচিত হয়। সার টমাস টার্টন (Sir Thomas Turton) একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, তাহা গৃহীত হউক, রসময় দত্ত তাহা সমর্থন করেন। এই সময়ে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে এই সভার এই অবস্থায় তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, দেশীয় সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কয় পংক্তি উক্ত অভিন্দন পত্রে সন্নিবেশিত হউক। তিনি বলেন যে, সভা সমাহূত করিবার জন্য সেরিফের নিকট যে আবেদন হয় তাহাতে একটীমাত্র দেশীয়ের সহি ছিল। তাহার কারণ দেশীয়েরা সম্যকরূপে এ সভার বিষয় জানিতে পারে নাই। কেহ কেহ নাকি এরূপ অনুমান করিয়াছে যে, লাহোরের গভর্ণমেণ্ট হিন্দু ছিল বলিয়া, কলিকাতার হিন্দু অধিবাসী পাঞ্জাব বিজয়ে সুখী নহে। কিন্তু ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহারা ভারত গভর্ণমেণ্টকে তাহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাঁহার বিশ্বাস যে শীঘ্রই এরূপ প্রণালী সঙ্ঘটিত হইবে যাহাতে তাহাদের সহিত আদৌ কোন পার্থক্য থাকিবে না। যাহা হউক তিনি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক কয় পংক্তি পড়িবার জন্য প্রস্তাব করেন। তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজী নয়, সুতরাং তাঁহার ইংরাজীতে যদি ভাষাগত দোষ হয়, তজ্জন্য তিনি প্রস্তাবটির লিপিকৌশলের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। কিন্তু অভিনন্দন পত্রের সুন্দর ও সুললিত ভাষায় তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রবর্ত্তক টার্টনকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন। এই সময়ে হিউম আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, অভিনন্দন পত্রে যেরূপ আছে, তাহা বদলাইবার কোন আবশ্যক নাই। রেভারেণ্ড ভদ্রলোকটি অভিনন্দন পত্রের আদ্য ও শেষ উভয়ই ঠিক ধরিতে পারেন নাই। অল্প কথায় অভিনন্দন পত্র মধ্যে সমস্ত ভাবই সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হইতে থাকে। "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের রিপোর্টে প্রকাশ যে, রামগোপাল উঠিয়া বক্তৃতা না করিলে বোধ হয় সারারাত্রিতেও এ আলোচনার মীমাংসা হইত না। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমোহনের প্রস্তাবটি যদি যথাযথ গৃহীত না হয়, তবে এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লর্ড হার্ডিঞ্জ যে ভারতবাসীর ভিতর শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি যে ভারতবন্ধু সে চরিত্র যেন এই অভিনন্দন পত্রে প্রকাশিত হয়। Peace making (শান্তি সংস্থাপক) এই একটী কথার মধ্যে সব আখ্যাই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে ইহা বলিতে উত্তম বটে, কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করেন জাতীয় শিক্ষা, রাজবর্ত্মের উন্নতি, খালাদি খনন প্রভৃতি সভ্যতা বিস্তারের কারণগুলি কি সকলই একটিমাত্র গুণজ্ঞাপক কথার তুলনায় খর্ব্ব হইয়া যাইবে বলিয়া উহা ব্যবহৃত হইয়াছে? সংক্ষিপ্ত ভাষা বুদ্ধির পরিচায়ক বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে ভাষাকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলা হইয়াছে, ইহা চলিবে না। ইহার পর সভাস্থ সকলে তাঁহার

অনুমোদন করেন। কলভিল বলেন যে, এ বক্তৃতার পর অভিনন্দন পত্র লইয়া বাদানুবাদ করা চলে না। তিনি উহার বাচনিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেন।

সেই সভাতে লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতি রক্ষার জন্য এবার একখানি ধাতুফলক ও টাউনহলে রাখিবার জন্য একখানি তৈলমূর্ত্তির প্রস্তাব করেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ উইলসন তখন পীড়িত, তিনি এ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, অন্যান্য বড়লাটের ন্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জ সত্রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন ও পাঞ্জাবে সাম্রাজ্য বিস্তারে যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত মঙ্গদানে তাঁহারও ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তদুদ্দেশ্যে স্বয়ং দুই সহস্র মুদ্রা চাঁদা প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ প্রস্তাব কেহই উত্থাপন করেন নাই। উপরন্তু টার্টন উল্লিখিত প্রস্তাব প্রবর্ত্তন করেন। রামগোপাল তাহাতে আপত্তি করিয়া সংক্ষেপে বলেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের অপেক্ষা যে উত্তম বড়লাট আর ভারতবর্ষে আসেন নাই, তাহা নহে, তবে তিনি যে (দেশের) শুভাকাঙ্ক্ষী বড়লাট এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ধাতব মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব লইয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারা যায় না। বিশেষতঃ লর্ড বিশপ যেরূপ বদান্যতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ধাতবমূর্ত্তির প্রস্তাব করিতে তিনি ভরসা করেন এবং টার্টনের প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া বলেন "And surely a mere piece of plate and picture are not enough."

টার্টন বলেন যে পাঞ্জাব বিজয়ের জন্য ডিরেক্টরেরা অচিরে লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য শতদ্রু স্তম্ভ (Sutlej column) স্থাপন করিবেন, সুতরাং ভারতবর্ষে একই কারণে দুটি স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করা অনাবশ্যক। এই সূত্রে তিনি পূর্ব্ব দুইটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, এরূপ স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হউক যাহাতে এ দেশবাসীর স্মৃতিপথে বড়লাট বিরাজিত থাকেন; অপরটি যাহাতে বড়লাটের মন হইতে এদেশবাসী বিস্মৃত না হন এবং বলেন যে, এমন কিছু নিদর্শন লাট সাহেবের সহিত দেওয়া হউক যাহা তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার বন্ধুগণকে দেখাইতে পারেন। সেইজন্য এখানে রাখিবার জন্য ধাতুফলকই যথেষ্ট। রামগোপাল বলেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতিরক্ষার জন্য ধাতুফলক যথেষ্ট নহে। বড়লাটের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত যে শতদ্রুস্তম্ভ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রভুরা গুণের আদর করিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় সম্প্রদায়ের ভক্তি, সম্মান ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক স্মৃতিচিহ্নের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের সে ভাব লর্ড হার্ডিঞ্জের মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। লর্ড ড্যালহাউসির ভ্রাতা কর্ণেল র‍্যামজে (Colonel Ramsay) তাঁহাকে সমর্থন করেন।

ইহার পর হস্তোত্তলন দ্বারা প্রস্তাবের সম্মতি ও অসম্মতি নির্দ্ধারিত হয়। এই সময় একজন বলেন সভাটি বিভক্ত হইয়া ইহা নির্দ্ধারিত হউক। তখন এ প্রস্তাবে যাহারা সম্মত

তাহারা উঠিয়া হলের একদিকে দণ্ডায়মান হইল ও অপর দল অন্যদিকে সমবেত হইল। এইরূপে বৃহত্তর জনমণ্ডলী রামগোপালের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কলিকাতার ময়দানে লর্ড হার্ডিঞ্জের যে দণ্ডায়মান ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা রামগোপালের এই চেষ্টার ফল। পরদিন ইংলিশম্যান পত্র লিখিলেন যে, ভারতে একজন ডেমস্থিনিস দেখা গিয়াছে, একজন বাঙ্গালী যুবক তিনজন সুদক্ষ ইংরাজ ব্যারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছেন।

রামগোপাল, সি, এচ, কেমিরন (Cameron), বুসবি (Bushby), কলভিন, মেজর বায়গ্রেভ (Bygrave), রসময় দত্ত ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বড়লাটের মূর্ত্তি-কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন ও পরে রামগোপাল ও এফ, জে ময়াট (Mouat) উভয়ে উক্ত কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। সেই দিনকার সভায় প্রায় ছয় কি সাত সহস্র মুদ্রা চাঁদা উঠিয়াছিল। রামগোপাল কত চাঁদা দিয়াছিলেন তাহা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে শুনিয়াছি বিশপের চাঁদারই অনুরূপ।

কলিকাতায় ব্যবসার দুর্ব্বৎসর

পর বৎসর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হয়। ২২শে জানুয়ারি এই ব্যাঙ্কের হিসাব মিটাইবার নিমিত্ত যে একজেকিউটিভ কমিটি গঠিত হয় তাহাতে সি, জে, রিচার্ডস প্রস্তাব করেন এবং ডবলিউ, ডি, শ সমর্থন করেন যে, রামগোপাল, জন আলেন, এচ্, কাউই, টি, এস, চেলসেন ও প্রবর্ত্তক ইহা-দিগকে অনুরোধ করা হউক যে, তাঁহারা পাওনাদারদিগের পক্ষ হইতে কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন্।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী জীবনে একটি জাতীয় অনুষ্ঠান। ইহার অধিকাংশ শেয়ারহোল্ডার বাঙ্গালী ছিলেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, বাঙ্গালীর বিস্তর অর্থ নষ্ট হইয়াছিল, অনেক বিধবা ও অনাথা তাহাদের শেষ সম্বল এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেককে পথের কাঙ্গাল হইতে হইয়াছিল সুতরাং ইহা জাতীয় দুর্ঘটনা বলিয়া ইহার একটি বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। সেই বৎসর ব্যবসায়ীর সাধারণ দুর্ব্বৎসর।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালের সনন্দে পর বৎসর হইতে ইউরোপীয়ানদিগকে ভারতবর্ষে ব্যবসা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, ইহার পূর্ব্বে কেবলমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এখানে ব্যবসা করিবার এক-চেটিয়া অধিকার ছিল। এতদিন ইউরোপীয়ানরা কোম্পানীর অনুমতি লইয়া ভারতবর্ষে শুধু অধিবাস করিতে পারিতেন ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা কোম্পানীর ব্যবসায়ে কর্ম্মচারীর ন্যায় কার্য্য করিতেন। শুধু বেতনের পরিবর্ত্তে কার্য্যের হিসাবে কমিশন পাইতেন সুতরাং তখনকার এই সব ব্যবসায়ীর ব্যবসা করিবার অধিকার একান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ব্যবসা করিবার

অধিকার পাইয়া লাভের আশায় বাণিজ্যের পরিধি এতদূর বাড়াইলেন যে তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মূলধনের অপেক্ষা ক্রয়-বিক্রয় এত অধিক আরম্ভ হইল, যে সাধারণ লোক তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিল। গত চারি বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় পামার অ্যালেকজাণ্ডার ম্যাকিনটস্, কলভিন, ফারগুসন প্রভৃতি ও বোম্বায়ের খ্যাতনামা তিন চারিটি কোম্পানীর ব্যবসা উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল। এই ব্যবসায়ীদিগের দেনা সর্ব্বসমেত প্রায় সাড়ে চারিকোটি মুদ্রা। বাজারে এই মুদ্রার অভাব অনেক ব্যবসায়ীই বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিল। ইহার ফলে অচিরে আরও কতকগুলি ব্যবসায়ীকে কার্য্য বন্ধ করিতে হইল। দেশে এইরূপে এত অর্থের অনাটন হইয়া উঠিল যে, রেলওয়ে, পূর্ত্তকার্য্য ও সাধারণের হিতকর আরও অনেক কার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়। এই অবস্থায় ইউনিয়নব্যাঙ্ক কার্য্য বন্ধ করে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ব্যাঙ্কটির প্রতিষ্ঠায় বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। প্রারম্ভে ইহার চারিজন ডিরেক্টারই ইংরাজ ছিলেন, কেবল তিনজন ট্রাষ্টীর মধ্যে একজন বাঙ্গালী ট্রষ্টী নিযুক্ত হন। সনন্দ দ্বারা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক আধা কোম্পানীর ব্যাঙ্ক মধ্যে পরিগণিত হইতে থাকে, সে কারণ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিত না, সেই সকল কার্য্যের জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহাই একমাত্র প্রাইভেট ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান ছিল। কমারস্যাল ব্যাঙ্ক, কলিকাতা ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্থান তখন কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল। কলিকাতার প্রধান প্রধান সওদাগরী হাউসের কর্ত্তাদিগের মধ্য হইতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হয়। সিভিল বা মিলিটারি সার্ভিসের কোন ব্যক্তির ব্যাঙ্ক পরিচালন করিবার অধিকার ছিল না, সেই জন্য উহাদের মধ্যে কেহ ইহার কর্ম্মকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হন নাই। অন্যান্য ব্যাঙ্কের ন্যায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কেরও নোট বাজারে প্রচলিত ছিল। প্রাপ্ত মূলধনের এক চতুর্থভাগ মূল্যের কাগজের নোট ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের নামে বাজারে চলিতে পারিত কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে এই ব্যাঙ্কের নোট গৃহীত হইত না বলিয়া, ছয় লক্ষ মুদ্রা মূল্যের অধিক নোট বাজারে ছাড়া হইত না। ১৫ লক্ষ সিক্কা (অর্থাৎ ১৬ লক্ষ কোম্পানীর) মুদ্রা মূলধন লইয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক আসরে অবতীর্ণ হয়। ২৫০০৲ শত মুদ্রা মূল্যের ছয়শত শেয়ারে ইহা বিভক্ত হইয়াছিল। হাজার-খানি শেয়ার বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু ছয়বৎসরে ছয়শত শেয়ার মাত্র বিক্রয় হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যাঙ্কে গোলমালের সূত্রপাত হয় ইহার অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট সিম নামক এক ব্যক্তি বিস্তর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ পায়। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টেণ্ট হেন্ হেণ্ডরসনের ন্যায় সিমেরও নিজনামে কাজ করিবার অধিকার ছিল। তাহার জুয়াচুরির পর এ পদ্ধতি বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে সিঙ্গাপুরে এজেন্সি খুলিয়া কাজ আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে সাতলক্ষ মুদ্রার নোট বাজারে চলিতে থাকে। এই সময় এই ব্যাঙ্কের মূলধন বর্দ্ধিত হইয়া এককোটি মুদ্রা হইয়া উঠে ; কিরূপে এই মূলধন লাভজনকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে ডিরেক্টারেরা

চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ইহাই হইল সর্ব্বনাশের মূল। ইহার পরই নীলকরদিগের কুঠির পাটাপত্র রাখিয়া ও বার্ষিক আদায়ের উপর এবং স্কচ প্রথামত ব্যক্তিগত জামিনে ধার দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অদৃষ্টের এমনই উপহাস যে, যে নীলকরদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, বাঙ্গালীই যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তাহাদিগকে সেই কার্য্যে সহায়তা করিতেছিল। ইহার পর দুইটি হাউস কার্য্য বন্ধ করে আর সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কের ৬০ লক্ষ মুদ্রা মূলধন ডুবিয়া যায়। আরও অন্যান্য কার্য্যে এইরূপে সমস্ত মূলধন নষ্ট হইয়া যায়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কার্য্য বন্ধ করে। পরে প্রকাশ পায় যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া শেয়ারহোল্ডার দিগকে যে লভ্যাংশ (Dividend) দেওয়া হইতেছিল, তাহা আয়ের উপর নহে—তখনও বিশ্বাস করিয়া যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতেছিল সেই মূলধন হইতে। যে সকল হাউস হইতে ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই সকল হাউসই ব্যাঙ্কের টাকা লইয়া নিজেদের ব্যবসা চালাইয়া ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিয়াসটিক্যাল রেজিষ্ট্রার (Ecclesiastical Registrar) সার টমাস টার্টন ও মাষ্টার অফ দি একুইটি (Master of the Equity) গ্র্যাণ্ট উভয়েই কোর্টের টাকা লইয়া এই ব্যাঙ্কে স্পেকুলেসন (speculation) করেন। ফলে টার্টনকে দেউলিয়া হইয়া কারাবাস করিতে হয়, আর গ্র্যাণ্টের কর্ম্মচ্যুতি হয়। টার্টন সম্বন্ধে লর্ড ড্যালহাউসি লিখিয়াছিলেন যে, বড়ই দুঃখের বিষয় যে তিনি বিধবা ও অনাথদিগের সর্ব্বস্বাপহারী এই দস্যুকে বট্যানি বের (Botany Bay)* অপরাধী উপনিবেশে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ঘটনা কলিকাতা সমাজকে একটি বিষাদ ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ইহাই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শোচনীয় ইতিহাস।

রামগোপাল দেখিয়াছিলেন এরূপ ক্ষেত্রে ন্যায়-অনুমোদিত কোন মীমাংসায় আসা অসম্ভব। তিনি পাওনাদারদিগের পক্ষ হইতে কমিটিতে বসিতে অসম্মত হন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

---

* এক্ষণে New south wales বলিয়া খ্যাত

পুস্তক-পরিচয়

Asoka (Calcutta University, Carmichael Lectures, 1923) by Dr. D. R. Bhandarkar M. A, Ph. D., Carmichael Professor of Ancient Indian History and Culture—পৃথিবীর ইতিহাসে মৌর্য্যরাজ অশোকের কীর্ত্তিকাহিনী অতি অপূর্ব্ব। এসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ দেবদত্ত ভাণ্ডারকার মহাশয়ের প্রণীত এই পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গ্রন্থখানির বিশেষ গৌরব এই, ইহাতে অশোক সম্বন্ধে এমন কোন কথা লিখিত হয় নাই যাহার প্রস্তর লিপিগুলি সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হইতে পারে না। প্রস্তরলিপিগুলি বহুবার বহু পণ্ডিত পড়িয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই ডাঃ ভাণ্ডারকারের ব্যাখ্যার মত সংযত ও নিপুণ বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। পুণ্যকীর্ত্তি অশোক সম্বন্ধে এমন কোন কথা নাই, যাহা এই সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার গ্রন্থখানিতে দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থকারের ধীরতা, পাণ্ডিত্য ও বিচারপটুতা অতি প্রশংসনীয়।

Evolution of Law by Dr. Nareshchandra Sengupta, M. A., D. L., (1925)—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের জন্য যে সারগর্ভ ও উপাদেয় প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। জর্ম্মাণিতে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ ছাড়া এ পর্য্যন্ত সমাজ তত্ত্বের তথ্য ধরিয়া আইনের উৎপত্তি ও বিকাশের অন্য কোন গ্রন্থ পড়ি নাই। সমাজের ক্রমবিকাশ ধরিয়া আইনের উৎপত্তির বিচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি; ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানিকে সকল শ্রেণীর লোকের সুপাঠ্য করিয়াছেন। এ গ্রন্থে আইনের বিকাশের বিচারে বহু তথ্যের অতি দক্ষ সমালোচনা আছে।

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ প্রণীত। ১২৬ পৃঃ, মূল্য এক টাকা।

সংস্কৃতে যাঁহাদের জ্ঞান তেমন অধিক নয়, অথচ মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশের সহিত পরিচয় লাভ করিতে চান, তাঁহাদের নিকটে ঐ দেবীমাহাত্ম্যের এই পদ্যানুবাদ আদৃত হইবে আশা করি। অনুবাদ সরল ও সুপাঠ্য।

শব্দ—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। ১২৮ পৃঃ, মূল্য এক টাকা।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সাধারণ পাঠকশ্রেণীকে শিখাইবার জন্য গ্রন্থকার এ পর্য্যন্ত অনেক পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; এই 'শব্দ' গ্রন্থখানি তাঁহার খ্যাতির অনুরূপই হইয়াছে। ভাষা ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি সরল ও সুবোধ্য।

ভক্তিকথা—বাবাজী শ্রীপদ্মচরণ দাস কৃত উড়িয়া ভক্তিকথা নামক গ্রন্থ হইতে রাণী শ্রীমতী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী কর্তৃক বাঙ্গলায় অনুদিত ও প্রকাশিত। ৩৭৭ পৃঃ, মূল্য দেড় টাকা।

ওড়িষার ঢেঙ্কানল রাজ্যের রাণী বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থখানি লিখিয়া আমাদের আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন ও আমাদের বিশেষ সম্মানের পাত্রী হইয়াছেন। ওড়িষার ভক্তদের লেখা অনেকের কৌতূহলের সামগ্রী হইবে, মনে করি।

শব্দার্থসম্বন্ধ

প্রাচীন গ্রীসদেশেও শব্দতত্ত্বসম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুশীলন হইয়াছিল। হিরাক্লিটাস্, ডিমোক্রিটাস্, প্ল্যাটো ও আরিষ্টটাল প্রভৃতি চিন্তাশীল দার্শনিকগণ শব্দের উৎপত্তি এবং শব্দার্থসম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রভূত গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। কণ্ঠতালু প্রভৃতি বর্ণোচ্চারণস্থানসমূহের সামান্য ব্যাপারের দ্বারা কেমন করিয়া ধ্বনির উদ্গম হয়, এবং কেমন করিয়াই বা সেই উচ্চারিত ধ্বনিসকল নানাপ্রকার অর্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে, তাহা আমাদের গভীর চিন্তার বিষয় না হইলেও প্রাচীনযুগের তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উচ্চারণের পরক্ষণে মহাকাশে বিলীন হওয়াই যাহার স্বভাব, সেই ধ্বনির মধ্যে এমন কি শক্তি নিহিত আছে যাহাদ্বারা যখনই সেই ধ্বনিটি উচ্চারিত এবং শ্রুতিগোচর হয়, তখনই একটি নিয়ত অর্থের জ্ঞান জন্মাইতে পারে? যখনই 'গো' শব্দটি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই "গলকম্বলাদিবিশিষ্ট" প্রাণিবিশেষের বোধ হয়; "ঘট" শব্দটী শ্রবণমাত্রেই "কম্বুগ্রীবাদি বিশিষ্ট মৃণ্ময় পাত্রবিশেষের" জ্ঞান হয়। এই প্রকারে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক শব্দের সহিত তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের বাচ্য-বাচকভাবে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে।

অর্থপ্রকাশের জন্যই আমরা শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকি (১)। একজনের মনের ভাব অন্যের নিকট অভিব্যক্ত করাই শব্দব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু শব্দের সহিত অর্থের যদি স্বভাবতঃ কোন সম্বন্ধ না থাকে, এবং শব্দ যদি মনুষ্যসমাজের কল্পিত একটি কৃত্রিম সঙ্কেত (arbitrary marks) বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে প্রশ্ন হইবে যে, কেমন করিয়া শব্দরাশি তাহাদের স্ব স্ব অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ হইয়া থাকে। হিরাক্লিটাসের মতে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক—অর্থাৎ বাচকশব্দের বাচ্যপদার্থের বোধ জন্মাইবার স্বরূপতঃই যোগ্যতা আছে। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে ভারতীয় শাব্দিকগণের সিদ্ধান্তের সহিত এই মতের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ডিমোক্রীটাসের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তাঁহার মতে মানুষই শব্দসৃষ্টির কর্ত্তা, এবং মনুষ্যকৃত সঙ্কেতের (Convention) দ্বারাই শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। মানুষ স্বীয়শক্তি বলে শব্দ সৃষ্টি করে এবং লোক সম্মতিক্রমে তাহাতে ইষ্টার্থ যোগ করিয়া ব্যবহার করে। দার্শনিকপ্রবর অরিষ্টটাল এই শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শব্দের স্বাভাবিক উৎপত্তি বিষয়ে (Natural orgin of language) বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিয়া ভাষাকে ভাবাভিব্যক্তির অনুকূল কৃত্রিম উপায় বা সঙ্কেত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদীয় মতানুসারে শব্দের বস্তুতঃ নিজের কোনও অর্থ নাই; অর্থহীন বর্ণাবয়বের দ্বারা শব্দসকল স্থূলাকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। উচ্চারণকারীর ঈপ্সিত

---

১ অর্থগত্যর্থঃ শব্দপ্রয়োগঃ। অর্থং সংপ্রত্যায়য়িষ্যামীতি শব্দঃ প্রযুজ্যতে।—মহাভাষ্য।

অর্থের একটি কৃত্রিম সঙ্কেত ভিন্ন শব্দ আর কিছুই নয়। Talegraphic Code যেমন স্বরূপতঃ অর্থহীন হইয়াও কল্পিত অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ হয়, সেইরূপ নিরর্থক হইলেও বক্তার ইচ্ছানুসারে শব্দসকল অর্থপ্রতিপাদক সঙ্কেত (convention) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরর্থক শব্দগুলি নির্দ্দিষ্ট অর্থের সঙ্কেতরূপে (convention) প্রযুক্ত হইয়া অর্থবান্ হয়।

এই মতের সারবত্তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই মনে করিতে হইবে যে ভাষাসৃষ্টির পূর্ব্বে একদিন মনুষ্য সমাজ একত্রিত হইয়া কোন ধ্বনির দ্বারা কোন অর্থ অবধারণ করিতে হইবে তাহা সকলের সম্মতিক্রমে নিশ্চয় করিয়াছিল। অর্থাৎ স্বয়ং বা স্বরূপতঃ নিরর্থক হইলেও শব্দরূপ সঙ্কেতগুলিতে মনুষ্য সমাজই অর্থ-যোজনা করিয়া দিয়াছিল এবং সেই অবধি সেই সেই সঙ্কেত সমূহ (conveniton) নির্দ্দিষ্ট অর্থের প্রতিপাদকরূপে চিরদিন প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা মনুষ্যসমাজের এইরূপ একটি চিত্র মনে আঁকিতে পারি না। অর্থ প্রকাশের অনুকূল শব্দব্যবহারের সামর্থ্য লইয়াই মানুষ ধরিত্রীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অনাদিকাল প্রবাহ হইতেই মানুষ শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। মানুষ একসময়ে মূক ছিল, তাহার পর হঠাৎ একদিন বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া শব্দের সহিত অর্থের যোগ করিয়া ভাষার সৃষ্টি করিল—ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য এবং কল্পনার অতীত। পক্ষান্তরে, শব্দের সহিত অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, 'ঘট' শব্দ উচ্চারণ করিলে পটের প্রতীতি যে কেন হয় না তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝাইতে পারা যায়। শব্দ ও তদভিধেয় অর্থের মধ্যে এই প্রকারের নিয়ত সম্বন্ধ না থাকিলে একশব্দ অন্য অর্থের প্রতিপাদক হইত এবং শব্দপ্রয়োগ ও অর্থাবধারণ বিষয়ে মনুষ্যসমাজে কোন বিধিবিধান বা ব্যবস্থাই থাকিত না। বিশেষতঃ এই জাতীয় উৎকট অব্যবস্থার ফলে মনুষ্যলোকে যে মহান্ অনর্থপাত হইত তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

মনুষ্যসৃষ্টি যেমন অনাদি, মনুষ্যলোকে প্রচলিত ভাষাও তদ্রূপ। কর্ম্মবিপাক-প্রসূত সৃষ্টির প্রারম্ভ নির্দ্দেশ করা যেই প্রকার দুঃসাধ্য, ভাষার উৎপত্তি ঠিক করাও সেইরূপ দুরূহ। কাজেই আমরা ভাষাহীন মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের কল্পনা করিতে পারি না। নৈয়ায়িকগণের ন্যায় যাহারা শব্দকে উৎপত্তিবিনাশশীল কার্য্যদ্রব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও শব্দের প্রবাহনিত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাষাকে 'প্রবাহনিত্য' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অনাদিকাল প্রবাহ হইতেই লৌকিকজগতে শব্দব্যবহার চলিয়া আসিতেছে (current from time immemorial); ইহার প্রারম্ভ নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই॥ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তে শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলই নিত্য (১)। মীমাংসকগণও শব্দ এবং শব্দার্থ সম্বন্ধকে নিত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখন দেখা যায় যে ভারতীয় আচার্য্যগণের মধ্যে ব্রহ্মের ন্যায় শব্দের কূটস্থনিত্যত্ব লইয়া বিরোধ

১ "সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে"—মহাভাষ্য

থাকিলেও স্মরণাতীত কাল হইতে লৌকিক জগতে প্রচলিত বলিয়া শব্দ এবং শব্দার্থসম্বন্ধকে "প্রবাহনিত্য" বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও মতদ্বৈধ নাই (১)। বাল্যকাল হইতে সংস্কারবশে কোন শব্দ কোন অর্থের বাচক হইবে তাহা লৌকিক ব্যবহার হইতে অবধারণ করিয়া আমরা শব্দে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু সেই সেই শব্দের সহিত তত্তদর্থের তাদৃশ সম্বন্ধ কে স্থাপন করিয়াছিল সেই বিষয়ে আমাদের মনে কখনও প্রশ্নের উদয় হয় নাই। পাণিনি প্রভৃতি শাব্দিকগণ শব্দের সহিত তদুপস্থাপিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার কেবলমাত্র অনাদিপ্রবাহাগত সম্বন্ধের স্মরণ করিয়াছেন—এই বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করিয়া কৈয়টাচার্য্য (২) ব্যবহারপরম্পরাক্রমে অনাদিত্বনিবন্ধন শব্দার্থগত সম্বন্ধকে নিত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রুতি বলেন, (৩) শব্দ অর্থের সহিত অবিভক্ত, অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট। যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে (৪) আছে, শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পর ইতরেতরাধ্যাস হইয়া "যোঽয়ংশব্দঃ সোঽয়মর্থঃ" এই প্রকারে শব্দ ও অর্থ mutually convertible বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে, "যেই শব্দ সেই অর্থ" এই ভাবে শব্দার্থের একাত্মতা বোধ হইয়া থাকে। বাক্যপদীয়কার বলিয়াছেন যে, স্বীয় অর্থের সহিত নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই শব্দ সকল নিয়তার্থপ্রতিপাদক হইয়া ব্যবহৃত হয়। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে এইপ্রকার নিত্য ও অব্যভিচারী সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়াই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে "বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ" বলিয়াছেন। মীমাংসকগণও "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দাস্যার্থেন সম্বন্ধঃ"—এই বলিয়া শব্দার্থগত সম্বন্ধের অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অর্থবান্ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যে নিত্য তাহা মহাভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"নিত্যোহ্যর্থবতামর্থৈরভিসম্বন্ধঃ"। শব্দের সহিত অর্থের বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই এবং শব্দরাশিকে অর্থাববোধের কল্পিত কৃত্রিম উপায় বা সঙ্কেত বলিয়া যাহারা ঘোষণা করেন, তাহাদের মত যে অনুপাদেয় তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ভর্তৃহরি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"সম্বন্ধঃ সমবস্থিতঃ"(৫)। সম্বন্ধ না থাকিলে শব্দ কখনই অর্থ প্রকাশ করিতে পারিত না এবং মনুষ্য-সমাজে শব্দব্যবহারের দ্বারা অর্থপ্রকাশের ব্যবস্থাও বোধ হয় থাকিত না। সাধারণতঃ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা আমরা তিনটি জিনিষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, (৬)—উচ্চারিত শব্দের স্বরূপ,

১ কার্য্য শব্দিকানামপিমতে প্রবাহনিত্যতয়ার্থস্যাপি জাতিলক্ষণস্য নিত্যত্বম্।
২ কিমাচার্য্য এব স্রষ্টা শব্দার্থসম্বন্ধানাম্, অথ স্মর্ত্তেতি প্রশ্নঃ।
৩ সূক্ষ্মামর্থেনাপ্রবিভক্ততত্ত্বামেকাং বাচমভিষ্যন্দমানাম্।
৪ যোগদর্শন—বিভূতিপাদ ১৭।
৫ বাক্যপদীয়, ৩য় কাণ্ড, সম্বন্ধসমুদ্দেশ প্রকরণ।
৬ প্রয়োগেণাভিজ্বলিতৈঃ শব্দৈস্ত্রিতয়মবগম্যতে। আত্মীয়ংরূপমর্থশ্চ ফলসাধনঃ প্রযোক্তুরভিপ্রায়শ্চ। ন চৈতদসতি সম্বন্ধে নিয়মেন ঘটতে॥ হেলারাজ।

তদভিধেয় অর্থ এবং প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রায়। শব্দ ও অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে উল্লিখিত প্রকারে আমাদের জ্ঞান হইতে পারে না। এই সম্বন্ধ পুরুষপ্রযত্নসাধ্য (১) নয়, ইহা স্বাভাবিক। মানুষ বৃদ্ধব্যবহারাদি লৌকিক উপায় হইতে প্রতিপাদ্য অর্থ নিশ্চয় করিয়া শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কখনই শব্দ সৃষ্টি করিয়া অর্থের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "সম্বন্ধস্য ন কর্ত্তাস্তি শব্দানাং লোকবেদয়োঃ" অর্থাৎ বৈদিক বা লৌকিক শব্দের সহিত তত্তদভিধেয় অর্থের সম্বন্ধস্থাপনকারীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন জিজ্ঞাস্য, এই অব্যভিচারী সম্বন্ধের স্বরূপ কি? আমরা বুঝিয়াছি, শব্দ যে অর্থাভিধানে সমর্থ হয় তাহাতে শব্দার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধস্থিতিই একমাত্র হেতু, তাহা না হইলে শব্দার্থ সম্বন্ধের নিয়ত ব্যবস্থার অভাববশতঃ সকল শব্দই সকল প্রকার অর্থের বাচক হইতে পারিত (২)। শাব্দিকগণ এই অর্থপ্রত্যায়ন যোগ্যতাকেই সম্বন্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের মতে এই সম্বন্ধ "সাময়িক" অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছাকৃত, এবং যোগদর্শনে ইহাকেই "ইতরেতরাধ্যাসমূলক" বলা হইয়াছে। "ঔৎপত্তিক", "যোগ্যতালক্ষণ", "সাময়িক", এবং "ইতরেতরাধ্যাস মূলক"—(৩) এইরূপ বিভিন্নভাবে দার্শনিকগণ শব্দার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মীমাংসা, ব্যাকরণ, ন্যায় ও যোগদর্শনে এইপ্রকারে শব্দার্থসম্বন্ধনির্ণয়াবসরে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দার্থসম্বন্ধতত্ত্ব-সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকমণ্ডলীর মধ্যে যেইপ্রকার প্রগাঢ় চর্চ্চা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধহয় জগতের অন্য কোনও দেশের সাহিত্যে সেইরূপ অনুশীলনের নিদর্শন নাই। শব্দের সহিত অর্থের যে নিয়ত যোগ বা সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝাইতে গিয়া ভর্তৃহরি (৪) বলিয়াছেন,— 'এই শব্দের এইটি বাচ্যার্থ এবং এই অর্থের এইটি বাচক শব্দ এইরূপ লৌকিক ব্যবহারে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থের দ্বারা ইহাই পরিস্ফুট হয় যে শব্দের সহিত অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ (Natural relationship) আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, (৫) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রামের রূপাদি প্রত্যক্ষে যেমন স্বভাবতঃ যোগ্যতা আছে, সেইপ্রকার শব্দের ও অর্থপ্রত্যায়নরূপ যোগ্যতা বা শক্তি অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বৈয়াকরণগণ শব্দের এই অর্থপ্রত্যায়ন যোগ্যতাকে "শক্তি" আখ্যা দিয়াছেন। শব্দ অর্থাভিধানে শক্ত বা সমর্থ এবং অর্থ শক্য। হেলারাজ বলেন, শব্দের অর্থাভিধান সামর্থ্য স্বভাবতঃই সিদ্ধ আছে, সংকেত সেই যোগ্যতা বা শক্তির দ্যোতকমাত্র। ন্যায়নয়ানুসারে "এই শব্দ হইতে এতাদৃশ অর্থের প্রতীতি হইবে" এইপ্রকার ঈশ্বরেচ্ছার নাম

১ স্বভাবত এব নিরূঢ়ো ন তু পুরুষেণ নিবেশিত ইত্যর্থঃ—হেলারাজ।

২ শব্দেনার্থস্যাভিধানে সম্বন্ধো হেতুঃ, অন্যথা সর্ব্বং সর্ব্বেণ প্রত্যায্যেতেতি।—হেলারাজ।

৩ দ্বিবিধঃ সম্বন্ধঃ পদার্থে ব্যবতিষ্ঠতে। যোগ্যতা কার্য্যকারণভাবশ্চ পরস্পরমধ্যাসশ্চ।—হেলারাজ।

৪ "অস্যায়ং বাচকো বাচ্য ইতি ষষ্ঠ্যা প্রতীয়তে। যোগঃ শব্দার্থয়োস্তত্ত্বমপ্যতো ব্যপদিশ্যতে"॥
—বাক্যপদীয়, ৩য় কাণ্ড, সম্বন্ধসমুদ্দেশ।

৫ ইন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়েষ্বনাদির্যোগ্যতা যথা। অনাদিরর্থৈঃ শব্দানাং সম্বন্ধো যোগ্যতা তথা—
বাক্যপদীয়, ৩য় কাণ্ড।

সংকেত বা সময়। এই সংকেত আবার 'আজানিক' ও 'আধুনিক' ভেদে দ্বিবিধ (১)। তন্মধ্যে আজানিক সংকেত নিত্য; ইহাকেই প্রধানতঃ 'শক্তি' বলা হয়। শাস্ত্রকারাদিকৃত ইদানীন্তন সংকেত সমূহ 'আধুনিক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গা শব্দ বলিতে আমরা "ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জল-প্রবাহরূপ" যে অর্থ বুঝিয়া থাকি তাহা "আজানিক সংকেত" বা গঙ্গাশব্দের শক্তি। টি, ঘু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণকৃত সংজ্ঞা সকল (technical terms) আধুনিক সংকেত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখন দেখিতে পাওয়া গেল, নিত্যই হউক, ইতরেতরাধ্যাসমূলকই হউক, কিংবা ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা সংকেতিতই হউক, শব্দের সহিত অর্থের যে নিয়ত সম্বন্ধ আছে সেই বিষয়ে কাহারও বোধ হয় সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন শব্দার্থতত্ত্বনিরূপণপ্রসঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহাই এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সিদ্ধান্ত উপন্যাস করিবার পূর্ব্বে আশঙ্কাগ্রন্থ উপস্থাপিত করাই হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। শব্দের সহিত অর্থের যে 'সংযোগ' বা "সমবায়রূপ" কোনও সম্বন্ধ নাই তাহা প্রথমতঃ প্রদর্শন করিয়া বৈশেষিককার এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধাভাব দেখাইয়াছেন। শব্দ আকাশের গুণবিশেষ, কাজেই তাহাতে সংযোগরূপে (২) অর্থের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ন্যায়নয়ানুসারে গুণ পদার্থ কখনই গুণান্তরের আশ্রয় হইতে পারে না, অর্থাৎ দ্রব্যেই গুণ থাকে, গুণ কখনই গুণী হইতে পারে না। সংযোগাদি সম্বন্ধ স্থলে নিয়তই ক্রিয়া বা ব্যাপার বিশেষের অনুভূতি হইয়া থাকে; কিন্তু শব্দ যেভাবে অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে তাহাতে কোনও ক্রিয়াই লক্ষিত হয় না। কাজেই বলিতে হইবে শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংযোগরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। এইপ্রকার যুক্তির উল্লেখ করিয়া সমবায় সম্বন্ধের অভাবও প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখন যদি শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংযোগ বা সমবায়রূপ কোনও সম্বন্ধ না থাকে, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহারা পরস্পর অসম্বদ্ধ (৩)। কিন্তু ইহা (৪) বলিয়া নিস্তার নাই, যেহেতু শব্দার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিদ্যমানতা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এইপ্রকার নিয়তসম্বন্ধ স্বীকার না করিলে যে শব্দ সকল তাহাদের শকার্থের প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া মহর্ষি কণাদ "সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ" এই সূত্র দ্বারা চরমসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরেচ্ছাকৃত সময় বা সংকেতের দ্বারা শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। "এই শব্দ হইতে এই অর্থের প্রতীতি হউক" এইপ্রকার ঈশ্বরেচ্ছামূলক সংকেত হইতেই শব্দ সকল স্বীয় স্বীয় বৃত্ত্যুপস্থাপিত অর্থের সাক্ষাৎ অভিধায়করূপে ব্যবহৃত হয়। এই সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত ঠিক একরূপ। নৈয়ায়িকগণ শব্দকে অনুমানের অন্তর্গত না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায় দর্শনেও শব্দার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধের অভাবই প্রথমে প্রদর্শন করা হইয়াছে(৫)। আশঙ্কাগ্রন্থে এইরূপ আছে,—"শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি শব্দের

১ "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধোমতঃ। নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে।
কাদাচিৎ কস্ত্বাধুনিকঃ শাস্ত্রকারাদিভিঃ কৃতঃ"॥

২ "গুণত্বাৎ"—বৈশেষিক সূত্র ৭।২।১৪। ৩ "শব্দার্থাবসম্বন্ধৌ"—„ ৭।২।১৯।

৪ নমু যদি না সংযোগো ন বা সমবায়ঃ শব্দার্থয়োস্তর্হি কেন সম্বন্ধেন শব্দো নিয়তমর্থং প্রতিপাদয়তীত্যাহ "—বৈশেষিক উপস্কার।

৫ "পূরণপ্রদাহ পাটনানুপলব্ধেশ্চ সম্বন্ধাভাবঃ"—ন্যায় সূত্র—২।১।৫৩।

সহিত অর্থের স্বাভাবিক নিয়ত সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'অগ্নিশব্দ' উচ্চারণ করা মাত্রই মুখবিবর দগ্ধ হইয়া যাইত, 'অন্ন' এই শব্দটি করিলেই মুখ অন্নে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত ; কিন্তু ইহা প্রকৃতই অনুভববিরুদ্ধ। কাজেই বলিতে হইবে শব্দের সহিত অর্থের প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধ নাই। ইহাও কোনপ্রকারেই বলা চলে না। শব্দপ্রয়োগ দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই অর্থপ্রকাশ করিয়া থাকি; শব্দ ও অর্থ পরস্পর অসম্বন্ধ হইলে লৌকিক জগতে শব্দপ্রয়োগের দ্বারা কখনই অর্থাবগতি হইত না। এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া মহর্ষি গোতম ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নিম্নলিখিতভাবে সমাধান করিয়াছেন—প্রত্যেক শব্দেরই এক একটি নিয়ত অর্থ আছে, এবং যখন সেই শব্দটির শ্রবণ হয় তখনই সেই অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে —ইহা চিরন্তন নিয়ম। শব্দার্থপ্রত্যয়ের এই ব্যবস্থা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাস্তবিকই সম্বন্ধ আছে। মহর্ষি গোতম (১) শব্দ ও অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে অর্থপ্রত্যয় হয় তাহা নয়, পরন্তু "এই শব্দের এই অর্থ' এই প্রকার অভিধানাভিধেয় নিয়মের দ্বারাই প্রকৃত পক্ষে শব্দ হইতে অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে।

এখন দেখা গেল যে, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ, মীমাংসক ও বৈয়াকরণগণের মত শব্দার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা শব্দের অর্থপ্রত্যায়ন সামর্থ্যকে নিত্য বা স্বাভাবিক না বলিয়া "সাময়িক" বলিয়াছেন ; কিন্তু মনুষ্যকল্পিত সংকেত বলিয়া অপসিদ্ধান্ত করেন নাই। শব্দের অর্থপ্রত্যায়ন বিষয়ে যেই যোগ্যতাকে শাব্দিকগণ "শক্তি" আখ্যা দিয়াছিলেন, ন্যায়বৈশেষিকাচার্য্যগণ তাহাকেই ঈশ্বরেচ্ছা-মূলক সংকেত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে এই মতদ্বয়ের মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশেষ পার্থক্য নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বুঝা গেল যে, শব্দ ভাবাভিব্যক্তির মনুষ্য-কল্পিত একটি কৃত্রিম উপায় নয়, এবং শব্দ ও অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছার অনুপ্রেরণা আছে। শব্দার্থগত এই সম্বন্ধকে নানাভাবে বলা হইয়াছে, যথা কার্য্যকারণ, গ্রাহ্যগ্রাহক, প্রকাশ্য-প্রকাশক, বাচ্য-বাচক ইত্যাদি। বাক্যপদীয়কার শব্দ ও অর্থের মধ্যে পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন (২)। অন্যোচ্চারিত শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাদের যেই অর্থজ্ঞান হয়, সেই অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জনক বলিয়া শ্রুত শব্দটি কারণ, আবার বুদ্ধিস্থ অর্থও তদভিধায়ক শব্দের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ শব্দ ও অর্থকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে অভিন্ন বলিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুসরণ করিয়া ভর্তৃহরি শব্দ ও অর্থকে একই আত্মার বিভিন্নরূপমাত্র বলিয়াছেন (৩)। প্রকৃত পক্ষে বহিঃপ্রকাশের পূর্ব্বে বুদ্ধিস্থ অবস্থায় শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাস্তব ভেদ থাকে না (৪)। বস্তুতঃ শব্দ ও অর্থ অভিন্ন ; এক ও অখণ্ড আন্তর চৈতন্যের বিভিন্নাবস্থামাত্র।

১ "ন সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়স্য"—ন্যায় সূত্র - ২।১।৫৫।
"ন সম্বন্ধকারিতং শব্দার্থব্যবস্থানম্। কিং তর্হি ? সময়কারিতম্। কঃ পুনরয়ং সময়ঃ ? অস্য শব্দস্যেদমর্থজাতমভিধেয়মিতি অভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ" ॥—বাৎস্যায়নভাষ্য।

২ "শব্দঃ কারণমর্থস্য সহি তেনোপজন্যতে। তথাচ বুদ্ধিবিষয়াদর্থাচ্ছব্দঃ প্রতীয়তে—বাক্যপদীয়, ৩য় কাণ্ড

৩ "একস্যৈবাত্মনো ভেদৌ শব্দার্থাবপৃথক্ স্থিতৌ"—বাক্যপদীয়, ২য় কাণ্ড, ৩১।

৪ "বুদ্ধৌ শব্দার্থয়োঃ পূর্ব্বমভেদেনাবস্থানম্"—হেলারাজ।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থ

আশ্বিনে

গবর্ণর-জেনেরাল—লর্ড রেডিঙ্গের বিদায়ের সময় আসন্ন; এখন তাঁহার প্রভুতার মেয়াদ বাড়ান হইবে, না তাঁহার কাজে লর্ড রোনাল্ড্‌শে আসিবেন, না অন্য কেহ আসিবেন, তাহার চর্চ্চায় আমাদের কোন লাভ নাই, কারণ উঁহাদের কেহই আমাদের অনন্ত শয্যায় শায়িত ভাগ্য-বিধাতার নিয়োগে আসিবেন না। পার্লামেণ্টের কর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পাকা রাজনীতি ফাঁদিবার জন্য লর্ড রেডিঙ্গ বহুব্যয়ে নিজের দেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু এদেশে ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোঝা শক্ত যে, সেই পরামর্শের জন্য অত ব্যয়ের প্রয়োজন কি ছিল। ১৯২৯ অব্দের পূর্ব্বে যে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি বদলাইবে না, তাহা তিনি বহু পূর্ব্বেই শোনাইয়াছিলেন; ১৯২৯ অব্দে যে আমরা একটা অপূর্ব্ব সম্পদ পাইব, সে কথা জানাইবার জন্য তাড়াতাড়ির প্রয়োজন ছিল না। সারা ভারতবর্ষে চাষের উন্নতির জন্য একটি নূতন ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা দিয়াছেন, তাহাতে যদি প্রজাদের দৈন্য যায়, তবে পরম মঙ্গলের কথা; কিন্তু উহাতে যদি বিলাতী বণিকদের প্রার্থিত সামগ্রীর উৎপন্নের ব্যবস্থাই অধিক হয়, তবে এ অনুগ্রহেও আমাদের নিগ্রহ ঘুচিবে না।

* * * *

ভবিষ্যতের নীতি—পার্লামেণ্টের অনুশাসনে ভবিষ্যতের সুসংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভায় যে শ্রেণীর স্বরাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহা তাহার জন্মের পূর্ব্বেই ইউরোপে অনুমিত হইতেছে। কেহ কেহ নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া বলিতেছেন যে, যদি অবিলম্বেই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের হাতে প্রেসিডেণ্ট নিয়োগের মত মিনিষ্টার নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া যায়, তবে আর ১৯২৯ অব্দ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। এই উক্তি যাঁহাদের, তাঁহাদের বিশ্বাস এই, যদি সদস্যদের ভোটে মিনিস্টারের বাছনি ও নিয়োগ হয়, তবে স্বরাজ বল, বা লিবারেল বা আর কিছু বল, সকল দলের হিতৈষীদের মধ্যেই আত্মদোহ বাড়িয়া উঠিবে, ও সকল স্বরাজের উদ্যোগ ধ্বংস হইবে। আমাদের চরিত্রের নীচতায় যাঁহাদের এই উচ্চ ধারণা, তাঁহারা নিষ্ঠুর হইলেও আমাদের যথার্থ বন্ধু। আমাদের যথার্থই ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সম্প্রদায় ভেদে ব্যক্তি-বিশেষের গৌরব বাড়ান পর্য্যন্তই আমাদের হিতৈষণার দৌড় কি না। স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনেক স্থলে কাজের কাজ কি, তাহা নির্ণীত না হইয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থ লইয়াই কোলাহল বাড়িয়াছে; এ কথা সত্য, যে যাহা বুদ্ধিমানদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, তাহা লইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দল-ত্যাগ ঘটিয়াছে।

* * * *

নারীদের ভোটের অধিকার—যাহার নিজের সম্পত্তি আছে ও রাজ্যের কাজের ব্যয়ের জন্য যাহাকে কর ও টেক্স দিতে হয়, সে পুরুষ হোক্ বা নারী হোক, তাহার দেখিবার অধিকার আছে যে, তাহার টাকা কে কিভাবে ব্যয় করিবে, ও যিনি শাসন চালাইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইতে চান, তিনি উপযুক্ত লোক কি না। রাষ্ট্রের শাসনে নারীদের কতখানি অগ্রসর হওয়া

উচিত, এ কথায় সন্দেহ—তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার হইতে নারীকে বঞ্চিত করা চলে না। নারীর বুদ্ধি আছে কি না, ইহার বিচার করিতে যাওয়া কেবল লঘুতা ও চপলতার পরিচয় দেওয়া। যাঁহারা মনে করেন, নারীকে ঐরূপ অধিকার দিলে তাঁহাদের পর্দ্দার আড়ালে রাখার পবিত্র ব্যবস্থা নষ্ট হয়, তাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে পর্দার ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারেন, কারণ কেহই জোর করিয়া নারীর ভোট লইতে যাইবে না। উন্নত সমাজের লক্ষণের অনুরূপে এদেশে বহু শ্রেণীর মতভেদ জন্মিয়াছে; যাঁহারা মনে করেন নারীদের পক্ষে ঐরূপ অধিকার পাওয়া উচিত, তাঁহারা কখনও কোন সভ্য ব্যবস্থায় বিরোধী মতের প্রভুতায় শাসিত হইতে পারেন না। যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী অথবা জোর করিয়া পরের উপর আপনার মত চালাইতে চান, তাঁহারা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার শত্রু। এবারকার ব্যবস্থাপক সভায় নারীর ভোট দেওয়ার অধিকার স্থির হইয়াছে।

* * *

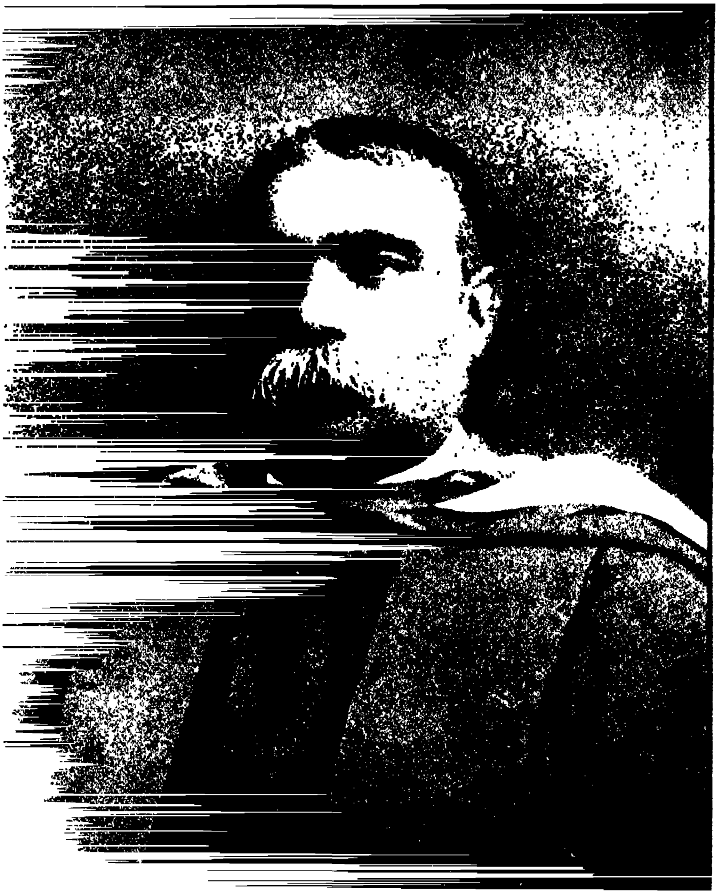
বেরোজগার—কথায় বলে, যাহা দেবতার বেলায় আদর্শ লীলা, তাহা এই মানুষের বেলায় হয় পাপ। এমন অনেক সামাজিক অবস্থা আছে, যাহা ইউরোপে আদর্শ, আর আমাদের দেশে ঘটিলেই ইংরেজ সরকারের কাছে আমরা তাহার জন্য তিরস্কৃত হই। ইউরোপের কোন দেশে যদি দৈবাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক শ্রেণীর লোক উচ্চ শিক্ষা চায় কেন, তবে লোকে তাহাকে বর্ব্বরবোধে ঘৃণা করিবে,—আর যদি কেহ সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলে যে, জ্ঞানের সকল বিভাগের শিক্ষার জন্যই আয়োজন হয় কেন, তবে লোকে তাহাকে আস্ত পাগল ভাবিয়া উপহাস করিবে; যদি কথা ওঠে যে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফল কি হইবে, তবে লোকে বলিবে যে তাহাতে দেশের গায়ের বল বাড়িবে,—আর যদি শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের আহারের সংস্থান না হইবার বিবরণ পাওয়া যায়, তবে পার্লামেণ্ট সে অপরাধের জন্য তিরস্কৃত হয়। মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের যে ন্যায্য অধিকার আছে, তাহার প্রার্থনাই আমাদের প্রধান অপরাধে দাঁড়ায়।

একেত ইংলণ্ডের লোকদের সুবিধা আছে যে, তাহারা ইংরেজের উপনিবেশগুলি ছাড়াও আমেরিকায় গিয়া স্থায়ী আবাস পাতিয়া রোজগারের পথ করিতে পারে, তাহার উপর আবার সমর-বিভাগ, নৌচালন-বিভাগ প্রভৃতি বহু বিভাগে সকলের কাজ পাইবার অবাধ সুবিধা আছে; এত সুবিধা থাকিতেও শ্রমজীবিদের অধিকতর সুখ-সুবিধা করিবার জন্য, ও সকলেই যাহাতে খাইতে পায় তাহার জন্য পার্লামেণ্ট প্রতিদিন নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। দুর্ভাগা এই আমাদের দেশের যুবকেরা লেখা-পড়া শেখেন বলিয়া তিরস্কৃত হইতেছেন আর প্রজাসাধারণেরা নিজেদের দোষেই নিজেরা মরিতেছে বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। আমাদের দোষ নাই বা আলস্য নাই—এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যাহা বিলাতী নিয়মে করা উচিত তাহা এদেশে করা হয় না কেন? ইউনিভার্সিটি ছাড়িয়া যদি ভদ্রলোকের ছেলেরা কল কারখানার কাজ শিখিতে যায়, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন কি? তখন যদি আবার তাহাদিগকে নিজেদের গোলাকার মূলধনটুকু লইয়া কারবার খুলিয়া টাকা রোজগার করিতে বলেন, তবে একই ফল দাঁড়াইবে। আশা করি এ বিষয়ে এখন যে নূতন রিপোর্ট লিখিবার উদ্যোগ হইতেছে, তাহাতে যেন এসকল কথার বিচার থাকে।

ইম্পিরিএল লাইব্রেরি—দিল্লীতে রাজধানী বসিবার পর অনেকবার এই কথা উঠিয়াছিল যে, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিটিকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইবে কি না। জ্ঞানের কেন্দ্রের হিসাবে কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতির সঙ্গে তুলনায় দিল্লী যে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ, আর ভৌগোলিক স্থিতির দরুণ দিল্লী যে বহুবৎসরেও নূতন যুগের সভ্যতায় কলিকাতার একটি অংশ বিশেষের মতও উন্নত হইতে পারেনা, ইহা রাজপুরুষদের মধ্যেও কয়েকজন বুঝিয়াছিলেন, ও বুঝিয়াছেন বলিয়াই ঐ প্রস্তাবটি বিশেষভাবে উত্থাপিত হইতে পারে নাই। এখন দিল্লীতে অনেক এমারত হইয়াছে,—অনায়াসেই উহার একটিতে ইম্পিরিএল লাইব্রেরি স্থাপন করা চলে; কিন্তু দিল্লীতে ঐ লাইব্রেরির সদ্ব্যবহার হইবে কিরূপে? সে কথা উপেক্ষা করিয়াই যেন আবার বড় ব্যবস্থাপক সভায় কথা উঠিয়াছে যে, ইম্পিরিএল লাইব্রেরিটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হউক। এ প্রস্তাবের মূলে ভারত গবর্ণমেণ্টের সমর্থন আছে বলিয়াই অনেকের অনুমান। রাষ্ট্রনীতির কোন দুর্ব্বোধ্য কারণে দিল্লীকে রাজধানী করা গবর্ণমেণ্ট উপযোগী মনে করিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ইচ্ছার নিশ্বাসে দিল্লীকে জ্ঞানের গৌরবের কেন্দ্র করিতে পারেন না। সম্প্রতি লর্ড কর্জনের যে গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অনেক অকাট্য প্রমাণে এই অবস্থাটির কথা সমর্থিত হইয়াছে। লর্ড কর্জনের সেই উক্তিকে কেহ জিদের উক্তি বা ভ্রান্ত ধারণা বলেন নাই, যদিও তাঁহার অন্যান্য অনেক কথার তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। কলিকাতার জ্ঞানের কেন্দ্রে এখন যে ভাবে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক Research এর কাজ চলিয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, তাহাতে এই লাইব্রেরিটি স্থানান্তরিত করা অত্যন্ত অন্যায় হইবে। কিন্তু ন্যায়ের দিক দিয়া, প্রয়োজনের দিক দিয়া ও হিতের দিক দিয়া কথাটির আলোচনা হইতেছে মনে হয় না। ব্যবস্থাপক সভায় কেবল এই তর্কটুকু উঠিয়াছে যে, ঐ লাইব্রেরির ব্যয় বহন করেন একা ভারত গবর্ণমেণ্ট। ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কলিকাতার জ্ঞানের উন্নতি হওয়া যে কেন দোষের আর ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজধানী পঞ্জাবে বসিয়াছে বলিয়াই যে পঞ্জাব বিশেষভাবে লাইব্রেরিটি দাবি করিতে পারিবে কেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। লাইব্রেরি হইল একটি, আর ভারতের প্রদেশ হইল অনেক—সকল প্রদেশের মধ্যে যখন একটি প্রদেশেই লাইব্রেরিটি থাকা সম্ভব, তখন সে লাইব্রেরেটির জন্ম ও বৃদ্ধি যেখানে, যেখানে সে লাইব্রেরি থাকিলে যথার্থ হিতসাধন হয়, সে স্থান হইতে লাইব্রেরিটী স্থানান্তরিত করা হইবে কেন? গোড়ায় এই লাইব্রেরির নাম ছিল মেটকাফ্ লাইব্রেরি, আর তখন বঙ্গের সাহায্যে উহার স্থাপনা হয়; পরে ঐ লাইব্রেরি ইম্পিরিএল নাম পাইলেও ও ভারত গবর্ণমেণ্টের টাকায় পুষ্ট হইলেও ঐ লাইব্রেরি সম্পর্কে কলিকাতার দাবি উঠিয়া যায়না। আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়া আমাদের দেশবাসীরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আয়োজন করিবেন।

দ্রষ্টব্য—কার্ত্তিক সংখ্যা ১২ই কার্ত্তিক বাহির হইবে

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.



বঙ্গবাণী

সম্পাদক

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্য্যালয়

৭৭ নং রসা রোড নর্থ,

ভবানীপুর

বার্ষিক ৬৷০



"শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা"

অরণ্য আড়ালে রহি কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

কার্ত্তিক

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৩য় সংখ্যা

শিক্ষা ও সমাজ

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির উপযুক্ত করিয়া তোলা। শিক্ষার প্রভাব সমাজকে রূপান্তরিত করে সত্য, কিন্তু সমাজের উপযোগী না হইলে তাহাতে সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না—সলিলে তৈলবিন্দুর ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমান যুগে আমাদের বাঙ্গলা দেশে এই উপযোগিতার বিলক্ষণ অভাব আছে বলিয়া অনেকেই আক্ষেপ করেন।

সেকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় মোটামুটি বাঙ্গলা লেখাপড়া ও সর্ব্বদা কাজে লাগে এমন অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইত। কতক লোক—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দল—টোলে সংস্কৃত পড়িয়া পণ্ডিত হইতেন, কতক পার্সী প্রভৃতি শিখিয়া বিষয়কার্য্যে অভ্যস্ত হইতেন। সাধারণ লোকের মধ্যে সরস্বতীদেবীর প্রভাব খুব বেশী প্রকাশ পাইত বলিতে পারি না। তবে এই আটপৌরে গোছ বিদ্যায় অসন্তোষ আসিত কম। বিলাসিতা তখন এতটা আত্মশক্তি প্রকাশ করার সুবিধা পায় নাই। অভাব অল্প, আয় মোটামুটি—একরকমে দিন চলিয়া যাইত। যাঁহারা সংস্কৃত প্রভৃতিতে বড় রকমের পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন, তাঁহারাও আপন আপন ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে আপন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেন।

লর্ড মেকলে এই গণ্ডী ভেদ করিয়া দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালাইলেন। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি তাঁহার উৎসাহে ইন্ধন যোগাইলেন। ইহার ফল যে অনেক দূর গড়াইবে, মেকলে তাহা

জানিতেন, এক সময়ে পার্লামেণ্টে উচ্চকণ্ঠে তাহার ঘোষণাও করিয়াছিলেন। ফলে বঙ্গদেশে এক নবযুগের আবির্ভাব হইল। লোকের চক্ষুর সম্মুখে এক নূতন জগৎ উন্মুক্ত হইল।

হিন্দুর গোঁড়ামি প্রথমে এই শিক্ষা একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়াছিল। দেখিবারই কথা। প্রথম প্রথম যাঁহারা কলিকাতায় কলেজে শিক্ষালাভ আরম্ভ করিলেন তাঁহারা আচার ব্যবহারে যে উদারতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহার প্রকৃত নাম স্বেচ্ছাচারিতা। ৺ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। মেডিক্যাল কলেজে প্রথম প্রবেশ প্রায় রাজসূয় যজ্ঞের গুরুত্ব ধারণ করিয়াছিল। কিছুদিন পরেই অবশ্য অনেকটা মস্তিষ্কের স্থিরতা দেখা দিল। 'অর্থকরী বিদ্যা' বলিয়া দেশ পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মোটের উপর এই শিক্ষাবিপ্লব শান্তভাবেই সমাজে অধিকার বিস্তার করিল, আর ইহার প্রসারও হইল খুব দ্রুতগতিতে। ব্রাহ্মণ টিকি কাটিয়া ইংরাজী শিখিতে মন দিল, মুসলমান দেখিল পারসী বয়ান অপেক্ষা মিল্টনের কবিতা মুখস্থ করিলেই গৌরব বাড়ে। কত কৃষক পুত্রকে লাঙ্গল না ধরাইয়া প্যারীচরণের First Book পড়াইতে আরম্ভ করিল। কত নবশায়ক জাতীয় ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তে ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর ব্যবসায়ান্তরে প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যেই এই শিক্ষার ঝড়টা প্রথম প্রবলবেগে লাগিয়াছিল। এখন মুসলমান সমাজেও বেশ বহিতেছে।

কিন্তু চিরদিন সুখে কাটে না। কিছুকাল পর্য্যন্ত এমন ছিল যে ইংরাজী লেখাপড়ায় একটু অগ্রসর হইলেই গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনাটা আর থাকিত না, কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভও ঘটিত। সে দিন চলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের জনসাধারণ যতই অশিক্ষিত বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি, শিক্ষার আরও বিস্তৃতি আমাদের দেশে যতই আবশ্যক হউক, এটা অস্বীকার করা চলে না যে, অপেক্ষাকৃত অল্পদিনে সরকার বাহাদুরের আশ্রয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশে বেশ হাত পা খুলিয়া বসিয়াছে, আর নৈতিক জগতের আবহাওয়াটাকেও ফিরাইয়া দিয়াছে, কেবল পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষাই পাশ্চাত্য শিক্ষা নহে। বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে আমাদের যে প্রাথমিক শিক্ষা চলিতেছে তাহাও পাশ্চাত্য শিক্ষা। কারণ, বাঙ্গলা পুস্তকেও ইংরাজী ভাব, ইংরাজী ধরণ, ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ বা মর্ম্ম শিখিতে হয়। 'ভদ্র' শ্রেণীর মধ্যে এই পাশ্চাত্য শিক্ষার এমন একটা মত্ততা আসিয়া পড়িয়াছে যাহার গতিরোধ এখন অসম্ভব। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বঞ্চিত ব্যক্তি এখন 'ভদ্র' বলিয়াই গণ্য নহে। এই গতির প্রতিরোধও অনাবশ্যক। আবশ্যক, এই শিক্ষাটাকে এমনভাবে নিয়মিত করা, যাহাতে ইহা সমাজের উপযোগী হয়।

ইহাকে সমাজের উপযোগী করিতে হইলে প্রথম আবশ্যক এমন কিছু ব্যবস্থা যাহাতে এই সুজলা সুফলা দেশে অন্ততঃ উদরান্নের সংস্থানের জন্য চারিদিক অন্ধকার দেখিতে না হয়। কতকটা বিদেশী প্রতিযোগিতায় ও বিলাসিতার আক্রমণে আর কতকটা এই শিক্ষার অনুপযোগিতায়

অন্নসমস্যা দেশে এত গুরু হইয়া উঠিয়াছে। যে ইংরাজী পুস্তকের দুপাতা উল্টায়, প্রায় সেই চাকরী খোঁজে, কারণ সে অন্য কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। চাকরী অল্প, প্রার্থী অনেক; ফলে অসন্তুষ্ট এবং শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর ইতস্ততঃ পর্য্যটন ও সময়ে সময়ে অকার্য্যে যোগদান। বৈজ্ঞানিক কল কারখানা এখনও দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই; অনেকেরই জাতীয় ব্যবসায় মান্ধাতার আমলের প্রক্রিয়ায় চালিত, সুতরাং বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে অক্ষম। কৃষিকার্য্য বা দ্রব্যোৎপাদন বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিতে হইলে এই দরিদ্রের দেশে প্রায়ই একের ক্ষমতায় কুলায় না। দশে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে যে একতা, সমবায় বা নৈতিক বল আবশ্যক, তাহাও যোটে না। আর বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ চালাইবার উপযুক্ত জ্ঞানই বা দেশে কোথায়?

এটা ঠিক যে দেশের প্রাচীন ব্যবসায়গুলি একেবারে ত্যাগ করিলে চলিবে না, দেশের প্রকৃতির উপর সেগুলি প্রতিষ্ঠিত। যেটা চলে তাহাকে চালাইতে হইবে, যেটা চলে না তাহাকে সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে অথবা অবস্থা বিশেষে তাহার মায়া কাটাইতে হইবে। জাতি ব্যবসায় আঁকড়াইয়া ধরিলে যেখানে হরিবাসর অবশ্যম্ভাবী, সেখানে সেটা ছাড়িয়া একটা "নূতন কিছু" করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমিক গুরুগিরি ব্যবসায়টা বেশ সুখের ছিল, তাহা ত উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। পৌরোহিত্যও এখনও খুব সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ বলিয়া যে একটা জিনিষ বহু টোলের স্থায়িত্ব সম্পাদন করিত, তাহা ত দিনকয়েক পরে প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণায় ভিন্ন অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কতক দেশের হাওয়ার পরিবর্ত্তনে, কতক বিলাসিতা-গ্রস্ত বাঙ্গালীর উদরান্নের তাড়নায় এই ব্যবসায়গুলি বিনষ্ট হইতেছে। ব্যবসায়ী গুরু পুনর্জ্জীবিত হইবেন বা পুরোহিতের কর্ম্মক্ষেত্র আবার বিস্তৃত হইবে সে আশা নাই। অগত্যা ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য পন্থায় জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন তাহাই করিতে হইবে। টোলের পণ্ডিতের স্থান বিদ্যালয়ের বেতনগ্রাহী শিক্ষক অধিকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ এ পরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এটা ত পূর্ব্বের মত একচেটিয়া ব্যবসায় নহে, ঘোর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। ব্রাহ্মণেতর লোকের জাতি ব্যবসায় অনেকস্থলেই রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অথবা প্রতিযোগিতায় ম্লান হইয়া পড়িতেছে। সেগুলির দেশকাল পাত্রোপযোগী পুনরুদ্ধারকল্পেই শিক্ষার অনেকটা চেষ্টা ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। কারণ, গ্রাসাচ্ছাদনের দাবি সর্ব্বাগ্রে।

সাবেক বর্ণধর্ম্মের নিয়মে কামার, কুমার বা বারুই নূতন প্রথায় তাহার পিতৃ-পিতামহের ব্যবসায়েরই অনুবর্ত্তন করিবে, নূতন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবে না একথা আমি বলিতেছি না। বর্ত্তমান শিক্ষার স্রোত এ সকল প্রভেদ ভাসাইয়া দিবেই। ব্যবসায়ের হিসাবে নূতন করিয়া জাতিগঠন হইবেই,—তাহা শাস্ত্রকারেরা মানুন আর নাই মানুন। সমবায়নীতির প্রসার হইলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও মুসলমানকে এক নৌকায় পা দিতে হইবেই; ইহাতে যে নূতন রকমের মিলন আসিবে

তাহা সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয়। তবে এটাও স্বীকার্য্য যে কোন লোকের তাহার পিতৃপিতামহের অবলম্বিত ব্যবসায়ে যে একটা স্বাভাবিক সুবিধা আছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। এই সুবিধার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার অর্থনীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত। একজন বারুজীবী কার্য্যকরী শিক্ষার গুণে পানের চাষে স্বল্পদিনে যে উন্নতি দেখাইতে পারিবে ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে গবর্ণমেণ্ট করেন তাহার চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে নিজেদের, তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে স্থানীয় নেতার।

কতক লোক শিক্ষার জন্যই উচ্চ-শিক্ষা লাভের প্রয়াসী। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানের বিস্তার। তাঁহারা সমাজের পূজার্হ, যে জাতি হইতেই আসুন গুণে ও কর্ম্মে ব্রাহ্মণ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কিছু করিয়া খাইবার জন্য শিক্ষা চায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর শিক্ষা ঠিক্ হইতেছে না। যে শিক্ষা হইতেছে তাহার বাজারে ততটা কাটতি নাই, আমদানি খুব বেশী। কথাটা মামুলি হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত প্রতীকার না হয় ততদিন মামুলি কথারও পুনরাবৃত্তি প্রয়োজনীয়। অন্য রকম শিক্ষার যে আমদানি দরকার তাহা সকলেই বুঝিতেছেন, তাহার চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে কিন্তু আরও দ্রুত গতিতে আবশ্যক। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য মুখ্যতঃ উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানের বিস্তার, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ও দেশের এই অভাব উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থকরী শিক্ষার উৎসাহ দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। যাহাদের জ্ঞানপিপাসা অপেক্ষা অর্থপিপাসা প্রবল তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে অথবা অবস্থানুসারে আরও কিছুদিন পরে যাহাতে কোন বৈজ্ঞানিক কারখানায় বা ব্যবসাদারের আড্ডায় শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার যথাসাধ্য ব্যবস্থা একান্তই আবশ্যক। যাহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের উদ্দেশ্য কেরাণীগিরি লাভ ও ক্রমে মুখস্থকরা পুস্তকগুলি ভুলিয়া যাওয়া, তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল মনোবিজ্ঞান বা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান অধ্যয়নের ফল কেবল অর্থ ও জীবনীশক্তির অপচয়। ইহাতে চস্‌মার দোকানের পসার বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু নিজের ব্যবসায়ে পসার খুব কমই বাড়ে। কর্ত্তৃপক্ষের পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রদের শরীরে যেরূপ নানা ব্যাধির সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে খুব আশাপ্রদ নহে। ইংরাজী ধরণে খেলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে না আছে বলিতে পারি না। কিন্তু কয়জন তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দেয়? রুগ্ন শরীরকে আরও রুগ্ন করিয়া ফেলা শিক্ষার অপব্যবহার মাত্র।

আর একটী গুরুতর দোষ হইতেছে নীতি শিক্ষার অভাব। বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার অভাব ও সংসারে অন্নবস্ত্রের অভাব কত যুবককে বিপথগামী করিতেছে। চুরী, ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার দিকে ঝোঁক, শিক্ষার কি শোচনীয় পরিণাম! সাবেক শিক্ষার মধ্যে যতটা কুসংস্কারই থাকুক বিজ্ঞানেতিহাসে অভিজ্ঞতা লাভ যতই কম থাকুক তাহার একটা মূলমন্ত্র ছিল ধর্ম্মজ্ঞান জাগরিত করা। মুনিঋষিদিগের আশ্রমে বা বৌদ্ধবিহারে যে জ্ঞান বিতারিত হইত তাহার লক্ষ্য ছিল পরমার্থ,

—লৌকিক অর্থ নহে। এই ভাবটা দেশে শিক্ষার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। সিদ্ধিদাতা গণেশকে নমস্কার করিয়া এবং নানা দেবদেবীকে বন্দনা করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত বা বাঙ্গলা গ্রন্থ আরম্ভ করা হইত। চিঠিপত্র লিখিতে হইলে প্রথমেই উপরে ভগবানের নাম লেখা হইত। এখনকার বিদ্যালয়ে ভগবানের স্থান খুব কমই আছে। যেটা ভাল সেটা দেশী বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে এমন কথা নাই। নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের দেশে সাধারণের বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম চলে না কিন্তু সাধারণ নীতিজ্ঞান ত চলে। কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা না করিয়া এবং পরীক্ষায় পাশ অপেক্ষা, উন্নত চরিত্রবলে শিক্ষকের অধিকতর উপযোগিতা গণ্য না করিয়া ভাল কাজ করিতেছেন মনে হয় না। অতীতের ধারা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কে কবে বড় হইতে পারে? এ দেশে অনেক যথেচ্ছাচারীকে শেষ বয়সে পরম ভাগবত হইতে দেখা যায়, সেটা অতীতের প্রভাবে। কিন্তু শিক্ষার দোষ সব সময়ে সারে না, কেহ কেহ পাষণ্ডই থাকিয়া যায়। প্রাচীন শিক্ষায় শিষ্য গুরুগৃহে বাস করিত, তাঁহার সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিত, তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইত। বৌদ্ধবিহারে বহু গুরুশিষ্যের একত্র বাসে ভাবের আদানপ্রদান চলিত। বর্ত্তমান কালে শিক্ষকের উদাহরণে ছাত্রের চরিত্রগঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। বই মুখস্থ করা অপেক্ষা চরিত্রগঠন যে কত বড় কাজ তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে দেশে গৃহিণীর রান্ধা তেঁতুল পাতার ব্যঞ্জন বড় নৈয়ায়িকের অভাব পূরণ করিত, যে দেশে কপর্দ্দকহীন যোগী পৃথিবীবিজয়ী বিক্রান্ত বীরের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, সে দেশে অভাবের মধ্যে বিলাসিতার এতটা আক্রমণ কেবল নীতি শিক্ষার অভাবেই ঘটিতে পারে।

শিক্ষা জীবনব্যাপী; বিদ্যালয়ে তাহার ভিত্তি স্থাপন হয় মাত্র। বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাহারা কোন কাজকর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহারা সেই কাজকর্ম্মে শিক্ষিত হয়। আর যাহাদিগকে বেকার অবস্থায় দিন কাটাইতে হয় তাহারা কি অবস্থায় পড়ে? বিদ্যালয়ে থাকিতে মনে যতটা দুরাশা সঞ্চয় করিয়াছিল সংসারে আসিয়া ততটা হতাশ হইয়া পড়ে। অকালপক্কতা ও ঔদ্ধত্যও অনেক সময়ের নানা বিভ্রাট ঘটাইয়া দেয়। অন্য কাজের অভাবে অনেকে রাজনীতি-ওয়ালাদিগের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়ায়। রাজনীতি যতক্ষণ বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ তাহাতে বেকার যুবকদল মাতিয়া গেলেও ততটা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু কেহ কেহ মাত্রা ঠিক্ রাখিতে পারে না, বিপ্লববাদী হইয়া দেশের ও পরিবারের ঘোর অশান্তি জন্মাইয়া দেয়; গুরুজনের আদেশ অমান্য করিয়া, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া এক মোহময় রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে। দেশহিতৈষিতা ভাল জিনিষ কিন্তু এতকাল পরে ইংরাজের অনুগ্রহে যে দেশের চক্ষু ফুটিয়াছে তাহার পক্ষে প্রতীচ্য দেশের গণতন্ত্রের উপযুক্ত হইতে যে চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় আবশ্যক তাহার পরিবর্ত্তে বালকোচিত পাশববলের চিন্তা কি অসৎ শিক্ষারই ফল নয়? প্রকৃত শিক্ষা—কর্ম্মজীবন

সৎ পথে চালিত করিবে, নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে মনের দৃঢ়তা আনয়ন করিবে, আপনাকে পরের সেবায় নিয়োগ করার প্রবৃত্তি দিবে।

আজকাল বাঙ্গলায় তরল সাহিত্যের অতিরিক্ত প্রাচুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক মাসিক পত্রিকারই প্রধান সম্বল গল্প ও কবিতা। গৃহলক্ষ্মীদের বিদ্যার দৌড় গল্পের উপরে বড় বেশী স্থলে উঠে না। গল্পগুলিও অনেক সময়ে স্বদেশী সমাজবিরোধী হইলেও বিদেশী অনুকরণে বেশ মুখরোচক। বিদ্যালয়ে থাকিতে ও তাহার পরেও, আমাদের যুবকগণ এই গল্পের ও উপন্যাসের ভক্ত হইয়া পড়ে। অশোকের পিতার নাম অপেক্ষা উপন্যাসের নায়িকার তৃতীয় প্রেমপাত্রের নামই বেশী মুখস্থ করে। উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদের মতিগতি এরূপ হইয়া যায় যে, সংসারের কঠিন কার্য্যে সমুচিত মনঃসংযোগ তাহাদের অভ্যাসের বাহিরে আসিয়া পড়ে। এ দিকে শিক্ষার বাজারে সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে আর সমাজে দায়িত্ব অভিভাবকগণের।

যাহাদিগকে লইয়া এত কথা বলা গেল তাহারা কিন্তু দেশের সর্ব্বস্ব নহে। এখনও দেশটা অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকেই পূর্ণ। বঙ্গদেশের প্রকৃতি বুঝিতে হইবে পল্লীগ্রামে, সহরে নহে, কারণ ইহার অধিকাংশ লোক এখনও কৃষিজীবী ও পল্লীগ্রামের অধিবাসী। বড় সহর হইতে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গেলে মনে হইবে যেন আর এক জগতে আসিলাম। এক অন্নকষ্ট ব্যতীত আর সমস্ত অভাব অভিযোগ সেখানে ভিন্ন রকমের। দলাদলি ও মামলামোকদ্দমা সেখানকার জীবন। এই শক্তি ভিন্ন পথে পরিচালিত করিতে হইলে খুব বিস্তৃত আকারে শিক্ষার প্রয়োজন। অনেক সভ্যদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে বিতরিত। ভারতবর্ষে যে কেন তাহা হইতে পারে না বোঝা কঠিন। খরচ ইহাতে অবশ্যই অনেক লাগে। কিন্তু সে খরচের টাকা উঠাইতে প্রথম প্রথম যে আপত্তিই উঠুক, বেশী দিন তাহা থাকিতে পারে না। রুগ্ন শিশু ঔষধ খাইতে আপত্তি করিয়াই থাকে, কিছু জ্ঞান জন্মিলেই সে আপত্তি ক্রমে আগ্রহে পরিণত হয়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচার হইলে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার কমিয়া যাইবে, যাহারা হস্তপদ চালনা দ্বারা অন্নসমস্যার সমাধান করে তাহাদের মধ্যে ঐ কাজের জন্য কিছু কিছু মস্তিষ্ক চালনাও আসিবে। 'ভদ্র' ও ভদ্রেতর লোকের মধ্যে এখন দেশে যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে সে ব্যবধান অনেকটা তিরোহিত হইবে। মহাত্মা গান্ধি অবকাশ কালে চরকা ঘুরাইতে উপদেশ দেন কিন্তু এ উপদেশ বঙ্গদেশে বড় কেহ মানে না। যদি অবকাশকালে শিক্ষিত লোক শিক্ষাদান ও অশিক্ষিত লোক শিক্ষাগ্রহণ করে তবে দেশের গতি অন্যদিকে ফিরিতে পারে। এ কাজটা বোধ হয় খদ্দর অপেক্ষাও গুরুতর। দেশে শিক্ষার বিস্তার ও রাজনৈতিক নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে মতামত দিবার উপযুক্ত লোকের বৃদ্ধি হইলে আমরা হয়ত জনসঙ্ঘের নূতন রকমের নেতার দর্শন পাইব।

পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমানের সমবায়নীতির আশ্রয়ে একত্র ব্যবসায়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। ভদ্র ঘরের শিক্ষিত বাঙ্গালী একাকী ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রে যে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না তাহার একটা কারণ শারীরিক অপটুতা। অনেক সময়ে বিলক্ষণ সদিচ্ছা লইয়াই সে কার্য্যে প্রবেশ করে কিন্তু শেষে আসল খোয়াইয়া বসে। অবস্থার অতিরিক্ত বিলাস তাহার অভ্যাসকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে। অল্পদিন হইল, লেখকের জ্ঞাতসারে কয়েকটী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক চিরন্তন 'ভদ্রতা'র ভাব ত্যাগ করিয়া অনেক সাহসের সহিত একটী ক্ষুদ্রাকার মুদিখানা খুলিয়াছিল। পাড়ার ভদ্রলোকের সহানুভূতি ইহারা পাইয়াছিল নিশ্চয়ই। দোকান কিন্তু টিকিল না। পার্শ্ববর্ত্তী 'অভদ্র' দোকানদারকে কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর দিল "ঘর পরিষ্কার করিতে ঝাঁটা হাতে ধরিলেই বাবুরা ঘামিয়া পড়িতেন, উঁহারা কি পারেন দোকান করিতে?" কিন্তু 'বাবুরা' যে-ভাবে পারেন সে-ভাবে কার্য্যে লাগেন না কেন? 'ভদ্র' ও 'ইতর' একত্র হইয়া বড় সহরের বাহিরে ছোট কাজে লাগিয়া পড়েন না কেন? তাহাতে প্রথম প্রথম বিলাসিতা অবশ্যই ছাড়িতে হইবে, কিন্তু ভাত ছাড়িতে হইবে না। চেষ্টা করিলে তাঁহারা গ্রাম্য কৃষিশিল্পে কতকটা বৈজ্ঞানিক সাহায্য যোগাইতে পারেন। বিজ্ঞান কখন নিশ্চল থাকিতে পারে না। নিত্যই নূতন আবিষ্কার সভ্য জগতের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেছে। গ্রাম্যশিল্প বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃহৎ কারখানার শিল্পের সহিত কখন প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না এ কথা বলা যায় না। গ্রাম্যশিল্পই এ দেশের প্রকৃতিগত, বৃহৎ কারখানা বিদেশী আমদানী। যাহাতে গ্রাম্যশিল্প অনতিবৃহৎ আকারে গ্রামের পাঁচ জনের যৌথ চেষ্টায় প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারে সে দিকে একদিকে আমাদের উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিকগণের অপর দিকে স্বদেশ-সেবী যুবকগণের মনোনিবেশ আবশ্যক।

আর একটা সামাজিক আবশ্যকতা দাঁড়াইয়াছে স্ত্রীশিক্ষা। বৃদ্ধ মনু বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

আমরা ১০।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে কিছু কিছু লেখা পড়া শিখাই। বালক ও বালিকার শিক্ষা যে ঠিক এক রকম হওয়া উচিত নহে একথা অনেকেই বলিবেন কারণ উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন—এদেশে এখনও বহুকাল ভিন্ন থাকিবে। তাই বলিয়া বালকের ২৫।৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার প্রয়োজন আর বালিকার কিছু বর্ণজ্ঞান জন্মিলেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইল এ মতটাও কোন কাজের নয়। বালিকার বিবাহ এ দেশে অল্পবয়সে হয়; তৎপরে সন্তান প্রসব, গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ ইত্যাদি কারণে তাহার শিক্ষা আর যাহা কিছু হয় তাহা প্রধানতঃ সাংসারিক ব্যবস্থায় এবং অধিকতর শিক্ষিত আত্মীয়গণের সাহচর্য্যে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। সংসারে স্ত্রীলোকের স্থান ও নানাক্ষেত্রে কার্য্যকারিতা ক্রমেই বাড়িতেছে, নারীকেও এই বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সাজসজ্জা বাড়াইতে হইবে। কন্যাদায় এখন যেরূপ ভীষণাকার ধারণ করিতেছে তাহাতে বিবাহের বয়স আপনা হইতেই বাড়িতে থাকিবে। একটু চেষ্টা করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে হয়ত বয়স আরও কিছু বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? আজ কাল শিক্ষিত যুবকগণ সাধারণতঃ বিলম্বে বিবাহ করে। বয়সের সামঞ্জস্যও ত রাখা চাই। বাল্য বিবাহ বা অবরোধ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সনাতন প্রথা নহে। বাল্য বিবাহ সম্ভবতঃ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে কিন্তু বেশী বয়সে বিবাহও প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান আকারে অবরোধ প্রথাটা মুসলমান প্রভাব হইতেই জন্মিয়াছে; এখন কিন্তু মুসলমান জগতের স্বাধীনতার কেন্দ্র তুরস্কে ইহা শিথিল। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া বালিকাদের শিক্ষাব বন্দোবস্ত করিলে তাহাদের পক্ষে ত ভালই, যুবকদেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পরস্পরের কার্য্যে সাহায্য বৈবাহিক জীবনের একটী প্রধান সম্পদ। এদেশের শিক্ষিত যুবক এখন সে সম্পদ হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত। বৈষয়িক কার্য্যে সহায়তা দূরে থাকুক, বাহিরে সমানাবস্থাপন্ন পাঁচজনের সহিত তাহার যে যে বিষয়ে আলাপ চলে ঘরে স্ত্রীর সহিত তাহাও সাধারণতঃ চলে না। পারিবারিক জীবনে এটা একটা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সহকর্ম্মিণী না হইতে পারিলে নারী সম্পূর্ণ সহধর্ম্মিণী হইতে পারে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়।

আমাদের সমাজ এখন শিথিল। যথেচ্ছাচারিতা যথেষ্ট চলে কিন্তু প্রকৃত সংস্কার চলে না। সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে কুসংস্কার এমন মস্তক উত্তোলন করে যে তাঁহার ভ্রুভঙ্গীতে শিক্ষার ফল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। হয়ত এমন লোকের মনে পীড়া দিতে হয় যাহাকে কষ্ট দেওয়া ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত নহে। হয়ত পাঁচজন হইতে এমন বিচ্ছিন্ন হইতে হয় যে সে বিচ্ছেদ ঘরে বা বাহিরে কোন স্থানেই কল্যাণপ্রদ নহে। বাহিরের লোকে হয়ত মনে করে ভারতবাসী এরূপ অদ্ভুত জীব কেন? কলেজে এত জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান পড়িয়া ঘরে আসিয়া তুলসী গাছকে প্রণাম করে কেন? কিন্তু তুলসী গাছের সহিত যে ভারতবাসীর কত যুগযুগান্তরের সংস্কার জড়িত, তাহার সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ যে কত সময়সাপেক্ষ তাহাও ত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। সকল সময়েই কিন্তু ভারতবাসী তুলসী গাছে প্রণাম করে না এবং কেহ কেহ উচ্ছৃঙ্খলতার ঝোঁকে দেশে যে ভাল আচার ব্যবহার আছে তাহাও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মণের ছেলে সর্ব্বভুক্ হইয়া অকালে অজীর্ণ রোগের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। অতীতের সহিত যে বর্ত্তমানের একটা সম্পর্ক আছে সেটা ভুলিয়া যাওয়া অপশিক্ষারই ফল। প্রকৃত ব্যবস্থা অতীতের উপর বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠা। তাহার চেষ্টা কই? একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যদিকে কুসংস্কারের ক্রোড়ে অবস্থান—আমাদের অনেককেই ভগবানের রাজ্যে দুই মূর্ত্তিতে বাস করিতে হয়। সমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহার কারণ নৈতিক বল নহে; উচ্ছৃঙ্খলতা ও অক্ষমতাজনিত উপেক্ষা। শিক্ষাও দেশের চিরন্তন পথ ত্যাগ করিয়াছে, সমাজও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়া নূতন পথে যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন শৃঙ্খলার সহিত নিয়মিত হইলেই ফল ভাল হইত।

আমাদের শিক্ষার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট আছে, কিন্তু শক্তি খুব কম। সমাজের মধ্যে তাই সুশৃঙ্খল সংস্কারের পরিবর্ত্তে কপটতা ও অসামঞ্জস্য। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা অধিকতর শিক্ষিত হইলে সংস্কারের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। যে সংস্কার দেশকে ভবিষ্যতে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে, অন্ধ অনুকরণের মধ্যে ডুবাইয়া না দেয়, তাহাই আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলে সমাজ পরিবর্ত্তিত হইবে, আবার সেই সমাজ হইতে লোকে শিক্ষালাভ করিবে ইহাই প্রকৃত পথ। ইহাতে দশের মত চালিত করা আবশ্যক তাই ইহা কিছু সময়সাপেক্ষ, কিন্তু সে সাধনা কোথায় ?

শিক্ষায় আর একটী দোষ প্রবেশ করিতেছে—সাম্প্রদায়িকতা। পূর্ব্বে ইহা ততটা আত্ম-প্রকাশ করে নাই কিন্তু এখন যথেষ্ট করিতেছে। সাধারণ পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুসারে বিদ্যালয় বিভাগ একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। পণ্ডিতের টোল বা মৌলবীর মোক্তাব থাকুক কিন্তু যেখানে উদার পাশ্চাত্য শিক্ষার অবতারণা সেখানে সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন পক্ষের ব্যবস্থা কেন ? ইহাতে কেবল দেশে ভেদবুদ্ধির প্রসার হয় মাত্র।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বিজয়া

আজ সেইদিন, রাজারা যেদিন চাপিয়া কনক-রথে
দিগ্বিজয়ের যাত্রা করিয়া বাহির হইত পথে।
অসাড় জীবনে অসম-সাহস আসিয়া দিত যে নাড়া,
বাজিত শঙ্খ, ধ্বনিত ডঙ্কা, পুরীতে পড়িত সাড়া ;
চীনাংশুকের কেতনে কেতনে চেতনা উঠিত কাঁপি,
শিরায় শিরায় নাচিয়া শোণিত ছুটিত হৃদয় ছাপি ;
কোষে কোষে অসি—থাকিয়া থাকিয়া করিত ঝনৎকার,
অস্ত্রে অস্ত্রে তড়িৎ চমকি উঠিত বারম্বার—।
—তিথি বয়ে যায়, আছ কে কোথায়, পিছে কি পড়িয়া রবে ?
আজি বিজয়ার জয়-অভিযানে এস—কে যাত্রী হবে !

আজ সেই দিন পলকে যে দিন টুটিয়া বিলাস-পাশ,
বিপদে বরিয়া বাহিরিত রথী—দুর্জ্জয় অভিলাষ ;
কানে কুণ্ডল, মাথায় কিরীট, অঙ্গে অস্ত্র-লিখা,
চক্ষে দীপ্তি, বক্ষে সাহস, ললাটে রক্ত টীকা।

পথে পথে পথে পৌর জনের জনতা হয়েছে জড়,
ধায়—তুরঙ্গ ক্ষিপ্রগতিতে, হৃদয় ক্ষিপ্রতর ;
অশ্বক্ষুরের ক্ষিপ্ত ধূলিতে ধূম্র গগনতল,
শৃঙ্গে স্বনিছে, "সমুখে সাহসী !" ধ্বনিছে, "অগ্রে চল্ !"
তিথি অনুকূল—সৈনিক, আর দেরী নয়, দেরী নয়,
পুর ছাড়ি দূরে কে যাবে করিতে অজানা রাজ্য-জয় ?

আজ সেই দিন, অশ্বপৃষ্ঠে রাণা, রাজ অনুচর,
যেদিন ছুটিত দিকে দিকে দিকে—স্কন্ধে ধনুঃশর ;
ছুটিত—মথিয়া ঘন অরণ্য, নিবিড়তা ভেদ করি,
মৃত্যুর মত মৃগের পিছনে, ভয়াল ভল্ল ধরি ;
ভয়ে শার্দ্দূল নিঃসাড়-পদে পলাত গোপনে দূরে,
বিবরে সিংহ লুকাতে চাহিত মরুর প্রান্ত ঘুরে ;
ছুটিত—ঊষার আলোকে জাগিয়া উন্মাদ উল্লাসে,
ছুটিত তখনো—সন্ধ্যা-তিমির শিরে ঘনাইয়া আসে।
বিদ্যুদ্বেগে,—জীবনের এই রশ্মি করিয়া শ্লথ,
কে ছুটিবে শূর, মৃগয়ায় দূর, না চাহি পিছনে পথ !

আজ সেই দিন, যে দিন হইলা পূর্ণমনস্কাম,
অকাল দেবার্চ্চনায় আর্ত্ত মানব-দেবতা রাম।
রক্ষঃ ভুলিল রক্ষামন্ত্র, শক্তি হরিল—মায়া,
মরণের আগে মৃত্যু মেলিল কৃষ্ণ করাল ছায়া,
শিহরিয়া উঠে স্বর্ণলঙ্কা, রাক্ষসী হৃদি ডরে।
ধর্ম্মের গ্লানি দূরিতে—ভারতে কে আসে যুগান্তরে ?
নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপিতে—নাশি দুষ্কৃতে নব,
করে কার্ম্মুক আবির্ভূত কে অভীত করিয়া ভব !
জাগো অযোধ্যা, আসে রঘুনাথ, করিওনা আর দেরী
রাবণ-বিজয়ী বীরেরে বরিতে,—দুয়ারে বাজিছে ভেরী !

আজ সেই দিন,—শত্রু মিত্র মিলি একত্রে সবে,
নব জীবনের গরিমা-গর্ব্বে জগতে দাঁড়াতে হবে !
আপনার যারা হয়ে গেছে পর, এই মাহেন্দ্রক্ষণে
বক্ষে সবলে বাঁধিতে হইবে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে।

মর্ম্মহরণ প্রেমের মন্ত্রে—অসীম শক্তিময়,
অজানা জিনিয়া করিতে হইবে হৃদয়-দিগ্বিজয়।
বীরাষ্টমীর ব্রত পালিয়াছি—ভুবনবিজয়ী বীর,
সে ব্রত করিব পূর্ণ—প্রভাতে এ পুণ্য দশমীর।
আর দেরী নয়, এসেছে সময়, ধ্বনিচে শঙ্খরবে—
আজি বিজয়ার জয়-অভিযানে এস—কে যাত্রী হবে!

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রাচীন রোমে নারী স্বাধীনতার ক্রমবিকাশ

হিন্দুসমাজে আজ নারীর যেরূপ অবস্থা, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোমের সমাজে নারীর অনেকটা সেইরূপ অবস্থাই ছিল। ইতিহাস অতীতের সাক্ষ্য দিয়া মানবের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। তাই প্রাচীন রোমের নারীর অবস্থার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের ঘরের সমস্যার উত্তর পাইতে প্রয়াসী হইতেছি।

রোম তখন একটি ক্ষুদ্র নগরী। কিন্তু রোম ক্রমে ক্রমে লেসিয়াম, ইতালী. প্রভৃতি জয় করিল, এবং একদিন সমগ্র সভ্যজগতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী হইয়া বসিল। রোমের এইরূপ ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমের নারীর অধিকারও বৃদ্ধি পাইল। রোমের নারী প্রথমে হিন্দুনারীর মতন অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে কোন কোন্ ঘটনার মধ্যে, কি কারণে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাইল তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে রোমে নারী স্বাধীনতার ফলে কি ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়াছিল তাহাই দেখাইব।

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—নারী কখনও স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে, ইহাই ছিল রোমের প্রথম যুগের সামাজিক মূলমন্ত্র। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন হইয়া রোমের নারীকে সে যুগে বাস করিতে হইত। পিতা ছিলেন সংসারের সর্ববিষয়ে কর্ত্তা। তিনি তাঁহার পরিবারস্থ পুত্র কন্যা, স্ত্রী ও দাসদাসীকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন। তিনি যদি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও হত্যাও করিতেন, তাহা হইলে আইন অনুসারে তাঁহার কোন দণ্ড হইত না। সেইজন্য কোন কন্যা তাঁহার পিতার বিন্দুমাত্র অবাধ্য হইতে পারিতেন না।

প্রাচীন রোমে আমাদের দেশের মতন মেয়ের যৌবনোদ্গমের লক্ষণ দেখা দিবামাত্র বিবাহ স্থির করা হইত। বিবাহও কতকটা আমাদের দেশের মতন ছিল। উভয় পক্ষের মাতাপিতা বা অভিভাবকেরা বরকন্যা স্থির করিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতেন। বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দান হইত। কিন্তু

ইউরোপে আজকাল যেমন বাগ্‌দানের পরই বর ইচ্ছা করিলে কন্যাকে স্ত্রীর মতন ব্যবহার করিতে পারেন, রোমে সেরূপ পারিতেন না। সেনেকা বলিয়াছেন যে, পশু, দাস, আহার্য্য বা বস্ত্রাভরণ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে চাখিয়া দেখা যাইতে পারে, কিন্তু বর কখনও বাগ্‌দত্তাকে চাখিয়া দেখিতে পারেন না। এমন কি বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যায় দেখাশুনাই হইত না। আমাদের দেশের ঘটক সম্প্রদায়ের ন্যায় একশ্রেণীর বিবাহের দালাল রোমে ছিল। তাহারাই বিবাহ সম্বন্ধ জুটাইয়া দিত। অনেক সময়ে নিতান্ত শিশুকালেই বাগ্দান হইত। কিন্তু তের বৎসরের কমে মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হইত না। পরবর্ত্তী কালে নিয়ম করা হইয়াছিল যে, কুড়ি বৎসরের বেশী বয়স হইলে মেয়েদের বিবাহ না করার দরুণ জরিমানা দিতে হইবে।

প্রথমে কেবলমাত্র পেট্রিসিয়ান নামক রোমের সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ আইনসঙ্গত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিতেন। তাঁহাদের মধ্যে রোমের ইতিহাসের প্রথম যুগে যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম confarreatia. এই প্রকারের বিবাহে রোমের প্রধান পুরোহিত বা Portifex Maximus উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের অনুমোদন বিবাহে প্রদত্ত হইত। দেবতা সাক্ষী রাখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং যদিও আইন মতে ইহা ছেদন করা যাইত, ইহার বন্ধন ছেদন করিতে কেহই সাধারণতঃ অগ্রসর হইত না। যখন রোমের রাষ্ট্রের মধ্যে প্লিবিয়ান্ বা সাধারণ সম্প্রদায় স্থান লাভ করিল, তখন আরও দুই প্রকার বিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইল। এক প্রকারের নাম Coemptio—ইহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইত না। আইনের সাহায্যে স্ত্রীকে পিতার বংশ হইতে স্বামীর বংশে স্থানান্তরিত করা হইত। আর এক প্রকার বিবাহ ছিল তাহা অনেকটা আমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহের মতন। কোন নরনারী একবৎসর কাল স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বাস করিলেই এ বিবাহ সিদ্ধ হইত। কিন্তু নারী যদি এই এক বৎসরের মধ্যে একাদিক্রমে তিন দিন অন্য গৃহে বাস করিত, তাহা হইলেই বিবাহ অসিদ্ধ হইত।

বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর অধীন হইয়া বাস করিতেন। আইনের চক্ষে গৃহস্বামী তাঁহার নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় স্ত্রীরও পিতারূপে বিবেচিত হইতেন। প্রথম যুগে রোমের নারীর সত্তা বা স্বাধীনতা অতি অল্পই ছিল। কিন্তু আইন যাহাই বলুক না কেন, স্বামী স্ত্রীকে শ্রদ্ধা সম্মান করিয়া চলিতেন। আমরা যেমন নারীকে রক্ষাও করি, শ্রদ্ধাও করি, প্রাচীন যুগের রোমানগণও ঠিক তেমনি করিতেন। রোমান স্ত্রীদিগকে রন্ধন বা গৃহ মার্জ্জনাদি কার্য্য করিতে হইত না। এরূপ কার্য্য দাসীরা করিত—এ কার্য্য করা তাঁহারা আত্মসম্মানের হানিকর মনে করিতেন। স্বামীর সহিত গার্হস্থ্য ব্যাপারে সকল বিষয়ে তিনি সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। গৃহের গৃহিণীস্বরূপে তিনি সেখানে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন। দাসদাসীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। তিনি প্রত্যহ চরখা কাটিতেন। চরখার সূতা দিয়া কাপড় জামা পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতেন। রোম যখন বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে তখনও এই চরখা কাটা অভ্যাস

সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ রাখিয়াছিলেন। রোমের প্রথম সম্রাট আগষ্টোসের কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী চরখায় সূতা কাটিতেন।

গ্রীসে যেমন নারীকে একেবারে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখা হইত, রোমে সেরূপ হইত না। রোমে ভোজ বা উৎসবের সময় মেয়েরা যোগ দিতে পারিতেন। স্বামীর বন্ধুবান্ধব গৃহে আসিলে তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন করিতেন। কোথাও বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করিলে তাহাও পারিতেন।

রোমের প্রথম যুগে স্বামীরা স্ত্রীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেন। পিউনিক যুদ্ধের পূর্ব্বে সেখানে গ্রীসের ন্যায় সখী-জাতীয়া গণিকার আবির্ভাব হয় নাই। স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রণয় সম্বন্ধে রোমের ইতিহাসে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রাকাই ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা একদিন শয্যার উপর এক সর্প-দম্পতীকে দেখিতে পান। তিনি এ বিষয়ে জ্যোতিষীদের পরামর্শ চাহিলে, তাঁহারা বলেন যে, তিনি যেন দুইটিকেই চলিয়া যাইতে না দেন বা মারিয়া ফেলিতে না দেন। যদি পুরুষ সর্পটীকে মারেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং মারা যাইবেন, আর স্ত্রী সর্পটীকে মারিলে তাঁহার স্ত্রী মারা যাইবেন। তিনি তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া পুরুষ সর্পটীকেই মারিতে বলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী কর্ণেলিয়াকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল, কিন্তু কর্ণেলিয়া তখনও যুবতী। তাই এরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি সত্যই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রাচীন রোমে নারীর প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে কোরিওলানাসের কাহিনীর উল্লেখ করিতে হয়। কোরিওলানাস রোমের জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভলসিয়ানদের দেশে যাইলেন। তিনি অসমসাহসী যোদ্ধা। রোমের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল। তাই তিনি ভলসিয়ান সৈন্যদলের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া রোম আক্রমণ করিতে চলিলেন। রোমের সমস্ত সৈন্য তাঁহার নিকট পরাজিত হইল। রোমের স্বাধীনতা তখন লুপ্তপ্রায়। দেশের নারীশক্তি তখন একবার এই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াসী হইল। কোরিওলানাসের মাতা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রোমের মহিলাবৃন্দ তাঁহার নিকট দেশের মুক্তি প্রার্থনা করিতে আসিলেন। নারীর এই প্রার্থনায় কোরিওলানাসের ন্যায় বীরের প্রতিহিংসার অটল সংকল্প কোথায় দূর হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে রোমের আরও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার নিকট এজন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এবার কিন্তু আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—এযে তাঁহার মায়ের আদেশ—পত্নীর অনুরোধ। কিন্তু ভলসিয়ান সৈন্যদলকে এইভাবে ফিরাইয়া লইয়া গেলে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। তাহা জানিয়াও রোমের বীরপুত্র মাতা ও পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করিলেন। ভলসিয়ানদের দেশে ফিরিয়া গেলে তাঁহারা তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল।

রোমের এই প্রথম যুগে নারীর সতীত্বের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা হইত। সে যুগে বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল রোমের জন্য সুসন্তান উৎপাদন করা। নারীর সতীত্ব না থাকিলে, সে কখনই বীর-

সন্তান প্রসব করিতে পারে না। আর কোন রোমান রমণী যদি তাহার নিজকুল ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়া গর্ভবতী হইত, তবে সে সন্তান প্রকৃত রোমান বলিয়াই গণ্য হইত না। এই জন্যই রোমে নারীকে গৃহ মধ্যে সাধারণতঃ রাখা হইত। পুরুষ যখনই অত্যাচারী হইয়া নারীর সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনই রোমে বিপ্লব বাধিয়াছে। রোমের শেষ রাজার পুত্র লুক্রেসিয়ার প্রতি অত্যাচার করায় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল। এমন কি কথিত আছে যে, রোম সেই হইতে আর কোন রাজাকে রাষ্ট্রের ভার প্রদান না করিয়া গণতন্ত্র-প্রথা প্রচলন করে। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন আইন প্রণয়নের জন্য দশজন বিচারক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে আপিয়াস ক্লডিয়াস্ নামক একজন বিচারক ভার্জ্জিনিয়া নাম্নী কুমারীর প্রতি নিজের কুভাব প্রকাশ করায় তাহাকেও রোমানগণ ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিয়াছিল।

প্রাচীন রোমে নারীকে যে উপযুক্তরূপ শ্রদ্ধা-সম্মান দেখান হইত, তাহা আমরা Vestal Virgins নাম্নী মহিলাগণের অবস্থা হইতে বুঝিতে পারি। ইঁহাদের উপর রোমের ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটী প্রধান অংশের ভার অর্পিত ছিল। লোকে ইঁহাদিগকে যারপর নাই সম্মান করিত। তাঁহারা কখনও বিবাহ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের পিতার যে কোনরূপ অধিকার তাঁহাদের উপর ছিল তাহা নহে। তাঁহারা নিজের ক্ষমতায় সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিতেন। যদি কেহ ইঙ্গিতেও তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিত, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইত। কিন্তু যদি কোন vestal virgin নিজে তাঁহার কুমারীব্রত ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোলাইন গেটের তলায় জীবন্তে পুঁতিয়া মারিয়া ফেলা হইত। সতীত্বের অতি উচ্চ আদর্শ রোমান সমাজে তৎকালে প্রচলিত থাকায় এইরূপ কঠোর শাস্তির বিধান করা হইয়াছিল। যে ঘরটীতে অপরাধিনীকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হইত, সেই ঘরটী গেটের তলায় নির্ম্মিত হইত। ছোট্ট ঘরটীর মধ্যে একটী শয্যা, একটী জ্বলন্ত বাতি ও কিছু সামান্য খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইত। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, vestal virginএর ন্যায় পবিত্র ব্যক্তিকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলা উচিত নহে। পাল্কীতে চড়াইয়া অপরাধিনীকে সেই সমাধির নিকট লইয়া যাওয়া হইত। রোমের অধিবাসিবৃন্দ নীরবে বিষণ্নবদনে তাঁহার অনুগমন করিত। এই নিস্তব্ধতার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এমন এক ভীষণ ভাব জাগিয়া উঠিত যে, লোকে সতীত্বের মর্য্যাদা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিত। গেটের নিকট লইয়া যাইয়া একটী মই দ্বারা অপরাধিনীকে নামাইয়া দিয়া, মই তুলিয়া লওয়া হইত।

রোম যখন ক্ষুদ্র একটা নগর মাত্র ছিল, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ইতালীর উপর তাহার অধিকার বিস্তার হওয়া কাল পর্য্যন্ত নারীর এইরূপ অবস্থা ও অধিকার ছিল। কিন্তু রোমের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর মনেও আইনসঙ্গত অধিকার লাভের ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। বোধ হয় সেই সুপ্রাচীন যুগের নারীদের মনেও আজিকার মতন পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পাইবার স্পৃহা জাগিয়াছিল। কতকগুলি কারণে তাঁহাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

রোমে নারীর মুক্তির প্রধান কারণ হইল তাহার আয়তন বৃদ্ধি। রোম যখন আর ক্ষুদ্র একটী নগরমাত্র রহিল না, তখন কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য আর নারীকে কুলের মধ্যেই বিবাহ দিবার প্রয়োজন থাকিল না। রোম ক্রমে ক্রমে ইতালীর সর্ব্বাংশের লোকদিগকে রোমান্ নাগরিকের অধিকার প্রদান করিল। তখন রোমের নারীরা ইতালীর সর্ব্বত্র বিবাহ করিতে অনুমতি পাইল। কুলধর্ম্মের সনাতন বন্ধন হইতে যখন নারী এইরূপে মুক্তিলাভ করিল, তখন তাহার মুক্তিপথের অন্যান্য বিঘ্নও সহজে দূরীভূত হইতে লাগিল।

নব নব রাজ্য জয়ের ফলে রোমের ঐশ্বর্য্য বিপুল হইতে বিপুলতর হইতে লাগিল। এই অগাধ ঐশ্বর্য্যই প্রকারান্তরে নারী-স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। কার্থেজের সহিত রোম যখন জীবনযুদ্ধে জয়ী হইল, তখন গ্রীস, ম্যাসিডন, স্পেন, পার্থিয়া প্রভৃতি দেশগুলি একে একে তাহার হস্তগত হইল। রোমের সকল পুরুষই এ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। তাই জয়ের পর সকলেই অগাধ ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইল। প্রথম যুগে রোমে পিতারা কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে পর করিয়া দিতেন। তাঁহারা তখন গরীব লোক ছিলেন। তাঁহারা ছেলেদের কোনরূপে মানুষ করিয়া তুলিতেন কিন্তু মেয়েদের টাকা দেন এমন সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। এখন তাঁহাদের হাতে অনেক টাকা হইল। নিজের ছেলে মেয়েকে পারতপক্ষে কে অসুখী দেখিতে চায়? তাই এযুগের পিতারা ছেলেদের যেমন টাকা দিতেন, মেয়েদেরও সেইরূপ দিতেন। প্রথমে তো মেয়েদের কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু আইনের মারপ্যাঁচকে বদলাইয়া পিতারা নানা কৌশলে মেয়েদিগকে টাকা দিতে লাগিলেন। পরে রমণীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবার ক্ষমতাও আইনানুসারে সিদ্ধ হইল। কিন্তু পুরুষেরা ইহাতে অনেক বাধা দিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭৯ অব্দে Lex Voconia নামক আইনের দ্বারা এই নিয়ম করা হয় যে কোন নারী এক লক্ষ আসের বেশীর অধিকারিণী হইতে পারিবেন না। এই আইন হইতেই বুঝা যায় যে, তখন অনেক রমণী এরূপ সম্পত্তিশালিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই আইন কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হয় নাই। পিতা মৃত্যুকালে কন্যাকে পুত্রদের ন্যায় ধন দিয়া যাইতেন, স্বামী তাঁহার স্ত্রীর জন্য ধন রাখিয়া যাইতেন। এইরূপে রোমের রমণীরা ধনশালিনী হইলেন। অর্থবলে কি না হয়? অর্থের বলেই রোমের নারী অনেক স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইলেন। রোমের প্রথম যুগে নারী কোন কাজই নিজের নামে করিতে পারিতেন না। কিন্তু সে আইন উঠিয়া গেল, নারী স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য মোকদ্দমা প্রভৃতি করিবার অধিকারিণী হইলেন।

কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিমাত্র, এরূপ বিধি থাকিবে, ততদিন নারীর স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশামাত্র রহিবে। তাই বিবাহের পুরাতন রীতি পরিত্যাগ করিয়া রোমের নারীরা নূতন একনিয়মে বিবাহিত হইতে লাগিলেন। কিরূপে এই আইনের প্রবর্ত্তন হইল, এরূপ নূতন বিবাহ-প্রথা কতদিন হইতে প্রচলিত ছিল—ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বহু বাদ

বিসম্বাদ আছে। কিন্তু ইহা স্থির যে, পিউনিক যুদ্ধের পর হইতে এই নূতনতর বিবাহ বন্ধনেই অধিকাংশ রমণী আবদ্ধা হইতেন। ইহার নাম Sene conventional. এইরূপ বিবাহে স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন অধিকারই থাকিত না। নারী বিবাহিতা হইলেও পিতার অধিকারই তাহার উপর বেশী থাকিত।

পিতা ইচ্ছা করিলে কন্যার অনিচ্ছা সত্বেও স্বামীর সহিত কন্যার সম্বন্ধ মোচন করিয়া দিতে পারিতেন। কন্যার বিবাহ দ্বারা গোত্র পরিবর্ত্তন হইত না—তিনি স্বামীর সহিত পৃথক গোত্রেই থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কন্যার উপরে পিতার অধিকারকে সমাজ মন্দভাবে দেখিতে আরম্ভ করিল। আর তাহা ছাড়া পিতা কিছু স্বামীর ন্যায় দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকেন না। তাই রোমের মেয়েরা এইরূপ বিবাহ-প্রথা দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহাদের সম্পত্তি, যৌতুক প্রভৃতি তাঁহাদের নিজস্ব সামগ্রী হইল। স্বামীর তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবারও ক্ষমতা রহিল না। সকল পিতা কন্যাকে বিবাহের সময় প্রচুর যৌতুক দিতেন। যৌতুকের সুদেই কন্যার ভরণপোষণ চলিতে পারিত। সুতরাং তাঁহাকে অন্ন বস্ত্রের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষিণী হইয়া থাকিতে হইত না। আজ ইউরোপে নারীকে আর্থিক স্বাধীনতা দিবার জন্য নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আর্থিক অধীনতাই নারীর স্বাধীন হইবার পথে প্রধান অন্তরায়। রোমের অতুল ঐশ্বর্য্যের ফলে পিতার যৌতুকে কন্যারা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ দানে যে স্বাধীনতার উৎপত্তি, যে স্বাধীনতা পাইতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয় না, যে স্বাধীনতা পাইলে অলস বিলাসে জীবন কাটাইবার সুযোগ পাওয়া যায়, সে স্বাধীনতা যে নারীর পক্ষে বা সমাজের পক্ষে মঙ্গলের কারণ নহে, তাহা পরে দেখাইব।

নূতনতর বিবাহ-প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। বিবাহ-বন্ধন ছেদন করা অবশ্য রোমের প্রাচীনতম দ্বাদশ আইনেরও অনুমোদিত ছিল। কিন্তু এই নূতন যুগে যেরূপ বিবাহ-বন্ধন ছেদন করা ফ্যাশনের মধ্যে দাঁড়াইল, সে যুগে তাহা কখনই ছিল না। উভয় পক্ষের সম্পত্তির উপর নূতনতর বিবাহ নির্ভর করিত, সুতরাং যখনই তাঁহাদের মধ্যে কেহ সে বন্ধন ছেদনে ইচ্ছুক হইতেন, তখনই স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের অবসান হইত। যে পাথরখানিতে বিবাহের সাক্ষীদের নাম সহি থাকিত সে পাথরখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা স্ত্রীর নিকট হইতে সংসারের ভার লইলেই বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হইত। প্রথমে রাষ্ট্র হইতে এই বিবাহ-ছেদন ব্যাপারে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা হইত না। কিন্তু যখন অকারণে নরনারী বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে লাগিলেন, তখন সম্রাট আগস্টাস্ নিয়ম করিলেন যে, বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে হইলে আটজন পূর্ণবয়স্ক রোমান সাক্ষী রাখিয়া দলিল দ্বারা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু সম্রাট স্বয়ংই গর্হিত উপায়ে পত্নীলাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার এ আদেশ দ্বারা বিবাহবন্ধন ছেদের সংখ্যা হ্রাস পায় নাই। এইরূপ বিবাহ-ছেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেনেকা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন,—নারীরা আর এখন কতজন

কন্‌সাল শাসন করিল, তাহার দ্বারা বৎসর গণনা করে না, তাহারা কতবার স্বামী ত্যাগ করিল, তাহাই তাহাদের সময় নির্ণায়ক। সে যুগের সকল প্রসিদ্ধ নরনারীই একাধিক বার বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন। ওভিড ও ছোটপ্লিনি তিনবার, সিজার ও অ্যাণ্টনি চারিবার, স্থূলা ও পম্পে পাঁচবার স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। নারীদের মধ্যে একজন ৫ বৎসরে আটটী স্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এরূপ নারীর ইচ্ছাক্রমে যেখানে বিবাহ-বন্ধন ছেদন করা যাইত, সেখানে নারীর যে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সে যুগে অবিবাহিতারা কিন্তু বিশেষ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে গৃহের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে হইত। সেইজন্য সকলেই বিবাহিতা হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেন। কিন্তু এমন স্বাধীন বৃত্তিশালিনী নারী অনেক ছিলেন, যাঁহারা প্রকৃত বিবাহ ব্যাপারটীকেই ভয় করিতেন। তাই একরূপ কল্পিত বিবাহে তাঁহারা আবদ্ধ হইতেন। কুমারী থাকিলে যে জরিমানা দিতে হইত, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও তাঁহারা এরূপ বিবাহ করিতেন। গরীব লোকেদের কিছু টাকা দিয়া এই বিবাহে তাঁহারা রাজী করিতেন। এইরূপে নানা কারণে নানা উপায়ে রোমে নারী যে স্বাধীনতালাভ করিল, তাহাতে কিরূপ ফল হইল, সে বিষয়ে আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

কোথা ?

কোথা গেল মন মোর, ছিঁড়িয়া বাঁধন ডোর,
ছাড়িয়া কিনারে ?
স্মৃতির বিপুল ভার, স্বপ্ন সম সুকুমার,
ভুলি বেদনারে।
আকাশ ধূসর কায়া রং তার ধূপ ছায়া
নব জল ভারে,
তারি 'পরে ভাসে মেঘ, বায়ু অতি লঘুবেগ,
বহিছে তাহারে
কমলের দল হেন তব লিপি-খানি যেন
দূর পর-পারে !

লিখেছিলে যত কথা, তার সুখ তার ব্যথা,
অপগত ভার—
আজিকে জীবন হ'তে ভেসেছে অবাধ স্রোতে,
কেবলি দোঁহার
আছিল যা একদিন, কোথায় সুদূরলীন ;
তোমার আমার !
বাসা বাঁধা সুখ যত, শেজ সাজ কত মত
ধূপ দীপাধার
পড়ে আছে একে একে, চোখে পড়ে থেকে থেকে,
নাই ব্যবহার !

মরমের মঞ্জুষায়, ভরেছিনু যে আশায়,
অনেক সঞ্চয়,
কাজ ফুরায়েছে তার, যাক্, যেথা ইচ্ছা যার,
হোক্ যাহা হয় !
আমার মিটেছে সাধ, আসিয়াছে অবসাদ,
আশা, আলো, ভয়,
গানের পসরাখানি, নীরব মরমবাণী,
সমান উভয় !
খাঁচা-খোলা নীল পাখী, দিল যাহা ছিল বাকী,
নূতন বিজয় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

খেয়ালী

(৬)

সীতার পিতা নরেশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়াই গ্রামে থাকিতে হইত,—যদিও গ্রামে পড়িয়া থাকাটা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিরণবালার কোন দিনই মনঃপূত ছিল না। নরেশচন্দ্র গ্রামে থাকিয়াই কনট্রাক্টরের কায করিতেন এবং তাহাতে বেশ দু' পয়সা রোজগারও করিতেন। চাকরীর বাজার সুলভ তো নহেই, তা ছাড়া, কেরাণীগিরির নিতান্ত পরিমিত বেতন এবং অপরিবর্ত্তনীয় দাসত্ব অপেক্ষা কন্‌টাকটরের কাযটা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ বলিয়া নরেশচন্দ্র মনে করিতেন।

নরেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরেশচন্দ্র সস্ত্রীক রেঙ্গুনে থাকিত। সম্প্রতি সে তিন মাসের ছুটিতে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে লইয়া দেশে আসিয়াছে। বীরেশের স্ত্রী অপরাজিতার চেয়ে কিরণের বসন-ভূষণ ঢের বেশী থাকিলেও কিরণ চাকরীতে দেবরকেই অধিকতর সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত। গ্রামের কোণে পড়িয়া থাকা এবং খুঁটিনাটি প্রত্যেক ব্যাপার লইয়া করুণার সঙ্গে ঝগড়া করা, ইহা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামে না আছে গাড়ী ঘোড়া, না আছে বায়স্কোপ থিয়েটার। তাহার লুব্ধ ও মুগ্ধ মন পিতার সহিত কলিকাতা প্রবাসের কথা অনেক সময় ভাবিত। পিতা এখন জীবিত থাকিলে কিরণ বছরে দু'মাস কলিকাতা থাকিয়াও জুড়াইয়া আসিতে পারিত।

কিরণের বিবাহের কিছু পূর্ব্বেই সীতার বড়দিদি অমিতা ও মেজ দিদি ললিতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অমিতা কিরণের কিছু বড়, ললিতা সমবয়স্কা। অমিতা ও ললিতা যখন এখানে আসিত, তখন পিসিমার সহিতই তাহাদের যত কিছু আবদার। কিন্তু একটুকু মেয়ে সীতাকেও যে করুণা কিরণের সান্নিধ্য হইতে বহু দূরে সরাইয়া রাখিবেন, ইহা কিরণ কেন সহ্য করিতে যাইবে? তাহার কথার জবাবে করুণা কিছু না বলিয়া ঠাকুর ঘরে যাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, ইহাতে তাহার রাগ না কমিয়া বাড়িয়াই গেল। করুণা কিছু বলিলে, তাহার উত্তরে আরও শক্ত শক্ত দু' কথা শুনাইয়া দিতে পারিলে হয় তো তাহার কোপ শান্তি হইত। কিন্তু করুণা চুপ করিয়া যাওয়ায় তাহা তো হইল না।

কিরণ যখন রুদ্ধ রোষে ঘরে বসিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, তখন অপরাজিতা ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া সঙ্কুচিত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, সীতা কি এখন ভাত খাবে? সকালে তার খাওয়া ভাল—"

কিরণ তাহাকে মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া বলিল, "সীতাকে যখন আমি পেটে ধরিনি, তখন তার কথা আমি কি বলব? তোমাদের যা খুসী করগে।"

একথার উপর আর কোন কথা বলা চলে না। অপরাজিতা ক্ষুন্ন মনে ফিরিয়া গেল।

কিরণ অপরাজিতার বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও অপরাজিতা তাহাকে বেশ একটুখানি ভয় করিয়াই চলিত। ভাসুর ও ননদ যাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন, তাহার হুকুম অমান্য করিয়া সীতাকে খাবার দিতে তাহার ভরসা হইল না। কিন্তু দণ্ডিতা সীতার শুষ্ক চক্ষু ও ম্লান মুখ দেখিয়া তাহার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিল। এমনি সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একটী পুলের কাজ দেখিয়া নরেশচন্দ্র ফিরিলেন। দাওয়ায় ক্রীড়ারত খোকাকে তুলিয়া বুকে লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন। তারপর স্ত্রীর মেঘাবৃত মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ শঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই?"

"আমার শরীর আবার ভাল থাকেনা কবে?" বলিয়া কিরণ উঠিয়া চাকরকে ডাকিয়া বাবুর হাত মুখ ধুইতে জল দিতে বলিল।

বেশী ঘাঁটা ঘাঁটি করা নিরাপদ নয় জানিয়া নরেশচন্দ্র নীরবে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিলেন। কিরণ তাহাকে খাবার আনিয়া দিলে খোকাকে কোলে বসাইয়া তাহার মুখে কিছু খাবার দিয়া নিজে খাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে খোকা ডান হাত খানা সরবতের গ্লাসের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া বাঁ হাতে খানিকটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া দিল। নরেশচন্দ্র খোকার কাণ্ড দেখিয়া হাসিমুখে স্ত্রীকে বলিলেন, "দেখেছ, খোকা কি দুষ্ট হয়েছে।"

স্বামী-পুত্রের মিলন দৃশ্যটা কিরণের মুখের জমাট মেঘ অনেকখানি হালকা করিয়া দিল। সে বলিল, "খোকাকে আমার কাছে দাও, ও তোমাকে সুস্থ হয়ে খেতে দেবেনা।"

নরেশচন্দ্র জবাব দিলেন, "না, না, ও এ রকম না করলে আমার খাওয়াই যে হবে না।" এই বলিয়া পরম আদরে খোকার পুরন্ত গাল দুটি টিপিয়া দিলেন।

পিতার জলযোগের সময়ে সীতা আসিয়া প্রায়ই পিতার কাছে দাঁড়াইত। আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া নরেশচন্দ্র বলিলেন, "সীতা যে এক ভাবেই উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, খাবার কাছে যে একবারও এল না ?"

কিরণ গম্ভীরমুখে বলিল, "শ্লেট ভাঙ্গার জন্যে ওকে শাস্তি দিয়েছি।"

"সেদিন বই হারিয়েছে, আজ আবার স্লেট ভেঙ্গেছে! মেয়েটা ভয়ানক পাজি হয়ে উঠেছে দেখছি।"

"ঠাকুরঝির আদরে আরো বেশী বিগড়ে যাচ্ছে। ঠাকুরঝি যে তাঁর দাদার আদুরে বোন, তাঁকে তো কারু কিছু বলবার উপায় নেই।"

নরেশচন্দ্র কোন জবাব দিলেন না। করুণার বিরুদ্ধে অনেক নালিশই তিনি কিরণের মুখে শুনিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিকার করিবার চেষ্টা তিনি কোন দিনই করিতে পরেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার জন্য তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণবিদ্ধ হইয়াও তিনি নির্ব্বাক রহিয়াছেন। আজও নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া উঠিলেন।

বাহিরে বীরেশের পদশব্দ শুনা গেল। সে দীর্ঘ অলস মধ্যাহ্নটা কাটাইবার জন্য ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে গিয়াছিল। কিন্তু একটা মাছ ধরাও হয় নাই। ঘোষেদের পুকুর পাড়ে বয়স্কদের গল্পের মজলিস বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। সেই মজলিসে যোগদান করিয়া মাছ ধরার চেয়ে বেশী আনন্দই সে ভোগ করিয়া আসিয়াছে। নরেশচন্দ্র শুনিলেন, সে করুণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, সীতা অমন করে উঠানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

করুণা জবাব দিলেন, "ওর মা ওকে সাজা দিয়েছে।"

"অপরাধ ?"

"বাগান থেকে আম ওর হাতে পড়ে শ্লেট ভেঙ্গে গেছে।"

"অমার্জ্জনীয় অপরাধ বটে। যোগ্য হাকিমের যোগ্য বিচার।" বলিয়াই বীরেন হাতের

ছিপটা ঘরের কোণে ঠেসান দিয়া রাখিয়া দ্রুতপদে যাইয়া সীতাকে কোলে তুলিয়া লইল। স্নিগ্ধ স্নেহ স্পর্শে এতক্ষণ পরে সীতা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—জলভারাক্রান্ত মেঘ এখন অজস্র ধারায় বর্ষণ করিতে লাগিল।

বীরেশ নিজে হাসিয়া অজস্র আদরে সীতার মুখে হাসি ফুটাইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া স্ত্রীকে বলিল, "শীগ্‌গির ওকে খেতে দাও। নিজে খেয়ে দেয়ে আরাম করছ, আর এই কচি মেয়েটা ন'টার পর থেকে কিছু খায়নি। আচ্ছা তোমার নিজের মেয়ে ইরা যদি এতক্ষণ না খেয়ে থাকত, তা হলে কি করতে?"

অপরাজিতা চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আঃ, কি বলছ! দিদি শুনতে পেলে কি মনে করবেন?"

বীরেশ সীতার কান বাঁচাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি তো আর দাদা নই যে তোমার দিদিকে পুলিশের দারোগা অথবা আফিসের বড় সাহেব বলে ভয় করে চলব?"

অপরাজিতা আর কোন কথা না বলিয়া সীতাকে লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। কোন কথা বলিলে হয় তো বীরেশ হাসিয়া, চেঁচাইয়া কিসে কি বলিয়া বসিবে, তার ঠিক নাই। স্বামীর মুক্ত কণ্ঠ এবং মুক্ত হৃদয় অপরাজিতার নিঃতিশয় গর্ব্বের বিষয় হইলেও স্থান ও কাল বিশেষে এই দুটি জিনিষকে সে ভয় করিয়াও চলিত।

স্ত্রী চলিয়া গেলে বীরেশের ইচ্ছা হইল, সন্তান-শাসন-নীতি সম্বন্ধে ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীকে বেশ দু'কথা বলিয়া আসে; কিন্তু কিরণ সম্বন্ধে অন্ততঃ বাহিরে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকার প্রতিশ্রুতি সে ইতিপূর্ব্বেই অপরাজিতাকে দিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহা মনে পড়ায় সে থামিয়া গেল।

সীতার খাওয়া হইলে বীরেশ তাহাকে, ইরাকে এবং খোকাকে ডাকিয়া লইয়া আঙ্গিনায় খেলিতে বসিয়া গেল। কিরণের গাম্ভীর্য্য ও উত্তাপ সমস্ত বাড়ীটা এতক্ষণ যেন গম্ভীর উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। শিশুদের এবং শিশুসম বীরেশের খেলার তরলতা এবং উচ্চ হাসির লহর রূপকথার সোনার কাঠির মোহন স্পর্শের মত বাড়ীটা জীবন্ত ও পুলকিত করিয়া তুলিল। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খেলা চলিল। তারপর বীরেশ সীতা ও ইরাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

বীরেশ খোকাকে লইয়া না যাওয়ায় কিরণ স্বামীকে বলিল, "দেখলে, মেয়ে আর ভাইঝিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন; আমার খোকা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে।"

নরেশ কুলিদের পাওনার হিসাব খতাইতে ছিলেন। তিনি মাথা না তুলিয়াই বলিলেন, "খোকা তো ওদের সঙ্গে সমানে হাঁটতে পারবে না, তাই—"

কিরণ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "রেখে দাও বাজে কথা। আমি সীতাকে আদপে দেখতে পারিনে, এইটে সবাইকে দেখাবার জন্যে তোমার ভাইবোন দু'জনে মিলে অতটা আধিক্যেতা দেখান,

সে আর আমি বুঝিনে ? সীতাকে একটু কিছু বলতে গেলেই ঠাকুরঝি মারমুখী হয়ে এসে পড়েন। আজ কাল তো কথাই নেই, ভাইকে জোড়া পেয়েছেন। ঠাকুরপোর কাছে ঠাকুরঝি আমার নামে কত যে লাগান-ভাঙ্গানি দেন তার অন্ত নেই।"

নরেশ অতি নম্রভাবে বলিলেন, "কিন্তু কিরণ, করুণা আর বীরেশ—"

"দু'টি অমূল্য রত্ন। সে তো চিরকালই শুনে আসছি। যত অনিষ্টের মূল আমি। আমি তোমার মেয়েদের দেখতে পারিনে, ভাই বোনকে হিংসে করি, তোমাকে জ্বালাতন করি, আরো কত কি ! আমার মরণ তো নেই, কি করে তোমাদের শান্তি দিই বল। মরণ হলে বাঁচতাম।"

এই বলিয়াই সজলনয়না কিরণ প্রস্থানোদ্যতা হইল।

অনেক স্বামীই—বিশেষতঃ প্রৌঢ়—সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সজল নয়ন সহ্য করিতে পারেন না ; তা সে অশ্রু যে কারণেই সঞ্জাত হোক্ না কেন। বৈকালিক প্রসাধন শেষ করিয়া কিরণ আসিয়া স্বামীর কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, এখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। নরেশের আর হিসাব ঠিক করা হইল না। তিনি ত্রস্তে উঠিয়া জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া কিরণকে কাছে বসাইলেন। তারপর তাহার নত মুখখানা তুলিয়া সাদরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "পাগল আর কি ! এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ তুমি ! আমি তোমাকে কখনো ও-সব কথা বলেছি ? তোমাকে পেয়ে আমি কত সুখী হয়েছি, তা তুমি জান না ? আজ আর হিসাবটা দেখতে দিলে না দেখছি।" বলিয়া নরেশ কিরণের একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া মৃদু মৃদু চাপ দিতে লাগিলেন।

কিরণ মুখখানা স্বামীর বুকে লুকাইয়া অভিমানভরা গলায় বলিল, "সারা দিনতো কায নিয়ে থাকই, সন্ধ্যার পরেও সেই কাজ। তবে আমি তোমাকে পাব কখন ?"

এই সোহাগে গলা, অভিমানে ভরা কথার জবাব দিবার মত বয়স নরেশের ছিল না। কাজ না করিলে স্বর্ণাভরণ, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ এবং সুখাদ্যের ব্যবস্থা যে হইতে পারে না, সেই কথাটাই তাঁহার মনে জাগিল। তবে টাকাটা নাকি নেহাৎ অকোমল জিনিষ এবং তাহার প্রসঙ্গও নাকি নিতান্ত গদ্য, তাই তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া স্ত্রীর চিবুকটি নাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আমার খাটুনি তো তোমার সুখের জন্য কিরণ।"

কিরণ বলিল, "আমি এমন ছাই সুখ চাইনে ! তোমার চেয়ে টাকা বড় হলো ?" এ কথার যথার্থ উত্তর দেওয়া চলে না। অপ্রিয় সত্য বলাও নাকি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাই নরেশচন্দ্র অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া, কিরণের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সচেষ্ট হইলেন।

ঠিক এই সময়েই করুণা রান্নাঘরে যাইয়া উনান ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অপরাজিতা তাহার শয়ন ঘর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে আসিয়া বলিল, "ওকি হচ্ছে দিদি ? ওঠ, ওঠ, শীগগির ওঠ। নইলে ঝগড়া করব।"

করুণা হাসিয়া বলিলেন, "ঝগড়া করতে পারবি ছোট বৌ ?"

"না, পারবো না আর কি! তুমি ওঠ শীগগির। আমি বসে থাকব, তুমি রাঁধবে!"

"আমি তো কত রাঁধি। তুই পোয়াতি মানুষ, দু'বেলাই রাঁধবি কিরে?"

অপরাজিতা মনে মনে বলিল, "পোয়াতি হয়েছি তো, সবাইকে কৃতার্থ করেছি আর কি;" প্রকাশ্যে বলিল, "আমি বাড়ী থাকতে তুমি আঁষ ঘরে রাঁধবে, সে হবেনা দিদি, ওঠ।" বলিয়া জোর করিয়া করুণাকে ঠেলিয়া উনান গোড়ায় বসিল। এমনি সময়ে বীরেশ আসিয়া স্ত্রীকে বলিয়া উঠিল, "সরিয়ে দেবার ছল করে দিদিকে তুমি মারছ?"

অপরাজিতা মৃদু হাসিয়া ঘোমটা একটুখানি টানিয়া দিল। করুণার শান্ত মুখে স্নেহ-কোমল হাসি দেখা দিল। তিনি ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেলেন। তখন অপরাজিতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সীতাকে নিয়ে দিদি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন না?"

বীরেশ বলিল, "তাতে সীতার মা রাজি হবেন না।"

"কেন রাজি হবেন না? এতদিন তাঁদের কাছে আছেন, এখন কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কি বলে আপত্তি করবেন?"

"আপত্তির পথটা অত্যন্ত সোজা। বলবেন, সীতাকে আমি অত দূরে পাঠাব না। দিদি যে সীতাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না, সে কথা তো বৌঠান উত্তমরূপেই অবগত আছেন। আসল কথা কি জান? আমার দিদির মত অমন মুখবোজা রাঁধুনী কোথা পাবেন?"

"ছি, অমন কথা বলতে নেই। দিদির সম্বন্ধে তোমার ধারণা এমন নীচু কেন?"

"তোমার বুঝি খুব উঁচু? তাই তো সীতাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছ? দু'বছর আগেই আমি দিদিকে আর সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, দাদা রাজি হন নি। কোন দিন হবেনও না বোধ হয়। দিদি চলে গেলে তাঁর সংসার প্রায় অচল হয়। তুমি মরে গেলে আমি কি করব জান? দাদার চেয়েও শীগগির বিয়ে করব, আর ইরার সম্বন্ধে ঠিক দাদার মতই নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হয়ে থাকব।"

"তুমি সেই সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদই আমাকে কর, ইরাকে তোমার কোলে রেখে, তোমার পায় মাথা রেখে আমি যেন যেতে পারি। কিন্তু যা বললে, তা তুমি কক্‌খনো পারবে না।"

"পারব না?" বলিয়া বীরেশ অপরাজিতার গভীর প্রেম ও ধ্রুব বিশ্বাসে উদ্ভাসিত মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

(৭)

উত্তীর্ণপ্রায় সন্ধ্যা। শৈলজা চুপ করিয়া দক্ষিণের বারান্দায় রেলিংএ হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বারান্দার রেলিং ও থাম গুলি গাঢ় সবুজ বর্ণে রঞ্জিত। প্রত্যেক থামের শীর্ষ-দেশে সুদৃশ্য টবে দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছ। প্রায় সব গাছই ফোটা ফুলে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিয়া ফোটা ফুলের গন্ধ বারান্দায় ছড়াইতেছিল।

পশ্চিমাকাশে, সন্ধ্যার রক্তরাগ-রঞ্জিত ললাটে হীরক ভূষণের মত একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝল মল করিতেছিল, পূর্ব্বাকাশে সোনার থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। শৈলজার দৃষ্টি পশ্চিমাকাশে স্থিরবদ্ধ হইয়া থাকিলেও নীলবসনা শ্যাম সন্ধ্যা ও শ্বেতবসনা গৌরী রজনীর মিলন সৌন্দর্য্যের মহিমা দেখিতেছিল না। তাহার সে দৃষ্টি অর্থশূন্য।

অনেকক্ষণ তেমনি নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল। শুভ্র জ্যোৎস্নাবন্যায় সন্ধ্যার রক্তিম আভা ও নীলিমা তলাইয়া গেল। উচ্ছ্বসিত আনন্দের মত জ্যোৎস্না আসিয়া বারান্দায় লুটাইয়া পড়িল। পশ্চাতে হরপ্রসাদের চির পরিচিত জুতার শব্দ শুনা গেল, তবু শৈলজা ফিরিল না। হরপ্রসাদ বলিলেন, "শুনেছ বোধ হয়, অজিত এবারেও প্রোমোশন পায়নি। তিন বছর তাকে একই ক্লাসে থাকতে হবে। কিন্তু—"

শৈলজা বাধা দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এতক্ষণ বাইরে কি করলে? সন্ধ্যার যায়গা করে দেব এখন?"

হরপ্রসাদ বলিলেন, "বাইরে কাজ ছিল, তাই দেরী হয়ে গেছে। সন্ধ্যা একটু পরেই করব। একটা কথা বলছি, শোন। এক শ টাকা বাড়াতে মাষ্টারের মাইনে দেওয়ায় আর কয়েক ঘণ্টার জন্যে অজিতকে স্কুলে বন্ধ করে রাখায় কোন দিকেই কোন লাভ দেখছিনে। বল যদি তো ওকে স্কুল ছাড়িয়ে আনি। ওর পড়া শুনা কিচ্ছু হবে না, আমি তা শপথ করে বলতে পারি।"

শৈলজা ক্লিষ্টস্বরে বলিল, "তুমি বল কি? ফেল করেছে বলে অজিতের পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। ওর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, কিন্তু অমনোযোগী বলেই—"

হরপ্রসাদের আকস্মিক অপ্রত্যাশিত উচ্চ হাস্যে শৈলজা চমকিয়া থামিয়া গেল। সে আর তাহার বক্তব্য শেষ করিল না। কিন্তু সেই অবিশ্বাস ও শ্লেষপূর্ণ হাসি তাহার মনে কোনরূপ উত্তেজনার সাড়া জাগাইতে পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

হরপ্রসাদ বলিলেন, "মুখ ফেরালে কেন? সন্ধ্যার যায়গা করে দেবে, চল।"

শৈলজা আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

হরপ্রসাদ সন্ধ্যা করিবার জন্য পূজাকক্ষে প্রবেশ করিলে শৈলজা সেখান হইতে বাহির হইয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে আসিল। সেখানে অজিত বা অমিয় কেহই ছিলনা। অমিয়র ফাষ্ট প্রাইজের বইগুলি টেবিলের উপর ছিল। সেই বইগুলির ওপর দৃষ্টি পড়ায় শৈলজার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অমিয় ফাষ্ট না হইয়াও যদি অজিত প্রোমোশন পাইত। মানুষের ইচ্ছা কত দুর্ব্বল! নিজেকে পূর্ণ ও তৃপ্ত করিবার কোন পন্থা সে আবিষ্কার করিতে পারেনা। নিষ্করুণ অদৃষ্টের ক্রীড়নক হইয়াই বুঝি মানুষ জন্মগ্রহণ করে।

শৈলজার মনটা সে দিন কিছুতেই স্থির হইতে চাহিতেছিল না। কএক মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া পৌষ মাসের কনকনে শীতের মধ্যেও বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ধীরা দেখিতে

পাইয়া বলিল, "মা, তোমার গায় গরম কাপড় নেই, শীতে যে তুমি মরে যাবে।" ধীরার কথা শুনিতে পাইয়া তারা শৈলজার শাল খানা আনিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। শৈলজা হাত বাড়াইয়া শাল লইয়া গায় জড়াইতে জড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তারা, বাবুর সন্ধ্যা হয়েছে ?"

তারা বলিল, "হয়েছে বোধ হয়।"

"অজিত কোথায় ?"

"সেই যে সকাল বেলা দাদাবাবু স্কুলে চলে গেছেন, তারপর তাঁকে তো আর বাড়ীর ভেতর দেখতে পাইনি। কিন্তু মা, গায়ে হিম লাগালে কি অসুখ করবে না ?"

শৈলজা সে কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় দেখে এস তো।"

তারা যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, "বাবু শোবার ঘরে আছেন।"

শৈলজা আর কোন কথা না বলিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন খাবে ? খাবার দিতে বল্‌ব ?"

হরপ্রসাদ বলিলেন, "ছেলেরা কোথায় ? তাদের খাওয়া হয়েছে ?"

"না। অজিত বোধ হয় বাড়ী নেই, অমিয় তার ঘরেই আছে।"

"অজিত বেশ ভাল করেই আড্ডা গড়তে শিখেছে। ওর আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি। ওর বাড়ী থাক্‌বার আর দরকারই বা কি ?"

শৈলজা মনে মনে অত্যন্ত আহত হইল, কিন্তু কথা কহিল না। হরপ্রসাদ বলিলেন, "অমিয়কে ডাক তো।"

শৈলজা বারান্দায় আসিয়া ডাক দিতেই অমিয় আসিয়া হাজির হইল। পিতার আদেশের অপেক্ষায় সে নতনেত্রে কক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমিয়, অজিত কোথায় রে ?"

অমিয় নম্রস্বরে বলিল, "দাদা বাড়ী নেই জানি, কিন্তু কোথায়, তা জানিনে।"

অকৃতকার্য্যতার বেদনা ও লজ্জায় অজিত বাহিরে হিমের মধ্যে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কে জানে ? শৈলজা উদ্যত নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রাখিল, কিন্তু হরপ্রসাদের নিঃশব্দ বিরাগ ও ক্রোধ অনুভব করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

হরপ্রসাদ কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন প্রোমশন পেলি অমিয়, এবার ?"

অমিয় মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "ফার্ষ্ট হয়েছি বাবা।"

"ফার্ষ্ট হয়েছিস্! সে কথা আমাকে এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন রে ?"

অমিয় কথা বলিল না। হরপ্রসাদ বুঝিলেন, অজিতের অসাফল্যের লজ্জা অমিয়র সগৌরব কৃতকার্য্যতার আনন্দ ক্ষুণ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

বলিলেন, "তুমি তো অজিতের জন্যে বসে থাক্‌বেই, আমাদের আর বসিয়ে রাখ কেন? খেতে দাও।"

শৈলজা ইহারও কোন জবাব দিল না। নীরবে ভোজন-কক্ষে যাইয়া স্বামী ও পুত্রকে পরিবেষণ করিল। রাঁধুনী পূর্ব্বেই খাবার রাখিয়া গিয়াছিল। স্বামীপুত্রের পরিবেষণের ভার শৈলজা পাচক বা পাচিকাকে দিত না।

হরপ্রসাদ ও অমিয়র খাওয়া হইয়া গেলে শৈলজা তাহার বসিবার ঘরে যাইয়া বসিল। আজ যেন হরপ্রসাদের সামীপ্যকে তাহার ভয় করিতেছিল। সে একটা বই খুলিয়া বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইতে চাহিল না। বইএর লাইনগুলা যেন এলোমেলোভাবে তাহার চোখের সামনে নৃত্য সুরু করিয়া দিল। সে বিরক্ত হইয়া বই বন্ধ করিয়া রাখিল। যামিনী কি একটা খুঁজিবার ছল ধরিয়া সেই কক্ষে আসিয়া এ-দিক সে-দিক একবার ঘুরিল। তারপর শৈলজার নিকট অগ্রসর হইয়া সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিল, "ওকি বৌদিদি, অমন করে বসে আছ কেন?"

অপেক্ষা করিয়া উত্তর না পাইয়াও যামিনী আবার বলিতে লাগিল, "পেটে ধরনি বটে, কিন্তু সতীনের ছেলের জন্যে পেটের ছেলের চেয়ে কিছু কম কর্‌ছ না তো। ফি বৎসর ফেল কর্‌ছে, দুঃখ হবারই তো কথা। এক বাপেরই তো ছেলে, প্রত্যেক বছরই কেমন ভাল পাস করছে অমিয়। সবাই বলে, অজিতের কিছু হবে না, আর——"

শৈলজার অসহ্য হইল, সে বলিয়া উঠিল, "কে কি বলে, না বলে, সে আমি শুন্‌তে চাইনে ঠাকুরঝি। আমার ছেলের কথা আমার চেয়ে বেশী কে জান্‌বে যে, শুন্‌তে যাব? আর অজিতের কথা নিয়ে সকলের কেন যে এত মাথা ব্যথা হয়েছে, তাও বুঝিনে।"

যামিনী তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া ফেলিল, বলিল, "ঠিক্ বলেছ বৌদিদি, কতকগুলা মানুষ আছে, পরের নিন্দে না কর্‌লে তাদের দিন চলা ভার হয়ে ওঠে। অজিতের পাসের দরকারই বা কি? রাজার ছেলে, রাজার হালে থাক্‌বে। তাকে তো চাকরী করে খেতে হবে না। কত লোক তারই চাকরী কর্‌বে। অজিত তোমার বেঁচে থাক্ পাস না পেলেও হবে।"

শৈলজা অজিতের খোঁজে চাকর পাঠাইয়া অধীরভাবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যামিনীর অনাবশ্যক বাক্যধারা তাহার শ্রুতিমূলে ঠিক্ অমৃত বর্ষণ করিতে ছিল না। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "যাও ঠাকুরঝি, শোওগে। আমার জন্যে তোমার বসে থাক্‌বার কোন দরকার নেই।"

অগত্যা যামিনীকে সেখান হইতে উঠিতে হইল। শয়নকক্ষে যাইবার পথে ক্ষেতুর মার সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সে অনুচ্চ তিক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে বলিল, "জান ঠান্‌দি, বড় লোকের ঢঙের আর অন্ত নেই। কাযও নেই, ভাবনাও নেই, ঢং না করে আর কর্‌বেই বা কি?"

ঠান্‌দিদি বিস্ময়ের ভাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আবার ঢং করেছে লো?"

যামিনী মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিল, "ন্যাকা আর কি! কিছুই জান না! গিন্নিঠাকুরুণের কথা বল্‌ছি গো। ঢং করে সবাইকে জানান হয়, সতীনপোকে কতই ভালবাসেন। কিন্তু ঢং দেখে কি মানুষ ভোলে?"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং অজিতের কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতের মৃদু গুঞ্জন শুনা গেল। তখনই যামিনী দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। অজিত দেখিল, শৈলজা কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। মাকে দেখিয়া খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া গান বন্ধ করিল।

অজিতের অবস্থা দেখিয়া শৈলজার সমস্ত কুণ্ঠা, বেদনা, লজ্জা মুহূর্ত্তে অদম্য ক্রোধে পরিণত হইল। ফেল করিয়া এবারেও যে অজিত নির্ব্বিকার থাকিতে পারিবে, শৈলজা তাহা ভাবিতে পারে নাই। বর্ত্তমান অসাফল্যের জন্য যে ব্যথিত বা লজ্জিত নহে, সফলতা কি কোন দিন তাহার কাছে আসিতে পারে? শৈলজা রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথা ছিলি অজিত?"

অজিত বলিল, "সে শুন্‌লে তুমি রাগ কর্‌বে মা।"

শৈলজা বলিল, "করি কর্‌ব। শীগ্‌গির বল, কোথা ছিলি।"

অজিত ভয়ে ভয়ে বলিল, "অতুলদের বাড়ী।"

শৈলজা ছুটিয়া আসিয়া অজিতের একখানা কান ধরিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আবার থিয়েটারের রিহার্সাল চলেছে পাজি!"

অজিত হাসিয়া বলিল, "শাস্ত্রে আছে, ষোল বছর হলে ছেলের সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করবে। আমার যে ষোল বছর হযে গেছে মা, এখনো তুমি আমাকে মারবে?"

শৈলজা রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে বলিল, "থাম্, শাস্ত্রের কথা তোর মুখে শোভা পায় না। অপদার্থটা ফি বছর ফেল করছে, সেই লজ্জায় দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়, আর ও কিনা থিয়েটার করে বেড়ায়?"

"একেবারে কেঁদে ফেল্লে! তোমার কান্না আমি সইতে পারিনে, তাতো তুমি জান। স্কুল থেকে এসে ওপরে যাচ্ছিলাম, সুলোচনার কাছে তখন শুনলাম, আমি প্রোমোশন পাইনি বলে তুমি নাকি লুকিয়ে কাঁদছ। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওপরে না উঠে নীচে থেকে কিছু খেয়ে অতুলদের বাড়ী চলে গিয়েছিলাম। সারা বছর পড়িনি, পাস হব কি ক'রে? অমিয় ফার্ষ্ট হয়েছে, সে জন্যেও তো তোমার কাঁদা উচিত ছিল না।"

"তুই বুঝি সেই আহ্লাদেই থিয়েটার করতে গেলি?"

"আমি ফেল করেছি বলে যা একটু দুঃখ পেয়েছি, তার চেয়ে ঢের বেশী খুসী হয়েছি অমিয়র ফার্ষ্ট হওয়ায়। আচ্ছা মা, তুমি কাঁদলেই বা কেন? পরীক্ষা পাস করিনি বটে, কিন্তু রামদীনের কাছে অনেকগুলা কসরৎ শিখে ফেলেছি। সেদিন আমার লাঠি ঘুরান দেখে তহিমদ্দী অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মত লাঠি খেলোয়ার তো এ অঞ্চলে নেই। রামদীন বলে—"

"থাম এখন, হয়েছে। আমি ও বীরত্বের ব্যাখ্যান শুনতে চাইনে। আজ আমার কাছে তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আর থিয়েটারের সংস্রবে যাবিনে, খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করবি।"

"মন দিয়ে পড়তে চেষ্টা করব, কিন্তু মা, অতুল যে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, দু'টি পার্ট আমাকে নিতেই হবে। আর—আর—সে থাক্ এখন। এই একটিবারের জন্যে আমাকে মাপ কর মা। এবার হয়ে গেলে আমি না হয় থিয়েটারের সংস্রবে আর থাকব না। এখন খাবার দাও, চেঁচামিচি করে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

(৮)

শৈলজা বিরক্তিপূর্ণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "অজিত, বলছি এখন বিরক্ত করিসনে, তবু ভ্যান ভ্যান প্যান প্যান করছিস কেন ?"

অজিত মিনতির সুরে বলিল, "দাও মা, একশটি টাকা, আমি চলে যাই। আর তোমায় বিরক্ত করব না।"

"থিয়েটার করতে তোমাকে টাকা দিতে পারবনা, পারবনা, হয়েছে ? এখন চলে যাও, আর বিরক্ত করো না।"

"এবার দাও মা, আর কখনো থিয়েটারের জন্যে টাকা চাইব না। আমি যে ওদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি। এখন টাকা না দিলে ওরা আমায় মিথ্যাবাদী, বাক্যবাগীশ বলে টিটকারী দেবে। সে বড় ঘেন্নার কথা মা।"

"একশ টাকা দিয়েছি শুনতে পেলে উনি ভয়ানক বিরক্ত হবেন। এই থিয়েটার করায় উনি যে তোর ওপর কত বিরক্ত, তা জানিসনে ?"

"জানি। কিন্তু সবাই আমাকে যে রকম করে ধরে পড়ে, তা 'না' বলতে পারিনে। আর থিয়েটার নির্দ্দোষ আমোদ বৈতো মন্দ কায নয়। খারাপ কায হলে আমাদের সেকেণ্ড মাষ্টার পরেশ বাবু পার্ট নিতেন ? তাঁকে তো বাবা ভালই বলেন। দাও টাকা।"

"টাকা পাবেনা, চলে যাও।"

অজিত হাসিয়া নিজের হাতের মুঠা খুলিয়া শৈলজাকে এক গোছা চাবি দেখাইয়া বলিল, "আমি তোমার টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে এসেছি। তুমি নিজে না দিলে আমি বাক্স খুলে নিয়ে যাব টাকা।"

শৈলজার কণ্ঠের উত্তেজনা নিমেষে শান্ত হইয়া গেল। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাই নিয়ে যাওগে। আমি নিজের হাতে দিতে পারব না।

"মান বাঁচাবার জন্যে এবার আমাকে তাই নিতে হবে" বলিয়া অজিত চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে অমিয় সেইখানে আসিয়া শৈলজার পায়ের কাছে চাবির গোছা ফেলিয়া

দিয়া বলিল, "মা, দাদা তোমার বাক্স খুলে একশ টাকা নিয়ে গেছে, চাবিগুলি তোমাকে দিতে বলে গেছে।"

সরোষ বিরক্তিতে শৈলজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অমিয় আবদারের সুরে বলিল, "দাদাকে একশ টাকা দিয়েছ, আমাকেও দিতে হবে।"

শৈলজা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "কি জন্যে শুনি ?"

"দাদাকে দিয়েছ, আমাকে দেবেনা কেন ?"

"দাদাকে দাদার টাকা দিয়েছি আমার টাকা নয়।"

"দাদার টাকা ! দাদার টাকা তোমার কাছে কেন ?"

"সে যে মাসে মাসে নিজের খরচের জন্যে ত্রিশ টাকা পায়, তা বরাবর আমার কাছে এনে দেয়, যখন যা দরকার চেয়ে নিয়ে যায়। তোর মত নিজের কাছে টাকা রাখেনা। সে কথা জেনে শুনেও আমাকে জেরা করছিস ? আশ্চর্য্য !"

"দাদার খরচ হয়েও তোমার কাছে একশ টাকা জমা হয়েছিল, একথা সত্যি ?"

"অমিয়, অজিত পরীক্ষায় ফেল করলেও তোর চেয়ে ঢের ভাল। সে আমাকে এমন অবিশ্বাস করেনা, তোর মত মিথ্যাবাদী বলে জানে না।"

শৈলজার কথা চাবুকের মত অমিয়কে আঘাত করিল। তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে হরপ্রসাদ অন্দরে আসিলেন। স্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ এত ভার ভার কেন ? হয়েছে কি ?"

শৈলজা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হবে আবার কি ? কোন দিনই তো তুমি আমার মুখ সুন্দর দেখলে না। এখন এই বুড়ো বয়সে কি আর সুন্দর দেখবে ?"

হরপ্রসাদ সেই অক্ষুণ্ন লাবণ্যে ঝলমল পরম সুন্দর মুখখানার পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, "একশ টাকার শোক কম নয় দেখছি, ব্যাঙ্কে যার অনেক হাজার টাকা আছে, তার মুখও কালো করে তুলতে পারে।"

স্বামীর পরিহাসতরল কণ্ঠের আড়ালে যে তীক্ষ্ণতা ছিল, তাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া শৈলজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার বিহ্বল কণ্ঠ হইতে অস্ফুটে বাহির হইল, "কি বলছ তুমি ?"

মৃদু হাস্যের সহিত হরপ্রসাদ জবাব দিলেন, "যা বলছি, তাতো তুমি বেশ ভাল করেই জান। তবু যদি আমাকে বলতে হয়তো বলছি, আজ অজিত না বলে তোমার বাক্স থেকে একশ টাকা নিয়ে গেছে। তার জন্যে এতখানি দুঃখিত হয়েছ কেন ? ব্যাঙ্কে তো তোমার ঢের টাকা জমা রয়েছে।"

শৈলজা তেমনি ভাবে বলিল, "না বলে নিয়ে গেছে! কার কাছে একথা শুনলে? ওঃ অমিয় বলেছে। ঠিক ঠিক।"

শৈলজা তাহার মস্তিষ্কে জ্বলন্ত আগুনের প্রখর উত্তাপ অনুভব করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হরপ্রসাদও কথা কহিলেন না। সেই কক্ষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল ধীরা সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, দাদা কি তোমার কাছে সন্ধ্যার পরে এসেছিল?"

প্রশ্নটা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যই হয়তো শৈলজা কিছুকাল ধীরার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "না।"

"সে তাদের থিয়েটারের জন্যে আমার শাড়ী আর ব্লাউসগুলা আজ নিয়ে যাবে বলে আমাকে গুছিয়ে রাখতে বলেছিল। এখনো তো তার দেখাই নেই" বলিতে বলিতে ধীরা চলিয়া গেল।

তখন হরপ্রসাদ স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি অমন হয়ে পড়লে কেন? অজিত যে এমনিভাবে নিজের খেয়ালের বশে চলবে, কারু শাসন মানবে না, কারু অনুরাগ বিরাগের দিকে চাইবে না, তা আমি জানতাম।"

এই সহজ শান্ত কথাগুলির মধ্যে হরপ্রসাদের বেদনাপূর্ণ গভীর নৈরাশ্য কঠিন আঘাতের মতই শৈলজার বুকে বাজিল। অজিত সকলের কামনার ধন; ভগবানের মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদের মত সকলে তাহাকে সমগ্র হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। আজ তাহার মাতা ও পিতামহী ইহলোকে নাই, কিন্তু পিতা আছেন। পিতা তো তাহার কোন একটা আচরণেও তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। শৈলজার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, কিন্তু পুত্রটি কি শুধু পিতার ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার জন্যই জন্মলাভ করিয়াছিল? বাধ্যতার জন্য হরপ্রসাদ অমিয়র প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু তাহার আজিকার আচরণ শৈলজাকে যে একেবারে মর্ম্মাহত করিয়াছে। শুধু বাধ্যতাই তো মানুষের সর্ব্বস্ব নহে।

"একেবারেই যে চুপ করে রইলে?"

স্বামীর কথায় শৈলজা সদ্য নিদ্রোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিল। কিন্তু মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "অজিত তো না বলে টাকা নেয়নি। তুমি ভুল বা মিথ্যা শুনেছ। সে আমার অনিচ্ছায় টাকা নিয়েছে বটে, কিন্তু চুরি করে নয়। তোমাকে যে এতবড় মিথ্যা কথাটা বলেছে, তার ভবিষ্যৎ যে অজিতের চেয়েও ঢের বেশী অন্ধকার।"

"কিন্তু তাই যদি হয়, তবুতো তুমি সুখী হতে পারবে না।"

"আমি সুখী হতে পারব না জেনে তুমি তো সুখী হয়েছ?" বলিয়াই শৈলজা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমনের জন্য মুখে আঁচল চাপা দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

হরপ্রসাদ খানিকক্ষণ বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর আসনখানা টানিয়া খোলা জানালার কাছে যাইয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

নীচে সবুজ মখমলের মত কোমল দূর্ব্বায় ঢাকা একখণ্ড খোলা জমি। জ্যোৎস্না রাত্রি।

জমির খানিকটায় গৃহ প্রাচীরের ছায়া পড়িয়াছিল, বাকি স্থানটা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করিতেছিল। ছায়ার সামীপ্য জ্যোৎস্নাকে উজ্জ্বলতর শোভনতর করিয়া তুলিয়াছিল। আনন্দের প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া জ্বালিবার জন্যই বুঝি এমনি করিয়া মানুষের জীবনেও নিরানন্দের ছায়াটি আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যাহার জীবনে নিরবচ্ছিন্ন ছায়ারই রাজত্ব, সে কোন্ আশায়, কোন্ সান্ত্বনায় বাঁচিয়া থাকে? বাঁচন মরণের উপর মানুষের হাত থাকিলে সে কিছুতেই বাঁচিতে চাহিত না, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়।

অজিত যে শৈলজার জগতের কতখানি জুড়িয়া আছে, তাহা হরপ্রসাদের অপেক্ষা আর তো কাহারও বেশী জানিবার সম্ভাবনা নাই। সেই অজিতকে বাঞ্ছিত আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে না পারার ব্যথা ও লজ্জা তাই তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাজিয়াছে। অমিয়ও তো মায়ের মনের মত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার তেজস্বিনী মা শুধু পরীক্ষা উত্তরণেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। যাহা থাকিলে মানুষ 'মানুষ' হয়, তাহার অভাব শৈলজার চিরদিনই দুঃসহ। সেই দুঃসহ উত্তাপটা এখন অদম্য রোদনে. আপনাকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্ট বোধ হয় কেহ স্বেচ্ছায় গড়িয়া তুলিতে পারে না। মানুষের ইচ্ছা, মানুষের শক্তি যে কত তুচ্ছ, তাহা তো মানুষে পদে পদে বুঝিতে পারে। তবু দুঃখ জয় করিবার শক্তি সে সঞ্চয় করে না কেন? পদে পদে পরাভবই তাহার প্রাপ্য হইয়া উঠে কেন?

"বাবা, আজ খাবে দাবে না তুমি? এমনি চুপ করে বসে থাকবে নাকি?"

হরপ্রসাদ চকিতে ফিরিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ধীরা তাঁহার নিকটে আসিতেই তিনি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া হাসি মুখে বলিলেন, "মায়েরই খোঁজ নেই, ছেলের খাওয়া হবে কি করে?"

ধীরা হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আমার খোঁজ নেই বুঝি! আমি তো অনেকক্ষণ তোমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি কি ভাবছিলে বাবা?"

হরপ্রসাদ ধীরার প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোর মা কোথায়রে? খাবার ঘরে নাকি?"

"না, ঠাকুরতো ওপরে খাবার দিয়ে গেছে। আমি মাকে ডেকে আনছি" বলিয়া ধীরা দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আজ আমি তোমাদের ভাত বেড়ে দেব, তুমি এস।"

হরপ্রসাদ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তা হলেই হয়েছে! যাও, তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস।"

পিতার উচ্চ হাস্যে ধীরা একটুখানি লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইল, কিন্তু বলিল, "আমি নিশ্চয় পারব। সীতা আমার এক বছরের ছোট, সে রাঁধতে পারে, আর আমি খাবার দিতে পারব না!

মা বলেন, আমার মত তেরো বছরের মেয়েরা নাকি ঢের কায করতে পারে; মা নাকি এই বয়সে ঢের কায করেছেন।"

মেয়ের কথা শুনিয়া হরপ্রসাদ হাসিলেন। শৈলজা সেই হাসি দেখিতে পাইলে তাহাকে দারিদ্র্যের প্রতি ঘোরতর অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই বলিত না। ভাগ্যে সে উপস্থিত ছিল না।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধীরা, অজিত কি তার ঘরে আছে?"

ধীরা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বাবা, সে আজ বারোটার আগে ফিরতে পারবে না, আমাকে বলে গেছে। কাল তাদের থিয়েটার কিনা, আজ তার কত কাজ! ওকি, উঠতে উঠতে আবার গম্ভীর হয়ে বসলে কেন? ওঠ, এখন ন'টা বেজে গেছে যে।" বলিয়া ধীরা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল।

ক্রমশঃ

৺সরোজবাসিনী গুপ্তা

চালিতার ফুল

মরি! মরি! বলিহারি! কি সুন্দর চালিতার ফুল!
পত্রময় পাত্ররূপে গড়িয়াছে চারু পঞ্চদল!
তারি মাঝে অগণিত পীতবর্ণ কেশর কোমল!
বিংশদলী শ্বেত পুষ্প তদুপরি বিরাজে অতুল!
আগে তো হেরিনি কভু, রূপে গুণে করেছে আকুল!
কোথা লাগে 'ম্যাগ্নোলিয়া'? এর কাছে ও-সব অচল!
ইহার মাধুরী হেরি' আঁখি মোর থির অচপল!
আছে, আছে এরি মাঝে পুঞ্জীভূত রহস্য বিপুল!

সৌন্দর্য্য স্বজনকর্ত্তা কোথা আছ, ওহে ভগবন্!
তোমারে হেরিনি চক্ষে তবু চিত্ত নৃত্যে বারবার!
কল্পনায় হেরি বলে' ভাষা দিয়া রচি আলিপন!
ছায়া-ছায়া কায়া দেখি' দিবানিশি করি হাহাকার!
রূপ ধরি' দেখা দাও! দেখা দাও, অরূপ রতন!
ঘনায়ে আসিছে রাত্রি, সহযাত্রী কে আছে আমার!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান বাঙ্গালার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

আমেরিকার কার্য্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে যে, আমেরিকার কার্য্য গদরের দল ও তাহার সহিত বার্লিন কমিটির প্রতিনিধির সংযোগে সম্পাদিত হইত। কিন্তু যে সব যুবক গদর দলের বাহিরে ছিল অথচ বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাদের চালনা করিবার জন্য একটি কমিটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হইয়াছিল। আমেরিকায় সমগ্র বৈপ্লবিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা বিশেষ আবশ্যক ছিল, কিন্তু বার্লিন কমিটির সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি যুদ্ধের পরে বলিয়াছিলেন যে, এ প্রকার কমিটি গঠন করিবার লোক আমেরিকায় ছিল না, সমস্ত কর্ম্ম তিনি গদরের নেতা রামচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া করিয়াছেন, অন্যদিকে অন্যলোকেরা বলেন যে, এ প্রকার কমিটি গঠনের লোক আমেরিকায় মজুত ছিল, বার্লিনের প্রতিনিধি সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবার জন্য কমিটি গঠন করেন নাই। আবার গদরের দলে শিখের সংখ্যা বেশী থাকায় তাহা যেন শিখ-পাঞ্জাবী আন্দোলনে পরিণত হইল এবং তাঁহারা আর কাহারও তোয়াক্কা রাখেননা এ ভাব তাঁহাদের সভ্যদের মনে জাগিত। শেষে গদরের দল বড়ই হুজুগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদের policy নাকি ছিল "One thrill per day"! এই জন্যই হুজুগে সংবাদ সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক তাঁহারা কাগজে প্রকাশিত করিতেন। এই সব কারণে সমস্ত কর্ম্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মাধীন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৫ খৃঃ শেষকালে হঠাৎ নরওয়ের রাজধানী খৃষ্টিয়ানিয়া হইতে সংবাদ আসিল যে, ... চক্রবর্ত্তী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, হরদয়াল তাহাকে কমিটির অজ্ঞাতসারে বার্লিনে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সময়ে হরদয়ালকে সর্ব্বসভ্যের সম্মতিক্রমে কমিটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী যখন ইউরোপ আসিয়াছে তখন তাহাকে বার্লিনে আনয়ন করা হইল। কমিটিও এ সময়ে একজন লোক খুঁজিতেছিল যে আমেরিকা গিয়া সর্ব্ব কর্ম্মকে এককেন্দ্রীভূত করিবার প্ল্যান লইয়া যায়। চক্রবর্ত্তী আসিলে তাহাকে এই প্ল্যান দেওয়া হয়, সে যেন আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রামচন্দ্র ও অন্যান্য বৈপ্লবিকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মীদের একত্রিত করিয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি স্থাপন করে। তাহাকে এই গুরুতর কর্ম্মের ভার দিবার পক্ষে কোন কোন সভ্যের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অন্য লোকাভাবে চক্রবর্ত্তী দ্বারা এই প্ল্যান আমেরিকায় পাঠানর সুযোগটি কমিটি গ্রহণ করে। অন্যান্য প্ল্যান ও আদেশের সঙ্গে West Indies এর ভারতীয়

ঔপনিবেশিক কোন বৈপ্লবিকের নাম তাহাকে দেওয়া হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় সেখানেও যেন বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করার চেষ্টা হয়। চক্রবর্ত্তী আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বার্লিনে সংবাদ পাঠায় যে তথায় প্ল্যান অনুসারে একটি কমিটি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ৫ জন সভ্য আর পণ্ডিত রামচন্দ্র এই কমিটির সভ্য হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গদরদলের অন্যান্য সভ্যেরা "গদরের" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করিতে অপ্রস্তুত হওয়ায় তাঁহারা এ কমিটিতে আসিলেন না। কিন্তু তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিতেছেন ও গদরদল তাহার মাসিক খরচা এই কমিটির কাছ হইতে লইতেছে। কারণ বার্লিন কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আমেরিকায় সঙ্কল্পিত কমিটি বার্লিন কমিটির একটি শাখা হইবে ও আমেরিকার সমস্ত বৈপ্লবিক কর্ম্ম ও তাহার ব্যয় এই নবপ্রতিষ্ঠিত কমিটির দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। বার্লিন কমিটি এই সময়ে চেষ্টা করিতেছিল যে, ভারতের বাহিরের সমস্ত কর্ম্ম যেন এককেন্দ্রীভূত হয়। সেই জন্যই তুর্কিতে তাহার এক শাখা স্থাপিত হয়, আমেরিকাতেও তদ্রূপ করিবার চেষ্টা ছিল। আমেরিকায় চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কমিটির উপর সমস্ত কর্ম্মের ও টাকা ব্যয়ের ভার দেওয়া হয়। পরে আমেরিকাস্থিত জর্ম্মাণ embassy হইতে বার্লিনে সংবাদ আসে যে চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত জোরে কার্য্য চালাইতেছে, সমস্ত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে আরও টাকার দরকার। বার্লিন কমিটি আবার আমেরিকার কার্য্যের জন্য এক মোটা টাকার sanction করে। পরে ১৯১৬ খৃঃ আবার সংবাদ আসে যে, West Indiesএর কোন এক দ্বীপের ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা বিপ্লব করিতে প্রস্তুত, তাহারা অস্ত্র ও অফিসার চাহে কিন্তু এবিষয়ে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের কি মত? জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের সহিত তখন আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের মিত্রতা ছিল। এই দ্বীপে বিপ্লব হইলে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের সহিত জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের বিবাদ বাধিতে পারে এই ভয়ে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ এ চেষ্টা বন্ধ করিয়া দেয়।

এই সময়ে আমেরিকাস্থিত বৈপ্লবিক কর্ম্ম স্থায়িরূপে সংস্থাপন করিবার চেষ্টা তৎস্থানীয় বৈপ্লবিকেরা করেন। আমেরিকার কমিটির দ্বারা কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত ও সর্ব্বসাধারণে বিতরিত হয়। ইহার ফলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও তাহার প্রত্যুত্তরে এক পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ও কমিটিও তাহার জবাব দিয়া এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে আমেরিকাস্থিত বৈপ্লবিকেরা আইরিশ ও চীনদেশীয় বৈপ্লবিকদের সংস্পর্শে আসেন ও একজন চৈনিক যুবককে ভারতীয় কর্ম্মের জন্য চীনে প্রেরণ করেন। যখন এই প্রকারে আমেরিকায় কর্ম্ম চলিতেছে সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৬ খৃঃ গ্রীষ্মকালে বার্লিন কমিটি সুদূর চীনে ভারতীয় কর্ম্ম দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত .... দাসকে পেকিংএ প্রেরণ করেন। তিনি আমেরিকা হইয়া চীনে যান। তিনি চীন ও জাপান এই কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণ করেন। কিন্তু যে কর্ম্মের উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গিয়াছিলেন তাহার কিছু হইতে পারে নাই। ইত্যবসরে আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য (United States of America) জর্ম্মাণির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাহার ফলে যুদ্ধ-

ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় বৈপ্লবিকদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়। এই সময়ে জনকতক বৈপ্লবিক মেক্সিকো সহরে পালাইয়া যান, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রায় ৪০।৫০ জন লোককে আমেরিকান পুলিশ কয়েদ করে। তাহাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা ও তদ্দেশ হইতে একটি মিত্র গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার অপরাধের চার্জ্জ দেওয়া হয়। এই মকদ্দমায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারতীয় C. I. D. পুলিশের Denhem নামক এক কর্ম্মচারি তথায় অগমন করে। এই মকদ্দমাটি কুৎসিৎ Hindu conspiracy case নামে আখ্যাত হয়। ইহাতে ভারতীয়দের সম্পর্কীয় অনেক জর্ম্মাণ কর্ম্মচারিদেরও কয়েদ করা হয়। আমেরিকান পুলিশ এই মকদ্দমায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্বাধীনতাসমরের চেষ্টার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া কুৎসিৎ আকারে ইহাকে সাধারণের সম্মুখে ধরে।

এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার অগ্রেই, ধরপাকড়ের পরেই ইউরোপীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল যে, জনৈক বাঙ্গালী সমস্ত Confess করিয়াছে। পরে প্রকাশ পায় যে, সে সর্ব্বকর্ম্মের গুপ্ত সংবাদ ও বার্লিন কমিটির পত্র লিখিবার গুপ্ত সঙ্কেত প্রণালী (Code), ও তৎ কমিটির পত্রাদি, ও চীনদেশীয় বৈপ্লবিক নেতাদের নাম পর্য্যন্ত সমস্তই আমেরিকান পুলিশের হস্তে প্রদান করিয়াছে। সানফ্রান্সিকোতে (Sanfrancisco) এই মকদ্দমার বিচার হয়। এই মকদ্দমায় ব্যাংকক হইতে ধৃত ও "লাহোর ষড়যন্ত্র মকদ্দমার" approver যোধসিংহকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপরোক্ত সহরে আনা হয় এবং দক্ষিণ এসিয়ার কর্ম্মের approver কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দীও নাকি এই মকদ্দমায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। যোধসিংহ, আদালতে বলিয়াছিল যে, পুলিশের নির্য্যাতনায় ভারতে সে স্বদেশবাসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু আমেরিকায় সে উক্ত দেশের আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, সে তাহার স্বজাতির বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেনা। এই অস্বীকারের ফলে আমেরিকান পুলিশ তাহার উপর এপ্রকার নির্য্যাতন করে যে সে উন্মাদ হইয়া যায় ও শেষে তাহাকে পুলিশ এক পাগ্‌লা গারদে পাঠাইয়া দেয়।

এই প্রকারে মকদ্দমার ভীষণতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বীভৎস ভাব-স্রোত যখন চলিতেছিল, সেই সময়ে সান্‌ফ্রানসিকোর প্রকাশ্য আদালতে পণ্ডিত রামচন্দ্রকে একজন শিখ গুলি করিয়া হত্যা করে, ও তাহাকে আদালতের একজন আমেরিকান বেলিফ্ (Bailiff) উত্তেজিত হইয়া গুলি করিয়া মারে। রামচন্দ্রের হত্যার অর্থ কি ও এই হত্যাকারীর পশ্চাতে কে ছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত রহস্যপূর্ণ রহিয়াছে। এই বিষয়ে দুইটি মত আছে, একটি মত এই যে ইংরেজ গুপ্ত পুলিশ এই শিখটির দ্বারা রামচন্দ্রকে ইহজগত হইতে সরাইয়া দিল। পণ্ডিতজি একজন উচ্চদরের ব্যক্তি ও কর্ম্মকুশল বৈপ্লবিক ছিলেন; আমেরিকাস্থিত পাঠান ও পাঞ্জাববাসীদের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল ও তিনি গদর দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে ইহ জগত হইতে বিদায় করিয়া দিলে ওই স্থানের ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় মত এইযে

পণ্ডিতজির সঙ্গে গদরের শিখ সভ্যদের অনেকদিন অর্থ হিসাব লইয়া খুঁটিনাটি ঝগড়া চলিতেছিল। তিনি নাকি সকলকে কর্ম্মের ও টাকার হিসাব খুলিয়া বলিতেন না ও সমস্ত কর্ম্মে সকলের কাছে দায়িত্বহীন হইয়া যা ইচ্ছা তাই করিতেন। এইরূপ নানাকারণে একদল শিখ তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। যাঁহারা অশিক্ষিত বা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষিত উষ্ণ মস্তিষ্ক ও আমেরিকার ডেমোক্রাসির হাওয়া প্রাপ্ত শিখদের সঙ্গে কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই ভুক্তভোগী পুরুষমাত্রই জানেন যে, এই প্রকারের লোকদের সঙ্গে গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্ম্ম করা কি প্রকার দুরূহ! যাঁহারা পণ্ডিত রামচন্দ্রকে জানিতেন তাঁহার পণ্ডিতজিকে একজন সৎ ও বৈরাগ্য-ব্রতধারী ব্যক্তি বলিয়াই শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার উপর অন্য প্রকারের দোষারোপ অবিশ্বাসের যোগ্য বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মতের বিশ্বাস যে, যে শিখের দল তাঁহার শত্রু হইয়াছিল তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাহাদের রাগের প্রতিশোধ লইল। তখন আমেরিকার পুলিশ ভারতীয় বৈপ্লবিকদের নির্য্যাতন কর্ম্মেই ব্যস্ত, কাযেই এই হত্যাকাণ্ডের কোন অনুসন্ধানই হইল না! পণ্ডিত রামচন্দ্রের শোচনায় মৃত্যুতে বিপ্লববাদীদের ক্ষতিই হইয়াছে। গদর দলের তিনিই নেতা ছিলেন ও ১৯১৫ খৃঃ পাঞ্জাবের বিপ্লব চেষ্টা তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

এই মকদ্দমার বিচারে অনেক ভারতবাসীর ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়; এই মকদ্দমার সঙ্গে আর একটি মকদ্দমা আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট খাড়া করে। যথা, তারকনাথ দাস ও শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ একটা Indian Provisional Government করিয়াছিলেন ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টকে ভারতের স্বাধীনতার সাহায্যের জন্য লিখিয়াছিলেন। মকদ্দমা যখন আরম্ভ হয় তখন তারকনাথ জাপানে ছিলেন কিন্তু তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে কয়েদ করা হয় ও বিচারে তাঁহার চারি বৎসর কারাদণ্ড হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯১৭ খৃঃ কলিকাতা হইতে absconder হইয়া ছদ্মবেশে ইউরোপ হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে কলিকাতার সমিতি নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে কোনও সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছিল। আমেরিকায় যখন ভারতবাসীদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়, তিনিও মেক্সিকোতে পলায়িত হন, কিন্তু পরে একদিন তিনি শীতের রাত্রে Rio de Grande নদী সাঁতার দিয়া পার হইয়া United Statesএ গুপ্তভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও নিউ ইয়র্কে পুলিশের হস্তে ধরা পড়েন।

এই প্রকারে United Statesএর কর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার পর ১৯১৭ খৃঃ বার্লিনে সংবাদ আসিল যে, Kreft দক্ষিণ এসিয়ার কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া মেক্সিকো সহরে আসিয়াছেন ও তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তথাকার সিফারৎখানার আশ্রয়ে চারিজন ভারতবাসী যথা, হেরম্বলাল গুপ্ত, জন মার্টিন ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়, সা-ও-সে আছেন, তাঁহাদের বিষয়ে বার্লিনের কি অভিপ্রায়? এই সংবাদ পাইয়া বার্লিন কমিটি মেক্সিকোতে বলিয়া পাঠায় যে,

ইঁহাদের যেন সাহায্য করা হয়। এই সময়ে আমেরিকার কর্ম্মের কেন্দ্র বার্লিন কমিটির দ্বারা মেক্সিকোতে স্থিত হয় এবং চীন ও জাপানে ভারতীয় কর্ম্মের পুনরারম্ভ করিবার জন্য একজন জাপানী ভদ্রলোককে (যিনি অগ্রে জাপানের Diplomatic Serviceএর কর্ম্মচারি ছিলেন) আমেরিকায় প্রেরণ করে। ইনি মেক্সিকো হইয়া পূর্ব্ব এসিয়ায় গমন করিলে ইংরেজের পুলিশ তাঁহাকে ধৃত করিয়া সিঙ্গাপুরে আনয়ন করে, কিন্তু জাপান গভর্ণমেণ্টের প্রতিবাদের ফলে তাঁহাকে খালাস দিতে বাধ্য হয়। ইঁহার কর্ম্মের অভিপ্রায় ছিল যে, চীনে গিয়া দাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন ও জাপানী militarist দলের সহিত ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সম্পর্ক স্থাপন করিবেন। কিন্তু তিনি ধৃত হওয়াতে সে চেষ্টা পণ্ড হয়।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

সমুদ্রগুপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃন্তহীন অলাবু

ক্ষুদ্র অট্টালিকার রুদ্ধ দ্বার মুক্তির শব্দে রন্ধনশালার ছাদে অলাবুপত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল দেখিয়া গণপতি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতলে বাতায়ন-পথে প্রদীপের আলোক আসিয়া অলাবুলতার উপরে পতিত হইয়াছিল। গণপতি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া রন্ধনশালার ছাদে উঠিল এবং পরক্ষণেই রন্ধন গৃহের ছাদে ভীষণ শব্দ শুনিয়া দ্বিতলের সমস্ত লোক সেই দিকের বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণপতি, ছাদে এত শব্দ হচ্ছে কেন?" গণপতি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "লাউ গাছে একটা বড় লাউ ফলেছে মা।" গৃহস্বামিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফলেছে ফলেছে, তার জন্যে এই ভীষণ শীতের রাত্রিতে তুমি ছাদের উপর উঠে অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন?" তখন উত্তরীয় বস্ত্রে আবদ্ধ একটা গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন করিয়া গণপতি বলিল, "লাউটা গড়িয়ে পালাচ্ছিল মা, আমি মাঝ রাত্রিতে স্বপ্নে জানতে পারলুম যে লাউটা ছটফট করছে, আর একটু দেরী করলেই গড়িয়ে পড়তো।" গৃহস্বামিনী বিস্মিত হইয়া তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলছ গণপতি, আমিতো কিছুই বুঝিতে পারছিনা। কচি লাউ, একদিনের লাউ, গড়িয়ে পড়চে কি? এই লাউটা তুলতে তুমি ছাদের উপরে গিয়ে ধস্তাধস্তি করলে তাতে লাউ গাছটা এতক্ষণ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কচি লাউটা তুলতে গেলে

কেন বল দেখি ? যদি ছিঁড়ে থাক তা হলে বোঁটা ধরে সাবধানে নামিয়ে নিয়ে এস।" গুরুভার দ্রব্য ছাদের প্রান্তে নামাইয়া রাখিয়া গণপতি বলিল, "বরাতে দুঃখ ছিল কিনা মা, তাই শীতের রাতে উঠে পাড়লুম। বোঁটাটা খুঁজে পেলুম না তাই যত্ন করে কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। ছাদের কোল থেকে ফেলে দেব কি ?" গৃহস্বামিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না, ফেল না, একেবারে মাটি হয়ে যাবে। গণপতি, তুমি কি পাগল হলে নাকি ? লাউএর বোঁটা নেই, কি যে বল ?" গণপতি তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে এটী বৌদ্ধ লাউ কিনা তাই বোঁটা নেই, এই জাতের লাউগুলো রাত্তির কালে বড় বাড়ে।"

সহসা প্রদীপের আলোক গণপতির উত্তরীয় বস্ত্রে আবদ্ধ বস্তুর উপর পতিত হওয়ায় গৃহস্বামিনী দেখিতে পাইলেন যে গণপতি ক্ষুদ্রাকার মনুষ্য ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহা দেখিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "ওকি গণপতি, ওযে মানুষ ! লাউ কোথায় ?" গণপতি আবার হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে দেখতে তো মানুষের মতই বটে। কিন্তু আমাদের লাউমাচায় ফলেছে কিনা, সেইজন্যই বৌদ্ধ লাউ বলে মনে হচ্ছে।" গণপতি বস্ত্রাবদ্ধ মনুষ্য লইয়া নিম্নে অবতরণ করিল দেখিয়া গৃহস্বামিনীও প্রদীপ হস্তে নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন। তিনি বৌদ্ধ অলাবু দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ করেছিস গণপতি, এ যে কাষায়পরিহিত ভিক্ষু ! এখুনি ছেড়ে দেও—তা না হলে কাল সকালে আর পাটলিপুত্রে বাস করতে হবে না।" তখন গণপতি গৃহস্বামিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা আপনি ভট্টারিকা, আর আমি দাস, আপনি আদেশ করলে আমি প্রতিপালন করতে বাধ্য, কিন্তু মা, একবার বিবেচনা করে দেখুন। এই ভিক্ষু নিশীথ রাত্রিতে গুপ্তচর হয়ে আপনার গৃহে প্রবেশ করেছিল, এখন যদি একে মুক্ত করে দি তা হ'লে ভট্টারকের বিপদ হতে পারে। মা আজ রাত্রি পাটলিপুত্রের বৈষ্ণবের পরীক্ষার রাত্রি, আপনি অনুমতি করুন যতক্ষণ ভট্টারক না ফিরে আসেন ততক্ষণ আমি ভিক্ষুপ্রবরকে বেঁধে রেখে দি। কাল সকালে যদি শকরাজার মহাদণ্ডনায়ক দণ্ড দিতে চান তা হলে সে দণ্ড আমিই পাব।"

গণপতি কোন মতে মুক্তি দিতে চাহেনা দেখিয়া গৃহস্বামিনী ভিক্ষুকে প্রাঙ্গণ হইতে অট্টালিকার মধ্যে আনিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং তাহার মুখের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। মুখের বন্ধন মুক্ত হইবামাত্র ক্ষুদ্রাকার শীর্ণকায় ভিক্ষু গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কাল সকালে তোদের সমস্ত পরিবার কুকুর দিয়ে খাওয়াব।" গৃহস্বামিনী কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "দেব, আপনাকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমার দাস আপনার পরিচয় না জেনে আপনাকে বন্দী করেছে। ভট্টারক ফিরে এলেই আপনাকে মুক্ত করে দেব।" ভিক্ষু গৃহস্বামিনীর বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই কি মনে করেছিস যে তোর ভট্টারক আবার ফিরে আসবে ? এতক্ষণ তার ছিন্নমুণ্ড নগর তোরণে শোভা পাচ্ছে। আর তোর ছেলে দুটোর মুণ্ড পাটলিপুত্রের রাজপথের ধূলায় লুটাচ্ছে। আমি কে তা জানিস্ ? আমি কাপোতিক সঙ্ঘারামের আচার্য্য ত্রিশরণ, সঙ্ঘস্থবির

বোধিগুপ্তের আদেশে প্রতি রাত্রিতে এই গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করতে আসি। জেনে রাখ, আর্য্যসঙ্ঘ জানতে পেরেছেন যে এই পাটলিপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তই জঘন্য বৈষ্ণবদের একমাত্র আশ্রয়। তার জন্যেই এখনও মগধে বৈষ্ণবধর্ম্ম লোপ পায়নি। শাস্তি যে কেবল গুপ্ত পরিবারের পুরুষেরা পাবে তা নয়, কাল সকালে পাটলিপুত্রের চতুষ্কে গুপ্তবংশের সমস্ত নারী দাসীরূপে বিক্রীত হবে।" গৃহস্বামিনী ভিক্ষুর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং গণপতি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, কালকের কথা কাল হবে, এখান থেকে যদি ফিরে যাও তা হলেতো মায়েরা চতুষ্কে বিক্রয় হবেন। এমনও অনেক হতে পারে ভিক্ষুঠাকুর যে ভট্টারকের ছিন্নমুণ্ড নগর তোরণে লোহার কীলকের উপর স্থাপিত হলে তার পাশে তোমার ন্যাড়া মাথাটাও শোভা পাবে।"

এইবার ভিক্ষু শিহরিল। তাহা দেখিয়া গৃহস্বামিনী বলিলেন, "ওসকল কথা কেন বলছ গণপতি?" তাঁহাকে বাধা দিয়া গণপতি বলিল, "মা, এই ভিক্ষুঠাকুরটী কেউটে সাপের জাত। আপনি ওর সঙ্গে কথা কইবেন না, উপরে যান। ভট্টারক ফিরে এলে ঠাকুরের ব্যবস্থা করা যাবে।" গণপতির কথা শুনিয়া গৃহস্বামিনী ভিতরে চলিয়া গেলেন। গণপতি তাহার কম্বলটা সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া সেই কক্ষের একমাত্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিল। তৃতীয় প্রহরের শেষে সুষুপ্তিমগ্ন বৈষ্ণবপল্লী ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল। দলে দলে লোক সেই ক্ষুদ্র অট্টালিকার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, ভিক্ষু উৎকর্ণ হইয়া তাহাদিগের পদশব্দ ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনিতে লাগিল।

পূর্ব্বদিকপ্রান্তে ঊষার শুভ্র আলোক প্রথম দেখা দিলে তিন চারিজন লোক সেই ক্ষুদ্র অট্টালিকার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিল। গণপতি ভিক্ষুকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যাহারা আসিয়াছিল গণপতি তাহাদিগকে চিনিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহাকে বলিল, "গণপতি, ভট্টারক আদেশ করেছেন যে এখনই স্ত্রী ও শিশুদের নগরের বাহিরে নিয়ে যেতে হবে। তুমি ভট্টারিকাকে বল তিনি যেন এখনই গৃহত্যাগ করেন।" গণপতি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নগর ত্যাগ করে যেতে হবে, ধ্রুবভূতি? কোথায় যেতে হবে?" ধ্রুবভূতি কহিল "তুমি ভট্টারকের পুরাতন ভৃত্য হয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করছ গণপতি? তুমি কি ভট্টারক চন্দ্রগুপ্তকে এখনও চিনতে পার নাই?" ভিক্ষু উৎকর্ণ হইয়া ধ্রুবভূতির নাম ও কথা শুনিল। পরক্ষণেই গণপতি ও ধ্রুবভূতি সেই কক্ষে আসিয়া ত্রিশরণকে খট্টার সহিত রজ্জু দিয়া বন্ধন করিল! অল্পক্ষণ পরে যখন বহু পদশব্দ দূরে ক্ষীণ হইয়া গেল তখন ভিক্ষু ত্রিশরণ বুঝিল যে পাটলিপুত্রের বৈষ্ণব নাগরিকগণ স্ত্রীপুত্র দূরে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

দিবসের দ্বিতীয় প্রহর আরম্ভ হইলে শকসেনা পাটলিপুত্রের বৈষ্ণবপল্লী লুণ্ঠন করিতে আসিয়া রজ্জুবদ্ধ ভিক্ষু ত্রিশরণকে মুক্ত করিয়া দিল।　　ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আকুলতা

১

তুমি যদি চলি যাবে রাণি !
আমি একা রহিব কেমনে ?—
ব্রহ্মাণ্ড থাকিলে পূর্ণ, তোমা বিনা সবি শূন্য,
আমি যে কিছুই নহি
তোমারি বিহনে !

২

ধীরে ধীরে সুমেরু অচলে
উষা খোলে কনক দুয়ার,
পরশি অমৃত করে, সুষুপ্ত বিশ্বের পরে
সে যে করে নব শক্তি—
জীবনী সঞ্চার।

৩

আমিও তেমনি জড়তায়
পড়েছিনু অলস অবশ—
তুমি দেবি, স্নেহে স্পর্শি, অমৃত করুণা বর্ষি
জাগায়ে তুলিলে—হায়
চির-নিদ্রালস।

৪

জীবনের জীবনী স্বরূপে
সঞ্জীবিত করিছ এ দীনে,
এযে শুষ্ক মরুভূমি, জানিনা কেমনে তুমি
ছুটায়েছ উৎস, সাধি
কি অচিন্ত্য দিনে !

৫

কি করেছ বলিতে কি পারি,
আমি শুধু মন্ত্রমুগ্ধ রূপ
বিস্মিত বিহ্বল প্রাণে, চেয়ে থাকি মুখপানে
বুঝি না কেমন তুমি—
কি তব স্বরূপ !

৬

তুমি যদি ফেলি যাবে তবে
কিহবে এ অগতির গতি
বিশ্ব যাক্ ভেঙে চূরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ছিঁড়ে খুঁড়ে,
তুমি যাবে আমি র'ব,
স'বে বসুমতী ?

৭

তখনো জাগিবে রবি শশী
ফুলে ফুলে ভরিবে অবনী ?—
আনন্দ-উৎসবে ভরা, তখনো রহিবে ধরা,
আমি হব তোমাহারা নয়নের মণি।—
তোমা হারা হয়ে র'ব আবার এমনি ?

শ্রীমানকুমারী বসু

"নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী"*

(প্রতিবাদ)

"নীলকণ্ঠের স্বরচিত কোন জীবনী নাই"

সামান্য দুই বৎসর মাত্র হইল "নীলকণ্ঠের" জীবন কথা ও গীতিকাব্যের বিষয় বাংলা মাসিক পত্রিকায় আলোচিত হইতেছে। বৈষ্ণব মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে. সি. আই. ই, মহোদয় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "উপাসনা" পত্রিকাতে সর্ব্বদেই আমিই এ বিষয়ে আলোচনা করিতে সুরু করি; সাধকের জীবনী এবং প্রকৃত কবির কাব্য-প্রতিভা, স্ব-গুণে স্বয়ং-প্রকাশমান হইতেছে। ভক্ত সাধক নীলকণ্ঠ একাধারে পল্লী-কবি, এবং স্বভাব-কবি। তাই তদীয় রচনায় পল্লার আনন্দ-বেদনা যেমন মূর্ত্ত হইয়া উঠে তেমনটি আর আমরা অপর কোন সাধক কবির নিকট হইতে আশা করিতে পারিনা। রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত উচ্চদরের সাধক, ভাবুক এবং ভক্ত; তাঁহাদের রচনায় সত্যদৃষ্টির শুদ্ধ প্রকাশ আছে; সত্য-অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আছে কিন্তু তাহাতে মধুপের মনোহারী গুঞ্জনের অভাব; তাই তাঁহাদিগকে সত্য-দ্রষ্টা ঋষি বলা যাইতে পারে'—কিন্তু, কবি-রামপ্রসাদ বা কবি-কমলাকান্ত বলিতে গেলেই অনেকগুলি বিরুদ্ধ যুক্তিতর্কের সমুত্থান হইতে হয়; কিন্তু আমরা অবাধে সাধক কবি-নীলকণ্ঠ বা ভক্ত-কবি-নীলকণ্ঠ বলিতে পারি ও নীলকণ্ঠের রচনায় সত্য-দৃষ্টি ও সত্য-অনুভূতির সহিত কবিত্বের হরগৌরী মিলন হইয়াছে; পূর্ব্বোক্ত দুই সাধকের জীবনে এই মিলনের অভাব খুব সুস্পষ্ট ও তাই এক হিসাবে নীলকণ্ঠ ইঁহাদের একটু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন।

বাংলার এই প্রাণের কবি সম্বন্ধে এতদিন যে কোন-রূপ আলোচনা হয় নাই, ইহা বঙ্গ-বাণীর কম পরিতাপের বিষয় নয়। এবং বর্ত্তমানে যে সামান্য একটু আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাও যে কবির স্মৃতি রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয় তাহা বলাই বাহুল্য;

কবির জীবন-কথা লইয়া স্বর্গগত কবির উদ্দেশে যাঁহারা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন শ্রীযুক্ত বিমান বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার এই উদ্যমের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ; তবে কেন তাঁহার এই উদ্যমের প্রতিবাদ করিতে বসিলাম, নিম্নে তাহার সামান্য কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত মনে করি।

১। বিমান বাবু যাহাকে নীলকণ্ঠের স্ব-রচিত জীবনী বলিয়াছেন, তাহাকে নীলকণ্ঠের স্বকথিত জীবনী বলিলেই বোধহয় সঙ্গত হইত। তিনি নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন, "নীলকণ্ঠ অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার জীবন কথা মুখে একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়া যাইতেন, আর তিনি লিখিয়া লইতেন" এই বলিয়া যাওয়ার ও লিখিয়া যাওয়ার ব্যাপারটি আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহার প্রথম কারণ এই জীবনীটির আগা-গোড়া অসঙ্গতি। এবং এই ভুলগুলি এমন মারাত্মক যে, ইহাকে সত্য স্বীকার করিতে হইলে—আদৌ মানিয়া লইতে হয় যে অতি-বৃদ্ধ বয়সে নীলকণ্ঠ ভীম-রতি গ্রস্ত হইয়া নিজের জীবন কথা আবৃত্তিকালে এইরূপ মুহুর্মুহু ভুল বলিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে অসংযত ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবেই মুদ্রিত হইল। এই প্রবন্ধের নানাস্থানে যে সমস্ত "অপ-প্রয়োগ" আছে তাহা তাঁহারই—মুদ্রাকরপ্রমাদ নহে। বিমান বাবুর অপ-প্রয়োগও তাঁহারি প্রতিবাদের বিষয়ীভূত—সেইজন্য এই রচনাটিতে তাঁহারও ভাষা, বানান ও ছেদচিহ্ন যথাযথভাবে মুদ্রিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে আর কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবে না।—বঃ সঃ

নীলকণ্ঠ সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত (যাহাকে বিমান বাবু অতি বৃদ্ধ বয়স বলিয়াছেন) অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমান ভাবে দল চালাইয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর তিন মাস আগে ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গার ঘাটে 'মানসিক' গান করিবার সময় তিনি স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন "সম্ভবতঃ শ্রাবণের একাদশীতে আমি এখানে দেহরক্ষা করিব", এখানে গান শেষ হইলে তিনি গৃহিণী রোগগ্রস্ত হইয়া মানকর কবিরাজ-বাটীতে কিছুদিন থাকিয়া পরে বাড়ী আসেন। সুতরাং বিমান বাবু যখন বলেন "নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শেষ জীবন স্বর্গীয় মহারাজা রামরঞ্জণ চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের নিকট যাপন করেন" তখন আমরা তাঁহার এই অতিশয়োক্তির জন্য দুঃখিত না হইয়া পারি না। রাজা বাহাদুরের সহিত নীলকণ্ঠের রাজা-প্রজা সম্বন্ধ ছিল; সেইজন্য হয়ত তাঁহাকে দু'এক দিন কার্য্য ব্যপদেশে হেতমপুরে থাকিতে হইত; তাই বলিয়া এই দু'এক দিনের অবস্থিতিকে ঐরূপ মিথ্যা অতিশয়োক্তিদুষ্ট করা উচিত নহে।

তিনি লিখিয়াছেন "নীলকণ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম্মের উপাসক ছিলেন" ইহার উত্তরে আমরা শুধু বলি, নীলকণ্ঠের জীবনী লিখিবার উপযুক্ত যে সামান্য মালমসলা হেতমপুরেই আছে—বিমান বাবু যদি তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজিয়া দেখিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন,—নীলকণ্ঠ ছিলেন,—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত—তান্ত্রিক সাধক বীরুপাক্ষের বংশধর ৺কবীন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য; কেন্দুলার মহিষমর্দ্দিনীর পাট তাঁহার গুরুবাড়ী; কাশীর বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীশ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় নিজেকে নীলকণ্ঠের গুরুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। নীলকণ্ঠ তদ্বিরচিত "বাল্য-কাহিনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন——

"নীলকণ্ঠ ঠাকুর খুঁজিয়া খণ্ড বিশ্ব
গুরু পরখিয়া হ'ন কবীন্দ্রের শিষ্য"

একথা বিমান বাবুর পড়া খুবই কর্ত্তব্য ছিল। কারণ এই "বাল্যকাহিনী" হেতমপুরের মহারাজা বাহাদুরেরই জীবনী। এতদ্ভিন্ন নীলকণ্ঠ দুর্গানাম ভিন্ন অন্য কিছুই প্রায় লিখিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বে আবক্ষ-গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন তাহার শেষের কলিটিতে তিনি স্বীয় ধর্ম্মের সামান্যমাত্র আভাষ দিয়াছেন;——

"মা যে আমার মুক্ত-কেশী
আমি মুক্তি পাব তাঁরই কাছে"

তবে শক্তি উপাসকের "বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল" এই ভাবটি তাঁহার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সাধারণের পক্ষে তাঁহার ধর্ম্মমতটি বুঝা বড় কঠিন; কিন্তু যিনি তাঁহার জীবন কথা আলোচনা করিবেন তাঁহাকে আমরা এই সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। বিশেষতঃ বিমান বাবুর মত শিক্ষিত লোককে। নীল কণ্ঠ প্রত্যহ নিত্যহোম করিতেন; মধ্যে মধ্যে কুমারী-পূজা এবং কুমারী-ভোজন করাইতেন; সুতরাং যে জীবনীটি শাক্ত নীলকণ্ঠকে একেবারে বৈষ্ণব সাজাইতে পারে তাহা আর কাহারও রচিত হইতে পারে; কিন্তু ইহা যে "স্বরচিত নহে" তাহা বলাই বাহুল্য।

২। "তাঁহারা (অর্থাৎ মতিরায় প্রভৃতি সখের দলওয়ালারা) কেমন করিয়া বার ঘণ্টা গান করিয়া 'নীলকণ্ঠ'কে আসর হইতে হটাইয়াছিল সে কথা এই ক্ষুদ্র জীবনীতে প্রকাশিত আছে"

সকলেই জানেন নীলকণ্ঠের সম-সাময়িক সখের যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু তিনিই স্বয়ং নীলকণ্ঠের প্রাধান্য-স্বীকার করিয়া নীলকণ্ঠের দলের দক্ষিণা তাঁহার দলের

দক্ষিণা হইতে একটাকা বেশী করিয়া দেন; এবং নীলকণ্ঠ যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার এই প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই; এবং তাঁহার জীবন কালে তাঁহার দল দিন দিন উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। সখের দলের সহিত প্রতিযোগিতায় তিনি চিরদিন জয়ী হইয়াছেন একথা তাঁহার বিস্তৃত জীবনীতে আলোচনা করিব। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটি তাঁহার নিজের কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

"শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠশালায় পড়েন নাই" এ কথার কোন মূল্য নাই; তিনি তাঁহার গ্রামে রক্ষিতপুর নিবাসী ৺রাধাকান্ত সরকার মহাশয়ের পাঠশালায় দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন—বলা বাহুল্য ইহাই তাঁহার অধীত বিদ্যা।

"..................তাঁহাদের গ্রামের জমিদার ৺ব্রজনাথ ক্ষত্রিয় খাইতে দিতেন ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করাইয়া শ্রবণ 'করাইতেন'।"

৺ব্রজনাথ ক্ষত্রিয় নহে, ৺ব্রজলাল বর্ম্মণ; যাঁহার অধীত বিদ্যা মাত্র দ্বিতীয় ভাগ তিনি আবার শাস্ত্রগ্রন্থ কি পাঠ করিবেন? তবে আমরা জানিয়াছি নীলকণ্ঠ বাল্যকাল হইতেই সুকণ্ঠ ছিলেন, তাই ৺ব্রজলাল বাবু তাঁহার নিকট হইতে দু'একটি গান শুনিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দু'একখান কাপড় দিতেন, কখনও বা কিছু খাইতে দিতেন।

নীলকণ্ঠের মাড়োয়ারী নাগরী লেখাপড়া শেখা, বা মাড়োয়ারীর দোকানে খাতা লিখিতে যাওয়া প্রভৃতি কথার মূলে কোন সত্য নাই; ইহা কাহারও উদ্ভট কল্পনা। তিনি শৈশবে মাতুলালয় কুঁচডিহিতে মাতুলের গরু চরাইতেন; ইহাই তাঁহার যাত্রার দলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্ব জীবনের একমাত্র ইতিহাস।

"কণ্ঠ মহাশয়ের যে গ্রামে বাস তাহার নিকটে একটি জামুই বলিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই গ্রামে গোপালচন্দ্র রায়ের বাস। তাঁহার একটি যাত্রার দল ছিল। ....তখন তিনি এদেশের প্রধান ওস্তাদ। তাঁহার কাছে গান শিখিয়া নীলকণ্ঠ কৃষ্ণ যাত্রার দলে ভর্ত্তি হইলেন"

উপরি উক্ত বাক্যগুলি ভুল এবং অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। গ্রামটির নাম "জামুই" নহে "জামবুনি"। গোপাল রায় এ দেশের প্রধান ওস্তাদ ছিলেন না পরন্তু একজন সামান্য যাত্রাওয়ালা ছিলেন মাত্র। গোপালপুর নিবাসী আনন্দলাল মিশ্র মহাশয় তখন এদেশের প্রধান ওস্তাদ, তাঁহারই শিষ্যদ্বয় ফেলারাম চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণধন ঘোষাল উত্তর কালে নীলকণ্ঠের দলে ছিলেন। নীলকণ্ঠ কখনই কাহারও নিকট মুখে মুখে কিছু শিক্ষা করেন নাই; গান ত দূরের কথা; পরন্তু মাতুলালয়ে যখন গরু চরাইতেন তখন নির্জ্জন প্রান্তরে তাঁহার গান শুনিয়া শ্রীযুক্ত গোপাল রায় আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং তাঁহাকে নিজের দলে আদর পূর্ব্বক রাধিকা বালকরূপে ভর্ত্তি করিয়া লন।

তৎপরে বিমান বাবু লিখিতেছেন "অধিকারী মহাশয় তাহাতে প্রতিবাদ করিলেন যে "তুমি দুই মাস মাত্র আমার দলে আসিয়াছ, কিরূপে যাত্রা করিতে হয় শিক্ষা না করিলে কি দল চালাইতে পার?" কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, অন্যান্য দলে নীলকণ্ঠ দূতী সাজিয়া দল চালাইতেন।"

উপরি উক্ত কথাগুলির মূলে কোন সত্য নাই; কারণ অধিকারীর দলে যাইবার পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ কেবলমাত্র এক গোপাল রায় ও গঙ্গা নারায়ণ রায় (গোপালের খুড়া) এই দুই দলে রাধিকা বালক সাজিতেন; বলা বাহুল্য অধিকারীর দলেই তিনি সর্ব্বদেই দূতী সাজেন। এবং তৎপূর্ব্বে কোন দলে তিনি দূতী সাজেন নাই; দল চালান

ত দূরের কথা। এবং যেখানে এই গান হইয়াছিল সেই স্থানটিকে বিমান বাবু একবার বলিয়াছেন মণিরামপুর এবং আর একবার বলিয়াছেন মাণিকপুর। এ নামের কোনটাই ঠিক নহে; গ্রামের নাম "ভাতশালা"।

পুনরায় বিমান বাবু লিখিতেছেন "তখন তিনি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসল গান শিক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং গোস্বামী শাস্ত্র, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, চৈতন্যচরিতামৃত, বিদগ্ধ মাধব, সনাতন গীতা প্রভৃতি পাঠ করিতে লাগিলেন।"

নীলকণ্ঠ স্বয়ং কোনদিন কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন না। অপরকে পড়াইয়া নিজে শুনিতেন তাঁহার প্রাপ্ত-বয়সে নাচন প্রতাপপুরের ৺রাধারমণ গোস্বামী তাঁহাকে প্রত্যহ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন; এই গোস্বামী মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন বটে কিন্তু সাধক বা সিদ্ধ ছিলেন একথার কোন প্রামাণিক মূল্য নাই। সুতরাং বিমান বাবু যখন উক্ত গোস্বামী মহাশয়কে দিয়া বলাইতেছেন "কণ্ঠ আমি তোমাতে শক্তি সঞ্চার করিলাম, তুমি এই কৃপায় হরিভক্তি লাভ করিবে" তখন আমাদের সত্যই নীলকণ্ঠের জন্য অত্যন্ত দুঃখ হয়। হায় কবি! সাধক কোন এক অর্ব্বাচীন জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের পাতায় তোমাকে এমন দেউলিয়া করিয়া আঁকিয়া গিয়াছে; তুমি ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিলে না আর ইহাই হইল তোমার স্বরচিত জীবনী!

নীলকণ্ঠের গুরু কবীন্দ্র গোস্বামী কিরূপ শক্তিশালী সাধক ছিলেন বিমান বাবু তাহা 'বাল্য কাহিনী' পাঠে জানিতে পারিবেন; এইরূপ একজন ভক্তিশালী সাধকের শিষ্যের মধ্যে ৺রাধারমণ গোস্বামী কোন সাহসে শক্তি সঞ্চার করিতে যাইবেন তাহা আমদের বুদ্ধির অনধিগম্য। নীলকণ্ঠই বা গুরুত্যাগ করিয়া অপর এক ব্যক্তির কাছে শক্তি সংগ্রহ করিবেন কেন? সর্ব্বোপরি ৺ রাধারমণ গোস্বামী একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমাত্র; সাধক হিসাবে তাঁহার কোন নাম নাই।

তৎপরে নীলকণ্ঠ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ ও শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ শীলার পূজা প্রকাশের ব্যাপারে নানারূপ উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে; ইহার প্রকৃত ইতিহাস নীলকণ্ঠের জীবনীতে প্রকাশ করিব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের সহিত বর্দ্ধমান এজলাসে নীলকণ্ঠের পরিচয়ের অংশটুকু আগাগোড়া একটা আষাঢ়ে গল্পের মত। দুই জন যাত্রার দলের অধিকারীর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইল এজলাসে; আবার ইহাই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ; তাই প্রথম দর্শনেই প্রেমতরু অঙ্কুরিত, মুঞ্জরিত এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিল। সুতরাং উভয়েই প্রেম গদ গদ কণ্ঠে অমনি বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন; এজলাসের হাকিম কি বলিলেন উল্লেখ নাই, তবে সাহিত্যের ধর্ম্মাধিকরণে এইরূপ মিথ্যার প্রশ্রয়ের উপযুক্ত শাস্তি বেত্রাঘাত।

বহু পূর্ব্বেই কিরূপে কলিকাতায় তাঁহাদের পরস্পরের সহিত আলাপ হইয়াছিল কিরূপে উভয়ে উভয়ের গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিরূপে বড় বাজার (কলিকাতা) তামাপটীতে ৺রাম দয়াল মজুমদার ডাক্তারের বারোয়ারীতে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় নীলকণ্ঠকে প্রাধান্য দেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা জীবনীতে করিব।

প্রবন্ধটির নাম দিয়াছেন "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী" নীলকণ্ঠের রচিত প্রায় এক হাজারেরও উপর সংগীতের মধ্যে বিমান বাবুর পদাবলীতে মাত্র তিনটি তৃতীয় শ্রেণীর গান স্থান পাইয়াছে। এবং এই তিনটি গানের মধ্যে আবার ভুলের সংখ্যা এত বেশী যে, বানান ভুল ও শব্দের ভুলের চাপে কবির দম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জানিনা যিনি এই "স্বরচিত জীবনী ও পদাবলীর" লেখক তাঁহার ঘাড়ে তখন বড়তলার ভূত চাপিয়াছিল কিনা। তাহা না হইলে কবির কোমল প্রাণের উপর মুহুর্মুহু কসাইএর মত এমন নির্ম্মম ছুরিকাঘাত কোন সহজ মানুষে করিতে পারে না। মধুর:কোমল-কান্ত পদাবলীর মহাজন "খঞ্জ কণ্ঠ" এখানে ছন্দ পতনের জ্বালায়

কেবলই হোঁচট খাইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে ; পাঠক ১৩৩১। মাঘ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে উদ্ধৃত গানটির সহিত নিম্নোদ্ধৃত গানটির তুলনা করিলেই আমাদের কথার যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিমান বাবুর উদ্ধৃত সংগীতের এই অংশটুকুর মিল আমাদিগকে যাত্রার দলের রসিক কবির :—

"নদী এল বান
কোকিলে করে গীত" প্রভৃতি মনে পড়াইয়া দেয় :

"গানটি যে মূর্ত্তি দেখিয়া লিখিত সে মূর্ত্তিটি দেবগোষ্ঠে কৃষ্ণ-মাতার-মূর্ত্তি ; পদে মহা-কাল শিব ; পার্শ্বে অশ্বাসুর মৃত ; তাঁহার কোলে বালক কৃষ্ণ নীলাম্বর ; এই ভীষণ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া দেবগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন "

কে শংকর উরে ?

দশ-করা করে দশদিক আলোক,   নিরখি ওরূপ পলকে পুলক
গোকুল-বাসী নন্দ-কুলেরই তিলক, ত্রিলোক-পালক-বালক ক্রোড়ে।
মিটায়ে যন্ত্রণা ঘুচায়ে অবিদ্যা,   যোগানন্দ পদে যোগে দিলেন নিদ্রা
ওকি মহা বিদ্যা নাকি সিদ্ধবিদ্যা, নবীনা কি বৃদ্ধা চিনিনা ওরে !
রক্ত-বস্ত্র-পরিধানা রক্তসুশোভিতা,   শ্রীচরণযুগে যোগিনী বেষ্টিতা
রতা-সক্তা অতি সতী পতিরতা অদ্ভুত চরাচরে।
নীলাভ্রেরই আভা নীল গিরিবরে,   নীল-পদ্ম-প্রভা নীল সরোবরে—
এত কভু নাহি শোভা করে।
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য দেখিলে অখিলে,   নীল-বর্ণা-নীল-পুত্র কোলে নিলে
নীলবর্ণে শুভ্র শশাঙ্কে জিনিলে কিনিলে কিনিলে কিনিলে নরে (১)
রণেতে-জীবন বধিয়া অশ্বার,   মনেতে উদয় হয়েছে উষ্মার
যায় বা সংসার এই ভেবে সার মহা ভয় ব্রহ্মাস্তরে।
রাখতে ভূ-মণ্ডল কমণ্ডলু-পাণি,   স্তুতি করেন আসি সহ বজ্র-পানি
তাতে বিরক্তা হয়েছেন আরক্তা-ননী অ-কটাক্ষ অজ অশনি করে।
পদে মহা-কাল বিষ পানে কাল,   কোলেরই বালক কাল চির কাল
জননীর বর্ণ জিনি মেঘ জাল তবু যে জগৎ আলো করে।
কণ্ঠ বলে মন বল আমি কি করি   পদে যেমনি রূপের হর
কোলে তেমনি রূপের হরি !
তেমনি অসমা সুষমা সুন্দরী,   আমি কোন রূপ ধরি হৃদি মন্দিরে ?

পরে বিমান বাবু লিখিয়াছেন—"আপন পুত্র শ্রীমান রামকমল মুখোপাধ্যায়কে যাত্রার দলে ভর্ত্তি করিলেন।"

(১) পাঠান্তর—কি নীলে কি, নীলে কিনিলে মোরে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও "বঙ্গবাণী"র তত প্রচার নাই ; নচেৎ নীলকণ্ঠের একমাত্র জীবিত পুত্র কমলাকান্ত কি মনে করিতেন কে জানে? স্বীয় জীবনী বিবৃত করিবার কালে কি স্বীয় পুত্রের নামও ভুলিয়া গিয়াছিলেন? মহারাজ কুমার মহিমা নিরঞ্জণও কি তাঁহার প্রজা নীলকণ্ঠের: পুত্রের নাম জানেন না? তবে এতগুলি ভুলের বোঝা এক জায়গায় স্তুপীকৃত করিয়া কোন ব্যবসায়ী সাহিত্যের বাজারে বিপণী-সাজাইতে আসে? যে জমিদারী হিসাবের খাতায় বিমান বাবু "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী" পাইয়াছেন ; তাহারই খোকা উল্টাইলে বোধ হয় নীলকণ্ঠের পুত্রের নাম পাইতে বেগ পাইতে হইত না। হঠাৎ নামের লোভে যা-তা ভাবে একটী গুরুতর কার্য্যে হাত দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে।

পরিশেষে বক্তব্য আমাদের মনে হয় তাড়াতাড়ি 'যাহোক কিছু' একটা লিখিবার খাতিরেই বিমান বাবু এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।; নচেৎ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পঠিত হয় ; তাহার ভাষায় এত ভুল এবং জড়তা আসে কেমন করিয়া ; এবং পরিষদই বা এরূপ অব্যবস্থিত চিত্ততার প্রশ্রয় দেন কেমন করিয়া? পাঠক নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির অর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন

"উমাসুন্দরী কণ্ঠ মহাশয়কে গরীব জানিয়া শালগ্রাম* দিতে অস্বীকার হইলেন। বিশেষ অনুরোধে ৺রাধাবল্লভজীউকে দর্শন করাইলেই কণ্ঠ যাইয়া দর্শন করিলেন। খাটাস্থিত পলান শয্যায় বস্ত্রাচ্ছাদিত তন্মধ্যে ভুবনমোহন যুগলরূপ মূর্ত্তি শয়ন করিয়া আছেন। তন্মধ্যে আরও চারিটি ৺শালগ্রাম রাখিয়াছেন উহা দর্শন করিয়া কণ্ঠ মহাশয়ের অত্যন্ত লইবার লোভ হইল।" [বঙ্গবাণী, মাঘ, ১৩৩১, ৭১০ পৃঃ] সমস্ত প্রবন্ধটিতে এইরূপ অপভাষার প্রয়োগ ; উপরি উদ্ধৃত অংশটি সামান্য একটু নমুনা মাত্র। স্যার আশুতোষ জীবিত থাকিলে ঐরূপ ভাষার নমুনা প্রবেশিকা পরীক্ষায় শুদ্ধ করিতে দেওয়া যাইতে পারিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধটির তীব্র প্রতিবাদ আরও আগে হওয়া উচিত ছিল ; কারণ, প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয় আগাগোড়া ভুল এবং স্মৃতিবিভ্রমে পরিপূর্ণ। এবং এই ভুলগুলি আবার এমন মারাত্মক যে এতদ্দারা কবির ধর্ম্ম-জীবন এবং কর্ম্মজীবন একেবারে সম্পূর্ণ উল্টা করিয়া আঁকা হইয়াছে ; সুতরাং ইহা "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী" নহে। এবং আমরা জানি যে, নীলকণ্ঠ স্বরচিত কোন জীবনী বা পদাবলী লিখিয়া যান নাই। তাঁহার ঘটনা-বহুল জীবন-কথা কোন এক যায়গায় আবদ্ধ হইয়া নাই ; তাহা এখনও বৰ্দ্ধমান-বীরভূমের পল্লী অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে ; আমরা আজ ছয় বৎসর ধরিয়া তাহারই সামান্য সামান্য সংগ্রহ করিয়াছি। বিমান বাবু যদি নীলকণ্ঠের জীবন কথা সাহিত্যিক হিসাবে আলোচনা করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকেও ঐরূপ পল্লীর চাষীবাসীর কুটীরে সন্ধান লইতে হইবে। পল্লীকবির জীবন কথা পল্লীদুলালেরাই সযত্নে বুকে করিয়া রাখিয়াছে ; তাহা কোন রাজ-অন্তঃপুরে জমাট বঁধিয়া নাই।

উপসংহার :—কিছুদিন হইল বিজলীসম্পাদক কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আমাকে বিমান বাবুর উক্ত প্রবন্ধের কথা জানান ; তৎপূর্ব্বে অপর কোন পত্রিকায় নীলকণ্ঠ-জীবনী আলোচিত হইতেছে ইহা আমাদের জানা ছিল না তাই প্রতিবাদটি লিখিতে কিছু দেরী হইল সেজন্য পাঠক আমাদের ক্ষমা করিবেন।

শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

(প্রত্যুত্তর)

আমার কৈফিয়ৎ

শ্রীযুক্ত শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীলকণ্ঠের জীবনী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দেখিতে পাইয়া সুখী হইলাম। এইরূপ বাদপ্রতিবাদে সত্যনিরূপন সহজ হয় ও সাধারণের মন বিষয়টীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে সাহিত্যিক তর্ক খুব ধীর ও সংযতভাবে করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। ব্যক্তিগত আক্রমণে আলোচনা ঈর্ষ্যাদ্বেষে বিষাক্ত হইয়া উঠে, ও সত্যনিরূপণ কঠিন হইয়া পড়ে।

শক্তিপদ বাবুর মূল বক্তব্য এই যে, তিনি অনেক দিন ধরিয়া নীলকণ্ঠের যে জীবনকাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার নীলকণ্ঠের "স্বরচিত" জীবনী বলিয়া প্রকাশিত ঘটনার মিল হইতেছে না অতএব আমার প্রকাশিত জীবনীটা জাল। সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে আগে হইতে কোন বদ্ধমূল ধারণা মনে রাখিতে নাই—ইহাই হইতেছে বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রণালী। এক্ষেত্রে কিন্তু শক্তিপদবাবু তাঁহার সংগৃহীত ঘটনার সহিত আমার প্রকাশিত ঘটনা মিলিতেছে না বলিয়াই আমাকে জালিয়াতির অপবাদ দিয়াছেন। এরূপ কথা সাধারণে ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে তিনি আর একটু অনুসন্ধান করিলে ভাল করিতেন। তিনি ভালরকমেই জানেন যে, নীলকণ্ঠের সহিত হেতমপুরের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইজন্য অনেক দিন পূর্ব্বে তিনি একবার হেতমপুর আসিয়াছিলেনও শুনিতে পাই। এক্ষেত্রে যখন সেই হেতমপুর হইতেই একখানি নীলকণ্ঠের স্বরচিত বা স্বকথিত জীবনী বাহির হইয়া পড়িল, তখন এখানে আর একবার আসিয়া সে সম্বন্ধে ভাল করিয়া খোঁজখবর লইলেই তাঁহার পক্ষে নীলকণ্ঠের জীবনী রচনা করা অধিকতর সহজসাধ্য হইত না কি? কিন্তু যেরূপ তীব্রভাবে সহসা "স্বকথিত" জীবনীটীকে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, তাঁহার লিখিত জীবনী সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ও নূতন সত্যের আলোকে তিনি আর তাহার কিছু অদলবদল করিতে চাহেন না, এক্ষেত্রে বেদবাক্যের মতন "নীলকণ্ঠের জীবনে ওরূপ হয় নাই, এইরূপ হইয়াছিল" একথা বলিলে লোকে বিনা প্রমাণে তাহা মানিয়া লইবে কেন? অথচ তিনি প্রতিবাদটীতে কোন স্থলেই প্রমাণ দিবার কোন প্রয়াস পান নাই। নীলকণ্ঠ সম্বন্ধে তিনি এত বড় আপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতাম না। তিনি পুনঃপুনঃ "আমার নীলকণ্ঠের জীবনীতে ইহা বলিয়াছি" বলিয়া আলোচনার মুখবন্ধ করিয়াছেন—সে "জীবনী" এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পাঠকগণ যদি ভাবেন যে, শক্তিপদ বাবুর প্রতিবাদের আবরণে তাঁহার অপ্রকাশিত জীবনীর সস্তায় বিজ্ঞাপন দিয়া লইতেছেন, তবে তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

যাহা হউক জীবনীটী যে জাল নহে তাহার কয়েকটী কারণ নিম্নে দিলাম (১) যদি জাল করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইত তবে মূল জীবনীর ভাষা বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিয়া দিতাম। তাড়াতাড়ি জাল করিলেও আমি বা মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন যে শুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে পারি একথাটুকুও শক্তিপদ বাবু স্বীকার করিতে রাজী নহেন কি? Manuscript বা পুথি প্রকাশের সময় সাহিত্যপরিষদ্ কখনই পুথিকে সংশোধন করিয়া প্রকাশ করেন না—কেননা সংশোধন করিলে ভাষার রূপ অবিকৃত থাকিতে পারে না। এই জন্যই মূল জীবনীটীতে যেমন আছে, আমিও তেমনি ভাবে লিখিয়াছিলাম ও সাহিত্যপরিষদের সাহিত্যশাখা তাহা

অনুমোদন করিয়াছিলেন। যদি আমার ভাষা উহা হইত, তবে শক্তিপদ বাবুর কষাঘাত মাথা পাতিয়া লইতাম। শক্তিপদ বাবু বরাবর নীলকণ্ঠের স্বকথিত ও কর্ম্মচারী দ্বারা লিখিত ভাষাকে আমার ভাষা বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ নীলকণ্ঠের সম্বন্ধে শক্তিপদ বাবু অপেক্ষা প্রবীণ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়। এই কৈফিয়তের সহিত মহারাজকুমার বাহাদুরের যে পত্র দেওয়া গেল, তাহা হইতেই আমার প্রকাশিত "জীবনী" যে জাল নহে, তাহা বুঝা যাইবে। মহারাজকুমারের সহিত নীলকণ্ঠের বহু দিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—আর শক্তিপদ বাবু অনুসন্ধান করিয়া নীলকণ্ঠের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে first hand informationই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়। যাহা হউক শক্তিপদ বাবু প্রতিবাদ করিয়া যে দুই একটী নামের লিপিকর প্রমাদ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। আমি "জীবনীটি" প্রকাশ করিবার সময় মহারাজকুমার বাহাদুরকে একবার দেখাইয়া লইতে পারিলে, ফুটনোটে মূল জীবনীর ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিতে পারিতাম। "বীরভূম বিবরণের" যে তৃতীয় খণ্ড লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশের সময় ঐরূপ করা হইবে স্থির হইয়াছিল। যাক "বঙ্গবাণীর" কলেবরে পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা হইয়া গেল। তবে "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি"র যত্নে নীলকণ্ঠের বহু পদ ও জীবনের বহু নূতন ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। সেগুলি প্রকাশিত হইলে, শক্তিপদ বাবুর সংগৃহীত জীবনী মিলাইয়া দেখিয়া পাঠকবর্গ সত্যনিরূপণ করিবেন ইহাই অনুরোধ।

আমি তাড়াতাড়ি "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী" প্রকাশ কেন করিয়াছিলাম তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও প্রয়োজন মনে করি। শক্তিপদ বাবু বলিয়াছেন যে, একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আমার নাম জাহির করার মতলব ছিল—কিন্তু ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, ও দৈনিকে লিখিবার অভ্যাস আমার নূতন নহে সুতরাং মাসিকে নাম বাহির করিবার জন্য সহসা একটা জাল জুয়াচুরী করিবার বোধ হয় আমার প্রয়োজন নাই। তবে নীলকণ্ঠের স্বকথিত জীবনী একখানি পাইয়া আমি প্রকাশ না করাকে পাপ মনে করিয়াছিলাম—ভুলভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও এরূপ জীবনীর মূল্য অনেক। তাই সাহিত্যপরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে উহা পাঠ ও প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। "বঙ্গবাণী"তে প্রকাশিত হইবার পর উহা "বঙ্গবাসীর" তিন সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছিল। সুতরাং পল্লীগ্রামে যে আমার প্রকাশিত জীবনী পৌছায় নাই—ইহা মনে করা শক্তিপদ বাবুর ঠিক্ হয় নাই। তবে পল্লীর কোন পাঠকই এ পর্য্যন্ত উহার প্রতিবাদ করেন নাই।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের পত্র

৶শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ

পরম স্নেহভাজন—

হেতমপুর রাজবাটী

শ্রীমান্ বিমানবিহারী মজুমদার,

১৩৩২।২৯ শ্রাবণ

তোমার প্রকাশিত "নীলকণ্ঠের জীবনী" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শক্তিপদ ভট্টাচার্য্যের প্রতিবাদ পাঠ করিলাম। প্রতিবাদের তীব্রতা দেখিয়া ইহা লইয়া কোনোরূপ আলোচনার ইচ্ছা ছিল না। তথাপি তোমার অনুরোধে দুই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

তুমি "বঙ্গবাণীতে"নীলকণ্ঠের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছ তাহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ব-কথিত। তিনি অবসর মত মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিয়া থাকিতেন। স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধমত ইদানীং তিনি ব্রজলীলা সম্বন্ধে একখানি নূতন যাত্রার পালা রচনা করিতেছিলেন। নিরালায় বই লেখার সুবিধা হইত, আর তখন আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ কুঞ্জে শাস্ত্রালোচনার খুব ধূম ছিল, তার উপর বিশেষ করিয়া আমি অনুরোধ করায় শেষের দিকে অবসর মিলিলেই তিনি হেতমপুরে চলিয়া আসিতেন। প্রাতে সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট বসিতাম, নানা কথার আলোচনা হইত, আমি প্রায়ই তাঁহাকে বলিতাম "আপনার জীবনী লিখুন"; তিনি রাজী হইতেন না।—বলিতেন "আমার এ ক্ষুদ্র জীবনী শুনিয়া কাহার কি লাভ হইবে; তা ছাড়া নিজের কথা কিছু বলিতে গেলেই একটা প্রতিষ্ঠা লাভের ভাব আসিয়া পড়িবে।" আমি কিন্তু ছাড়িতাম না, সুবিধা পাইলেই বলিতাম, শেষে একদিন তাঁহাকে রাজী করা গেল। সর্ত্ত হইল ইহাতে তাঁহার নিজের উক্তি কিছু থাকিবে না, যেন আর একজন লিখিতেছে। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—অতি সাধারণ কথাবার্ত্তা বলার ভঙ্গীতে; আমার একজন কর্ম্মচারী তাহার নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সেগুলি একটু লেখ্য ভাষায় লিখিয়া লইতে লাগিল। ইহা কণ্ঠ মহাশয়ের স্বর্গারোহণের কয়েক মাস পূর্ব্বের ঘটনা। সেবার যতটুকু পাওয়া গিয়াছিল সংগৃহীত হইয়াছিল, পরে আর সেরূপ কোনো সুযোগ না পাওয়ায় জীবনীটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

নীলকণ্ঠের বাল্যজীবনের অনেক ঘটনাই লোকে জানেনা। তাহার প্রথম কারণ সেকালের একটী দরিদ্র বালক কোথায় কি করিয়াছে না করিয়াছে অত খবর জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, যে দু'একজন লোক জানিত এখন আর তাহারা কেহ বর্ত্তমান নাই; পুত্র কমলাকান্ত বিশেষ কোনো সংবাদ রাখেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কণ্ঠের মাড়োয়ারী বাড়ীর চাকুরী ইত্যাদির কথা প্রায়ই লোক জানেনা।

ভুল এটী মানুষের স্বাভাবিক, বিশেষ যে কর্ম্মচারীটি লিখিয়াছিল বানানে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল না। তাই হয় তো জামাবুনি লিখিতে জামুই লিখিয়াছে, তা ছাড়া শুনিবার ভুলও হইতে পারে। গানের ভুল সম্বন্ধে আমার মনে হয়, লোকের মুখে মুখে 'কণ্ঠের গান' অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, লেখক লিখিবার সময় যে পাঠান্তর জানিত অভ্যাসবশে তাহাই লিখিয়া ফেলিয়াছে। কমলাকান্তের নাম ভুলও শুনিবার ভুল হইতে পারে।

প্রতিপদে "রাজা প্রজা" সম্বন্ধ লইয়া একটু শ্লেষের গন্ধ পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গে কণ্ঠের কি সম্বন্ধ ছিল—বিশেষ আমার সঙ্গে,—অন্যের পক্ষে তাহা জানিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। এখন আর জানাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

মা

সংসারের একমাত্র অবলম্বন স্বামী হারাইয়া এলোকেশী ভাবিয়াছিল, এ পৃথিবীতে তাহাকে আর অধিক দিন বাঁচিতে হইবে না। তখন তাহার ভাবনা হইয়াছিল একমাত্র বালক-শিশুটিকে লইয়া। স্বামী যে পথে চলিয়া গিয়াছেন, আজ হউক বা কাল হউক, তাহাকেও সেই পথ ধরিতে

হইবে ; কিন্তু এই নিতান্ত শিশু সন্তানটির কি হইবে, কোথায় থাকিবে, কে খাওয়াইবে, ইত্যাদি অপার ভাবনার বোঝা একা বহন করিতে না পারিয়া ক্রমে অদৃশ্য ভগবানের উপর সে সকল ভাবনা সমর্পণ করিয়া দিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না। স্বামীর মৃত্যুর পর, দিন, মাস, ক্রমে বর্ষ অতীত হইল, কিন্তু স্বামী-প্রদর্শিত পথে চলিবার ডাক তাহার আসিল না। জীবনসংগ্রামের আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া এবং কাল-ধর্ম্মে, স্বামীর শোকটাও ক্রমে বিস্মৃতিতে চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে পাঁচটা বর্ষ কাটিল।

একদিন গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় কি এক সবিশেষ কারণে এলোকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অদূরে ক্রীড়ারত বালকের প্রতি চাহিয়া তাহাকে জানাইয়া গেলেন, এতবড় ছেলেকে আজও পড়িতে না পাঠাইয়া তাহাকে গো-সংক্রান্ত গণেশ-বিশেষ হইতে দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে। পিতামাতা যে সন্তানকে পাঠাভ্যাসের জন্য পাঠশালায় না পাঠাইলে পরম শত্রুর কাজ করে, এরূপ ভাবার্থযুক্ত একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। কথাটা এলোকেশীও কয়েকবার ভাবিয়াছিল, কিন্তু গৃহে অন্য পুরুষ ব্যক্তির অভাব হেতু, দীর্ঘসূত্রতাহেতু এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম কারণ বশতঃ ভাবনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, তিন দিবস ব্যাপী চিন্তার পর একদিন গুরুমহাশয়কে ডাকাইয়া এলোকেশী জানাইল, সে তাহার ছেলেটিকে তাঁহার শ্রীহস্তে সমর্পণ করিতে চায়। কিন্তু যেহেতু সে আজও নিতান্ত শিশুমাত্র, সেই হেতু তাহাকে যেন বেত্রাঘাত, হস্তাঘাত, এবং বাক্যাঘাত, এই ত্রিবিধ আঘাত হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। তাঁহার উপদেশের ফল যে এত শীঘ্র ফলিবে, গুরুমহাশয় তাহা ভাবেন নাই। অভিভাবকহীনা সম্পত্তিশালিনী এই বিধবার পুত্রের ভার গ্রহণ করা তাঁহার নিতান্তই প্রয়োজনীয়। এই সরলা, অবলা এবং একটু অধিক মাত্রায় সংস্কারাপন্না নারীটির নিকট হইতে কোন কোন সুদূর আত্মীয়-আত্মীয়া এবং দুর্জ্জয় সমাজ বস্তুটির শীর্ষস্থানীয় কোন কোন মহা-মানব অল্প-বিস্তর গ্রহণ, আহরণ এবং অপহরণ করিয়া তাহার সংসার চিন্তা অতিমাত্রায় হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুমহাশয় অদ্যাবধি এই দলভুক্ত হইতে পারেন নাই, দূর হইতে এই সকল পাপ-কর্ম্ম দেখিয়া নিজের স্বাভাবিক সাংসারিক বাতরাগ বৃদ্ধি করিতেছিলেন মাত্র। বিধবা কবে পুত্রকে শিক্ষালাভের জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহারই অপেক্ষায় তিনি আশান্বিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে দু'একবার কথাটা পাড়িবেন মনে করিয়াও বিধবার অত্যধিক এবং অস্বাভাবিক পুত্রস্নেহের প্রবাদ শুনিয়া সংকল্প মনেই রাখিয়াছিলেন। অবশেষে কোন এক শুভমুহূর্ত্তে তিনি কথাটা পাড়িয়া-ছিলেন, এবং ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইবার পরই হাতে হাতে ফল পাইলেন। ত্রিবিধ আঘাত সম্বন্ধে অভয় প্রদান করিয়া, নির্ঘণ্ট দেখিয়া, বিদ্যারম্ভের শুভদিন স্থির করিয়া গুরুমহাশয় বিদায় লইলেন।

পাঠশালায় যাইবার পূর্ব্বরাত্রে ছেলেটি মা'র সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া গল্প করিল। বাহিরে সমস্ত সুপ্ত, ঘরের মধ্যে বেড়ার জানালার মধ্য দিয়া খানিক জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আছে। পাঠশালায়

কত ছেলে পড়ে, কি পড়ে, কখন ছুটী হয়, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ছেলেটি মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং মা কতক জানা এবং কতক কল্পিত উত্তরের দ্বারা ছেলেকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। এক সময়ে ছেলেটি চুপ্ করিল। মা মনে করিল সে ঘুমাইয়াছে, এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ডাকিল, মণি! ছেলেটি জাগিয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কি মা?

মা বলিল, ঘুমুবি না?

ছেলেটি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, আচ্ছা মা, যে সব ছেলেরা পাঠশালায় পড়ে, তাদের মা'র জন্যে মন কেমন করে না?

মা তাহাকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মন কেমন কর্‌বে কেন? ক' ঘণ্টা বৈত' নয়।

ছেলেটি পুনরায় প্রশ্ন করিল, আচ্ছা তাদের ভয় করে না?

মা বলিল, ভয় কিসের?

ছেলেটি মাতার আলিঙ্গনের মধ্যে একটু নড়িয়া বলিল, এই যেমন গুরুমশাই হয় ত' মার্‌লেন্ কিম্বা খুব বক্‌লেন। হ্যাঁ মা, গুরুমশায়ের বেতটা নাকি তিন হাত লম্বা? আর নাকি মার্‌লে গায়ের ছাল উঠে যায়?

এলোকেশীর মনে হইল ছেলেকে পাঠশালায় দিয়া কাজ নাই। পরে গুরুমহাশয়ের অভয়দানের কথা স্মরণ হইল। ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, মার্‌বেন কে বল্লে? গুরুমশাই কোন দিন মারেন না। লেখাপড়া না কর্‌লে একটু বক্‌বেন। লেখাপড়া শিখ্‌লে কত বড়লোক হবি, চৌধুরীদের বাড়ীর মত বাড়ী কর্‌বি;—

ছেলেটি চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি যখন বড়লোক হব, তখন তোমাকে কি দেব জান মা?

কি?

বড়লোক হইলে সে যে মাতাকে কি দিবে, তাহা মোটেই ভাবিয়া বলে নাই। এখন হঠাৎ মনে পড়িল, মা এক প্রতিবেশিনীর সহিত গল্প-প্রসঙ্গে একটি ঝিয়ের আবশ্যকতার কথা কহিয়াছিল। সে বলিল, তোমাকে তখন একটা ঝি এনে দেবো।

মা ছেলের মস্তক চুম্বন করিয়া বলিল, হ্যাঁ বাবা, বুড়ো-শুড়ো হ'য়ে পড়্‌ছি, শীগ্‌গির বড়লোক হ'য়ে একটা ঝি ঘরে আন্। কেমন?

ছেলে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পরে এক সময়ে মাতার আলিঙ্গনমধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মা'র কিন্তু ঘুম হইল না। কিছুক্ষণ অন্ধকারে চোখ মেলিয়া শুইয়া থাকিবার পর ছেলেটিকে অতি সন্তর্পণে শোয়াইয়া রাখিয়া সে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। মেঘ-মুক্ত আকাশে চাঁদ

স্থির হইয়া আছে, গাছপালার উপরে চাঁদের আলো এক নিরবিচ্ছিন্ন স্বপ্ন-মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে, রকের নীচে পুদিনার ঝোপ হইতে একটা গন্ধ বাতাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। কোন খানে জীবনের সাড়া নাই, জাগরণের চিহ্ন নাই। এলোকেশী বাহিরের দিকে চাহিয়া দোরের পাশে বসিয়া রহিল। তাহার মনে কোথা হইতে কি একটা বেদনা জাগিয়া ছিল, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বহুদিন পরে মৃত স্বামীর কথা তাহার মনে পড়িল। সংসারের কাজকর্ম্ম এবং পূজা অর্চ্চনাদিতে ব্যস্ত থাকায় তাহার কোন কিছু ভাবিবার অবসর খুব অল্পই ছিল। আজ তাহার মনে পড়িল এই রকের উপর বসিয়া তিনি কতদিন শিশু-পুত্রকে কোলে লইয়া তাহাকে সেই পুত্রের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কত সম্ভবাসম্ভব কথা বলিতেন, এবং এই লইয়া উভয়ে কত ছোট-খাট বিবাদ ঘটিয়া যাইত। পুত্রপ্রাপ্তির কোন আশাই ছিল না, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ভগবান যখন তাহাদের পুত্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাকে লেখাপড়া না শিখাইলেও যে সে ভবিষ্যতে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিবে, তাহাতে তাহার স্বামীর সন্দেহমাত্র ছিল না। এলোকেশী কিন্তু ভাবিত, ছেলেকে সহরে পাঠাইয়া দিয়া কিরূপে চৌধুরীদের ছেলের মত তিন-চারটা পাশ করাইবে। এবিষয়ে মতদ্বৈধের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ অমত করিবার কেহ নাই। ভাবনায় চিন্তায় এলোকেশী সমস্ত রাত্রিটাই অতিবাহিত করিয়া দিল।

উঠানের দক্ষিণ পার্শ্বের ঘরে দুইজন লোক শয়ন করে। তাহারা এলোকেশীর ক্ষেতে কাজ করে, এবং রাত্রিকালে এখানে শুইয়া পাহারারও কাজ করে। তাহাদের ঝাঁপ ঠেলার শব্দে এলোকেশী তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

বালকটিকে পাঠশালায় লইয়া যাইবে বলিয়া একজন কৃষাণ উঠানে দাঁড়াইয়াছিল। এলোকেশী ছেলেকে কাপড় পরাইয়া, চাদর গায়ে দিয়া, তাহাকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, ঠাকুরদের নমস্কার কর বাবা।

বালক নমস্কার করিল। তাহাকে সেখান হইতে বাহিরে আনিয়া এলোকেশী কৃষাণকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিল, খুব যেন সাবধানে যায়, ছুটী হইলেই যেন লইয়া আসে, গুরুমহাশয় যেন প্রহার না করেন, ইত্যাদি। পরে তাহাদের সহিত অনেকখানি পথ আগাইয়া দিল। কৃষাণ বলিল, আর কেন যাচ্ছ মা ?

এলোকেশী কিছু না বলিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মোড়ের নিকট গিয়া বালকটি মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া মাকে দেখিল, তারপর মোড়ের পার্শ্বে অদৃশ্য হইয়া গেল। এলোকেশী তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বেলা বাড়িলে এলোকেশীর বার বার মনে হইতে লাগিল, যে কোন মুহূর্ত্তে মণি ছুটিয়া আসিয়া বলিবে, মা তোমার পাতে খাব। একবার ভুল করিয়া মণির নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফেলিল। পরে নিজে কিছু আহার না করিয়া সমস্ত ছেলের জন্য চাপা দিয়া রাখিল।

ক্রমে সমস্ত অভ্যস্ত হইয়া গেল। পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিতে আর কোন লোকের আবশ্যক হইত না, জননীকে আর উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত না, এবং সংসারের অনিবার্য্য ত্রিবিধ তাপের ন্যায় গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের অনিবার্য্য ত্রিবিধ প্রহারও ছেলেটির অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে কয়েকটা বর্ষ কাটিয়া গেল; ছেলেটি গ্রাম্যপাঠ সমাধা করিল। পাড়ার বিজ্ঞদের পরামর্শ মত, ছেলেকে সহরে পাঠাইয়া লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য এলোকেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুযোগও ঘটিল। এলোকেশীর এক দূর সম্পর্কের ভ্রাতা সহরে ছোট-খাট কারবার করিত, এবং মধ্যে মধ্যে এলোকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। এলোকেশী গ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা তাহাকে এক পত্র লিখিল—তদুত্তরে সে জানাইল, তাহার ভগিনী-পুত্রকে লইয়া যাইতে সে খুবই প্রস্তুত। সেই সঙ্গে ইহাও জানাইল, ভগিনী-পুত্রের ভরণ-পোষণ এবং লেখা-পড়ার সমস্ত খরচ সেই দিত, কিন্তু সংসারের নিতান্ত অসচ্ছল অবস্থাহেতু তাহা হইবার উপায় নাই, এলোকেশীকেই কিছুদিনের জন্য সে ভার গ্রহণ করিতে হইবে। দিনস্থির করিয়া এলোকেশী তাহাকে আনাইল। জন্মপরিচিত গ্রাম ছাড়িবার পূর্ব্বরাত্রে ছেলে মাকে অসংখ্য প্রশ্ন করিতে লাগিল, এবং মা'য়ের কেবলই মনে হইতে লাগিল, সেখানে মণি কাহার নিকট শুইবে, কে তাহাকে ধরিয়া খাওয়াইবে, কে তাহাকে যত্ন করিবে, এত শীঘ্র অত দূর দেশে না পাঠাইলেও চলিত।

ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল। মণি মাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই এলোকেশী তাহার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কত নিদারুণ বিদায়-বেদনা যে অন্তরের মধ্যে চাপিয়া লইল, তাহা এক অন্তর্যামীই বুঝিলেন। মাঝিরা তাড়া দিতেছিল; মণি মাতুলের হাত ধরিয়া নৌকায় উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় সঙ্গেই ছিলেন, তিনি স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিলেন। পালে বাতাস লাগিয়া বাঁধা নৌকা দুলিয়া উঠিল। তীরের জল ছপ্ ছপ্ করিয়া উঠিল। নৌকার বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকা আর একবার নড়িয়া ধীরে ধীরে তীর ছাড়াইয়া মাঝ-নদীতে পৌঁছিল। মথিত জলরাশি বার বার ছল্ ছল্ কল্ কল্ করিয়া তীরের উপর আসিয়া নীরব হইয়া যাইতে লাগিল। মাতুলের আজ্ঞামতই বোধ হয় মণি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা চল্লুম।

এলোকেশী কোন উত্তর দিতে পারিল না। পুত্রের বিদায়-বাণী নদীর অশ্রান্ত মর্ম্মধ্বনির সহিত মিলিয়া, প্রান্তরের আকাশ-বাতাসের সহিত মিলিয়া এক অতি করুণ অনন্ত সঙ্গীতের সুরের মত কেবলই জননীর কর্ণে বাজিতে লাগিল। নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন জননী অদূরে নদীবক্ষে সেই সাদা পাল তোলা নৌকাটি তখনও দেখিতে লাগিল। পণ্ডিত-মহাশয় বলিলেন, মা বাড়ী যাবে না? চল যাই।

এলোকেশী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল নৌকা কখন কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে এক বিরাট শূন্যতা স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার প্রথমেই মনে হইল এই শূন্যতার গহ্বরের মধ্যে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। পণ্ডিতমহাশয় পুনরায় তাহাকে

গৃহগমনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। এলোকেশী উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিল, আপ্‌নি এখন যান্, আমি একটু পরে যাব। কিন্তু এই সন্থ-বিচ্ছিন্না নারীকে এস্থানে একা ফেলিয়া যাইতে পণ্ডিত-মহাশয়ের মন সরিল না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা মা, আমি আহ্নিকটা এখানেই সেরে নিচ্ছি। এই বলিয়া তিনি নদীতীরে আহ্নিককৃত্যে রত হইলেন। এলোকেশী স্বপ্ন-বিহ্বলের ন্যায় যে পথে নৌকাটি গিয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

ইহার পর মণি বহুবার গ্রামে আসিল, এবং সহরে ফিরিয়া গেল। প্রথম প্রথম সে মায়ের জন্য সহর হইতে কোন একটা কিছু আনিত, পরে তাহা বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মা'কে বুঝাইতে চেষ্টা করিত, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাসিক ব্যয়ও বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, সুতরং পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক অর্থ পাঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মা মধ্যে মধ্যে বলিত, ইহার অধিক অর্থ পাঠান সম্ভবপর নহে। মণি তদুত্তরে মাকে স্মরণ করাইয়া দিত, মাসে মাসে যে টাকাটা চৌধুরীদের বাড়ীতে জমা রাখা হয়, তাহা জমা না রাখিলেও ত' সংসারের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না।

এই মাসে মাসে টাকা জমানর একটা ইতিহাস আছে। এলোকেশীর ইচ্ছা আছে, ছেলে আর একটা পাশ দিলেই তাহার বিবাহ দিবে, এবং তাহা সহরে গিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিবে। সেই হেতু মাসে মাসে সে এখন হইতেই টাকা জমাইতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন মণির নিকট উত্থাপন করায়, সে হাসিয়া বলিয়াছিল, সহরের কোন ছেলে এত শীঘ্র বিবাহরূপ রজ্জু গলায় ধারণ করে না এবং চিরজীবন অবিবাহিত থাকাটা সেখানে একটা পরম গৌরবের বিষয়।

মণির পাশ দিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। এলোকেশী ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে শুঁড়ভাঙ্গা গণেশ এবং দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান বহুকালের সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া চকের চণ্ডীকে পর্য্যন্ত নানা মানসিক করিয়াও যখন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তখন একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকাইয়া পুত্রের আসন্ন পরীক্ষার সাফল্যকামনায় তুলসী দিবার ব্যবস্থা করিল। ইহার কিছুদিন পরে তাহার সহরের ভ্রাতাটি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এই আকস্মিক আগমনে আশ্চর্য্য হইয়া এলোকেশী বলিল, সব ভাল ত' ? মণি কেমন আছে! বারুদে সামান্য আগুন লাগিলে তাহা যেমন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি এলোকেশীর এই প্রশ্নে তাহার ভ্রাতাটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া দুইটী হস্ত এবং দশটী অঙ্গুলি নানা ভঙ্গিতে নাড়িয়া চাড়িয়া যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, মণি স্বদেশী নামক একপ্রকার গুণ্ডাদলের সহিত মিশিয়া ইহকাল এবং পরকালের মস্তক ভক্ষণ করিতেছে। এবং শুধু তাহাই নয়; তাহার দোকানে যে সমস্ত, বিদেশজাত জিনিষ আছে, তাহা যাহাতে কেহ ক্রয় না করে, তাহার জন্য দস্তুরমত দলগঠন অবধি করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে তাহার দোকান বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এলোকেশী শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, তার না পরীক্ষা কাছে? পড়াশুনো করছে কখন?

ভ্রাতাটি শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, পড়াশুনো? সে অনেকদিন বন্ধ হ'য়ে গেছে। পরীক্ষা টরীক্ষা ও দেবে না। আজ দু'দিন হ'ল বাড়ী ফেরে নি, কোন এক স্বদেশী আড্ডায় থাকে।

এলোকেশীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। পাশের খুটিটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বাড়ী ফেরে নি? তবে কোথায় আছে? কোথায় খাওয়া-দাওয়া কর্‌ছে?

ভ্রাতাটি স্বদেশী আড্ডার কথাটা আর একবার স্মরণ করাইয়া দিয়া জানাইয়া দিল এতদিন সে দুগ্ধ এবং কদলী দিয়া সর্প পুষিতেছিল। তাহার এই তীক্ষ্ণ মন্তব্য তীক্ষ্ণতর হইয়া এলোকেশীর বুকে বাজিল। তাহার ভ্রাতা আরও অনেক কথা বলিয়া গেল, কিন্তু সে কি বলিবে, কোন উপদেশ গ্রহণ করিবে কি প্রদান করিবে, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবে কি অভিসম্পাত দিবে, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া কাঠের মত চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আবশ্যকীয় উপদেশাদি প্রদান করিয়া এলোকেশীর আত্মীয়টি পরদিনই চলিয়া গেল। এলোকেশী পুত্রের আগমনাপেক্ষায় পথ চাহিয়া রহিল। পুত্রের পরীক্ষার কথা, পাশের কথা, বিবাহের কথা এবং আরও অনেক কথা সে ভুলিয়া গেল, এখন ঠাকুরের পদে বার বার এই মিনতি করিতে লাগিল, ঠাকুর যেন তাহার ছেলেকে তাহার ক্রোড়ে ফিরাইয়া দেন্। ঠাকুরের ইচ্ছাতে হউক, বা অন্য কাহারও ইচ্ছাতে হউক পুত্র পরদিনই বাড়ী আসিল। এলোকেশী চোখের জল মুছিয়া তাহার আত্ম-বর্ণিত পল্লবিত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে মণি আর একবার মাতার পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল, আমি দেশের দশের মঙ্গল চেষ্টা কর্‌ছি সত্যি, কিন্তু কারুর ত' কোন অনিষ্ট কর্‌ছি না।

এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলা বাহুল্য বিবেচনায় এলোকেশী বলিল, আর সহরে গিয়ে কাজ নেই, যা করবার, এখান থেকেই কর।

মণি বলিল, তা কি ক'রে হবে মা? আম্‌রা যে এখন দেশের সেবক। আমরা বাড়ীতে প'ড়ে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? দেশের লোক্‌দের দেখ্‌বে কে?

এলোকেশী অবাক্ হইয়া বলিল, দেশের লোক্‌কে তুই দেখ্‌বি কেন? আর তোর দেশ ত' এই গাঁয়েই।

মণি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মাতাকে দেশের ব্যাপকতার মর্ম্ম বুঝাইতে সক্ষম হইল না। কিন্তু দুইদিন পরে সে এই অসাধ্য সাধন করিল। দুইদিন অবিশ্রান্ত বক্তৃতার দ্বারা সে এলোকেশীকে বুঝাইয়া দিল দেশ অর্থে শুধু এই গ্রাম নয়, আরও এইরূপ লক্ষ লক্ষ গ্রাম লইয়া ভারতবর্ষ নামক একটী প্রকাণ্ড দেশ। এই বৃহৎ দেশের লোকসংখ্যার যেমন সীমা নাই, তাহাদের দুঃখ কষ্টেরও তেমন সীমা নাই। সে এই সকল দুঃস্থদের মঙ্গলব্রতে ব্রতী হইয়াছে, তাহার জীবন ইহাদের সেবাকার্য্যেই ব্যয়িত হইবে। সমস্ত বুঝাইয়া সে আসল কথা পাড়িল। বলিল ইহাদের সেবাকার্য্যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন; এই কার্য্যে সাধ্যমত সকলেরই কিছু কিছু দান করা কর্ত্তব্য।

আরও অনেক কথার পর এলোকেশী বলিল, কিন্তু আমার ত' অত টাকা নেই।

মণি বলিল, .কেন তুমি আমার বিয়ের নাম করে যে টাকাটা চৌধুরীদের বাড়ী জমা রেখেছ, সেইটে এনে দাও না কেন?

এলোকেশী কাতরভাবে বলিল, ওটা যে তোর বিয়েতে খরচ হবে ব'লে জমাচ্ছিলুম্ বাবা!

বিয়ে? দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহচিন্তা যে কিরূপ বাতুলতা, মণি তাহা আর একটি বক্তৃতার দ্বারা মাকে বুঝাইয়া দিল।

জননীর মনে যে কি চিন্তার উদয় হইল, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানিলেন। সে সংক্ষেপে বলিল, তোরই বিয়ের জন্যে রেখেছিলুম্, তুই নিতে চাস্ নে।

মণি বলিল, দেশের উপকারের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে হবে মা, টাকাটা কবে আন্‌বে? টাকা পেলেই আমি একবার সহরে যাব। টাকার অভাবে সেখানে কাজ আট্‌কে রয়েছে।

এলোকেশী বলিল, আজ সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, এখন টাকা পাব না, কাল এনে দেব।

পরদিন একটা পুঁট্‌লী মণির হাতে দিয়া এলোকেশী বলিল, এই নে তোর টাকা।

মণি একে একে নোট ও টাকা গণিয়া লইতে লাগিল। সাফল্য এবং গর্ব্বে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু জননী যে এই টাকার সহিত কত ত্যাগ করিল ভবিষ্যতের তাহার কত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং কল্পনা এই কয়মুষ্টি অর্থ দানের সহিত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, কোন সুগভীর বেদনা হৃদয়ের কোন নিভৃততম প্রদেশে কেমন করিয়া লাগিল,—সেখানে কতখানি ক্ষত বা ছিন্ন করিল,—এ সকল কিছুই তাহার মনে হইল না। সে টাকাগুলি পুনরায় পুঁটুলিতে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, ঘরে ঘরে যেদিন এম্‌নি মা হবে, সেদিনই এদেশ স্বাধীন হ'তে পার্‌বে মা।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অরূপ না রূপ

"অরূপ বীণা রূপের আড়ালে" বীণা দেখা যায় কিন্তু বীণার সুর—তাকে দেখা যায় না; কিন্তু চেনা যায় সেই সুর দিয়ে—এটি বীণা বাজ্‌ছে ঢাক নয় ঢোল নয় গ্রামোফোনের বীণাও নয়। দেখা বীণার সঙ্গে না-দেখা সুর জড়িয়ে রয়েছে যেটি, সেটি বীণার প্রাণ স্বরূপ বীণার কাঠামো ধরে আছে প্রাণ।

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল"

একটি রূপের অশেষ প্রকাশ,—দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে রূপ-সাগরের পারে অরূপ বলে একটা কিছু ধরতে সাঁৎরে চল্লোনা, রূপের মধ্যেই তলিয়ে গেল! মন যৌবনের শেষ চাইলে না—নতুন থেকে নতুন আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলেই চল্লো! এই হল রূপদক্ষের কথা রূপ-সাধনের চরম সিদ্ধি।

এক সঙ্গে রূপলাবণ্য ভাবভঙ্গী যা চোখে দেখা গেল তা এবং সেই সঙ্গে রূপের মাধুরী—তাও পেয়ে গেল যখন মানুষ, তখন সে হল রূপ-দক্ষ।

রূপ সবারই চোখে পড়ে কিন্তু রূপের মাধুরী তো সবার কাছে ধরা দেয় না!

ফুলটা দেখলেম, ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে ফুলের সৌরভ কেমন তাও জানলেম, কিন্তু এই হলেই যে ফুলের মাধুরীটিও পেয়ে গেলেম এমন নয়!

রূপের মধ্যে তিনটি জিনিষ—একটি তার আকার প্রকার, একটি তার অন্তর্নিহিত ভাব আর এই দুই জড়িয়ে যে মাধুরী ফুটলো সেটি!

পর্ব্বত যে পর্ব্বত এবং সে যে বিরাট ভাব নিয়ে বিরাট—এটুকু সাধারণের পক্ষে ধরা শক্ত নয়; কিন্তু পর্ব্বতের—নবীন নীরদ শ্যাম রূপের মাধুরী সবার ধারণার বিষয় তো হয় না!

তেমনি একটা কবিতা ছবি গান এরা যা দেখালে তা পেলেম, অথচ এদের মাধুরী মনকে একেবারেই স্পর্শ করলে না—এমন ঘটনা সাধারণ।

রূপদক্ষ যাঁরা তাঁরা এই মাধুরীকে পেয়ে যান, তাই সব রূপই তাঁদের কাছে কালে কালে পুরাতন হয়ে যায় না—কতকালের এই আকাশ পর্ব্বত নদ নদী জল স্থল এরা পরিচয়ের দ্বারা ঔদাসীন্য এনে দেয় না তাঁদের মনে, পলে পলে বারে বারে মনের সঙ্গে এসে লাগে, চোখে এসে লাগে এরা নতুন হয়ে মধুর হয়ে।

পর্ব্বত একবার দুবার দেখলে তাকে দেখার তৃষ্ণা মিটে গেল আমাদের—কিন্তু রূপদক্ষ তাঁরা আমাদের চেয়ে সৌভাগ্যবান—তাঁরা তো শুধু রূপ বা ভাবটাই পেলেন না—পর্ব্বতের বা অরণ্যের বা ফুলের বা কবিতার বা ছবির অথবা গানের—তাঁরা রূপের সঙ্গে রূপের ভাব এবং তাদের মাধুরী—যেটা রূপকে চিরযৌবন দেয়—তা'পর্য্যন্ত পেয়ে ধন্য হলেন।

যারা সত্যি রূপদক্ষ তাদের আনন্দের শেষ নেই, চোখ মন সব দিয়ে একটি রূপকে তাঁরা বিচিত্রভাবে দেখে যাচ্ছেন নতুন নতুন চিরকাল ধরে নতুন!

হিমালয় পর্ব্বত সেও রূপের রংএর সঞ্চয় নিয়ে পুরোণো হয়ে শেষ হয়ে গেল যাদের কাছে এমন মানুষ খুব কম নেই, কিন্তু হিমালয়ের একটা পাথর একটি গাছ মাধুরী পেয়ে অফুরন্ত হয়ে রইলো চির নূতন হয়ে গেল যার কাছে—এমন মানুষই কম দেখা যায়।

গানে যে রূপ ফুটছে, কবিতায় যে রূপ, ছবিতে যে রূপ এবং বিশ্বের এই বিশ্বরূপ সবারই কায মাধুরীতে মনকে তলিয়ে দেওয়া। এই মাধুরী স্পর্শ করে চলেছে তাবৎ জীব, কেউ

এতে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ সমুদ্রের জলে তেলের মতো উপরে উপরে ভাসতে থাকছে তলাতে পারছে না।

চন্দ্রোদয় দেখে—আহা সুন্দর না বলে এমন লোক কম, কিন্তু তারা সবাই চাঁদের মাধুরীকে পেয়ে যায় না—এই ধরণের সাধারণ ভাবপ্রবণতা চন্দ্রকান্ত মণির মতো—চাঁদ উঠতেই ভিজে ওঠে, কিন্তু কিছু উৎপন্ন করে না বনের সামগ্রী। অসাধারণ ভাবপ্রবণতা হল মাটির মতো—রসে ভেজে এবং বীজে ফল ধরায় শক্তি গজায় ফুল ফোটায় ফল দেয় নানা রকম।

জিনিষটাকে বার থেকে বেশ করে চেনা হল এবং তার ভিতরের ভাবটাও যাহোক নিপুণভাবে বার করে দেখা হল কিন্তু বাকি রইলো তখনো আসল যেটা পাবার সেটি পাওয়া—রূপের মাধুরীটুকু!

আর্টের সঙ্গে আর্টিষ্টকে পাই তাই আর্টের আদর করি, রূপের আড়ালে অরূপকে দেখি তাই রূপের আদর করি, এমনি কতকগুলো বচন আর্ট সমালোচনাতে প্রচলিত হয়ে গেছে। রূপ যেন সোপান আর্ট যেন সোপান—আর্টিষ্টের এবং অরূপের কাছে পৌঁছে দিতে আমাদের! রূপ সিঁড়িও নয় প্রহরীও নয়, আর্ট Exhibitionর যে তাকে ধরে আর্টিস্টের সঙ্গে পরিচয় করতে চলবে বা অরূপ অদ্ভুত একটা বাজি দেখবে তার কাছে ছাড়পত্র নিয়ে!

রূপের সাগরে ভাসিয়ে নিতে তলিয়ে নিতেই রূপ আছে মাধুরী দিয়ে, আর্টিষ্টের কথা অরূপের ধ্যান ভুলিয়ে দিতেই রূপ আছে।

সুরূপাদের শিরোমণি তাজবিবি সে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে কিন্তু তার রূপ সে এসে বল্লে এই রইলেম আমি রূপের স্বপ্নে বাঁধা এই পাথরের ভিতরে বাহিরে সুপ্রত্যক্ষ, অরূপে মিলালো না রূপ আমার, রূপের সঙ্গে মিল্লো এসে আমার নতুন রূপ। তাজমহলের দর্শন শিল্পির নাম ও পরিচয় বা ইতিহাসের এক অধ্যায় পড়ে নেওয়াতে তো নয়, তাজমহলের রূপের মাধুরী পাওয়াই হচ্ছে দেখার শেষ! রূপ থেকে মাধুরীকে পেয়ে যাওয়াতে রূপের এবং রূপদক্ষের সার্থকতা—। দেহতত্ত্ব আধ্যাত্মিকতত্ত্ব এমনি শক্ত রকমের একটা তত্ত্ব পেয়ে রূপ বা রূপদক্ষ ধন্য হয় না কোনো কালে।

বিয়ের দিনে বর কনের মধ্যে অনেকগুলো লোক থাকে তারা কেউ তত্ত্ব বয় কেউ শাস্ত্র কয় কেউ বর কনের দাম কত যাচাই করে, এমনি নানা ঘটনা নিয়ে উৎসব একটা রূপ পেয়ে বসে সবারই কাছে কিন্তু উৎসবের মাধুরিমা পেয়ে যায় শুধু দুটি তিনটি লোক—বর কনে, কনের মা এমনি দুচার অন্তরঙ্গ—যারা হাসে কাঁদে এক সঙ্গে।

বিশ্বজোড়া রূপ মাধুরী সাগরে ঢলমল করছে—বাতাসে মাধুরী সাগর জলে মাধুরী, আকাশে মাধুরী, ধরিত্রী মাধুরী বহন করছে, অরণ্যে মাধুরী—পথের ধূলা তাতেও মাধুরী—এত মাধুরী ধরা রইলো দশ দিকে কিন্তু এর উপভোগের উপযুক্ত হল না মানুষ ছাড়া আর কোন জীব! এই যে শ্রেষ্ঠদান—কবির কবি, রচয়িতার রচয়িতা, আর্টিষ্টেরও আর্টিষ্টের কাছ থেকে এল—একে

পেয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হবে এই জন্যেই না এতে খুসি হয়ে দাতার কথা স্মরণ করবে সেই জন্যেই এই ভাবনা হিমালয়ে বসে আমার মনে উঠেছিল, আমার দেবতাকে আমি প্রশ্ন করে দিলেম —দান দেখেই যে ভুলে থাকি তোমায় দেখতে চোখও চায় না মনও চায় না এ কেমন দান তোমার!

সত্যিই যেদান দাতাকে ভুলিয়ে দেয় সেইতো বড় দান, যে দান ঠেলে দাতা আপনি এগিয়ে আসেন সে দান তো তুচ্ছ দান। রূপদক্ষতার চরম তো সেইখানে যেখানে রচনার রূপ রং সমস্তই ভুলিয়ে দিলে রূপদক্ষকে শুধু তার দান করা রূপের মাধুরী মনকে পরিপূর্ণ করলে।

ছবির, কবিতার, সঙ্গীতের উদ্দেশ্য রচয়িতাকে সুপরিচিত করা—এ হতেই পারে না, রচয়িতা যেখানে গোপন, রূপদক্ষের পূর্ণ দক্ষতা সেখানে। ছবির সঙ্গে আর্টিষ্টকে জানছি এ নয় আর্টিষ্টকে জানলেম না শুধু জানলেম রচনাকে এবং পেলেম তা থেকে মাধুরী যা পাবার তা এই হল ঠিকভাবে রূপের উপভোগ, কিন্তু এ না হয়ে ছবি নিয়ে কবিতা নিয়ে সঙ্গীত নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে চল্লেম কোথায় তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা দার্শনিকতা প্রভৃতি নানা তত্ত্বের সিংহাসনে আর্টিষ্ট বসে আছেন এতে রূপকে কোন দিক দিয়ে দেখা শোনা কিছুই হল না। ভোলাতেই রূপের সৃষ্টি হয়েছে যখন, তখন রূপকে অতিক্রম করে অরূপ প্রভৃতির সন্ধান কতকটা যেন বরকন্যার যুগল মূর্ত্তির সামনে বসে দুজনের কুলপঞ্জী এবং তাদের আয়ব্যয় ও ধর্ম্ম কর্ম্মের হিসেব দেখে খুসি হয়ে যাওয়ার মতো কায।

মধুভরা আকাশ বাতাসে আলোর মধ্যে ফুলের কুঁড়ি প্রাণের পাত্র খুলে ধরলে—মধু সঞ্চিত হল সেখানে, তেমনি রূপদক্ষের রচনার সামনে হৃদয় পেতে দিলেন মধুতে পরিপূর্ণ হল পাত্র, রূপের সবখানি এতেই পাওয়া হয়ে গেল! এটা কবি-কল্পনা নয়—সৃষ্টির রূপের রহস্য এই নিয়ে এবং এই নিয়ে আর সব জীবের চেয়ে মানুষ আমরা বড় হলেম 'অমৃতস্য পুত্রা'!

বর্ষার আকাশ জলই ঝরায় তাদের কাছে—যারা মেঘের পিছনে মেঘবাহন ইন্দ্র নয়তো মেঘনাদ নয়তো বৃষ্টিতত্ত্বগোছের একটা কিছু দেখার চেষ্টা করে, আর সেই মেঘ অমৃত বর্ষণ করে তার প্রাণে যে মেঘের রূপ দেখেই ভুলে থাকে, কার দেওয়া মেঘ কোথাকার মেঘ কি দরের মেঘ এ সব খোঁজই নেয় না।

মধুকরের সঙ্গে রূপদক্ষের তুলনা দেওয়া হয় কখন কখন, কিন্তু রূপদক্ষ ফুলের মাধুরী ফুলের রূপের সঙ্গে পায়, মধুকর শুধু পায় ফুলের মধু, ফুলকে পায় না! রূপের মধ্যে, মধুকর ছাঁকা অরূপ রস পেয়ে বঞ্চিত হল,—আর রূপদক্ষ মানুষ রূপে রসে সমান অধিকার পেয়ে চরিতার্থ হয়ে গেল।

রূপ কি তা বোঝাতে হয় না কাউকে, রূপ চোখে পড়লেই জানায় আপনি কি বস্তু, কিন্তু রূপের মাধুরী সে যে অন্তরের জিনিষ, তাকে বোঝাতে গেলেও বোঝানো হয় না, রূপদক্ষ যাঁরা তারা তা জানে কিন্তু জানাতে পারে না। যাকে জানা গেল কিন্তু জানানো গেল না তেমন বস্তু নিয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া চলে না, কাযেই রূপ সম্বন্ধে চর্চ্চা করি শুকনোভাবে—মাধুরী তোলা থাক্ কিছু কালের জন্য।

মাধুর্য্য এবং রূপ দুটোর বিষয়েই "উজ্জ্বল নীলমণিতে" লেখা আছে। কিন্তু রূপ যে দেখলে না, রূপের মাধুরী হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করলে না সে হাজার বার "নীলমণি" উল্টেপাল্টে পড়েও কিছুই পেলে না। রূপ দেখে ভুলে যাওয়া যার হল না সে পড়েই চল্লো পুঁথি। রূপ যে নিজের দৃষ্টির বিষয় এবং তার মাধুরী নিজের মনের বিষয় অন্যের এমন কি খুব বড় কবিরও পিছনে পিছনে গিয়ে তাদের চোখে দেখলে রূপ দেখা হয় না অন্যের দেখার মতো করে দেখা হয়।

মহাকবি কালিদাস তিনি একরূপে হিমালয় পর্ব্বত দেখে—খুব সম্ভব কল্পনা করে—লিখলেন—

"অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশি দেবতাত্মাহিমালয়োনাম নগাধিরাজ
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধি গোহ্যস্থিতঃপৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।"

বড় কবির দেওয়া এই মানদণ্ড এগিয়ে হিমালয় পর্ব্বতের রূপেব পরিমাপ করে দেখতে গেলে দেখবো কি—এই শ্লোকের দুটো ছত্র এবং এরি প্রতিরূপ। এ ছাড়া আর কিছুই ভাল মন্দ চোখে পড়বেই না এবং দেখবো মনও এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি ধরে চলছে চোখের সঙ্গে পাহাড় অরণ্যে, পরের দেওয়া রূপ ও রসের ভাল মন্দর মধ্যে রেলের উপরে গাড়ির মতো বাঁধা পথে।

মহাকবির চশমা নিজের চশমার চেয়ে বড় চশমা, কিন্তু বৃদ্ধের চশমা যুবা চোখে পরলে, যুবার চশমা বুড়োয় পরলে, তার দশা হয় কি সেটাও তো দেখা চাই। আমি যদি কালিদাসি করে লিখি—এই যে গিরিচূড়ার মতো উন্নত নাশা তার উপরে ধরা রয়েছে সোনার তারের দুইধারে ধরা দুখানি মোতিয়া বিন্দু সেতো চশমা নয় সে রূপ অরূপ দুই সমুদ্রের জলের পরিমাণ করে নেবার দাঁড়িপাল্লাখানি।—তবে হয় লোকে বলবে আমার চোখ খারাপ কিম্বা উল্টো চশমা পরেছি—এর চেয়ে বেশীও বলবে। হিমালয়কে একটা মাটির ঢেলা ওজন করবার দাঁড়ি পাল্লার মতো দেখায় মজা আছে, রসও এক রকমের আছে, কিন্তু তাই বলে সেটা হিমালয়ের উপযুক্ত বর্ণনা একেবারেই নয়, বলতে সাহস হয় না, তাই বলি যে মহাকবি কালিদাসের ভুল বর্ণন চাঁদের কলঙ্ক, আর চশমা চোরা অকবির ভুল বর্ণন তার নিজের মুখের চুণকালির প্রায়। একথাটা সহজ সত্য কথা—কিন্তু একথা মতো চলা অত্যন্ত কঠিন সেই জন্যে জগতে অনেক কবি নেই, অনেক আর্টিষ্ট নেই, অনেক রসিকও নাই, ঋষিও নেই—যাঁদের আর্ষ প্রয়োগ মাপ করা চলে। তিন মাস আমি নিজের লাঠি ধরে পাহাড় প্রদক্ষিণ করেছি, কোনোদিন পর্ব্বতের কাছে বখসিস পেয়েছি কোনোদিন পাইনি, মহাকবির চাদরের খুঁট ধরে গেলে হয়তো পদে পদে কিছুনা কিছু প্রসাদ পেতেম, কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে কবির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পর্ব্বতকে পাওয়া, অকবির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পাওয়ার চেয়ে ভাল হলেও নিজে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের একবিন্দুর সঙ্গে তার পরিমাপ হয় কি? মহাজনের

সঙ্গে চলা নিরাপদ এটা সবাই বলে, কিন্তু মহাজন নিজের চোখের চশমা অন্যের চোখে যে পরিয়ে সহজ দেখার পথ বন্ধ করেন এটাতো মিছে কথা নয়। রূপ নিজের দৃষ্টির বিষয়, সে মধুর কি নয়—তা নিজে দেখে বুঝি। রূপের পর্দ্দা পরিয়ে অরূপকে দেখ—এটা মহাজনদের কথা, কিন্তু রূপ রূপ-দেখাতেই তো আছে এটা সহজ মানুষের কথা!

পূর্ণচন্দ্রের আলোকে পরাস্ত করে পর্ব্বতের উপরের তারাটি জ্বলছে তার রূপ দেখেই আনন্দ, তারাটা কোন তারা, তারার অন্তরে কোন দেবতার দীপ্তি—এসব মনে নাই এলো। যার রূপ আছে সে রূপ দিয়েই মন টলায়, নকিবের দরকার তার যার নিজের রূপগুণাদির পরিমাণ যথেষ্ট নয়—ইন্দুমতির স্বয়ম্বর সভায় রূপ নকিবের দেওয়া সাজ না পেয়েই বরমাল্য লাভ করলে। রূপের দর্শন দেখে আনন্দিত হওয়াতেই তার পরিণতি, রূপ থেকে স্বতন্ত্র বং থেকে স্বতন্ত্র বর্ণহীন রূপহীন অরূপের প্রতীক হওয়াতে রূপের সার্থকতা নয়। প্রতিমার মর্য্যাদা—প্রতীক হয়ে পড়াতে নয়, রূপের আসনই তার গৌরবের আসন।

গৌরীশঙ্কর হিসেবে বরফের পাহাড় দেখা পাহাড়কে সত্য দেখা বলেতো মনে হয় না, একটা সমুদ্রের তরঙ্গ ঘোড়া হিসেবে দেখে কবিদের আনন্দ হয়—কেননা কবি ভাবুক কিন্তু আর্টিষ্ট—তারা যে রূপদক্ষ!

দিয়াশলাইয়ের বাক্স একটা, সিগারেটের টিন একটা, লোহার সিন্দুক একটা—এবং কালীঘাটের কৌটো একটা—এদের ভাল মন্দের হিসেব এদের রূপের মধ্যেই রয়েছে। দেশলাইয়ের বাক্সর কবি বাক্সটার রূপ বড় উপমার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হয়তো কালিঘাটের কৌটোর চেয়ে তাকে ভাল বলে প্রমাণ করতে পারেন কারো কাছে কিন্তু আর্টিষ্ট—সে রূপ দিয়েই রূপের পরিমাপ করে দেখবে, উপমার ভাল মন্দ দিয়ে নয়।

কি প্রাচীন কি আধুনিক ভারত শিল্পের একটা রূপ আছে, শুধু তাই দিয়েই তার ভাল-মন্দ উচ্চ-নীচ বিচার আধ্যাত্মিকতার প্রসংশাপত্রের উপরে তাকে বসালে সে যে জগৎ শিল্পে বড় জিনিষ বলে চলে যাবে একথা ভাবাই ভুল। গুণের অপেক্ষা না রেখেই রূপবান সহজেই প্রমাণ করে যে সে রূপবান। অষ্টাবক্র—তিনি ঋষি হয়েও একটা ছেলের কাছে ধরা পড়লেন যে তিনি রূপবান একেবারেই নন—নির্দ্দোষীকে কিন্তু তিনি অভিসম্পাৎ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন তিনি বড় ঋষি।

ইন্দুমতীকে নিয়ে সহচরী সুনন্দা এক এক রাজার রূপগুণের বর্ণনা কত ব্যাখ্যানা দিতে দিতে চল্লো মালা পড়লো না কারু গলায়। অজ রাজার সামনে এসে সুনন্দা শুধু বল্লে—আর্য্যে ব্রজামো-ন্যতঃ—অজরাজা যে রূপবান ছিলেন সুতরাং সেখানে সুনন্দার ব্যাখ্যানার প্রয়োজন একেবারেই রইলো না। রূপের পর্য্যাপ্তির মধ্যে রূপের একটু আধটু খুঁৎ যেমন, তেমনি গুণেরও বাহুল্যের মধ্যে কুরূপের সবটা তলিয়ে যায়। পয়সার পর্য্যাপ্তি রূপ গুণ সবার দোষ ফিল্‌টার করে পাত্রটিকে

বিয়ের সভায় হাজির করে, কিন্তু তাই বলে কালো কোন দিন সাদা হয় না—যা কুরূপ তা অরূপের ছাড়পত্র পেয়েও সুরূপ হয় না। অনেক সময় দেখি কুরূপ সেও সয়ে গেছে চোখে।

যেমন দেখতে দেখতে সয়ে গেলে রূপের খুঁৎ চোখেই পড়ে না, তেমনি রূপ অনেক সময়ে অতিপরিচিত হয়ে মর্য্যাদাও হারায় আমাদের কাছে।

হিমালয় পর্ব্বত তার দিকে ফিরেও দেখে না পাহাড়ি মানুষ, আর তিন মাস ধরে প্রতি মুহূর্ত্তে তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ আমার তৃপ্তি আর মানলো না!

হারমোনিয়ামের শব্দ অত্যন্ত বদ কিন্তু কেমন করে আমাদের কানে সয়ে গেছে—বুঝতেই পারিনে যে দেবী বীণাপাণির কান লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে সেটা দেখা মাত্র! আমি সেদিন একটা ছদ্মবেশের সভায় চীনের জুতো আর কোর্ত্তা পরে গেলেম, বন্ধুরা আমায় দেখে চাপা হাসি হাসলেন, কিন্তু আমার পাশেই আধখানা ধুতি আধখানা কোট পরে কত লোক এল গেল কারু চোখে তার কদর্য্যতা ধরা দিলে না—সয়ে গেছে বলেই তো?

রূপ সম্বন্ধে বলবার সময় অরূপের কথা ওঠে প্রায়ই দেখি এবং অরূপের আধার রূপ এও বলা হয় এবং অরূপের সাধনার জন্যই আর্টে রূপের অবতারণা—এমনো বলা প্রচলিত হয়ে গেছে চিত্র সমালোচনাতে, সুতরাং গত তিন মাস ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ছবিতে এই রূপ অরূপের ঠিক যোগাযোগটা কি ভাবের তা ধরার চেষ্টায় রইলেম! দেখতেম—পর্ব্বতের সামনে যখন কুয়াসা তখন অরণ্য নেই, পাহাড়ের ঝরণা নেই, চোখের কায ফুরিয়ে গেছে তখন, মনের এবং কানের কায আরম্ভ হয়ে গেছে—জলের শব্দ শুনছি, পাখির গান শুনছি, আর ভাবছি কত কি—কিন্তু এটা যে পাখি গাইছে ওটা যে ঝরণা ঝরছে তা মনে ধরা রূপ সমস্ত কুয়াসা হবার আগে থেকেই জানিয়েছে আমাকে! আবার পর্ব্বতের উপরে অমাবস্যার রাত্রি যে কি ভয়ানক অন্ধকার,—তা পাহাড়বাসী মাত্রই জানেন—পায়ের তলা থেকে পথ মনের কাছ থেকে দেখে চলা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, অরূপ ঘিরে নেয় চারিদিক, দূরত্ব নৈকট্য আর থাকে না, বিষম ভ্রান্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে খুঁজে বেড়ায় চোখ আর মন দুজনেই হারানো রূপ আর তার স্মৃতি।

যার কোন পরিচয় আমার কাছে ধরা পড়লো না সেই রইলো আমার কাছে অরূপ হয়ে বর্ত্তমান—বড় সভায় বক্তার সামনে দু একজন পরিচিত এবং নিকটবর্ত্তী অপরিচিত মানুষ ছাড়া বেশীর ভাগ শ্রোতাই নিজের নিজের রূপ না দেখিয়ে লোকে পরিপূর্ণ ঘর এইটুকু মাত্র জানাতে থাকে—এ একভাবে অরূপ রূপের যোগাযোগ, এর ধারণা ছবিতে পৌঁছে দেওয়া চল্লো—অবগুণ্ঠিতা সুন্দরী সবাই আঁকে, পর্দ্দানশীন সবাই আঁকে—সেখানে মানুষটি ছেড়ে দেওয়া গেল দর্শকের কল্পনার উপরে, শুধু অবগুণ্ঠন এঁকেই খালাস চিত্রকর। যন্ত্রসঙ্গীত আরো এগোলো, গোটা দুই সুরের টান কানের কাছে দিয়ে এক একটা রূপ জাগালে—সকাল বিকাল কত-কির কবিতার ব্যঞ্জনা সুরের রংএর রেখার রেশ দিয়ে যা বলতে পারলে না, দেখাতে পারলে না, তা দেখালে শোনালে ইসারায়

বলা হল যা তাকে আর যাই বলি অরূপ বল্লে ভুল হয়—একরূপ আর এক রূপের এক রং আর এক রংএর এক সুর অন্য কিছুর ইঙ্গিত করলে এ পর্য্যন্ত চলে আর্টে—বেং দিয়ে বোঝানো চলে বাদলা কিন্তু বেরং দিয়ে রং বিনা রেখায় ছবি—এসব তত্ত্ব কথার কথা! পর্ব্বতে বসে রূপ অরূপ দুয়েরই হিসাব দিয়ে লেখা ছবি দেখে আমি অনেকগুলো নোট খাতায় টুকে এনেছি তাই নিয়ে এ সমস্যাটা আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি,

(১) "সকালে ফোটা সূর্য্যমুখী ফুলটিকে নীল আকাশ আলোর খবর এনে দিতে না দিতেই প্রথম পৌষের দুরন্ত কুয়াসা দিকবিদিক ঘিরে নিলে।"

কিম্বা যেমন—(২) "পাহাড় তলিয়ে যাচ্ছে হিমের প্লাবনে, বাতাসে ভেসে বেড়চ্ছে সকালের আলো—কুলহারানো একলা হাঁস।

অথবা যেমন—(৩) "সন্ধ্যার আকাশ চেয়ে দেখছে দিনের শেষে আলোর জয় পতাকা শীতের কুয়াসা নামিয়ে রাখছে ফুলের বনের পায়ের কাছটিতে!"

তিনটি ছোট ছোট স্থান চিত্র কবিতাও নয় গল্পও নয়। হাতের লেখায় ধরা দিলে ছবি কটা সহজে কিন্তু তুলির আগায় এদের আটকাতে গেলে দেখবো—দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুটিই ছবি হয়ে রূপ পেয়ে বসে আছে—কিন্তু প্রথমটির বেলায় মুস্কিল—সেখানে রূপ সাদা কাগজ থেকে পিছলে পড়তে চায়, ঘন কুয়াসা পটের সবটা অধিকার করতে চায়। বাদলের আকাশ যেমন শুধু রং দিয়ে জানায় জলের ধারা আছে তার বুকে, তেমনি এখানে কুয়াসা না-দেখা ফুল পাতা ইত্যাদি রূপের পরিমল বহন করে সার্থক একখানি ছবি হতে চাইলে। সাদা রংএর একটা প্রলেপ দিয়ে পাহাড় পর্ব্বত ফুল পাতা সব ধরে দেওয়া পটের উপরে—এ মানুষের কর্ম্ম নয়। ছবি করতে হলেই তাকে হয় রূপ নয় রূপের আভাষের মধ্যে বদ্ধ থাকতে হবেই। পর্ব্বতের আভাস না দিয়ে পর্ব্বতের কুয়াসার ঠিক রূপ এবং মাঠের আভাস না দিয়ে পাহাড় তলার কুয়াসার ঠিক রূপ দেওয়া বিশ্বকর্ম্মার কায—মানুষের ক্ষমতায় কুলায় না--বুঝলে পর্ব্বতে আছি কিম্বা আগে জানলে পাহাড়ে নেই সহরে আছি পাহাড়ের কুয়াসা কিম্বা কলের ধুয়া বলে প্রভেদ করলে তখন।

রূপ যতটুকুই হোক না কেন সে রূপ ছাড়া অরূপ নয়। জলের মতো হাল্কা রং দিয়ে পাহাড় লিখি, গাছ লিখি, কুয়াসায় গাছ পাহাড় তলিয়ে গেছে তাও লিখি—সে হল ছবি নয় ছাপ। রেখা মাত্রেই রূপবান, রেখা ছেড়ে ছবি কোথায় এবং রং ছেড়েই বা রেখা কোথায়। এই রং আর রেখার যোগাযোগ ছবিকে সুনির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ধরে চোখে।

রূপের বাঁধন ছেঁড়া রং সেই শুধু অরূপের কতকটা আভাষ দিতে পারে, যেমন আকাশের গভীর নীল রঙীণ কাপড়ের নিথর রং, কিন্তু তারা ছবি নয় ভাবের বাহন, রংএর একটা একটা স্ফূর্ত্তি দিয়ে মনে এক এক ভাব ও রস জাগায় রূপের অপেক্ষা না রেখেই। সুর কতকটা যে কায করে, রং কতকটা সেই কাযই করে—বসন্তবাহার সুর আর বাসন্তি রংএর আলো দুই অনির্দ্দিষ্ট

রূপের ধ্যানে মগ্ন করে দেয় মনকে, কিন্তু রেখা বাঁধা রং রূপের পাথারে মনকে তলিয়ে নিয়ে চলাই তার কায।

ছবি যারা লেখে তারাই জানে রূপ রং ইত্যাদিকে দিয়া সম্পূর্ণ ফুটতে না দিলে এবং সম্পূর্ণ ফুটিয়ে দিলে একই বস্তুর দুটো ছবি দুরকম রস দেয় দর্শককে। পটখানির মধ্যে তলিয়ে আছে যে রূপ, আর পট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে যে রূপ—দুটো দুরকম জিনিষ, কিন্তু দুটোই রূপের বাইরের জিনিষ নয় দুটিই রূপ, একের ঘোমটা আছে অন্যের ঘোমটা নেই—এই তফাৎ। এই ত নিয়ে থাকা এবং ফুটে ওঠা রূপ জগৎ শিল্প এই দুই তটের মধ্যে ধরা। সব দেশের সব শিল্পের ধারা ধরা গেছে এই দুই কিনারার মধ্যে। এই দুই পারের হিসেব নিয়ে কলা-রসিকদের মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি হয়েছে Idealist, Realist নামে এবং ছোটখাটো দলও সৃষ্টি হচ্ছে কত যে তার ঠিকানা নাই, যথা Futurist, cubist, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং দলে দলে দলপতিতে ঝগড়ারও সীমা নেই—impressionist বলে একটা কথা চলেছে শিল্পসমালোচনায়, mystic কথা তাও ভারতশিল্পের পরিচয়-পুস্তকে স্থান পেয়েছে। নাতিস্ফুট না অতিস্ফুট, নির্দ্দিষ্ট না অনির্দ্দিষ্ট ছবি হতে হবে এই নিয়ে তর্কের সীমা ছাড়িয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর গালাগালির বন্যায় গিয়েও ঠেকবার জোগাড় হয়েছে। এই তর্কজাল কুয়াসার মতো যখন সরে যায় তখন দেখি পর্ব্বতে পর্ব্বতে শুধু স্ফুট অস্ফুট দুরকমের ছবি ঝরণা দিয়ে বহে আসছে দৃষ্টি পথে এবং এও স্পষ্ট দেখি—যে খাত বয়ে স্বভাবের দৃশ্যাবলী সেই খাত বয়েই ভারত শিল্পও চলেছে—কি পুরাতন কি নূতন—অথচ সেটা হল অস্বাভাবিক কারো কারো কাছে এবং এই অস্বাভাবিক শব্দটার কর্কশতা মেটাতে গিয়ে ভারত-শিল্পকে আধ্যাত্মিক বলে সুখানুভব করার চেষ্টাও করছেন দেখি কেউ কেউ। ভারতশিল্প সত্যিই যদি ছেঁড়া পকেট হয় তো তাকে উল্টে ছেঁড়া বালিসের খোল বলে প্রমাণ করে মজা করা যেতে পারে কিন্তু ছেঁড়া বটে এটাতো ঢাকা পড়ে না!

হীরকের প্রভা জ্বল জ্বল করছে, চন্দ্রকান্ত মণির প্রভা কুয়াসার মধ্যে টল্ টল্ করছে—বাজার দিলে একটাকে বহুমূল্য অন্যটাকে স্বল্পমূল্য বলে।

অরূপের পক্ষপাতী সে চন্দ্রকান্ত মণিকে প্রাধান্য দিয়ে বলবে—এ যে অরূপের ধ্যান ধরে আছে অতি ভাল জিনিষ, রূপের পক্ষপাতী হীরেকে হাতে তুলে বলবে এর রূপের রং এর সীমা নেই, এর তুল্য ওটা নয়, অপক্ষপাতী শিল্পি মণি দুটোকেই এক সূত্রে গেঁথে বলবে এরা দুটি মাণিকজোড়—হীরকের সুপরিস্ফুট জ্যোতির মধ্যে হীরের মত পলতোলা বা বাহ্য রূপ তলিয়ে আছে, চন্দ্রকান্ত মণির নিটোল সুবিম্বিত রূপের মধ্যে তার জ্যোতি তলিয়ে আছে, অনুপমের মধ্যে রূপ রূপের মধ্যে অনুপম, অনির্দ্দিষ্ট জ্যোতির অবগুণ্ঠনে সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুনির্দ্দিষ্ট রূপের গর্ভে অনির্দ্দিষ্ট জ্যোতি রসিকের কাছে দুয়ের উচ্চ-নীচ ভেদ কোথায় ভিন্ন দেখে তথাকথিত যারা তারাই যারা রূপের র'ও দেখে না কেবল 'রূপ অরূপ রূপ অরূপ' করে মালা জপে।

ঘরের দেওয়ালে ঘেরা জীবনে যে মাধুর্য্য আকাশের তারাখচিত নীল ঘেরাটোপে ঢাকা জীবনের মাধুর্য্যের চেয়ে কম জিনিষ এটা বলা চলে না, এটা এতখানি ওটা ততখানি এও বলা নিরাপদ নয়—অনেক সময়ে ঠকতে হয়, জীবনের স্বাদ বিচিত্রতা হারায়। তেমনি রূপের এক প্রস্থ, অরূপের আর এক প্রস্থ ভাগ করে নিয়ে যারা দুটো দেখে তারা রসের এক নদীর চমৎকারি রূপ দেখতে পায় না নদীর থেকে সরিয়ে আনা দুটো খালের কিনারায় কিনারায় বসতি বেধে বসে যায়।

মাটির প্রদীপখানি মাটির ঘরের কোণে আকাশের তারা চেয়ে প্রদীপের দিকে প্রদীপ চেয়ে তারার দিকে—এই দুই চাওয়ার সূত্রটি কেটে দেখতে চায় যে সে পায় ছেড়া মালার এ আধখানা নয় তো ও আধখানা রসের ও রূপের পূর্ণ পাত্র পড়ে না তার হাতে।

পর্ব্বতে বসে দেখ্‌তেম এক পাহাড় কুয়াসাতে ঝাপ্‌সা, আর এক পাহাড় আকাশপটে সুস্পষ্ট টানা—কিন্তু দুয়েরই থেকে এক ঝরণা ঝর্‌ছে একই ছন্দে সুরে। তেমনি ইট, পাথর, কাঠের পাহাড় নগরের কোথায়ও রস নেই এটা মনে করিলে অট্টালিকার অরণ্য আর পাহাড়ের ঝাউবন দুইই রহস্যময় ছবি দেখায়। পাহাড়ের বসতি আর আমার ঘরের পাশে সিংহির বাগানের বস্তি রূপ হিসেবে কোনটা বড় কোনটা ছোট বলা শক্ত, রং আর সুর পেয়ে দুটোই মধুর লাগে চোখে। ঘরের মধ্যে এতটুকু টিপ পরা কালো মেয়েটি আর পর্বতের উপরকার অরণ্যের কোলে সন্ধ্যা তারা—দুজনেই সমান রূপবতী দুজনেই প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে মধুর—অপ্রত্যক্ষের ইঙ্গিত না দিয়েও মধুর—এটা অস্বীকার করাতো যায় না। আবার পাটের সাড়ির মধ্যে ঘোমটাটানা সুদূরে নববধূ এবং পূর্ণ চন্দ্রিমার আলোর ঘোমটাটানা পাহাড়ের কোলে চা গাছের নতুন ফোটা ফুলের আড়ালে না-দেখা ঝরণা—দুজনের নূপুরধ্বনি মধু হয়ে শুধু কানে বাজে না প্রাণেও যে বাজে।

নগর তার এবং নগরবাসীর স্বভাবের অনুরূপ রূপটি যখন দিলে এখন সেটি স্বাভাবিক ছবি হল! স্বভাব-দৃশ্য কথার অর্থই থাকে না যদি আর্টিষ্টের নিজের ভাব দৃশ্যের মধ্যে অনুরূপ রূপটি লাভ করেছে—এটা ছবি না প্রমাণ করে। ভারতবাসীর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক লণ্ডনবাসীর পক্ষে তা স্বাভাবিক মোটেই নয়, কিন্তু তাই বলে ভারতীয় ছবি অস্বাভাবিক রূপ সমস্ত নিয়ে কারবার করলে এটা বলা বিষম ভুল। বানরের ডানা স্বাভাবিক নয়, বাদুড়ের ডানা স্বাভাবিক—এটা তর্ক করে বানরকে বাদুড়ের চেয়ে কম স্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। রূপ যখন স্বভাবের নিয়ম ধরে স্ফুট অস্ফুট দুই সীমা মেনে চল্লো, সুর যেখানে স্বাভাবিক, চলা বলা সমস্তই স্বাভাবিক ছন্দ পেলে সেইখানেই মাধুরী ফুটলো, এর বিপরীতে বিশ্রী কাণ্ড হল। আমার পক্ষে ভারতশিল্প স্বাভাবিক, ইংরেজের পক্ষে নয়। নূপুর পায়ের ছন্দে মধুর বাজে, পোষা কুকুর যখন সেটাকে নিয়ে টানা হেঁচড় করে তখন বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া আর কিছু করে না।

আলোকে অন্ধকারের সঙ্গে পৃথক করে দেখা চলে না, প্রত্যক্ষ রূপকে অপ্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে পৃথক করেও দেখা চলে না। একের সঙ্গে অন্যের ঠিক্ যোগাযোগ না করতে পারলে

ছবিও হয় না, সাদা পাথরে কাল পাথরে সাদা কাগজে কালো কাগজে যারা কিছু রচনা করে তারাই জানে যে এই যোগাযোগের কৌশলই হ'ল রূপদক্ষের সাধনার বিষয়।

পর্ব্বতে পর্ব্বতে অপরিসীম রূপের সামনে বসে মন একটি দিন উঠেছিল রূপের পর্দ্দার ওপারের না-দেখা আর্টিষ্টের একটু পরিচয় পেতে—রূপকে প্রশ্ন করলেম, সে বল্লে আর্টিষ্টকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যেই তো আমি আছি আমাকে এ প্রশ্ন করা মিছে, আমি রূপবান রূপের মাধুরী আগলে রেখেছি, আমার আড়ালে আমার মধু। বনফুলের বুকের মধুবিন্দু তাকে প্রশ্ন করি—সে বলে আমি কমলা ফুলের মধু, আমার উপরে ফুলের প্রতিবিম্ব আমার ভিতরে ফুলের পরিমল!

মন অধীর হয়ে বলে ফুলের মধ্যে যে মধু ধরলে তার খবর পাই কোথা? ভ্রমর এসে বল্লে—তুমি মধু নাও তো নাও, নয় আমার পথ ছাড়। নিরুপায় হয়ে আমি নিজেকে তখন প্রশ্ন করি, মন উত্তর দেয়—এই যে বসে বসে নানারূপ ছবিতে নানা রস ধরছো, এগুলো মিথ্যা মায়া বলে যদি কোনো লোক ছিঁড়ে ফেলে তোমার সঙ্গে মিলতে আসে এবং তোমার একটা ফটো তুলতে চায় তুমি তাকে কি ভাবো?

কবির সঙ্গে তাঁর রচনা দিয়ে পরিচয় হল না নামটা লেখা photograph দিয়ে পরিচয় হলো এ যেন একের লেখা পর্ব্বত-বর্ণনা কিম্বা রূপ অরূপের সমস্যা দিয়ে মস্ত একটা বক্তৃতা নিয়ে হিমালয় দেখার কায হয়ে গেল মনে করা।

ভূগোলের এক একটা পাতায় কত নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত সেইগুলো পড়েই তো পৃথিবী দেখার কায হয়ে যেতে পারতো। 'পরলোক ভ্রমণ' বলে একটা বই আছে তাতে সেখানে পরিক্রম করবার আটঘাটের বর্ণন এমন কি সেখানকার অধিকারী আলোর পর্দ্দা খাটিয়ে তার মধ্যে ঘুমোচ্ছেন—এও লেখা আছে। এই ভূগোল এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত দুখানা মুখস্ত করে রূপে দক্ষতা পাওয়া গেল বলে কেউ কি ভুল করে?

পাহাড়ে যাবার সময় উড়ো-সাপের মত রেল যখন এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড় মেঘ থেকে মেঘে আমাদের নিয়ে চল্লো সেই সময় পাশের একটা ছোট ছেলেকে বল্লেম, পাহাড় কি রকম ভাবতিস্? তার কথার পুঁজি কম, সে শুধু পর্ব্বতের দিকে হাঁ করে চেয়ে বল্লে, পাহাড় যে এরকম তা একেবারেই মনে ছিল না!—ছেলের মনের পাহাড়ের রূপটা ছিল একটা ঢিবি যার এপার ওপার দৌড়ে ওঠা নাবা যায়, তাতে গাছ ছিল না, ঝরণা ছিল না, পাথর ছিল না—রূপের মরুভূমির মাঝে বালির স্তূপ, কিম্বা একটা বড় গাছের গুঁড়ি—তার বেশি একটুও নয়; ছেলের মনে আগের দেখা পাহাড় এবং পরের দেখা পাহাড়ে যে বিষম তফাৎ—ঠিক ততটাই তফাৎ চোখের দেখা থেকে বিচ্ছিন্ন অরূপ আর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হচ্ছে যে রূপ তার মধ্যে। দাঁড়ি পাল্লার বামদিকে রাখ লিখিয়ের কালি কলম কাগজ রং তুলি, বীণা বাঁশী এবং রূপ অরূপের জল্পনার ভার আর দক্ষিণে চাপাও শুধু তার চোখেদেখা রূপের মাধুরী বিন্দুটি, জল্পনার বাটখারা ক্রমেই উঠবে আকাশে, চোখে

দেখার বাটখারা ক্রমেই নামবে মাটির দিকে! ভারত শিল্পে যে সকল দেবদেবী-মূর্ত্তি দেখি. যে সব ছবি দেখি—তার সবটাই ধ্যান এবং আধ্যাত্মিকতা এবং অরূপ—এটা আমি এক সময়ে কতবার বলেছি তা মনে নেই কিন্তু তাই বলে সেই ভুল আঁকড়ে ধরে থাকা চিরকাল তো সম্ভব হল না—রূপ যে চোখ ভুলিয়ে নিলে মন মাতিয়ে দিলে একথা আজতো বলতে হচ্ছে!

পাহাড় পর্ব্বত, নদী নির্ঝর অরণ্য আকাশ রূপের সত্তায় বলীয়ান টোলের পণ্ডিতের রূপ অরূপের তর্ক কিম্বা বিশেষ কোন ধর্ম্মের ও জাতির আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করতে তারা নেই। বরফের চূড়া দেবী পুরাণের একটা শ্লোক নিরুপম নীল আকাশ কৃষ্ণ লীলার পদাবলীর ছাঁদ পেয়ে যে বড় তাতো মনে হয় না! নানা রূপক উপমা অতিক্রম করে বিদ্যমান এই যে সব রূপ রং এদের সামনে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করা চলে না যে, রূপ নিজেতে নিজে স্বপ্রতিষ্ঠিত নয়। সেই স্বপ্রতিষ্ঠিত রূপের কথাই যেমন হিমালয়ের শিখরে শিখরে তেমনি সমস্ত ভারত শিল্পেরও প্রত্যেক অঙ্গে দীপ্তি পাচ্ছে আমাদের চিত্রের ষড়ঙ্গ ঋষি দিলেন তার প্রথমেই লেখা হল "রূপ ভেদাঃ" বিচিত্র রূপের কথা নিরুপম রূপের কথা। অরূপের কথা সে দর্শনশাস্ত্রের কথা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়, স্বপ্রতিষ্ঠিত নিরুপম রূপের বিষয় হল চিত্রের এবং মূর্ত্তির বিষয়।

সুনির্দ্দিস্ট রূপ, সুব্যক্ত সুর এই নিয়ে প্রকৃতির চারিদিক ঘিরে রইলো মানুষকে। অনির্দ্দিষ্ট সেও একটি রূপ, যাকে বলি অব্যক্ত তাও একটি সুব্যক্ত সুর নিয়ে বর্ত্তমান হল। এই যে পর্ব্বতের ছবি কুয়াসার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে আবার আলোর মধ্যে জেগে উঠছে এ দুটি ছবিই রূপের সুনির্দ্দিষ্ট সীমা কোন দিন অতিক্রম করে চলছে না। কুয়াসা এখানে রূপ আবরণ করছে না একটা রূপ থেকে আর একটা রূপ ফোটাচ্ছে—পাথরের কড়ি সুর মেঘের কোমল থেকে কোমল সুরে মিলে আর একটা নতুন সুরে পরিণত হতে চলেছে, রূপ রং এদের ছন্দে বিচ্ছেদ ফাঁক টেনে দিচ্ছে না, প্রলয় দিচ্ছে না টেনে চোখের এবং মনের উপরে মাধুর্য্যহীন নীরস নিকষ প্রলেপ।

রূপকে নষ্ট করে অরূপের স্বাদ দেয় না রূপদক্ষের কায। পাথরের মূর্ত্তি রং বাদ দিলে অথচ রংএর স্বপ্ন ধরে রইলো, সেই মূর্ত্তিকে পুড়িয়ে এবং গুঁড়িয়ে চূণ কর তাতে মূর্ত্তিতে যা ছিল তা নেই! তেমনি সুন্দর পটখানি চূণের প্রলেপ দিয়ে সাদা করে দিই, কোথায় যায় ছবির রূপ কোথায় বা রং, কিন্তু সুন্দর দৃশ্যের উপরে রাত্রির কুয়াসা পড়ুক সে এক নিরুপম রূপ পায় দৃশ্যটি!

ছবির গায়ের চূণের প্রলেপ রূপের রহস্য তাতে নেই। পর্ব্বত ঢেকে কুয়াসার প্রলেপ—সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ এবং মন বসে থাকতো, কিন্তু কোন দিন দেখলে না সে রূপ নেই রং নেই, কেবলি দেখলে রং ভোলানো রং রূপ ভোলানো রূপ এসে মিল্লো রূপের পাশে রংএর পাশে!

বুদ্বুদ ফেটে গেল রূপ মিলিয়ে গেল রং মুছে গেলে এ ঘটনা নিয়ে গভীর তত্ত্ব কথা লেখা চল্লো, আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের কবিতা ও গান লেখা চল্লো, কিন্তু ছবি লেখা চল্লো না।

ক্ষণভঙ্গুর রূপ মিলোতে চাচ্চে,—রূপ হারানো অকূলের কিনারায় রূপ রং এ ভরে উঠে বুকের বেদনায় কাঁপছে—এটা ছবির বিষয় হলো।

মানুষ যদি কেবল চোখ নিয়েই চারিদিকের রূপ সমস্ত দেখতো তবে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা যে ভাবে দেখে সেই ভাবে তুলতো কেবলি রূপের ছাপ—ছবি নয়—শুধু দেখতো—রূপ আর রূপ। জলের উপর তেল যে-ভাবে ভাসে দৃষ্টি সেইভাবে পিছনে চলতো, দৃষ্টি রূপের গভীরতা অনুভব করতেই পারতো না মানুষ যদি তার চোখের সঙ্গে মন নিয়ে না দেখতো চেয়ে। চোখের দেখা রূপের বাইরে বাইরে দৃষ্টির স্পর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হয়, মনের দেখা রূপের মধ্যে যে রস তাকে পেতে চলে, চোখ মন দুই মিলে তবে দেখায় রূপের মাধুরীখানি।

খুব প্রাচীন কালে মানুষ যখন গুহাবাস করছে, তখন তারা কি দেখছে এবং কেমনভাবে দেখছে তার ছবি এখনো গুহার দেওয়ালে এবং ছাদে লেখা রয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে এক প্রস্থ ছবি দেখি যেগুলি শুধু চোখে দেখা রূপের নমুনা—হরিণ বসে আছে, গরু চরছে, মানুষ লড়ছে, সব গুলোই কিন্তু চক্ষুহীন—একটাতেও চোখ দেয়নি চিত্রকার শুধু রূপ—দেওয়ালের গায়ে ছায়া পড়লে যা দেখায় তাই।—(Childhood of Art, Spearing. Page 114. Fig 74.) আর এক প্রস্থ ছবি চোখের সঙ্গে মন জুড়ে দেখার নমুনা,—হরিণ চেয়ে আছে সামনের বনের দিকে, হরিণ হরিণীর সঙ্গে যাচ্ছে আর ফিরে ফিরে দেখছে,—এই দুই ছবিতে চোখ এঁকেছে যত্নে মানুষ—শুধু হরিণের ছায়াচিত্র নয় তার রূপ এবং ভাব এক হয়ে পুরো ছবি হয়েছে তখন।—(Childhood of Art, Sparing Figs 70 and 65 Pages 104. 108.)

অনেকে দেখি শুনতে বেশ পায় অথচ সুর বিষয়ে একেবারে বধির। তেমনি রূপ দেখছে অথচ রূপ দেখছেনা এমন লোক বিস্তর।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুয়ের সমস্যা শাস্ত্রকার যে-ভাবে মীমাংসা করেছেন তার জটিলতার মধ্যে যাবার সাধ্য নাই।

শিল্পের দিক দিয়ে এর একটা মীমাংসা উপস্থিত হবার চেষ্টা হয়েছিল আমরা দেখতে পাই, সেটা থেকে ব্যাপারটা হয়তো আমরা সহজে বুঝবো।

চীন দেশে 'তাওইষ্ট' সাধক,—শিল্পের দিক দিয়ে অপ্রত্যক্ষ সাধনার অনেকগুলি উপায় এঁদের ছবি থেকে পাই, তার মধ্যে প্রধান উপায় হল—পটের ধৌত অংশ (সাদা জমী) এবং লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত অংশের যথাযথ হিসাবের উপরে ছবির ভাবের বিস্তৃতি নির্ভর করছে এটা তাঁরা মত দেন, ঘর সাজানোর বেলায় নানারূপ জিনিষ দিয়ে ঘর ভর্ত্তি করা মানে ঘরের প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে মনের এবং দৃষ্টি প্রসার নষ্ট করা—এই তাঁরা বলেন এবং এই ভাবে অপ্রত্যক্ষের স্বাদ শিল্প কাযে পৌঁছে দেবার উপদেশ তাঁরা দেন।

আমাদের দেশের শিল্পসাধক এর উল্টা দিক দিয়ে রূপের বিস্তারের পথ নির্দ্দেশ করলেন—

"দাক্ষিণাত্যের মন্দির ধারণাতীত সংখ্যাতীতরূপে ভরে উঠে একটা বিরাট বিপুলতা এবং অনির্দ্দিষ্টতায় গিয়ে মিল্লো লক্ষ্য হারানো গিয়ে দুর্লক্ষ্যতার মধ্যে, রূপ থেকেও রইলো না !"

চীনের ছবিতে যে সাদা অংশ সেটি রূপ না থেকেও রূপে ভর্ত্তি হল, আমাদের মন্দিরের চূড়া—সেটি রূপ থেকেও রূপ না-থাকা দিয়ে পরিপূর্ণ হল।

জয়পুরি আঁকা ছবি সেখানে কড়া রংএর তলায় কড়া রেখা তলিয়ে দিয়ে শিল্পি অপ্রত্যক্ষের সমস্যা মিটিয়েছে।

মোগল আমলের আঁকা ছবি কোমল থেকে অতিকোমল রেখাকে প্রায় দুর্নিরীক্ষতার কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার উপরে রঙ্গীন ওড়নার আড়াল টেনে এই সমস্যা মিটিয়েছে।

আফ্রিকার শিল্প সেখানে রেখার রংএর সবল টান অদ্ভুত কৌশলে কাটা সমস্ত রূপের সুনির্দ্দিষ্টতা অরূপের দিকেও যায় না, সেখানে শুধু রূপ আর রূপ কিন্তু সেখানেও চোখের দেখাকে অতিক্রম করছেন শিল্পি ভীমকান্ত কল্পনার পথ ধরে।

পাহাড়ের ঘরে বসে থাকতেম, সামনের খোলা জানালায় দুটি পাহাড় একখানি আকাশ পটে ধরা ছবির মতো ধরা থাকতো, কিন্তু সেইটুকু পলে পলে নতুন রূপ নতুনভাবে ভরে উঠতে দেখতেম। পাহাড় পথে চলতেম, দেখ্‌তেম—একস্থানে পথ শেষ হয়েছে অপার রূপের কূলে এক স্থানে থেমেছে মন ভোলানো কুয়াসায় ঢাকা শূন্যের পাশে, এক স্থানে বা পথ আপনাকে হারিয়েছে গভীর অরণ্যে আলো ছায়ায় নিবিড় রহস্যের অন্তরালে। ঝরণা রূপ ধরে কোথাও এসে পড়তো কাছে, ঝরণা রূপ হারিয়ে কোথাও শোনাতো সুরটুকু—এই ভাবে গেছে দিন রাত হৃদয় এবং দৃষ্টি দুজনে মিলে, একদিনও এক কথা ভাবতে পারেনি যে রূপ নেই রহস্য নেই অরূপ আছে। দিন রাতের মধ্যে রূপ ও রহস্য এরা হরগৌরী যুগল মূর্ত্তির মতো বিরাজ কচ্ছে—এই কথাই বলেছে বার বার! আনন্দে পূর্ণপাত্র পেয়ে চোখ এবং মন কবির ভাষায় বলেছে ছবির ভাষায় বলেছে—

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!"

শিউলি তলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!
আলোছায়ার আঁচল খানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কি কথা কয় মনে মনে।

তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেল ঠেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশ বীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।

কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাযে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে
নয়ন-ভুলানো এলে !

(রবীন্দ্রনাথ)

পর্ব্বতের পাষাণের কামনা পাষাণ-গলানো রূপের ঝরণা হয়ে রইলো—সে এক রূপ সে এক ভাব সে এক সুর দিলে, মরুভূমির বুক জুড়িয়ে ঝরণা নদীরূপে বইলো—সে আর একরূপ আরএক ভাব আর এক সুর, নদী সমুদ্র হয়ে কূল হারালো নীল ছন্দে দুলতে থাকলো—সে এক,—সমুদ্র ঘন মেঘের দিক ভোলানো রূপ ধরে নীল পর্ব্বতের কোলে এসে লুকোলো বৃষ্টি জলের ঝরণা বইয়ে,—সে অন্য। এই একে থেকে অন্য, অন্য থেকে আর একে—এদেরই ধরে ধরে মন-ভোলানো পাষাণ-গলানো কামনাসূত্রে গেঁথে গেঁথে রচনা করলেন রূপদক্ষ তিনি অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোরম রূপের মালা গাছি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাপানের সামাজিক প্রথা

শিক্ষা (২)

শিশুবিদ্যালয় বা কিণ্ডারগার্টেন

প্রাথমিক শিক্ষা নব্য জাপানের প্রারম্ভ হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন বা শিশুশিক্ষাটী তখনই আরম্ভ হয় নাই। ইহার অনেক পরে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের অনুকরণে ইহা সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হয়।

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষাই কেবল বাধ্যতামূলক। অবশ্য এই প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে কতখানি বুঝায় তাহা আমরা পরে বলিব। আপাততঃ কেবল এইটুকু বলিয়া রাখিতে চাই যে, সাধারণতঃ বালক-বালিকাদের ছয় বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই তাহাদিগকে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এই প্রাথমিক শিক্ষার স্থূল উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্যা, নীতি ও ব্যায়াম বিষয়ে মোটামুটী শিক্ষা প্রদান। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন এরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষা-পদ্ধতি নহে। সুতরাং এই সব বিদ্যালয়ে শিশুদের যাওয়া-না-যাওয়া তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই কিণ্ডারগার্টেনের মোট উদ্দেশ্য এই যে, কেবলমাত্র ছোট শিশুদিগকে এক জায়গায় রাখিয়া রক্ষণাবেক্ষণ বা পালন করা। কাজেই ইহাকে বিদ্যালয় নাম দেওয়া ঠিক সঙ্গত হয় না। এই দিক দিয়া দেখিলে আপনারা যে এদেশে কিণ্ডারগার্টেন বলিতে শিশুদের 'হাতে কলমে' শিক্ষা-পদ্ধতি

বুঝেন, তাহাও উচিত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশের ভাষায় এই কিণ্ডারগার্টেন অর্থে "ইয়ো-টি-ইন," অর্থাৎ ছোট শিশুদের বাগান বুঝায়। শিশুর বয়স পূর্ণ তিন বৎসর হইলে পিতা মাতারা তাহাদিগকে এইখানে পাঠাইতে থাকেন। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় এ বিষয়ে কোন বাধ্যতা নাই; কাজেই শিশুদের তিন বৎসর বা চারি বৎসর বয়সে যখন ইচ্ছা তাহাদিগকে এখানে পাঠাইতে ও ফিরাইয়া লইতে পারা যায়—এবিষয়ে কোন নিয়ম নাই। এইজন্য আমরা একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, শিশুদের তিন হইতে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে একত্র রক্ষণাবেক্ষণ করাই এই শিশু-উদ্যানের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

জাপানে বা এদেশে সর্ব্বত্রই শিশুর স্বভাব একরূপ। তাহারা বাড়ী থাকিলে স্বেচ্ছানুসারে কেবল খেলা করিয়া বেড়ায়। অবশ্য এই খেলা জিনিসটাকে আমি খারাপ মনে করি না—বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে ইহার খুবই দরকার। কিন্তু এই খেলার পার্থক্যের উপর তাহাদের স্বভাব চরিত্র অনেকখানি নির্ভর করে, একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আরও একটা কথা এই যে, প্রত্যেক মাতা পিতার নিজের নিজের স্বভাব-চরিত্র ও শিক্ষার অনুপাতে সন্তান পালনের ব্যবস্থাও পৃথক পৃথক হইয়া থাকে, কেহবা ছেলেদের বড় আদর দেন—কেহ বা বেশী শাসন করেন; ইহার ফলেও তাহাদের স্বভাব-চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এই কারণে শিশুদিগকে একস্থানে একত্র এক গুরুমার অধীনে রাখিলে এক গান এক খেলা ও গল্পের মধ্য দিয়া তাহাদের পরস্পরের ভিতর একটা সামাজিক একত্ব বোধের সৃষ্টি হয় এবং এই একত্ব বোধই ভবিষ্যতে দেশীয় উন্নতির বিশেষ সহায়তা করে, ইহাই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার অপর একটী উদ্দেশ্যও আছে। শিশুরা কতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাড়ীর লোককে বিশেষতঃ শিশুর মাতাকে বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়। এজন্য সাংসারিক অন্য কর্ম্মে বড় বিশৃঙ্খলা ঘটে। অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগের সামাজিক প্রভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলা-দিগকেও অনেক সময় অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাহিরে কাজ করিতে হয়। এজন্য রীতিমত শিশু-পালন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল, ভবিষ্যতে শিশুর দেহ মনের অসম্পূর্ণতা। এজন্যও শিশুদিগের মাতা-পিতার স্থানীয় হইয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। এই জন্য আমাদের দেশে প্রত্যেক সহরে নগরে ও গ্রামে স্থানীয় লোকের ব্যয়েই এই সব শিশুউদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার মনে হয় এই ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত। সমগ্র দেশে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে মাত্র দুইটী শিশুউদ্যান পরিচালিত হইতেছে। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সহরে ও গ্রামে সাধারণের স্থাপিত শিশুউদ্যান অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের স্থাপিত শিশুউদ্যানের সংখ্যা খুব বেশী। এইখানে আরও একটী কথা আপনাদিগকে জানাইতে চাই যে, আজকাল জাপানে জীবনের সকল বিভাগে জনসেবা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধাশীল ধনবান, বৌদ্ধ পুরোহিত ও আচারনিষ্ঠ লোকেরা অধুনা

নিজেদের অর্থ ও সামর্থ্য দেশসেবায় নিয়োগ করিতে ব্যগ্র। শিশুপালনকেও একজাতীয় দেশসেবা মনে করিয়া ইঁহারা স্থানে স্থানে শিশুউদ্যান সকল স্থাপন করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল শিশুদিগকে মানুষ করিয়া তুলেন। নিম্নে আমি যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছি তাহাতে আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত অপেক্ষা মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালিত এবং মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালিত অপেক্ষা এই সব ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক পরিচালিত শিশু-উদ্যানের সংখ্যা কত অধিক।

শিশুউদ্যানের মোট সংখ্যা	৭৩৩
উহার মধ্যে	
গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত—	২
মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালিত	২৬৭
ব্যক্তিবিশেষ পরিচালিত	৪৬৪
	৭৩৩

এতক্ষণে আশা করি আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জাপানে 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে শিশুদের কোনওরূপ বিদ্যা বা নীতিশিক্ষার আদৌ স্থান নাই ; কিন্তু স্ফূর্ত্তিপ্রদ নানারূপ গল্প ও খেলার মধ্য দিয়া তাহাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা-বিধানই মুখ্য লক্ষ্য। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেরূপ বালক বালিকাদের শিক্ষণীয় নানাবিধ বিষয়ের সমাবেশ আছে, কিণ্ডারগার্টেনে তাহার কিছুই নাই ; এখানে কেবল শিশুরা খেলা করিয়া গান গাহিয়া ছড়া বলিয়া বেড়ায়, এবং নিজেরা স্বহস্তে নানারকমের কাগজের খেলনা তৈয়ারী করিয়া আমোদ পায়।

শিশু-উদ্যানগুলির ভার প্রধানতঃ রমণীদের উপরই থাকে। এই সকল রমণীদিগকে আমাদের দেশের ভাষায় "হো-বো" অর্থাৎ রক্ষামাতা বলে। এই 'রক্ষামাতার' পদ পাইতে গেলে রমণীদিগকে একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় ; ইহা কতকটা এদেশী 'গুরুট্রেণিং' পরীক্ষার মত। তবে অনেকগুলি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজই এই সব শিশু-উদ্যানের প্রধান কাজ বলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপেক্ষা ইহাঁদের দায়িত্ব গুরুতর এবং এইজন্য এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক পাওয়াও দুষ্কর।

জাপানের প্রায় সমগ্র বিদ্যালয়েই ছেলেদের খেলিবার বড় বড় মাঠ থাকেই ; বিশেষতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু-উদ্যান গুলিতে এই সব খোলা মাঠের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শিশু-উদ্যানে খোলা মাঠগুলি আবার নানাবিধ লতা-পাতা ও ফুলের গাছে এরূপ সুন্দরভাবে সাজান থাকে যেন ইহা একটী অভিনব ফুলের বাগান। ইহার একটী কারণ এই যে প্রধানতঃ বাহ্য বিষয়-গুলি শিশুদের হৃদয়-মনের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে ; এইজন্য শিশু-উদ্যানের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে তাহাদের থাকিবার ও খেলিবার স্থানগুলিকে নানাবিধ ফুল-পাতা ও লতা দিয়া এরূপ শোভন ও সুন্দর করিয়া রাখেন।

জাপানের প্রত্যেক বিদ্যালয়েই প্রায়ই সকাল আটটা হইতে দুপুর দেড়টা বা দুইটা পর্য্যন্ত পড়াশুনার কাজ চলে। ইহার মধ্যে প্রকৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্যাপারটী বেলা বারটার মধ্যেই শেষ হয়। সকাল বেলা মস্তিষ্ক শীতল থাকে বলিয়া এই সময়টীকে বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে বড় অনুকূল বলিয়া মনে করা হয়; তাই এই বন্দোবস্ত। আমাদের দেশের সহিত এদেশের শিক্ষাপ্রদান প্রণালীতে এই ব্যাপারে একটী মস্ত বড় পার্থক্য দেখা যায়। এদেশের মত গরম দেশে আহারের পর দুপুরে বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থা বড়ই বিসদৃশ। ইহা প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে কিনা, তাহা আমি জানি না; তবে শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর যে ইহা একটী বড় দোষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক শিশু-উদ্যানের শিশুরা সাড়ে আটটায় বাগানে গিয়া বারটায় ফিরিয়া আসে। তিন চারি বৎসরের শিশুদের পক্ষে একাকী এই সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া উহাদের সঙ্গে মা-ভাই বা বাড়ীর চাকর-বাকর কেহ সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দেয়, আবার বারটায় গিয়া ফিরাইয়া আনে। অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা অভিভাবকদের পক্ষে একটু কষ্টকর। এইজন্য নীচশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের বাড়ীর শিশুদিগকে এই সব শিশুউদ্যানে প্রায়ই পাঠাইতে পারে না। কারণ তাহাদিগকে কাজ-কর্ম্মে অনবরত এরূপ ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, এই সব কাজের জন্য তাহাদের সময়ের বড় অভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় শিশু-উদ্যানগুলির সংখ্যা যে এত কম, ইহাই তাহার একটী মুখ্য কারণ।

একথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ দিনে তিন বার করিয়া খাওয়া হয়—সকালে সাড়ে সাতটায়, দুপুরে সাড়ে বারটায়, সন্ধ্যায় আটটায়। শিশুউদ্যানের শিশুরা এই সকাল বেলার খাবার খাইয়া বাগানে যায়। কিন্তু এখানে যাইবার সময় স্বেচ্ছানুসারে কাপড় জামা পরা চলে না—প্রত্যেককে এক ধরণের পরিচ্ছদ (uniform dress) পরিতে হয়। তাহারা সকলেই এক রকমের টুপি, কোট ও প্যানটুলেন প্রভৃতি পরিধান করে। এমন কি তাহাদের সঙ্গের ব্যাগটী পর্য্যন্ত একই রঙের ও একই ঢঙের হইয়া থাকে। এই গুলির ভিতর তাহাদের ছবির বই, রঙিন কাগজ ও রুমাল প্রভৃতি নিতান্ত দরকারী জিনিসগুলি থাকে।

প্রিয়দর্শন সরলহৃদয় শিশুগুলি যখন হাসিমুখে গান করিতে করিতে দুই-তিন জনে দল বাঁধিয়া বাগানে যায়, তখন সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রত্যেকের অন্তরে এমনই একটী স্নেহের এবং প্রীতির ভাব জাগ্রত হয়, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শিশুদের সেই সরল হাসি মুখ দেখিলে নিতান্ত পাষণ্ড লোকেরও মন-প্রাণ গলিয়া যায়, মুখে-চোখে প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠে।

বাড়ীর অভিভাবকেরা শিশুদিগকে বাগানে লইয়া গিয়া রক্ষামাতার হাতে সমর্পণ করে। অতঃপর তাহারা মনোরম পুষ্প-উদ্যানে রক্ষামাতার তত্ত্বাবধানে একসঙ্গে গান গাহিয়া ও খেলা করিয়া বেড়ায়। এই এক ধরণের পোষাক পরিয়া এক জায়গায় এ রক্ষামাতার অধীনে সকলে একসঙ্গে একই রকমের খেলা গান ও গল্পের মধ্যে দিয়া তাহারা পরপরে একত্ব-

বোধের যে একটী মহতী শিক্ষা প্রচ্ছন্নভাবে লাভ করে, ইহাই এস্থলে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত ইহারও বৎসরের মধ্যে দুইবার—শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে—দীর্ঘ ছুটীর ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে সমস্ত শিশু-উদ্যানের মোট শিশু সংখ্যা একষট্টী হাজার আট শত, ইহাদের মধ্যে একশত চুয়ান্নটী বৈদেশিক শিশু। গুরুমাতা বা রক্ষামাতার সংখ্যা—দুই হাজার একশত পঞ্চাশ; ইহাদের মধ্যে আটজন মাত্র ইয়োরোপীয়। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা অষ্টআশী লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয় শত। ইহাতে আপনারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অপেক্ষা শিশু উদ্যানের ছাত্র সংখ্যা কত কম। ইহার একটী কারণ এই যে শিশু-উদ্যানের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নহে। ইহা ছাড়া আরও একটী গূঢ় কারণ এই যে, শিশু-উদ্যানের শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল শিক্ষিত লোকের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। একপক্ষের লোকেরা শিশু-বাগানের পক্ষপাতী—তাঁহারা মনে করেন ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। অন্যপক্ষের ধারণা, প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব্বে শিশুদিগকে—লেখা-পড়া নাই হউক—নিয়মিতভাবে কোনরূপ মস্তিষ্কের কাজ করান ঠিক নহে; সুতরাং ঐ সময়ে তাহাদিগকে শিশু-উদ্যানে না পাঠাইয়া বাড়ীতে স্বেচ্ছানুসারে খেলিতে ও বেড়াইতে দেওয়াই উচিত। আরও একটী কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, এক একটী শিশু-উদ্যানে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় একশত কুড়ীর বেশী শিশুছাত্র গ্রহণ করা হয় না।

উপসংহারে শেষ কথা এই বলিতে চাই যে, আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা ছাত্রদিগের নীতি ও চরিত্রের উৎকর্ষের জন্য ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন বুঝিয়া সর্ব্বত্র উহার কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন; শৈশবেও এই ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন আছে দেখিয়া তাঁহারা শিশু-উদ্যানগুলিতে ইহার প্রচলনের জন্য বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন; এবং ইহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, ব্যক্তিগত শিশু-উদ্যানগুলির অধিকাংশই ভিক্ষু পুরোহিতের কর্ত্তৃত্বের অধীনে আছে। ইঁহাদের স্থাপিত এই সব শিশু-উদ্যানগুলিতে প্রত্যহ দুইবার—আরম্ভে ও অন্তে—উপাসনা হইয়া থাকে এবং শিশুদিগের উপযোগী সঙ্গীতও গীত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

পূর্ব্বে একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক; কাজেই শিশুদের বয়স ছয় বৎসর পূর্ণ হইলেই তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ উহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য—এ ব্যবস্থা দেশের ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচনির্বিশেষে একইরূপ; তবে যেসব শিশু এরূপ একান্ত রুগ্ন বা বিকৃতাঙ্গ যে কোন কাজই করিতে পারে না তাহাদিগকে কেবল বাদ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে একথাও বলিয়া আসিয়াছি যে, বালকবালিকাদিগকে নানাবিধ বিদ্যা, নীতি ও ব্যায়াম

বিষয়ে মোটামুটি শিক্ষাদানই এই প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এদেশে দেখিতে পাই শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষেরা শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় তেমন যত্ন লন না। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত; সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাতেই শিশুদের শিক্ষার আরম্ভ বলিয়া কর্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে আরও অধিক যত্ন লইয়া থাকেন। তাঁহারা যথার্থই বুঝেন যে, ভিত্তিভূমি সুগঠিত না হইলে তাহার উপর অট্টালিকা-নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না। প্রধানতঃ শরীর, মনও আত্মা লইয়াই মানুষ; কাজেই এই তিনটীর পূর্ণতা সম্পাদন ব্যতীত মানব জীবনের যথার্থ কল্যাণ নাই; এবং এবিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে শৈশব হইতেই চেষ্টা করা দরকার। এই জন্য তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে বালক বালিকাদের মানসিক উন্নতির জন্য বিদ্যাশিক্ষা, অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নীতিশিক্ষার এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথম করিয়াছিলেন।

এই প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুরা 'অ আ' 'ক খ' হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং কর্তৃপক্ষদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত সুকৌশলে তাহাদিগকে এই সকল বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যেমন উচ্চ ও নিম্ন দুইটী বিভাগ আছে জাপানেও ঠিক এইরূপ। ইহার মধ্যে নিম্ন প্রাথমিকে শিশু-দিগকে অধ্যয়ন করিতে হয় ছয় বৎসর; আর উচ্চ প্রাথমিকে মাত্র দুই বৎসর। সর্ব্বশুদ্ধ এই আট বৎসরের মধ্যে শিশুদিগকে স্বদেশের ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোল এবং অতঃপর পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোলেও অল্পস্বল্প জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বিজ্ঞান, গণিত, কৃষি, বাণিজ্য, চিত্র ও সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে হয়, বালিকাদিগের জন্য অধিকন্তু রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি বিবিধ গার্হস্থ্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, দেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকদিগকে দুই একটী বিদেশী ভাষাও শিখিতে হয়; তবে আজকাল অধিকাংশ ছাত্র প্রধানতঃ ইংরাজীই শিখিয়া থাকে।

পূর্ব্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগকে সকলে ৮টা বা সময় সময় ৮॥০টা হইতে দুপুরে ১টা বা ১॥০ পর্য্যন্ত স্কুলে থাকিতে হয়। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারটী প্রধানতঃ বেলা ১২টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। অতঃপর বেলা ১টা। ১॥০টা পর্য্যন্ত প্রায়ই ব্যায়াম শিক্ষা হয়। ব্যায়াম শিক্ষার মধ্যে দেশী বিদেশী নানারকমের পদ্ধতির প্রচলন আছে। বিদেশী পদ্ধতির মধ্যে প্রধানতঃ 'ড্রিল'; ইহা প্রায় এদেশেরই মত—তবে সত্যকার প্রয়োজনের দৃষ্টিতে আরও অধিক যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সম্পন্ন হয়। দেশী পদ্ধতির মধ্যে আমাদের দেশে "যুযুৎসু" ও "কেন্দ" নামে যে একরকমের ব্যায়াম-শিক্ষা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিত আছে, প্রধানতঃ তাহারই চর্চ্চা হয়। ইহা ছাড়া, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যুদ্ধবিদ্যারও 'হাতে খড়ি' দেওয়া হয়। অবশ্য এই সমস্ত ব্যায়াম দ্বারা ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতি ও নীরোগতা লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যহ একঘণ্টা করিয়া

নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের মধ্যে যিনি প্রধান শিক্ষক বা তৎজাতীয়, নীতিশিক্ষা দানের ভার প্রধানতঃ তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা ছাত্রদিগকে স্বদেশানুরাগ, সমাজ-প্রীতি, মাতাপিতা ও আত্মীয় বন্ধুর প্রতি যথাযথ সামাজিক কর্ত্তব্য পালন প্রভৃতি নানা নৈতিক বিষয়ে উপদেশ দান করেন। ইহা ছাড়া, দেশী-বিদেশী নানা প্রাচীন ও আধুনিক নীতিমূলক দৃষ্টান্তও আখ্যায়িকার দ্বারাও শিশুদের নীতিবোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হয়। এখানে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, অবশ্য ইহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, আজকাল শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন বুঝিয়া নীতিশিক্ষা বিষয়ে আরও অধিক যত্ন লইতেছেন। ইহার ফলে বুদ্ধদেব ও জাপানের অন্যান্য সাধু মহাত্মার জীবনী ও ইতিহাস এবং তৎসংক্রান্ত নানাবিধ উপাখ্যান ও আলোচনাও নীতিশিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বালকবালিকাদের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেও আজকাল "সু-সিম" নামে নীতিশিক্ষার একটী পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানতঃ ছাত্রগুলিকে বেতন দিয়াই পড়িতে হয়; তবে উহার পরিমাণ খুবই কম। সহরের স্কুলগুলিতে ছাত্র প্রতি মাসিক বেতন পাঁচ আনা, আর গ্রাম্য স্কুলগুলির বেতন আরও কম—মাত্র দশ পয়সা; এবং এই বেতন বালকবালিকা ও উচ্চ-নীচ শ্রেণী ভেদে একই রূপ। অবশ্য ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে দরিদ্র ছাত্রদিগের নিকট হইতে মোটেই বেতন লইবার ব্যবস্থা নাই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, বালক-বালিকারা একত্র বসিয়া লেখা পড়া করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহারা স্বতন্ত্রভাবে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বসিয়া পড়াশুনা করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা মোটামুটি বলা হইল। এখন উহার একটা শ্রেণীবিভাগ ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই।

মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত (গ্রাম ও নগর) = ২৫,৫৩৬
গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত = ৮৯
স্থানীয় লোকের বা ব্যাক্তি বিশেষের স্থাপিত = ১৩৭
শিক্ষকদিগের সংখ্যা (স্ত্রী ও পুরুষ) = ১,৮৯,৪৭৬
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা = ৮৮,৭১,৯৮২
বিদেশী ছাত্র সংখ্যা = ২৪

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সেগুলি ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার প্রসঙ্গে বলিবার ইচ্ছা রহিল। ক্রমশঃ

শ্রীআর কিমুরা

তিলক চরিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কালের তুলনায় দেশ ভ্রমণের সুবিধা খুব অল্পই ছিল। বিলাতে ডাক যাইতে এক মাস লাগিত। বিলাতযাত্রি সিভিল সারভিস্ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রথম মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র বিলাত গমন করেন। তাহার নাম শ্রীপাদ বাবাজী ঠাকুর। তাহার পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে কয়েক জন ব্যবসায়ি মাত্র বিলাত যাইত। শ্রীপাদ বাবাজীর পূর্ব্বে ১৮৬৪ সালে ফিরোজ সাহা মেটা ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। দাদা ভাই অবশ্য তাহার পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। সেকালের বিলেতের ভারতীয় ছাত্রদিগের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোণা যাইত। মাধব রাও রাণাডে ব্রাহ্মণ না হইলে হয়ত ফিরোজ সাহার পূর্ব্বেই বিলাত যাইতেন। কিন্তু সেকালকার মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বিলাতযাত্রা-জনিত সামাজিক শাসনকে ভয়ানক ভয় করিতেন। ১৮৭২ সালে পার্লামেণ্টারি কমিটিতে সাক্ষি দিবার জন্য পুণার সার্ব্বজনিক সভা একজন মহারাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে কেহই বিলাত যাইতে রাজী হইলেন না। সেই সময় কিন্তু বিলাতে একটী হিন্দু-মন্দির নির্ম্মাণের কল্পনা হইয়াছিল। কিন্তু যেমন হিন্দু-সমাজ তেমন তাঁহাদের দেবতা! উভয়েরই বিদেশযাত্রার নামে ভয়। ১৮৬১ সালে বোম্বাই হইতে কোকনে ষ্টীমার যাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু সপ্তাহে মাত্র একদিন ষ্টীমার চলিত বলিয়া কোকনযাত্রীদিগকে নৌকায়ও যাইতে হইত। তখনও কোকন উপকূলের রাস্তা নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং সেখানে যাতায়াত নিতান্ত সহজ ছিল না; বোম্বাই হইতে পুনা পর্য্যন্ত রেল গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং পুনা হইতে মফঃস্বলের সহরে যাইবার রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালে কাএজের ঘাটের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হয় এবং সাতারা, বেলগাঁও ও বাঙ্গালোরের রাস্তা নির্ম্মিত হয়। অনেক যায়গায়ই ঘুঙ্গুরওয়ালা হরকরার হাতে ডাক পাঠান হইত। কেবল পুনা হইতে কোলাপুর পর্য্যন্ত ডাকগাড়ী আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালে সমগ্র পুনা সহর ও ক্যাণ্টনমেণ্টে মাত্র একটী পোষ্ট অফিস্ ছিল এবং সমগ্র পুনা সহরে মাত্র একটী ডাকবাক্স ছিল।

তিলক কলেজ ছাড়িবার সময় মহারাষ্ট্রে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। টাকায় পাঁচ সের শস্যও মিলিত না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাজ তাঁহাদের হাতে যথারীতি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক বিপদ অপেক্ষাও মহারাষ্ট্রে স্থায়ী বিপদ ছিল অধিক ভয়ঙ্কর। মহারাষ্ট্রের কৃষক ঋণে ডুবিয়া গিয়াছিল। কৃষকদিগের এই দুরবস্থার বাস্তবিক কারণ অনেকগুলি। মহারাষ্ট্রের পার্ব্বত্য ভূমির অনুর্ব্বরতা, বৃষ্টির অল্পতা, পুষ্করিণী ও কূপের অভাব, ঘাসদানার

অপ্রচুরতা এবং গৃহপালিত পশুপালনের অসুবিধার জন্য কৃষকদিগকে কেবল শস্যক্ষেত্রের অল্প আয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কৃষকের ঘরে সঞ্চিত অর্থ নাই। কিন্তু সেকালে লস্করি পেশা প্রায় সমস্ত গ্রামেই অল্পবিস্তর বিস্তৃত হওয়ায় মহারাষ্ট্রের লোকের তাদৃশ কষ্ট হইত না, কিন্তু ইংরেজী আমলে নিম্ন শ্রেণীর অবস্থা হইয়াছিল কোমর অবধি কবর দেওয়া মানুষের মত। ব্যয় অপেক্ষা আয় কম কাজেই তাহাদিগকে মহাজনের ঘরে যাইতে হয়। আর সেখানে একবার পা দিলে তাহার অবস্থা হইত মাকড়সার জালে আবদ্ধ মাছির মত। মহাজনেরা অবশ্য এক জাতীয় লোক নহে। মাড়োয়ারি, গুজর, মারাঠা, বানিয়া, ব্রাহ্মণ, মহাজন যে জাতীয় লোকই হউকনা কেন তাহাদের ব্যবসায়ের রীতি এক। তাহাদের অত্যাচারে সাত্বিক মনুষ্যও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। সুতরাং সাধারণ মানুষ যে প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? গ্রামে গ্রামে মহাজনদিগের বিরুদ্ধে দল গঠিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। এবং কোন কোন স্থলে মহাজনের ঘরে ডাকাত পড়িয়া তাহাদিগকে খুন পর্য্যন্ত করিয়াছিল। মহাজনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন কেবল মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল না, গুজরাটেও অল্প বিস্তর প্রসারিত হইতে লাগিল সুতরাং সেখানেও একটু গোলমাল চলিতেছিল।

কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা পুরাপুরি চলিয়াছিল পুনা ও নগর জিলায়। শেষে কৃষকের ঋণ মোচন করিবার জন্য কমিশন বসাইয়া কেবল মহারাষ্ট্রের জন্য আইন করা হইয়াছিল। তিলক কলেজে থাকিতে এই সকল দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর সংবাদপত্রে পড়িতেন এবং লোকমুখে শুনিতেন। কম পক্ষে হাজার লোক দাঙ্গার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিল, এবং বিচারে অন্ততঃ ৫০০ শত লোক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় রাও বাহাদুর রাণাডের প্রেরণায় পুনার সার্ব্বজনিক সভা আন্দোলন করিয়াছিল—ছাত্রাবস্থায় তিলকের মন তাহার প্রভাব বোধহয় এড়াইতে পারে নাই। পরে সার্ব্বজনিক সভা হাতে আসিলে তিলক স্বয়ং সরকারের দুর্ভিক্ষ নিবারণ ব্যবস্থা ও খাজনার জুলুমের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহার আমাদের বোধহয় তাহার মূলে ছিল ২০ বৎসর পূর্ব্বের এই সকল ঘটনার স্মৃতি।

উচ্চাঙ্গের রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখিলে পার্লামেণ্টের বিধানে তখনও হিন্দুস্থানের ললাটে দাসত্বের চিহ্ন অঙ্কিত হয় নাই। চার বৎসর পরে লর্ড লিটনের আমলে রাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতবর্ষের রাণীর উপাধি ধারণের সংবাদ যখন দিল্লির বড় দরবারে জাহির করা হইল তখনই হিন্দুস্থানের এই হীনতার সূত্রপাত। সে পর্য্যন্ত কোন ব্যবহারশাস্ত্রবিদ অল্প কথায় ইংলণ্ড ও হিন্দুস্থানের সম্পর্ক যথোচিতভাবে নির্ণয় করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। সত্য কথা বলিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইত যে রাণীর সরকারের রাজ্য বসিয়াছিল দিল্লির বাদসাহের ফরমানের, বাজীরাওয়ের দানপত্রের, সাতারার মহারাজকে বলপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার

স্থান জবর দখল করিবার এবং এইরূপ বিবিধ প্রকারের অধিকারের দুর্ব্বল ভিত্তির উপর। কোম্পানির যায়গায় রাণীসাহেব আসিয়াছিলেন সত্য কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানির ও রাণী সরকারের দাবিতে কিছুই পার্থক্য ছিল না। রাজার প্রভুত্বের প্রধান দলিল প্রজার সম্মতি। রাণী ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞীর উপাধি ধারণ করায় এবং ভারতবর্ষের প্রজাগণ তাঁহাকে সেই উপাধি গ্রহণ করিতে দেওয়ায় এই দলিল বিলাত সরকারের হস্তগত হইল।

সেকালে মহারাষ্ট্রের রাজনীতি ছিল অতি সাধারণ ও সরল। প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন না থাকায় একটা রাস্তা চওড়া করিবার কিম্বা পরিচ্ছন্ন রাখিবার আবেদনকেও রাজনৈতিক আন্দোলন বলা হইত। হারাণ সম্পত্তির হিসাবে স্বরাজ্য শব্দ সেকালের লোকের অজ্ঞাত ছিলনা। কিন্তু ভবিষ্যতে স্বরাজ্য লাভের কথা মুখেত দূরের কথা কেহ মনেও আনিতে পারিতনা। সমগ্র ভারত বর্ষের রাষ্ট্রিয় সভা স্থাপিত হইবার পর বিশ বাইশ বৎসর অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারও মুখেও যখন স্বরাজ্য শব্দটী বাহির হয় নাই তখন মহারাষ্ট্রের সেই আদিম যুগের রাজনীতিতে তাহা কোথা হইতে আসিবে! রাজনীতির দিক দিয়া যে তাহাদের প্রতিদিনই অবনতি হইতেছিল তাহা সেকালের লোকেরা বুঝিতেন। কিন্তু তাহা নিবারণের জন্য সমাজে যে নব জাগরণ কিম্বা সঙ্ঘ-শক্তির সৃজন আবশ্যক তাহার কচিৎ কখনও সূচনা মাত্র দেখা গিয়াছিল। ইনাম কমিশন পান দোষের প্রসার জঙ্গলের বিস্তার জনিত লোকসানের কথা সকলেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করা ব্যতীত রাজনৈতিক আন্দোলন বলিয়া যে কিছু আছে তাহার কল্পনাও তখন কেহ করিতে পারেন নাই। সাহেবেরা বিশেষতঃ গোরা সৈনিকের দল দেশী লোকের সহিত যেরূপ অপমানকর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল লোক মুখে কিম্বা সংবাদপত্র হইতে তাহার কথা শুনিয়া তাহাদের মনে কষ্টই হইত। কিন্তু সেই কষ্টের তুলনায় প্রচলিত সংবাদপত্রেও তদ্বিষয়ে কোনও কঠোর কথা বাহির হয় নাই। একেবারে কোথাও যে জনসাধারণের মনের ক্ষোভ অন্য প্রকারে প্রকাশিত হয় নাই এমন নহে। হিন্দুদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিতে যাইয়া অনেক মিশনারি মার খাইয়াছিল। ১৮৭১ সালে ব্রেসিন্ সহরের ইনকাম ট্যাক্স কলেক্টর হাণ্টার সাহেবকে ধরিয়া ২৫ জন লোক বেদম প্রহার দিয়াছিল। হাট বাজারে কখন কখন দুই একজন গোরা কর্ম্মচারি জনতার হাতে দু একটা ধাক্কা খাইত। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কথা ছাড়িয়া দিলেও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরম্যান ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেওর মত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এদেশী লোকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সুতরাং প্রসঙ্গবিশেষ সে ইংরেজের অঙ্গেও হাত তোলা যায় তাহা তখনও লোকে দেখিয়াছিল। কিন্তু চতুর্দিকে সার্ব্বজনিক রাজনৈতিক আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয় নাই।

পেশোয়ার পতনের পরও কিছুদিন প্রাচীন উচ্চবংশীয় লোকদিগের প্রভাব অব্যাহত ছিল। পরে নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদিগের সহকারিতাই সরকার অধিক

সুবিধাজনক বিবেচনা করিতে লাগিলেন, রাজ্য শাসনের দৃষ্টিতে ইহা উচিতই হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হইত না। সুতরাং সে কালের সুশিক্ষিত লোকদিগের মনের অবস্থা ভয়ঙ্কর শোচনীয় হইয়াছিল। প্রাচীন সামাজিক প্রথার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা রহিলনা, অল্প বিদ্যায়ই বড়মানুষি চালাইবার মত উচ্চ বেতন ও সরকারী সম্মান মিলিত বলিয়া একদিকে যেমন তাহাদের অধিকার বাড়িয়াছিল অন্যদিকে তেমনই সমাজকে উপেক্ষা করার বুদ্ধিও জন্মিয়াছিল। ১৮৩৭ হইতে ১৮৭৪ পর্য্যন্ত সুশিক্ষিতদিগের প্রায় ২।৩ পুরুষ হইয়াছিল। ইহাদের প্রথমদলকে গোপালরাও হরির দল বলা যাইতে পারে। উহাদের বিদ্যা নিতান্ত অল্প। গোপালরাও হরি নিজে মোটেই সুশিক্ষিত ছিলেন না! দ্বিতীয়দলের নেতা মাধবরাও রাণাডে কুণ্ডে প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে সামাজিক বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রথমদল অপেক্ষাও কম ছিল। সমাজের দোষ গুণের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ছিল না।

পাণ্ডিত্যের হিসাবে রাণাডের নীচেই মাধব রাও কুণ্ডের স্থান। তিনি পুনা হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন। ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং তাহার Vicissitudes of Aryan Civilization নামক পুস্তক দেখিলে বুঝা যায় যে ঐ প্রকারের দুরূহ ব্যাপারের সহিতও তাঁহার অল্পাধিক পরিচয় ছিল। উদ্যমশীলতার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, একটী পেন্সিলের কারখানা খুলিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্র শিখিবার ইচ্ছা হওয়ায় কিছুকাল তাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও স্বভাবের ক্রটি ছিল উচ্ছৃঙ্খলতা। লিখিতে পারিতেন বেশ, কিন্তু কি লিখিয়া বসেন তাহার কিছু স্থিরতা ছিলনা! বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলে ইংরেজী ভাষার মুশলধারে বর্ষণ হইত। কিন্তু তাহাতে যে কোথাকার কত আবর্জ্জনা ভাসিয়া আসিত তাহার ঠিক ছিলনা। একেবারে নির্জ্জনে সঙ্গীতবিদ্যা অভ্যাস করা কঠিন সত্য, কিন্তু কুণ্ডে কর্কশ চড়া গলায় সুরের তালিম সুরু করিলে কাহারও সেখানে টেঁকা দায় হইত। মায়ের মুখের উপর বলিয়াছিলেন "আমার যে কয়জন বাপ শ্রাদ্ধে সেই কয়জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিব।" আবার প্রয়োজন হইলে পায়ে নূপুর পরিয়া হাতে করতাল লইয়া ভজন গাহিতেও পারিতেন। বিদ্যালয়ে যিনি ছাত্রদিগকে শিষ্টাচার শিখাইতেন সেই হেড্মাষ্টার মহাশয় বালকদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা আমরা লিখিলে শিষ্টাচারের হানি হইবে। বিশেষভাবে কুণ্ডেকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রী মহাশয় এক যায়গায় লিখিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সকল বিশ্রী বিশেষণ ইহার প্রতি প্রয়োগ করিলেও পর্য্যাপ্ত হইবেনা।

সেকালের শিক্ষিত লোকদের সম্বন্ধে এই বর্ণনা প্রকৃত হইলেও ইংরেজ সরকারের প্রতি যে তাঁহাদের বিশেষ প্রীতি ছিল তাহা নহে। মারাঠা সাম্রাজ্য নষ্ট হওয়ার পর তখন মাত্র ৫০ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং সে সাম্রাজ্যের কথা তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া যাইবেন কেমন করিয়া এক হিসাবে তিলকের পূর্ব্বের মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাসুদেব বলবন্ত ফড্‌কেকে

একটী বিশিস্ট স্থান দেওয়া যায়। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া মহারাষ্ট্রে নূতন নহে। মাধবরাও রাণাডে সরকারী চাকুরি করিতে করিতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সরল রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ফড্‌কে সরকারী চাকুরিতে থাকিয়াই বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের ভাবী বিপ্লবপন্থী তরুণদিগের মত ফড্‌কেও মনে করিয়াছিলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে যাহা পাওয়া যাইবে না বিপ্লবের দ্বারা তাহা সহজেই মিলিবে এবং সরকারকে অনায়াসে নরম করা যাইবে। তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৬।৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় রামসী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করিল তখন ফড্‌কে মনে করিলেন যে তাঁহার কাজের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, এবং ডাকাতের দলগুলির সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু মাঙ্গ রামসীরা ফড্‌কের মহৎ উদ্দেশ্য কেমন করিয়া বুঝিবে, তাহারা চুরি ডাকাতির ব্যবসাই বেশ ভাল করিয়া চালাইতে লাগিল এবং ফড্‌কে তাহাদের সংশ্রব না এড়াইতে পারায় ফড্‌কের বিদ্রোহের অপরাধে ফাঁসি হইল।

একালে যাহাদের নামে ইংরেজেরা ভয়ে জড়সড় হন তাহাদের মধ্যে ফড্‌কেই প্রথম, বাসুদেব বলবন্তের বিদ্রোহের বিচিত্র বিবরণ এখনও শোনা যায়। কথিত আছে তিনি তিলকের এক নিকট আত্মীয়—এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন।

কিন্তু বাসুদেব বলবন্ত ফড্‌কে ছিলেন সাধারণ নিয়মের অপবাদ। রাজনৈতিক আন্দোলন যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন তাহার গতি মন্থর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জোয়ারের সময় যেমন প্রথম তরঙ্গ অপেক্ষা দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং দ্বিতীয় তরঙ্গ অপেক্ষা তৃতীয় তরঙ্গ প্রবলতর হয় সেইরূপ মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক জোয়ারেও দেখা গিয়াছে যে প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দল অধিক সাহসী। দ্বিতীয় দল অপেক্ষা তৃতীয় দলের চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র এবং পরবর্ত্তী দলের স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বদলের অপেক্ষাও অধিক। এই ভাবে রাজনৈতিক স্রোত বিষ্ণু শাস্ত্রী চিতলুনকর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং চিতলুনকর সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তিলক ও আগরকার চাকুরিতে না ঢুকিয়াই যে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাও রাষ্ট্রীয় চিন্তা ধারার নৈসর্গিক নিয়মসঙ্গত। এই হিসাবে সেকালের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিলকের পূর্ব্বের কয়েক জন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ডাক্তার ভাউদাজী লাড্ তিলকের জ্যেষ্ঠাদগের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার আদি নিবাস গোমান্তক। ১৮১৮ সালে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে পারিবারিক দারিদ্র্যের জন্য তিনি বোম্বাই আগমন কয়েন। তখন তিনি মাটীর পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পরে দাবা খেলায় বিশেষ দক্ষতার জন্য প্রথম বোম্বাইর অনেক বড় বড় লোকের এবং পরে লাট সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শুনা যায় যে এরূপ বুদ্ধিমান বালক বিনা শিক্ষায় নষ্ট হইতেছে দেখিয়াই তাঁহার জন্য প্রথম সরকারি মারাঠা পাঠশালা খোলা হয়। বিদ্যালয় প্রবেশ

করিয়া পড়িতে পড়িতে তিনি অনায়াসে গ্রাণ্ড মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিলেন এবং ভাউদাজীই এই কলেজের প্রথম G. G. M. C.। দয়া ক্ষমা ও চরিত্র মাধুর্য্যের জন্য তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সাহেবেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং আদর করিয়া ডাক্তার বব্ বলিয়া ডাকিতেন। আবার এদেশী নিরাশ্রয় গরীব লোকদিগেরও তিনিই ছিলেন অভিভাবক। তিনি দুই বার বোম্বাইর সেরিফ্ হইয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসকের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াও যথেষ্ট বিদ্যার্জ্জন এবং সাহিত্য-সেবা করিয়াছিলেন। শিলা-লেখা ও তাম্রশাসনের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঐ বিষয়ের উপর তিনি কয়েকটী উত্তম প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। রাও সাহেব মণ্ডলিকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং সামাজিক ব্যাপারে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রাচীন ও নবীন মতের সুন্দর সমন্বয় করিতেন। ১৮৭৩ সালে ভাউদাজীর মৃত্যু হয়।

মহাদেবশাস্ত্রী কোল্‌থণ্ট্‌কর সেকালের একজন পণ্ডিত লোক। তাঁহার নিবাস বাই। পুনার পাঠশালায় তিনি জ্যোতীষ ও ব্যাকরণ অভ্যাস করেন ও বৃত্তি দিয়া ৬ বৎসর ইংরেজী শিখিবার জন্য যে সকল বিদ্বান তরুণ শাস্ত্রীকে বোম্বাই সরকার ক্যাস্‌ডি সাহেবের নিকট পাঠান কোল্‌থণ্ট্‌কর তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বোম্বাইতে বালশাস্ত্র জাম্ভেকরের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫১ সালে তিনি পুনা কলেজে অধ্যাপক হন। পরে ১৮৬৫ সালে সেণ্ট্রাল বুকডিপোর কিউরেটরের কার্য্য করিতে করিতে ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। মহাদেব শাস্ত্রী উত্তম বক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি কলম্বাসের জীবনচরিত, অর্থশাস্ত্র, ওথেলো নাটকের অনুবাদ প্রভৃতি পুস্তক ও কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাল শিখেন নাই বলিয়া তিনি শিক্ষা বিভাগে যোগ্যতানুরূপ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তথাপি মহাদেব শাস্ত্রী সেকালের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। তখনকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে গোপাল রাও হরি দেশমুখ অন্যতম। বাল্যকালে তিনি বেশী লেখাপড়া শিখেন নাই কিন্তু নিজের চেষ্টায় পরে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনই তিনি অবিরত জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। তাঁহাকে লেখক কিম্বা গ্রন্থকার বলা যায়না। কোন নূতন তথ্য পাইলেই তাহা তিনি সঙ্কলন করিয়া ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহার প্রবন্ধগুলিকে 'নোট্' বলিলেও চলে। ইংরাজী গ্রন্থ পড়িয়া তাহা হইতে মাল মশলা লইয়া সংবাদ পত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখা ছিল তাঁহার অভ্যাস। তিনি লোকহিতবাদী নাম দিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি প্রায় সবই এই প্রকারের। তাহার গ্রন্থগুলিকে বিদ্যার্জ্জনের দোকানে খস্‌ড়া হিসাবও বলা যাইতে পারে।

মাননীয় রাও বাহাদুর কৃষ্ণাজী লক্ষ্মণ নুলকর C. I. E. তিলক অপেক্ষা ২৬ বৎসরের বড় ছিলেন। তাঁহার মূল নিবাস সাবস্ত বাড়ী, তাঁহার এক খুল্লতাত সঙ্কেশ্বরের জগৎগুরুর জমিদারির তত্ত্বাবধান করিতেন। নুলকারের যখন ৮ বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং মাতা সহমৃতা হন। ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি মোটেই ইংরেজী শিখেন নাই। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে

বিদ্যানুরাগ ও স্বাবলম্বনের অধিকারী ছিলেন বলিয়া নিজের চেষ্টায় নানাস্থান হইতে তিনি কিছু কিছু ইংরেজী শিখিলেন। এই সময় হঠাৎ এই ভাগ্যবান বালকের উপর Political Agent General Jacob সাহেবের দৃষ্টি পড়িল এবং তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপনার খাস্‌মুন্সি নিযুক্ত করিলেন ও পরে তাঁহার কাছারির Head Clerk করিয়া দিলেন। রাও সাহেব মাণ্ডলিক এই সময় সরকারি চাকুরি করিতেন। তাহার সহিত লুলকরের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মাণ্ডলিক প্রথম ভুজের একাউন্টেন্ট পরে সার বারটল ফ্রিগারের খাস্‌মুন্সি এবং পরিশেষে বোম্বাইর স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সার বারট্‌ল্‌ ফ্রিগারের নিকট তদ্‌বির করিয়া লুলকরকে নিজের পদে নিযুক্ত করেন। বোম্বাইর সেক্রেটারিয়েট, কাথিওয়ারের পলিটিক্যাল এজেন্সি, বোম্বাইর Small Cause Court এবং পরিশেষে কচ্ছের রাজ দরবারে বড় বড় চাকুরি করিয়া ১৮৭৬ সালে লুলকর পুণায় স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সার্ব্বজনিক সভার সভাপতি মনোনীত হন এবং ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যে ১৮৪৪ সালে বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক জঙ্গল বিভাগে লোকসান করিবার তদন্তের জন্য যে কমিসন্‌ গঠিত হয়, লুলকর তাহার সদস্য নিযুক্ত হন। এই কার্য্যের জন্যই পরে তিনি সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছিলেন।

কৃষকদিগের ঋণ সম্বন্ধীয় কমিশন, বোম্বাইর আইন মজলিস্‌ এবং ভারতীয় আইন মজলিসে তিনি সরকারি তরপ্‌ হইতে সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মোটের উপর সেকালে একজন সাধারণ লোক সরকার দরবারে যতখানি সম্মান আশা করিতে পারিত লুলকর তাহা লাভ করিয়াছিলেন।

সার্ব্বজনিক সভার সভাপতি হিসাবে লুলকর রাণাডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তিনি বয়সে রাণাডের জ্যেষ্ঠ। লুলকর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারণ করিতে পারেন নাই এবং রাণাডের মত প্রতিভা ও উদ্যম তাহার ছিল না; সুতরাং এই বৃদ্ধ তরুণের বিরোধে রাণাডের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় অধিক পাওয়া যাইত। কিন্তু অভিজ্ঞতা স্পষ্টবাদিতা এবং একপ্রকারের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ছিল বলিয়া লুলকর অনেকবার রাণাডেকে হারাইয়া দিয়াছেন। পুণা সহরে এবং খাস্‌ সার্ব্বজনিক সভায় রাণাডের এক বিরোধী পক্ষ ছিল। তাহারা অনেক সময় রাণাডে ও লুলকারের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া মজা দেখিত। লুলকর ফরেষ্ট কমিশনে জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু সহবাসসম্মতি আইনের অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুণাবাসিগণের অপ্রীতিভাজন হন। ১৮৯৬ সালের ২৮শে মার্চ্চ মহাবলেশ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

মোহভঙ্গ

(১)

ভাত খেয়ে উঠে, দুপুরবেলায় রমেশ একখানা ইব্‌সেনের নাটক মুখে করে শুয়ে পড়্‌ল। গরমের ছুটিতে এম-এ ক্লাস বন্ধ হ'বার পর থেকে প্রায় পনেরোদিন এই ভাবেই কাট্‌ছিল; আর কিন্তু ভাল লাগে না। বইখানা বুকের ওপর চেপে ধরে সে ভাব্‌ল, যাই কোথাও বেড়িয়ে আসি; কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়,—পুরী, দার্জ্জিলিং—সবই পুরানো জায়গা। হঠাৎ সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল। সুদূর পল্লী থেকে বুড়ো দিদিমার নিমন্ত্রণটা তার মনে পড়ে গেল।

"মা, ও মা শুন্‌ছ—"

মা ছেলের হঠাৎ চীৎকারে চকিত হয়ে বল্‌লেন—"কি রে?"

"কাল সকালের ট্রেণে মামার বাড়ী যাচ্ছি মা; দিদিমার খবরটা অনেকদিন পাইনি।"

"হঠাৎ দিদিমার জন্যে তোর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল কেন বল দেখি?"

"সে সব জানি না—মোট কথা আমি চলেছি।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই রমেশ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, পল্লীবাসটা তত সুখের নয়। দিদিমার দেওয়া ঘন দুধের বাটি, পাকা আম আর দুপুরের গভীর ঘুম তার জীবনটাকে বড়ই একঘেয়ে করে তুল্‌ল।

সেদিন বিকেলে ঘুম থেকে উঠে, রমেশ সবে একখানা বাংলা গল্পের বই হাতে করেছে, এমন সময়ে পেছন থেকে উচ্চ মধুর গলায় কে বলে উঠ্‌ল, "বাঃ রমেশ ঠাকুরপো, তুমি আচ্ছা লোক তো! আজ সাত আট দিন হ'ল এখানে এসেছ, অথচ আমাদের ওদিক মাড়াও নি। একেবারে ভুলে গেছ,—না?"

রমেশ চেয়ে দেখ্‌ল,—ওপাড়ার দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই বিপিনদার বউ শৈল একটি ছোট ছেলে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে। এই বিপিনদার বাড়ীই তার এখানকার আড্ডা ছিল। রমেশ ফিরে বসে বল্‌ল,—"না, সত্যি বল্‌ছি, ভুলে তো—একদম যাই নি বরং—।" 'বরংটা' শেষ করবার মত কথাটা তখুনি' মাথায় না আসাতে সে কথাটা বদলে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—"আচ্ছা বৌদি ওটি তোমার ছেলে বুঝি?"

শৈল একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌ল, "হাঁ,—যা' বল।"

রমেশ হেরে গিয়ে আবার কথাটাকে পাল্‌টে দিয়ে বল্‌ল, "আচ্ছা ভাই বৌদি, তুমি নিজেই যখন কষ্ট করে এসেছ, তখন তোমার বাড়ীতে কাল আমার নেমন্তন্ন রইল।"

"মনে থাকে যেন, পেটুকের মত যেমন যেচে নেমন্তন্ন নিলে, কাল গিয়ে তেমনি খেয়ে আসতে হবে তা' না হ'লে—"

বাধা দিয়ে রমেশ চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "দিদিমা, আজ রাত্তিরে আমি আর কিছু খাব না—"

দিদিমা ব্যস্ত হয়ে এসে বল্‌লেন, "কেন রে, শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?"

হাসিমুখে শৈলর দিকে একবার চেয়ে রমেশ বল্‌ল,—"না, এই কাল বৌদির বাড়ী নেমন্তন্ন কিনা, সেইজন্যে পেট খালি করে রাখ্‌ছিলুম।"

(২)

"সত্যি বল্‌ছি, বৌদি, আমার পেটে আর এক ঢোক্ জল খাবার মতও জায়গা নেই; বিপিনদাকে বরং দাও।"

"দুধটুকু খাবার জায়গা আছে; সুমি দুধের বাটিটা আন্‌ত।"

সুমি আবার কে?—এ বাড়ীতে ঐ নামের কোন লোকের সঙ্গে রমেশের তো পরিচয় ছিল না। একখানি সুগোল হাত যখন পাতের কাছে দুধের বাটি রাখ্‌ল, তখন রমেশ মুখটা তুলে একবার চেয়ে দেখ্‌ল, একজোড়া কালো চোখ—তার দৃষ্টির ভেতর যেন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, আর তার ভেতর থেকে যেন এক গভীর ব্যথা ঝরে পড়্‌ছে। ভাল করে চেয়ে সে দেখ্‌ল, মেয়েটির পরণে থান। যেটুকু উচ্ছ্বাস তার মনের মধ্যে জেগেছিল, সব জমাট হয়ে গেল।

"রমেশ ঠাকুরপো, তুমি বেজায় একগুঁয়ে; দুধটা খেলে বুঝি তোমার পেট সত্যিই ফেটে যেত!"

করুণ চোখে চেয়ে রমেশ বল্‌'ল,—"সত্যি বল্‌ছি, আমার খাবার আর ইচ্ছে নেই।"

যে খবরটা জান্‌বার জন্যে রমেশের সব চেয়ে বেশী ঔৎসুক্য হচ্ছিল, খাওয়া হয়ে যাবার পর শৈল আপনা থেকেই তা' বল্‌ল।

"দেখ ঠাকুরপো, একজন লোক ভাগ্যিস্ পেয়েছিলুম, তাই আজকাল একটু ফুরসুৎ পাই।"

রমেশ সম্পূর্ণ উদাসভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "লোকটি কে?"

"ঐ যে মেয়েটিকে দেখ্‌লে আমার বাপের বাড়ীর দেশে ওরও বাপের বাড়ী। সে আজ বছর দুই হ'ল। বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে ও—খুব গরীব কিন্তু। মেয়ের বয়স তেরো বছর হতেই, গ্রামের লোক যখন টিট্‌কারী দিতে আরম্ভ কর্‌ল তখন ওর বাপ মায়ের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। আমি তখন মাঝে মাঝে ওদের বাড়ী যেতুম। একদিন হঠাৎ শুন্‌লুম, পাশের গ্রামের এক নেশাখোর আধবুড়ো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক। সেদিন সুমির চোখে যে করুণ কান্না জমাট হয়ে ছিল, সে তুমি বুঝ্‌বে না। তারপরের ঘটনা অতি অল্প। তার স্বামী গেল মরে—এক মাসের মধ্যেই; শ্বশুর বাড়ীর লোক অপয়া বউ বলে তাড়িয়ে দিল। আর বছরের মধ্যেই অভাগী বাপমাকে খেলে। আমি তখন বাপের বাড়ীতে—সবে খোকা হয়েছে। ওঁর অনুমতি না নিয়েই আমি মেয়েটাকে সঙ্গে করে আন্‌লুম।"

সুষমা একটু আগেই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। শৈলর কথা শেষ হলে, সে তার পাশ ঘেঁষে আস্তে আস্তে বল্‌ল,—"দিদি, তুমি খাবে এস না—খোকাকে আমি ধর্‌ছি।"

"ঠাকুরপো, তুমি ততক্ষণ কর্ত্তার সঙ্গে একটু গল্প কর; আমি আস্‌ছি—পালিও না যেন!"

রমেশ ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভাল করে মেয়েটিকে দেখে নিল। সুন্দর তাকে বলা যায় না—কিন্তু যে করুণভাব তার সারা দেহ ব্যাপ্ত করে ছিল, সেটা অনুভব না করে কেউ তার দিকে তাকাতে পারে না। সন্ধ্যার আঁধারে ক্ষীণ প্রদীপটি যেমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে—অল্প বাতাসে হেলে দুলে ওঠে,—সর্ব্বদাই যেন নিবু নিবু;—এও ঠিক সেই রকম। তার মাথার রুক্ষ চুলের গোছ গুলি ক্রমাগতই মুখের ওপর এসে পড়্‌ছে—যেন একটা বিষম বোঝা; কিন্তু তাতেই তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। আর এই সবের মধ্যে নিবিড় বেদনা জড়ানো সেই কালো ডাগর চোখ দুটি যেন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা গুলোকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সে দিনের দুপুরটা রমেশের যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। বিপিনদা, শৈল ও সুষমার সঙ্গে তাদের তাসের আড্ডাটা জমেছিল ভাল। সেই কাল চোখের চাউনি, খেলার শেষ পর্য্যন্ত তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল—যদিও প্রত্যেক হাতেই তার হার হয়েছিল।

(৩)

"সুষমা, একটা পান দেবে?"

সুষমা পান সাজছিল। দুটা পান রমেশের হাতে তুলে দিয়ে, সুষমা একটু হেসে বল্‌ল,—"আজ কিন্তু খেলা হবে না। দাদাবাবু কি কাজে বেরিয়েছেন—দিদি ঘুমোচ্ছে।"

রমেশ ধপ্ করে তার পাশে বসে পড়ে বল্‌ল, "তাহোক্—বেশ একটু গল্প করা যাবে।"

সুষমা একটু সঙ্কুচিত হয়ে সরে বস্‌ল,—তার গালে একটু লালের রেশ এসে লাগ্‌ল। তার প্রাণহীন দেহবল্লীর ভেতরে যেন একটু সজীবতা এসেছিল। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি এনে সুষমা বল্‌ল, "আচ্ছা আপনি কলকাতায় ফির্‌ছেন কবে? পাড়াগাঁ আপনার ভাল লাগ্‌ছে?"

রমেশের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—"ভাল লাগা নিশ্চয়ই উচিত—বিশেষতঃ তুমি যখন এখানে রয়েছ।" কথাটা বলেই রমেশ স্তব্ধ হয়ে গেল; কি কথা সে বলে ফেলেছে?

সুষমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর পাঁচ মিনিট দুজনে চুপ। অন্যঘরে হঠাৎ শৈলর খোকা কেঁদে উঠ্‌ল। সুষমা উঠে চলে গেল।

আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, দুজনের মনেই—একটা আগুন ধুনোর আগুনের মত দপ্ করে, আর একটা কাঠের কয়লার মত ধিকি ধিকি করে।

তাসের আড্ডাতে যাওয়া রমেশ দুদিন বন্ধ রাখল। তৃতীয় দিনে সেখানে যেতেই, সবার আগে অভিযোগ কর্‌ল, সুষমা। রমেশের মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চেয়ে মুখ ভার করে রইল। সে অভিযোগটা নীরব হলেও, সুষমার চোখের চঞ্চলতা রমেশকে চঞ্চল করে তুল্‌ল। আড্ডা সেদিন

গরমের দোহাই দিয়ে রমেশ সে রাত্রি জেগেই কাটিয়ে দিল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমিয়ে পড়বার আগে, রমেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল যে, পালাতে হবে। তাকে এ প্রলোভনের সাম্‌নে থাক্‌তে হ'লে, নিজেকে সংযত করা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কেন—মন যাকে চায় তাকে পেতে এত সঙ্কোচ কেন? তারপর আর একটা 'কিন্তু' এসে রমেশের সব চিন্তাকে বিপর্য্যস্ত করে দিয়ে গেল।

সমস্ত রাত্রি জেগে, তার ওপর পুকুরের জলে ঘণ্টা দুই সাঁতার কেটে রমেশ জ্বরে পড়ল। খুব বেশী জ্বর না হলেও, মাথার যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। বিকেল বেলার দিকটায় একটু তন্দ্রার মত আস্‌ছিল, এমন সময়ে কে ঘরে ঢুকল। রমেশ ভাবল বোধ হয় তার দিদিমা কি মামীমা হবেন। একটু পরেই কপালে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করে, সে চেয়ে দেখল, দুটি ব্যাগ্র আকুল চোখ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। রমেশ একবার চঞ্চল হয়ে উঠল—নিজের মনের অস্থিরতাকে চাপবার জন্যে। তারপর নিজের হাত দুখানি দিয়ে, সেই স্নিগ্ধ স্পর্শকে কপালের ওপর চেপে ধরল।

আর এরকম ভাবে চলে না। রমেশ সেরে ওঠবার পরই ক'ল্‌কাতা ফেরবার ঠিক করে ফেল্‌ল। এ তার পলায়ন! যে আগুন সে জ্বালিয়েছে, তা নিভিয়ে না দিয়ে দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা নিয়ে দূরে পলায়ন! মনের সঙ্গে অনেকখানি যুদ্ধের পর ঠিক কর্‌ল যে, যাবার সময় একবার সুমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

যাবার আগের দিন বিকেলে বিদায় নেবার সময় শৈল ব'লল, "সত্যি ভাই রমেশ ঠাকুরপো, তোমার মন যে খুব চঞ্চল হয়েছে তা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কোথাও থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে নাকি? নেমন্তন্নটা যেন ফাঁক যায় না।"

দিনের আলো অবসাদের মত এলিয়ে পড়েছিল। রমেশ সুমার সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে খিড়কির ঘাটে গিয়ে পৌঁছিল। সুমা ঘাটের অন্ধকার কোণে বসেছিল। রমেশ সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে সংযত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, সহজভাবে বল্‌ল—"কাল ভোরেই যাচ্ছেন তো?" কিন্তু হঠাৎ বন্যার মত চোখের জল এসে তার গণ্ড ভাসিয়ে দিয়ে, তাকে বিপর্য্যস্ত করে ফেল্‌ল। সুমা দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। রমেশ তার হাত দুখানি ধরে তাকে কাছে টেনে নিল। পাথরের মত দুমিনিট স্থির থেকে সেইভাবেই তার হাতদুখানি ধরে, রমেশ স্থিরকণ্ঠে বল্‌ল—"হ্যাঁ ভাই সুমা। আমার জন্যে তোমার এত কান্না কিসের? আমি আবার এখানে আস্‌ব। জেনো তোমার রমেশ দাদা চিরকাল তোমাকে এমনই স্নেহ করবে। আজ আসি, কেমন?" রমেশ একটা নিশ্বাস ফেল্‌ল; তার বুকের ভার যেন সব কমে গিয়াছিল।

ধরা গলায় সুমা বল্‌ল—"দাঁড়াও।"

রমেশ দাঁড়াল। সুমা গলায় আঁচল দিয়ে রমেশের পায়ে প্রণাম কর্‌ল। যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে।

শ্রীহরিদাস ঘোষ

স্মরণে

আজ ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে সার আশুতোষ এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের চরিত্র সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের জীবনের ছোট ছোট কথাও জানা দরকার। আমি প্রায় দশ বৎসর কাল তাঁহার সহিত পরিচয়ের বিপুল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম; ইহার মধ্যে কত কথা কত ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার স্নেহশীল মহান্ উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, অক্ষুণ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও অক্লান্ত কর্ম্মনিষ্ঠার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। আজ সব কথা স্মরণ করিয়া গুছাইয়া লিখিবার সাধ্য নাই। তবে খণ্ড খণ্ড ভাবে কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করিব।

(১)

সার আশুতোষের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে একবার ছাত্রজীবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৯১১ সাল আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ পড়ি। সেইবার গ্রীষ্মের ছুটির পরেই আমাদের পরীক্ষা হইবার কথা। পরীক্ষা আসন্ন হইলেই ছাত্রগণের স্বভাবতঃই মনে হয় যে আরও কিছুদিন সময় পাইলে সুবিধা হয়। সুতরাং আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজের একদল এম, এ পরীক্ষার্থী স্থির করিলাম সার আশুতোষের নিকট পরীক্ষা পিছাইয়া দিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে আমরা প্রায় ২৫।৩০ জন ছাত্র রসা রোডে উপস্থিত হইলাম। যতদূর মনে পড়ে গ্রীষ্মের অসহ্য গরম প্রভৃতির অজুহাতেই আমরা পরীক্ষা পিছাইবার প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলাম। সার আশুতোষ দোতালায় নামিয়া আসিয়া আমাদিগকে খুব এক তাড়া দিলেন। আমি এবং অন্যান্য কয়েকজন যাহারা আশুতোষের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলাম ভয়ে একেবারে একতলায় প্রস্থান। কিন্তু আমাদের দলের কয়েকজন নাছোড়বান্দা ছেলে কিছুতেই দমিল না, অনেক অনুনয় বিনয় যুক্তি তর্কের ফলে অবশেষে আমাদেরই জয় হইল। সেদিন এই শেষোক্ত বন্ধুগণের দুঃসাহসিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে আশুতোষের চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার পর বুঝিয়াছিলাম ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিলনা, আশুতোষ ছাত্রবন্ধু ছিলেন। মুখে যতই কঠোর দৃঢ় ভাব দেখান না কেন তাঁহার কোমল অন্তর কখনও ছাত্রগণের প্রতি রূঢ় আচরণ করিতে পারিত না।

(২)

বস্তুতঃ ছাত্রগণকে তিনি এতই ভালবাসিতেন যে অনেক সময় বিচার বুদ্ধি দ্বারা অনুমোদিত হইলেও কোন কঠোর শাসননীতি তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। আমি যখন ল কলেজে পড়ি তখন জনৈক অধ্যাপকের সহিত ছাত্রগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ল কলেজের

ছাত্রেরা চিরকালই মাথাভাঙ্গা দলের, তাহারা ক্লাসের মধ্যেই অধ্যাপককে অশিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করে এবং দুই একজন আস্তিন গুটাইতেও প্রবৃত্ত হয়। আশুতোষ এই সংবাদ শুনিয়া ভয়ানক ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন, এবং ভীষণ কঠোর ও রুক্ষ মূর্ত্তিতে ক্লাসে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই প্রকার মূর্ত্তি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ভয়ে সকল ছাত্রেরই আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। কয়েকজন ছাত্রের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কয়েক দিন পরে আশুতোষের কোমল হৃদয়েরই জয় হইল, অপরাধী ছাত্রগণের দণ্ডের গুরুত্ব অনেক কমিয়া গেল।

(৩)

এম্ এ পাশ করার পর একখানি পরিচয়পত্র লইয়া আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যে পরিচয়পত্র দরকার হয় না এ জ্ঞান তখনও ছিলনা। যাহাতে ডেপুটিগিরির জন্য ইউনিভারসিটির একটি নমিনেশন পাই তাহাই আমার আবেদনের বিষয় ছিল। পরিচয়পত্রখানি একটু দেখিয়াই, খুব সম্ভব সবটা পড়েন নাই, ফেলিয়া দিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া—সেই চিরমধুর হাসি যাহা আশুতোষকে এ জীবনে যাহারা দেখিয়াছে তাহারা কখনও ভুলিতে পারিবে না—বলিলেন " তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া, তোমাদের আবার পরিচয়পত্র কি ? আমি ডেপুটিগিরির কথা বলিলে তিনি বিশেষ আপত্তি করিলেন, বলিলেন, তোমার জীবনটা তাহা হইলে একেবারেই মাটি হইবে। আমাকে তিনি আইন পড়িতে পরামর্শ দিলেন। পরবর্ত্তীকালে আশুতোষ অনেক ছাত্রকেই 'Research' করার জন্য উৎসাহিত করিতেন, কিন্তু আমাদের কাল পর্য্যন্তও—তখনও Post graduate class ভাল ভাবে গঠিত হইয়া উঠে নাই,—নাম মাত্র ছিল, তিনি অধিকাংশ যুবককেই উকীল হওয়ার জন্য পরামর্শ দিতেন। বেশ মনে আছে, এই উপলক্ষে তিনি ওকালতীর অবস্থা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন—বলিলেন ভাল ছেলেরা সকলেই যদি ডেপুটিগিরি ও অন্যান্য চাকরীতে যায় তাহা হইলে 'বারের' অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে। কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম যে 'Bar overcrowded'. তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। বেশী লোক থাকিলেই তাকে Overcrowded বলা যায় না। কিন্তু আগে যেমন বড় বড় উকীল অধিক সংখ্যায় ছিলেন এখন সেরূপ নাই। তাঁহার আমলের কয়েকজন বড় বড় উকীলের নাম করিয়া বলিলেন, তখনকার আমলে এত বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমকক্ষতা করিয়া তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইত! সে হিসাবে এখন তো ওকালতীতে উন্নতি করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার ডেপুটিগিরি প্রসঙ্গ সেইখানেই চাপা পড়িল। আর একদিন আমার পিতৃদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ কথা বলায় বলিলেন, তাঁর চেয়ে আপনার ছেলেকে হাত পা বেন্ধে হাওড়ার পোলের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিন্। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরে শুনিতে পাইলাম যে আমি ইউনিভার্সিটি হইতে নমিনেশন পাইয়াছি।

(৪)

১৯১৪ সনের প্রথমভাগের কথা। আমি তখন ঢাকা ট্রেণিং কলেজে কাজ করি, বন্ধুবর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এক পত্র পাইলাম। আমাকে আশুতোষের সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছে। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ছুটি লইয়া কলিকাতা গেলাম। সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ করিলাম। তখন আশুতোষ তাঁহার পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসের organisationএর কথা সকল ভাঙ্গিয়া বলিলেন এবং আমাকে প্রশ্ন করিলেন আমি আসিতে চাই কিনা। থিবো সাহেব আমার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন, তাঁহার মতামত শুনিয়াই আমাকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন এরূপ বলিলেন। আমি বলিলাম যে ইহার ভবিষ্যৎ কি? তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, দেখ ইহার ভবিষ্যৎ কি তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে যদি Post graduate Department থাকে এবং আমি বাঁচিয়া থাকি তবে তোমাদের ভাবনা নাই। আপাততঃ এক আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়াই তোমাকে সরকারী চাকরীর মায়া কাটাইয়া আসিতে হইবে। আর্থিক হিসাবে তোমার সুবিধা হইবে কিনা তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তোমার পড়াশুনার যে অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলিলেন যে অনেক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আমাকে Post graduate class করিতে হইতেছে। কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ কলেজের Principalএর নাম করিয়া বলিলেন যে, ইহারা তো প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিবে, গভর্ণমেণ্টও বিশেষ অনুকূল নহে, এ অবস্থায় আমি তোমাদিগকে খুব আশা ভরসা দিতে পারি না—সুতরাং তুমি সরকারী চাকরী ছাড়িয়া আসিবে কিনা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাল আমাকে জানাইও। পরদিন আমি জানাইলাম যে আমি তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই আসিতে রাজী আছি। খুব খুসী হইলেন, হাসিয়া বলিলেন যে বাঙ্গালের উপযুক্ত কথাই বটে।

কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলিলাম, কারণ অনেকের বিশ্বাস আছে যে আশুতোষের বাড়ীতে পুনঃ পুনঃ গতায়াত ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পাইবার উপায় ছিলনা। আমার পরে ইতিহাস বিভাগে যাঁহারা শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধে আমি নিজে এইটুকু বলিতে পারি যে আশুতোষের সহিত পূর্ব্বে তাঁহাদের এক প্রকার পরিচয় ছিলনা বলিলেই হয়, তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া চাকরীতে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(৫)

আমি যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হই সে সময়ে প্রবীণ অধ্যাপকেরা অল্পবয়স্ক সহযোগীদিগকে বড় কৃপার চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা এই প্রকার তরুণবয়স্ক সদ্য পাশ করা ছাত্রদিগকে চাকরী দেওয়াটা মোটেই পছন্দ করিতেন না। আশুতোষ সর্ব্বপ্রথম এই নীতি প্রবর্ত্তন করেন, মুখে তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে ভরসা করিতেন না, কিন্তু এই নূতন সহযোগিগণকে

উৎসাহদান করা তো দূরের কথা তাঁহাদের সফলতার প্রতিবন্ধকতা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আমি প্রথম কার্য্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া আমাকে মুসলমান যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াইতে দিলেন। এম্ এ পরীক্ষায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আমার বিশেষ পাঠ্য বিষয় ছিল, ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াই আমি প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি আমাকে ঐ বিষয়ে পড়াইতে দিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া আমি আশুতোষের শরণাপন্ন হইলাম এবং তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলাম। শুনিয়া তিনি কেবলমাত্র একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। মুখে বলিলেন যে, আচ্ছা তুমি বাড়ী যাও। ৩।৪ দিন পরে দেখিলাম নূতন Time table প্রস্তুত হইয়াছে। আশুতোষ পোষ্ট গ্রাজুয়েটের সকল বিভাগে হস্তক্ষেপ করিতেন বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু কেন করিতেন উপরের ঘটনা দ্বারা তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য প্রথমে অধ্যাপকদের হাতেই 'রুটিন্' তৈরী করিবার ভার ছিল এবং যে রুটিন্ অনুসারে আমাকে মুসলমান যুগের ইতিহাস পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল আশুতোষ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। কত মত ও সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যে আশুতোষ এই নবীন প্রতিষ্ঠানটিকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই জানিবার কোন সুযোগ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেন।

(৬)

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইবার মাসখানেক পরে সকালবেলা ময়দানে বেড়াইতে গিয়াছি। সকলেই জানেন প্রাতঃকালে বন্ধুগণের সঙ্গে ময়দানে বেড়ানটা আশুতোষের দৈনন্দিন কার্য্যের অন্যতম ছিল। আমিও প্রায়ই যাইতাম, সাক্ষাৎ হইলে দূর হইতেই নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়িতাম। সেদিন আমি যথারীতি নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছি, আশুতোষ ডাকিয়া বলিলেন শোন, একটা কথা আছে। তারপর তাহার সঙ্গিগণকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া একটু দূরে একটি গাছের তলায় দাঁড়াইলেন। সেখানে যাইয়া আস্তে অন্যে না শুনিতে পায় এরূপভাবে বলিলেন, "দেখ——(একজন প্রাচীন অধ্যাপক) তোমার নামে নালিশ করেছে, তুমি মন দিয়া পড়াও না, সময়মত ক্লাসে যাওনা ইত্যাদি"। আমি প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলাম—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি নিজেই বলিলেন তোমার প্রতি-বাদের প্রয়োজন নাই, আমি ঐ অভিযোগের এক কথাও বিশ্বাস করি না, জানইত বুড়ারা তোমাদের পছন্দ করে না, কেবল আমার ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। তোমাকে এ ঘটনাটা বলিলাম যাহাতে তুমি সাবধান হইয়া চলিতে পার, বলিয়াই আমাকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়াই তিনি বন্ধুগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। তারপর দশ বৎসরেরও অধিক কাল গত হইয়াছে কিন্তু আজও আমার মনে এই ঘটনাটি সুস্পষ্ট মুদ্রিত আছে। আজ যে সকল তরুণ যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই জানেন না যে কত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবীণ ও নবীনের বিরোধের আরও বহু দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে কিন্তু সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের উল্লেখ না করাই ভাল। এই সমুদয় বিরোধে আশুতোষ চিরদিনই নবীনের সহায় ছিলেন। পাখী যেমন শিশুশাবকগুলিকে ডানা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে—আশুতোষও তেমনি নবীন শিক্ষকগণকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। আশুতোষের বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী কালে যে এক দলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মূলে একটি প্রধান কারণ ছিল এই নবীনের পক্ষাবলম্বন হেতু প্রবীণের অসন্তোষ।

(৭)

তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পুস্তক খুব বেশী ছিল না; এইজন্য আমি প্রায়ই Imperial Library যাইতাম। একদিন আশুতোষ কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাকে প্রায়ই বিকালে হাইকোর্টের দিক হইতে ফিরিতে দেখি ব্যাপার কি? তদুত্তরে আমি Imperial Library যাওয়ার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বইয়ের এত অভাব—এতো ঠিক কথা নহে—আচ্ছা তুমি একটা বইয়ের তালিকা কর, আমি বই আনাইয়া দিব। তদনুযায়ী আমি এক তালিকা প্রস্তুত করিলাম—মোট মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকা হইল—একটু ভয়ে ভয়ে তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 'approved' বলিয়া লিখিয়া নাম সই করিয়া দিলেন—সেইদিনই বই কিনিবার জন্য Cambray কোম্পানির নিকট হুকুম গেল।

ইহার দুই তিন বৎসর পর একবার সংবাদ পাইলাম যে বিলাতে Burgessএর সমস্ত লাইব্রেরী বিক্রয় হইবে। Burgess বহুকাল ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাঁহার গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। এসব বই খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা না করিলে প্রায়ই পাওয়া যায় না; তাই আমি সংবাদ পাইবামাত্রই আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছুটিলাম। তখন বেলা প্রায় ৮টা, শুনিলাম তিনি তেতালায় কাজে নিযুক্ত আছেন কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না। আমি তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জানিতাম—তাই একখণ্ড কাগজে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য লিখিয়া চাকরের হস্তে পাঠাইয়া দিলাম। একটু পরেই আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। গিয়া দেখি স্তূপীকৃত গ্রন্থ ও কাগজের মাঝে তিনি একটা টেবিলের সামনে বসিয়া আছেন। সমুদয় ব্যাপার শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করিয়া ঐ বই কিনিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন।

(৮)

পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টের জন্য যখন নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয় (Chap XI.) তখন ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়। যখন সিনেটে এই নিয়মের আলোচনা হয় তখন স্বয়ং সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত কোন কোন বিষয়ে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সেই সময়ে আশুতোষ একপ্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কিসে এই নিয়মগুলি সিনেটে পাশ হইবে তাহার

চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর লোকের নিকট শুনিয়াছি অনেকদিন আহারের সময় অন্যমনস্কভাবে কোন কোন জিনিষ আহার করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তারপর সিনেটে পাশ হইলে এই নূতন আইনগুলি গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনের জন্য গেল—বিপক্ষপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল যে কোন রকমে সিনেটে দেরী করাইয়া দিতে পারিলে, গভর্ণমেণ্টের মত আসিতে দেরী হইবে সুতরাং সে বৎসর আর নূতন আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে না—বিপক্ষপক্ষের এই চেষ্টা কতকটা সফলও হইয়াছিল, তাই সময়মত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আসে কিনা ইহার জন্য আশুতোষ বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। বেশ মনে আছে একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, গিয়া শুনিলাম সেই দিনই বড়লাটের কৌন্সিলে ঐ আইন আলোচিত হইবে। আশুতোষকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখিলাম কারণ সেইদিন ঐ আইন পাশ না হইলে ঐ বৎসরে আর নূতন আইন অনুসারে কাজ করা যাইবে না—আর এক বৎসর দেরী হইলে কত রকম বাধা বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা। আশুতোষের ব্যবস্থা ছিল যে ঐ আইনগুলি পাশ হইলেই তাঁহার নামে টেলিগ্রাম আসিবে। তিনি সেই টেলিগ্রামের আশায় উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। তিনি বলিলেন, তোমরা বস, আজ টেলিগ্রাম না আসা পর্য্যন্ত আমার ঘুম হইবে না, ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে গল্প স্বল্প করি। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত আমি ছিলাম কোন খবর না আসায় আশুতোষ বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—বস্তুত তাঁহাকে এরূপ উদ্বিগ্ন সচরাচর বড় দেখি নাই। পরদিন শুনিলাম রাত দুপুরে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আশুতোষ সম্পূর্ণভাবে নিজের কাজের মতনই দেখিতেন Lord Harding যথার্থই বলিয়াছিলেন He made the University his own.

(৯)

কথা প্রসঙ্গে আশুতোষ তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা গল্প করিতেন। ইহার বেশীর ভাগই প্রধান প্রধান রাজপুরুষের সহিত ঝগড়া মারামারির কথা। তাঁহার মুখে এই সব পুরাণ কাহিনী শুনিতে বড় ভাল লাগিত। একদিন বলিয়াছিলাম যে আপনি এই সমুদয় একত্র করিয়া একটা memoirএর মত লিখিয়া গেলে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসের অনেক মালমশালা সংগ্রহ হইবে। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যে, হ্যাঁ এইবার ছেলে আর জামাই বড় হয়েছে তাদের সাহায্যে লিখে ফেলব। ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কিনা জানিনা। তাঁহার জীবনের অনেক ছোটখাট ঘটনার কথাও তিনি গল্প করিতেন। ইহার একটি উদ্ধৃত করিতেছি। আশুতোষ যখন ইউনিভার্সিটি কমিশন উপলক্ষে দারজিলিং ছিলেন তখন একবার সিনেট মিটিংএ উপস্থিত হইবার জন্য কলিকাতায় আসেন। গাড়ী ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বেই দার্জিলিং ষ্টেশনে আসিলেন। আমি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনার তো গাড়ী রিজার্ভ করাই আছে, আপনি এত সময় থাকিতে আসিলেন কেন ? বলিলেন ওহে ও বিষয়ে আমার ছোটকালের একটা ঘটনা বলি শোন তাহা

হইলেই বুঝিতে পারিবে। ঘটনাটির স্থূলমর্ম্ম এই যে আশুতোষের যখন ছয় সাত বৎসর বয়স তখন কলিকাতার বাহিরে কোন স্থানে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয়, আশুতোষ তাঁহার কাকার (অথবা ঐরূপ নিকট কোন আত্মীয় আমার ঠিক স্মরণ নাই) সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাইবেন স্থির হয় কিন্তু তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখেন যে গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে বালক আশুতোষের মনে যে ইহাতে বিষম কষ্ট হইল তাহা বলাই বাহুল্য। গল্পটি শেষ করিয়া আশুতোষ বলিলেন যে বাল্যকালে সেই ঘটনা হইতে আমি বরাবর গাড়ী ছাড়িবার অনেক আগে রেল ষ্টেশনে যাই।

(১০)

১৯২৪ সালের ৩রা মে প্রাতঃকালে আশুতোষ পাটনা হইতে কলিকাতা আসিবেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার আসিতে অনেক দেরী হইল ; কারণ ষ্টেশন হইতে সোজা বাড়ী না আসিয়া তিনি নবজাত পৌত্রকে দেখিবার জন্য বৈবাহিক ভবনে গিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া ঢাকার দুই একটা খবর জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে বলিলেন সন্ধ্যার পরে এসো অনেক কথা আছে। সন্ধ্যার পরে যাইয়া দেখিলাম বৈঠকখানায় অনেক ভিড় তিনি আমাকে দক্ষিণ দিকের নবনির্ম্মিত দ্বিতল কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দুইটি বৃহৎকায় টিনের বাক্সে পাটনার মোকদ্দমার কাগজ পত্রাদি ছিল তাহা দেখাইয়া বলিলেন তোমরা কি ইতিহাস পড়, দেখ একবার আমার মোকদ্দমার নথি, ২৪০০০ পৃষ্ঠা, ইহা পড়িতে ও বুঝিতে ছয় মাস লাগিয়াছে। আমি বলিলাম আপনার কিছু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তিনি বলিলেন হাঁ এই পাটনার মোকদ্দমাটা শেষ হইলেই বিশ্রাম লইব। তখন জানিতাম না যে এই মোকদ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিবেন।

তখন কথা ছিল আশুতোষ শিমলা কনফারেন্সে যাইবেন। আমিও সেখানে যাইতেছিলাম তাই সেই কনফারেন্সে তিনি যে কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করিবেন সেই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাব ছিল আমি সেই সম্বন্ধে তাহার মতামত জানিতে চাহিলাম। একটি ব্যতীত তিনি অন্য সকল কথাতেই বিশেষ সহানুভূতি জানাইলেন। তার পরে বলিলেন যে শীঘ্রই সুবিধামত একবার ঢাকায় যাইয়া আমরা কি করিতেছি না করিতেছি দেখিয়া আসিবেন। আমি ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলাম। তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত সংবাদ আসিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সিঁড়ি দিয়া একসঙ্গে একতলায় নামিয়া আসিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম, তিনি অভ্যাসমত আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা আবার শিমলায় শীঘ্রই দেখা হবে। বিদায় লইয়া আসিলাম তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই বিদায়ই জন্মের মত বিদায়। জানি না কোন পুণ্যফলে এই মহাপুরুষের স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলাম। তাঁহার স্নেহের ঋণ এ জন্মে পরিশোধ হইবার নয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা————শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(দ্বাদশ গীত)

নারীগণ।

মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক মিলন !
জীব, জীব, জীব,——নিত্য অটুট হোক বন্ধন।
পুণ্য-সুখ-শান্তি-তৃপ্তি-বিরাজিত ভবনে
শুভ্র জীবন করহ যাপন পুলক-মধু-পবনে——
চরণতলে রহুক বদ্ধ প্রণত ধন্য ধরণী,
সন্ততিকুল হউক পূজ্য বিশ্বমুকুটমণি ॥

[স্বরলিপি————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

সুর————সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী।

মিশ্র————ঠুংরী।

স্থায়ী।

II { ধর্সা সর্না | ধা -া I ধনা ধপা | মা -া | গপা মগা |
মং গল হো ক্ মং গল হো ক্ মং গল

| রাঃ রঃ I সরা -মপা | -ধা -া } | { র্সা র্সা | র্সা র্সনা I
হোক্ মি ল০ ০০ ০ ন্ জী ব জী ব০

I ধর্রা র্রা | -া -া | র্সা র্সনা | ধা পা I রগা -মগা |
জী০ ব ০ ০ নি ত্যঅ টু ট হো০ ক্ব

| -রঝা -া } II
ন্ধ ন্

অন্তরা।

II { পাঃ পঃ | পা পা I ধাঃ ধঃ | ণণা পা | ধধা -ণধা |
পু ণ্য সু খ শান্ তি তৃপ্ তি বিরা ০জি

| পা ধর্সা I র্সা -া | -া -া } | { র্সা র্সনা | ধণা ধপা I
ত ভব নে ০ ০ ০ শু ভ্র০ জী০ বন

I পধা পা | মপা মগা | পপা ধনর্সনা | ধপা মগা I রা -া |
কর হ যা০ পন পুল ক০০০ মধু পব নে ০

| -া -া } | { সসা রগমা | মা -া I পপাঃ পঃ | ধা -ধধা |
০ ০ চর ণ০ত লে ০ রঞ্ জ ক ব দ্ধ

| ধধধা ণধা | -ধপা ধধর্সা I র্সা -া | -া -া } | { র্সর্রা র্রর্রা |
প্র০ণ তধ ০ন্ধ ধর০ ণী ০ ০ ০ সন্ ততি

| র্রা র্রা I র্সর্সর্রা -গর্রা | র্সর্সা র্সর্সা | র্রা র্সর্সা | ণণা ণধা I
কু ল হউ০ ০ক পূ০ জ্য০ বি শ্ব মুকু টম

I পা -া | -া -া } II II
নি ০ ০ ০

নিবেদন।

১। পরিচয়ার্থ রাগিণীর নামকরণ সম্বন্ধে ১ম গীতের স্বরলিপির শেষে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। ঠুংরী তাল সম্বন্ধে ৫ম গীতের স্বরলিপির শেষে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

——লেখিকা।

তোমরা ও আমরা

(রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা "তোমরা এবং আমরা"র সুরে)

তোমরা হাসিয়া ভাসিয়া নাচিয়া যাও
মৃদুল-মধুর মলয় বায়ুর মত,
ফোটা কুসুমের সুরভি ছড়ায়ে দাও,
আধ-ফোটা ফুল আদরে ফোটাও কত
আজো আছে যারা কলিকা মুদিত আঁখি
পল্লবদলে সঙ্কোচে মুখ ঢাকি,
তারাও রয়েছে তোমাদের মুখ চেয়ে
হরষে ফুটিবে সরস পরশ পেয়ে!

অগ্নি-গিরির গভীর গুহায় বীণা
ঝটিকার মত আমরা হারাই পথ,
তোমাদের গতি নয়নে লাগায় ধাঁধা,
মরমে জাগায় হতাশের মনোরথ,
পিপাসায় ভরা ব্যাকুল বিকল প্রাণ,
যত উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসে অবসান,
হেলায় আমরা হারায়ে সোণার কাটি
গত-যৌবন জীবন করেছি মাটি!

তোমাদেরি তরে হেরি ঘরে ঘরে আজ
রচিত অর্ঘ্য, মঙ্গল ঘট পাতা,
নিখিল ভুবন পরেছে মোহন সাজ
কানন-কুঞ্জে গায় আগমনী-গাথা,
মান্য-অতিথি তোমরা হেথায় সবে,
যার পূজা ল'বে সেই ত ধন্য হ'বে,
বিফল জীবন যাহার তরণী, হায়,
না হ'ল হিরণ ও বর চরণ ঘায়।

পুষ্প-কাননে শুষ্ক তরুর প্রায়
দাঁড়ায়ে আমরা ফুল-পল্লব-হারা,
জড়ায় না লতা, বিহগ না গান গায়,
নাই যে জীবনে যৌবন রস-ধারা,
প্রাণের এ ভাঙা বাঁশরীর তানে আর
কিশোরীর মন করেনাক অধিকার,
মুগ্ধ চাহনি, অধরে হাসির লেশ
রাঙা ত করে না কাহারো গণ্ড-দেশ।

যৌবন-হারা আমরা বৃথায় আছি,
পদে পদে হেরি আমাদেরি পরাজয়,
প্রেমের সমরে তোমরা সব্য-সাচী,
হেলায়-খেলায় কর যে হৃদয়-জয়,
যত মধু আছে প্রেম-ভাণ্ডার-ভরা
করিও না দেবী, লুণ্ঠন কর ত্বরা,
যাইলে তোমার পলাইবে সুসময়,
জরা, ব্যাধি, কাল যৌবন করে ক্ষয়।

জানিও বন্ধু! আমাদেরো ছিল দিন,
হৃদয়-কাননে মৃগয়ার অধিকার,
আজিকার মত হইনি আয়ুধ-হীন,
স্মৃতিপটে আঁকা আজিও চিত্র তার;
অতীতের লাগি' করিনাক অভিমান,
জরা, যৌবন উভয়ই বিধির দান,
তবু মাঝে মাঝে নিশ্বাস পড়ে, হায়,
যৌবন সনে জীবন কেন না যায়।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধু সম্বন্ধে

সুভাষচন্দ্রের চিঠি*

Mandalay Central Jail.
12-8-25.

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"মাসিক বসুমতীতে" আপনার "স্মৃতিকথা" তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা,—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্কা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকেদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করিতে হয়।"—এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তাঁর অনুগত কর্ম্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগল "একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মাঝে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আর আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না।" বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে, তা' হ'লে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে?

আর একটী কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে। ......"আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধহয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মত-নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাটি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্যচরিত্র বিচার করতে দেখি নি। মানুষের ভালমন্দ

* সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সব চেয়ে বেশী ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যত বড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো—মার (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায়—"রাগ করিবার, অভিমান করিবার যায়গাও আজ আমাদের ঘুচিয়া গেছে।"

আপনি এক যায়গায় লিখেছেন "লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সে দিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলকাতায় ফিরি—তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্দ্ধসত্যে বাঙ্গলার সব খবরকাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই না—এমন কি আমাদের বক্তব্যটাও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় না। তখন স্বরাজ্য-ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব বেশী প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়টী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ব্বগৌরব ফিরে এল বাহিরের লোকে এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল—তখন আমরা কাজের কথা বলবারও সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ভাণ্ডারে অর্থ-সঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবরকাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জন-মত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল—তা' বাহিরের লোকে জানে না—বোধহয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্ম্মভার—এই দুইয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে তাঁর স্বদেশ-সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ ধরপাকড়ের সময়ে তিনি স্থিরসংকল্প করেছিলেন যে একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এরকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক

থেকে খুব নিম্ন স্তরেরই বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন তাই আমরা বলেছিলুম যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্ত্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধরে তর্কবিতর্ক চলে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারিনি। শেষে তিনি বলেন—"এটা আমার আদেশ; তোমাদের মত যাই হোক না কেন—আমার আদেশ পালন করতে হবে।" তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে তিনি পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠ কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কিনা—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হল। তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা—কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত না। কারণ একেই তিনি অসুস্থ তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষ সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব্বপ্রথমে ভোম্বল যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও ঊর্ম্মিলা দেবী যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে-মুহূর্ত্তে আসবে—তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজকে নিয়ে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে।

আমার মনে হয় যে মহাপুরুষদের মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের "বসুমতীতে" আমি দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ও অনুগত কর্ম্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের—এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ। কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হল তা' বলতে পারি না। * * * * দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্ম্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারিনা যে দেশবন্ধুর অকাল দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা এবং তাঁর অনুচরবর্গ কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা' হ'লে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হ'ত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকল্‌মা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার—শুধু আমার কেন এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না—অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মন্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। এখানে সুখে দুঃখে, স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে যে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয় বন্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ একটা শান্তি একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দারিদ্র্য এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাংলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছিলেন—

"সোনার বাঙ্গলা! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার চিত্ররূপ মানস চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মন্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে!

কেন এ পত্র লিখে ফেললুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব একথা আগে কখনও মনে আসে নি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসাতে লিপিবদ্ধ করলুম। আর যখন লিখেই ফেলেছি—তখন পাঠিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ

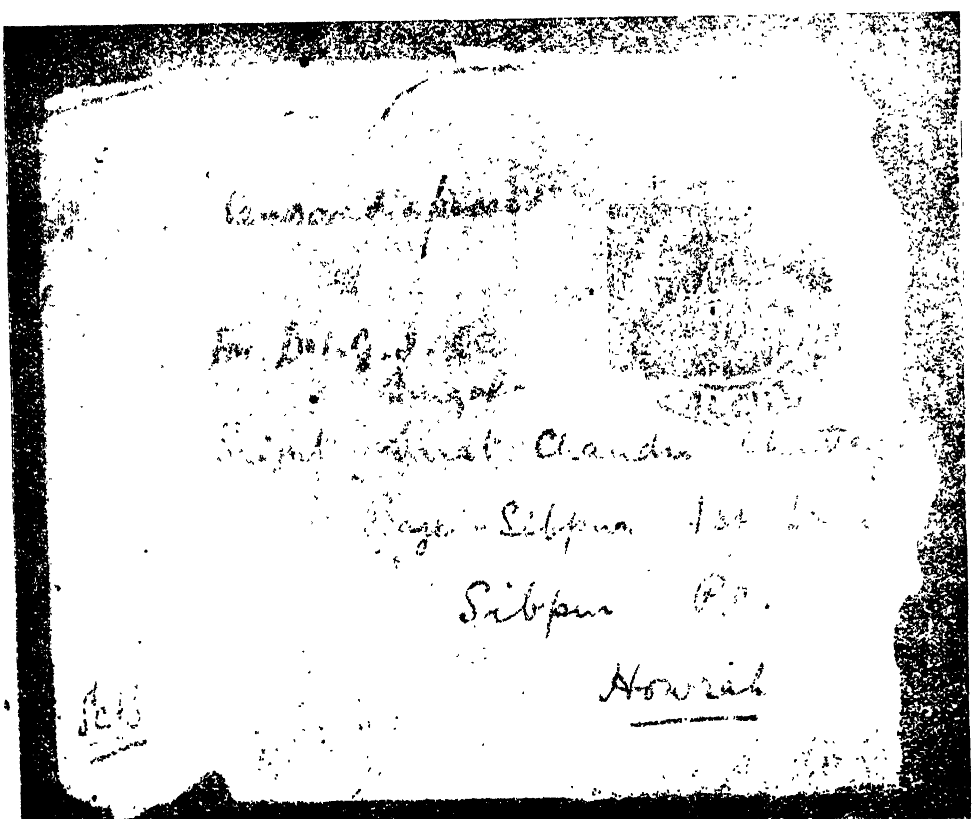
করবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয়—দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখিনা। যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C/o D. I. G., I. B., C. I. D.
13 Elysium Row.
Calcutta.

ইতি—

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু



পুস্তক পরিচয়

উৎপলা—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ মহাশয়ের "উৎপলা" নামক উপন্যাসখানি পাঠ করিলাম। "হেমেন্দ্রলাল," "সরমার সুখ" প্রভৃতি গল্প লিখিয়া ভবানীবাবু যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, "উৎপলা"য় তাহা শুধু সংরক্ষিত হয় নাই, বর্দ্ধিত হইয়াছে।

উপন্যাসখানি আমাদিগকে সেই যুগে লইয়া গিয়াছে, যে যুগে দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কলিঙ্গজয়ের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কলিঙ্গযুদ্ধ ভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পুনরভিনয়। এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ; কারণ এই মহাযুদ্ধের পর সমস্ত ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দয়া ও করুণার জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ অশোকরাজা নরহত্যার অনুশোচনায় যে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার দীপ্তিতে এক দীর্ঘযুগ ব্যাপিয়া ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অশ্রুর মৌক্তিক ঔজ্জ্বল্য বহু শিলালিপিতে এখনও দীপ্যমান হইয়া আছে।

ভবানীবাবু ধীরে ধীরে ভারতেতিহাসের সেই অধ্যায়ের যবনিকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের রমণী-দেহরক্ষীদের প্রসঙ্গে সেই কালের কথা মনে পড়ে, যখন স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ করিতেন এবং রাজাদের পার্শ্বরক্ষী নারী সৈন্যগণ শোভাযাত্রাকালে সৈন্যগণের পুরোভাগে গমন করিতেন। "সামান্ন ফল সুত্ত" নামক পালিগ্রন্থে মহারাজ বিম্বিসারের রমণী রক্ষীদের একটি কৌতুহলপ্রদ বিবরণ আছে। রমণী যোদ্ধৃগণ শুধু অস্ত্রচালনদক্ষ ছিলেন না, ইঁহারা অতিরিক্ত "মৈরেয়" পান করিতেন এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভিক্ষুর বক্ষে শূল হানিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। স্ত্রীলোকের প্রসাধন-সামগ্রীর মধ্যে গোরোচনা, মুক্তাজাল এবং সীমন্তমণি প্রভৃতির উল্লেখেও আবার সেই অতীত যুগের স্বপ্ন কল্পনাচক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। সেকালে পতিতারমণীদের গর্ভজাত মেয়েরাও কখনও কখনও উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া মহিলাসমাজে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিতেন। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ন্যায় এই আখ্যায়িকার অন্যতমা নায়িকা "মঞ্জুলা"ও আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী। কূপের জলে কোন সামান্য জিনিষ পড়িলেও আশঙ্কা হয়, তাহা বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু স্রোতের জল কত কি বহন করিয়া লইয়া যায়, অথচ তাহাতে অপবিত্রতার লেশ স্পর্শ করে না। জাতীয় জীবনের সেই প্রবল অভ্যুদয়ের যুগে পাপপুণ্যের বিচার কতকগুলি শুষ্ক নিয়মের 'নিক্তি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না; মানুষের দৃষ্টি যেন সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মের দিকে নিবদ্ধ ছিল,—পৌরোহিত্যের খুটনাটি সংস্কারে তখনও সমাজনীতি জটিল হয় নাই। গ্রন্থকার উৎপলার পার্শ্বে মঞ্জুলাকে দাঁড় করাইয়া উভয়কেই অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছেন। কুলবধূ ও "নগরশোভিনী" এক ছাঁচে ঢালা, বরঞ্চ মঞ্জুলার গৃহ বিদ্বজ্জন গুণিগণের সমাগমে অধিকতর মহিমান্বিত। এখনকার দিনে সমাজের সেই উদার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন পতিতাদের পথ নাই; আমরা তাহাদিগকে একেবারে কূপে নিক্ষেপ করিয়া চিরঅভিশপ্তা করিয়া রাখিয়াছি। যে পতিতা, সে চিরতরে অধঃপতিতা। মানবজাতির আতুড় ঘর অতি পবিত্র, সে স্থান হইতে চির সত্য, চির অনবদ্য, চির সুন্দরের নিত্য নিত্য জোগান হইতেছে। এখন আমাদের দেশে সেই আতুড় ঘরে শিশু অশেষ কুসংস্কার ও অসুবিধায় অভিশপ্ত হইয়া জন্মলাভে করে; ইহজীবনে সেই সংস্কারের গণ্ডী তাহার আর এড়াইবার কোনও পথ থাকে না। পতিতার আতুড় ঘরে এখন আর বসন্তসেনা, মঞ্জুলা, শকুন্তলার ন্যায় অনবদ্য রূপ, ও পবিত্রতার খনি লাভের আশা করা যায় না। এই পুস্তকখানি পড়িতে

পড়িতে আমরা প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরের অলিগলিতে পর্য্যটন করিবার সুবিধালাভ করিয়াছি এবং নানাবিধ সামাজিক সমস্যাও এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে উঠিয়াছে।

লেখক প্রেমের কথা দিয়া পুস্তকখানি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু সে প্রেমে এখনকার দিনের বিচিত্র ভঙ্গিমা ঢোকে নাই। আঙ্গুলের চাপ, কুন্তলের স্পর্শ ও মর্ম্মঘাতী কটাক্ষ—যাহাতে শরীরের ভিতর বিদ্যুৎ বহিয়া যায়, যাহাকে 'আর্ট' নাম দিয়া কোন কোন লেখক পাশব উত্তেজনাকে সভ্য ভব্য করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন,—ভবানীবাবু প্রাচীন ব্যক্তি—তিনি ফুলধনুর সেই সকল আধুনিক সন্ধানের বিষয়ে বোধ হয় ততদূর অবহিত নহেন। যাহা হউক, তজ্জন্য তাঁহার এবং তাঁহার পাঠকবর্গের পরিতপ্ত হইবার কারণ নাই। যেহেতু পুস্তকখানি আদ্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই গল্প সর্ব্বত্র কৌতূহল বজায় রাখিয়া পাঠককে ঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত সবলে টানিয়া লইয়া যাইবে। ফুলধনুর শরের প্রদাহ না থাকিলেও তাঁহার পঞ্চপুষ্পের সুঘ্রাণ ও আনন্দ ইহাতে যথেষ্ট আছে।

একটি কথা। আমাদের দেশের প্রেম বিবাহের পরেই জন্মিয়া থাকে। অন্ততঃ গত তিনশত বৎসর যাবৎ সামাজিক বিধানে পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রেমের কোনও অবকাশ আমাদের হয় নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম। বিবাহের পূর্ব্বের প্রেম যে খুব মনোমদ এবং বিবাহের পরের প্রেম বাসি ফুলের মত—তাহাতে চিত্তহরণ করিবার শক্তি নাই—একথা আমরা মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হই। কারণ আমাদের অনেকের জীবনের বহুদর্শিতা যাহা, সেই মহাসত্য শুধু কয়েকখানি বিলিতী উপন্যাস পড়িয়া অগ্রাহ্য করিব কিরূপে? বিবাহের পরের প্রেম লইয়া যদি গল্প রচনা করা হয়, তবে তাহাতে নকল করিবার দোষ থাকেনা,—নিজের চোখ দুটি খাটাইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিবার শক্তিলাভ হয়। কিন্তু এখনকার ঔপন্যাসিকেরা বিলিতী গল্প পাঠে মুগ্ধ। তাঁহাদের অনেকের মৌলিকতাও তাদৃশ নাই; সুতরাং তাঁহারা বিলাতী পুস্তকের নকলে বিবাহের পূর্ব্বের প্রেম লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। আমাদের সমাজে সে প্রেম আদৌ খাপ খায় না। এই জন্য শক্তিশালী ঔপন্যাসিককে এক হয় মুসলমান মহিলা আয়েষাকে অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা গড়মান্দারণের প্রাচীন কালের রাজনন্দিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বঙ্কিমবাবু শেষকালে ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী প্রভৃতি বিবাহিতা রমণীদিগকে নায়িকাস্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কারণ তাহারা যে ঘরের জিনিষ,—চোখ ভাঁড়াইয়া আর কতদিন চলে? কিন্তু সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীর, এবং ভ্রমর রোহিণীর কতকটা আড়ালে পড়িয়া গিয়াছেন। ভবানীবাবু এই বিবাহের পূর্ব্বের প্রেম জমাইয়া তুলিবার জন্য অতীতকালের মঞ্জুলার আবিষ্কার করিয়াছেন।

ভাবী সমাজ বিবাহের পূর্ব্বের এই সকল মিলনের অবাধ অধিকার দিবেন কিনা, জানি না। যদিও হিন্দুসমাজের মেয়েরা এখন বয়ঃস্থা হইয়াই বিবাহিতা হন, তাঁহাদের স্বামি-মনোনয়নের কোন সূচনাই দেখা যায় না। এই হিসাবে এই সকল প্রেমবর্ণনা শুধুই নকলবাজি; নতুবা নিছক কল্পনাপ্রসূত। আমি আমাদের সমাজের কথাই বলিতেছি; যে ক্ষুদ্র সমাজটির উপর পশ্চিমে হাওয়া খুব জোরে বহিতেছে, তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য নাই।

ভবানীবাবুর উপন্যাসখানি পড়িয়া আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার হাত পাকা; লেখার ভঙ্গী খুব 'দুরস্ত'—যদিও তাহাতে বঙ্কিমী ছাঁচটা বেশ টের পাওয়া যায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মধুমালতী।—কতকগুলি প্রণয়-কবিতার সমষ্টি—তরুণ কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ছাপা-কাগজ বাঁধাই অনিন্দ্য। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কবিতাগুলিতে মাধুর্য্য অফুরন্ত—ছন্দে বৈচিত্র্যের সহিত ঝঙ্কার আছে—পদগুলি কান্ত কোমল—শব্দগুলি ললিত ও লাবণ্যময়—পংক্তিগুলি এমনি শ্রুতিতর্পণ যে নয়নে নিদ্রার আবেশ আনিয়া দেয়—নেত্রপল্লব মুদিয়া আসে।

ইন্দ্রধনুর সাতরঙে রাঙা আজিকে পরাণ লীলাময়
বন্ধুর পথে ঝর ঝর ঝরে নির্ঝর,—সরে শিলাচয়।
উলসি বিলসি কূলে কূলে ভরা অসীমে চলেছে তটিনী
যৌবন যেন ধরেনা বক্ষে নৃত্যচপলা নটিনী।

* * * *

আমার নিশায় শুধু চাঁদ ওঠে খোলে তারকার বিপণি
শুধু জোৎস্নার গাঢ়ালো আবেশ মুখচেয়ে বুকে কাঁপনি।

ইত্যাদি শ্রুতিস্নায়ুমণ্ডলকে বিবশ করিয়া দেয়।

কবি নব প্রণয়ের মাধুর্য্য অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিয়াছেন তাহার প্রমাণ আছে পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে—

যুগল বাহুতে ঢাকিতে চাও যে মুছিবারে চাও
চোখের লজ্জা করি'
চেয়ে দেখ ঐ প্রেমের চিহ্ন রাঙিয়া উঠিল করপদ্মের
দুটী পল্লব ভরি'।

—চিত্রটি বড়ই সন্তর্পণে আলিখিত। একটি পংক্তিতে কেমন বিরহিণীর চিত্রটি প্রকট হইয়াছে দেখুন—

চোখের জলে তার কাজল মুছে গেছে,
আঁচলে মাথা শুধু কালি।

কবিতাগুলির মাধুর্য্য তাল্‌ী সুরাসারের মত সমস্ত গ্রন্থখানিতে ব্যাপ্ত হইয়া রচনার রসঘনতাকে শিথিল করিয়া রাখিয়াছে—রস মাঝে মাঝে জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই। এজন্য কবিতাগুলিকে আঙুরের গুচ্ছ বলিতে পারি না—এ যেন আঙুরের সরবৎ।

রচনায় কোনোখানে বন্ধুরতা, উচ্চাবচতা বা গ্রন্থিলতা নাই। এযেন এক হিসাবে গুণ—অন্য হিসাবে দোষও। নিরবচ্ছিন্ন সমতলতা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরিপন্থীও হইয়া থাকে। কবিতাগুলিতে নিস্তরঙ্গ হ্রদবক্ষের প্রসন্নতা আছে—কিন্তু তরঙ্গায়িত নদবক্ষের উল্লাস নাই।

অঙ্গের বন্ধুরতা মাত্রেই রসের প্রতিকূল নহে—একটি সুপক্ক আতা ভাঙিয়া মুখে দিলেই তাহা বোঝা যায়। আবার পক্ষান্তরে অঙ্গের চিক্কণতা বা মসৃণতা মাত্রই রসের পোষক নহে। মাকাল ফলই তাহার প্রমাণ।

অনবরত প্রয়োগের ফলে শব্দ বাক্য, পদাবলী মিল সমস্তই জীর্ণ ও নিস্তেজ রসহীন হইয়া পড়ে—এ সত্যটির প্রতি কবির দৃষ্টি থাকা উচিত। এবং আলঙ্কারিকতার দিকেও কবির মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

মোটের উপর কাব্যগ্রন্থখানি কাব্যকুঞ্জের মধুপগণের মধুপিপাসা যথেষ্ট নিবারণ করিতে পারিবে।—আর এ যেন প্রণয়দেবতার চরণে বাঙ্ময়ী অঞ্জলি।

শ্রীকালিদাস রায়

শিকার ও শিকারী—শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী প্রণীত ও ১৬১ বিডন ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত—২০৫ পৃষ্ঠা—১৫ খানি ছবি সম্বলিত—মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

মৈমনসিং জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার আচার্য্যচৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ বংশপরম্পরায় শিকার কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। এই বংশীয় স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যচৌধুরী একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। "শিকার কাহিনী" লিখিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যেও তাঁহার শিকার-কথার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজা সূর্য্যকান্তের অসম্পূর্ণ "শিকার কাহিনী"র পরে শিকার বিষয়ক এই শ্রেণীর অন্য কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বোধ হয় "শিকার কাহিনীর" পরে বঙ্গভাষায় শিকার বিষয়ক এই প্রথম পুস্তক। ব্রজেন্দ্রবাবু নিজেই শিকারী সুতরাং "শিকার ও শিকারী" যে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল—তাঁহার নিজেরই জীবনের শিকার বিষয়ক ঘটনার বিবৃতি—তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা উপন্যাস পাঠ করিলে আনন্দ লাভ করেন, এই শিকারের বিবরণ তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সময়ক্ষেপ নিরর্থক না হইয়া নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে সার্থক হইয়া উঠিবে। কারণ, ইহা কেবল শিকারীর ও তাঁহার শিকারের বিবরণে পূর্ণ নহে—অপিচ ইহাতে পশুপক্ষীর স্বভাব, আবাসভূমি, শিকারে ব্যবহৃত বন্দুকাদির বিবরণ এবং পশুভেদে ও স্থানভেদে শিকার প্রণালীর প্রভেদের কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা শিকারী, তাঁহারাও এই পুস্তক হইতে শিকার-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ, এই পুস্তক পাঠ করিলে মনে হয় বঙ্গসাহিত্যের নানা কারণে এই অনাদৃত বিভাগের পুষ্টিসাধনকল্পে ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে অনেক আশা করা যাইতে পারে।

বাংলার পাখী—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত,—ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত—১৮১ পৃঃ—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

বিজ্ঞান বিষয়ক শিশুসাহিত্যে জগদানন্দবাবুর অখণ্ড প্রতিপত্তি সর্ব্বজনসম্মত। তাঁহার অক্লান্ত লেখনী শিশুরঞ্জনের জন্য নিয়তই নিয়োজিত। তাঁহার এই সমস্ত সরল ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পড়িলে আজি-কালিকার শিশুদের সৌভাগ্যে হিংসা হয় ও মনে মনে আবার শিশু হইবার সাধ হয়। শিশুদের জন্য লিখিত জগদানন্দবাবুর এই "বাংলার পাখী" পড়িয়া এই পরিণত বয়সেও যে অনেক নূতন কথা শিখিলাম, তাহা অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্বীকার করিতেছি। জগদানন্দবাবুর লেখনী ও উৎসাহ অক্ষয় হউক।

মহাত্মাজীর চিঠি (১ম খণ্ড)—প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীকালীকুমার মিত্র জেলা হুগলী,—প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়,—৯০ পৃষ্ঠা, —মূল্য ॥০ আট আনা।

পুস্তকখানি ভারত-ধর্ম্ম গ্রন্থমালার অন্তর্ভূত। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে এই চিঠিগুলির অধিকাংশ পুত্র মণিলালকে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ৫৫ খানি চিঠির অনুবাদ আছে। মহাত্মাজীর পরিচয় কাহাকেও নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি, এই চিঠিগুলি হইতে তাঁহার হৃদয়ের ও সাধনার নূতন পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

মহাপ্রস্থান—হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বাস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত—২২২ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা মাত্র। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

ইহা একখানি উপন্যাস। কিন্তু আজ কাল বঙ্গসাহিত্যে প্রতিনিয়তই যে শ্রেণীর উপন্যাস বাহির হইতেছে—

বর্ত্তমান উপন্যাসখানি তাহা হইতে কতক পরিমাণে বিভিন্ন। ইহার একটা উদ্দেশ্য আছে—একটা সুনিয়ন্ত্রিত পন্থা আছে। নায়ক ভবানীপ্রসাদ আদর্শ নরপতি—শাসক ও শাসিতের সম্পর্কে মাধুর্য্য প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই ভবানীপ্রসাদের সৃষ্টি। কিন্তু ভবানীর পরিণাম সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভবানীর মহাপ্রস্থানের সার্থকতা কি? মহাপ্রস্থান না করিলে আখ্যানবস্তুর কি ক্ষতি হইত? আর, এই মহাপ্রস্থান দেখাইবার জন্য শেষ পরিচ্ছেদে সাঁওতালরাজের সৃষ্টিও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না—আখ্যায়িকার সহিত ইহা আদৌ মিশিতে পারে নাই। মথুরাসিংহ দরিদ্র অবস্থা হইতে গঞ্জাম-রাজ্যান্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা বীরসিংহের প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। মথুরার সহিত প্রথম পরিচয়ে দেখা গেল, মথুরা বীরসিংহের একজন বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মক্ষম কর্ম্মচারী। বীরসিংহের পতনে মথুরার বুদ্ধিকৌশলে ও কর্ম্মঠতায়ই বীরসিংহের পুত্র কন্যা রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং রায়পুরাধিপতি অমরসিংহের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থমধ্যে মথুরার সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে চিরকৃতজ্ঞ মথুরার ধ্যান-জ্ঞান রায়পুরাধিপতির সাহায্যে প্রভুর হৃত রাজ্যের উদ্ধার—এই উদ্দেশ্যে মথুরা বীরসিংহের কন্যা কল্যাণীর সহিত রায়পুরের যুবরাজের বিবাহ দিয়াছিলেন, নিজে রায়পুরপতির অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের বানপ্রস্থ অবলম্বন কালে মথুরাকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া গ্রন্থকার তাহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। দৃঢ় চরিত্র, বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞহৃদয় এবং প্রভুর রাজ্য উদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প মথুরার পক্ষে তাহা সুশোভন হয় নাই। প্রভুপুত্র অরুণসিংহকে ভবানীপ্রসাদের ত্যক্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কি মথুরাসিংহের সর্ব্বকর্ম্মের, সর্ব্ব উৎসাহের অবসান হইল? এইরূপ ভাবে মথুরার বানপ্রস্থ অবলম্বনে আখ্যানবস্তুরও ক্ষতি হইয়াছে। অমরসিংহ ও বীরসিংহকে অবলম্বন করিয়া গল্পের যে দুইটী বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আদৌ মিলিবার অবসর পায় নাই—তাহা বিযুক্তই রহিয়া গিয়াছে। ভবানীসিংহের মহানুভবতা, বিজয়সিংহকে সিংহাসন দান, মথুরাসিংহের বিশ্বস্ততা দেখাইবার জন্য বিজয় বা মথুরাকে অন্য রাজ্যের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া গল্পের একটা নূতন শাখার সৃষ্টির আবশ্যকতা ছিল না, তাহাদিগকে সহজেই অন্য কোনরূপে মূল গল্পের অন্তর্ভূত করা যাইত।

লীনার শিক্ষা—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত—২৪ নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট হইতে রায় এণ্ড রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী—মূল্য ১৷৵০ সাতসিকা। ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট।

পুস্তকখানি উপন্যাস—গল্প ও চরিত্র বিলাতী—পড়িতে মনোরম।

সংসারী—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত উপন্যাস। পাইকা অক্ষরে ছাপা—উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

বিজাতীয় ও বিদেশীয় প্রভাবে আমাদের অনাড়ম্বর শান্ত সংযত হিন্দুসংসারে একটা অভিনব পরিবর্ত্তন আসিয়াছে,—অনেক সংসারই আজ বিলাসের মোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শের এই সহসা পরিবর্ত্তন ভারতীয় ধন বিজ্ঞানের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। 'সংসারী'র লেখক অবশ্য সেই সমস্যার অনুশীলন ও সমাধানের জন্য উপন্যাস লেখেন নাই—তাহা হইলে উপন্যাসখানি ব্যর্থ হইত। তিনি আমাদের বর্ত্তমান যুগসন্ধির সাংসারিক জীবনের একটি অবিকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন এই সকল সংসারের নারীই একমাত্র কর্ত্রী—নারীই ভাগ্যনিয়ন্ত্রী। রমণীর সুবিবেচনা, সহৃদয়তা, মহত্ত্ব ও সুকৃতি ভিন্ন আজ কোন সংসারেরই উপায় নাই। গৃহসংসারের ধ্বংসের মূলে নারীরই হৃদয়হীনতা। নারীজীবনের দায়িত্ব ও গুরুত্বকে গল্পচ্ছলে লেখক সুকৌশলে

এই গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন। হিন্দুনারীগণ এই গ্রন্থপাঠে একটি উন্নত আদর্শের আভাস পাইবেন। গ্রন্থকার—শিল্পসাধনায় সর্ব্বত্র সুনীতি সুরুচি ও সংযমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

"ঝলক"—লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাস্যরসিক কবি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটকের কৌতুক কবিতা সংগ্রহ। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সতীশবাবু বঙ্গসাহিত্যে রসরচনার জন্য প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন,—৺দ্বিজেন্দ্রলালের আমার 'জন্মভূমি'র গানের প্যারডি 'আমার কর্ম্মভূমি' সঙ্গীতের সহিত পরিচিত নহেন, এমন অরসিক, শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে বোধ হয় কেহই নাই; এই সংগ্রহে তাঁহার ২।১টী সুন্দর প্যারডিও আছে। তন্মধ্যে 'পতিতোদ্ধারিণী টক্কে' নামক প্যারডিকে বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বেই আমরা সমাদর করিয়াছি। এ সংগ্রহের অধিকাংশ কবিতাই রসোজ্জ্বল—সতীশবাবু যখন হাসান—তখন অট্টহাস্যের ফেনিলতা সৃষ্টি করেন না, অট্টহাস্য সৃষ্টিও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। সতীশবাবুর কবিতায় যে হাসি পায় তাহাতে সংযম ও সম্ভ্রম আছে।—সে হাস্যের 'রেশ' বহুক্ষণ স্মৃতিতে থাকিয়া যায়। মনে এমন একটা প্রসন্ন মাধুর্য্যের সৃষ্টি হয়—যাহা মন হইতে সহজে দূরে যাইতে চাহে না। কবিতার কারু কৌশলের বিচিত্রতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কবি কৌতুকের উপাদান রাখিয়া দেন,—সেজন্য যাঁহারা হাসিতে জানেন অথচ রসসাহিত্য বুঝেন না, তাঁহারা হাসিবার তত সুযোগ পান না।

"কমলের দুঃখ"—শ্রীসত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ২৲ টাকা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "নারায়ণ" যখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল—তখন সত্যেন্দ্রবাবু ছিলেন "নারায়ণে"র একজন শ্রেষ্ঠ সেবক। তখন সত্যেন্দ্রবাবু একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্য-সেবী বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হ'ন। বঙ্গীয় পাঠকের মুখে তাঁহার যত যশ, তত নিন্দা; কেহবা গুণগানে দশকণ্ঠ—কেহবা দোষ কীর্ত্তনে সপ্তজিহ্ব। আলোচ্য গ্রন্থখানি নারায়ণে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপন্যাসখানির বৈশিষ্ট্য লেখকের অভিনব ভঙ্গিতে। লেখক পরিচ্ছেদ বিভাগ না করিয়া উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর পত্র বিনিময়চ্ছলে আদ্যন্ত আখ্যান বস্তুকে সাজাইয়া গিয়াছেন। লেখক ও পাঠকের কল্পনার সহযোগিতায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণাঙ্গ। লেখক পত্রগুলি পর পর সাজাইয়া গিয়াছেন। আপন মন হইতে যোগসূত্রটি আদায় করিয়া পাঠককে ঐ পত্রগুলিকে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। এরূপ রচনাভঙ্গি ব্যঞ্জনাময়, পাঠকের যথেষ্ট দায়িত্ব সূচনা করে।

লেখক কিন্তু পাঠককে দায়িত্বের ভাগ দিতে তত রাজী হন নাই—অর্থাৎ পাঠকের কল্পনাশক্তিকে তেমন মর্য্যাদা তিনি দেন নাই—ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতগুলির উপর নির্ভর না করিয়া নিঃশেষ করিয়া সমস্তটুকু বলিয়া ফেলিবার লোভ ও মুখরতা সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যে যোগসূত্রটি পাঠকের মনের চরকা হইতে জন্মিলেই ভাল হইত—তাহা তিনি নিজেই যোগাইয়াছেন। তাহাতে কলাচাতুর্য্য মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মাঝে মাঝে উপন্যাসের একটী সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদকেই রীতিরক্ষার জন্য পত্র বলিয়া চালাইয়াছেন। কোন' কোন' পত্রে এত বেশী বাগ্মী ও মুখর—এমন কি ভাষাপ্রয়োগ অসংযত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা পত্রও নয়, সাধারণ পরিচ্ছেদও নয়। বাগ্‌বাহুল্য পত্রবাহুল্যের ন্যায় রসের ফুল ও কলাচাতুর্য্যের ফল দুই-ই ঢাকিয়া দিয়াছে।

উল্লিখিত ত্রুটীসত্বেও "কমলের দুঃখ" উপন্যাসখানিতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অনেক লক্ষণই বিদ্যমান আছে। লেখকের চরিত্রাঙ্কণে ও চরিত্রমালার সামঞ্জস্য রক্ষণে কৃতিত্ব আছে—মনস্তত্ব বিশ্লেষণে ও লোকচরিত্র পরিদর্শনে শ্যেনদৃষ্টি আছে। অকুণ্ঠিত ও সুস্পষ্ট ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিবার এমন ক্ষমতা অতি অল্পলেখকেরই দৃষ্ট

হয়। সসাহস তেজস্বিতা ও অসঙ্কোচ ওজস্বিতা গ্রন্থখানিকে একটা রূঢ় কঠোর স্বাস্থ্য দান করিয়াছে। লেখকের ভাষায় অগাধ অধিকার,—ভাষা যেন শ্লথবল্গা অশ্বিনীর ন্যায় ছুটিয়াছে। লেখকের এই ভাষার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয়—তিনি যদি সংযম ও সুরুচির প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন—তাহা হইলে তিনি এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিতেন।

ছোটপাতা—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, রায় এণ্ড রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৫৪পৃঃ—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

পুস্তকখানি সৌরীন্দ্রবাবুর পাকা হাতের লেখা উপন্যাস—ইহা সহরের বস্তীর একটা করুণ চিত্র। বর্ত্তমান সময়ের এই সুপ্রতিষ্ঠ লেখকের সমাজের এই অনাদৃত অংশে যে দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা অত্যন্ত আশার কথা। যতই কল্পনার তুলির পরশ থাকুক মঙ্গলা, নকুল, অধব ও বাড়ীওয়ালী বাস্তব চিত্র—কিন্তু বিশাখা ও নরেশের উপর কল্পনার রং যেন একটু বেশী ধরিয়াছে। পুস্তকখানি সুলিখিত, সুখপাঠ্য ও মর্ম্মস্পর্শী।

ব্যথিত জীবন—শ্রীরামসত্য মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও ১৫নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট্, বাগবাজার হইতে শ্রীনেংটাশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—৩২১ পৃঃ,—মূল্য ২৲ দুই টাকা।

এখানি একখানি উপন্যাস। পড়িতে ভাল লাগে, আখ্যান বস্তু কৌতূহলোদ্দীপক। ঘটনাস্থল,—রাজপুতানা, ও চরিত্রগুলি—রাজপুত বটে—কিন্তু পড়িবার সময় বাঙ্গালীর পারিবারিক চিত্রই সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, বাঙ্গালী মেয়ে, বাঙ্গালী বধূ এবং বাঙ্গালী গৃহিণীর কথাই স্মরণ হয়। দিল্লীর কারাগার হইতে সীতারামজীর এবং উদয়পুরের বন্দীবাস হইতে ঊর্ম্মিলার পলায়ন-বৃত্তান্ত পড়িলে, আকবর বাদশাহের বন্দীশালার পাহারার ব্যবস্থা ভাল ছিল না, বলিতে হইবে।

পথের দাবী*

(২৬)

আজ শনিবার, শশী ও নবতারার বিবাহের দিন। শশীর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া কোন এক সময়ে যেন ডাক্তার ভারতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আজ তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। পঞ্চমীর খণ্ডচন্দ্র সেইমাত্র গাছের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ভারতী একখানা কালো র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার সেই জনশূন্য ঘাটের একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভারতী আরোহণ করিয়া বলিল, কত-কি যে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আসছিলাম তার ঠিকানা নেই। জানি, আমাকে না বলে তুমি কিছুতেই চলে যাবে না, তবুত ভয় ঘোচেনা। ক'দিনই বা, কিন্তু, মনে

হচ্ছিল যেন কত যুগ তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি, দাদা। আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে চীনেদের দেশে চলে যাবো তা' বলে রাখ্‌চি।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, আমিও বলে রাখ্‌চি তুমি নিশ্চয়ই ওরকম কিছু করবার চেষ্টা করবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এইটুক ত বেশ যাওয়া যাবে কিন্তু বড় নদীতে পড়ে উল্টো স্রোত ঠেলে পৌঁছতে আজ আমাদের ঢের দেরি হবে।

ভারতী কহিল, হ'লই বা। এম্‌নি কি শুভকর্ম্মে যোগ দিতে চলেছ, যে সময় বয়ে গেলে ক্ষতি হবে? আমার ত যাবার ইচ্ছেই ছিলনা,—শুধু তুমি যাচ্চো বলেই যাওয়া। কি বিশ্রী নোঙ্‌রা কাণ্ড বলত!

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, শশীর নবতারার সঙ্গে বিয়ে অনেকের সংস্কারে বাধে, হয়ত বা, দেশের আইনেও বাধে। কিন্তু সে দোষ ত শশীর নয়, আইন করা না-করার জন্য দায়ী যারা, অপরাধ তাদের। আমার একমাত্র ক্ষোভ শশী আর কাউকে যদি ভাল বাস্‌তো ভারতী।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, শশী বাবু না-হয় আর কাউকে ভালবাস্‌লেন, কিন্তু সে বাস্‌বে কেন? ওর মত মানুষকে সজ্ঞানে কোন মেয়েমানুষ ভালবাস্‌তে পারে এ তো আমি ভাব্‌তেই পারিনে দাদা। আচ্ছা তুমিই বল, পারে?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, ওকে ভালবাসা শক্ত বই কি। তাই ত রয়ে গেলাম তাকে আশীর্ব্বাদ করব বলে। মনে হল, সত্যকার শুভ কামনার যদি কোন শক্তি থাকে শশী যেন তার ফল পায়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক গভীরতায় ভারতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শশী বাবুকে তুমি বাস্তবিক ভালবাসো, না, দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ।

কেন?

তোমাকেই বা কেন এত ভালবাসি তারই কি কারণ দিতে পারি দিদি? বোধহয় এম্‌নিই।

ভারতী আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, তোমার কাছে কি তবে আমরা দুজনে এক? কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যে বলিল, তবু ত নিজের দামটা এতদিনে টের পেলাম। চল, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে এখন খুসি হয়ে তাঁদের আশীর্ব্বাদ—না না, প্রণাম করে আসি গে।

ডাক্তারও হাসিলেন, বলিলেন, চল।

জোয়ারের আশায় নদীর এপারে কোথাও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিরাপদ নহে, তাই ভাঁটা ঠেলিয়া কষ্ট করিয়াই চলিতে হইল। খাঁড়ির মুখে একখানা জাপানী জাহাজ কিছুদিন হইতে

বাঁধা ছিল, সেই স্থানটা নিঃশব্দে পার হইয়া ভারতী কথা কহিল। বলিল, এই কয়দিন থেকে থেকে কেবলি মনে হোতো, দাদা, সমুদ্রের যেমন তল নেই, তোমারও তেমনি তল নেই। স্নেহ বল, ভালবাসা বল, কিছুই তোমাতে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সবই যেন কোথায় তলিয়ে চলে যায়।

ডাক্তার বলিলেন, প্রথমতঃ, সমুদ্রের তলা আছে সুতরাং উপমা তোমার এ ক্ষেত্রে অচল।

ভারতী কহিল, এই নিয়ে বোধহয় তোমাকে একশ বার বোললাম যে, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর আপনার কেউ নেই,—তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কিন্তু এ কথা তোমার কানেই পৌঁছল না। আর পৌঁছবে কি করে দাদা, হৃদয় ত নেই। আমি ঠিক্ জানি একবার চোখের আড়াল হ'লে তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, না। তোমাকে নিশ্চয় মনে থাক্‌বে।

ভারতী প্রশ্ন ক'রল, কি আশ্রয় করে আমি সংসারে থাক্‌বো?

ডাক্তার বলিলেন, ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে। স্বামী, ছেলেপুলে, বিষয় আশয়, ঘরদোর—

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, আমি যে অপূর্ব্ববাবুকে একান্তভাবেই ভালবেসেছিলাম এ সত্য তোমার কাছে গোপন করিনি; তাঁকে পেলে একদিন যে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে যেতো এ কথাও তুমি জানো,—তোমার কাছে কিছু লুকোনোও যায় না,—কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি অপমান করবে কিসের জন্যে?

ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, অপমান! অপমান ত তোমাকে আমি এতটুকু করিনি, ভারতী।

সহসা অশ্রু-আভাসে ভারতীর কণ্ঠ ভারি হইয়া উঠিল, কহিল, না, করনি বই কি! তুমি জানো কত শত-সহস্র বাধা, তুমি জানো তিনি আমাকে গ্রহণ করতেই পারেন না,—তবুও তুমি এই সব বল্‌বে!

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এই ত মেয়েদের দোষ। তারা নিজেরা একদিন যা' বলে অপরে তাই আর একদিন উচ্চারণ করলেই তারা তেড়ে মারতে আসে। সেদিন সুমিত্রার কথায় বল্‌লে সে কাকে যেন একদিন পায়ের তলায় টেনে এনে ফেল্‌বে, আর আজ আমি তারই পুনরাবৃত্তি করায় কান্নায় গলা তোমার বুজে এলো!

ভারতী চোখ মুছিয়া বলিল, না, তুমি কখ্‌খনো এসব কথা আমাকে বল্‌তে পাবেনা।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, বোল্‌বনা। কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে যদি ফিরে আসি বোন্, এই আমারই পায়ের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে স্বীকার করতে হবে,—দাদা, আমার কোটী কোটী অপরাধ হয়েছে,—নিশ্চয় তুমি হাত গুণ্‌তে জানো, নইলে আমার সৌভাগ্যের এতবড় সত্যি কথা তখন বলেছিলে কি করে!

ভারতী ইহার উত্তর দিলনা। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া তিনি পুনশ্চ কথা কহিলেন। এবার কোথা দিয়া যেন কণ্ঠস্বরে তাঁহার অপরূপ সুর মিশিল, বলিলেন, সেরাত্রে সুমিত্রার কথা যখন বল্‌ছিলে, ভারতী, আমি জবাব দিতে পারিনি। এ পথের পথিক নই আমি, তবু তোমার মুখের সুমিত্রার কাহিনীতে গায়ে আমার বার বার কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো! দুনিয়া ঘুরে অনেক বস্তুরই হদিস্ পেয়েছি, পেলামনা শুধু এই নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব! দিদি, অসম্ভব বলে শব্দটা বোধ হয় সংসারে কেবল এদেরই অভিধানে লেখেনা।

এ কথায় ভারতী লেশমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলনা। উদাস নিঃস্পৃহ স্বরে বলিল, তোমার বাক্যই সত্য হোক্, দাদা, ও শব্দটা তোমাদের অভিধান থেকে যেন মুছে যায়। সুমিত্রাদিদির অদৃষ্ট যেন একদিন প্রসন্ন হয়। একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার নিজের কিন্তু ওতে আর আনন্দ নেই, ও আমি আর কামনাও করিনে। এই বলিয়া সে পুনরায় ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অপূর্ব্ববাবুকে আমি যথার্থই ভালবাসি। ভাল হোক্, মন্দ হোক্, তাঁকে আর আমি ভুল্‌তে পারবোনা। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘর সংসার না করতে পেলেই জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে কিসের জন্যে? এ আমার শোকের কথা নয় দাদা, তোমাকে অকপটে যথার্থই বল্‌চি আমাকে তুমি শান্তমনে আশীর্ব্বাদ করে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাও,—তোমার মত আমিও পরের কাজেই এ জন্মটা আমার সার্থক করে তুলব। নাওনা দাদা, তোমার নিরাশ্রয় ছোট বোন্‌টিকে সাথী করে!

ডাক্তার নিঃশব্দে তরী বাহিয়া চলিলেন, এতবড় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, সে এই নীরবতায় আশান্বিতা হইয়া উঠিল। এবার তাহার কণ্ঠস্বরে সস্নেহ অনুনয়ের নিবিড় বেদনা যেন উপচিয়া পড়িল, বলিল, নেবে দাদা সঙ্গে? তুমি ছাড়া এ আঁধারে যে এক ফোঁটা আলোও আর কোথাও দেখ্‌তে পাইনে!

ডাক্তার ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, অসম্ভব ভারতী। তোমার কথায় আজ আমার জোয়াকে মনে পড়ে; তোমারই মত তার অমূল্যজীবন অকারণে নষ্ট হয়ে গেছে! ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোনদিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা? এর জন্যে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারবনা বোন্, তোমার মধ্যে যে-হৃদয় স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্য্যে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহু ঊর্দ্ধে চলে গেছে,—তার নাগাল আমি হাত বাড়িয়ে পাবোনা।

ভারতীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সব্যসাচীর গভীর অন্তরের একটা অপরূপ মূর্ত্তি সে যেন সহসা চক্ষে দেখিতে পাইল। ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হইয়া কহিল, আমিও ত

তাই ভাবি দাদা, তোমার অজানা সংসারে কি আছে ! আর তাই যদি হোলো, কি হেতু তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছো ? দেশে-বিদেশে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করে বেড়ানো তোমার কিসের জন্যে ? মানবের চরম কল্যাণ ত কোনদিনই এর মধ্যে থেকে হতে পারবেনা।

ডাক্তার বলিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু চরম কল্যাণের ভার আমরা বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যের মধ্যে যে সামান্য কল্যাণ তারই চেষ্টাতে নিযুক্ত আছি। নিজের দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে কথা কওয়া, স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে বেড়ানোর অতি তুচ্ছ অধিকার,—এর অধিক সম্প্রতি আর আমরা কিছুই চাইনে ভারতী।

ভারতী কহিল, সে তো সবাই চায় দাদা। কিন্তু তার জন্যে নরহত্যার ষড়যন্ত্র কিসের জন্যে বল ত ? কি তার প্রয়োজন ? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কারণ, এ অভিযোগ শুধু রূঢ় নয়, অসত্য !

তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তচিত্তে কহিল, আমাকে মাপ কর দাদা, এ মিথ্যে আমি শুধু রাগের ওপরেই বলে ফেলেছি। আমাকে তুমি ফেলে চলে যাবে—এ যেন আমি ভাবতেই পারচিনে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা' আমি জানি।

ইহার পরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। এই সময়ে কিছুদিন হইতে 'স্বদেশী' আন্দোলন ভারতবর্ষব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল ! ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধারকল্পে আইন বাঁচাইয়া যে সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহারই সারাংশ সংবাদপত্র-স্তম্ভে মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া ভারতী সশ্রদ্ধবিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত। বিগত রাত্রে এম্‌নি ধারা কি একটা রোমাঞ্চকর রচনা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া অবধি তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার তপ্ত বাতাস সারাদিন ধরিয়া আজ বহিয়া ফিরিতেছিল। তাহাই স্মরণ করিয়া কহিল, আমি জানি ইংরাজ রাজত্বে তোমার স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত দুনিয়াই ত তাদের নয়। সেখানে গিয়ে তোমরা ত সরল, প্রকাশ্যভাবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করতে পারো। প্রশ্ন করিয়া ভারতী উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে বটে, কিন্তু বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি মনে মনে তুমি হাস্‌চো। কিন্তু, তুমি এবং তোমার বিভিন্ন দলগুলিই ত শুধু নয়, আরও যাঁরা দেশের কাজে,—তাঁরা প্রবীণ, বিজ্ঞ, রাজনীতিতে যাঁরা,—আচ্ছা দাদা, কাল্‌কের বাঙ্‌লা খবরের কাগজটা—

বক্তব্য শেষ হইল না, ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, রক্ষে কর ভারতী, আমাদের সঙ্গে তুলনা করে পূজনীয়গণের অমর্য্যাদা কোরো না।

ভারতী কহিল, বরঞ্চ, তুমিই তাঁদের বিদ্রূপ কোরচ।

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, মোটে না। তাঁদের আমি ভক্তি করি, এবং দেশোদ্ধারের বক্তৃতা তাঁদের আমাদের চেয়ে সংসারে কেউ বেশি উপভোগ করে না।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, পথ তোমাদের এক না হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ত একই।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, এতক্ষণ হাস্‌ছিলাম সত্যি, এবার কিন্তু রাগ কোরব ভারতী। পথ আমাদের এক নয় এটা জানা কথা, কিন্তু লক্ষ্য যে আমাদের তার চেয়েও অধিক স্বতন্ত্র এ কি তুমিও এতদিন বোঝনি? পৃথিবীর বহুজাতিই স্বাধীন,—তার চেয়ে বড় গৌরব মানব জন্মের আর নেই, সেই স্বাধীনতার দাবী করা, চেষ্টা করা ত ঢের দূরের কথা, তার কামনা করা, কল্পনা করাও ইংরাজের আইনে ভারতবাসীর রাজদ্রোহ। আমি সেই অপরাধেই অপরাধী! চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। সুতরাং, আইনের বাইরে এই সব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা ত কোন দিন কোন কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশে মাঞ্চু রাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরাজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখ্‌তে হবে, এঁরা টিকির বিরুদ্ধে তখন কোনমতেই বে-আইনি প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে, একে সওয়া দু'হাত করে দেওয়া হোক্! এই বলিয়া তিনি নিজের রসিকতায় উৎফুল্ল হইয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্যে নদীর অন্ধকার নীরবতা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন। হাসি থামিলে ভারতী কহিল, তুমি যাই কেন না বল তাঁরাও যে দেশের নমস্য ন'ন এ কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আমি সকলের কথাই বল্‌চিনে, কিন্তু সত্য সত্যই যাঁরা রাষ্ট্রনীতিবিদ্ যথার্থই যাঁরা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের সকল শ্রমই ব্যর্থশ্রম, এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা কঠিন। মত এবং পথ বিভিন্ন বলেই কাউকে ব্যঙ্গ করা সাজে না।

তাহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার চুপ করিলেন। পিছন হইতে একটা ষ্টিম লঞ্চ যথেষ্ট শব্দ-সাড়া করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণীকে রীতিমত দোল দিয়া বাহির হইয়া গেলে সব্যসাচী ধীরে ধীরে বলিলেন, ভারতী, তোমাকে ব্যথা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার নমস্যগণকে উপহাস করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তাঁদের রাজনীতি বিদ্যার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও আমার ভক্তি কম নেই, কিন্তু কি জানো দিদি, গৃহস্থ গরুকে যখন খাটো করে বাঁধে, তখন তার সেই ছোট্ট দড়িটুকুর মধ্যে নীতি একটি মাত্রই থাকে। আমি সেইটুকু মাত্রই জানি। গরুর একান্ত নাগালের বাইরে খাদ্যবস্তুর প্রতি প্রাণপণে গলা এবং জিভ বাড়িয়ে লেহন করার চেষ্টার মধ্যে অবৈধতা কিছুমাত্র নেই, এমনকি অত্যন্ত আইনসঙ্গত। উৎসাহ দেবার মত হৃদয় থাক্‌লে দিতেও পারো, রাজার নিষেধ নেই, কিন্তু বৃষের এই আন্তরিক প্রবল উদ্যম বাইরে থেকে যারা দেখে, তাদের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, তুমি ভারি দুষ্টু। বলিয়াই আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু এ আমি ভেবে পাইনে, প্রাণ যার অহর্নিশি সরু সুতোয় ঝুল্‌চে সে কি করে হাসি-তামাসা করে পরের কথা নিয়ে।

ডাক্তার সহজকণ্ঠে বলিলেন, তার কারণ, এ সমস্যার মীমাংসা পূর্ব্বেই হয়ে গেছে,

ভারতী, যেদিন বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েছি। আর আমার ভাব্‌বারও নেই, নালিশ করবারও নেই। আমি জানি, আমাকে হাতে পেয়েও যে রাজশক্তি ছেড়ে দেয়, হয় সে অক্ষম উন্মাদ, নয় তার ফাঁসি দেবার দড়িটুকু পর্য্যন্ত নেই।

ভারতী বলিল, তাইত আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তে চাই দাদা। আমি উপস্থিত থাক্‌তে তোমার প্রাণ নিতে পারে সংসারে এমন কেউ নেই। এ আমি কোন মতেই হতে দেব না। বলিতে বলিতেই গলা তাহার চক্ষের পলকে ভারি হইয়া আসিল।

ডাক্তার টের পাইলেন! নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, নৌকোয় জোয়ার লেগেছে ভারতী, পৌঁছাতে আর আমাদের দেরি হবে না।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু কহিল, মরুক্‌গে। কিছুই আমার ভাল লাগ্‌চে না। মিনিট দুই পরে জিজ্ঞাসা করিল, এত বড় রাজশক্তিকে তোমরা গায়ের জোরে টলাতে পারো একি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর দাদা?

দ্বিধাহীন উত্তর আসিল, করি, এবং সমস্ত মন দিয়ে করি। এতবড় বিশ্বাস না থাক্‌লে এতবড় ব্রত আমার অনেকদিন পূর্ব্বেই ভেঙ্গে যেত।

ভারতী বলিল, তাই বোধ হয় ধীরে ধীরে তোমার কাজ থেকে আমাকে বার করে দিচ্চ,—না দাদা?

ডাক্তার স্মিতহাস্যে বলিলেন, না, তা নয় ভারতী। কিন্তু, বিশ্বাসই ত শক্তি, বিশ্বাস না থাক্‌লে সংশয়ে যে কর্ত্তব্য তোমার পদে পদে ভারাতুর হয়ে উঠ্‌বে। সংসারে তোমার অন্য কাজ আছে বোন্‌—কল্যাণকর, শান্তিময় পথ, যা তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কর,—তাই তুমি করগে।

অপরিসীম স্নেহবশেই যে এই লোকটি তাহার একান্ত বিপদসঙ্কুল বিপ্লব-পন্থা হইতে তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে চাহিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া ভারতীর সজল চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া উঠিল। অলক্ষ্যে, অন্ধকারে, ধীরে ধীরে মুছিয়া বলিল, দাদা, আমার কথায় কিন্তু রাগ করতে পাবেনা। এতবড় রাজশক্তি, কত সৈন্যবল, কত উপকরণ, যুদ্ধের কত বিচিত্র ভয়ানক আয়োজন, তার কাছে তোমার বিপ্লবি-দল কতটুকু? সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়েও ত তোমরা ছোট। এর সঙ্গে তোমরা শক্তি পরীক্ষা করতে চাও কোন্‌ যুক্তিতে? প্রাণ দিতে চাও দাও গে—কিন্তু এতবড় পাগ্‌লামি আমিত সংসারে আর দ্বিতীয় দেখ্‌তে পাইনে। তুমি বল্‌বে, তবে কি দেশের উদ্ধার হবেনা? প্রাণের ভয়ে সরে দাঁড়াবো? কিন্তু তা আমি বলিনে। তোমার কাছে থেকে, তোমার চরিত্র হতে জননী জন্মভূমি যে কি সে আমি চিনেছি। তাঁর পদতলে সর্ব্বস্ব দিতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা মানুষের যে আর নেই তোমাকে দেখে এ কথা যদি না আজও শিখ্‌তে পেরে থাকি ত আমার চেয়ে অধম নারী জন্মে কেউ জন্মায়নি। কিন্তু, নিছক আত্মহত্যা করেই কোন্‌

দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে? কোন মতে ভারতী তোমার বেঁচে থাক্‌তেই এতবড় ভুল ধারণা করে আমার সম্বন্ধেও তুমি রেখোনা দাদা।

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই ত!

তাইত কি?

তোমার সম্বন্ধে ভুলই হয়েছে বটে। এই বলিয়া ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিপ্লব মানেই, ভারতী, কাটা-কাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন। সৈন্যবল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ, এ সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। আজ যারা শত্রু, কাল তারা বন্ধু হতেও ত পারে। নীলকান্ত শক্তি পরীক্ষা করতে যায়নি, তাদের মিত্র করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিল। হায়রে নীলকান্ত! কেবা তার নাম জানে।

অন্ধকারেও ভারতী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল দেশের বাহিরে, দেশের কাজে, যে ছেলেটি লোক চক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে প্রাণ দিয়াছে তাহাকে স্মরণ করিয়া এই নির্ব্বিকার পরমসংযত মানুষটির গভীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ যেন তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, কি বল্‌ছিলে ভারতী, গোষ্পদ? তাই হবে হয়ত। কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদ ভস্মসাৎ করে ফেলে আয়তনে সে কতটুকু জানো? সহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ববিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোন দিন ব্যত্যয় করতে পারে না।

ভারতী বলিল, দাদা, তোমার কথা শুন্‌লে গা কাঁপে। রাজশক্তিকে যে তুমি দগ্ধ করতে চাও, তার ইন্ধন ত আমাদেরই দেশের লোক। এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের কল্পনায় কি তোমার মনে করুণাও জাগেনা?

প্রত্যুত্তরে লেশমাত্র দ্বিধা নাই, ডাক্তার স্বচ্ছন্দে কহিলেন, না। প্রায়শ্চিত্ত কথাটা কি শুধু মুখেরই কথা? পূর্ব্ব পিতামহগণের যুগান্ত-সঞ্চিত পাপের অপরিমেয় স্তূপ নিঃশেষ হবে কিসে বল্‌তে পারো? করুণার চেয়ে, ন্যায়ধর্ম্ম ঢের বড় বস্তু ভারতী।

ভারতী ব্যথা পাইয়া বলিল, এ তোমার সেই পুরাণো কথা দাদা। ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তুমি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারো তা যেন আমি ভাবতেই পারিনে। রক্তপাত ছাড়া আর কিছু যেন মনে তোমার জাগ্‌তেই পায় না। রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তা হলে তারও ত জবাব রক্তপাত? এবং তারও ত জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলেনা। এ প্রশ্নোত্তর ত সেই আদিম কাল থেকে হয়ে আস্‌চে। তবে কি মানবের সভ্যতা এর চেয়ে বড় উত্তর কোন দিন দিতে পারবেনা? দেশ গেছে, কিন্তু তার চেয়েও যে বড় সেই মানুষ ত আজও আছে। মানুষে মানুষে কি হানা-হানি না ক'রে কোন মতেই পাশাপাশি বাস করতে পারেনা?

ডাক্তার কহিলেন, ইংরাজের একজন বড় কবি বলেছেন, পশ্চিম ও পূর্ব্ব কোন দিনই মিল্‌তে মিশ্‌তে পারেনা।

ভারতী রুষ্ট হইয়া কহিল, ছাই কবি। বলুকগে সে। তুমি পরম জ্ঞানী, তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞেসা করেচি, আজও জিজ্ঞেসা করচি, হোক্ তারা পশ্চিমের, হোক্ তারা ইয়োরোপের মানুষ, কিন্তু তবু ত মানুষ? মানুষের সঙ্গে মানুষে কি কিছুতেই বন্ধুত্ব করতে পারেনা? দাদা, আমি ক্রীশ্চান, ইংরাজের কাছে আমি বহু ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্‌গুণ আমি নিজের চোখে দেখেচি,—তাদের এত মন্দ ভাব্‌তে আমার বুকে শূল বেঁধে। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝোনা দাদা, আমি বাঙালী ঘরেরই মেয়ে,—তোমারই বোন্। বাঙ্‌লার মাটি, বাঙ্‌লার মানুষকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। কে জানে, যে জীবন তুমি বেছে নিয়েচ, হয়ত আজই আমাদের শেষ দেখা। আজ আমাকে তুমি শান্ত মনে এই জবাবটি দিয়ে যাও, যেন এরই দিকে চোখ রেখে আমি সারা জীবন মুখ তুলে সোজা চলে যেতে পারি। বলিতে বলিতে শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর কান্নার ভারে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল!

ডাক্তার নীরবে তরী বাহিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ভারতীর মনে হইল, বোধ হয় তিনি ইহার উত্তর দিতে চান্ না। সে হাত বাড়াইয়া নদীর জলে চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল, অঞ্চল দিয়া বার বার ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতেছিল, ডাক্তার কথা কহিলেন। স্নিগ্ধ মৃদু কণ্ঠ, কোথাও লেশমাত্র উত্তেজনা বা বিদ্বেষের আভাস নাই,—যেন কাহার কথা কে বলিতেছে এম্‌নি শান্ত সহজ। ভারতীর সেই প্রথম পরিচয় দিনের স্কুলের নিরীহ নির্ব্বোধ মাষ্টার মশায়টিকে মনে পড়িল। অশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ, ব্যাকরণও তেম্‌নি,—ভারতী কষ্টে হাসি চাপিয়া আলাপ করিয়াছিল। পরে তাই লইয়া রাগ করিয়া সে ডাক্তারকে অনেক দিন অনেক তিরস্কার করিয়াছে। সেই নিরুৎসুক নিঃস্পৃহকণ্ঠে কহিলেন, এক রকমের সাপ আছে ভারতী, তারা সাপ খেয়েই জীবন ধারণ করে। দেখেচ?

ভারতী বলিল, না, দেখিনি, শুনেচি।

ডাক্তার বলিলেন, পশুশালায় আছে। এবার কলকাতায় গিয়ে অপূর্ব্বকে হুকুম কোরো, সে দেখিয়ে আন্‌বে।

বার বার ঠাট্টা কোরো না দাদা, ভাল হবে না বল্‌চি।

না, ভাল হবে না আমিও তাই বল্‌চি। পাশাপাশি বাস করাটা ঠিক্ ঘটে ওঠে না বটে, কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠভাবে একজনের জঠরের মধ্যে আর একজন বেশ নিরাপদেই স্থান পায়। বিশ্বাস না হয় জু'র অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেসা করে দেখো।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, তুমি তাদের সমধর্ম্মাবলম্বী, তাদের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, তাদের

অনেক সদ্গুণ চোখে দেখেচ,—দেখেচ তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এদেশের মালিক তারা,—মালিকানার তারিখ মনে আছে ত? আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ আয়োজনের আর অন্ত নেই। তার সমস্ত অভাব, সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটী টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্য্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাঙলাদেশের মেয়ে বল্‌ছিলে না? বাঙলার মাটি, বাঙলার জল-বায়ু, বাঙলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয় না? এই বাঙলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতিবৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেচ কখনো এ কথা? দেখেচ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্ত্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম্ম গেল, জ্ঞান গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠ্‌চে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে,—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্ব্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই,—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেচ ভারতী?

ভারতী চীৎকার করিয়া থামাইতে চাহিল, কিন্তু গলা দিয়া তাহার শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

সব্যসাচীর সেই ধীর সংযত কণ্ঠস্বর কোন্ এক সময়ে অন্তর্হিত হইয়াছিল, বলিলেন, তুমি ক্রীশ্চান, মনে পড়ে একদিন কৌতূহলবশে ইয়োরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার স্বরূপ জান্‌তে চেয়েছিলে? সেদিন ব্যথা দেবার ভয়ে বলিনি, কিন্তু আজ তার উত্তর দেব। তোমাদের কেতাবে কি আছে জানিনে, শুনেচি ভাল কথা ঢের আছে, কিন্তু বহুদিন এক সঙ্গে বসবাস করে এর সত্যকার চেহারা আর আমার এতটুকু অগোচর নেই। লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশু-শক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর মূল মন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্ব্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোন দুর্ব্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। অথচ ন্যায়ধর্ম্মই সকলের বড়, এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যেই এই অধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইয়োরোপীয় সভ্যতার চরম কর্ত্তব্য এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়, মিশনারির ধর্ম্মপ্রচারে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।

ভারতী মিশনারির হাতে মানুষ, অনেকের মহৎ চরিত্র সে যথার্থই চোখে দেখিয়াছে; বিশেষতঃ, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি এইরূপ অহেতুক আক্রমণে সে ব্যথা পাইয়া বলিল, দাদা,

যে জন্যেই হোক্ তোমার শান্ত বুদ্ধি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক্রীশ্চান-ধর্ম্ম প্রচার করতে যাঁরা এদেশে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি। তাঁদের প্রতি তুমি আজ নিরপেক্ষ সুবিচার করতে পারছ না। ইউরোপীয় সভ্যতা কি তোমাদের কোন ভাল করেনি? সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন——

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, চড়কের সময়ে পিঠ ফোঁড়া, সন্ন্যাসীদের খাঁড়ার ওপর লাফানো, ডাকাতি, ঠগি, বর্গিরহাঙ্গামা, গোঁড় ও খাসিয়াদের আষাঢ়ের নরবলি,—আর যে মনে পড়ছেনা ভারতী——

ভারতী কথা কহিল না।

ডাক্তার বলিলেন, রোসো, আরও দুটো স্মরণ হয়েছে। বাদশাদের আমলে গৃহস্থের বৌ ঝি ঘরে রাখা যেত না,—নবাবেরা মেয়েদের পেট চিরে ছেলে-মেয়ে দেখ্‌তো,—হায় রে হায়, এম্‌নি করেই বিদেশীর লেখা ইতিহাস সামান্য এবং তুচ্ছ বস্তুকে বিপুল, বিরাট তৈরি করে দেশের প্রতি দেশের লোকের চিত্ত বিমুখ করে দিয়েছে! মনে আছে আমার ছেলেবেলায় স্কুলের পড়ার বইয়ে একবার পড়েছিলাম, বিলেতে বসে আমাদের কল্যাণ ভেবে ভেবেই কেবল রাজমন্ত্রীর চোখের নিদ্রা এবং মুখের অন্ন বিস্বাদ হয়ে গেছে! এই সত্য ছেলেদের কণ্ঠস্থ করতে হয়, এবং উদরান্নের দায়ে শিক্ষকদের কণ্ঠস্থ করাতে হয়! সভ্য রাজ্যতন্ত্রের এই রাজনীতি ভারতী। আজ অপূর্ব্বকে দোষ দেওয়া বৃথা!

অপূর্ব্বর লাঞ্ছনায় মনে মনে ভারতী লজ্জিত হইল, রুষ্ট হইল। কহিল, তুমি যা বল্‌চো তা সত্য হতে পারে, হয়ত, কোথাও কেউ অতিভক্ত রাজকর্ম্মচারী এম্‌নিই করেছে, কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের অসত্যই কখনো মূলনীতি হতে পারেনা। এর ওপরে ভিত্তি করে এই বিপুল প্রতিষ্ঠান একটা দিনের তরেও স্থির থাক্‌তে পারেনা। তুমি বল্‌বে কালের পরিমাণে এ কটা দিন? এম্‌নি সাম্রাজ্য ত ইতিপূর্ব্বেও ছিল, সে কি চিরস্থায়ী হয়েছে? তোমার কথা যদি যথার্থ হয়, এও চিরস্থায়ী হবেনা। কিন্তু, এই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য,—যত নিন্দেই করনা কেন,—এর ঐক্য, এর শান্তি থেকে কি কোন শুভ লাভই হয়নি? প্রতীচ্যের সভ্যতার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কি কোন হেতুই পাওনি? স্বাধীনতা তোমরা ত বহুদিন হারিয়েছ, ইতিমধ্যে রাজশক্তির পরিবর্ত্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ত হয়নি। ক্রীশ্চান বলে আমাকে তুমি উল্টো বুঝোনা দাদা, কিন্তু নিজেদের সমস্ত অপরাধ বিদেশীর মাথায় তুলে দিয়ে গ্লানি করাই যদি তোমার স্বদেশপ্রেমের আদর্শ হয়, সে আদর্শ তোমার হাত থেকেও আমি নিতে পারবনা। এত বিদ্বেষ হৃদয়ের মধ্যে পুরে তুমি ইংরাজের ক্ষতি হয়ত করতেও পারো, কিন্তু তাতে ভারতবাসীর কল্যাণ হবেনা এ সত্য নিশ্চয় জেনো।

তাহার সহসা উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণ স্বর নিস্তব্ধ নদীবক্ষে আহত হইয়া সব্যসাচীর কানে পশিয়া

তাঁহাকে চমকিত করিয়া দিল! ভারতীর এই রূপ অপরিচিত, এ মনোভাব অপ্রত্যাশিত। তথাপি যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ প্রভাবের মধ্যে সে বালিকা বয়স হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আঘাতে চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া সে এই যে নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া বসিল, তাহা যত কঠিন ও প্রতিকূল হৌক, সব্যসাচীর চক্ষে তাহাকে যেন নব মর্য্যাদা দান করিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভারতী বলিল, কই জবাব দিলেনা দাদা? এতবড় হিংসের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে তুমি আর যাই কর দেশের ভালো করতে পারবেনা।

ডাক্তার কহিলেন, তোমাকে ত অনেকবার বলেছি দেশের ভালো যাঁরা করবেন তাঁরা চাঁদা তুলে দিকে দিকে অনাথ আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বেদান্ত আশ্রম, দরিদ্র ভাণ্ডার প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্য করছেন, মহৎ লোক তাঁরা, আমি তাঁদের ভক্তি করি,—কিন্তু, দেশের ভালো করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েছি! একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আমার বুকের আগুন নেভে শুধু দুটো জিনিষ দিয়ে। এক নিজের চিতাভস্মে, আর নেভে যে দিন শুনবো ইউরোপের ধর্ম্ম, সভ্যতা, নীতি, সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবেছে।

ভারতী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই বিষকুম্ভের পরিপূর্ণ সওদা নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপ যখন প্রথম ব্যাসাত করতে এসেছিল, তখন চিনতে পেরেছিল কেবল জাপান। তাই আজ তার এত সৌভাগ্য তাই আজ সে ইয়োরোপের সমকক্ষ সম্ভ্রান্ত মিতা। কিন্তু চিনতে পারেনি ভারত, চিনতে পারেনি চীন! তখন স্পেনের রাজ্য পৃথিবীময়, ক্ষুদ্র জাপান স্পেনের এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করে এত রাজ্য হল তোমাদের কি করে? নাবিক বললে অতি সহজে, যে দেশ আত্মসাৎ করতে চাই, সেখানে নিয়ে যাই প্রথমে মাল, হাতে পায়ে পড়ে ব্যবসার জন্যে দেশের রাজার কাছে চেয়ে নিই এক ফোঁটা জমি। তার পরে আনি মিশনারী, তারা যত না করে ক্রীশ্চান, তার বেশী করে সে দেশের ধর্ম্মকে গালিগালাজ। লোকে ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ফেলে দু একটাকে মেরে। তখন আসে আমাদের কামান বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্য সামন্ত। আমাদের সভ্য দেশের মানুষ-মারা কল যে অসভ্য দেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা অচিরে প্রমাণিত করে দিই। শুনে জাপান বললে প্রভু! আপনারা তা'হলে গা তুলুন, আমাদের আর ব্যবসাতে কাজ নেই। এই বলে তাদের বিদায় দিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি করে দিলে চন্দ্র-সূর্য্য যত দিন উদয় হবে ক্রীশ্চান যেন না আর আমাদের দেশে পা দেয়। দিলে তার প্রাণদণ্ড।

তাহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকের প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে ভারতী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আমি পূর্ব্বেও শুনেছি, কিন্তু যে জাপানীদের তুমি ভক্তি কর তারা কি?

ডাক্তার কহিলেন, ভক্তি করি? মিছে কথা। ওদের আমি ঘৃণা করি। কোরিয়ানদের বার বার প্রতিশ্রুতি এবং অভয় দিয়েও বিনা দোষে, মিথ্যা অজুহাতে তাদের রাজাকে বন্দী করে

১৯১০ সালে যখন কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নিলে তখন আমি সাংঘাইয়ে। সে দিনের সে সব অমানুষিক অত্যাচার ভোলবার নয়, ভারতী। আর অভয় কি শুধু একা জাপানই দিয়েছিল? ইয়োরোপও দিয়েছিল। শক্তিমানের বিরুদ্ধে ইংরাজ কথা কইলে না, বল্‌লে এ্যাঙ্‌লো-জাপানী-সন্ধি-সূত্রে আমরা আবদ্ধ। এবং সেই কথাই আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের সভাপতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বল্‌লেন, প্রতিশ্রুতি তা কি! যে অক্ষম, শক্তিহীন জাতি আত্মরক্ষা করতে পারেনা তাদের রাজ্য যাবেনা ত যাবে কাদের? ঠিকই হয়েছে! এখন আমরা যাবো তাদের উদ্ধার করতে? অসম্ভব! পাগ্‌লামি! এই বলিয়া সব্যসাচী এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমিও বলি ভারতী,—অসম্ভব, অসঙ্গত, পাগ্‌লামি। প্রবল দুর্ব্বলের সম্পদ কেন ছিনিয়ে নেবেনা, এ কথা যে সভ্য ইয়োরোপের নৈতিক বুদ্ধি ভাবতেই পারেনা!

ভারতী নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আঠারো শতাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিশদূত লর্ড ম্যাকার্টনি এলেন চৈনিক দরবারে কিঞ্চিৎ ব্যবসার সুবিধে করে নিতে। মাঞ্চুরাজ শিনলুঙ ছিলেন তখন সমস্ত চীনের সম্রাট, অত্যন্ত দয়ালু, দূতের বিনীত আবেদনে খুসি হয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌লেন, দেখ বাপু, আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অভাব কিছুরই নেই, কিন্তু তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে, অনেক দুঃখ সয়ে। আচ্ছা, ক্যান্‌টন সহরে ব্যবসা কর, স্থান দিচ্চি, তোমাদের ভাল হবে। রাজ-আশীর্ব্বাদ নিস্ফল গেলোনা, ভালই হোলো। পঞ্চাশ বছর পেরুলনা, চীনের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ বাধলো।

ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, চীনেরই অন্যায়। বেয়াদপ হঠাৎ বলে বোস্‌লো, আফিঙ খেয়ে খেয়ে চোখ কান আমাদের বুজে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি আর নেই, দয়া করে ও-জিনিষটার আমদানি বন্ধ কর।

তারপরে?

তারপরের ইতিহাস খুব ছোট। বছর দুয়েব মধ্যে পুনশ্চ আফিঙ খেতে রাজী হয়ে, আরও পাঁচখানা বন্দরে শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র শুল্কে বাণিজ্যের মঞ্জুরি পরওয়ানা দিয়ে, এবং সর্ব্বশেষে হঙকঙ বন্দর দক্ষিণা প্রদান করে বেয়াল্লিশ সালে যজ্ঞ সমাধা হল। ঠিকই হয়েছে। এত সস্তায় আফিঙ পেয়েও যে মূর্খ খেতে আপত্তি করে তার এমনি প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত।

ভারতী বলিল, এ তোমার গল্প।

ডাক্তার কহিলেন, তা হোক্, গল্পটা শুন্‌তে ভালো। আর এই না দেখে ফ্রান্সের ফরাসী সভ্যতা বল্‌লে, আমার ত আফিঙ নেই কিন্তু খাসা মানুষ-মারা কল আছে। অতএব যুদ্ধং দেহি। হল যুদ্ধ। ফরাসী চীন সাম্রাজ্যের আনাম প্রদেশটা কেড়ে নিলে। আর যুদ্ধের খরচা, অধিকতর বাণিজ্যের সুবিধে, টি-টিপোট ইত্যাদি ইত্যাদি—এসব তুচ্ছ কাহিনী থাক্।

ভারতী কহিল, কিন্তু দাদা তালি কি একহাতে বাজে? চীনের অন্যায় কি কিছু ছিলনা?

ডাক্তার বলিলেন, থাক্‌তে পারে। তবে তামাসা এই যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অন্যায় বোধটা অপরের ঘর চড়াও হয়েই হয়, তাঁদের নিজেদের দেশের মধ্যে ঘট্‌তে দেখা যায় না।

তারপরে ?

বল্‌চি। জার্ম্মান সভ্যতা দেখলেন, বা রে বাঃ, এতো ভারি মজা! আমি যে ফাঁকে পড়ি। তিনি এক জাহাজ মিশনারি এনে লেলিয়ে দিলেন! ৯৭ সালে তাঁরা যখন তোমাদের প্রভু যিশুর মহিমা, শান্তি এবং ন্যায়ধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত তখন একদল চীনে ক্ষেপে উঠে পরম ধার্ম্মিক জন দুই প্রচারকের মুণ্ড ফেল্‌লে কেটে। অন্যায়! চীনেরই অন্যায়। অতএব, গেল শ্যান্‌টঙ প্রদেশ জার্ম্মানির উদর-বিবরে। তারপরে এল বক্সার বিদ্রোহ। ইয়োরোপের সমস্ত সভ্যতা এক হয়ে তার যে প্রতিশোধ নিলে, হয়ত, কোথাও তার আর তুলনা নেই। তার অপরিমেয় খেসারতের ঋণ কত কালে যে চীনেরা শোধ দেবে তা যিশুখৃষ্টই জানেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সিংহ, জারের ভালুক, জাপানের সূর্য্যদেব,—কিন্তু আর না বোন, গলা আমার শুকিয়ে আস্‌চে। দুঃখের তুলনায় একা আমরা ছাড়া বোধ হয় এদের আর সঙ্গী নেই। সম্রাট শিন্‌লুঙের নির্ব্বাণ লাভ হোক্, তাঁর আশীর্ব্বাদের বহর আছে!

ভারতী মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী ?

কি দাদা ?

চুপ্‌চাপ্ যে ?

তোমার গল্পের কথাটাই ভাব্‌চি। আচ্ছা দাদা, এই জন্যেই কি চীনেদের দেশে তোমার কার্য্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছ? যারা শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত, তাদের উত্তেজিত করে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু একটা কথা কি ভেবে দেখেচ? এই সব নিরীহ, অজ্ঞান চাষাভূষোর দুঃখ এম্‌নিই ত যথেষ্ট, তার ওপরে আবার কাটাকাটি রক্তারক্তি বাধিয়ে দিলে ত সে দুঃখের আর অবধি থাক্‌বেনা!

ডাক্তার কহিলেন, নিরীহ চাষাভূষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, ভারতী, কোন দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয়না। বরঞ্চ, বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র সন্তানদের নিয়ে। কোনদিন যদি আমার কাজে যোগ দিতে চাও ভারতী, এ কথাটা ভুলোনা। আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ শান্তিপ্রিয়, নির্বিরোধী, নিরীহ কৃষকের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায়না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের,—সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশি কামনার বস্তু।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল আমিও তাই, চাই দাদা, আমাকে বরঞ্চ এই জড়ত্বের

কাজেই তুমি নিযুক্ত করে দাও, তোমার পথের দাবীর ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিশ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আস্‌চে।

সব্যসাচী হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

ভারতী থামিতে পারিল না, তেম্‌নি ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, ঐ একটা আচ্ছার বেশি, আর কি তোমার কিছুই বল্‌বার নেই দাদা ?

কিন্তু আমরা যে এসে পড়েছি ভারতী, একটুখানি সাবধানে বোসো দিদি, যেন আঘাত না লাগে—এই বলিয়া ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে হাতের দাঁড় দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাঁহার ছোট্ট নৌকাখানিকে অন্ধকার তীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইতে নামাইতে বলিলেন, জলকাদা নেই বোন্‌, কাঠ পাতা আছে, পা দাও।

অন্ধকারে অজানা ভূপৃষ্ঠে হঠাৎ পা ফেলিতে ভারতীর দ্বিধা হইল, কিন্তু পা দিয়া সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দাদা, তোমার হাতে আত্ম-সমর্পণ করার মত নির্বিঘ্ন স্বস্তি আর নেই,—

কিন্তু অপর পক্ষ হইতে এ মন্তব্যের উত্তর আসিল না। উভয়ে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হইলে ডাক্তার বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু ব্যাপার কি বলত ? এ কি বিয়ে বাড়ী ? না আছে আলো, না আছে চীৎকার—না শোনা যায় বেহালার সুর,—কোথাও গেল নাকি এরা ?

আরও কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল, সিঁড়ির উপরের সেই চিত্র-বিচিত্র কাগজের লণ্ঠন। ভারতী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, ঐ যে সেই চীনে-আলো। এর মধ্যেই খরচের হুঁসিয়ারিটা শশি-তারার দেখবার বস্তু, দাদা। এই বলিয়া সে হাসিল।

দুজনে সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া খোলা দরজার সম্মুখে প্রথমেই চোখে পড়িল,—শশী মন দিয়া কি একখানা কাগজ পড়িতেছে। ভারতী আনন্দিত কলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, শশি বাবু, এই যে আমরা এসে পড়েছি,—খাবার বন্দোবস্ত করুন, নবতারা কই ? নবতারা ? নবতারা ?

শশী মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আসুন। নবতারা এখানে নেই।

ডাক্তার স্মিতমুখে কহিলেন, গৃহিণী-শূন্য গৃহ কি রকম কবি ? ডাকো তাকে, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাক্‌, নইলে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। হয়ত খাবোও না।

শশী বিষণ্ণমুখে বলিল, নবতারা এখানে নেই ডাক্তার। তারা সব বেড়াতে গেছে।

সহসা তাহার মুখের চেহারায় ভীত হইয়া ভারতী প্রশ্ন করিল, কোথায় বেড়াতে গেলো ? আজকের দিনে ? কি চমৎকার বিবেচনা !

শশী বলিল, তারা বিয়ের পরে রেঙ্গুনে বেড়াতে গেছে। না না, আমার সঙ্গে নয়,—সেই যে আহমেদ,—ফর্সা মতন,—চমৎকার দেখ্‌তে,—কুট সাহেবের মিলের টাইম-কিপার,—দেখেছেন না ? আজ দুপুর বেলা তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়েছে। সমস্তই তাদের ঠিক ছিল, আমাকে বলেনি।

আগন্তুক দুজনে বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন,—বল কি শশি ?

শশী উঠিয়া গিয়া ঘরের একটা নিভৃত স্থান হইতে একটা ন্যাকড়ার থলি আনিয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, টাকা পেয়েছি ডাক্তার। নবতারাকে পাঁচ হাজার দেব বলেছিলাম, দিয়ে দিয়েছি। বাকি আছে সাড়ে চার হাজার, পঞ্চাশ টাকা আমি নিলাম কিন্তু—

ডাক্তার কহিলেন, এই টাকা কি আমাকে দিচ্চ ?

শশী কহিল, হাঁ। আমার আর কি হবে ? আপনি নিন্। কাজে লাগবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাকে কবে টাকা দিলেন ?

শশী কহিল, কাল টাকা পেয়েই তাকে দিয়ে এসেছি।

নিলে ?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ। আহমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। তারা একটা বাড়ী কিন্‌বে।

নিশ্চয়ই কিন্‌বে ! এই বলিয়া ডাক্তার সহাস্যে ফিরিয়া দেখিলেন, চোখে আঁচল দিয়া ভারতী বারান্দার একদিকে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে।

শশী কহিল, প্রেসিডেন্ট আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তিনি সুরাবায়ায় চলে যাচ্চেন।

ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, তবু প্রশ্ন করিলেন, কবে যাবেন ?

শশী কহিল, বল্‌লেন ত শীঘ্রই। তাঁকে লোক এসেছে নিতে।

কথা ভারতীর কানে গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রা দিদি সত্যি চলে যাবেন বলেছেন শশিবাবু ?

শশী বলিল, হাঁ সত্যি। তাঁর মায়ের খুড়োর অগাধ সম্পত্তি। সম্প্রতি মারা গেছেন,—ইনি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই। তাঁর না গেলেই নয়।

ডাক্তার কহিলেন, না গেলেই যখন নয়, তখন যাবেন বই কি।

শশী ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, অনেক খাবার আছে, খাবেন কিছু ? কিন্তু ভারতীর ইতস্ততঃ করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়,—চল, কি আছে দেখিগে। এই বলিয়া তিনি শশীর হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন। যাবার পথে শশী আস্তে আস্তে বলিল, আর একটা খবর আছে ডাক্তার, অপূর্ব্ব বাবু ফিরে এসেছেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সে কি শশি, কে বল্‌লে তোমাকে ?

শশী কহিল, কাল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একেবারে মুখোমুখি দেখা। তাঁর মা বড় পীড়িত। চলুন বলচি।

ক্রমশঃ

ভুল

যদিও ভুলে তোমারি দ্বারে গিয়াছে লিপিখানি---
কেন গো তারে করিয়া শতখান
বেদনাহত বক্ষ'পরে বজ্ররেখা হানি
করিলে মোরে এহেন অপমান !
জীবনে সবে করিয়া গেছে কতনা কত ভুল
তুমিও কত করেছ' নিজ ভুলে,
তবুও কেন না করি ক্ষমা—না হয়ে অনুকূল
মরণ কোলে আমারে দিলে তুলে !
জানত তুমি বেদনা কোথা লুকান হৃদিমাঝ
কিসের তরে কাঁদিয়া মরে প্রাণ,
কাহারি শুভ সাধিব বলে জীবন প্রান্তে আজ
নিজেরে আমি দিতেছি বলিদান।
কেন গো তবে নিঠুর তুমি ভাসায়ে আঁখি জলে
বেদনাধারা বক্ষে দিলে ঢালি,'
কেন বা পুনঃ তুলসী তলে আঁচল দিয়া গলে
আমারি শুভ মাগিলে দীপ জ্বালি' !
বৃথা এ তব সাধনা ওগো—বৃথা এ আয়োজন—
অধম শুধু লভিত নব প্রাণ,
যদিগো তুমি ভুলিয়া ত্রুটী মথিয়া নিজ মন
করিতে মোরে করুণাধারা দান।

শ্রীরেণুকা দাসী

কার্ত্তিকে

মহাত্মা গান্ধী ও চরকা।—কেন যে সকলের পক্ষে চরকা ব্যবহার করা চলে না, ইহা বুঝাইবার জন্য অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। তবুও এ বিষয়ে গান্ধীজির উদ্দেশ্য ধরিবার জন্য দুইচারিটি কথা লিখিব। সকল বিপদ আপদের সময় যাহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাত-কাপড়ের অভাব না ঘটে, সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকা উচিত। ইউরোপের মহাসমরের সময়ে বিদেশের কাপড়ের আমদানি যখন অত্যন্ত কমিয়াছিল, ও কাপড় বড়ই দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল, তখন বহু স্থানে দরিদ্র ভদ্রলোকের মেয়েদের পক্ষে লজ্জা রক্ষা করা দায় হইয়াছিল। এই বিবরণ অত্যন্ত খাঁটি যে অনেকে বাড়ীর ভিতরে নিতান্ত ছেঁড়া নেকড়া পরিত, আর বাড়ীতে রক্ষিত একখানি ভাল কাপড় যাহা থাকিত, তাহাই পালা করিয়া পরিয়া মেয়েরা ঘরের বাহির হইত। এমন অভাব পূর্ব্বে কখন এ দেশে ঘটিয়াছিল বলিয়া জানি না। এই অতি প্রয়োজনের কাপড় বুনিবার জন্য যাহাতে সকলেই উদ্যোগী হইয়া তুলার চাষ করে ও চরকা কাটে, তাহার জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধীজি অনেক কথা বলিয়াছেন। সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বলা না চলিতে পারে যে সকলেরই চরকা কাটিবার অবসর আছে। কিন্তু ভারতের সকল স্থানের কৃষকদের যে এ কাজ করিবার অবসর আছে, তাহাতে ভুল নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের কৃষকসাধারণের এত জমি নাই যে যাহার চাষের উদ্যোগে তাহাকে বার মাস খাটিতে হয়। একদিকে অবসর সময় উপযোগী কাজে কাটাইবার জন্য, আর অন্যদিকে নিজেদের স্থায়ী অভাব মোচনের জন্য চাষারা চরকা ধরিলে অত্যন্ত উপকার হয়। এই গেল একদিকের কথা।

তাহা ছাড়া গান্ধীজির নির্দ্দেশটির আর একটি দিক্ আছে। এ দিক্‌টির কথা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ ভাবিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাই বলিব। কারণ গান্ধীজি এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। কথাটি এই যে মনে স্থায়িভাবে দেশহিতৈষণা জাগাইতে হইলে সকলেরই এমন একটা কিছু কাজ করা উচিত, যে কাজ করিলে দেশের হিত হয়। ছড়া বাঁধিয়া হিতৈষণার মন্ত্র পড়িলে অথবা "বন্দেমাতরম্" বলিয়া চেঁচাইলে অথবা সাময়িক উত্তেজনায় সভা-সমিতি করিলে এই স্বদেশ-হিতৈষণা মনে স্থায়িভাবে জাগে না। প্রতিদিন যথার্থ প্রয়োজনের একটা কাজে যদি লাগা যায়, আর সেই কাজটি যদি দেশের হিতের কাজ হয়, তবে মানুষের মনে নিরন্তর জাগিতে থাকে যে সে দেশের জন্য কিছু কাজ করিতেছে। এইরূপ কাজে হিতৈষণার প্রবৃত্তি অভ্যস্ত হইয়া বদ্ধমূল হয়। এরূপস্থলে অন্যদিকের কথাটা যখন ঠিক যে সকল শ্রেণীর লোকের চরকা কাটিবার অবসর নাই, তখন চরকা ছাড়াও অন্য আরও দশটা কাজ খুঁজিয়া স্থির করিতে হইবে, যাহা প্রত্যেক লোকে অবস্থাবিশেষে প্রতিদিন করিতে করিতে আপনার দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ বাড়াইতে পারে। কথাটি এই ভাবে বুঝিয়া ও বুঝাইয়া যদি কতকগুলি কাজের উদ্যোগ হয়, আর বিশেষ

ভাবে মন্ত্র জপের মত সকলেই সেই সেই কাজে লাগে, তবে যথার্থই এ দেশের বহুদিনের বদ্ধ জড়তা কাটিতে পারে। কাপড় বোনা যখন অত্যন্ত প্রয়োজনের কাজ, তখন যত অধিক পরিমাণে চরকা চালাইতে পারা যায়, তাহার উদ্যোগ করা উচিত।

পরের দেশে ভারতবাসী—যে সকল অধিকার না পাইলে কোন দেশের লোকেরাই আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারেনা, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারেনা, অর্থাৎ পশুপ্রায় হইয়া পড়ে, আমরা নিজেদের দেশে সেই শ্রেণীর অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত। এ দুর্ভাগ্যের জন্য রাজনীতি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ও আমাদের নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থাও দায়ী। যেই দায়ী হউক, এই অবস্থাটি সত্য। অবস্থাটা যখন নিজের ঘরে এইরূপ, তখন বিদেশে আমরা অনাদৃত ও তাড়িত হইব, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ব্রহ্মদেশের লোকেরা তাহাদের চাষের কাজ চালাইতে পারেনা, যদি বাঙ্গালী, ওড়িয়া ও তেলেঙ্গা শ্রমজীবীরা সে দেশে তাহাদের কাজের জন্য না যায়। চাটগাঁয়ের গোয়ালারা না থাকিলে ব্রহ্মদেশে দুধ পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে। এক দুই করিয়া সকল কাজের নাম না করিয়া বলিতে পারি যে ভারতবাসীদের না পাঠাইলে ব্রহ্মদেশের লোকেদের চলে না। এইজন্যই এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের জনসাধারণের মনে ভারতবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি জাগে নাই। সরকার বাহাদুর কিন্তু এখন যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মে ও আরাকানে ভারতবাসীদের স্থিতি ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিতদের মনে শিক্ষিত ভারতবাসীদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। এটা কাহার প্ররোচনায় ঘটিয়াছে, বলা শক্ত। তবে এখনও জনসাধারণ ভারতবাসীদিগকে চায়। সরকার বাহাদুর সম্প্রতি আইন করিয়াছেন যে ভারতবাসী লোকেরা একবার যদি দণ্ডবিধি আইনের কোন অপরাধে দণ্ড পাইয়া থাকে, তবে সে ঐ আইনের বিচারে দ্বিতীয়বার অপরাধী হইলেই ব্রহ্মদেশ হইতে তাড়িত হইবে। গালাগালি করিবে না, মারামারি করিবে না, অথবা অন্য কোন অপরাধ করিবে না শ্রমজীবীদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া অসম্ভব। কাজেই এই আইনের বিধানে এখন দলে দলে অনেক ভারতবাসীকে তাড়িত হইতে হইবে। আরাকানের অধিকাংশ জমি চাষ করে ভারতবাসীরা, আর সেই ভারতবাসীরা এক রকম আরাকানের অধিবাসীই হইয়া গিয়াছে। ইহারা যদি অপরাধ করিবার ছলে তাড়িত হয়, তবে ইহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইবে।

আমরা যখন ব্রহ্মদেশ হইতেই তাড়িত হইতেছি, তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বিশেষভাবেই বিড়ম্বিত হইব, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে যাঁহারা আন্দোলন করিয়া ইংরেজের ন্যায়বুদ্ধি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত। বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার পক্ষে ভারতবাসীদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, আর সেই প্রয়োজনের তাড়নাতেই যে বহুকাল হইতে ভারতবাসীরা আফ্রিকার উপকূলে যাইতেছিল ও যাইতেছে, তাহা আমরা জানি। আমরা ইহাও জানি যে আমাদের যতই প্রয়োজন বা অভাব থাকুক, তাহার দিকে তাকাইয়া ইংরাজেরা কিছুই করিবেন না। ইংরেজ জাতির এই ধাতুগত মৌলিক প্রকৃতিটি ভুলিলে চলিবে না যে ঐ জাতির লোকেরা এসিয়ার লোকের গায়ের গন্ধ কিছুতেই সহিতে পারে না, আর এসিয়ার লোকের সঙ্গে দৈবাৎ ইউরোপের লোকের রক্ত মিশ্রণ হইবে ভাবিলে নিদারুণ অপমানের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠেন।

এস্থলে ভারতবাসীদের পক্ষে প্রয়োজন যে তাঁহারা ইংরেজদের উপনিবেশ ছাড়িয়া সেই সেই

স্থলে উপনিবেশ করিতে যান, যেখানে তাঁহারা তীব্র বিদ্বেষ দৃষ্টিতে পুড়িয়া মরিবেন না। পোর্ত্তুগীজ ফরাসী ও ইতালীয় লোকেরা ইংরেজের মত ইউরোপীয় হইলেও এসিয়ার গন্ধে আঁত্‌কান না। খুব জোর করিয়া বলিতে পারি যে যদি ভারতবাসীরা ঐ সকল জাতির উপনিবেশে যান, তবে বিড়ম্বিত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। শিল্প ও শ্রমের কাজের জন্য, যুদ্ধ বিভাগে সেনা পাইবার জন্য ফরাসী প্রভৃতি জাতির লোকেরা ভারতবাসীদিগকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দিবেন, তবে এ পথে যাইবার সময় গোপনে অন্য কেহ যদি কাঁটা পাতিবার ব্যবস্থা না করেন। অনেকের কাছে আমাদের এই পরামর্শ উপেক্ষিত হইবে, কিন্তু আর একবার জোর করিয়া বলিতেছি, যদি একবার এই পন্থা অনুসরণের খাঁটি উদ্যোগ হয় তবে দেখিতে পাইবেন যে সেই উদ্যোগ আরম্ভের মুখে দক্ষিণ আফ্রিকার কড়া আইন অনেক মোলায়েম হইয়া আসিবে। আর ফরাসী প্রভৃতি জাতির উপনিবেশে স্থান পাইলে ভারতবাসীদের স্থিতি নিরাপদ হইবে।

পদক পুরস্কার—“মাশিলা ইন্‌ষ্টিটিউট্” হইতে নিম্নলিখিত পদক-পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

১। শ্যামাচরণ রৌপ্য-পদক

বিষয়ঃ—গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা ও বর্ত্তমান অভিনয়-প্রথা।

(সাধারণের জন্য)

২। সুষমাসুন্দরী রৌপ্য-পদক

বিষয়ঃ—অবসরে কুটীর-শিল্প।

(নারীদিগের জন্য)

৩। নিশিকান্ত রৌপ্য-পদক

বিষয়ঃ—ছাত্রজীবনে পল্লী-সেবা।

(স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য)

নিয়মাবলী—

(১) রচনা মাঘের শেষ তারিখের মধ্যে পৌঁছান আবশ্যক।

(২) কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত বা পেন্সিলে লিখিত রচনা গৃহীত হইবে না।

(৩) তৃতীয় রচনা সম্বন্ধে শিক্ষক বা অভিভাবকের লিখিত প্রমাণ আবশ্যক।

(৪) পরীক্ষকের মীমাংসাই শেষ মীমাংসা। কোন রচনা কেন পুরস্কারের অযোগ্য বিবেচিত হইল—সে বিষয়ে কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়া হইবে না।

(৫) পুরস্কৃত রচনা মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইবে।

(৬) কপি রাখিয়া রচনা পাঠান আবশ্যক; অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৭) প্রতিযোগিতার ফলাফল সংবাদ পত্রে যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

ঠিকানা—মাশিলা ইনষ্টিটিউট্, পোঃ আন্দুল, জেলা হাওড়া।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.



সম্পাদক

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

কার্যালয়

৭৭ নং রসারোড নর্থ,

ভবানীপুর।



বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

অগ্রহায়ণ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৪র্থ সংখ্যা

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশ

স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবী-বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক।

স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া ইতিহাসে স্থান পাইবেন। ভারতবর্ষে, এবং ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্যদেশে,—সাধাণতঃ লোকেরা তাঁহাকে একজন হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়াই জানিতে পারিয়াছে। তিনি শুধু দার্শনিক ছিলেন না। ইতিহাসেও তাঁহার গভীর অনুপ্রবেশ ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে তিনি বর্ত্তমান কালের উপযোগী অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের একটা আত্ম-সংবিৎ ছিল। তাঁহার প্রচার-কার্য্যের ফল,—ভবিষ্যতে কিরূপ আকার ধারণ করিবে,—স্বীয় অমানুষিক কল্পনা বলে,—তাহাও তিনি অনুমান ও কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রচারকে অদ্বৈত বেদান্তের স্থান।

কোন জাতির মধ্যে এক সময়ে এক সঙ্গে দুই জন বিবেকানন্দ থাকিতে পারেনা। বাঙ্গলায়,—ভারতে, বা এমনকি ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে ১৮৯৩ খৃঃ হইতে ১৯০২ খৃঃ পর্য্যন্ত এই ১০ বৎসর—একজন বিবেকানন্দই ছিল। ইহা অত্যুক্তি নয়;—ইহা ইতিহাস, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

প্রখর ব্যক্তিত্বশালী এত বড় একজন অদ্ভুতকর্ম্মা জগদ্বরেণ্য ধর্ম্মপ্রচারকের ধর্ম্মজীবনকে তাহার বিচিত্র অভিব্যক্তির পথে অনুসরণ করা অতীব দুরূহ কার্য্য। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনেকগুলি স্তর আছে। একের পর আর সেই সমস্ত বিভিন্ন স্তরগুলির উল্লেখ, সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজীবনের এক স্তরের সহিত অন্য স্তরের কি সম্বন্ধ—ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা,—আর যাহাই হউক,—সহজ নহে; এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত স্তরগুলির অন্তরালে কি এক যোগ সূত্র অবিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চালিত হইয়া এই সকল বিভিন্ন,—আপাতঃদৃষ্টিতে কোন কোন স্থলে পরস্পর বিরোধী—স্তরগুলিকেও এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে,—তাহা নির্দ্ধারণ করা আরও সহজ নহে। কি এক অখণ্ড প্রচণ্ড জীবনী-শক্তি স্বীয় দুর্নিবারবেগে নিজের অন্তরে ও বাহিরে কত কত সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্য দিয়া আপনার পথ আপনি করিয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়াছে,—তাহার সেই অপূর্ব্ব-গতি-মুক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া,—তাহার প্রত্যেকটি পা ফেলার সহিত সমগ্র জীবনের একটা ধারাবাহিক গতিকে সুসংবদ্ধ করিয়া ফুটাইয়া তুলা সহজ ত নয়ই, অত্যন্ত কঠিন। গতিপথে স্তর বহু হইলেও, জীবন এক।

ধর্ম্মজীবনের বিভিন্ন স্তর ও ক্রমবিকাশ।

এক প্রচণ্ড জীবনী-শক্তি এই বিভিন্ন স্তরগুলির যোগসূত্র।

বাল্যের স্বভাব-ধ্যানী, প্রচলিত দেবদেবীর পূজায় অনুরক্ত বালক,—কি করিয়া যে একদিন মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বসিল—কে বলিতে পারে? পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে নাস্তিক না হইলেও সংশয়বাদের কাছাকাছি তার্কিক যুবা গুরুবাদ, অবতারবাদ, মূর্ত্তিপূজা ও অদ্বৈতবাদ—সমস্তই দূরীভূত করিয়া দিয়াছে,—তখনকার ব্রাহ্ম সমাজের দেখাদেখি এক নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনার কথাও ভাবিতেছে,—অথচ পরক্ষণেই এ সমস্ত ধূলির মত মন হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই তাহার ধর্ম্মপিপাসা মিটিতেছে না। কিসের তাড়নায় উন্মাদের মত নরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বেড়াইতেছে? আবার কোন শক্তি জীবনের উপর আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে? অদ্বৈতবাদ আসিতেছে আবার প্রতীকোপাসনা আসিতেছে। কিন্তু তাহাও স্থায়ী হইতেছে না। পিতৃবিয়োগ,—জ্ঞাতিবর্গের শক্রতাচরণ—প্রচণ্ড দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ,—কোথায় সগুণ ঈশ্বর, কোথায় নির্গুণ ব্রহ্ম, কোথায় অখণ্ডের ধ্যান আর কোথায়ই বা সেই উগ্র তীব্র ও এমনকি তিক্ত বিশ্লেষণমূলক যুক্তিবিচার? আবার ধীরে ধীরে একি মোহজাল, এ কাহার স্পর্শ,—এবং ইহা কিসেরি বা জন্য? রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিতা এ মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী? কে দেখায়? কে দেখে? কিসে এই অসম্ভব সম্ভব হয়? হেদুয়ার লৌহ বেড়ায় মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে মনের মধ্যে বিচার চলিতেছে—জগৎ আছে কি নাই; পরমহংস কে, মানুষ না অবতার? বেদান্তের দিক দিয়া, না পুরাণের দিক দিয়া? তারপরে অন্য স্তরে আত্মপ্রশ্ন; পরমহংসই গুরু না পাওহারী বাবা? দুঃখ, দুঃখ,—ভারতে দারিদ্র্য ও অজ্ঞান জগদ্দল পাথরের মত জাতির বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। যার পেটে ভাত নাই তার আবার ধর্ম্ম কি! যার মা ভাই

বিভিন্ন স্তর।

খেতে পায় না, তার পক্ষে কি মুক্তি সাজে? যে ভগবান আমাকে এখানে খেতে দিতে পারেন না,—তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—এ আমি বিশ্বাস করি না। কে চায় নিজের মুক্তি? মুক্তির বাপ নির্বংশ। দুচারবার নরক কুণ্ডে গেলেই বা? লাখ নরকে যাব, যদি মনুষ্য-কুলের কল্যাণ হয়। সমস্ত জগতের মুক্তি না হ'লে আমার মুক্তি নাই। আমি ও জগৎ যে এক। সুতরাং সমস্ত জগতের মুক্তি ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। দেশের একটা কুকুর যেপর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমি মুক্তি চাইনা। তোমরা কে যে আমার দেশের মূর্ত্তিপূজাকে গালি দেও, অদ্বৈত-বাদকে উপহাস কর,—খৃষ্টানই হও আর ব্রাহ্মই হও—তোমরা তফাৎ যাও। এই মহৎ জীবনের উপরকার যবনিকা আপসারণ করিলে পর এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর স্রোতমুখে ভাসমান প্রস্ফুটিত পদ্মের মত একের পর আর আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর; স্থিতি—বিচ্যুতি—পুনঃসংস্থিতি।

এক স্তরে দেখিতে পাই তিনি মূর্ত্তিপূজক, দ্বিতীয় স্তরে তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী—আবার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্তরে তিনি মূর্ত্তিপূজার সমর্থক,—মূর্ত্তিপূজার বিরোধী সম্প্রদায়গুলির উপর খড়গহস্ত। একস্তরে দেখিতে পাই তিনি অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী,—আমি তুমি ঘটিবাটী সব ঈশ্বর—একি আবার একটা কথা? আবার অন্যস্তরে দেখিতেছি—অদ্বৈতবাদের একজন এযুগের বড় মীমাংসক এবং সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভীক প্রচারক। একস্তরে দেখিতে পাই পরোপকার, অন্যস্তরে দেখিতে পাই জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবা। এ সমস্তই ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর,—একের পর আর, এ সমস্তের ভিতর দিয়া, তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে। পরিশেষে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমনের প্রাক্কালে কাশ্মীরে ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে দেবীর আদেশবাণী শ্রবণে তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন,—লক্ষ্য করা যায়, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পৃথিবীর জীবনলীলা যে ক্রমশঃ একটা বড় পরিণতির মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইতে চলিয়াছে,—বিকাশেরএই স্তরে আমরা তাহা দেখিতে পাই। এই স্তরে তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসানে কর্ম্মসন্ন্যাসের অবস্থা আমাদের চক্ষুকে বাষ্পার্দ্র করিয়া তুলে—হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

মনুষ্যজীবনের একটা গতি আছে,—তাহার বিকাশ আছে,—এবং পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহাতে উন্নতি এবং অবনতির অবসর আছে। জীবনের এই সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে আমরা সেই জীবনের বিকাশের ধারাকে এবং সেই বিকাশের মূল উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করিতে পারি, জীবনের সেই লক্ষ্যকে কতকটা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। জীবনের প্রবাহে আবর্ত্ত আছে। সেই আবর্ত্তের, সেই ঘুরাফেরার মধ্য দিয়াই আমরা মূলে এক অখণ্ড প্রবাহের গতিমুক্তি ও চরম পরিণতিকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। বিকাশের এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর বিচ্ছিন্ন নহে। তাহারা সকলেই এক অখণ্ড জীবনের বিকাশ—বিশ্ব-সংসারের কিছুই বিচ্ছিন্ন নহে। যাহা আপতঃদৃষ্টিতে এমনকি পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়, তাহার অভ্যন্তরেও ঐক্য বিদ্যমান।

ধর্ম্মজীবনের বিকাশের যে স্তরে বিবেকানন্দ পৌরাণিক অবতারবাদ স্বীকার করিতেছেন না, আবার সে স্তরে "যেই রাম সেই কৃষ্ণ একাধারে রামকৃষ্ণ, কিন্তু বেদান্তের দিক দিয়ে নয়," এই কথা শুনিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত নেত্রে থমকিয়া দাঁড়াইতেছেন,—এই উভয় স্তরকে প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ উহা মূলে একই জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ। বাহিরের বিকাশে যাহা স্ববিরোধী, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পরিবর্ত্তনমুখে তাহা ঘাতপ্রতিঘাতের ক্রিয়াফলে স্বাভাবিক। যাঁহারা মনে করেন স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্ম-জীবনে কোন বিকাশ নাই, বিকাশের পথে বিভিন্ন স্তর নাই, কেননা তিনি স্বয়ম্ভু প্রাকৃতিক বা জীবধর্ম্মীর নিয়মের ঊর্দ্ধে, তাঁহারা যে কি বলেন বুঝা কঠিন।

বাহ্যতঃ পরস্পরবিরোধী স্তর মূলে একই অখণ্ড-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ।

ধর্ম্ম-জীবনের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে দুইটী মত।

আবার যাঁহারা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মমতের কোন স্থিরতাই নাই একবার যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছেন আবার পরক্ষণেই তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার মতসকল পরস্পর বিরোধী, পূর্ব্বাপর ঐ সমস্ত মতের মধ্যে কোন ঐক্য নাই,—তাঁহারাও যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রথম হইতে শেষাঙ্ক পর্য্যন্ত স্বামীজীর জীবন নাট্যের এক অখণ্ড বিচিত্র লীলাভিনয় দেখিতে সমর্থ হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—"মশারি তুলিয়া দেখরে মুখ।" প্রত্যেক মহৎ জীবনে যাহা ঘটিয়া থাকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছে। অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছু ইহাতে নাই। স্থাণুর মত অচল একটা বিশেষ আদর্শকে যাঁহারা স্বামীজীর জীবনের বিকাশোম্মুখে প্রত্যেক স্তরেই দেখিতে চান অথবা দেখিতে পান তাঁহারা ভ্রান্ত আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদ কল্পিত। ইহা মায়িক, ইহা জড়বাদের নামান্তর মাত্র। তাঁহারা জীবনবাদী নহেন। তাঁহারা জীবনের ধর্ম্মকেই অস্বীকার করেন। কেননা জীবনের ধর্ম্মই পরিবর্ত্তনোম্মুখী। যাঁহারা বিকাশের বিভিন্ন স্তর দেখিতে ইচ্ছুক নহেন বা ঐরূপ দেখা অন্যায় কিংবা পাপ মনে করেন তাঁহাদের ধারণা স্বামীজীর ধর্ম্মজীবনের বিকাশে নানারূপ স্তর দেখিতে গেলে তাঁহার চিরপূজ্য মহিমাকে খর্ব্ব করা হইবে। কিন্তু ইঁহাদের ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। মনুষ্য-জীবন ত দূরের কথা, যাহা জীবনধর্ম্মী, তাহাই পরিবর্ত্তনশীল। এই বিশ্ব সংসারই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের বিকাশকে, বিকাশের পথে বিভিন্ন স্তর গুলিকে, যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহারা মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকেই অস্বীকার করেন। কেননা পরিবর্ত্তনই জীবনের চিহ্ন, পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উন্নতি ও অবনতির অবসর আছে বলিয়াই এই জীবনসংগ্রাম। লীলাই হউক আর মায়াই হউক পরিবর্ত্তনকে কে কোথায় অস্বীকার করিতে পারে? প্রত্যক্ষকে কে অস্বীকার করিবে? স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনে পরিবর্ত্তন আছে, বিকাশ আছে, বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও ক্রমপরিণতিও আছে। হয়ত বা উন্নতি এমন কি অবনতিরও অবসর আছে। মায়াকে অবলম্বন করিয়া যে অস্তিত্ব, যে প্রবাহ, তাহাতে দোষ থাকা অসম্ভব নয়।

অন্যদিকে যাঁহারা পরিবর্ত্তন মাত্রকেই দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা মনে করেন, তাঁহারা জীবনধর্ম্মের স্বাভাবিক গতিকে বুঝিতে পারেন না, পরিবর্ত্তনের মুখে ধর্ম্মজীবনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে পৌঁছিবার মধ্যে যে সেতু বিদ্যমান, সেই বিভিন্ন স্তরের পরস্পর যোগের সেতু যে এক অখণ্ড মানব-মন, সেই মনের ক্রিয়াকে, মনের অখণ্ডতাকে তাঁহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই,—বিভিন্ন স্তরকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বলিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হন। যাঁহারা মনকে বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা আত্মাকে কি করিয়া বুঝিবেন? বস্তুতঃ যাহা স্থূল দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন, মনস্তত্ত্বের দিক হইতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাহা সকলেই এক প্রচণ্ড জীবনী-শক্তির অধীনে, এক অখণ্ড মনের ধারাবাহিক চিন্তাসূত্রে একত্র গ্রথিত। জীবন-প্রবাহ এক। প্রবাহে তরঙ্গ আছে, তরঙ্গে উত্থান ও পতন স্রোতকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। মুক্তি শুধু স্থিতি নয়। গতির মধ্যেও মুক্তি আছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের যে উদ্দামপ্রচণ্ড গতি-বেগ তাহাই তাঁহার জীবনের মুক্তিরও ইতিহাস। তাঁহার জীবনের শিক্ষাস্থিতি মুক্তি নয়, গতি মুক্তি।

প্রথমোক্ত সমালোচকগণ একের জন্য বহুকে অস্বীকার করেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকগণ বহুকে দেখিতে গিয়া এককে দেখিতে পান না, অন্তর্দৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া পড়েন। শাস্ত্র বলেন আমাদিগকে চক্ষুষ্মান হইতে হইবে। বস্তুতঃ, যিনি এক তিনিই ত বহু। এই পরিদৃশ্যমান বহু যদি এক হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া থাকে, তবে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের বহুবিধ স্তরও তাঁহার এক অখণ্ড মনের ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। ইহা তাঁহারই প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত আর ইহারই আলোকে তাঁহার জীবনের গতিকে—ইতিহাসকে আমি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কিন্তু এই ধর্ম্মজীবনের বিকাশ কি কেবল আপনাতে আপনি সম্ভব? আমরা ইতিহাস ও জীবনচরিত আলোচনায় প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিতে বাধ্য, এবং প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়াই যাহা অপরোক্ষানুভূতির বিষয়, তাহাকে অনুসন্ধান করিব। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের বিকাশ আলোচনা করিতে গিয়াও আমাদিগকে যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে। যাহা প্রত্যক্ষ নয় তাহাকেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

জীবনচরিত আলোচনায় প্রত্যক্ষের স্থান। প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়া অপরোক্ষের সন্ধান।

অদ্বৈত বেদান্ত বলে যে এক পরমাত্মাই আছেন, আর কেহ বা কিছুই নাই;—চক্ষে দেখা গেলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে নাই। আমি এবং আমার বাহিরে যাহা দেখিতেছি ইহা সকলেই স্বরূপতঃ সেই এক পরমাত্মা। সুতরাং সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আমার জন্মও মিথ্যা, মৃত্যুও মিথ্যা। জীবনধারণ ত মিথ্যা বটেই। হয়ত অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারও মিথ্যা। আমার জীবনের যত বিকাশ ও পরিবর্ত্তন সকলই কল্পনা মাত্র। কেননা উপাধিবিশিষ্ট এই যে ক্ষুদ্র আমি,—এই আমিই একটা প্রকাণ্ড ভ্রম। সংসার নাট্যের যত কিছু লীলাভিনয় চলিতেছে—তাহা সমস্তই এই মহা ভ্রমকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে। এই

জীবনী আলোচনায় অদ্বৈত বেদান্তের পন্থানুসরণ।

ভ্রমকে দূর করাই জীবের লক্ষ্য। এই ভ্রমের নিরসনেই জীবের মোক্ষ। 'অহং' ও 'ইদং' এক্ষ যত অস্থিরতা—যত পরিবর্ত্তন—সমস্তই মায়া-প্রসূত। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব আর ব্রহ্ম এক।

কিন্তু জীব ব্রহ্ম ঐক্য জ্ঞান ত চারিটিখানি কথা নয়। "কেবল সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন যাঁহারা" এই অদ্বৈত সাধনে তাঁহারাই শুধু অধিকারী—একথা শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহনই বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে শতাব্দীর শেষ ব্যক্তির জীবনের আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন নহেন—সেই সমস্ত নিম্নাধিকারীরাই জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা একজনকে লক্ষ্য করিয়া নিরাকার স্বগুণ উপাসনা করিবে। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের চরম পরিণতিতে পৌঁছিয়া অদ্বৈত বেদান্তকেই সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন এবং অধিকারীভেদে রাজা রামমোহনের মত তিনিও স্বগুণ নিরাকার, ঈশ্বরোদ্দেশে প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। দ্বৈতবাদ-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—ধর্ম্মসাধনার ধারায় ইহা ক্রম-উন্নতিশীল মানবচিন্তার তিনটি স্তরভেদ মাত্র।

জীবনের বিকাশকে বুঝিবার দুইটি দার্শনিক উপায়;—পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ।

বিকাশ বা পরিবর্ত্তনকে বুঝিবার দুইটিমাত্র প্রসিদ্ধ উপায় চিন্তারাজ্যে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম উপায়,—যাহার বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার স্বরূপের কোনই পরিবর্ত্তন হইতেছে না,—সমস্ত পরিবর্ত্তন লীলাটার কোনই পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ আত্মার পরিবর্ত্তন বা বিকাশ সম্ভবই নয়। দ্বিতীয় উপায়, যাহার বিকাশ হইতেছে, স্বরূপতঃ উত্তরোত্তর তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হইতেছে, দধি হইতে ঘোল হইতেছে, ঘোল হইতে মাখন হইতেছে, মাখন হইতে ঘৃত হইতেছে। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে এক দুগ্ধই দধি, ঘোল, মাখন ও ঘৃতের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তবে তাহা একদিকে বলা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু যাহা দুগ্ধ—তাহা দধি নহে, যাহা দধি—তাহা ঘৃত নহে, একের স্বরূপ বা গুণ অন্যে নাই। এখানে অনেকাংশে স্বরূপের ও স্বধর্ম্মের বিনাশ দেখা যাইতেছে। অথচ ইহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্রও আছে, কেননা ইহারা সকলেই একই দুগ্ধের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিকে এইরূপ দুগ্ধ হইতে ঘৃতে পরিবর্ত্তনের যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল, সেই দৃষ্টান্তের অনুপাতে হয় ত কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আবার কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে—বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের বিকাশকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা ভ্রমাত্মক। তাঁহার জীবনের সে সমস্ত বিভিন্ন স্তর একের পর আর আমরা দেখিয়াছি,—তাহা দেশে ও কালে,—কার্য্য-কারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়া লোকলোচনে ঐরূপ প্রতিভাত হইয়াছে মাত্র,—যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার অবশ্যই একটা ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু ঐ সমস্ত বিকাশ বা পরিবর্ত্তনের কোন পারমার্থিক সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন বা বিকাশ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

পরিণামবাদই হউক, অথবা বিবর্ত্তবাদই হউক,—লীলাই হউক বা মায়াই হউক, পারমার্থিক দৃষ্টিতেই হউক বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই হউক—বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের যে পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনের মুখে যে সকল বিভিন্ন স্তর আমাদের সম্মুখে একে একে ধীরে ধীরে প্রকট হইয়াছে,—সেই প্রত্যক্ষকে দেশ কাল ও নিমিত্তের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা জীবনের দিক দিয়া, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ও বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীর একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ না করিয়া পারি না। কিন্তু ইহা দ্বারা বিবেকানন্দের যে অংশ দেশ কাল ও সমস্ত কার্য্য-কারণ সম্পর্কের অতীত,—তাহার অস্তিত্বও কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। যাহা ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানের ক্ষীণপরিসরের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না,—যাহা বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্দ্ধে—তাহাকে অযথা বিতণ্ডার বিজৃম্ভণে জড়িত করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। অস্বীকার করা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ছোট বড় সমস্ত জীবনের, জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের এমন একটা দিক আছে যাহা বহু পরিমাণে অদ্যাপিও অস্পষ্ট। ইহা স্বীকার না করিলে সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে। মানব জীবনের ঘটনাবলী কার্য্য-কারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়া যিনি দেখাইতে ইচ্ছা করেন সত্যকে অতিক্রম করা, কোন ক্রমেই তাঁহার উচিত হয় না।

বিকাশের অদৃশ্য কারণ বহু পরিমাণে অজ্ঞেয়।

অপ্রত্যক্ষ, অদৃশ্য কি কারণে বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবন বাঙ্গলায় শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া প্রকট হইল কে বলিতে পারে? কেহই পারে না। ঐ সম্বন্ধে সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতে যাহা কিছু সম্প্রতি বলা যাইতে পারে, ইতিহাসে স্মরণীয় মহাপুরুষদের জীবনের ব্যাখ্যাকল্পে তাহা যথেষ্ট নহে। যাহা ঘটিয়াছে,—তাহার পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া আমরা একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, অনুমান করিতে পারি মাত্র। বিবেকানন্দ কলিকাতায় কায়স্থজাতির মধ্যে একটা শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে আধারের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাকে উপেক্ষা করা যায় কিরূপে? স্বরূপে সকলেই সেই এক ব্রহ্ম হইলেও আমাদের যাহা কিছু বলিবার কহিবার তাহা ত বহু অংশে এই আধারকে লইয়াই। দেশ কাল ও নিমিত্তের মধ্যে এই প্রপঞ্চময় অথচ অনির্ব্বচনীয় চৈতন্য-সমন্বিত আধারের যে লীলাভিনয়—তাহাই ত জীবন—তাহাই ত ইতিহাস। গতিমুখে তাহাইত বিকাশ। আর জন্ম ও মৃত্যুর পরিসরের মধ্যে তাহাইত চঞ্চল ও মুখর। স্তব্ধ অন্ধকারের ইতিহাস ত আমরা জানিনা। কেহত তাহা আজিও ঠিক ঠিক বলিতে পারিল না।

স্বামী বিবেকানন্দের বংশ-পরিচয় ও বংশানুক্রম।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতামহ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। বিবেকানন্দের পিতা সহজ দাতা, মুক্তস্বভাব, সঙ্গীতপ্রিয়,—কথঞ্চিৎ পাশ্চাত্য ও মুসলমান ভাবাপন্ন যুক্তিবাদী ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। বিবেকানন্দের মাতা শিবের উপাসিকা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী ছিলেন। বংশানুক্রমে ইঁহাদের নিকট হইতে কি সংস্কার

বিবেকানন্দের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, কে বলিবে? বিবেকানন্দও সন্ন্যাসী হইলেন। তিনিও মুক্তস্বভাব, সঙ্গীতপ্রিয়, পাশ্চাত্যদর্শনের যুক্তিবাদী, নির্ভীক এমন কি যাহাকে বলা যায় ডানপিটা যুবক ছিলেন। সর্ব্বত্যাগী উমানাথ শঙ্করও তাঁহার উপাস্য ছিল। কিন্তু এই সামান্য বাহ্য সাদৃশ্যের অন্তরালে, ভিতরে ভিতরে যে কি এক অদৃশ্যশক্তি বংশানুক্রমের মধ্য দিয়া কার্য্য করিয়াছে, তাহার অনেকটা অংশই আমাদের দৃষ্টির সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে। কেবল বংশানুক্রম ও তাহার অবস্থাধীন ক্রম পরিণতি স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত জীবনকে সম্ভব করে নাই। মহৎ জীবনের ব্যাখ্যা বংশানুক্রমে হয় না। ইহা নূতন সৃষ্টি।

জন্মকাল, কলিকাতায় ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন কলিকাতার এক গলির মধ্যে কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল রামমোহন ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের সহিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে পঞ্চদশ বৎসর পরিচালিত করিয়া, কেশবচন্দ্রের হস্তে শতাব্দীর এই অভিনব ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনকে পৌঁছাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছেন, কেননা আর মাত্র ৩ বৎসর পরেই কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মগুরু দেবেন্দ্রনাথের সহিত জাতিভেদের সমস্যা লইয়া কলহ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার একমাত্র নেতা হইয়া ইহাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করিবেন। রামমোহন মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—দেবেন্দ্রনাথ, বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করিয়াছেন, বেদের স্থানে আত্ম-প্রত্যয়কে ঈশ্বর-উপলব্ধি ও ধর্ম্ম-সাধনার ভিত্তি করিয়াছেন,—রামমোহনের শঙ্করানুবর্ত্তী অদ্বৈতবাদ পরিহার করিয়া, এক নিরাকার স্বগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন,—কেশবচন্দ্রের খৃষ্টভক্তি দেখা দিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ, খৃষ্টবিভীষিকা দেখিতেছেন। মহাপুরুষবাদের পূর্ব্বাভাষ প্রকট হইয়াছে,—বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে ছয় বৎসর হইল রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণ তখনও সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেছেন,—ডিরোজীওর শিষ্যদের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি সেই যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিন্তা সমাজ-বিদ্রোহ নাস্তিক্যবাদ একেবারে তিরোহিত হয় নাই,—ইতস্ততঃ তাহার স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতেছে একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। অন্যদিকে স্যার রাধাকান্তের ধর্ম্মসভা রূপান্তরিত হইয়া, বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে হরিসভা রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের এই বিচিত্র বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টার পরিচয় দিতেছে। কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজে যখন এইরূপ সংস্কার ও সংরক্ষণের বহুবিধ তরঙ্গ যুগপৎ উত্থিত হইয়া সমাজচিত্তকে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিতেছে, তখন একদিন—১৮৬৩ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন।

যে ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাকে পরবর্ত্তী জীবনে কার্য্য করিতে হইয়াছিল,—সেই ক্ষেত্রের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনারা পাইলেন। এই ক্ষেত্রের আব্‌হাওয়া তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল,—তাহাও সবিশেষ আলোচ্য। কিন্তু যেমন বংশানুক্রম তেমনি কেবল পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা ও ঘটনা বৈচিত্র্য তাঁহার জীবনকে সম্ভব করে নাই। কোনও মহৎ জীবনকে তাহা করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তিনি প্রথম যৌবনে ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া যোগদান করিলেন কিসের প্রেরণায়? তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া, আর প্রচলিত প্রথা বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা একই কথা। যুবক নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ প্রচলিতের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের বীজ প্রথম হইতেই অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছিল। ইহা তাঁহার প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান একটা ঘটনা বা উপলক্ষ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান।

প্রকৃতিতে প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ।

তাহার ধর্ম্ম জীবনের বিকাশের পরবর্ত্তী স্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই সহজ জ্ঞানে সহজ-লভ্য বা আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস ক্রমে শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় ১৮৮১ খৃঃ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। এই বৎসরেই পরমহংস দেবের সহিতও তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে তখন সংশয়বাদের মতে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজলভ্য আস্তিক্য বুদ্ধি তখন পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভাবে তাহার মন হইতে স্খলিত হইতেছিল। মানসিক বিকাশের ইতিহাসে ইহা তাঁহার পক্ষে এক অতি সঙ্কটকাল বলিয়া ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন।* এই সময়ে সংশয়বাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেও, ঈশ্বর লাভের জন্য এক তীব্র

ব্রাহ্মধর্ম্মে রসসহজলভ্য সুখময় সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস শিথিল।

এই সময়ের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিমত।

* [*A fellow student's reminiscences by Dr. Brojendranath Seal.*]

"This was the beginning of a critical period in his mental history. * * J. S. Mill. upset his first boyish theism and easy optimism which he had imbibed from the outer circles of the Brahmo Samaj. The arguments from Causality and Design were for him broken. * * He was haunted by the problem of the Evil in Nature and Man. * * Hume and Spencer settled him in Scepticism. * * But music still stirred him * * gave him sense of unseen realities. * * It was at this time that he came to me. * * He asked for a course of Theistic philosophy. * * I named some authorities. But Intuitionists and Scotch commonsense school confirmed him in his unbelief. * * * I gave him a course of readings in Shelley. It moved him. I spoke to him of a higher unity that of *Para Brahman* as the Universal Reason. * * The Sovereignty of Universal Reason and the negation of the individual as the principle of morals satisfied his intellect * * gave him conquest over scepticism and materialism. * * But this brought him no peace. * * The conflict now entered deeper in his soul. * * His senses were keen

ব্যাকুলতা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। এই ব্যাকুলতার বশবর্ত্তী হইয়াই—তিনি এই সময় ইতস্ততঃ যার তার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, মহাশয় আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামুখে—এই সংশয়বাদাচ্ছন্ন সঙ্কটকালের এই প্রচণ্ড ধর্ম্ম-পিপাসা, ঈশ্বরকে জানিবার জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁহার জীবনকে সংশয় বা নাস্তিক্যবাদের মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই—ইহা তাঁহার জীবনকে গতিমুখে খরবেগে চালিত করিয়াছে। ইহারই প্রেরণায় তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সংশয়তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে নাই। মানসিক বিকাশের পথে এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁহাকে নিরন্তর তাড়না করিয়া এক অতি বড় পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে।

তাঁহার বংশানুক্রম, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, তাঁহার চারিদিকের মানসিক আবহাওয়া ছাড়াও, তাহার ধর্ম্মজীবনের বিকাশে আর একটি বস্তুর উল্লেখ অতিশয় আবশ্যক। বিবেকানন্দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলিয়া এক অতি প্রচণ্ড সারবান বস্তু ছিল। এবং ইহা অতি প্রচুর পরিমাণেই ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য বোধ, এই আত্মসংবিৎ, এই প্রবল সত্যানুরাগ, এই তীব্র ব্যাকুলতা—ইহা ছিল বলিয়াই কি হিন্দু সমাজ, কি ব্রাহ্ম সমাজ—কোন সমাজেই তিনি রাজা রামমোহনের ভাষায় "কেবল স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করিতে" পারেন নাই। কেননা "তাহা পশু জাতীয়ের ধর্ম্ম হয়।" তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা বস্তু ছিল, যাহার জন্য তাঁহাকে সমস্তই নিজের চক্ষে দেখিয়া লইতে হইয়াছে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুভব করিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবকেও তিনি একদিনে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহাকে অনেক পরীক্ষা করিতে হইয়াছে—অনেকদিন লাগিয়াছে।

বিবেকানন্দ চরিত্রের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

রামকৃষ্ণদেবের সহিত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতের দিনই রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর একদিন যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহা ১৮৮১ খৃঃর শেষ ভাগে নভেম্বর মাসে ঘটে। পরমহংস দেব তখন দ্বাদশবৎসর কঠোর সাধনা করিয়া, তারপর ছয়বৎসর নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, প্রায় সাত বৎসর যাবৎ দিব্য ভাবের প্রেরণায় ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাপৃত আছেন।

পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাতের ইতিহাস, ও জীবনের গতির পরিবর্ত্তন।

---

and acute, his natural cravings and passions strong and imperious, his youthful susceptibilities tender, his conviviality free and merry. * * The struggle soon took a seriously ethical turn, -reason struggling for mastery with passion and sense. * * He confessed that Reason could not hold out arms to save him in the hour of temptation. * * He sought for a power unto deliverance. This quest brought him to the Paramahansa of Dakhineswar, in a doubting spirit, who spoke to him with an authority as none had spoken before and by his *sakti* brought peace into his soul and healed the wounds of his spirit, * * finding assurance in the Saving Grace and Power of his Master he went about preaching and teaching the creed of the Universal Man and the absolute and inalienable sovereignty of the Self.—p. 172–177. *Eastern and Western Disciples.*

কেশবচন্দ্র ইহার প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিও দুই বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছেন। এইবার নরেন্দ্রনাথ আসিলেন। সিন্ধু শেষ বিন্দুকে গ্রাস করিল। পৃথিবী বুঝিবা ইহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম আসিলেন সেই দিনই পরমহংসদেব নরেন্দ্রের সহিত পূর্ব্বপরিচিত পরম আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যেন কতদিনের চেনাশুনা। পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, তুমি কেন এতদিন আস নাই, আমি যে তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিয়া আছি। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ সুরেশ (সুরেন ?) বাবুর কলিকাতার বাড়ীতে পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন করেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাতেই পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সমাধিভাবাপন্ন করিয়া দেন। তাঁহাকে নররূপী নারায়ণ বলেন, সন্দেশ খাওয়ান এবং একা একদিন আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু নরেন্দ্র নাথের একে বিচার-বুদ্ধি প্রবল, তার উপর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ঈশ্বর বিশ্বাস হইতে স্খলিত হইয়া তখন তিনি একদিকে যেমন সংশয়বাদের মধ্যে পতিত হইয়াছেন, আবার অন্যদিকে এই সংশয়বাদের গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ঈশ্বর লাভের প্রকৃত উপায় অন্বেষণে ইতস্ততঃ ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন যে বাহির হইতে কোন একটা দৈব শক্তির অনুগ্রহে নরেন্দ্রনাথ এই সময়, তাঁহার মানসিক সঙ্কট ও সংশয়ের অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। মনের যখন এইরূপ অবস্থা ঠিক তখনি এই মহামিলনের সূত্রপাত দেখা দিল। ইহা কি এক পরম আশ্চর্য্য ঘটনা নয়? ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ-কথিত এই দৈব শক্তি, এই দেব অনুকম্পা পরমহংসদেবের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল। আপনারা জানেন, কেমন করিয়া ভবিষ্যের ইতিহাস এই ঘটনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিল।

পরমহংসদেবের স্পর্শ-জনিত সমাধিতে অবিশ্বাস।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ প্রথম দিনের স্পর্শজনিত সমাধিকে অবিশ্বাস করিলেন। ভাবিলেন, ইহা একটা বাতুলতা মাত্র। দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় প্রায় একমাস পরে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের দিনেও রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণপদ তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করিয়া নরেন্দ্র-নাথকে সমাধিগ্রস্ত করিয়া দিলেন। সেদিনেও নরেন্দ্রনাথ ইহাকে একটা সম্মোহন-বিদ্যা বলিয়া মনে মনে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয় দিনে অনেক লোকের ভিড় ছিল। রামকৃষ্ণদেব এইদিন নরেন্দ্রনাথকে লইয়া সমীপবর্ত্তী যদু মল্লিকের উদ্যানবাটিতে গমন করিলেন। এবং সেদিনেও নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া সমাধিভাবাপন্ন করিলেন। তৃতীয়দিনে, সমাধিভাবাপন্ন হইয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "ওগো তুমি আমার এ কি করিলে ? আমার যে বাপ মা আছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "তবে এখন থাক্। একবারে কাজ নাই, কালে হইবে।"

এইদিন রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের মনে সত্যিকারভাবে গভীর প্রশ্নসমূহ উত্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কে ? আমার মত প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যুবককে, আমার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবল স্পর্শমাত্রে সংজ্ঞাহীন করিয়া দিতে পারে যে শক্তি, সে শক্তি কিসের ? এই অর্দ্ধ-উন্মাদ পূজারী ব্রাহ্মণ কি সেই শক্তির ধারক-বাহক-ও পরিচালক ? কে ইনি ? স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, প্রথম সাক্ষাতের ৩৷৪ বৎসর পরে তবে নরেন্দ্রনাথ, পরমহংসদেবের নিকট সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন। তাহা হইলে দেখা যায় যে, পরমহংসদেবের দেহরক্ষার মাত্র বৎসর খানেক পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ পরমহংদেবের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিলেন। গুরুবাদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের নিকট, পাশ্চাত্য সংশয়বাদমূলক দর্শনাদির নিকট যেসমস্ত শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা এইরূপে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট হইতে যে স্বগুণ নিরাকার এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা তিনি পাইয়াছিলেন তাহাও একদিনে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কোন কিছু পরিত্যাগ করিতে হইলে মানুষ তাহা একদিনে পারেনা। পরমহংসদেব, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তাঁহাকে অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি অদ্বৈতবাদমূলক শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়িতে দিতেন। কিন্তু হইলে কি হয়, নরেন্দ্রনাথ বলিতেন আমি আর ঈশ্বর এক, এরূপ ভাবা মাথা খারাপের লক্ষণ। আর ইহা পাপও বটে। এককালে পাপবোধও নরেন্দ্রনাথের ছিল। তা'ছাড়া অদ্বৈতবাদের যে ব্রহ্ম, সে ত একরকম নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। ঘটি ঈশ্বর, বাটী ঈশ্বর—এ সব যদি পাগলামি না হয় ত পাগলামি কি গাছে ধরে ? শ্রীরামপুরের পাদ্রী-মহোদয়গণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা ডফ্ একদিকে; আবার অন্যদিকে উত্তরকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের তরফ হইতে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ঘোর রোলে এই কথাই বলিয়া আসিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব আবার একদিন নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিলেন, নরেন্দ্রর অদ্বৈতানুভূতি হইতে আরম্ভ হইল। জগৎ আছে কি নাই, হুঁস নাই। হেঁদুয়ার রেলিংএ মাথা ঠুকিয়া তবে বিশ্বাস করিতে হয় যে তিনি জাগিয়া আছেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন! ধর্ম্মজীবনের পরিবর্ত্তন মুখে তাঁহার এক সময়ের স্বীকারোক্তিতে বলিতে হয় যে এইবার পরমহংসদেবের স্পর্শে অদ্বৈত বা অখণ্ডের সমাধিতে মগ্ন হইয়া সত্যই নরেন্দ্রনাথের মাথা খারাপ হইল।। ধর্ম্মজীবনে মতের পরিবর্ত্তন কি অদ্ভুত। প্রচারক-জীবনের গৌরবময় স্তরে আমরা দেখিতে পাই এই নরেন্দ্রনাথ কি প্রচণ্ড তেজের সহিত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন। এই দুই বিভিন্ন স্তরের যোগসূত্র কোথায় ? এই দুই বিভিন্ন স্তর—আমরা একের পর আর কেন দেখিতে পাইলাম ? ইহা কি ঘাতপ্রতিঘাতমুখে আপনাতে আপনি বিকাশ ? স্বামীবিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার কি তাঁহার স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় না ইহা তাঁহার গুরুদেবের ইচ্ছায় ? ইহা কি তাঁহার স্বভাবের বিকাশ না পরমহংসদেবের প্রভাব ? এমত পরিবর্ত্তন কেন হইল, কে করিল ? জীবনে সমস্ত সমস্যার উত্তর মিলেনা। জীবনের সমস্ত অংশটা আমরা দেখিতে পাইনা। যাহা আমাদের লোকলোচনের অন্তরালে সংঘটিত হয়, তাহার অনেক কারণ ঐতিহাসিক জীবনচরিত লেখক বা, তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ববিদের নিকটেও অদ্যাবধি অজ্ঞাত। কাজেই সমস্ত

অদ্বৈত সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস।

সমস্যারই উত্তর দিবার চেষ্টা করা বৃথা শক্তিক্ষয় না হইলেও, অনেকটা পণ্ডশ্রম ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের Our Return to the Vedanta—বেদান্তে ফিরিয়া আসা অপেক্ষা, নরেন্দ্রনাথের অদ্বৈত বেদান্তে ক্রম পরিণতি লাভ করা অধিকতর চমকপ্রদ, পরম আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক বিপদ, দারিদ্র্যভোগ।

এইবার নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ উপস্থিত। সময় বুঝিয়া জ্ঞাতিরা ভদ্রাসনখানি গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত। বাঙ্গলা দেশের জ্ঞাতিরা ইহা করিয়া থাকেন। ভ্রাতা ভগিনী ও বিধবা মাতাকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ কপর্দ্দকহীন নিঃসম্বল। আহার কোন দিন জুটিত, কোনদিন জুটেনা। যাহার বাল্য ও কৈশোর সমৃদ্ধির ক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছে, অদৃষ্ট চক্রের অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনে সহসা একদিন যদি তাহাকে পথের ধূলিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহারা ছিল তাহারা যদি ঘরে গিয়া দুয়ার দেয়, যদি তাহার দিনান্তে একমুষ্টি শাকান্নও না জুটে, তবে ভুক্তভোগী ভিন্ন সেকষ্ট কে বুঝিতে পারিবে? হে বাঙ্গলার যুবকগণ, তোমাদের মধ্যে কতজন না এইরূপ বুভুক্ষিত হইয়া আজ এই সহরের পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছ, তোমাদের গৃহে, ভ্রাতা ভগিনী ও বিধবা মাতা অনাহারে তোমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, তোমরাও কি নরেন্দ্রনাথের এইকালের অবস্থাটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না? এই সময় নরেন্দ্রনাথের পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তিনি আর জুতা কিনিয়া পরিতে পারেন নাই, এই সহরে নগ্নপদে তাঁহাকে একদিন পথ চলিতে হইয়াছে। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, ছিন্ন মলিনবাসে আবৃতদেহ এই নিরুপায় অভিমানী যুবা সহরের সমস্ত বড় বড় অফিসের দরজায় সামান্য বেতনের একটি চাকরীর জন্য মাথা খুঁড়িয়া যখন ব্যর্থমনোরথে সমস্ত দিনের উপবাসের পর ক্ষুধায় ও চিন্তায় জর্জ্জরিত দেহমন লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তখন সহসা বৃষ্টি আসিয়া গতিরোধ করিল। তিনি পথের পার্শ্বে প্রথমে দাঁড়াইলেন, পরে আর না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন, অবশেষে সমস্ত রাত্রি পথের পার্শ্বে পড়িয়া নিদ্রায় অচৈতন্য রহিলেন।

বন্ধুগণ! সংসারে ইহাও সম্ভব। সমস্ত পৃথিবী একদিন যাহার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল, এই সহরে ভাবিতে পার একদিন তাঁহার জন্য একমুষ্টি খাদ্য মিলে নাই। এই ক্ষুধিত কেশরী এই লোকারণ্যময় গহনে একদিন না খাইতে পাইয়া যে শক্তিকে উদ্বোধন করিয়াছিল, বিস্তীর্ণ ভূভারতে আজ এমন অন্ধ কে আছে যে তাহার জাজ্বল্যমান ফল দেখিতে পাইতেছে না। যাহার দিক হইতে সকলে মুখ ফিরায়, বুঝিবা অলক্ষ্যে কিছু আছে, বা কেহ আছে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায়।

নরেন্দ্রনাথের দৈন্যাবস্থা পরমহংসদেব জানিতে পারিলেন। মায়ের কৃপায় মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা হইল। সে বিস্তীর্ণ বিবরণ আপনারা "লীলাপ্রসঙ্গে" পাঠ করিবেন। নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চাঁপাতলার স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, মাত্র চারি মাসের জন্য।

এই দারিদ্র্যের মধ্যে সুখী লোকের ভগবান আবার অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিল। নরেন্দ্রনাথ শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একদিন প্রভাতে ভগবানের নাম লইতেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের মা ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল ভগবান, আর ভগবান। ভগবান ত সব কল্লেন।" ইহার আঘাতও বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের বিকাশে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। "যে ভগবান আমাকে ইহলোকে খাইতে দিতে পারেন না তিনি যে পরলোকে আমাকে সুখে রাখিবেন তাহা আমি বিশ্বাস করিনা।"

মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব।

তারপর এইবার নরেন্দ্রনাথ রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিতা মৃন্ময়ী কালীর মধ্যে চিন্ময়ী মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলেন। ইহাও সম্ভব হইল। আমার সামান্য ধারণা এই যে জীবনের বিকাশে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। আজ যাহা অসম্ভব, কাল তাহা অত্যন্ত সম্ভব। ইহা বিচিত্র, ইহা অদ্ভুত। তথাপি ইহা জীবন, ইহা বিকাশ, ইহা সত্য, ইহা প্রত্যক্ষ।

ধর্ম্মজীবনের বিকাশের পথে কি করিয়া যে অসম্ভবও সম্ভব হয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাহা আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন।

পরমহংসদেবের দেহরক্ষা, মঠের সূত্রপাত ও ভারত ভ্রমণ।

১৮৮৬ খৃঃ পরমহংসদেব দেহরক্ষা করেন। পরমহংসদেবের দেহভস্ম লইয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। নরেন্দ্রনাথের উদারতায় কলহের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি একদল গোড়া শিষ্যেরা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পরমহংসদেবের নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় করেন। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর হইতেই স্বীয় মতাবলম্বী গুরুভ্রাতাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। বরাহনগর মঠে সর্ব্বপ্রথম এই সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যের সূত্রপাত দেখা যায়! বর্ত্তমান ভারতের প্রথম বৈদান্তিক সন্ন্যাসী এই সঙ্ঘ গঠন কল্পনার্থ তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তারপর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। উপর্য্যুপরি দুই দুই বার পীড়িত হইয়াও তিনি সাক্ষাৎভাবে সমগ্র দেশের পরিচয় না লইয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরমহংসদেবের দেহরক্ষার পর তিনি দু' তিন বৎসর বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে বাস করেন। তার পর হইতে ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে পর্য্যন্ত তিনি ভারত ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। বর্ত্তমান ভারতকে জানিতে হইলে ইহার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে জানিতে হয়। নরেন্দ্রনাথ তাহাদের পরিচয় নানা সম্পর্কের ভিতর দিয়া ইতিপূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের ছাড়া ভারতবর্ষের আরও দুই শ্রেণীর মনুষ্যকে জানা প্রয়োজন! ভারতের করদ ও স্বাধীন নরপতিগণ—যাঁহারা ইংরাজের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুদ্ধ করিয়া নামমাত্র কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা অদ্যাবধি রক্ষা করিয়াছে এবং ইহার কোটী কোটী দীনদরিদ্র সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন জাতির মনুষ্য সমষ্টি—যাহারা

আজ ক্ষুধার তাড়নায় জীবন্ত নরকঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে—এই দুই শ্রেণীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার প্রায় ৪।৫ বৎসর কাটিয়া গেল।

এইরূপে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর মনুষ্যদের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া তিনি ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে আমেরিকাস্থিত চিকাগো সহরের ইতিহাস-বিখ্যাত ধর্ম্ম মহাসভায় যাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স কিঞ্চিন্ন্যূন ৩১ বৎসর মাত্র। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় বাঙ্গলা দেশ তখন স্বামী বিবেকানন্দকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় স্বজাতীয়েরা তাহাদের মহাপুরুষকে চিনিতে পারেনা।

চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভা।

আপনারা সকলেই জানেন চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক গুরুকৃপায় কিরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সম্মুখে এই চিকাগো ধর্ম্মসভার মধ্য দিয়া স্বামীজীর অভ্যুদয় এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। কিসে ইহা সম্ভব হইল? কেইবা জানিত এইরূপ হইবে? স্বামীজীর ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই ঘটনার অতিবিস্তৃত বর্ণনা দ্বারা আপনাদিগকে আমি বিব্রত করিব না। ১৮৩০ খৃঃ বাঙ্গলার এ যুগের ইতিহাসে স্মরণীয়। কেননা ঐ বৎসর দেওয়ান রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করিয়া ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃঃও বাঙ্গলার ইতিহাসে স্মরণীয়। কেননা এই বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন। এ যুগের বাঙ্গলার ইতিহাসে এই দুইটি তারিখ স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন।

আমেরিকা হইতে ১৮৯৫ খৃঃ স্বামীজী ইংলণ্ড গমন করেন। ইংলণ্ডে প্রচার শেষ করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসেই ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অশোকের পর ভারতের বাহিরে এত বড় ধর্ম্মের প্রচার ভারতেতিহাসে আর দেখা যায় না। বাঙ্গলার শিক্ষিত অথচ উপেক্ষিত যুবকগণ, মনে রাখিও—বাঙ্গলা দেশে তোমাদের মত একজন উপেক্ষিত যুবক ইহা একদিন এ যুগেও সম্ভব করিয়া দিয়া গিয়াছে।

তখন আলমবাজারে মঠ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গার পশ্চিম পারে নীলাম্বর মুখার্জ্জির উদ্যানে মঠ উঠাইয়া আনিলেন। তারপর ১৮৯৯ খৃঃ ১৮ই মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে তিনি রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে বিধিমত সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দিলেন। এইবার তাঁহার গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রায় সমস্ত কর্ম্মই শেষ হইয়া আসিল।

কিন্তু এখনও তাঁহার অদ্ভুত ধর্ম্মজীবনের সমস্ত বিকাশ শেষ হইয়া যায় নাই। এই বৎসরেই তিনি কাশ্মীর ভ্রমণে বহির্গত হন এবং ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে গিয়া, বিজয়ী মুসলমান কর্ত্তৃক মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তিনি ঐ মুসলমান আক্রমণের সময় জীবিত থাকিলে, নিশ্চয়ই এই মন্দিরটি ভগ্ন হইতে দিতেন না। এই প্রকার আক্ষেপ বীরোচিত,

ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে দৈববাণী।

সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার আর একটা দিকও আছে। মা ভবানী, দৈববাণী করিলেন যে, এ তোমার কিরূপ স্পর্দ্ধা? আমি তোমাকে রক্ষা করিব, না তুমি আমাকে রক্ষা করিবে। আমি কি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে সপ্ততাল সোনার মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে পারিনা? রজোগুণাচ্ছন্ন উদ্ধত, শান্ত হও।

কর্ম্মজীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

বিবেকানন্দের চৈতন্য হইল। বিজয়ীবীর যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে যে অত্যাশ্চর্য্য পবিবর্ত্তন দেখা দিল, তাহার সঙ্গে তুলনায় পূর্ব্বের অন্যান্য পরিবর্ত্তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যদিও বিবেকানন্দের আত্মনির্ভরশীলতা তাঁহার মানসিক বিকাশের কোন স্তরেই স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় নাই, তথাপি এই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন একটা প্রখর স্বাজাত্যাভিমান নিয়ত জাগ্রত ছিল যে, অনেককে তাহার তীব্রতা কষ্টের সহিত অনুভব করিতে হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল এ যুগে পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার সন্ন্যাসী, ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর পর হইতে যেন মরিয়া গিয়া আর এক ভিন্ন মানুষ হইলেন। কে জানে, হয়ত সেইটাই তাঁহার ভিতরের মানুষ বা "পাকা আমি" কিনা? আর তাঁহার নিজের ইচ্ছাশক্তি পরিচালনের কোন স্পৃহা বড় একটা দেখা গেল না। তিনি ঐ বৎসরই ১৮৯৯ খৃঃ জুন মাসে দ্বিতীয়বার

দ্বিতীয়বার আমেরিকা গমন।

আমেরিকা যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু এবার যেন সেই ১৮৯৩ খৃঃর উগ্র প্রচারক মরিয়া গিয়াছে, এবার তিনি শুধু দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বেড়াইয়া আসিলেন।

তাঁহার এই সময়ের মনের অবস্থা অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁহার একখানি চিঠিতে এই সময়ের মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় আপনারা পাইবেন। তজ্জন্য চিঠিখানি দীর্ঘ হইলেও আমি তাহা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

কালিফোর্ণিয়া
১৮ই এপ্রিল, ১৯০০।

কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

কর্ম্মকরা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন, চিরদিনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। আর আমার সমুদয় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

আমি ভাল আছি—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্চি। লড়াইয়ে হার জিত দুইই হ'ল—এখন পুঁটলি পাঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। "অব শিব পার করো মেরো নেইয়া"—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।

কর্ম্মত্যাগ করিয়া বালক-ভাবে ফিরিয়া আসা।

যতই যা হ'ক্, জো, আমি এখন সেই পূর্ব্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাণী অবাক্ হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত! ঐ বালক ভাবটাই হচ্চে আমার আসল প্রকৃতি—আর, কাযকর্ম্ম পরোপকার যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছু কালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুন্‌তে পাচ্চি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! যাঁতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্য্যন্ত কণ্টকিত করে তুলচে। বন্ধন সব খসে যাচ্চে। মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে। কাজকর্ম্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। জীবনের প্রতি আকর্ষণও

শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান।

প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই! ঐ তিনি বল্‌চেন—"মৃতের সংকার মৃতেরা করুকগে, সংসারের ভালমন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুক্‌গে, তুই ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছে পিছে চলে আয়।"—যাই, প্রভু, যাই!

মায়াতীত ভাব।

হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্ব্বাণ সমুদ্র দেখ্‌তে পাচ্চি। সময়ে সময়ে উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি—সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র! মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্য্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ কচ্চে না।

পুনর্জন্ম হইবার কারণের অভাব।

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি—এত যে দুঃখ ভুগেছি, তাতেও খুসী—জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুসী, আবার এখন যে নির্ব্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুসী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, অথবা, এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্চি না। দেহটা নিয়েই আমার মুক্তি দিক্, অথবা দেহ থাক্‌তে থাক্‌তেই মুক্ত হই, সেই পুরোণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য গেছে আর ফিরচে না।

নেতৃত্ব পরিত্যাগ।

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে এটা কেবল পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস। অনেকদিন হ'ল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিইছি। কোন বিষয়েই "এইটে আমার ইচ্ছে" বল্‌বার আর অধিকার নাই। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ-রূপে গা ঢেলে দিয়ে থাক্‌তুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিইছি। উপরে দিবাকর নির্ম্মল কিরণ বিস্তার কচ্চেন—পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদ্‌শালিনী হয়ে শোভা পাচ্চেন—দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই এখন নিস্তব্ধ, স্থির, শান্ত! আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছাবিন্দু মাত্রও আর না রেখে, প্রভুর

মায়াতীত হইয়া মায়ার জগৎ—শুধু সাক্ষীরূপে নিরীক্ষণ।

ইচ্ছারূপে প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলিছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্‌তে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়। প্রাণের এই শান্ত নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়াবলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়।

ইতিপূর্ব্বে আমার কর্ম্মের ভিতর মান যশের ভাবও উঠিত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসিত আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আশঙ্কা থাকিত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসিত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে। আর, আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে, তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা-ভাসান দিয়ে চলিছি।

যাই, মা, যাই। তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে—যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!

আহা-হা—কি স্থির প্রশান্তি। চিন্তাগুলো পর্য্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতিদূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্চে,—আর, শান্তি,—মধুর মধুর শান্তি—যেন যা কিছু দেখ্‌ছি, শুন্‌ছি সকলকে ছেয়ে রয়েছে। মানুষ ঘুমিয়ে পড়্‌বার আগে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা অনুরাগ থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্য্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ। কেবল শান্তি, শান্তি! চারিপার্শ্বে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই! ঐ আবার সেই আহ্বান! যাই, প্রভু যাই।

সমাধির অবস্থার পূর্ব্বাভাস।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে,—কিন্তু সেটাকে সুন্দরও বোধ হচ্ছে না, কুৎসিতও বোধ হচ্ছে না! ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য এরূপ ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বল্‌বো। যা কিছু দেখ্‌ছি শুন্‌ছি সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে। কেননা, নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড় ছোট, ভালমন্দ, উপাদেয় হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চনীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সর্ব্বাপেক্ষা—উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি ইতিপূর্ব্বে যে বোধটা ছিল সকলের আগে সেটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে। ওঁ তৎ-সৎ।

মায়াতীত অবস্থায় জগতের রূপ ও তাহার উপলব্ধি।

তোমাদের চিরবিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ

১৯০০ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর তিনি আবার বেলুড়মঠে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে রাত্রে ঠিক নৈশভোজনের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিলেন। সে এক অতি হাস্যকর উপাদেয় ঘটনা যাহা বালকস্বভাব বিবেকানন্দ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আপনারা তাহা তাঁহার বিস্তৃত জীবনচরিতে পাঠ করিবেন। পরে ১৯০১ খৃঃ স্বামীজী পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারে বহির্গত হইলেন, সাধু নাগ মহাশয়ের পর্ণের কুটীরকে এই পৃথিবীবরেণ্য ধর্ম্ম প্রচারক তীর্থ জ্ঞানে অভিবাদন করিয়া আসিলেন। পর বৎসর ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই বেলুড মঠে সমাধি অবস্থায় বসিয়া আবার সেই দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিলেন। দেহের গতি দেহলাভ করিল। আত্মার অবিরাম গতি আবার কোনমুখে কোন দিকে ধাবিত হইল বা হইল কিনা কে বলিবে, কেইবা তাহা জানে।

পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার।

দেহত্যাগ।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের বিচিত্র বিকাশের যে ইতিহাস, আমি তাহার এক অতি

সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এবারের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আশা করি আপনাদের মধ্যে এই আলোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নানাদিক হইতে ইহা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত হইয়া উঠিবে।*

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

বঙ্গরবি আশুতোষ

হে বঙ্গের আশুতোষ, বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব!
গগনে পবনে তুমি রেখে গেছ যে সুধা-সৌরভ,
আজো তাহা পুলকিত করিতেছে সবার অন্তর—
সে সৌরভ জেগে রবে হিয়াতলে নিত্য-নিরন্তর!
জননীর অঙ্গে তুমি দিলে যেই কনক-কঙ্কণ
জগত-সভায় তারে যেই রূপে করিলে অঙ্কন,
শত উপচারে এই দীনা-হীনা বঙ্গবাণী-দ্বারে
যে অর্ঘ্য আনিয়াছিলে—সে কি কভু মিথ্যা হ'তে পারে?
আজি তুমি চলে গেছ পরপারে কোন্ কল্প-লোকে,
সেই সৌম্য মূর্ত্তি তব আজি আর পড়ে নাক' চোখে,
সত্য বটে, তবু সেটা সব চেয়ে বড় ক্ষতি নয়,
আমাদের কাছে তুমি রেখে গেছ পরম সঞ্চয়!
যে অসীম বিত্তে তুমি বাঙ্গালীর চিত্ত ভরি' দেছ,
তাই বড়,—বড় নয় যাহা তুমি সাথে নিয়ে গেছ।
তরুণ অরুণ যবে ফুটে ওঠে প্রাচীর ললাটে
আলোক-পুলক-ধারা ছড়াইয়া দেয় পল্লীবাটে,

* লেখক বিবেকানন্দ সোসাইটির আয়োজনে ১৯১৯ খৃঃ থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ দ্বাদশটি বক্তৃতা "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় ঊনবিংশ শতাব্দী" নামে পৃথক এক বৃহৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া এক মাসের মধ্যেই সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এই বক্তৃতাটি ঐ দ্বাদশ বক্তৃতার সর্ব্বশেষ বক্তৃতা। ১০ই নভেম্বর ১৯২৫। —বঃ সঃ

দিবসের দীপ্ত তেজে দূরে দায় আলস্য-জড়িমা,
ঘরে ঘরে জেগে ওঠে জীবনের নবীন গরিমা ;
তার পরে আসে যদি অকস্মাৎ মৃত্যু-কালো মেঘ
পশ্চিম গগন হ'তে নিয়ে তার ক্ষিপ্র গতি-বেগ,
চকিতে ছাইয়া ফেলে যদি ওই মুক্ত নীলাকাশ,
জগৎ আঁধার করি বহে যদি ঝঞ্ঝার বাতাস,
রবির সে ছবিখানি সত্য বটে হেরে নাক' চোখ,
তবু সেত রাত্রি নহে,—সত্যিকার সে যে দিবালোক !

সেইমত বাঙ্গলার স্তব্ধ ঘোর আঁধার গগনে
বঙ্গরবি আশুতোষ ! তুমি এলে কি শুভ লগনে !
দূরে গেল অন্ধকার, বাঙ্গালীর ফুটিল নয়ন
বাহিরে দাঁড়াল আসি ফেলি তার অলস-শয়ন ;
বহুদিন-ভুলে-যাওয়া আপনারে চিনিল আলোকে,
নাচিয়া উঠিল তার প্রতি অঙ্গ নবীন পুলকে !
তারপর অকস্মাৎ দ্বিপ্রহরে মৃত্যু-মেঘ আসি,
চকিতে ঢাকিয়া দিল ওই রূপ ওই হাসি-রাশি !
তোমার সে দিব্য-জ্যোতিঃ আজি আর পড়ে নাক' চোখে
তবু এ যে দিবালোক !—একথা যে জানে সব লোকে !
সত্য বটে তুমি আজি চলে' গেছ আঁখি-অন্তরালে,
প্রভাব তোমার তবু জেগে আছে দিক্ চক্রবালে।
দুরন্ত কুটিল মেঘ ছেয়ে দিতে পারে দশদিশি
তাই ব'লে দিবসেরে পারে কি সে করিবারে নিশি ?
কালের বুকের পরে আলোকের সেই রেখা-পাত
চিরদিন সত্য তাহা—তারপরে নাহি কারো হাত।

হে বঙ্গের আশুতোষ ! বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ শের-নর !
মরিয়াও তুমি যেগো চিরদিন রহিবে অমর।

গোলাম মোস্তফা

প্যারীচাঁদ মিত্রের বঙ্গভাষা

প্যারীচাঁদ মিত্রের (বা টেকচাঁদ ঠাকুরের) নাম একটা সাহিত্যিক বিতর্কের মধ্যে জড়িত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যে পরিচিত। তিনি তৎকালীন সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষার বিরুদ্ধে সরল ও কথ্য ভাষা প্রথম প্রবর্ত্তন করার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যে তিনি যে হাল ফ্যাসানের প্রথম নভেল লিখিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বোধ হয় অনেকে অবনত নহেন। বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম ঔপন্যাসিকের গৌরব বোধ হয় তাঁহারই প্রাপ্য। ইংরাজী শিক্ষার প্রবল বাত্যায় বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষা যখন তাহার নিকট উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইতেছিল ইংরাজি পড়িয়া ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজের হাবভাব ইংরাজের চালচলন এমন কি কথোপকথন সময়েও নব্য বঙ্গসমাজ যখন ইংরাজের অনুকরণে একান্ত অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, ইংরাজি শিক্ষার তীব্র মদিরা বাঙ্গালীকে যখন একটা উৎকট উন্মাদনায় মাতাইয়া দিতেছিল—ইংরাজি-শিক্ষিত প্যারীচাঁদ তখন বুঝিলেন অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর মতি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে শুধু বক্তৃতা করিয়া কিম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া শুভ ফল হইবে না; বাঙ্গালীর এই রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য ইংরাজ জাতিরই নভেলকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় নভেল লিখিয়া স্বদেশীর শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু তিনি নব্য যুগের সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া পুরাতন সনাতন প্রথা ও আচার ব্যবহারের মধ্যে যাহা কিছু যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণীয় তাহা তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত বরণ করিয়া লইতেন। আবার ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে নব্য সমাজে সুরাসেবন, স্বধর্ম্মে অনাস্থা প্রকাশ প্রভৃতি যে সমস্ত দোষ অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইতেছিল এইসকলের উপরও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খড়্গহস্ত ছিলেন পুরাতন দলের ভণ্ডামি ও সঙ্কীর্ণতার উপর—ইহাদের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র সুবিধা পাইলেই বর্ষিত হইত।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ক্যানিং লাইব্রেরি হইতে প্যারীচাঁদের গ্রন্থসমূহ লুপ্ত রত্নোদ্ধার নামে প্রকাশ সময়ে হিতবাদী সংবাদপত্রে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রকাশ হইয়াছিল। ক্যানিং লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে উহা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ লেখনীপ্রসূত।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। প্যারীচাঁদ মিত্রের পূর্ব্বে কেহই এরূপ সরল ও ললিত ভাষায় বাঙ্গালা পুস্তক লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আদর্শ ভাষা না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাঁহার সেই ভাষা মৌলিক, ভাব মৌলিক, প্রকরণ মৌলিক। সংস্কৃত ভাষার অনুসরণে যৎকালে বাঙ্গালী লেখকগণ সঙ্কীর্ণ পথে সঙ্কীর্ণ বিষয়ের সীমাবদ্ধ আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা ভাষার সেই সঙ্কীর্ণ

অবস্থায় প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে স্বদেশের মঙ্গলোদ্দেশে উৎকৃষ্ট রত্ননিচয় বাছিয়া লইয়া মাতৃভাষার হৃদয়ে একটি অভিনব তেজের সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই তেজ সেই সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে উন্নতির পথে দ্রুতবেগে চালিত করিয়াছে, এবং যদিও তাহা অন্যান্য তেজের সংঘর্ষে মার্জ্জিত ও শোধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছে, তথাপি তাহা যে মঙ্গলের নিদান, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। আর এক কথা ইংরাজি ভাষা শিখিয়া পাশ্চাত্য মতের অনুকরণে ভাব বিপর্য্যয়ের প্রবল সংঘর্ষে যৎকালে বাঙ্গালার অনেক শিক্ষিত ও ভদ্রগণ্য ব্যক্তি দুরাচার ও দুর্নীতির আবিল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র তখন উচ্চকণ্ঠে তীব্র শ্লেষবাক্যে তাঁহাদের দোষোদ্ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের উদ্ধারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" "মদখাওয়া বড় দায়" প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গোঁড়ামী ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে প্যারীচাঁদই সর্ব্ব প্রথম হস্ত উত্তোলন করেন। ইঁহার আগড়ডোম সেনে জলধরের মৌলিক প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রধান গুণ এই যে তাহার সকল গ্রন্থেই সুনীতির মুক্তামালা স্তরে স্তরে গ্রথিত। ইঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে হিন্দু পুরুষ ও নারী সকলেই সুনীতি শিক্ষা করিতে পারিবেন। এতদিন ইঁহার গ্রন্থাবলী সাধারণের পক্ষে একপ্রকার দুর্লভ ছিল, এক্ষণে যোগেশবাবু তৎসমুদায় একত্র প্রকাশিত করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন



প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)

প্যারীচাঁদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস ছিল—আলালের ঘরের দুলাল। ইহা প্রথমে তাঁহার সম্পাদিত "মাসিক পত্রিকা" নাম্নী সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ও পরে ১২৬৪ সালে "শ্রীযুত টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মাসিক পত্রিকা ১২৬১ সালের ভাদ্র মাস হইতে তিন বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় :—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচবাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক। তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে রুচির পবিত্রতা ও মন্তব্যের গভীরতা দৃষ্ট হয়। ইহাতে একদিকে পরিচালকদিগের সম্পূর্ণ গুণশালিতার অখণ্ডনীয় ও অভাবনীয় পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্যদিকে তাঁহাদিগের সুরুচিরও সম্যক প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন হিন্দুকলেজের কৃতবিদ্য দুইজন ছাত্র—প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। কিন্তু প্রবন্ধাদি বোধ হয় সমুদায়ই প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা।

১২৬১ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় আলালের ঘরের দুলালের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ও পত্রিকার শেষ সংখ্যায় (১২৬০ সালের শ্রাবণ) ইহার সপ্তবিংশতি অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় আর তিন অধ্যায় যোগ হইয়া গল্পটী শেষ হইয়াছিল।

কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল যে মিত্র মহাশয়ের প্রথম উদ্যম তাহা নহে, মাসিক পত্রিকার ১২ ১ সালের অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন (যে সংখ্যায় "আলালের ঘরের দুলাল"এর প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয়) সংখ্যায় আমরা তাঁহার প্রথম উপন্যাস দেখিতে পাই। উপন্যাসের নায়ক এক ব্যক্তিই (রামচন্দ্র বাবু) ছিলেন; কিন্তু শিরোনামায় দুইটি বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবন্ধের নাম "সুখ ও দুঃখ কেবল ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য হইয়াছে" ও অপরটির নাম ছিল "ভদ্র পরিবার যাহাকে বলে।" প্রথম প্রবন্ধে যেরূপ প্রকাশ আছে যে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আরও লিখিত হইবে, দ্বিতীয় প্রবন্ধেও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই, কিন্তু এই দুই প্রবন্ধের পর আমরা আর কিছুই তিন বৎসরের মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাই না। পাঠকবৃন্দ প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিয়া অনুভব করিবেন যে আলালের ঘরের দুলালের ন্যায় ইহাও গার্হস্থ্য উপন্যাস—কোনওরূপ প্রেমের ছড়াছড়ি এমন কি নামগন্ধও নাই এবং আলালের ঘরের দুলালে যেরূপ নীতিজ্ঞান ও সুরুচির পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হয় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধেও সেইরূপ আছে।

আমরা নিম্নে প্রবন্ধ দুইটি প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য ইহাতে কোনও বর্ণাশুদ্ধি

বা কোনও ছেদ পরিবর্ত্তন করি নাই।* তবে নামবোধক বিশেষ্য পদ (Proper noun) গুলি বড় হরপে ছিল, এক্ষণে সেরূপ প্রচলিত নহে এবং ঐরূপ পাঠে পাঠকের পাছে বিভ্রম জন্মে এজন্য সমুদায় একরকম অক্ষর দিয়াছি।

শ্রীস———

সুখ ও দুঃখ কেবল ধর্ম্ম-পরীক্ষার জন্য হইয়াছে।

(১২৬১ অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

পূর্ব্বে রামচন্দ্র বাবু বড় বড়মানুষ ছিলেন, তাঁহার সওদাগরি কর্ম্ম ছিল, কলিকাতা সহরে বড় বড় সওদাগরের কুঠীর মধ্যে তাঁহার কুঠী গণনা হইত, তথায় ছোট বড় অনেক লোক প্রতিপালন হইত। সর্ব্বপ্রকারে রামচন্দ্র বাবু ভদ্রব্যবহার করিতেন, তিনি কখন কোন বিধবা কিম্বা কোন নাবালকের ধন কাড়িয়া লয়েন নাই, কাহারও প্রতি জুওচুরি কিংবা জুলুম্ করেন নাই, তিনি যে সে অর্থ সঞ্চয় করিতেন, তাহা আপনার পরিশ্রম ও বুদ্ধি হইতেই হইত। রোজকার করিয়া তিনি কোন অপব্যয় করিতেন না, তাঁহার অনেক সদ্‌ব্যয় ছিল। আপনার পাড়ায় একটী অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন, তথায় গরীব লোকের সন্তানেরা বাঙ্গলা ও ইংরাজী শিখিত। আরো তিনি একটী হস্‌পিটল্ বানান, সেখানে দুঃখি রোগীদিগের চিকিৎসা হইত। স্কুল ও হস্‌পিটলের যত খরচ তাহা সকলি তিনি আপনি দিতেন। তিনি অলস লোকজনকে দেখিতে পারিতেন না, পরিশ্রমি ও সৎলোক দুঃখে পড়িলে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন, সৎপরামর্শ দিতেন, আর সুযোগ হইলেই তাহাদিগকে কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতেন।

রামচন্দ্র বাবুর দুই পুত্র এক কন্যা। পুত্রগণে লেখা পড়ায় সুশিক্ষিত হইয়া বিষয় কর্ম্ম করেন। কন্যারও বড় ভদ্র পালে বিবাহ হয়। সকলেই বলিত রামচন্দ্র বাবু বড় বড়মানুষ এবং বড় সুখী তাঁহার তুল্য সহরে আর কেহ নাই।

কিন্তু সওদাগরী কর্ম্ম, সকল সময়ে সমভাবে থাকে না, হয় তো কখন প্রচুর লাভ হয়, কখনও বা সর্ব্বস্ব যায়। রামচন্দ্র বাবু চারি পাঁচ লক্ষ টাকার রেসম্ কিনিয়া বিলাতে পাঠান, তাহাতে অনেক লোক্‌সান হয়। এই প্রকারে ছয় সাতবার ক্ষতি হওয়াতে তিনি সকল বিষয় হারাইয়া বসেন, এক্ষণে তাঁহার কিছুমাত্র যোত্র নাই, গুজরানের নিমিত্তে তাঁহাকে সামান্য লোকের মতন কর্ম্ম করিতে হয়, তিনি দালালি করিয়া দশ বার টাকা মাসে রোজগার করেন. তাহার দ্বারা তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণ হয়।

যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন সর্ব্বপ্রকারে দুর্ঘটনা ঘটে। গত বৎসর রামচন্দ্র বাবুর দুই পুত্রের ওলাউঠা হইয়া কাল হয়। কন্যার বয়স্ ষোল বৎসর, তিনিও বিধবা হইয়াছেন।

ধন পুত্র ও জামাই হারাইয়া রামচন্দ্র বাবু অতি কষ্টে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। একদিবস শুনেন তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বনমালি বাবুর হাতে একটি ২০ টাকার চাকরি খালি আছে, মনে ভাবেন, বলিলেই বনমালী বাবু আমাকে এই কর্ম্মটি দিবেন, সন্দেহ নাই। এই প্রকার আশান্বিত হইয়া তিনি তাড়াতাড়ি সেই

* পাণ্ডুলিপিতে কমা, (,) ও পূর্ণচ্ছেদের (।) পার্থক্য এরূপ অস্পষ্ট যে, সেগুলি যথাযথভাবে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। —বঃ সঃ

দিবস সন্ধ্যাকালে বনমালি বাবুর বাড়ীর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হন্। তাঁহার পায়ে জুতো নাই, আর তিনি কাল কাপড় পরিয়াছেন, ইহা দেখিয়া দরোয়ান তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া বাড়ী ভিতর যাইতে দেয় নাই।

বনমালি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে রামচন্দ্র বাবু অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে ঘরে প্রত্যাগমন করেন, ঘরে আসিয়া আহার করেন না, বিছানায় পড়িয়া ভাবেন,—হায় আমার কি হইল, পূর্ব্বে লোক জনকে দুই তিন শত টাকা মাহিনা দিয়াছি, এক্ষণে আমি কুড়ি টাকার চাকরির জন্যে লালায়িত হইয়াছি, আমি তো কোন অভদ্র কর্ম্ম করি নাই, তথাচ লোকে আমাকে অগ্রাহ্য করে, গরীব হওয়ার ফল এই,—একেতো পুত্রশোক, আবার কন্যা বিধবা, খাওয়া পরার দুঃখ, ও বৃদ্ধ অবস্থার দুর্ব্বলতা, আমার যন্ত্রণার শেষ নাই, আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না, এক্ষণে মৃতু হইলেই ভাল হয়,—হে পরমেশ্বর আমি কি অপরাধ করিয়াছি, কেন এমন বিপদে পড়িলাম, এই দায় হইতে আমাকে মুক্ত করুন, আর ক্লেশ সহ্য হয় না। মনে মনে এই সকল কথা বলিয়া রামচন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন; ক্ষণেক রাত্রি হইলে তিনি নিদ্রা যান। নিদ্রা যাইবা মাত্র তিনি দেখেন, তাঁহার নিকটে একজন সুন্দর পুরুষ দাঁড়িয়া এই সকল কথা বলিতেছেন,—রামচন্দ্র তুমি কাতর হইও না, সুখ ও দুঃখ ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্যে হইয়াছে, সম্পদ্ কালে তুমি অনেক ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছিলে, তাহাতে পরমেশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন, কিন্তু সম্পদ্ কালে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা সহজ বিষয়, মনে করিলে সকলেই করিতে পারে, কিন্তু ঘোরতর বিপদে পড়িয়া কুকর্ম্ম ত্যাগকরা, এবং ধর্ম্ম পথে থাকা বড় কঠিন, এই যে করিতে পারে, সেই পরম ধার্ম্মিক,—তোমার ধর্ম্মের জোর কত ইহা জানিবার জন্যে এক্ষণে পরমেশ্বর, তোমাকে দুঃখে ফেলিয়াছেন, আর তোমাকে অনেক মনস্তাপও দিয়াছেন, এই সময়ে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই তুমি তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবে, ঐহিক সুখের উপর নজর রাখিও না, কারণ সে সুখ চিরস্থায়ী নয়, আজ আছে কাল না থাকিলেও থাকিতে পারে, পরকালের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সাধ্যক্রমে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, ইহা করিলেই তুমি ধর্ম্ম পরীক্ষা হইতে উদ্ধার হইয়া পরম সুখী হইবে, যদি ইহকালে না হও, পরকালে অবশ্য হইবে। এই সকল কথা বলিয়া সুন্দর পুরুষ প্রস্থান করেন।

পরদিবস রামচন্দ্র বাবু নিদ্রা হইতে উঠিয়া কি বলেন, বা কি করেন, তাহা পশ্চাৎ একদিবস লেখা যাইবেক।

ভদ্র পরিবার যাহাকে বলে।

(১২৬১ ফাল্গুন সংখ্যা)

অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় রামচন্দ্র বাবুর পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, এ স্থানে তাঁহার সংক্রান্ত আরো বৃত্তান্ত শুন,—এক্ষণে রামচন্দ্র বাবুর বয়স পঞ্চান্ন বৎসর হইবেক, পূর্ব্বে তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন বাড়ী হাটখোলায় ছিল, এক্ষণে তিনি কাশীপুর অঞ্চলে বাস করেন, ষোল বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিবাহ হয়, স্ত্রীর নাম কমলমণি। বিবাহের পরেই রামচন্দ্র বাবু কমলমণিকে লেখাপড়া, সূচি ও হুনরী কর্ম্ম শিখান। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি কাজ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন, পরে ছাব্বিশ বৎসর বয়স না হইতে হইতে, তাঁহার দুই পুত্র হয়, প্রথম পুত্রের নাম শ্যামাচরণ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম বামাচরণ, দ্বিতীয় পুত্র হইলে পর রামচন্দ্র বাবুর স্ত্রী কমলমণি রোগগ্রস্ত হইয়া হইয়া বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তাঁহার অনেক চিকিৎসা হয় বটে, কিন্তু সে চিকিৎসায় কোন

উপকার হয় না। পরে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলেন,—রামচন্দ্র তুমি হাটখোলায় বাস করিও না, সে স্থান বড় নোঙ্গরা ও ঘিঞ্জি, এমন স্থানে থাকিলে তোমার স্ত্রী কখন আরোগ্য হইয়া সবল হইবেন না, পরে হয় তো তোমার ছেলেরাও চিররোগী হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেক, তুমি স্থানান্তর হও, কাশীপুর বেশ যায়গা; সহরের বাতাস অপেক্ষা সেখানকার বাতাস ভাল, তুমি কাশীপুরে বাস করিলে তোমার স্ত্রী অল্পদিবসে আরাম হইবেন, সন্দেহ নাই। ডাক্তারের অনুরোধ ক্রমে রামচন্দ্র বাবু কাশীপুরে একখানা বাগান কিনিয়া তথায় পরিবার লইয়া বাস করেন। পরে এক বৎসর না হইতে হইতে, কমলমণি আরোগ্য ও সবল হন্, দুই বৎসরের পর তাঁহার একটি কন্যা হয়, মা সাধ্ করিয়া কন্যার নাম কামিনী রাখেন।

ঘরের কর্ম্মই হউক বা বাহিরের কর্ম্মই হউক, রামচন্দ্র বাবু তাড়াতাড়ি উতলা হইয়া কিছুই করিতেন না, যাহা করিতেন, তাহা ধীর সুস্থে করিতেন; এক কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে, অন্য কর্ম্মে হাত দিতেন না। প্রত্যহ সূর্য্য উদয়ের আধঘণ্টা আগে, বিছানা হইতে উঠিয়া তিনি পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন, আর দিনমানে যে কিছু করিতে হইবেক, তাহাও তখনি স্থির করিতেন। পরে স্নান করিয়া বেলা ৮॥০ নাং বাগানময় বেড়াইতেন, বাগানময় বেড়াইবার কালে তিনি মালিদিগের কর্ম্মকাজ তদারক করিতেন, আর ইচ্ছা হইলে স্বহস্তে বাগানের অনেক কর্ম্মও করিতেন; ইংরাজি কোদাল লইয়া মাটি খুঁড়িতেন, ইংরাজী দা দিয়া মরা গাছটা ও ডালটা কাটিয়া ফেলিতেন; আপনার হাতে সর্ব্বদা নূতন বীচী ও চারা পুঁতিতেন, কখন হয় তো জমিতে যে পাতা টাতা পড়িয়া থাকিত, তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দিতেন। প্রত্যহ প্রাতে রামচন্দ্র বাবুর এই সকল কর্ম্ম করাতে অনেক লাভ দর্শিত,—প্রথমতঃ বাগান বড় পরিষ্কার থাকিত, আর গাছ পালার বড় তদারক হইত। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যহ প্রাতে বাগানের সকল কর্ম্ম দেখা শুনায় করাকর্ম্মেতে যে পরিশ্রম হইত, তাহাতে রামচন্দ্র বাবু শারিরীক ভাল থাকিতেন, তাঁহার প্রায় কখন কিছু অসুখ বোধ হইত না। তৃতীয়তঃ বাগানের কর্ম্ম করিয়া তাঁহার মন সুস্থ থাকিত। বিষয় কর্ম্ম সকল সময়ে সমান থাকে না, কখন ভাল হয়, কখন বা মন্দ হয়, বিষয় কর্ম্ম মন্দ হইলে মন চঞ্চল হইয়া উঠে, সে চঞ্চলতা বাগানের কর্ম্ম করিতে গেলে অনেক নিবারণ হয়। এই কথাটি রামচন্দ্র বাবু জানিতেন, জানিয়া বাগানের কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন।

রামচন্দ্র বাবুর মতন কমলমণিও ভোরে উঠিতেন, প্রথমে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, পরে ভাঁড়ার খুলিয়া রাঁধুনী ব্রাহ্মণীকে রান্নার সকল জিনিষ পত্র দিতেন। রাঁধুনী রসুই করিতে বসিলে, কমলমণি কুটনা কুটিতেন, ডাল ভাঙ্গিতেন, দুধ জাল দিতেন, বাটা সাজাইতেন। এই সকল কর্ম্ম তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করিতেন, আর বলিতেন,—কর্ত্তার আজ্ঞা এই, আমি যত পারি তত ঘরকন্নার কর্ম্ম করিব, সত্য বটে বাড়ীতে অনেক চাকর দাসী আছে, তাহারা সকল কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা সকল কর্ম্ম করিয়া লওয়া ভাল নয়, কর্ত্তা কহেন, ঘরকন্নার কর্ম্ম করিলে স্ত্রীলোকের শরীর ভাল থাকে, মনঃ চঞ্চল হয় না। আর কি জানি কখন কি হইবেক, এক্ষণে আমাদিগের অন্ন ধন আছে বটে, পরে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া গরীব হইয়া যাইতে পারি, যদি এমন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আমাকে তো সংসারের সকল কর্ম্ম করিতে হইবেক, এই জন্যে এক্ষণে সে সকল কর্ম্ম করা ভাল, সে বড় সুধারা, তাহা করিলে দুঃখকালে নিরুপায় হইব না, সকল কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারিব।

বেলা ৮॥০ টার সময়ে রামচন্দ্র বাবু দুই পুত্র লইয়া আহার করিতে বসিতেন; কমলমণি স্বহস্তে সকল খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করিতেন; কামিনীও নিকটে থাকিত, সে রান্নাঘর হইতে বাবাকে ও দাদাদিগকে ঘি, নুন, চিনি আনিয়া দিত, কখন হয়তো বাবার নিকটে বসিয়া তাহার থালা হইতে মাছি তাড়াইয়া দিত, আহারের

পর কামিনী বাবাকে ও দাদাদিগকে পান আনিয়া দিত। বালককাল হইতে মেয়েরা আত্মীয়গণের এইরূপ যত্ন করিলে তাহাদিগকে সুস্বভাব হয়।

ভোজনের পর রামচন্দ্র বাবু দুই পুত্রকে গাড়ীতে লইয়া কলিকাতায় যাইতেন। সন্তানদিগকে ইস্কুলে রাখিয়া, তিনি নিজ কুঠীতে গমন পূর্ব্বক কাজ কর্ম্ম করিতেন, পরে বেলা ৫টার সময় সন্তানদিগকে গাড়ীতে লইয়া ঘরে আসিতেন।

কর্ত্তা বেরুলে পর মায়েঝিয়ে আহার করিত, আহারের পর গৃহিনী বাজারের সকল হিসাব লিখিতেন; পরে কামিনীকে দুই ঘণ্টা লেখাপড়া সুচি ও হুনরী কর্ম্ম শিখাইয়া পরাহ্ণ ভোজনের বন্দোবস্ত করিতেন।

কামিনীর বেস্ একটী ছোট ফুলের বাগান ছিল, লেখাপড়ার পর সে আপন বাগান হইতে সকল ফুল তুলিত, পরে গাছে জল দিত, জমিতে যে পাতা পড়িয়া থাকিত, তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দিত, বাগানের সকল কর্ম্ম সে আপনিই করিত, তাহা আর কাহাকেও করিতে দিত না, বাগানটি খেলা ঘরের মতন ছিল।

বৈকালে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমনের পর, রামচন্দ্র বাবু গৃহিণী লইয়া বাগানময় বেড়াইতেন, সন্ধ্যার পর পরিবার সকল আহার করিত, পরে ছেলেরা পড়া মুখস্থ করিত, মেয়ে সূচি কর্ম্ম করিত, কর্ত্তা গৃহিণী একত্রে বসিয়া ঘরকন্নার কিম্বা অন্য কোন ভাল কথা কহিতেন, হয় তো কখন বা একখানা ভাল বই পড়িতেন, রাত্রি ৯টা, হদ্দ ৯৷৷০ টার সময়ে তাহারা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া শয়ন করিতে যাইত।

দুই ভেয়েতে ও বোনেতে বড় ভাব ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কখন ঝকড়া হইতনা, কেহ কখন কাহাকে তুমি বই তুই বলিত না, প্রাতে ও বৈকালে তাহারা একত্রে খেলা করিত, হয় তো একটা দোলনা করিয়া দুলিত, কখন বা কামিনীকে গাড়ীতে বসাইয়া দুই ভাই বাগানময় গাড়ী টানিয়া বেড়াইত, কখন বা পাড়ার ছেলেদিগকে লইয়া তাহারা লুকাচুরি খেলিত, লুকাচুরি খেলিবার কালে কামিনী বুড়ি হইত, ছেলেবেলা সমবয়েসির সঙ্গে অধিক দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিলে শারিরীক বল ও সুস্থতা বৃদ্ধি হয়, মনও প্রফুল্ল থাকে।

একদিবস রামচন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচরণ আপন পিতা হইতে একটি টাকা পায়, সে মনে ভাবে, আমি এই টাকা লইয়া ঘুড়ী, লক, লাটাই, কিনিব, পরে বলে,—না, আমি তাহা করিব না, এক জোড়া পায়রা কিনিয়া পুষিব, এই প্রকার অনেক কথা মনে ভাবিয়া শেষে স্থির করে, আমি কতক গুলিন বাজী কিনিয়া সন্ধ্যাকালে পোড়াইব। এই কথা স্থির করিয়া শ্যামচরণ টাকা সঙ্গে লইয়া ইস্কুলে যায়, তথায় গিয়া দেখে, একজন ব্যাপারী বিলাতী পুতুল বেচিতে আসিয়াছে. পুতুল দেখিবামাত্র শ্যামচরণ মনে করে,—আমি একটি পুতুল কিনিয়া কামিনীকে দিব, সে পুতুল পাইলে কত খুসি হইবে। এই বলিয়া শ্যামচরণ বাজী কেনা ভুলিয়া যায়, একটি পুতুল কেনে, তাহা স্কুল হইতে ঘরে যাইবামাত্র ভগিনীকে দেয়, পুতুল লইয়া কামিনী দৌড়াদৌড়ি করিয়া বাবাকে দেখায়, মাকে দেখায়, সকল চাকর চাকরাণীকে দেখাইয়া বলে,—বড়দাদা আমাকে এই পুতুলটি দিয়াছে, সে পুতুলটি কামিনী বড় যত্নে রাখে।

কোন বিশেষ প্রয়োজন কর্ম্ম উপলক্ষে রামচন্দ্র বাবুকে একবার ডাকযোগে পাঞ্জাব যাইতে হয়। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি কমলমণিকে বলেন—তুমি কাঁদিও না, সত্য বটে আমি দূরে যাইতেছি, ভয় কি? পথ ঘাট সকলি ভাল, দুই তিন মাসের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব, তুমি ছেলেদিগকে লইয়া সাবধান পূর্ব্বক থাকিও, দেখ যেন কামিনী প্রত্যহ লেখা পড়া করে, আমি প্রতিদিবস ডাকযোগে পত্র লিখিব, তুমিও প্রত্যহ এক একখানা পত্র লিখিও, যে যে দিবস যে যে স্থানে পত্র পাঠাইতে হইবেক, তাহার ফর্দ্দ রাখিয়া যাইতেছি, সংসার চালাইবার

সকল ভার তোমার উপর রহিল, পরমেশ্বর যেন তোমাকে ও ছেলেদিগকে ভাল রাখেন। এই সকল কথা বলিয়া রামচন্দ্র বাবু পত্নী হইতে বিদায় হইলেন, সেই সময়ে ছেলেরা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; পিতা যাত্রা করিতেছেন দেখিয়া তাহারা সকলেই কাঁদিতে লাগিল, অন্য অন্য লোকের মতন তাহারা কেহই হেউ হেউ করিয়া উচ্চস্বরে কাঁদে নাই, তাহারা কেবল বাপের পানে চাহিয়া থাকে, আর চক্ষু দিয়া হু হু করিয়া জল পড়ে। রামচন্দ্র বাবু সন্তানদিগের মাথায় হাত দিয়া দুই একটি স্নেহের কথা বলেন, পরে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মৌনভাবে পালকি চড়েন। চাকরেরা বলে পালকি চড়িবার কালে কর্ত্তারো চক্ষু দিয়া জল পড়িয়াছিল, তাহা হইলে হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তার চক্ষুর জল চাকরেরা বই আর কেহ দেখে নাই।

রামচন্দ্র বাবু বিদেশে গমনের সময়ে কামিনীর বয়স সাড়ে আট বৎসর হইবেক। একদিবস মায়ে ঝিয়ে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে গৃহিনীর খুড়তুত ভগিনী আসিয়া বলেন,—দিদি বাগানে আমরা একটা বনভোজন দিব, সেখানে মেয়ের কবিও হইবেক, দুই দল কবির বায়না দেওয়া গিয়াছে, তোমাকে ও কামিনীকে বাগানে আসিয়া আহ্লাদ আমোদ করিতে হইবেক, আমি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি। গৃহিণী উত্তর দেন,—বোন, আমি সমস্তদিন ঘরকন্নার কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি, কোথাও নড়ি, এমন সময় নাই, আর সময় থাকিলেও আমি যাইতে পারিতাম না, বোন, যে অবধি কর্ত্তা বিদেশে গিয়াছেন, আমাকে কিছুই ভাল লাগেনা, আহ্লাদ আমোদ বিষজ্ঞান হয়, আমি কেবল ছেলেদিগের মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহারা না থাকিলে, কি করিতাম বলা যায় না, হয় তো পাগল হইয়া পড়িতাম। খুড়তুত ভগিনী পুনরায় বলেন,—দিদি, যদি তুমি না আসিতে পার, তবে কামিনীকে পাঠাইয়া দিও, কেমন মা কামিনি, তুমি তো বনভোজনে আসিবে? কামিনী বলে,—না, মাসি, আমি যাইতে পারিবনা, আমি গেলে মা একলা ঘরে থাকিবে, দাদারা নয়টার সময়ে ভাত খাইয়া ইস্কুলে যায়, ঘরে আমি বই আর কেহ থাকেনা, আর বাবাকে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা আজ মাকে লিখিতে বলিব। এই সকল কথা বলিয়া কামিনী মায়ের গলা জড়িয়া থাকে, পরে ক্ষণকাল কথাবার্ত্তা করিয়া খুড়তুত ভগিনী প্রস্থান করেন, গৃহিণী ও কন্যা কেহই বনভোজনে যায় না।

চারি মাস বিদেশে থাকিয়া রামচন্দ্র বাবু স্বদেশে আইসেন, এক মাস পরে তাঁহার ছোট পুত্র বামাচরণের বড় জ্বর হইয়া বিকার হয়, তাহার রক্ষা পাওয়া ভার হইয়া উঠে, পীড়ার সময়ে ছোট দাদার নিকটে কামিনী সমস্ত দিবস বসিয়া থাকিত, কখন কখন গায়ে পায়ে হাত বুলাইত, মুখে মাছি বসিলে তাড়াইয়া দিত, দাদা জল চাইলে আনিয়া দিত, এই প্রকারে সাড়ে আট বৎসরের মেয়ে যত পারে, তত কামিনী খাটিত। পরে রাত্রে মায়ের সঙ্গে ছোট, দাদার নিকটে শুইয়া থাকিত, রাত্রিযোগে হয় তো দুই একবার উঠিয়া দেখিত, ছোটদাদা কেমন আছে। একদিবস রাত্রে উঠিয়া কামিনী ছোট দাদার নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছিল, মা বলেন,—তুই শুস্‌নে, খাস্‌নে, তোরও ব্যারাম হবে, তুই শুইয়া থাক আমি বাছার কাছে বসিয়া থাকিব। কামিনী উত্তর দেয়—মা ঘুম হয় না কি করিব, এই বলিয়া সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরিয়া কহে—এক্ষণে ছোটদাদা ঘুমচ্ছে, আস্তে আস্তে কথা কহ, আজ আমি ঈশ্বরের কাছে বর মাগিয়াছি, তিনি ছোটদাদাকে আরাম করিলেই তোমার নিকটে আমার যে দুই টাকা গচ্ছিত আছে, তাহা লইয়া গরীব দুঃখিকে দিব। এই বর প্রার্থনা হইতেই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেতেই হউক, বামাচরণের জ্বর সেই দিবস হইতে কমিয়া যায়, দশ দিবস পরে সে সম্পূর্ণ আরাম হয়।

দশ বৎসর বয়স্ প্রাপ্ত হইলে কামিনীর বিবাহ হয়। পরে পনের বৎসর বয়স্ক না হইতে হইতে সে স্বামী হারাইয়া বিধবা হইয়া পড়ে।

রামচন্দ্র বাবুর সংক্রান্ত আর যে কথা রহিল, তাহা আগামী পত্রিকায় বলা যাইবেক।

জীবন তরি

জীবন তরি
চলচে মরি
অন্ধকারে,
বোঝাই ভারে।
ঠিক্ ঠিকানা
নাইক জানা
ভিড়বো শেষে
কোন সে দেশে!
গগন তলে
আর না জ্বলে
সোনার লেখা
আলোর রেখা;
বিশ্ব গ্রাসি'
মেঘের রাশি
আকাশ ছেয়ে
আসচে ধেয়ে!
ঝঞ্ঝাবায়ে
তুফান-ঘায়ে
হলেম সারা;
কূল কিনারা
পাইনা খুঁজে,
চক্ষু বুজে
যাচ্চি ভেসে
কোন সে দেশে!

ভাবচি মনে
কী কুক্ষণে
যাত্রা সুরু;
দুরু দুরু
কাঁপচে হৃদয়,
ভাগ্য নিদয়!
আঁধার রাতি,
সঙ্গী সাথী
নাইক কেহ
-করবে স্নেহ!
ঘূর্ণিপাকে
দুর্ব্বিপাকে
হাঁপাই পড়ে;
শূন্যে ওড়ে
বজ্র নিশান,
বাজে বিষাণ!
তুমুল রোলে
চিত্ত দোলে!
কুজ্ঝটিকা
প্রলয় টীকা
গগন ভালে
ঐ পরালে!

অতীত মম
চিত্র সম
চোখের আগে
আজকে জাগে!
কাদের ছেলে
পুতুল খেলে?
কে ঐ দোলে
মায়ের কোলে?
রৌদ্রে ছাতে
লাটাই হাতে
উড়িয়ে ঘুড়ি
কে দেয় তুড়ি?
বন্ধু সনে
সঙ্গোপনে
কে কয় কথা?
জানায় ব্যথা!
স্মরণ পথে
স্বর্ণ-রথে
কে ঐ আসে
-মধুর হাসে?
বধূর মত
লজ্জানত
কণ্ঠে তারে
ফুলের হারে
-কুসুম জালে
কে সাজালে!

সুখের রবি
আলোর ছবি
অস্তগত,
ভাগ্যহত!
কই সে হাসি?
কই সে বাঁশী?
কই সে গীতি?
কই সে প্রীতি?
কই সে আশা?
কেবল ভাষা
আঁধার স্রোতে!
এখন হতে
মৃত্যু মুখে
তুফান বুকে
ছুটছি খালি;
আকাশ কালী
বজ্র ভরা,—
কাঁপচে ধরা
উঠছে তেড়ে;
দিলেম ছেড়ে
তোমার হাতে
আজকে রাতে
হে কাণ্ডারী
বোঝায় ভারী
মোর তরণী;
এই রজনী
প্রভাত হবে
উজল নভে
আর কি কভু
ওগো প্রভু?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

আবু-পাহাড়

বাংলার বাইরে এলেই রেলের দুধারে মাঝে মাঝেই পাহাড়ের ছোট ছোট ঢেউয়ের দৃশ্য মনকে একটা বড় সুন্দর তৃপ্তি দিয়ে থাকে। সমতল ভূমির মধ্যে বোধ হয় একটা একটানা একঘেয়ে ভাব থাকে, যেজন্য পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকা চোখকে এত বেশি আরাম দান করে। রাজপুতানার দুধারের বালুময় সবুজ-বিরল প্রান্তরের হরিতের মুগ্ধকর আবেদনের অভাবের খানিকটা ক্ষতিপূরণ মেলে—স্থানে স্থানে এই পাহাড়ের দৃশ্যের মধ্যে। কিন্তু তবু যেন মনটা সম্পূর্ণ খুসী হয় না—কারণ এ সব পাহাড়কে পাহাড় আখ্যা না দিয়ে মৃত্তিকা-প্রস্তরের ঢেউ বলাই বোধ হয় বেশি সঙ্গত মনে হয়।

তাই মনটা একটা নিবিড় খুসিতে ভরে ওঠে, যখন গাড়ী সোজাতা রোড় ষ্টেশন ছাড়ার পর আবুর পর্ব্বতমালার শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ রেলযাত্রীর চোখে পড়ে। তখন মনে হয় রাস্কিনের সেই কথা যে ভূমি যে মুহূর্ত্তে সমতলতাকে পরিহার করে সে মুহূর্ত্তে সে এই উচ্চনীচতার ঢেউয়ের মধ্যে কি যেন এক রহস্যের আভাষ ইঙ্গিত করে বসে। আবু পাহাড়ে মোটরে করে উঠ্‌তে মনটা খুসীর চরম সীমায় পৌঁছিতে না পারলেও—দার্জ্জিলিং শিলং ভ্রমণের পর বোধ হয় এ সব পাহাড় তেমনভাবে মুগ্ধ করতে পারে না—ব'লে না উঠেই পারে না যে, ঠিক্ ঠিক্ এই-ই বুঝি মনটা এতদিন রাজপুতানার বালুধূসর শুষ্কহরিত রাজ্যে অনুক্ষণ খুঁজছিল। সেই পরিচিত আঁকা বাঁকা পার্ব্বত্য পথ ঘোরানো সোপানশ্রেণীর মতন পর্ব্বতের গা বেয়ে উঠেছে; সেই স্থলে স্থলে যাত্রীর বিবর্দ্ধমান উচ্চতারোহণের বিশেষ একটা তৃপ্তি; সেই পরপারের উগ্র পাহাড়ের ঢালুর সযত্নপুষ্ট সবুজের নীলাভ কিরণ বিকীরণ করার শোভা; সেই মাঝে মাঝে দুই পাহাড়ের একান্ত মিলনের মধ্যে গভীর খাদের ভীষণ রমণীয়তার সমাবেশ ও সেই পিছনে ছেড়ে-আসা শুভ্র রাজপথের সত্বর নিম্নগমনের শোভা;—সবই মনকে এক পরিচিত উপলব্ধ তৃপ্তির সৌরভে শিহরিত ক'রে না তুলেই পারে না। কেবল আবু পাহাড়ের মধ্যে নেই সে দার্জ্জিলিং পথের বিরাট গাম্ভীর্য্য; নেই সে ধবল তুষারমৌলি যোগিরাজের ধ্যানস্তিমিত উন্নত যোগাসনের শোভা ও নেই সে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর শুভ্রহাস্য ও রূপালি কলধ্বনি। তা ছাড়া এর মধ্যে নেই সে শিলঙ পথের ঘন বিটপিশ্রেণীর অভিরাম সবুজের নয়ন-মনোহর আবেদন; নেই সে ক্ষণে ক্ষণে শীকরসিক্ত বায়ুর মধুর শিহরণ; নেই সে পর্ব্বতমালার উচ্চতা ও নেই সে স্থানে স্থানে গোচারণের গ্রাম্য ও সুন্দর শোভা। তাছাড়া আবু পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের মধ্যেও একটু শুষ্কতা বিরাজ করছে বলেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্ ওখানে দার্জ্জিলিং মসুরি বা শিলঙ্ পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় শুভ্রধূসর-পাংশু রঞ্জিত মেঘের সে নয়নাভিরাম লুকোচুরি খেলার দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে মনকে রাঙিয়ে তোলে না। তবে আবু-পাহাড় সুন্দর, তৃপ্তিদ ও উপভোগ্য—বিশেষতঃ রাজপুতানার বালুময় সহরগুলির পরে।

আবুপাহাড়ের শোভা সমধিক প্রকট হ'য়ে ওঠে প্রায় উপত্যকার কাছাকাছি এলে—অর্থাৎ যেখান থেকে পর্ব্বতাবিহারিগণ বাসস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেছেন। আবু-পাহাড়ের উপত্যকার কাছাকাছি আস্‌তে আস্‌তে সুন্দর সুন্দর কয়েকটি বাংলো ফ্যাশনের বাড়ী নির্দ্দেশ ক'রে দেয় যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছি;—দার্জ্জিলিঙের মতন হঠাৎ এক স্মরণীয় মুহূর্ত্তে নানা রঙের সযত্নখচিত হর্ম্ম্যরাজির রঙের মেলা এক মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে না।

পর্ব্বতপথে অনেকক্ষণ প্রকৃতি দেবীর বনানী শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোধ হয় আমাদের মতন সহুরে লোক একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে—তার মধ্যে মানুষের দানের কোনও চিহ্নই না পেয়ে। নদীর শোভা বোধ হয় এই মানুষী কীর্ত্তির সঙ্গে বেশি নিবিড়ভাবে জড়িত বলে তাকে আমরা বেশি আপনার বলে মনে করতে পারি। নদীকে যেন পাওয়া যায়—তার পাল তুলে উধাও-হওয়া তরণীমালার দৃশ্যের মধ্যে, তার অশ্রান্ত কুলুকুলুধ্বনির মনোমদ সঙ্গীতরঙ্গের মধ্যে, তার মধ্যে নেমে অবগাহন স্নানের মধ্যে; গা ভাসিয়ে দিয়ে স্রোতের টানে নিরুদ্দেশ-যাত্রী হওয়ার এক বিচিত্র বিস্ময়ারামের অনুভূতির মধ্যে ও সর্ব্বোপরি—তার ক্লান্তিহীন গতিশীলতার আহ্বানের মধ্যে।

পার্ব্বত্য শোভাকে কিন্তু মানুষ যেন কেমন পর-পর ভাবে। তার মধ্যে সম্ভ্রমের উপাদান যথেষ্ট আছে, কিন্তু আপনকরা সে উপাদান নেই—যা নদীর গতিভঙ্গী ও লহরীলীলার মধ্যে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্যসৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকে যেন একটা দূর গাম্ভীর্য্য, একটা আত্মসমাহিত ভাব, একটা মানুষী সভ্যতাকে তুচ্ছ করার প্রবণতা। নদীর মধ্যে থাকে এক সুললিত সুষমা, এক আপ্‌না-বিলোনের রূপ, এক মানুষের সভ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠার পুলক-পরশ। সব প্রাচীন সভ্যতাই গ'ড়ে উঠেছে নদীর আশপাশের উপত্যকায়—মানুষ পর্ব্বতের মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করেছে অনেক পরে ও অনেক বংশের চেষ্টায় অভ্যস্ত হ'য়ে। মানুষ আবাল্য পর্ব্বত রাজ্যের মধ্যে মানুষ না হ'লে পর্ব্বতকে সেভাবে ভালবাসতে পারে না যেমন কলনাদিনী, শস্যদাত্রী, নৃত্যশীলা, অশ্রান্তগতি ও ক্ষণে ক্ষণে নূতন-ছন্দ-উদ্ভাবিনী নদীর মোহিনী মূর্ত্তিকে পারে।

তাই গন্তব্য-স্থানে পৌঁছবার ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন পার্ব্বত্য যাত্রী সে গুরুগম্ভীর দূরত্ব স্রষ্টার গায়েও মানুষের সৃষ্ট হর্ম্ম্যরাজি দেখ্‌তে পায় তখন বোধ হয় সে অজ্ঞাতে এক পরম আরামের তৃপ্তির নিঃশ্বাস না ফেলেই পারে না। মনটা যেন আশ্বস্ত হয়ে গভীর খুসিতে ভরে উঠে—যেমন বিদেশে বিভুঁয়ে একটা চেনা মুখ দেখা গেলে হয়। কয়েক বৎসর বিদেশে কাটিয়ে যখন কোনও প্রবাসী জন্মভূমিতে ফিরে আসে তখন জন্মভূমির প্রতি পরিচিত রাজপথ, গাছপালাই তার মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব আবেদন তোলে। পার্ব্বত্য পথে কয়েক ঘণ্টা সেই একই শ্রেণীর জনবিরল বনানীশোভা ও সমাহিত গাম্ভীর্য্য দেখার পর ছোট ছোট লাল, সাদা, হল্‌দে রঙের বাড়ীগুলি সেই শ্রেণীর তৃপ্তি দেয়। মনটা ব'লে ওঠে "আচ্ছা এতক্ষণে বোঝা গেল।"

আবুপাহাড়ে একটি সুন্দর প্রাকৃতির হ্রদ আছে। হ্রদটির চারদিকে পাহাড়। হ্রদটি একটু দূর থেকে বড় সুন্দর নীল-আভা বিকীরণ করে। বেশ বড় হ্রদ। পরিভ্রমণ করতে ১৫.২০ মিনিট সময় লাগে ও তাতে ভারি একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, যে তৃপ্তি অনেকটা প্রতি কাজ সম্পূর্ণ করলে পাওয়া যায়। মানুষ একটা পথে বেড়াতে গিয়ে ঠিক্ সেই পথ দিয়েই ফিরে আস্‌তে চায় না। অন্য পথ দিয়ে ফিরে এলে একটা সুসম্পূর্ণতার ও সমাপ্তির তৃপ্তি যেন তাকে বেশি ক'রে আনন্দ না দিয়েই পারেনা।

আবুপাহাড়ে আর একটি স্থান আছে যেখান থেকে সূর্য্যাস্ত বড় সুন্দর দেখা যায়। এখানে বস্‌বার দু তিনটি সিমেণ্টের বেদী আছে। রমণীয় দৃশ্য। অস্তগামী সূর্য্যের রঞ্জিত আভা যখন আশেপাশের পর্ব্বতমালার নানা ছন্দের ঢেউয়ের উপর পড়ে তখন সাম্‌নের প্রসারিত সমতল ভূমির সঙ্গে তুলনা ক'রে সে সূর্য্যাস্তরাগিণীর গিরিগাত্রে অনুরণন তোলার উদাত্ত ধ্বনি বড় মনোহর হ'য়ে ওঠে। পর্ব্বত থেকে হঠাৎ পদমূলে এক বিরাট ধূ-ধূ-প্রসারিত সমতল ভূমির দৃশ্যের মধ্যে একটা বিচিত্র উপভোগ্য উপাদান আছে যার মূল বোধ হয় "I am the monarch of all I survey" -রূপ মনোভাবটি। তা ছাড়া অবশ্য পার্ব্বত্য শোভা ও সমতল উপত্যকার সৌন্দর্য্য পাশাপাশি বিরাজ করারও একটা বিশেষ আবেদন না থেকেই পারে না। শিলঙ পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী থেকে সিলেটের দৃশ্য বা হিমালয়ে কার্সিয়াং থেকে বাংলার দৃশ্য-উপভোগের মধ্যে অনেকটা এইরকমই রস মেলে।

আবু পাহাড়ের বিখ্যাত জৈন মন্দির—দিলওয়ারা। আমার এক ঐতিহাসিক বন্ধু আমাকে আগ্রাতে প্রায়ই দিলওয়ারা মন্দিরের কথা বল্‌তে বল্‌তে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতেন। বাল্যকাল হ'তেই আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দিরের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের কথা শুনে আস্‌ছি। তা'ছাড়া আমার ঐতিহাসিক স্থাপত্য-বিশেষজ্ঞ বন্ধুটি আমাকে বার বার বলেছিলেন যে হিন্দু সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পবিকাশ—এই দিলওয়ারার অচিন্তনীয় কলাকারু।

বহুদিনের সযত্নলালিত ও কল্পিত আগ্রহ নিয়ে জৈন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা গেল। কিন্তু কারুকাজ খুব অদ্ভুত রকমের কঠিন হলেও প্রথম থেকেই সেই দাক্ষিণাত্যের কারুকার্য্য-স্তূপাকৃতির পুরাতন কাহিনী অকস্মাৎ এখানেও নয়নকে আঘাত না ক'রেই পার্‌ল না। কিন্তু...... কিন্তু......হাঁ আশ্চর্য্য হ'তে হ'ল বটে।

বিস্ময়কর বটে এ অমানুষী শ্রমশীলতার স্মৃতিস্তম্ভ। অপূর্ব্ব সংগ্রহ বটে শুভ্র মর্ম্মরের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ, মর্ম্মরের হস্তী-বাজী, মর্ম্মরের অগণ্য নৃত্যশীলা দেবীমূর্ত্তি, মর্ম্মরের ঝাড়, মর্ম্মরের নানাবিধ কারুকাজ। দেখ্‌লে মনটা সম্ভ্রমে নুয়ে আসে বটে যে মানুষ এক সময়ে এ অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করতে পারত—শিল্পকলায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য। কল্পনা সহসা পাঁচ ছয়শ বৎসরের অতীত জগতে বিচরণ করবার জন্য পাখা মেলে উড়তে চায় বটে! কোথা হ'তে রাশি রাশি শুভ্র মর্ম্মর এনে কোন্ এক বিগত যুগের মানুষ কেমন ক'রে যে এ মর্ম্মর স্থাপত্যে কারুকার্য্যের

আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সে কথা ভাব্‌তে নয়ন বিস্মিত শ্রদ্ধায় সজল হ'য়ে না উঠেই পারে না বটে। কিন্তু তবু—কেন যেন মনটা অনুক্ষণ বল্‌তে থাকে 'নহে নহে নহে'। যেন এ জিনিষ ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়, স্থাপত্য-বিশেষজ্ঞের শিক্ষা করবার বস্তু, পুরাতনে শ্রদ্ধা সঞ্চয় করবার প্রণোদনা মাত্র। কিন্তু এ ত সৌন্দর্য্যের সার বস্তুকে কবি প্রতিভার যাদুতে বাস্তব জগতে ফুটিয়ে তোলা নয়! এ ত মানুষের যুগ-যুগ-সঞ্চারী সাধনার ফলে সরলতার সঙ্গে কলা কারুর মহিমময় উদ্বাহ-সাধনের অনুপম কীর্ত্তি নয়! এক কথায় এ একটা গ্রন্থনবৈচিত্র্য,—সৃষ্টি নয়; স্তম্ভিত করবার প্রয়াস, শিল্পীর প্রেরণালব্ধ মূর্ত্তি নয়; এ অলঙ্কারবাহুল্য, সৌন্দর্য্যের মর্ম্মবাণীটি সহজানুভূতির আলোকে উপলব্ধি করার সাধনা নয়। এক কথায় এ দিলওয়ারা তাজমহল নয়।

দিলওয়ারা সম্বন্ধে শেষ বৈষম্য-তুলনার (antithesis) দ্বারা বোধ হয় আমার বক্তব্যটি তাঁর কাছে এক মুহূর্ত্তে স্বচ্ছ প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্‌বে যাঁর জীবনে তাজমহল দেখবার পরম সৌভাগ্য হ'য়েছে। তাজমহল দেখ্‌তে দেখ্‌তে য়ুরোপের সৌন্দর্য্য-পিপাসুর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বল্‌তে ইচ্ছে করে—To see Tajmahal and then die.* দিলওয়ারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সৌন্দর্য্যান্বেষুর মনপ্রাণ এ ভাবে ভ'রে ওঠে না। অথচ একথা স্বীকার করতেই হবে যে পরিশ্রম ও কারুকার্য্যের অসম্ভব দুরূহতার দিক্‌ দিয়ে দিলওয়ারা তাজমহলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

দিলওয়ারা ও তাজমহল দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে একটা কথা আবার নতুন করে আঘাত দেয় যে শিল্পসৃষ্টি এক ও বাহাদুরি-দেখানো আর। দাক্ষিণাত্যের গোয়ালিয়রের ও ভুবনেশ্বরের মন্দির গুলির কারুকার্য্য-বাহুল্যের সঙ্গে মোগলসভ্যতার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিকাশের তুলনা করলে একথা এক মুহূর্ত্তে প্রতীয়মান হয়। হিন্দু মন্দিরগুলির নির্ম্মাতৃগণের যেন জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—গঠিত সৃষ্টিতে, পারত পক্ষে কোথাও কারুকার্য্য বাদ না দেওয়া। এ যেন নিম্ন-শ্রেণী ওস্তাদের অনবরত তান ও গমক দিয়া রাগিণীর মূর্ত্তিটিকে ঢেকে দেওয়ার সাড়ম্বর প্রয়াস, যার উদ্দেশ্য—লোকের "তাক লাগিয়ে দেওয়া", দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এক মনোজ্ঞ সহানুভূতির বিচিত্র আনন্দ-সেতু গ'ড়ে তোলা নয়।

মানুষী কীর্ত্তির রাণী তাজমহলের অনুপম শোভার চিরন্তন আবেদনের কথা ছেড়ে দিলেও সেলিমচিস্তির কবর, সিকান্দ্রার ও সিক্রির সিংহদ্বারের অনুপম কলাকারু, আগ্রার স্নানহর্ম্ম্যের প্রশস্ত উদার শিল্পচাতুর্য্য ও মতিমস্‌জিদের প্রসারিত নিরাভরণা মোহিনী ছবির সঙ্গে ভূত যুগের হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অলঙ্কার-বাহুল্যের তুলনা করলে বোধ হয় একটু বেশি ক'রে চোখে পড়ে যে মানুষ কত যুগ যুগ সঞ্চিত সাধনার ফলে শিল্পকলায় সারল্যের মধ্যেকার সৌন্দর্য্যের সত্যটি আবিষ্কার করেছে।

* আসল কথাটি—To see Naples and then die. কিন্তু হওয়া উচিত ছিল To see Venice and then die.

বোধ হয় সব শিল্পের সম্বন্ধেই একথা খাটে। উচ্চশ্রেণীর গায়ক গায়িকার গানের মধ্যে যে তানালাপের সংযম দেখা যায়, যে অলঙ্কারের প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখা যায়, ও যে সুরের প্রশান্তি পাওয়া যায়,—তার সঙ্গে বাহাদুরি-লোলুপ নিম্নশ্রেণীর গায়কের তালবহুল অলঙ্কার, প্রপীড়িত সুরের হুহুঙ্কারের তুলনা করলে দেখা যায় যে গানের ক্ষেত্রেও মানুষ বহুদিনের সাধনার ফলে তবে সঙ্গীতের আবেদনে সারল্যের দাম দিতে শিখেছে।

চিত্রশিল্পেও তাই। য়ুরোপের Renaissanceএর আগেকার চিত্রাদিতে প্রায়ই রঙের অভিচার, নরমূর্ত্তির বহুলতা, অসংখ্য দেবদেবীর আমদানী প্রভৃতির একঘেয়ে দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্রান্ত মন যেন স্পষ্ট বুঝতে আরম্ভ করে যে, কেন্দ্রগত মূর্ত্তিটি যে বাইরের উপলক্ষকে দিয়ে ঢেকে না ফেল্‌লেই বেশি ফুটে ওঠে সে সত্যটি ধরতে Vincy, Raphael, Angeloরূপ বিরাট শিল্পাত্রয়ীর কেন প্রয়োজন হ'য়েছিল।

য়ুয়োরোপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধেও তাই। Roman ও Gothic স্থাপত্যের মধ্যে প্রধান প্রভেদই এইখানে যে Gothic স্থাপত্য শিল্পীরা বুঝতে পেরেছিলেন প্রাসাদ, গির্জ্জাদিতে spaceএর আমদানীতে অলঙ্কারের সৌষ্ঠব কত বাড়ে। নইলে অলঙ্কারের গোলকধাঁধায় চোখ সহজেই ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে।

সাহিত্য সম্বন্ধে যে একথা আরও বেশি খাটে সেটাও বোধ হয় অনুরূপ স্বীকার্য্য। এক সময়ে সব সাহিত্যেই অনুপ্রাস, ঝঙ্কার, সালঙ্কার লিখনভঙ্গীকেই একান্তভাবে বড় ক'রে দেখা হ'ত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষ সারল্য, ঋজুতা, অনাড়ম্বর ভঙ্গীকেই বড় করে দেখ্‌তে শিখেছে। এ কথা বোধ হয় বেশি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ ক'রে তোলা অনাবশ্যক।

বেশভূষায়ও তাই। আগেকার যুগের অভিজাত ও রাজারাজড়াদের পর্ব্বতপ্রমাণ বেশভূষা ও সম্মানপদক ব্যবহার করার রীতির সঙ্গে তুলনা করলে আজকালকার সরল সুন্দর বেশ পরিধানের প্রথার ক্রমশঃ প্রচলন মোটের উপর শ্রেয়ঃ বলেই মনে হয়। আজকাল এমন কি নারীজাতিও য়ুরোপে (বিশেষ ক'রে বেশভূষার ফ্যাসান প্রবর্ত্তক ফরাসী দেশে) ক্রমশঃ আগেকার সে তীব্র রঙের (crying colour) পোষাক পরিচ্ছদ বর্জ্জন করতে আরম্ভ করেছেন। এলিজাবেথের সময়ের বা তৎপূর্ব্বকালের নারীগণের বেশবাহুল্যের মধ্যে সাঁতার দিয়ে চলার দৃশ্যের সঙ্গে আধুনিক বেলাচারিণী ফরাসী নারীর সরল অথচ বিচিত্রশ্রী গ্রাম্যবেশের তুলনা করলে বোধ হয় বর্ত্তমান জগতে বেশভূষার ক্ষেত্রেও এই সারল্যের বিবর্দ্ধমান প্রাধান্য বিশেষ ক'রে চোখে না প'ড়েই পারে না।

তর্ক উঠ্‌তে পারে যে দিলওয়ারা মন্দিরের অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যকে সমালোচনা করতে গিয়ে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি আমাদের হিন্দুস্থাপত্যের ঠিক্ যথাযথ বিচার করিনি—একটু অবিচারই করে ব'সেছি। কারণ পুরাতন শিল্পকে সব সময়ে আমাদের আধুনিক মানদণ্ডে ওজন করা উচিত নয় একথা সময়ে সময়ে শোনা যায়। তাই এ সম্পর্কে দু চারটে কথা বলা উচিত

মনে করি। আমার মনে হয় যে আর্টের বিচার করার সময়ে তার সময়ের বিচার করার কোনও দরকার নেই। কারণ আর্টের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা এক তার চিরন্তন রস সঞ্চারের প্রেরণার মধ্যেই মিলতে পারে—সমর্থন বা justificationএর মধ্যে নয়। সেরূপ সমর্থন ঐতিহাসিকের ও গবেষকের কর্ত্তব্যের এলেকায় পড়ে—সৌন্দর্য্যপিপাসুর এলাকার মধ্যে নয়। কারণ ভূত বা আধুনিক শিল্পের যে দিক্ দিয়ে বিচার করতেই অগ্রসর হই না কেন একটা কথা ভুললে চলবে না যে প্রতি যুগের মানুষই শিল্প থেকে চেয়ে এসেছে প্রধানতঃ—আনন্দ ও প্রেরণা, ভূতযুগ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তথ্য বা গবেষণার উপাদান নয়। কাজেই শিল্পানুরাগীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে—কেবল শিল্প হতে তাঁর প্রাপ্য মোটমাট আনন্দটুকু সঞ্চয় করা। তার উপরেও যদি কোনও সুধী বিশেষ শিল্প হ'তে বিশেষ দরকারী জ্ঞান বা তথ্য আহরণ করেন—করুন, শিল্পপ্রেমিকের তার সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই, যেহেতু শিল্পানুরাগীর কাম্য বস্তু—ভিন্ন। কেন না শিল্পানুরাগী কামনা করেন শুধু সাধকের উপলব্ধ আনন্দটুকু মাত্র—সুধীর তথ্যপূর্ণ অফুরন্ত শুষ্ক ভাণ্ডার নয়। কাজেই প্রতি শিল্পের নানা দিক্ হ'তে বিচার বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটি অনুক্ষণ মনে রাখা কর্ত্তব্য যে আসল বস্তুটি হচ্ছে—তার মধ্যে চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আবেদন। অর্থাৎ এ আপত্তি ভুললে হবে না যে "এখন যে হচ্ছে এখন, ও তখন যে ছিল তখন; অতএব দিলওয়ারার সঙ্গে তাজমহলের তুলনা করা ঠিক্ নয়।" শিল্পানুরাগী বলবেন "হোক্ গে। আমি খুঁজছি কেবল প্রেরণা ও আনন্দ, তাই সময়ের আমার কাছে অস্তিত্ব নেই। শকুন্তলা আমার কাছে ততখানি সত্য যতখানি রসবস্তু আমি এখনও তার পরিকল্পনাতে পাই। কালিদাসের সময়ে শকুন্তলার আবেদন কি প্রকৃতির ছিল সে বিচারের ভার ঐতিহাসিকের বা প্রত্নতাত্ত্বিকের, আমার নয়।" যদি প্রত্নতাত্ত্বিক না হ'লে শকুন্তলা রসগ্রাহীর মনে সাড়া না তুলত তা হলে সাত সমুদ্র তের নদী পারের জর্ম্মাণ কবি গেটে শকুন্তলা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ্‌বার আগে প্রত্নতাত্ত্বিকের পরামর্শ নিয়ে তবে শকুন্তলা-প্রশস্তি লিখ্‌তেন। তা ছাড়া শিল্পের একটা চিরন্তন আবেদন থাকেই থাকে যার ফলে classic চিরকালই classic থেকে যায়, আধুনিকের তুলনায় এক মুহূর্ত্তে খাটো হ'য়ে ওঠে না। তা যদি না হ'ত তা হ'লে আধুনিক যুগের শত শত শ্রেষ্ঠ মর্ম্মর প্রতিমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ সমবেত হ'য়ে অন্ততঃ একটিও ভিনাস ডি মিলো বা আপলোর সমকক্ষ মূর্ত্তি গ'ড়ে তুলতে পারতেন; তা যদি না হ'ত তা হ'লে হাজার হাজার চিত্রকরের লক্ষ লক্ষ সৃষ্টি ও একটিমাত্র সিষ্টিন মাডোনার উদ্ভাসিত গরিমার কাছে পাণ্ডুর হ'য়ে যেত না। তা যদি না হ'ত তা হ'লে আধুনিক শত সহস্র মন্দকবিযশঃপ্রার্থিগণকে একা নাট্যগুরু শেক্ষপীয়রের প্রতিভার সামনে মাথা হেঁট করতে হ'ত না; ও তা যদি না হ'ত তা হ'লে শত শত Victoria Memorial, St. Peter's Church, Cathedral প্রভৃতিও কবির মানসী প্রতিমা ও স্বপ্নজগতের অতুলিত গরিমাময় তাজমহলের কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে যেত না।

কর্পূর-মঞ্জরী

(রাজশেখর)

বিরহ।

নিশ্বাস পড়ে তা'র;—
টুটে-যাওয়া যেন হার,
শুকাইয়া তায় ঝরে' ঝরে' যায় শ্বেত-চন্দন-ভার !
বিষম দহিছে বুক,
হাসির সে শোভটুক্
হয়েছে এখন স্মরণাশ্রিতা, নাহি শোভে ওই মুখ !
বালার সকল গায়
পাণ্ডু বরণ ভায়,
আকাশেতে যেন নিরাভা মলিন দিবসের শশী হায় !
সৌম্য তোমারি তরে
সে যে ঝুরে ঝুরে মরে
জাগিয়াছে যেন তটিনী-প্রবাহ তাহার আঁখির লোরে।

বিরহ।

নিশিদিন সহ দীর্ঘ হয়েছে নিশ্বাস-বায়ু তা'র,
মণি-বলয়ের সাথে গলে' পড়ে আঁখিতে অশ্রুধার ;
সৌম্য, তোমারি বিরহতে বালা চিন্তিতা নিশিদিন,
তন্বীর তনু, জীবনের আশা দুইই যেন বড় ক্ষীণ।

বিরহ।

জ্যোৎস্না এখন উষ্ণ বড়
রাজার কাছে হায়,
চন্দনেরি প্রলেপ লাগে
বিষের মত গায়।
ঘা'য়ের মুখে নুনের ছিটা
গলায় দিলে হার,
রাত্রে যদি বয় গো বাতাস
অঙ্গ তাপে তা'র।
বাণের মত বিঁধে মৃণাল,
সিক্ত দেহে জ্বালা,
দেখ্‌লে সে যেই সুনয়না
কমল-মুখী বালা।

অসামঞ্জস্য। কর ও চরণ রুচি কিশলয়,
নয়ন দুটি ত' নীল কুবলয়,
চন্দ্রমা যেন মুখখানি তব,
অঙ্গগুলিও চম্পক নব,
তাইত কেমনে বোঝা নাহি যায়,
নিশিদিন তবু দহিছ আমায়।

হিন্দোল। রণিয়া বাজে নূপুর-মণি,
উজল হারে ঝিঙ্কিণী,
ঝঙ্কারিছে কাঞ্চীখানির
মুখর যত কিঙ্কিণী;
শিঞ্জিত হয় মঞ্জুমধুর
বিলোল বালা চঞ্চলা,
কার না মনোমোহন বল
শশীমুখীর হিন্দোলা।

দৃষ্টি। মরকত-মণি-রতন-গ্রথিত উজ্জ্বল যেন হার,
মালতীর মালা,—ভ্রমর বসেছে প্রান্তের পরে যা'র;
রভসের ভরে বিলাসিনী যেই ফিরায়েছে গ্রীবা খান,
আড়ে-হানা সেই সুন্দর দিঠি আঘাতিল মোর প্রাণ।

দৃষ্টি। যা'রে সে তীক্ষ্ণ চল-কটাক্ষ হানে,
চন্দ্র কোকিল, বসন্ত মারে জানে;
পূর্ণ দৃষ্টি যা'র পরে যায় ঝলি,
তা'রে দিতে হয় তিলের জলাঞ্জলি।

দৃষ্টি। আড়ে-হানা তা'র দিঠির আগে
কৃষ্ণ ভ্রমর-পংক্তি জাগে;
মাঝখানে তা'র করিছে আলা,
মথিত দুধের উর্ম্মিমালা;
হাতে ধনু টেনে চক্রাকার
যায় অনঙ্গ পিছনে তা'র।

ফুল ফোটানো। রণিত-নূপুর চরণে রূপসী উল্লাসে হেলাভরে,
অশোক। আঘাতিল যেই বিলাস লীলায় অশোকের দেহ'পরে;
উঠিল ফুটিয়া রাশি রাশি ফুল স্তবক পূর্ণ করি',
ভাসিল ক্ষণেকে গগনাঙ্গনে সে কি শোভা মরি মরি!

ফুল ফোটানো। তীক্ষ্ণ-তরল কজ্জল-আঁকা সুন্দর দিঠি তা'র,
তিলক। শরাসনধারী কামদেব যা'র সদা সাহায্যকার ;
সেই কটাক্ষ হানে মৃগাক্ষী তিলক-তরুর' পরে,—
জাগিল অমনি শত-মঞ্জরী-রোমাঞ্চ কলেবরে।

চন্দ্র। লাঞ্ছন-মৃগ শুভ্রবরণ চন্দ্রের বুকে ভায়,
যেন চঞ্চল কেলি-কোকিল দন্ত-পিঞ্জরে শোভা পায়।

প্রেম। তা'রে বলে প্রেম, যা'তে থাকে শুধু হৃদয়ের সরলতা,
সংশয়হীন পরাণেতে নাহি বাজে সন্দেহ ব্যথা ;
জাগে যা'তে সুখ-হর্ষ-প্লাবন দেখিলে পরস্পরে,
বাড়ে যা' শিঙারে, তোলে গো যাহারে মনোভব গাঢ় করে'।

কর্পূর-মঞ্জরীর সজ্জা—রাজা ও রাণী।

বিচক্ষণা। কুঙ্কুম-রস-পঙ্ক সে দেছে অঙ্গেতে আহা মরি ;
রাজা। কাঞ্চন-ময়ী তরুণী-মূর্ত্তি তোলে উজ্জ্বল করি।
বি। সখীরা দিয়েছে মরকত-মণি-মঞ্জীর পায়ে তা'র ;
রা। অবনত-মুখী কমল যুগলে ঘিরেছে ভ্রমর হার।
বি। সেজেছে ক্ষৌম-যুগলে হরিৎ শুকের পুচ্ছ প্রায় ;
রা। কদলীর শাখা,—পাতার অভ্র বাতাসে কাঁপিছে তায় !
বি। পদ্ম-রাগের কাঞ্চীদামেতে নিতম্ব শোভা করে ;
রা। নাচিছে ময়ূর কাঞ্চন-শিলা-শৈল-শিখর'পরে।
বি। মৃণাল-কোমল মণিবন্ধেতে বলয় কেমন শোভে,
রা। উলটিয়ে-রাখা কামের তূণীর তবে সে কেন না হবে ?
বি। দিয়েছে সখীরা কণ্ঠে পরায়ে মুক্তার বরহার ;
রা। তারকা-রাজিতে ঘিরে আছে যেন সে মুখ-চন্দ্র তা'র,
বি। কানে দোলায়েছে রত্নের দুল সখীগণ নিজ হাতে ;
রা। মুখ;খানি যেন মন্মথ-রথ—এ যেন চক্র তা'তে।
বি। নয়ন তাহার শোভিতেছে দেখ ঘন অঞ্জন রাগে,
রা। ভ্রমর আসিয়া নব-কুবলয়-কামশরে যেন লাগে।
বি। রচিয়াছে তার ললাট ফলকে কুটিল অলকমালা ;
রা। কৃষ্ণ-মৃগের লাঞ্ছনে যেন সেজেছে চন্দ্রকলা।
বি। কর্পূর-আঁখি তরুণীর চুলে পুষ্প কতনা সাজে,
রা। দেখা যায় চাঁদে-রাহুতে দ্বন্দ্ব মৃগনয়নার মাঝে।
বি। তাহারে এমনি পুরি মনোসাধ সাজায়েছে নানা বেশে,
রা। ভূষিত করেছে কেলি-কাননেরে যেন বসন্ত এসে।

শ্রী গণেশচরণ বসু

খেয়ালি

(৯)

তখনও ঠিক ভোর হয় নাই। তখনও পৃথিবী আলোক-সাগরে স্নান করিয়া উঠে নাই। তখনও দু' একটি তারা উজ্জ্বল কিরণে হীরকের ফুলের মত কোমল আকাশের গায় ফুটিয়াছিল। বাতাস অত্যন্ত লঘুপদেই শিশির-ভেজা ঘাসের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাখীগুলা কুলায়ে বসিয়াই থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। পাখীর মিষ্টরব ছাড়া আর কোন কর্কশ বা কঠোর রব উষার সৌন্দর্য্য-শান্তি অপহরণ করিতে ছিল না। এমনি সময়ে করুণা প্রত্যহ শয্যাত্যাগ করিতেন। তারপর প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। আজ তিনি দরজা খুলিয়া বাহির হইতেই সীতাও উঠিয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। সীতা তাঁহার সঙ্গেই শয়ন করিত। সীতাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এর মধ্যে উঠে এসেছিস্! ঠাণ্ডা লেগে আবার একটা অসুখ বিসুখ করবে? রোজ রোজ এত ভোরে উঠিস্ কেন সীতা?"

সীতা বলিল, "তুমি কেন ওঠ পিসিমা?"

করুণা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন, "সব কথার জবাব যেন মেয়ের ঠোঁটের গোড়ায় জমা হয়ে থাকে, একটুও ভাবতে হয় না। আমি যা করব, তোকেও কি তাই করতে হবে নাকি লো?"

সীতা হাসিয়া বলিল, "হবেই তো।"

করুণা মনে মনে নিজের বৈধব্য এবং তাহার অনুষ্ঠান গুলা স্মরণ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া "ষাট! ষাট!" করিয়া উঠিলেন। সীতার পূরন্ত গোলাপী গালে মৃদু টোকা মারিয়া বলিলেন, "অমন কথা বলতে নেই।"

সীতা বলিল, "আচ্ছা, আর বলব না। পিসিমা, তুমি তো ঠাকুর বাড়ীর পুকুরে রোজ ভোরে চান করতে যাও, আমাকে ডেকে নাওনা কেন? তা'হলে আমি তোমার জন্যে ফুল তুলে আনতে পারি। আজ আমি তোমার সঙ্গে ফুল তুলতে যাব।"

"যাবি, চল" বলিয়া করুণা আলনা হইতে কাপড় লইয়া 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। সীতাও তাহার অনুগামিনী হইল।

চৌধুরীদের 'ঠাকুর বাড়ী' নরেশচন্দ্রের গৃহ হইতে অধিক দূরে ছিল না। সেই দেবালয়ে কাত্যায়নী এবং আরও কএকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবালয়ের সম্মুখেই নির্ম্মল জলপূর্ণ প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, এবং প্রবেশদ্বারের দুইধারে পুষ্পোদ্যান। করুণা প্রত্যহ এই দীঘিতে প্রাতঃস্নান ও আহ্নিক করিয়া দেবতা প্রণাম করিয়া যাইতেন। ফুল তুলিবার সৌখিন ইচ্ছায় সীতাও দু' এক দিন তাঁহার সঙ্গে যাইত।

করুণা স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রেই বাঁধা ঘাটে আহ্নিক করিতে বসিয়া গেলেন। সীতা বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুল তুলিয়া সাজি ভরিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সীতা কাঁধে কাহার মৃদু স্পর্শ অনুভব করিয়া ভয়ে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি এরকম করে ভয় দেখাও? মানুষ বিরক্ত করেই বুঝি তুমি ভারি আমোদ পাও?"

সীতার রাগ দেখিয়া অজিত সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "তুই কি তা জানিসনে রাণি? বিশেষ ক'রে, তোকে মেরে, তোর গায় ঢিল ছুঁড়েই আমার বেশী আমোদ হ'ত। এখন তুই বড় হয়ে ঢেঙ্গা হয়ে গেছিস, এখন তো আর মারতে পারিনে তোকে। তাই ক্ষেপিয়ে একটু আমোদ করি।"

সীতা অধিকতর রাগিয়া বলিল, "বড় কীর্ত্তিকর!" তারপর একটুখানি থামিয়া বলিল, "ভোরে উঠেই যে বড় ঠাকুর বাড়ী এসেছ? তোমার এতটা ভক্তি হলো কবে থেকে?"

অজিত হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ঠাকুর বাড়ী এসেছি বৈকি। কাল আমাদের থিয়েটার শেষ হলো রাত তিনটায়। তখন বাড়ী গিয়েছি টের পেলে বাবা কি করতেন, কে জানে? তাই বাকি রাত টুকু অতুলের কাছেই ছিলাম। এই বাড়ী ফিরছি। পথ থেকে তোকে দেখতে পেয়ে একটু রাগিয়ে আমোদ করে গেলাম। বুঝলি রাণি?"

সীতা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলিল, "বুঝেছি। তোমার স্বভাব তো আমার জানাই আছে, সেটা বোঝা এমনি কি শক্ত? আচ্ছা, তুমি আমাকে কেন রাণা ডাক? নিজে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে তো রাজা সেজেই বেড়াচ্ছ, আবার আমাকে কেন 'রাণী' বলে ডাক?"

সীতার কথা শুনিয়া অজিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সীতার বয়স বারো বছর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে অজিতের উচ্চ হাসির মধ্যে একটা গূঢ় ইঙ্গিত অনুভব করিয়া অক্ষম রোষে ও লজ্জায় আরক্তমুখ হইয়া উঠিল। কথাটা যে সে নিজেই বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ভাবিল না; অজিতের অর্থপূর্ণ হাসিই তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। সে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "তোমাকে যে সবাই বকাটে বলে, তা খুবই সত্যি।"

নেহাৎ ছেলে মানুষ বলিয়াই যাহাকে জানে, তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া অজিত ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর ডাকিল, "সীতা!" এই গম্ভীর কণ্ঠ এবং সম্বোধন সীতার নিকট একান্ত অপরিচিত বোধ হইল সে চক্ষু তুলিয়া অজিতের মুখ পানে চাহিয়াই পলকে নিজের মুখ নমিত করিয়া লইল।

অজিত তেমনিকণ্ঠে বলিল, "সীতা, তুমি যে এমন পাকা মেয়ে হয়ে গেছ, আমি তা জানতাম না।" বলিয়াই সে চলিতে উদ্যত হইল। সীতা তাহার চাদরের খুঁট মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "অজিত দা, তুমি আমাকে এমন করে বকলে কেন? কি করেছি আমি?" বলিতে বলিতেই সীতার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

সীতাকে আরও কএকটা কঠিন কথা শুনাইবার জন্যই অজিতের জিহ্বা উস্ খুস্ করিতেছিল। কিন্তু তাহার চক্ষুর জল দেখিয়া অজিত অপ্রস্তুত হইল। একটুখানি নরম সুরে বলিল, "তুই আমাকে বকাটে বলে রাগিয়ে দিলি কেন?"

সীতা আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "সবাই যখন তোমাকে বকাটে মন্দ বলে, তখন আমার বল্‌তে কি? সবাই বলে, তুমি খারাপ ছেলে, মা বাপের কথা শোন না, পড়াশুনা কর না; বাপের মান খুইয়ে গরিবদের সঙ্গে—ছোট লোকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াও; যা খুসী, তাই কর, কারু শাসন গ্রাহ্য কর না।"

অজিত অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি বুঝি তা শুনিনে? আমার তো দুঃখ হয় না তাতে? কিন্তু রাণী, তাতে তোর এত মাথাব্যথা হয় কেনরে?"

"হয়তো হয়। তার কি করব?'

"রাণী, তুইও তো পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিস, স্কুলে যাসনে আর।"

"তোমার যে কথা! আমি মেয়ে, তুমি ব্যাটা ছেলে, আমার সঙ্গে তোমার তুলনা। আমি এখন বড় হয়েছি, তাই মা আমাকে স্কুলে যেতে বারণ করেছে।"

"মস্ত বড়ই হয়েছিস বটে! আচ্ছা, আমাদের বাড়ী যেতেও তোর মা'র নিষেধ আছে নাকি?"

"তা কেন হবে? আমি তো রোজই ধীরার কাছে যাই। তুমি কি বাড়ী থাক যে আমায় দেখবে? শুনলাম, শীগ্‌গিরই নাকি ধীরার বিয়ে হবে, সত্যি অজিত দা?"

"হতে পারে, যাই এখন।" বলিয়া অজিত চলিয়া গেল।

"তখন সুর্য্যোদয় হইতেছিল। অজিত দ্রুত পদেই পথ চলিতে লাগিল। অন্যত্র রাত্রি-বাসের জন্য শৈলজার নিকট যে তীব্র তিরস্কার জমা হইয়া আছে, অজিত তাহা খুবই জানিত। কিন্তু এই অবস্থায় পিতার সম্মুখে পড়িতে তাহার একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। অবশ্য পিতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, সে যে সমস্ত রাত্রি থিয়েটার করিয়া আসিয়াছে, সে কথা বলিতে সে কুণ্ঠিত হইবে না। কেন মিথ্যা কথা বলিতে যাইবে? ভয় কি? তবে যে শৈলজা তাহার খাদ্য লইয়া অন্ততঃ রাত্রি দু'টা পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়াছিল এবং অবশিষ্ট রাত্রিও দুর্ভাবনায় ঘুমাইতে পারে নাই, ইহা যেন সে প্রত্যক্ষ করিয়াই কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। একটা প্রবল আপত্তি উঠিবার ভয়েই তো সে সন্ধ্যায় বাহির হইবার সময়ে রাত্রের থিয়েটারের কথা শৈলজাকে বলিয়া আসিতে পারে নাই।

অজিত গেটের কাছে আসিয়াই বাড়ী প্রবেশ করিবার পথে বাধা পাইল। বাধা দিল তাহার বন্ধু বিপিন। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে?"

বিপিন বলিল, "কাল রাতে বোস-বুড়ী মারা গেছে, কিন্তু বাসি মরা পড়ে রয়েছে, জ্ঞাতিরা পোড়াবে না, তার নাকি কি দোষ ছিল। আসল কথা, জ্ঞাতিদের ইচ্ছা, এখনি একটা গোলমাল ক'রে বুড়ীর শ্রাদ্ধটা পণ্ড করে।"

বিস্মিত অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে তাদের লাভ ?"

বিপিন বলিল, "লাভ না থাক্‌লেও গায়ের জ্বালা মিটিবে। বুড়ী টাকাকড়ি তার বিধবা বোনঝিকে দিয়ে গেছে, না দিলে সেটা তো জ্ঞাতিদের পাবার কথা ছিল। এটা কি তাদের কম লোকসান ? আসল কথা, বুড়ী বোনঝিকে যা দিয়ে গেছে, তার অর্দ্ধেক না পেলে জ্ঞাতিরা পোড়াবে না।"

অজিত সহাস্যে বলিল, "মড়া পোড়াতেও ঘুষ চাই! শ্মশানক্ষেত্রটা আফিস আদালত হয়ে উঠল নাকি ? তা আমাকে এখন কি করতে হবে ?"

"অতুল, রামু ও আমি মিলে বুড়ীকে পোড়ায়ে জ্ঞাতিদের জব্দ করব ভেবেছি। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে শ্মশানে থাক, তা হলে শ্রাদ্ধের সময়েও তোমার বাবার ভয়ে কেউ টুঁ শব্দ করতে সাহস পাবে না। তাদের সকল গুড়ে বালি। বিধবা মেয়েটির টাকা গুলিও থেকে যাবে। আহা, গরিব মেয়েটি! জ্ঞাতিরা ডেকেও জিজ্ঞেস করেনি, কিন্তু মেয়েটি প্রাণ দিয়ে মাসীর সেবা করেছে।"

বাড়ীর একজন চাকর বাহিরে যাইতেছিল; অজিত তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া জামা, চাদর ও জুতা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "মাকে বলিস, বোস বুড়ীর পোড়ান দেখতে আমি শ্মশানে গেলাম। চল বিপিন, চল" বলিয়া সে নিজেই আগে আগে চলিল।

এইরূপ নগণ্য অনাত্মীয়ের শ্মশানে চৌধুরী বংশের কেহ কখনও উপস্থিত রহিয়াছে কি না, অথবা এইরূপ কার্য্য তাহা দ্বারা প্রথমে অনুষ্ঠিত হইলে পিতা রুষ্ট বা বিরক্ত হইতে পারেন কি না, এইরূপ কোন প্রশ্নই অজিতের মনে উদিত হইল না। কিন্তু বিপিন চলিতে চলিতে সসঙ্কোচে একবার অজিতকে বলিল, "তুমি তো এলে ভাই, কিন্তু তোমার বাবা——"

অজিত তাচ্ছিল্যের ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "মাভৈঃ। বাবা কি করবেন ? ঘুষলোভী বেটাদের যতক্ষণ জব্দ করতে না পারছি, ততক্ষণ আমার ভাল লাগছে না।"

বৃদ্ধার দাহ শেষ করিয়া অজিত যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অপরাহ্ন। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতেই প্রথমেই শৈলজার সঙ্গে অজিতের দেখা হইল। শৈলজা সিঁড়ির ঠিক উপরেই দাঁড়াইয়া ছিল। শৈলজা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অজিত তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ও-সব পরে হবে মা, আগে ভাত দাও। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল।"

শৈলজা অজিতের অনাহারক্লিষ্ট মুখ পানে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ ভাত বাড়িয়া আনিয়া দিল। অজিত খাইয়া উঠিয়া সুস্থ হইয়া বসিলে তীব্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "নিজে তো একেবারেই বয়ে গেছিস, বংশের মান-মর্য্যাদাও আর রাখলিনে।"

অজিত ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "তুমিও একথা বলছ মা ? তুমি তো জমিদারের ঘরে জন্মায় নি। তুমি তো জান, দারিদ্র্য কারু অপরাধ নয়। বিধবা মেয়েটির টাকা ক'টি

নেবার জন্যে পাজি রেটারা যে ফন্দি করেছিল, তা নষ্ট করায় যদি বংশের অমর্য্যাদা হয়ে থাকে তো হোক্। চেয়ে দেখ মা, তোমার ছোট ছেলের জমিদারী কায়দা। তোমার অই ছেলে হতেই বংশের মর্য্যাদা থাকবে।" বলিয়া অজিত অঙ্গুলি তুলিয়া অমিয়র কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। শৈলজা চাহিয়া দেখিল, অমিয় ভ্রমণ পরিচ্ছদে একটা ইজি চেয়ারে আড় হইয়া বসিয়া আছে, একজন চাকর কক্ষতলে বসিয়া হেঁট হইয়া তাহার জুতার ফিতা আঁটিয়া দিতেছে, আর একজন চাকর কি একটা প্রসাধন দ্রব্য লইয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। শৈলজা বিরক্তি গোপন করিয়া হাসি মুখে বলিল, "অমিয় কিছু খারাপ কায করছে না তো। সে তোর মত যার-তার সঙ্গে মেশামেশি করে না, লেখা পড়াও ছেড়ে দেয়নি। সে——"

অজিত বাধা দিয়া অভিমানের সুরে বলিয়া উঠিল, "হাঁ গো, হাঁ, তুমি তো অমিয়র মত আমায় ভালবাসনা, তাই আমার সবই মন্দ, আর তার সাত খুন মাপ।"

"অজিত!"

শৈলজার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠ এবং অন্ধকার মুখে অজিত বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহাস্যে বলিল, "কেন মা?"

"অমিয়কেও তুই হিংসে করতে আরম্ভ করলি?"

"এত বড় মিথ্যে কথাটা ঠাট্টা করেও তোমার বলা উচিত হলো না মা। যা মিথ্যা, তা তুমি বলতে পার না, যা অন্যায়, তা তুমি সইতে পার না, এই আমি চিরকাল জানি। এই জানায় আমার কত সুখ, তাও তুমি জান। কোন অবস্থায় কোন কারণেই যে আমি অমিয়কে হিংসে করতে পারিনে, তা আমার চেয়েও তুমি ঢের বেশী জান।"

সত্যই শৈলজা তাহা জানিত। অজিতের অকপট চিত্তের কোন সংবাদই প্রায় তাহার অগোচর থাকিতে পারিত না।

(১০)

হরপ্রসাদের নব প্রতিষ্ঠিত কলেজের তরুণ অধ্যাপক মণিভূষণ অতি সহজেই হর প্রসাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এই আকর্ষণ ব্যাপারটা মণিভূষণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছিল। তাহার ধীর গম্ভীর প্রকৃতি এবং মিতভাষিতার দর্পণে হরপ্রসাদ হয়তো আপনার প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

ছয় সাত মাস পূর্ব্বে অজিত স্কুলের সম্পর্কটাকে বোধ হয় জীবনের অবাধ গতির পরিপন্থী মনে করিয়া একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। হরপ্রসাদও তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। অদম্য বেগশালী স্রোতের মুখে বাধা দিতে যাওয়া যেমনি নিষ্ফল, তেমনি নির্বুদ্ধিতা বলিয়া হর প্রসাদের বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি অজিতকে বাধা দেন নাই। স্ব ইচ্ছার গতি রুদ্ধ করিবার শক্তি নিজের মধ্যে আছে কি না, অজিত কোন দিন তাহার সন্ধান লয় নাই; কিন্তু হরপ্রসাদ

বুঝিয়াছিলেন, পুত্রের খেয়ালের গতিরোধ করিবার শক্তি অন্ততঃ তাঁহার মধ্যে নাই। শৈলজা কিন্তু হাল ছাড়িল না। সে একরকম জোর করিয়াই স্কুলের রেজেষ্টারীতে অজিতের নামটা রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার নামের ঘরে যে শুধু অনুপস্থিতির হিসাবটাই খাড়া থাকিত, অমিয়র মুখে সে সংবাদ জানিতেও শৈলজার বিলম্ব হইল না। তবু সে হরপ্রসাদের মত নিশ্চিন্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিল না।

এক দিন নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া শৈলজা অনেকক্ষণ কাঁদিল। অজিতকে 'মানুষ' করিয়া তোলা, তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়া ভাল করিরা চোখ মুছিয়া স্বামীর কাছে যাইয়া বলিল, "অজিতের কি কোন বন্দোবস্ত করা যায় না? সে কি এই বয়সেই পড়া শুনা ছেড়ে দিয়ে উচ্ছন্ন যাবে?"

পত্নীর সদ্য-বর্ষণ-ক্ষান্ত আয়ত চক্ষুর রক্তিমা ও স্ফীতি লক্ষ্য করিয়াও হরপ্রসাদ স্থিরস্বরে বলিলেন," কি করতে বল তুমি?"

স্বামীর এইরূপ কথায়ও শৈলজা আজ রাগ করিল না। ভাল হইয়া বসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "স্কুলের ধরা বাঁধা নিয়মে, ও যখন থাকতেই চায় না, তখন কি ওর পড়া শুনার, অন্য ব্যবস্থা করা যায় না?"

"ব্যবস্থাটা কি রকম শুনি?"

"ঘরে একজন ভাল মাষ্টার রেখে দাও! যিনি আছেন, তাঁর দ্বারা কিছু হবে না। অজিত তাঁকে আদপে ভয়-ভক্তি করে না, বরং তিনিই অজিতকে একটু খানি ভয় করে চলেন।"

"অজিত যে কাউকে 'ভয়-ভক্তি' করে লেখা পড়া শিখবে, এ বিশ্বাসই আমার নেই, তবে তোমার যদি থাকে তো মাষ্টার বদলাও; আমার তাতে আপত্তি নেই।"

"অজিত মণিভূষণ বাবুর খুব প্রশংসা করে থাকে, তাকেই যদি—"

"আচ্ছা, সে এসেই পড়াবে, দেখ, এবার ছেলের বিদ্যা কত দূর হয়।"

সেই দিন হইতে মণিভূষণ অজিত ও অমিয়র গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল। ধারাকেও মাঝে মাঝে তাহার পড়া বলিয়া দিতে হইত, তবে প্রত্যহ নহে।

কলেজের নির্দ্দিষ্ট কায ছাড়া মণিভূষণের সঙ্গে বহির্জ্জগতের সম্পর্ক খুব কমই ছিল। দেশী ও বিদেশী রাশিকৃত দার্শনিক গ্রন্থ লইয়া সে তাহার আবাস-গৃহের পাঠ-কক্ষটিতে বিশেষ করিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। সেই স্থান হইতে অজিত তাঁহাকে কেমন করিয়া অধিকার করিল এবং এই অল্প-স্বভাব যুবাকে সে পছন্দ করিয়া বসিল, তাহা বলা কঠিন। হরপ্রসাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া মণিভূষণ অজিতকে পড়াইতে রাজি হইল। নূতন শিক্ষকের নিকট অজিতের পড়া শুনা কিছু না হইলেও অমিয় বেশ মনোযোগ ও উদ্যমের সহিতই পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, ফলে সে প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাসাগর পার হইয়া গেল।

অমিয়কে কলিকাতা না পাঠাইয়া হরপ্রসাদ গ্রাম্য কলেজেই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মণিভূষণই তাহার গৃহ শিক্ষক থাকিল।

সে দিন সন্ধ্যার পরে অমিয়কে লজিক বুঝাইতে বুঝাইতে হঠাৎ মণিভূষণের দৃষ্টি অজিতের উপর পড়িল। অজিত তখন খোলা 'স্নাইভ্যান হো'র উপর হাত রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে দেওয়ালের একখানা ছবি দেখিতেছিল। ছবিখানা নূতন আনা হইয়াছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মণিভূষণ অজিতকে বলিল, "অজিত বাবু, তুমি তো কিছুই পড়া শুনা কর না, অনর্থক আমাকে—"

অজিত হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ। আমি না পড়ি, তাতে কি? অমিয় বেশ পড়া শুনাই করছে, ধীরাও শিখছে, আপনার পরিশ্রম তো ব্যর্থ হচ্ছে না।" যিনি পরের ছেলের শিক্ষার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় ও অপরিসীম যত্ন করেন, তাঁহার নিজের ছেলের মুখে এই জবাব শুনিয়া মণিভূষণ অবাক হইয়া রহিল।

মণিভূষণকে নীরব দেখিয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছেন আপনি?"

মণিভূষণ মুখ তুলিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। তোমার বাবা কিন্তু তোমার পড়ার কথাই আমাকে বলেছিলেন।"

"তা আমি জানি। কিন্তু বাবাও আমাকে জানেন। না পড়ার জন্যে তিনি আপনার বা আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাবেন না। আমি যে কি, তা তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, কাযেই জুলুম করে আমার মাথায় বিদ্যা ঢোকাবার নিস্ফল চেষ্টা তিনি করেন না। কিন্তু মাকে কিছুতেই বোঝান গেল না। তিনি অসাধ্য সাধনের জন্যে যেন পণ করে বসে আছেন। আমার মগজটা যে কোন মতেই বিত্তার আধার হতে পারবে না, মা তা কিছুতে মানতে চান না বলে এক-এক সময়ে আমার ভারি হাসি পায়।" বলিয়া অজিত হাসিতে লাগিল; কিন্তু তাহার হাসিতে ঘরের আর কেহ যোগ দিল না। খানিক পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ধীরা কেমন শিখছে?"

মণিভূষণ বলিল, "ভালই শিখছে।"

"সে তো আপনার ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছে। সে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত না পড়ে আপনার কাছেই পড়তে চায়।"

চুড়ি বালার টুন্ টুন শব্দ শুনিয়া অজিত দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, বই ও খাতা লইয়া ধীরে দ্বারে দাঁড়াইয়া পর্দ্দা ঈষৎ ফাঁক করিয়া অজিতের পানে চাহিয়া আছে। তাহার ভ্রুভঙ্গি যেন নিঃশব্দে অজিতকে তিরস্কার করিতেছিল। অজিত হাসিয়া মণিভূষণকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেখুন, ধীরাকে আপনার ভক্ত বলেছি, তাই ধীরা চোখ দিয়ে আমায় কেমন বকছে।"

মণিভূষণ একটু হাসিয়া বলিল, "চোখ দিয়ে বকছে!"

পড়া বন্ধ করিয়া এই সব বাজে আলাপ করায় অমিয় মনে মনে অতিশয় উত্যক্ত হইয়া

উঠিতেছিল। এবার অসহ্য হওয়ায় দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "দাদা নিজে তো পড়বেই না, আর কাউকে পড়তেও দেবে না।"

অজিত অম্লান হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তোর তো হয়েই গেছে, এখন সরে যা; ধীরা এসে তার পড়া বুঝে নিক্।"

অমিয়র 'কুমার সম্ভবের' কএকটা শ্লোক বুঝিয়া লইবার ছিল। অজিতের কথায় সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

লজ্জিতা ধীরাকে সেইখানেই কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইতে থাকিতে দেখিয়া মণিভূষণ বলিল, "এস ধীরা, এখানে এস।"

ধীরা মৃদুপদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনুবাদের খাতাখানি মণিভূষণের দিকে আগাইয়া দিয়া আসনে বসিতেই অজিত আবার বলিয়া উঠিল, "ধীরা আপনার জন্যে একখানা টেবিল ক্লথ করেছে, সেটা আপনাকে দিতে নাকি ওর লজ্জা করে। কিন্তু সেটা ভারি সুন্দর হয়েছে।"

বোকা ছেলেটার এই কথায় মণিভূষণ সন্ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ধীরার লজ্জারক্ত মুখ টেবিলের উপর নুইয়া পড়িয়াছে।

যদিও মণিভূষণ ধীরার অভিপ্রায় জানিতে পরিয়া 'পঞ্চতন্ত্র' খুলিয়া লইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার লজ্জিতা ছাত্রীটি পাঠ বুঝিয়া লইবার জন্য অন্যদিনের মত আগ্রহ প্রকাশ করা দূরের কথা, মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া চাহিতেই পারিল না। ধীরা তখন উঠিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু মণিবাবু যে পড়াইতেছেন, উঠিয়া গেলে তিনি কি মনে করিবেন? অজিতের কি একটু আক্কেল বুদ্ধি থাকিতে নাই? এমন করিয়া কি লজ্জা দিতে হয়? ধীরা কেনই বা অজিতের পরামর্শে টেবিল ক্লথ করিতে গিয়াছিল? তখনই তো কথা হইয়াছিল মণিভূষণের কাছে অজিত ধীরার নাম করিতে পাইবে না। এই লাঞ্ছনার জন্য অজিতকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে, মুখ নীচু করিয়া ধীরা তাহাই ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে তারা আসিয়া তাহাকে মুক্তি দিল। সে দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ধীরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, মা জিজ্ঞেস করলেন; এখন কি বাবুকে জল খাবার এনে দেবে?"

"আসছি" বলিয়া ধীরা পাঠকক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সে প্রতিদিনের মত আজ আর জল খাবার লইয়া মণিভূষণের সম্মুখে যাইতে রাজি হইল না। শৈলজাকে "আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও" বলিয়া সে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

খাবার লইয়া রোজই ধীরা আসিত। আজ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া মণিভূষণ আশ্চর্য্য হইল। সে জলযোগ শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অজিত বলিল, "আজ যে কিছুই খেলেন না?"

"আর কত খাব" বলিয়া মণিভূষণ চলিতে সুরু করিল।

সে বারান্দা অতিক্রম করিতে করিতে শুনিতে পাইল, কোন একটা কক্ষ মধ্যে কে যেন কাহাকে সম্বোধন করিয়া হাস্য তরল মৃদুকণ্ঠে বলিতেছে, "তুই লজ্জায় অমন লাল হয়ে উঠেছিলি কেন লো? 'ভক্ত' ছাড়া আর তো কিছু বলেনি। না, মনে মনে মণিবাবুকে আরো কিছু ভেবেছিস? যে রকম লজ্জার বহর, দেখলে মনে হয় মণিবাবুই বুঝি তোর বর হবেন।" কণ্ঠস্বর কোন কিশোরীর বলিয়াই তাহার মনে হইল।

তরল-স্বভাবা মেয়েদের কৃপাপাত্রী বলিয়াই সে মনে করিত। সে জানিত, যাহা-তাহা এবং যাহাকে-তাহাকে লইয়া রসিকতা করিতে মেয়েদের একটুও বাধে না। পরিহাস ব্যাপারে ইহারা নিঃসঙ্কোচ এবং নির্ভীক। কিন্তু তথাপি কথাটা শুনিয়া নবীন অধ্যাপকের কর্ণমূল রক্তিম হইয়া উঠিল। আলোকোজ্জ্বল বারান্দায় অন্য কোন শ্রোতা আছে কিনা, চাহিয়া দেখিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিন্তু পথ চলিতে চলিতেও তাহার কল্পনা-নেত্র রহস্য-বাণবিদ্ধা লজ্জারঞ্জিতা ধীরার আনত মুখখানাই দেখিতে লাগিল।

মণিভূষণ ছাত্রজীবনে উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়াই গণ্য ছিল। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া কাব্য-কবিতার আরও যে একটা জগৎ আছে, তাহার খবর সে বড় রাখিত না। কলেজ হইতে বাহির হইয়াও সে দর্শন সম্বন্ধীয় রাশি রাশি বই লইয়া অবসর সময়টা যাপন করিত। বাহিরের বিপুল পৃথিবীর সঙ্গে তাহার অন্তরের তেমন যোগ কোন দিনই ছিল না। এই নির্জ্জনতা-প্রিয় স্বল্পভাষী যুবার সঙ্গে কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরাও তেমন খোলাখুলিভাবে মিশিতে পারিতেন না। ইহাতে মণিভূষণ তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞই ছিল।

সে বাসায় আসিয়া দেখিল, পাচক ভাত বাড়িয়া ঢাকিয়া রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, চাকরটা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে। রাত্রি তখন ন'টার বেশী হয় নাই। পাচক ও ভৃত্য কোন দিন তিরস্কৃত না হইয়া এইরূপ প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিল। মণিভূষণ কাপড় ছাড়িয়া টেবিলের কাছে যাইয়া পড়িতে বসিল। অমিয়কে পড়াইয়া আসিয়া সে প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত পড়িত, তারপর খাইয়া শুইত।

আজিও সে পড়িতে বসিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। সে মনটাকে গ্রন্থে নিবিষ্ট করিবার জন্য খানিকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া পড়িল।

খাওয়া শেষ করিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া সে শুইল। যতক্ষণ তাহার ঘুম না আসিল, ততক্ষণ সে অজিতের আজিকার নির্ব্বুদ্ধিতা এবং সেই অদৃষ্টা অপরিচিতা মেয়েটার পরিহাস-রসিকতার কথা ভাবিয়া মনে মনে তাহাদের উপর রাগ করিতে লাগিল। ছি, ছি, ধীরা কি মনে করিয়াছে? তাহার লজ্জা, সে তো কিছুতেই ঠাট্টার জবাব দিতে পারে নাই। মুখের মত জবাব দিতে পারিলে বেশ হইত. অমন অসভ্য ঠাট্টা আর কখনও করিত না। কিন্তু লজ্জাটাও বোধ হয় তুচ্ছ জিনিষ নয়। লজ্জার আভা মেয়েদের অমন মধুর রহস্যময়, অমন রঞ্জিত করিয়া তোলে

বলিয়াই বোধ হয় লজ্জাকে নারীর ভূষণ বলা হয়। আচ্ছা, অজিতের একটা সামান্য কথায় ধীরা অমন লাল হইয়াই বা উঠিল কেন? শিক্ষকের প্রতি ছাত্রীর ভক্তি স্বাভাবিক, তাহাতে লজ্জার কি থাকিতে পারে? ধীরার লজ্জার স্মৃতি যেন মণিভূষণের অন্তরের অন্তরালে একটা অজ্ঞাত ভাবের শিহরণ তুলিতে লাগিল।

ফাল্গুনের এক সন্ধ্যায় বাহিরের বাঁধা ঘাটের চত্বরে বসিয়া অজিত তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। তাহারা 'নূরজাহান' অভিনয় করিবার পরামর্শ করিতেছিল। পরামর্শে অভিনয় করা যখন স্থির হইয়া গেল, তখন প্রশ্ন উঠিল, নূরজাহানের ভূমিকা গ্রহণ করিবে কে? অতুল বলিল, "সে জন্যে চিন্তা কি? অজিত নূরজাহানের পার্ট নেবে। বলতেও পারে বেশ, মুখ খানাও অতি সুন্দর।"

অজিত অতুলের প্রশংসায় লুব্ধ হইয়া তাহার নবোদগত গুম্ফরাজি নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিল না, মেয়েলি পার্ট লইয়া পৌরুষকেও খর্ব্ব করিতে রাজি হইল না। সে প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হবেনা ভাই, আমি মেয়েলি পার্ট নিতে পারব না।"

রামু হাসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "নূরজাহান তো আর বাঙ্গালীর ঘরের অবলা বিহ্বলা ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে নয়, সে যে পুরুষের বাবা। নইলে জাহাঙ্গীরের মত বাদশাহটাকে ভেড়া বানিয়ে রাখতে পারত, না ভারত শাসন করতে পারত?"

বিপিন রামুর ঐতিহাসিক জ্ঞানকে বিলক্ষণ টিটকারী দিয়া বলিল, "ইতিহাস তো তোমার যথেষ্ট পড়া আছে দেখছি। জাহাঙ্গীর আবার পুরুষ ছিল কবে? আর নূরজাহানের আমলে ভারতের এমন কি পরিবর্ত্তন বা উন্নতি হয়েছিল, যাতে করে তার শুভ বুদ্ধির প্রশংসা করা যায়?

রামু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি মস্ত ঐতিহাসিক বটে! মহব্বৎ খাঁর মত লোকের চোখে ধূলো দেওয়াও কি কম বাহাদুরী নাকি?"

বিপিন রাগিয়া কি একটা জবাব দিবার উদ্যম করিতেই অজিত বাধা দিয়া বলিল, "না ভাই, আর তর্কে কায নেই। নূরজাহানের বিদ্যাবুদ্ধি এখন তো আর কারু কাযে লাগবে না। সে নিয়ে এখন তর্ক করায় লাভ কি?"

ফাল্গুনের মিঠা সন্ধ্যাটা তর্ক বা কলহের বাষ্পে শ্রীহীন হইয়া উঠে, অজিতের তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিছুকাল পরে তাহাকে মৃদু মৃদু হাসিতে দেখিয়া নৃপেন বলিল, "তুমি হাসছ কেন অজিত?"

অজিত হাসিতে হাসিতেই বলিল, "আমি একটা মজা করবার কথা ভাবছি। কিন্তু সেটা এখন তোমাদের কাছে বলব না।"

অজিতের কথা শুনিয়া রামু, বিপিন, অতুল, নৃপেন মহাউৎসুক হইয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল, এখনই বলিতে হইবে। অজিত বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও আপত্তি জানাইয়া বন্ধুদের ঔৎসুক্য

বাড়াইয়া অবশেষে কথাটা বলিয়া ফেলিল। কথাটা এই, সে একদিন নদীর ও-পারের জঙ্গলে বেড়াইতে গিয়াছিল। বনের মাঝখানে একটা বহু দিনের পুরাতন পুকুর এবং তাহার পাড়ে খানিকটা পরিষ্কার জমি দেখিয়া আসিয়াছে। জায়গাটা তাহার ভারি ভাল লাগিয়াছে। সেই পুকুর পাড়ে বসিয়া একদিন নিজেরা রান্না করিয়া খাইলে বেশ মজা হয়। কথাটা শুনিয়া ছেলেরা অসহ্য উল্লাসে হাত তালি দিয়া উঠিল এবং অজিতের কল্পনার যথেষ্ট তারিফ করিতে লাগিল।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের বন ভোজনটা কবে হবে ভাই?"

অজিত বলিল, "রবিবার।"

অতুল অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "শুভস্য শীঘ্রং। আজ সবে মঙ্গলবার, রবিবারের যে ঢের দেরী।"

অজিত বলিল, "রবিবার না হলে মণিবাবুর যে সময় হবে না।"

অজিতের কথায় সকলে বিস্মিত হইল, এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তাঁকে কি হবে?"

অজিত বলিল, "তিনি একদিন বলেছিলেন, বনে বেড়াতে তাঁর নাকি খুব ভাল লাগে।"

অতুল বলিল, "তবেই হয়েছে! প্রথমতঃ তিনি প্রফেসর, তার পর তিনি যে গম্ভীর মুখ-বোজা মানুষ, তাঁর কাছে তো কারু মুখ খুলবে না।"

অজিত হাসিয়া বলিল, "তিনি কম কথা ক'ন বটে, কিন্তু কারু বেশী কথা অপছন্দ করেন না। তিনি তো আমাদেরই প্রায় সমবয়স্ক, তোমাদের আমোদের কোন ব্যাঘাত হবে না, ভয় নেই।"

অজিতের কথায় তাহার বন্ধুরা খুব ভরসাও পাইল না। তাহাদের বন ভোজনের উৎসাহের উত্তাপ খানিকটা কমিয়া গেল।

শনিবার সকাল বেলা অজিত পূজা-কক্ষ-দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা!"

শৈলজা তখন পূজায় বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, বলিল, "কেন বাবা?" অস্নাত কাহারও সে-কক্ষে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিলনা। তাই অজিত বলিল, "তুমি বাইরে এস মা, কথা আছে।"

শৈলজা বাহিরে আসিল। তাহার পরণে চওড়া লাল-পেড়ে গরদ, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা রে অজিত?"

অজিত বলিল, "আমরা কাল ভোরে কেশবপুরে বনভোজন করতে যাব। খাবার সব জিনিষ আজই ঠিক ক'রে রেখ।"

কাহাকেও খাইতে দিয়া শৈলজা আনন্দিত হইত। সে প্রসন্ন মুখে বলিল, "ক'জন যাবি, ঠাকুর চাকর ক'জন সঙ্গে নিবি, তা না বললে খাবার ঠিক করব কেমন করে?"

"পনেরো ষোল জনের খাবার দিও। দু'জন চাকর হলেই চলবে, ঠাকুর দরকার নেই, নিজেরাই রাঁধব।"

"ওমা সেকি! নিজেরা রাঁধবি কিরে? হাত পুড়িয়ে মরবি শেষে? অমন বাহাদুরীতে কায নেই, ঠাকুর সঙ্গে নিও।"

"ভয় নেই তোমার। রামু বেশ রাঁধতে পারে। নিজেরা না রাঁধলে আমোদই বা হলো কি?" বলিয়া অজিত চলিয়া গেল।

পরদিন ভোর বেলা অজিত অমিয়কে বলিল, "চল অমিয়।"

অমিয় অবজ্ঞার সহিত বলিল, "তোমাদের সঙ্গে হল্লা করবার মত আমার সময় নেই।"

অজিতের সঙ্গ যে অমিয়র লোভের বস্তু ছিল না, অজিত তাহা জানিত। সে আর কথা কহিল না। শৈলজা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বিরক্তিপূর্ণ রুষ্টস্বরে বলিল, "মণিভূষণ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। তোমার লেখা-পড়ার চর্চ্চা সেখানেও চলতে পারবে।"

কথাটা শুনিয়া অমিয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এই অকর্ম্মণ্য অপদার্থ দলের সঙ্গে মণিভূষণ আমোদপ্রমোদ করিতে যাইতেছে শুনিয়া জনৈক অধ্যাপকও কাল সবিস্ময়ে মণিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঐ ছোকরাদের সঙ্গে সত্যি আপনি যাচ্ছেন! ওরা তো অপদার্থ। থিয়েটার, ফস্‌কিমি আর পান চুরুটের শ্রাদ্ধ করাই হচ্ছে ওদের কায।"

মণিভূষণ স্থিরস্বরে জবাব দিয়াছিল, "আর সবাই কেমন জানিনে। কিন্তু অজিত ঠিক অপদার্থ নয় বলেই আমার বিশ্ব স। ওকে যখন দেখি, দরিদ্র বান্ধবশূন্য রোগীর শিয়রে বসে রাত জেগে সেবা করছে, বিপন্ন দেখলে অন্যের মারফতে বা আড়ালে ডেকে নিয়ে পকেট খালি করে দান করছে, তখন তার হৃদয়কে তো অস্বীকার করতে পারিনে। অথচ এই যে সেবার ইচ্ছা বা শক্তি একেবারে আড়ম্বরশূন্য, নিঃশব্দ, অনেকেই এ জানেও না।"

অমিয়র বিদ্যাচর্চ্চার সফলতা অজিতের গৌরব ও সুখের বিষয়ই ছিল। শৈলজার শ্লেষাত্মক কথায় অজিত খুসী হইল না। সে বলিল, "তুমি ওকে অমন করে বলছ কেন মা? ওর ভাল না লাগে, ও থাক।" বলিয়াই সে চলিয়া গেল। উল্লাস ও উৎসাহে সে অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে লাফে লাফে দু'তিনটা সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া নামিয়া গেল।

ফাল্গুনের স্নিগ্ধ সুন্দর প্রভাত। সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের আলো নদীর বুকে যেন আবির ঢালিয়া দিয়াছে। দক্ষিণা বাতাসে নদীর বুকও ঈষৎ পুলক-চপল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই স্পন্দনে অজিতদের নৌকা দুলিয়া দুলিয়া কল কল তর তর শব্দ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। নৌকার গায় মৃদু তরঙ্গ-ভঙ্গের শব্দ বিচিত্র সঙ্গীতের মতই সুশ্রাব্য মনে হইতেছিল। ছেলেদের মধ্যেই দু'জনে দাঁড় বাহিতেছিল এবং অজিত হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। আজিকার কর্ম্ম বা আনন্দের অংশ তাহারা কাহাকেও দিবে না। আনন্দের আতিশয্যে কেহ বা গান ধরিল।

ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যেই নৌকা ইঙ্গিতমত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু ছেলেরা নৌকা

বাঁধা হইতে না হইতেই লাফ দিয়া পড়িতে লাগিল। জলসিক্ত বালুকায় কাহার বা পা বসিয়া গেল, কেহবা সেই সৈকত-শয্যায়ই হুমড়ি খাইয়া পড়িল। কিন্তু সেই পতন-আঘাত তাহাদের উচ্ছল হাসি ও আনন্দের বেগই বাড়াইয়া দিল।

নদীতীরে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া বন। সেই বনচ্ছায়ায় ঘেরা পুষ্করিণী এবং তাহার তীরবর্ত্তী খানিকটা স্থান দেখিলে অনুমান করা কঠিন হয় না যে, অদূর অতীতে এখানে কাহারও বাসস্থান ছিল এবং এই জনশূন্য স্থান এক সময়ে হাসি-অশ্রুর সমাবেশে সুন্দর এবং সুখ-দুঃখের স্পন্দনে স্পন্দিত ছিল। বনটা তেমন নিবিড় নহে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে শিশির-ভেজা ঘাসের উপর রৌদ্র পড়িয়া মুক্তার উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। অযত্নবর্দ্ধিত কতকগুলা গুল্ম-জাতীয় গাছে ফুল ফুটিয়া আপনার বর্ণ-বৈচিত্র্যে, আপনার বিকাশের আনন্দে আপনিই হাসিতেছিল। দু'একটা পাখীর স্বর বনের স্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। বনের শান্তি এবং গভীর সৌন্দর্য্য মণিভূষণ সমগ্র হৃদয় দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।

অদূরে তরুণের দল কল-কোলাহলে রন্ধনের আয়োজনে লাগিয়া গেল। শৈলজা নানা রকম মিষ্টান্ন এবং প্রচুর খাদ্য দ্রব্য দিয়াছিল। বনে ঢুকিয়াই সকলে মিষ্টান্নগুলির সদ্‌ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু রন্ধনের দ্রব্যগুলা যে যোগ্যতার অভাবে তেমন সুখাদ্য হইবেনা ভাবিয়া চাকরেরা কিছু বিমর্ষ হইল।

পুকুরের উঁচু পাড়ের খানিকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইলে রান্না চাপান হইল। পাচক হইল রামু এবং অজিত হইল তাহার সাহায্যকারী। অন্যান্য ছেলেরা অন্য কাজে প্রবৃত্ত হইল। রামু রান্নায় তেমন অভ্যস্ত না হইলেও রান্না এক রকম হইতে লাগিল। সে পুরোহিতের ছেলে, যজমান বাড়ী যাইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে রাঁধিয়া খাইতে হইত।

রান্না প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে রামু উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "এখন কি হবে ভাই অজিত ?"

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? কি হয়েছে ?"

"তেল সব ঢেলে মাটিতে পড়ে গেছে, এখনো যে দু'তিন খানা রান্না বাকি।"

"তার জন্যে ভাবনা কি ? আমি যোগাড় করে দিচ্ছি।"

যোগাড় কিন্তু সহজে হইল না। ভৃত্য দু'জন কোদাল লইয়া ভোজন-স্থান পরিষ্কার করিতে-ছিল এবং অন্য সকলে দলবদ্ধ হইয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। অগত্যা অজিত নিজেই মুদীর দোকানের সন্ধানে বাহির হইল।

সে বন পার হইয়া সম্মুখে একখানি কুটীর দেখিতে পাইয়া দোকানের সন্ধান লইবার জন্য তাহাতেই প্রবেশ করিল। কিন্তু প্রবেশ করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুটীরের জীর্ণ অবস্থা দেখিলেই তাহার অধিবাসীর চরম দুর্দ্দশা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সে কুটীরে কমলার

চরণ-অলক্ত-দাগ কোন দিন পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয় না। ঘরের মধ্যে একটা লোক শুইয়াছিল, ছিন্ন মলিন বিছানায় তাহার অতি শীর্ণ দেহ এক রকম মিলাইয়া গিয়াছিল। সেই বিছানার পাশে বসিয়া এক শীর্ণ দেহাধারী—পরণের ছেড়া কাপড়ে তাহার লজ্জা নিবারিত হইতেছিল না। উঠানে দাঁড়াইয়া একটা লোক বোধ করি ঘরের লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া এমন ভাষায় গালি দিতেছিল যে, তাহার অর্থ অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাঁচ ছ' বছরের একটি কঙ্কালসার উলঙ্গ বালক উঠানে দাঁড়াইয়া লোকটার অঙ্গভঙ্গ এবং ক্রুদ্ধ তর্জ্জন গর্জ্জন যেন গিলিতেছিল।

বিস্মিত অজিত লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি? এমন করে গাল দিচ্ছ কেন?"

লোকটা অজিতের প্রতি একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদ্ধতকণ্ঠে জবাব দিল, "তাতে তোমার কি দরকার?"

অজিত একটু ইতস্ততঃ করিয়া দাওয়ায় উঠিয়া স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা গালি দিচ্ছে কেন?

অজিতকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি খুবই বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা তাহাকে ভীত হইতে দিল না। সে চোখের জল মুছিয়া অজিতকে জানাইল যে, এই গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার রামতারণ বসু টাকাও লগ্নি করিয়া থাকেন। তাহার স্বামী হর্থাৎ শয্যাশায়ী লোকটি রাম তারণ বসুর নিকট হইতে ২১৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল। এ যাবৎ তাহার সুদ ৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখনও সুদে আসলে তাঁহার ৪০৲ টাকা পাওনা। স্বামী রোগে পড়ায় তাহাদের খাওয়াই চলে না, সুদ দিবে কোথা হইতে? গোমস্তা মাঝে মাঝে সুদ আদায় করিতে আসিয়া এই রকম গালি দিয়াই থাকে।

অজিত গোমস্তার নিকটে যাইয়া নম্রস্বরে বলিলেন, "দেখছই তো এদের অবস্থা, খেটে খুটে খেত; রোগে পড়ে আছে খেতেও পায় না। টাকা তো এখন দিতে পারবে না, তবে গাল দেওয়ায় আর লাভ কি?"

গোমস্তা কটমট করিয়া অজিতের পানে চাহিয়া বলিল, "কে তুমি? আমার কথায় কথা বলতে এসেছ?" তারপর সে স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া অকথ্য কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিতে লাগিল। সে কেন অজিতকে অত কথা বলিতে গেল?

অজিতের গা খোলা, কাঁধের উপর শুধু একখানা গামছা।• পরণের কাপড়খানা তৈল, ঘি, হলুদ এবং ধুলা লাগিয়া বিশ্রী হইয়া গিয়াছিল। তাহার দেহে ভদ্রোচিত পরিচয় থাকিলেও লোকটা হয়তো এমন অসঙ্কোচে অমন কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারিত না। সেই ভাষা শুনিয়া অজিতের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে গোমস্তাটার উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা ধরিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। অজিতের বজ্রমুষ্টি মুক্ত হইয়া লোকটা তাহার উন্নত বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আর ভরসা করিল না। কিন্তু

তাহাকে গালি দিতে দিতে শাসাইয়া গেল, জমিদারের কার্য্যে বাধা দেওয়ার ফল অচিরেই ফলিবে। সে যে-সে লোক নহে, জমিদারের কর্ম্মচারী, ইত্যাদি।

অজিত লোকটাকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়া খুসী মনে দোকান খুঁজিয়া তৈল লইয়া চলিয়া গেল। যাইয়াই সে ছেলেটির জন্য চাকরের হাতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিল এবং বাড়ী পৌঁছিয়া ছেলের বাপকে ৪০৲ টাকা পাঠাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্পও মনে মনে আঁটিয়া ফেলিল।

অজিতদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে বেলাও শেষ হইয়া আসিল। নদীবক্ষে সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে হাসি গল্প গানে মাতিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিল।

ক্রমশঃ

৺সরোজবাসিনী গুপ্তা

সাধ

যতবার দেখি এই ধরণী সুন্দর,
ইচ্ছা করে একখানি সৌন্দর্য্যের ঘর
গড়ে তুলি এরি মত; শুধু চারিধারে
সৌন্দর্য্য-প্রাচীর গাঁথা ঘিরিয়া আমারে।
তরুণ প্রভাতখানি দেবে প্রসারিয়া
শুভ্রস্নিগ্ধ হাতখানি আমারে ঘিরিয়া।
পূর্ণিমার রাত্রি যবে নিজ জ্যোৎস্না খানি
প্রীতি ভরে দিবে মম করপুটে আনি,
তার পানে বাড়াইয়া তরুণ হৃদয়
তার সেই হৃদিখানি করে নিব জয়
সম্পূর্ণ চাহনি ভরে। চাহিব না ফিরে
ঘর হতে দেখিবারে অন্য ধরণীরে।
সকল সৌন্দর্য্য হতে তিল তিল করি
ইচ্ছা করে সৌন্দর্য্যের ঘরখানি গড়ি।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

ভিক্ষা

হে ধরিত্রী, সঞ্জীবনী তব সুধা দানে
নব শক্তি দাও পুনঃ মম মন প্রাণে।
তোমারে বেসেছি ভালো সর্ব্ব প্রাণ দিয়া
মোর সুখে দুঃখে;—আজ তাই মোর হিয়া
ভিক্ষা এক মাগে শুধু,—দিয়ে নব সুধা
আবার বাঁচায়ে তোলো মোর রূপক্ষুধা!
তোমারে বাসিয়া ভালো সারা জন্ম ধরে'
জীবনের প্রতি পলে বাসি যেন মোরে।
আজ শুধু অহর্নিশি ভয় হয় মনে
নিজেরে করেছি ঘৃণা নিজের নয়নে।
বসুন্ধরে, দূর করে দাও এই ত্রাস,
জীবনের মৃত্যুহীন এই মৃত্যুগ্রাস।
এই ভিক্ষা তব পাশে, হে মোর মৃন্ময়ি,
নিজেরে করিয়া ঘৃণা ছোট নাহি হই।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

জাতীয়তা ও বঙ্কিমচন্দ্র

[বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের সাহিত্য সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

আজ শরদিন্দু বাবু * একটা কথা বলে বিশেষ উপকৃত করেছেন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্রটি যে রামায়ণে আছে, এটা যে আদি কবি বাল্মীকির রচনা, সেটা বলে আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করেছেন। আমি নিজে পণ্ডিত নই, এ শ্লোক কোথায় আছে আমি জানতুম না; স্বদেশী আন্দোলনের সময় এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, তখন কেউ কেউ বলেছিলেন "ও একটা উদ্ভট শ্লোক"; কিন্তু আজ বাঁশবেড়িয়ায় এসে জানতে পারলুম যে আমাদের দেশাভিমানের মূল এই মহামন্ত্রটি আমাদের রামায়ণেই আছে।

আর একটা জিনিষের মূলও এখানে পেলাম। রাবণবধের পর বিভীষণ যখন রামকে লঙ্কার রাজা হ'তে আহ্বান কর্ল্লেন, তখন রাম যে বল্লেন, 'না, এখানে আমি রাজা হ'তে চাই না, আমার দেশ ত রয়েছে; আমার জননী জন্মভূমি আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী'—এই কথাটার মধ্যে কি আদর্শে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্ত্তেন তারও একটা পরিচয় এখানে পেলাম। আজকাল সাম্রাজ্য বা Empireর অর্থ হচ্চে ছোট ছোট রাষ্ট্রকে করতলগত ক'রে তাদের উপর প্রভুত্ব। কিন্তু এ ত সাম্রাজ্যের যথার্থ আদর্শ নয়। আমি বিলাতে একবার একটা বক্তৃতায় বলেছিলুম যে আমরা এই যা-কে Empire বল্‌ছি এটা ত আসল Empire নয়। আসল Empire—সমাজ বিভাগের আদর্শ অনুযায়ী Empire—বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে তাদের সকলকেই সার্থক করে,—সে ত বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রভুত্বের মধ্যে ত তা'র প্রকাশ নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক সাহচর্য্যের, পরস্পরের সেবার প্রবৃত্তি আছে—যাকে অবলম্বন ক'রে মানুষ পরিবারের মধ্যে, গোষ্ঠীর মধ্যে, ক্রমে ক্রমে সমাজের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে আপনাকে পেয়ে সার্থকতা লাভ করে; প্রথমে পরিবার থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ আরও বিস্তৃত গণ্ডীতে বৃহত্তর স্বার্থ ও সুখের মধ্যে ছোট স্বার্থ ও সুখকে ডুবিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে পায়—সেই ভাবেই বেড়ে বেড়ে ক্রমে Nation তার পর Empire গড়ে তুলে। প্রত্যেকের শক্তি ও ক্ষমতাকে একদিকে বর্দ্ধিত ক'রে, সংহত ক'রে আর এক দিকে সংযত ক'রে অনেকের বৃহত্তর সাধনার মধ্যে সার্থকতা লাভ করা এইটাই পরিবারের, সমাজের এবং এই রকম সব মিলনের সত্য আদর্শ।

পরিবারে কি করে?—পরিবারে ত মানুষগুলোকে খাট করে না, বাড়িয়ে দেয়—সেখানে ত কাহারও আসল স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, যার যে শক্তি থাকে সে সেইটাই বাড়াবার সুবিধা পায়।

* বাঁশবেড়িয়া নিবাসী কুমার শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্ এ মহোদয়।

এক পরিবারে যদি একজন সাহিত্যিক থাকেন, একজন Lawyer থাকেন, একজন বিদ্বান্ থাকেন, তবে সেখানে কেউ ত অন্য কাউকে খাট করে না, কারও উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চায় না, বরং পরস্পরের সুবিধা করে পরস্পরকে ফুটিয়ে তুলে। সমাজের সম্বন্ধেও ঠিক এই আদর্শ খাটে; সেখানেও প্রত্যেকে স্বাধীন থেকেও, স্বতন্ত্র থেকেও সকলের মিলনের দ্বারাই নিজ নিজ স্বাধীনতাকে ফুটিয়ে তুলে। প্রত্যেকের স্বাধীনতার সঙ্গে মিলিতের একত্বের সমন্বয়—এইটাই সত্য আদর্শ। ব্যষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টির নিকট অধীনতা—এইটাই সত্য স্বাধীনতা।

আজকালকার Empire সত্য সাম্রাজ্য নয়, এতে কেবল একটাকে বড় ক'রে আরেকটাকে ছোট করে। আমি বিলাতে একবার বলেছিলুম যে "তোমাদের যে এই Empire—এ শুধু territorial usurpation নয়, এ তার উপর আবার একটা terminological usurpation;" কারণ এতে Empire শব্দের অর্থের ব্যভিচার হচ্ছে। সাম্রাজ্য শব্দের যা যথার্থ অর্থ, তার প্রকাশ দেখতে পাই "সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" এই বচনটিতে। বধূ যখন শ্বশুর গৃহে যায় তখন এর দ্বারা তাকে কি বলা হয় যে সেখানে তুমি Imperialistic চালে চল্‌বে? না, তা নয়, তাকে বলা হয় যে শ্বশুর গৃহের বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে নিজকে ডুবিয়ে সকলের কাছে প্রীতির, আদরের পাত্র হ'য়ে সকলের উপর আধিপত্য কর। সাম্রাজ্যের এই অর্থ, এই আদর্শ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। তাই যখন রাবণ-বধ ও সীতাউদ্ধার হয়ে গেলে, যে অন্যায়ের জন্য লঙ্কা আক্রমণ তার যখন নিরসন হয়ে গেল, তখন রামচন্দ্র বল্লেন যে পরের রাজ্যে কেমন করে থাক্‌ব? Japan যেমন Koreaর প্রতি কিম্বা England যেমন Indiaর প্রতি করেছেন অর্থাৎ শাসন কর্ত্তে এসে অদ্ ধাতুর প্রয়োগ করেছেন, রামচন্দ্র তা কল্লে'ন না; তিনি বল্লেন, 'আমার ত একটা স্থান আছে, এখানে আমি থাক্‌ব না।' আজকাল হলে চিরদিনের জন্য অধীনতার নিগড়ে লঙ্কাবাসীদের বাঁধতে চাইত। কিন্তু রামচন্দ্র তা কর্ত্তে পাল্লে'ন না; স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি তাঁর যে প্রীতি ছিল তারই জন্যে পাল্লে'ন না। কেন?

কারণ, স্বদেশকে যে সত্য প্রীতি করে সে ভিন্নদেশে স্বাধীনতা হরণ কর্ত্তে চায় না; যেমন আপন অপত্যকে যে সত্য প্রীতি করে সে পরের ছেলেকে ঠেঙাতে চায় না। যে মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহ নিজের ছেলেকে আশ্রয় করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে সেই ত যথার্থ স্নেহ; নইলে মাত্র নিজের অপত্যকে প্রীতি ত পশুতেও করে। দেশপ্রীতি যার যথার্থ আছে সে অন্যদেশের স্বাধীনতা হরণ কর্ত্তে চায় না। আমাদের দেশের উপর আততায়ীর আক্রমণ যদি সত্যই কষ্টের কারণ হয়, পরের দেশের উপর আক্রমণ হলেও ত তেম্‌নি হবে। England আজ আমাদের অধীন ক'রে রেখেছে কিন্তু Germany যদি Englandএ এসে চড়াও হ'ত, তবে আমি ত সুখী হ'তাম না, আমি বঙ্কিমের শিষ্য বলেই সুখী হতাম না।

আজকাল বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' গানের 'সপ্তকোটীর' যায়গায় অনেকে 'ত্রিংশ কোটি'

করতে চাইছেন—আমার মনে হয় এটা ঋষিবাক্যে হস্তক্ষেপ করা—কিন্তু এর আবশ্যক কি? আসল কথাটা ত সব জায়গাতেই ঠিক্। ভারতবর্ষ ত আর সবখানেই "সুজলা" নয়; কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় কি? মানুষ তার প্রাণের ভেতরের সৌন্দর্য্যকে সমস্ত প্রীতির পাত্রের মধ্যে দেখ্তে চায়, সেই জন্য "সুজলাং সুফলাং" ভারতের সব জায়গার লোকেরই প্রাণের বাণী হ'তে পেরেছে। ইংরেজ যদি 'বন্দে মাতরম্' নিজের দেশ সম্বন্ধে বল্তে পারে তবে সে কি সুখী হয় না? তাদের দেশেও যখন বসন্ত ফুটে, পত্রে পুষ্পে শোভায় দেশে অপূর্ব্ব শ্রী হয়, তখন তাদের মনেও কি এ রকম ভাব আসে না? 'বন্দে মাতরম্' গানের যে আদর্শ সে সব সময়ে সব দেশের স্বদেশ প্রেমিকের আদর্শ। ইংরেজের Rule Britanniaর আদর্শ সঙ্কীর্ণ, তাতে আমরা যোগদান কর্ত্তে পারি না, তার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে সার্ব্বজনীনতা নেই। কিন্তু

Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said
This is my own, my native land?

এ গানের মধ্যে সার্ব্বজনীনতা এসেছে। কবি বল্ছেন,—এমন লোক কি কেউ থাকতে পারে যে 'This is *my* native land'—এই আমার স্বদেশ বলে গর্ব্ব অনুভব করে না? এ ভাব সব দেশের, "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" এভাব কোন বিশেষ দেশে আবদ্ধ নয়।

বঙ্কিমের স্বদেশভক্তির আদর্শ পার্থিব আদর্শ নয়; সাংসারিক প্রতিপত্তির লাভ তার স্বদেশপ্রেমের লক্ষ্য নয়। স্বদেশপ্রেমের মধ্যে তিনি বিশ্বজনীন সত্য ও রসের সন্ধান পেয়েছিলেন। আজকাল দেশে দেশে যে patriotismর ঢেউ উঠেছে এটা দেখে অনেক মনীষী ভয় পেয়েছেন, তাঁরা বল্ছেন এতে অকল্যাণ আছে। Romain Rollandর মত লোক গত যুদ্ধের এই patriotismর উদ্দাম লীলা দেখে বলেছেন, 'এ আসুরী, দানবীয় বৃত্তি।' গীতায় আসুরী সম্পদের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্লে একেবারে অবিকল মিলে যায়। 'আজ এটা পেয়েছি, কাল ওটা নেব; একে হত করেছি, ওকেও হত করব'—এই হল আসুরী বৃত্তির লক্ষণ। দেশভক্তির নামে আসুরী বৃত্তির এই তাণ্ডব লীলা দেখে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন, দেখছেন যে এর প্রভাবে দুনিয়া ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছে। এই যে patriotic nationalism—যা ক্ষুদ্র ভূভাগকে আশ্রয় করে আঁকড়ে পড়ে থাকে—দেশের গণ্ডীর বাইরে যায় না—সে আত্মঘাতী। সে অপরের সর্ব্বনাশ করে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সর্ব্বনাশ করে।

বঙ্কিমবাবু এটা লক্ষ্য করেছিলেন। আমরা তাঁর আদর্শ ভুলে গেছি বলেই তাঁর জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে আজ আমাদের মনে সন্দেহ হচ্ছে। "আনন্দমঠে"ই এ আদর্শের ব্যাখ্যা আছে। যখন সত্যানন্দের সঙ্গে মহেন্দ্র 'আনন্দমঠে'র মধ্যে নানা দৃশ্য দেখছিলেন, তখন প্রথম দৃশ্য তিনি

দেখলেন—মহাবিষ্ণুর অঙ্কে মহালক্ষ্মী। এই মহাবিষ্ণু কে?—আজকাল প্রাচীন চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা বিলাতি কথাগুলির হুবহু অনুবাদ কর্ছি, যেমন Humanityকে বল্‌ছি বিশ্বমানব। আমাদের সাধনায় কিন্তু আছে মহাবিষ্ণু, নারায়ণ—তিনি হচ্ছেন ঐ বিশ্বমানব। Humanity বলে এই যে কল্পনা আমরা ইংরেজের কাছ থেকে ধার করেছিলুম, সেটা এখন সুদ শুদ্ধ ফেরৎ দেবার সময় হয়েছে। সুদ শুদ্ধ বলছি এই জন্য যে আমাদের মহাবিষ্ণুর কল্পনা ওদের Humanityর কল্পনার চেয়ে অনেক বেশী প্রগাঢ়, অনেক বেশী উঁচু। Humanity হচ্ছে তোমাদের একটা abstraction; কিন্তু নারায়ণ ত মাত্র কল্পনার বস্তু নয়, মাত্র generalisation নয়, নারায়ণ যে জাগ্রত দেবতা, মানুষের প্রাণের ঠাকুর। যারা তোমাদের সাধক, মনীষী বা প্রাজ্ঞ তাঁরাও একে এ রকম দেখেন নি। ওদের এক Mazzini বলেছেন "Humanity is a being"; আমরা সবাই বলব—নারায়ণ পুরুষবাচক, জাগ্রত।

মহেন্দ্র এই যে প্রথম দৃশ্য দেখলেন—এর ভিতর দিয়ে বঙ্কিমবাবু দেখালেন যে জন্মভূমি—যাকে আমরা প্রণাম করি—তাঁর আদিরূপ, নিত্যসিদ্ধরূপ কোথায়? না, মহাবিষ্ণুর অঙ্কে। আমাদের আদর্শের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সমস্ত nationকে ধারণ ক'রে। অঙ্গ যেমন অঙ্গীকে ধারণ কচ্ছে, সেই রকম নারায়ণ সমস্ত nationকে ধারণ ক'রে আছেন; সকল nationর মিলনের মধ্যে আমার মা—তিনি আলাদা নন, সকলের সঙ্গে মিলিত থেকে সকলের মধ্যে আলো করে রয়েছেন—এই আমার মা।

এখানে পর্ণ-কুটীরে, বাঁশঝাড়ে, "কর্দ্দম-পিচ্ছিল" পল্লীপথে মা-কে দেখি, আসল মা-কে দেখি সকল nationর মধ্যে। ইংলণ্ডের বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রীতির দেশমাতৃকার মধ্যেও দেখি নিজের রূপকে ফুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর সকলকেও ফুটিয়ে রেখেছেন—ঐ আমার মা।

বঙ্কিমও এইরূপ দেখেছিলেন, তাই সত্যানন্দের মুখ দিয়ে বলেছেন, "মহেন্দ্র, ঐ দেখ আমার মা। মহাবিষ্ণুর অঙ্কে দেশমাতৃকাকে দেখ।" Europe আজকাল এই ভাবের একটু আধটু পাচ্ছে, বঙ্কিমের ৫০ বৎসর পরে এইরূপ একটু একটু দেখ্‌তে শিখ্‌ছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু অনেক আগে শিখিয়ে গেছেন যে সেইটিই আসল patriotism যা বিশ্বপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ভালবাসায় অপরকে ঘৃণা করতে শিখি সে ভালবাসা জঘন্য। ইংরেজের দেশকেও ভালবাসব ইংরেজের মা বলে। তা হ'লে ইংরেজের উপর আঘাত আমাদেরও লাগ্‌বে; অঙ্গীর সঙ্গে অঙ্গের যখন সম্বন্ধ আছেই, তখন এক অঙ্গকে আঘাত কর্লে অন্য অঙ্গেও এসে লাগবে। আমাকে ছোট ক'রে তার যে উন্নতি সে যথার্থ উন্নতি নয়, আমার দুর্ব্বলতা পরশু হয়ে তাকে নিপাত কর্ব্বে।

বঙ্কিম প্রথমে মহাবিষ্ণুর অঙ্কে মহালক্ষ্মীকে দেখিয়ে তাঁর স্বদেশ প্রেমের যেখানে গোড়া-পত্তন করেছেন, সেটা আমরা আজকাল ভুলে গেছি বলেই নানা প্রশ্ন উঠেছে।

তার পর নানা দৃশ্যের ভিতর দিয়ে বঙ্কিম দেশমাতৃকার নানারূপ দেখালেন। আগে

দেখালেন, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—"মা যা ছিলেন।" আগে বন জঙ্গলের মধ্যে যে পশুত্ব ছিল তাকে বিনাশ করে তার উপর মায়ের প্রতিষ্ঠা ; দেশের এই প্রাচীন রূপ।

তার পর কালীমূর্ত্তি—"মা যা হয়েছেন"। রিক্তা, আত্মবিস্মৃতা, শ্মশানবিহারিণী মা শিবকে—আপন কল্যাণকে—পদদলিত কর্চ্ছেন, দেশের এই বর্ত্তমান রূপ।

তার পরে দশভূজা মূর্ত্তি—"মা যা হবেন"। একদিকে লক্ষ্মী, তাঁর কাছে তাঁকে রক্ষা কর্চ্ছেন দেবসেনাপতি স্কন্দ ; আর একদিকে সরস্বতী, তাঁকে রক্ষা কর্চ্ছেন স্থিরতার ধীরতার মূর্ত্তি গণেশ।—বিদ্যা যখন প্রাজ্ঞতার দ্বারা রক্ষিত না হয় তখন সে অবিদ্যা হয়ে দাঁড়ায়, লক্ষ্মী ক্ষাত্রবীর্য্য দ্বারা রক্ষিত না হ'লে চপলা হয়ে যান, তখন ঝাঁপিতে ধান তুষ হয়ে যায়।—মা দাঁড়িয়েছেন সিংহের উপরে—পশুশক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শকে স্বকার্য্যে বশীভূত করে আসুরী শক্তিকে দলন ক'রে দশদিক্ রক্ষা কর্চ্ছেন। এই বঙ্কিমের কল্পিত দেশের আদর্শরূপ।

এই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন বঙ্কিমের patriotismর শ্রেষ্ঠ দান। দেশকে মা বলে জেনে, দেবতা বলে মেনে তিনি এই দেশমাতৃকার মূর্ত্তি গড়েছেন, তাঁর স্তব গেয়েছেন—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যা দায়িনী নমামি ত্বাং
বন্দে মাতরম্।

স্বাদেশিকতার এমন প্রগাঢ়, এমন আন্তরিক, এমন মহিমামণ্ডিত আদর্শ আর কোথাও ফুটে ওঠে নি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

লোক-মত

তব কার্য্যে লোকে যদি করে সাধুবাদ,
সন্দেহ করিও তবে বিচারণা তার।
কিন্তু কভু কহে যদি তব পরিবাদ,
শ্রান্তভাব, বিচারণা-বুদ্ধি আপনার॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

বিবেকানন্দ

জয়,—তরুণের জয়!
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক,—জয়,—জয় চিন্ময়!
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল,—উষা উঠেছিল জেগে'
পূর্ব্ব তোরণে, বাংলা-আকাশে,—অরুণ-রঙীন মেঘে;
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া,—জগৎ গেছিল রেঙে'!

হে যুবক মুশাফের,
স্থবিরের বুকে ধ্বনিলে শঙ্খ জাগরণ-পর্ব্বের!
জিঞ্জির-বাঁধা ভীত চকিতেরে অভয় দানিলে আসি',
সুপ্তের বুকে বাজালে তোমার বিষাণ হে সন্ন্যাসী,
রুক্ষের বুকে বাজালে তোমার কালীয়-দমন বাঁশী!

আসিলে সব্যসাচী,
কোদণ্ডে তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিল প্রাচী!
টঙ্কারে তব দিকে দিকে শুধু রণিয়া উঠিল জয়,
ডঙ্কা তোমার উঠিল বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময়;
শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক,—নাহিক' তোমার ক্ষয়।

তৃতীয় নয়ন তব
ম্লান বাসনার মনসিজ নাশি' জ্বালাইত উৎসব!
কলুষ-পাতকে, ধূর্জ্জটি, তব পিণাক উঠিত রুখে',
হানিতে আঘাত দিবানিশি তুমি ক্লেদ-কামনার বুকে,
অসুর আলয়ে শিব-সন্ন্যাসী বেড়াতে শঙ্খ ফুঁকে'!

কৃষ্ণচক্র সম
ক্লৈব্যের হৃদে এসেছিলে তুমি ওগো পুরুষোত্তম
এসেছিলে তুমি ভিখারীর দেশে ভিখারীর ধন মাগি',
নেমেছিলে তুমি বাউলের দলে—হে তরুণ বৈরাগী!
মর্ম্মে তোমার বাজিত বেদনা আর্ত্ত জীবের লাগি।

হে প্রেমিক মহাজন,
তোমার পানেতে তাকাইল কোটি দরিদ্র-নারায়ণ;
অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণতলে
বারবার যবে কেঁদে কেঁদে গেল কাতর আঁখির জলে
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুমদলে!

কোথা পাপী? তাপী কোথা?
—ওগো ধ্যানী, তুমি পতিত-পাবন যজ্ঞে সাজিলে হোতা
শিব-সুন্দর-সত্যের লাগি সুরু করে দিলে হোম,
কোটি পঞ্চমা আতুরের তরে কাঁপায়ে তুলিলে ব্যোম,
মন্ত্রে তোমার বাজিল বিপুল শান্তি স্বস্তি ওঁ!

সোনার মুকুট ভেঙে'
ললাট তোমার কাঁটার মুকুটে রাখিলে সাধক রেঙে!
স্বার্থ-লালসা পাসরি ধরিলে আত্মাহুতির ডালি,
যজ্ঞের যূপে বুকের রুধির অনিবার দিলে ঢালি,
বিভাতি তোমার তাইতো অটুট রহিল অংশুমালী!

দরিয়ার দেশে নদী!
—বোধিসত্ত্বের আলয়ে তুমি গো নবীন শ্যামল বোধি!
হিংসার রণে আসিলে পথিক প্রেম-খঞ্জর হাতে,
আসিলে করুণা-প্রদীপ হস্তে হিংস্রার অমরাতে,
ব্যাধি মন্বন্তরে এলে তুমি সুধা-জলধির সংঘাতে!

মহামারী ক্রন্দন
ঘুচাইলে তুমি শীতল পরশে,—ওগো সুকোমল চন্দন!
বজ্র-কঠোর, কুসুম-মৃদুল,—আসিলে লোকোত্তর;
হানিলে কুলিশ কথনো,—ঢালিলে নির্ম্মল নির্ঝর,
নাশিলে পাতক,—পাতকীরে তুমি অর্পিলে নির্ভর।

চক্র গদার সাথে
এনেছিলে তুমি শঙ্খ পদ্ম,—হে ঋষি, তোমার হাতে;
এনেছিলে তুমি ঝড় বিদ্যুৎ,—পেয়েছিলে তুমি সাম,
এনেছিলে তুমি রণ-বিপ্লব,—শান্তি কুসুম দাম;
মাভৈঃ শঙ্খে জাগিছে তোমার নর-নারায়ণ-নাম!

জয়,—তরুণের জয়!
আত্মাহুতির রক্ত কখনো আঁধারে হয় না লয়!
তাপসের হাড় বজ্রের মত বেজে উঠে বারবার!
নাহিরে মরণে বিনাশ,—শ্মশানে নাহি তার সংহার,
দেশে দেশে তার বীণা বাজে,—বাজে কালে কালে ঝঙ্কার!

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

ঋণী

এক সময় যা'কে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করা যায় এমন সময়ও আ'স্‌তে পারে—যখন তার কাছেই আবার উপেক্ষিত হতে হয়। সেকালে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট বলী বেঁটে মুনি-কুমারের ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনায় প্রথমে অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন ; কিন্তু, যখন সেই বামন-মূর্ত্তি বিরাট-রূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে দুইপদে উর্দ্ধ ও অধঃ জুড়ে ব'স্‌লেন এবং তৃতীয় পদের জন্যে হুঙ্কার ছেড়ে স্থান চাইলেন, তখন সেই বিশ্বের সম্রাটই নিজেকে নিরুপায় ভেবে ভয়ে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিন্ধ্যারাণীর দিকে তাকালেন এবং শেষে তাঁর পরামর্শে দৈত্যের সম্মানদৃপ্ত মাথাটী অদিতি-পুত্রের পায়ের তলায় ধরে দিয়ে পূর্ব্ব অহঙ্কারের মাপ চেয়ে নিলেন।

জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ বীরগাঁয়ের বীরেশ্বর ঘোষাল এতদিন মোহনপুরের দত্ত বাবুকে উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখে আ'স্‌ছিলেন। গাঁয়ের দু'আনা রকমের তিনি অংশীদার। দত্তরা ব্যবসা ও মহাজনীতে কতকগুলি টাকা জমিয়েছেন বটে, কিন্তু, সে অঞ্চলে জমিদার আখ্যা লাভটা এখনও তাঁদের ভাগ্যে ঘটে নাই। সে হিসাবে তিনি তাঁদের অনেক উচ্চে! এ ধারণাটা তাঁর বরাবরই ছিল। কিন্তু কন্যাকে কুলীন পাত্রস্থা ক'রতে যখন তাঁর সঞ্চিত অর্থের সমস্তই শেষ হয়ে গেল, আর তার দিন কয়েক পরেই যখন রাজা বাকি খাজনার নালিশ ক'র্‌লেন, তখন বাধ্য হয়ে জমিদার বাবুকে মোহনপুরের শ্যামসুন্দর দত্তর কাছে কোটালের হাতে রোকা লিখে পাঠা'তে হ'ল। কারণ দত্ত বাড়ীতে বীরগাঁয়ের বীরেশ্বর বাবু আর দশজনের মত হাত পেতে দাঁড়ালে তাঁর দুর্নামের অবধি থা'ক্‌বে না।

চতুর শ্যামসুন্দর বাবু ঘোষাল মোশায়ের রোকার মর্ম্ম অবগত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে রোকা-বাহককে ব'ল্‌লেন,—"জমিদার বাবু একটা কাকের মুখে বলে পাঠা'লে আমি নিজে তাঁর বাড়ীতে টাকা পৌঁছে দিয়ে আ'স্‌তাম। পাঁচ-শ' টাকা তাঁকে বিনা লেখা পড়ায় দেব সেটা কি বড় আশ্চর্য্য! আমার বরাৎজোর্ যে তিনি চেয়েছেন।" লোকটীকে একটু অপেক্ষা ক'র্‌তে বলে তিনি একবার তাঁর খাস্ কুঠুরীতে গিয়ে প্রবেশ ক'র্‌লেন ও একটু পরেই বেরিয়ে এসে পাঁচ-শ' টাকা একটি একটি করে গুণে তার হাতে দিলেন। অধিকন্তু তাকে চার আনা পয়সাও জল খেতে দিলেন।

(২)

বীরেশ্বর বাবু যখন টাকাগুলি গুণে নিচ্ছিলেন তখন কোটাল তাঁকে ব'লল, "বাবু, দত্তরা কি ভাল মানুষ! ওদের বড়বাবু আপনার সুখ্যাতিতে ভেঙ্গে প'ড়্‌তে লাগলেন। বল্‌লেন জমিদার বাবুকে বিনি লেখাপড়ায় এই ক'টা টাকা দেব তার আর আশ্চর্য্য কি?" "বটে!" বলে তাকে সেখান থেকে বিদেয় করে দিয়ে বীরেশ্বর বাবু তাঁর পুত্রকে ডা'কলেন, —'অনঙ্গ!'

সে কাছে এলে বল্‌লেন, "শ্যাম দত্তকে বলে পাঠাও যেন কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। রেজেষ্টারি অফিসে যেয়ে কালই ওর টাকাটার একটা লেখাপড়া করে দেব।"

অনঙ্গ জিজ্ঞাসা ক'রল, "কেন, সে কি তাই বলেছে নাকি?"

"ব'ল্‌বে কেন?" বলে ঘোষাল মোশায় অনেকটা গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লেন।

"আচ্ছা, বলে পাঠাব 'খন।" বলে অনঙ্গ অন্যত্র চলে গেল।

পরদিন পাকা দলিল তৈরী করে দিয়ে বীরেশ্বর বাবু ভা'ব্‌লেন—সামান্য টাকা, এর পর এক সময় দত্তকে ফেলে দেওয়া যাবে। কিন্তু দেওয়া আর হল না। যখনই অর্থ হাতে আসে তখনই গৃহস্থের এমন একটা দরকারও সেই সঙ্গে এসে পড়ে যে, সেটা মেটাতে অধিকাংশ টাকাই খরচ হয়ে যায়। এমনই ভাবে প্রায় আটটী বৎসর চলে গেল। শ্যামসুন্দর বাবু একদিন ঘোষাল মোশায়ের বাড়ীতে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিভৃতে ডেকে ব'ল্‌লেন, "বাবু, একবার হিসেব করে সেই খতের টাকা কটা কত হল দেখবার অবসর হবে কি?"

বীরেশ্বর বাবু ব'ল্‌লেন, "তুমিই হিসেব করে আমাকে জানিও কত হ'ল। আর টাকাটা এখন পাচ্ছো না। হাতে যা আছে অনঙ্গর ছেলে অমিয়ের পৈতেতেই তার সবটাই খরচ হবে। আরও সাত আট শ' টাকা হলেই খরচটা বেশ হাত মেলেই করা যায়!"

দত্ত মশায় মুচকি হেসে ব'বল্‌লেন, "আজ্ঞে তাকি আর বল্‌তে হয়। আপনারা জমিদার মানুষ, হাত মেলে খরচ করবেন না তো করবে কে? তা—,ও টাকাটা না হয় আমিই দেব। পরে সবটা একসঙ্গে জড়িয়ে একটা—"

"সে বল্‌তে হবে না দত্ত—ব'ল্‌তে হবে না। বীরেশ্বর ঘোষালের জমিদারী আছে। না হয় তোমার বিশ্বাসের জন্যে সেইটেই মর্টগেজ্ লিখে দেব। টাকাটা আ'ন্‌তে লোক পাঠাতে হবে কি—,না তুমিই পাঠিয়ে দেবে? পরে একটা নূতন সুদ ধার্য্য করে সবটা জড়িয়েই লিখে দেব।"

"আজ্ঞে উত্তম কথা। আমিই নিজে এসে দিয়ে যাব। আপনার মত লোককে অবিশ্বাস করা যায়—রামচন্দ্র হে!" দত্ত মশায় তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বাড়ী ফি'র্‌লেন। বীরেশ্বর বাবু অমিয়ের পৈতের খরচের তালিকাটা তৈরা কর্‌তে গৃহিণী চঞ্চলার কক্ষে গেলেন।

(৩)

সময়ের গতি অবিরত। কারো বাধা সে মানে না। কারো সুবিধা—অসুবিধায় তার কিছু আসে যায় না। কারো মুখের হাসি অভিনন্দন ক'র্‌বার—কি কারো চোখের জলে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসবার তার অবসর নাই। কিসের অলক্ষ্য আকর্ষণে সে তার চারিদিকের সব জিনিষকেই উপেক্ষা করে চলে যায় তা' সেই জানে। ঘোষাল মশায়ের দিনও সুখে দুঃখে এক রকম যেতে লাগ্‌ল। ক্রমে আরও দশটা বৎসর চ'লে গেল, ঋণের এক কাণাকড়িও শোধ করে উঠ্‌তে পা'র্‌লেন না। এরই মধ্যে এক সময় শ' পাঁচ টাকা দেবার জন্য যোগাড়

করেছিলেন বটে—কিন্তু, অনঙ্গ ও তার ছেলে অমিয়ের অসুখে তার প্রায় সমস্তটাই খরচ হয়ে যায়। আর একবার তাঁদের পিতাপুত্রের চেষ্টায় যে টাকাগুলা সংগৃহীত হয়েছিল, তাতে হয় তো সব দেনাটাই শোধ হয়ে যেত ; কিন্তু দৈবের প্রতিকূলতায় সেবারও দেওয়া হ'ল না। হঠাৎ ঘোষাল গৃহিণী চঞ্চলা হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন। সমস্ত টাকাগুলিই তাঁর শ্রাদ্ধে বীরেশ্বর বাবু লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু সেদিন যখন তাঁর এক আত্মীয় ভদ্রলোকের কাছে শুন্‌লেন—যে, দত্তরা তাঁর নামে নালিশ ক'র্‌বে বলে বেড়াচ্ছে, টাকাগুলাও সুদেমূলে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের ওপর হয়েছে, তখন তিনি আর স্থির থাক্‌তে পা'র্‌লেন না। বরাবর দত্তদের ওখানে গিয়ে শ্যামসুন্দর বাবুকে একবার হিসেব করতে ব'ল্‌লেন।

দত্ত মশায় মুচ্‌কি হাসিয়া জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "টাকার যোগাড় কোথায় হল—ঘর থেকেই বেরোবে কি ?"

বীরেশ্বর বাবু মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে উত্তর দিলেন—, "যোগাড় এখনও হয় নাই। চেষ্টায় আছি—তাই হিসাবটা একবার দে'খ্‌তে এসেছি।"

"ওঃ,—যোগাড় হোক্। তারপর হিসাব ক'র্‌তে তো দশ বিশ দিন যাবে না।" বলেই দত্ত মশাই সেখান থেকে উঠ্‌বার উপক্রম ক'র্‌লেন। ঘোষাল মোশায় সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "শুন্‌লুম্ নালিশ—?"

বাধা দিয়ে শ্যামসুন্দর বাবু উত্তর দিলেন, "তা' করতে হবে বৈকি। চিরকালটা তো চুপ্ করে থাকা যায় না। আগে বুঝ্‌লে এ ঝক্‌মারি কি ক'র্‌তুম্ ঘোষাল !"

বীরেশ্বর বাবুর মাথাটী মাটীর দিকে অনেকটা ঝুঁকে প'ড়্‌ল। ঋণদাতা বলে গেলেন—আর এক মাস দে'খ্‌ব—একমাস—ক্ষুণ্ণমনে ঋণী উঠে বাইরের রাস্তাটী ধর্‌লেন।

(৪)

দিন দুই পরে আবার ঘোষাল মশায় দত্তদের ওখানে উপস্থিত হ'লেন। শ্যামসুন্দর বাবু সেদিন অনেকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজের বৈঠকখানায় মজলিসে বসে ছিলেন। বীরেশ্বর ঘোষালকে তিনি একবার তাকিয়ে দেখ্‌লেন, কিন্তু, বস্‌তেও বল্‌লেন না। পাশের লোকগুলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন। মনোহর মণ্ডলের, মনজুড়ো বড় হিড়্ জমিটী তিনি এ বৎসর সাতশ টাকায় সুদ্‌বন্ধকী নিয়েছেন। ন'পাড়ার বিপিন দে তার জমিজায়গা মর্টগেজ লিখে দিয়ে সেদিন তাঁর কাছে এক হাজার টাকা কর্জ্জ নিয়ে গেছে। যাদবপুরের চন্দ্রকান্ত মুখুয্যের ভিটেটী পর্য্যন্ত তিনি এই সেদিন নিলামে ডেকে নিয়েছেন—অল্পদিনের মধ্যেই দখল নেবেন !

ঘোষাল মশায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ ক'র্‌বার সুযোগ প্রতীক্ষা ক'র্‌তে লা'গ্‌লেন। কিন্তু সুযোগ আর মিল্‌ল না। সকাল ৭টা থেকে ১০টা হ'ল। গল্পের আর শেষ হয় না। বসে থাকা বৃথা ভেবে সেদিনের মত উঠ্‌লেন। তাঁকে উঠ্‌তে দেখে দত্ত মশায় পাশের লোকটীর কানে কি বলে হো হো করে হেসে গড়িয়ে প'ড়লেন। সেই অসাময়িক বেখাপ্পা আওয়াজটা বীরেশ্বর

ঘোষালের কানে বড় বেসুরো ঠেক্‌ল। দৃষ্টিটা অস্বাভাবিকরূপে সেখানের লোকগুলির দিকে ঘুরে গেল। একজন ব'ল্‌ল, "উঠ্‌লেন যে ঘোষাল ?" "হুঁ" বলেই তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। * * * * * *

ঋণ! ঋণ যে কি কঠিন তা যে ঋণী সেই জানে! সেই বোঝে যে লজ্জার কান ধরে ঋণ কেমন মানুষকে নির্লজ্জ সাজায়! মান অপমানকে এক জায়গায় ফেলে ঋণের পেষণ-যন্ত্র কেমন তাদি'কে গুঁড়ো করে দেয়! চেষ্টা ক'র্‌লেও ঋণী আর সে গুঁড়োগুলোর মাঝে কোনটা কা'র দানা বাছাই ক'র্‌তে পারে না।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আবার বীরেশ্বর ঘোষাল দত্তদের বৈঠক খানায় ধন্না ধ'র্‌তে যাবার যোগাড় ক'র্‌লেন। দত্তকে তাঁর স্বপক্ষে দুকথা বলে একটা অনুকূল ব্যবস্থা ক'র্‌বার মিনতি জানিয়ে ধরে ব'স্‌তে কয়েকজন মাতব্বর প্রজাকেও সঙ্গে নিলেন। পিতাকে দুশ্চিন্তার হাত হতে মুক্তি দিতে যদি কিছু ক'র্‌তে পারে ভেবে তাঁরই পরামর্শমত অনঙ্গও সঙ্গ ধ'র্‌ল।

শ্যামসুন্দর বাবুর বৈঠকখানায় সেদিনও অনেকগুলি ভদ্রলোক বসেছিলেন। ঘোষাল মশায়কে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, সেখানে ব'স্‌তে দেখেই হঠাৎ দত্ত চটে উঠ্‌লেন, "বলি ঘোষাল, খুবই তো আসা যাওয়া আরম্ভ করেছ! দেখে লোকে ভাববে দত্ত হয় তো পাক দিচ্ছে!"

"আজ্ঞে সে কি কথা ?"

"রকম তো তাই! তোমার মতলব কি শুনি ?"

যাতে আমিও একেবারে না যাই—আর আপনার ঋণও শোধ যায়; এমনই একটা কিছু করে নিন! অতগুলো টাকা যোগাড় ক'র্‌তে এক দফায় আমি পেরে উঠ্‌ছি না দত্ত মশায়!" বলে ঘোষাল বড় দীনভাবে দত্তর দিকে তাকালেন।

বিস্ফোরকের গায়ে হঠাৎ একটু আগুনের ফিন্‌কি পড়লে যেমন দ্রুতগতিতে সমস্ত ক্রিয়াটা এক মুহূর্ত্তে শেষ হয়ে যায় শ্যামসুন্দর দত্তর ঝাঁঝাল কথাগুলো তেমনই ভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "কিস্তি হবে না হবে না হবে না। রোকড়্‌ টাকা ঘর থেকে গুণে দিয়েছি। এ তল্লাটের নিমখারাম্‌ শালাদের জ্বালায় আমাকে হয়ত মহাজনীই শেষে তুলে দিতে হবে!"

সমবেত সম্মানজ্ঞানীদের অনেকেই উঠে বাইরে চলে গেলেন। কারো কারো বা মাথাগুলি একটু ঝুঁকে প'ড়্‌লে। আর নির্লজ্জরা মুখ ঘুরিয়ে টিপে টিপে হা'সল।

সক্ষোভদৃষ্টিতে প্রজাদের দিকে একবার তাকিয়ে বীরেশ্বর ঘোষাল ডা'ক্‌লেন, "অনঙ্গ বাইরে কি কর্‌ছিস্‌ ? মাছটা দত্ত বাবুর কাছে এনে দে।"

অনঙ্গ কিন্তু ভিতরে গেল না। বাইরে থেকেই একটা পাঁচসের রুই মাছ ভিতরের দিকে ছুড়ে দিল। প্রজারাও ততক্ষণে দোরের ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডা'ক্‌ল, "একবার বাইরে আসুন রাজাবাবু!" গলার স্বরটা তাদের ভারি ভারি শোনাল।

শ্রীকৃত্তিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পশ্চিমের কার্য্য

(৯)

যখন বার্লিনে কমিটি-স্থাপন হইয়াছে ও চারিদিকের বৈপ্লবিকদের তথায় সমাগম হইতেছে, তখন সুইজর্লণ্ডস্থিত শ্রীযুক্ত হরদয়ালকে বার্লিনে আসিয়া কর্ম্মে যোগদান করিবার জন্য কমিটি পুনঃপুন নিমন্ত্রণ করে। ইনি যখন ১৯১৪ খৃঃ আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক anarchist বলিয়া অভিযুক্ত হন, তখন জামিন ভাঙ্গিয়া সুইজর্লণ্ডে পলাইয়া আসেন। পরে ১৯১৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে স্তাম্বুলে গমন করেন, ও তথাকার জার্ম্মাণ সিফারৎ-খানায় ভারতীয় কর্ম্মের প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু জার্ম্মাণিরা তাঁহাকে নানা কারণ বশতঃ তাঁহার প্রস্তাবনা উপেক্ষা করে। এই জন্যই ইনি বার্লিনের কমিটির নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন। কিন্তু ১৯১৫ খৃঃ প্রাক্কালে হাতরাসের কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ সুইজর্লণ্ডে উপস্থিত হইয়া হরদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও পরে উভয়ে বার্লিনে আসেন। পরে তাহা বিবৃত হইবে।

এই বৎসরের প্রথমকালে ইংরেজ সোসালিষ্ট নেতা H. M. Hyndmann তাঁহার কোন পরিচিত কমিটির সভ্যকে লোক দ্বারা খবর পাঠান যে, তিনি বড়ই দুঃখিত যে ভারত বিপ্লবারম্ভ করে নাই (he is sorry that India has not moved)! এই বৎসরের শেষে কমিটির সভ্য শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়কে গুণ্ডা দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা হয়! কিন্তু সুইস পুলিশ সমস্তই পূর্ব্ব হইতে খবর পায়। তাহারা উভয়কে ধৃত করে, এবং Berneএর আদালতে সমস্ত কথা প্রকাশ করে। লণ্ডন হইতে একজন গুণ্ডা চট্টোপাধ্যায়ের কোন পরিচিত বন্ধুর নাম করিয়া তাঁহাকে সুইজর্লণ্ডে আহ্বান করে, বলে বড় দরকারি কাষ আছে। এই পরিচিত বন্ধু ইংলণ্ডে "অন্তরীণে" ছিলেন। তাঁহার কাছ হইতে পুলিশ জোর করিয়া লিখাইয়া লয় যে জার্ম্মাণিতে তাঁহার বাপমাকে কোন গুপ্ত দরকারি ব্যাপারের সংবাদ দিবার জন্য এই ইংরেজটি সুইজর্লণ্ডে যাইতেছেন, চট্টোপাধ্যায় ইহাকে যেন বিশ্বাস করেন। কিন্তু সুইজর্লণ্ডে আসিবার কালে এই লোকটার পাশপোর্টের গোলমাল থাকায় সুইস পুলিশের তাহার উপর নজর পড়ে। পরে চট্টোপাধ্যায়কে বার্লিনে ঘনঘন টেলিগ্রাম পাঠানতে পুলিশ সুইজর্লণ্ডে তাঁহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চট্টোপাধ্যায় এই ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে একটা

Cock and bull (আষাঢ়ে) গল্প ফাঁদে, শেষে তাহার একটা রিভলভার ও কতকটা তুলার দরকার হয়, এবং এইজন্য সে চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া এক দোকানে ঢুকিতে চায়, কিন্তু এই স্থলে চট্টোপাধ্যায়ও রিভলভারের নাম শুনিয়া থমকিয়া যান ও তাহার সঙ্গে দোকানে প্রবেশ করেন নাই। ইত্যবসরে পুলিশ আসিয়া উভয়কে ধৃত করে। পুলিশ চট্টোপাধ্যায়কে বলে "এই লোকটার উপর আমরা অনেক দিনই নজর রাখিতেছিলাম, কিন্তু তোমার আগমনের অপেক্ষাতেই এতদিন ছিলাম।" সুইস পুলিশই চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণ বাঁচাইয়া দেয়। এই গুণ্ডার প্লান ছিল, হয় তাহাকে ভুলাইয়া ফ্রান্সের সীমানার কাছে লইয়া গিয়া অটোমোবিলে চড়াইয়া ফ্রান্সে আনিবে, না হয় তাহাকে হত্যা করিবে। পুরস্কার dead or alive (মৃত বা জীবিত) একলক্ষ ফ্রাঙ্ক! কিন্তু ইংরেজ শক্তির প্রভাবের গুণে এই গুণ্ডার দোষ সাব্যস্ত হওয়া সত্বেও তাহার কেবল যুদ্ধব্যাপী সময় জন্য সুইজর্লণ্ড হইতে নির্ব্বাসনের হুকুম হইল। আর নিরপরাধী চট্টোপাধ্যায়েরও সেই দণ্ড হইল!

ভারতীয়-জার্ম্মাণ মিশন

(১০)

মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন সুইজর্লণ্ডে আসেন তখন তিনি হরদয়ালকে জর্ম্মাণির ভাব জিজ্ঞাসা করেন। কারণ তাঁহার একটা রাজনীতিক mission ছিল। কিন্তু হরদয়াল মহেন্দ্র প্রতাপকে জর্ম্মাণির ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের বিষয় অতি pessimist ভাবে উত্তর প্রদান করেন ও তাঁহাকে জর্ম্মাণি যাইতে মানা করেন! কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপের আগমনের সংবাদ বার্লিনে পৌঁছাইলে কমিটি তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করে। পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বার্লিনে আনয়ন করেন। এই সময়ে কমিটি আফগান আমীরের কাছে একটি রাজনীতিক মিশন পাঠাইবার পরামর্শ করিতে ছিল। কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপেরও সেই মিশন ছিল। উভয় পক্ষে একমতের যোগাযোগ হওয়াতে মহেন্দ্রপ্রতাপ জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বার্লিনে সাদরে নিমন্ত্রিত হন। বার্লিনে আসলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিরা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন ও কাইসারের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেওয়া হয় মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে প্রফেসার বরকাতুল্লা ও জনকতক জর্ম্মাণ কর্তৃক ধৃত ইংরেজি ফৌজের পাঠান সিপাহি ও আমেরিকা হইতে আগত দুইজন আফ্রিদি অভিযানে যাত্রা করেন। ইহাঁদের সঙ্গে জর্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট একজন প্রতিনিধি (Dr. Hentig) ও একজন ডাক্তার প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় Indo-German mission. উদ্দেশ্য আফগান আমীরকে জার্ম্মাণ-তুর্কির সহিত সংযুক্ত করাইয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা। মহেন্দ্রপ্রতাপকে নাকি উত্তরাখণ্ডের কোন কোন রাজরাজড়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশ (আফগানিস্থানের দিক) সুরক্ষিত থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ইংরেজের বিপক্ষে সম্মুখ রণ করিতে

সাহস করেন। আর ইহাও চিন্তাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, যদি আমীর জার্ম্মাণ তুর্কের সহিত সম্মিলিত হইত তাহা হইলে ভারতস্থিত ইংরেজসৈন্য সীমান্ত প্রদেশে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা বশতঃ ভারতীয় বৈপ্লবিকদের উত্থান করার সুযোগ হইত, এবং আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া অস্ত্রাদিও ভারতে আনয়ন করা সম্ভব হইতে পারিত। আফগান আমীরকে (হবিবুল্লা খাঁ) ইংরেজ-বিপক্ষে আনয়ন করার জন্য তিনটি হেতু নিরূপিত হইয়াছিল :—(১) আমীর হবিবুল্লা খাঁ একজন নৈষ্ঠিক সুন্নি মুসলমান ছিলেন, এবং তুর্কির সুলতান সুন্নিদের খলিফা ; তিনি যখন ইংরেজের বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন তখন আমীরেরও ইরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (২) আমীর যদি জার্ম্মাণ তুর্কির দিকে সম্মিলিত হইতেন তাহা হইলে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানকে স্বাধীন দেশ ও আমীরকে সুলতানের মতন বন্ধুপদবাচ্য স্বাধীন নরপতি বলিয়া গণ্য করিয়া লইত (এই সময়ে আফগান গভর্ণমেণ্ট বহিঃ রাজনীতিক বিষয়ে স্বাধীন ছিল না); ও আফগান স্বাধীনতা সমরের জন্য অর্থ ও অস্ত্রাদি সাহায্যের জন্য রাজী ছিল। আমীরের সঙ্গে negotiation করিবার জন্য Dr. Hentigকে জর্ম্মাণ প্রধান মন্ত্রী (Reichkanzler) Bethmenn-Hollweg, রাজনীতিক পত্রাদি (diplomatic correspondence) দিয়াছিলেন এবং Kaiser মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে আমীরের নামে এক স্বহস্তনামা (autograph) পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে জার্ম্মাণ প্রধানসচিব ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন, অর্দ্ধস্বাধীন ও করদ নরপতিদের ও নেপালের মহারাজার নামেও পত্রাদি মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সব রাজারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত defensive and offensive মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। তাঁহাদের এই মিত্রতাসূত্র ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা ইংরেজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলে জর্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহা পত্রে আভাষ দেওয়া হয়। নেপালের মহারাজার নামেও এক পত্র দেওয়া হয়, তাহাতে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট নেপালের মহারাজাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া সম্ভাষণ করে।

এই প্রকারে সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে Indo-German Mission অভিযান আরম্ভ করে ও ১৯১৫ খৃঃ এপ্রিলের শেষে স্তাম্বুলে পৌঁছায়। তথায় মহেন্দ্র প্রতাপ এনভার পাশা কর্ত্তৃক আদরে গৃহীত হন ও সুলতানও আমীরের নামে তাঁহার হস্তে এক Autograph পত্র প্রদান করেন। তুর্কি গভর্ণমেণ্ট ইহার অগ্রে আফগানিস্থানে কতিপয় অভিযান পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কোনটাই ইরাণ ছাড়িয়া বেশীদূর যায় নাই। এনভার পাশা আশা প্রকাশ করেন যে এই ভারতীয় জার্ম্মাণ মিশনই কৃতকার্য্য হইবে। মৌলবি বরকাতুল্লা সেখ-উল-ইসলামের কাছ হইতে হিন্দু মুসলমানদের একযোগে কায করিবার জন্য এক ফতোয়া গ্রহণ করেন। এই ফতোয়া প্রকাশ্যে আয়াসোফিয়া মসজিদে প্রদত্ত হয়। পরে মিশন তুর্কির পূর্ব্ব সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় রৌউফ্ বে (Rouf Bey) সীমান্তের প্রহরী ছিলেন।

তাঁহার সহিত মহেন্দ্র প্রতাপের সাক্ষাৎ হইলে তিনি শেষোক্তকে ইরাণের পথের দুর্গমতা ও ইংরেজের আক্রমণের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন। নানা কারণে মিশনকে সীমান্তস্থানে একমাস দেরী করিতে হয়। ইহার ফলে জুন-জুলাই মাসে বার্লিনে হেনটিস্ কর্তৃক প্রেরিত এক তার আসিয়া পৌঁছিল যে মহেন্দ্র প্রতাপ রৌফ্ বের সহিত সাক্ষাতের পর আর অগ্রসর হইতে চান না! জার্ম্মাণ ফরেণ অফিস্ চটিয়াই অস্থির, মহেন্দ্র প্রতাপ কেন রৌফ্ বের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, রৌফ্ বে ইংরেজ বন্ধু! আসল কথা রৌফ্ বে নাকি তুর্কির এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই প্রশস্ত ব্যবস্থা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই জার্ম্মাণেরা তাঁহার উপর বিরক্ত। যুদ্ধের পরে এই দেরীর কারণ বোধগম্য হয়। তুর্কি-ইরাণের সীমান্তের সেনাপতি রৌফ্ বে। তাঁহার সঙ্গে অমুক-পেশোয়ারী নামক একজন ভারতবাসী কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনিই ঘাটি আটক করিয়া বসিয়াছিলেন। রোউফ্ বে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে তিনি "মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন ও তাঁহাকে বলিয়াছেন যে তুর্কি গভর্ণমেণ্ট রোউফ্ বেকে আফগানিস্থানে রাজনীতিক মিশনে পাঠাইয়াছেন, উভয় মিশনের একই গন্তব্য ও মন্তব্য; আর তুর্কি যখন এসিয়ার "Paramount Power," তখন এই Indo-German মিশনের তাঁহার নেতৃত্বাধীনে গমন করা উচিত। কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপও বরাকাতুল্লা এ মন্তব্যে কর্ণপাত করেন নাই, আপনি ইহাঁদের বুঝাইয়া বলুন।" এই ভারতীয় কর্ম্মচারীই মহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরাকাতুল্লাকে বুঝাইবার জন্য একমাস ঘাটি আটকাইয়া মিশনকে অগ্রসর হইতে দেন নাই! স্তাম্বুল হইতে হুকুম ছিল যেন সীমানার কর্ম্মচারিরা মিশনকে বিনা বাক্যব্যয়ে সীমানা পার হইতে দেয়। কিন্তু তুর্কির যে প্রকার বিশৃঙ্খল কাণ্ড, রাজধানীর হুকুম প্রাদেশিক কর্ম্মচারিরা মানেন না, রৌফ্ বেও তদ্রূপ হুকুম তামিল করেন নাই। এই অসম্ভব প্রস্তাব স্বভাবতই মিশনের দ্বারা অগ্রাহ্য হইবে। ইহা ভারতীয় জার্ম্মাণ-তুর্কি সম্মিলিত মিশন,—উপরোক্ত গভর্ণমেণ্টদ্বয় রাজনীতিক সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মিশনকে পাঠাইয়াছে এবং এনভারপাশা কাজিম বেকে তুর্কি গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি করিয়া সঙ্গে দিয়াছেন, রাস্তায় রৌফ্ বে ইহাঁর সঙ্গে জুটিয়া সর্দ্দারি করিতে চান!

একমাস দেরীর পর মিশন ইরাণে যাত্রা করে। কিন্তু রাস্তা বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল! ইংরেজের চরেরা ও সৈন্যেরা রাস্তায় এই মিশনকে ধরিবার চেষ্টা করে। ইরাণি কাগজে প্রকাশিত হয় যে একজন ভারতীয় রাজা ও প্রফেসর ইরাণের মধ্যদিয়া কাবুল যাইতেছেন আর ইংরাজরা তাঁহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯১৫ খৃঃ পারস্যদেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত। তুর্কি ও জার্ম্মাণেরা চেষ্টা করিতেছেন পারস্য যেন তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হয়, সেই জন্য ছোট ছোট দলে তাঁহারা পারস্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, আর ইংরেজের ফৌজ দক্ষিণ চাপিয়া বসিয়া তাহাদের বিপক্ষে ক্রমশঃ উত্তরে অগ্রসর হইতেছিল এবং অনেক জায়গায় খণ্ডযুদ্ধও হইতেছিল। উভয় দলই ইরাণি পার্ব্বতীয় জাতিদের (tribes) পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া নিজেদের কার্য্যে নিয়োজিত

করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাস্তায় মিশনের উপর ইংরেজের লোকেরা হানা দেয় ও সমস্ত মাল বস্তা (luggage)—যাহাতে ভারতীয় রাজাদের নামে চিঠিপত্রাদি রক্ষিত ছিল—তাহা তাহারা লুটিয়া লয়! ইংরেজের লোকেরা নাকি এই পত্রাদি হস্তগত করিবার জন্য ক্রমাগতই চেষ্টা করিতেছিল!

কিন্তু বিশেষ দরকারি রাজনীতিক পত্রাদি মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে থাকায় মিশনের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। শেষে মিশন কাবুলে নিরাপদে পৌঁছায়। ইহার পর আর এক বৎসর মিশনের খবর পাওয়া যায় নাই। এই মিশন লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কথা উত্থাপিত হয়। পার্লামেণ্টের কোন সভ্যের প্রশ্নে তদানীন্তন ভারতসচিব উত্তর প্রদান করেন যে, মহেন্দ্রপ্রতাপ অযোধ্যার একজন সামান্য তালুকদার, তাঁহাকে বার্লিনস্থিত হিন্দু anarchistরা একজন "prince" বলিয়া কাইসারের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়াছে বলিয়া অলীক সংবাদ দেন। তৎপরে ১৯১৬ খৃঃ Hentig চীন ও আমেরিকা হইয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাবুলে এই মিশনের অবস্থিতির সময় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নাকি ইহার বিপক্ষে লাগিয়াছিল, আমীরকে নাকি অনুরোধ করা হইয়াছিল মিশনকে যেন আফ্‌গানিস্থান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়! কিন্তু এ বিষয়ে আফ্‌গান গভর্ণমেণ্ট শ্যাম ও রুষ গভর্ণমেণ্টদ্বয় হইতে আতিথেয়তা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল। ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত হয় যে মিশনের সভ্যদের আমীর কাবুলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ও পরে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়—ইহা ভুল ও মিথ্যা। ১৯১৬ খৃঃ ডাক্তার মথুরা সিংহও একজন মুসলমান ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত পত্র বার্লিনে আসিয়া পৌঁছে যাহাতে লিখিত ছিল যে, মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অন্যান্যেরা কাবুলে আমীর কর্ত্তৃক আদরে গৃহীত হইয়াছেন, তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য একটি অট্টালিকা প্রদান করা হইয়াছে। এই ভারতবাসীদ্বয়কে মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষের czarএর নিকট ভারতীয় বিপ্লবকর্ম্মের সহায়তা প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি memorandum লিখিয়া রুষ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তুর্কিস্থানে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা মিশনের কুশল সংবাদ বার্লিনে অবগত করাইবার জন্য তুর্কিস্থান ও চীনদেশের সীমান্তে ডাকে সমর্পণ করেন। এই পত্র পেকিং হইতে ওয়াশিংটন ও তথা হইতে বার্লিনে উপস্থিত হয়!

কিন্তু যে কর্ম্মের জন্য মথুরাসিংহকে তুর্কিস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হওয়া দূরের কথা, রুষ গভর্ণমেণ্ট ইহাঁদের ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। মথুরাসিংহ সাংহাই হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও পরে কাবুলে যান। ইহাঁদের লাহোরে আনা হয় ও তথায় সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে ডাক্তার মথুরাসিংহের ফাঁসি হয়। ইহার পর মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষ দিয়া জার্ম্মাণি প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যিত হয়। তৎপরে তিনি পামীর উপত্যকা দিয়া চীনের মধ্য দিয়া ফিরিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতেও বিফলমনোরথ হন। অবশেষে রুষে বোলচেভিকি বিপ্লবের পর পুনরায় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য্যও হন।

বোলচেভিকি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, Trotsky, Joffe প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয় এবং ১৯১৮ খৃঃ প্রাক্কালে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কাবুলে এই মিশনের সহিত আফগান গভর্ণমেণ্টের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা জগতের নিকট আজ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। আমীর হবিবুল্লাখাঁ মহেন্দ্রপ্রতাপকে মিশনের নেতা এবং কাইসার ও সুলতানের সংবাদবহ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে কেন যোগদান করিলেন না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। Hentig বলেন যে আমীরের ৬০,০০০ সৈন্য ছিল, কিন্তু তাহার সব অফিসার ষাটের উপর বয়সের বৃদ্ধ ও যুদ্ধোপযোগী সরঞ্জামের অভাব ছিল। আমীরের সৈন্য যুদ্ধে অক্ষম ছিল, তিনি ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। মহেন্দ্র-প্রতাপ বলেন যে, আমীর তাঁহাকে স্বহস্তে নোট লিখিয়া দিয়াছিলেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য, অফিসার, ও অস্ত্রাদি পাইলে যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারেন। আর Hentig সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ড করিয়াছেন। Captain Niedermeyer বলেন, আমীর কোন মতেই যুদ্ধে নামিতেন না, তিনি নিরপেক্ষ থাকিতেন, কোনও ব্যক্তির দোষে কার্য্য পণ্ড হইয়াছে ইহা বলা অসঙ্গত হয়। তিনি আরও বলেন যে, আমীরের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল। আমীর বলিয়াছিলেন যে তিনি ভারতের সংবাদ ভাল প্রকারেই জানেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার লোক আছে, ভারতবাসীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সমর করিবেনা। তিনি নিজে নিঃশঙ্কে ইংরেজের বিরুদ্ধে defensive যুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ও সে দেশের রাজারা যখন তাঁহাকে কোন সাহায্য করিবেন না তখন তিনি নিজে ইংরেজদের আক্রমণ করিয়া স্বীয় সিংহাসন কেন হারাইবেন! আর তুর্কি? মিশনের ভারতবাসী ও জার্ম্মাণ সভ্যেরা সকলেই একমত হইয়া বলেন যে আমীর তুর্কদের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলেন তুর্কদের Pan-islamism প্রচারের উদ্দেশ্য কেবল মুসলমান জগতে তুর্কির আধিপত্য বিস্তার করা। তিনি স্বীয়দেশে স্বয়ং খলিফা, তুর্কদের তিনি মানেন না।

সর্দ্দার নসরুল্লা খাঁর কিন্তু অন্যমত ছিল। তিনি বলিতেন যে ১৬ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মুসলমানদের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে। একবার আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধিলে তিনি ছয়মাসে ভারত বিজয় করিতে পারিবেন। তাঁহার ধারণায় এ ব্যাপারটা একটা easy walk over হইবে! এই জন্যই তিনি বরাবর বলিতেন যে আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধার জন্য তিনি সতত প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমীর বলিতেন যে, ইংরেজ ভারতে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাকে স্থানচ্যুত করা দুরূহ ব্যাপার।

আমীর যুদ্ধে যোগদান করিলেন না, কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে কাইসারের ও সুলতানের নামে দুইখানি Autograph পত্র প্রদান করেন। কাইসারের পত্রে লিখিত ছিল যে তিনি কাইসারের বন্ধুত্ব বাসনা করেন। আর সুলতানের নামে এই স্বহস্তনামা পত্র দিবার কালে মহেন্দ্রপ্রতাপকে বলেন যে, আফগানিস্থানের নরপতির কাছ হইতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম পত্র যাহা

তুর্কির সুলতানের নিকট প্রেরিত হয়! ১৯১৬ খৃঃ মধ্যখানে মথুরাসিংহের পত্র বার্লিনে পৌঁছিবার পর, পারস্য দিয়া উপরোক্ত মিশনের লোকের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, আমীর যুদ্ধে অবতরণ করিতে ইচ্ছুক ও জার্ম্মাণির সহিত একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে দুই দিক দিয়া কাবুলের সংবাদ আসায় বার্লিনে সাড়া পড়িয়া গেল। সেই সময়ে Kut-al-amaraরও পতন হইয়াছে, তুর্কিয় ফৌজ ইরাণের মধ্যে অভিমান করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহাই 'মাহেন্দ্রক্ষণ' সময়, জার্ম্মাণ General Staff স্থির করিল যে এই আক্রমণকারী তুর্কি ফৌজ পারস্য-আফগানিস্থানের সীমানাস্থিত Yedz সহরে অস্ত্রাদি পৌঁছাইয়া দিবে, তথা হইতে আফগানেরা সরঞ্জাম লইয়া যাইবে। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট আমীরের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য একটা খসড়া কাবুলে পাঠাইয়া দেন। পরে প্রকাশ যে প্রোফেসার বরাকাতুল্লা যিনি মিশনের অন্যান্য লোকেরা চলিয়া যাওয়াতে তাহার প্রতিনিধিরূপে কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারই প্ররোচনায় এই সন্ধির প্রস্তাব হয়। কিন্তু খসড়া কাবুলে পৌঁছিলে আমীর তাহা স্বাক্ষর করেন নাই। আমীর ক্রমাগতই জার্ম্মাণ-তুর্কি সম্পর্কীয় ব্যাপারে নিজেকে তফাৎ রাখিতে লাগিলেন। সেইজন্য ঐ দিক হইতে সমস্ত উদ্যমই ব্যর্থ হইল!

আমীর যদি জার্ম্মাণ-তুর্কির দিকে মিশিয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন তাহা হইলে সে যুদ্ধের পরিণাম কি হইত আজ তাহার জল্পনা কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা ধ্রুব ছিল যে সে সময়ে, ভারতের উত্তরখণ্ডে এক তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি হইত, যাহা Lahore Conspiracy Caseএর ন্যায় মকদ্দমা করিয়া নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা বৃথা হইত, এবং যে বিপ্লবের তেজে সমস্ত উত্তর ভারত টলটলায়মান হইত। কিন্তু আমীর হবিবুল্লা খাঁ যে কারণেই হউক এই যুদ্ধে যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন ১৯১৯ খৃঃ স্বীয় জীবন দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। জনরব যে তাঁহার সর্দ্দারেরা তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া নিরূপিত করিয়াছিল।

ভারতীয় জার্ম্মাণ মিশন যখন কাবুলে উপস্থিত হয় তাহার অব্যবহিত অগ্রে মৌলবি ওবায়দুল্লা ও আঞ্জুমান ইসলামিয়ার ছাত্রেরা কাবুলে পৌঁছিয়াছিল। এই ৪০-৫০ জন মুসলমান ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কিতে গিয়া জেহাদে যোগদান করা। সেই জন্য তাহারা কাবুলে যাত্রা করে। ভাবিয়াছিল যে তথাকার মুসলমান গভর্ণমেণ্ট তাহাদের তুর্কি গমনের সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমীর তাঁহাদের তুর্কিতে যাইতে দেন নাই। তাহাদের নজর বন্দিতে থাকিতে হইত।

এস্থলে উল্লেখ্য যে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের আফগানীস্থানের আগমনের ফল ভারত পায় নাই কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দেশ পাইয়াছে। মহেন্দ্রপ্রতাপ সেদেশে থাকিবার কালে আমীরকে এসিয়ার স্বাধীন দেশসমূহে রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করিবার পরামর্শ দেন। ১৯১৯ খৃঃ আফগানীস্থান স্বাধীন হইলে জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশে যে রাজপ্রতিনিধি পাঠাইয়া দেয় এবং আজকাল ভারতবাসীদের এক কৌমের (race) লোক বলিয়া খাতির করে তাহা এই মিশনের কাবুল আগমনের ফল।

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

আমেরিকায় টাকার মাহাত্ম্য

একটা চলিত কথা আছে "আমেরিকানরা ডলারকে (অর্থকে) ঈশ্বরের মত মনে করে ও সেইরূপ পূজা করে।" কথাটা নিতান্ত প্রবাদ নয়—অনেকটা সত্য, এরা টাকা উপায় করা জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। শুধু মনে করা নয়—তার উপায়ও বাহির করে। পার্থিব জগতের হিসাবে (materialistic) এরা বোধ হয় পৃথিবীর আর সব জাতিকেই হারাইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় যে এরা এত বেশী দূরে গিয়া পড়িয়াছে যে সেখানে কেবল ঐ পার্থিব জিনিষই আছে—অন্য সুখ-শান্তি তেমন নাই। এদের অবস্থা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় সেই আরব্য উপন্যাসের কথা। একজন বর চেয়েছিল যে, সে যা ছুঁইবে তাই যেন সোনা হয়। বর পূর্ণ হোল। সে যা ছোঁয় সবই সোনা হয়। খাবার বা জল খেতে যায়, তাও সোনা হয়ে যায়। শেষে কেঁদে মরে "হে সর্ব্বশক্তিমান, আমি আর সোনা চাই না—তোমার বর তুমি ফিরিয়ে নাও, আমায় দুটো ভাত আর একটু জল দাও।"

আমেরিকার যে দিকে তাকান যায় সেই দিকেই দেখা যায় ঐশ্বর্য্য। এর যেন শেষ নাই আরম্ভ নাই, যেন অনন্ত। দুঃখের বিষয় এ ঐশ্বর্য্য সকলের ভাগ্যে জোটে না। যে টাকা উপায়ের ফন্দি জানে সেই উপায় করিতে পারে। কতকটা যন্ত্রের মত, যে যন্ত্রটী চালাতে জানে সেই পারে। যে তা জানে না সে হাহাকার করে। একদল ধনাকাঙ্ক্ষী আমেরিকান এ জিনিষটাকে বড় বেশী দূরে নিয়েছে, তাদের হাব ভাব কথাবার্ত্তা এবং বোধ হয় জীবনটা পর্য্যন্ত ঐ একঘেয়ে যন্ত্রের মত হইয়া গিয়াছে। সেখানে দয়া, মায়া, পরদুঃখকাতরতা বা পরোপকার নামে কোনও শব্দ নাই। সবই কাজ, কাজ, কাজ। কাজ ও টাকা, টাকা ও কাজ। কাজ না হইলে টাকা হইবে না। টাকা না হইলে কাজ হইবে না। রীতিমত একটা পাল্লা চলিতেছে, কে কাকে পরাজয় করিতে পারে। টাকা ছাড়া যেন আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। এই যন্ত্র চালাইতে লোকবল চাই। লোকবলের অভাব আদৌ নাই। কার্ত্তিক মাসে যেমন পোকাগুলা আলোতে ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়া জীবন সার্থক করে, আমেরিকার শ্রমিকদের জীবন কতকটা সেই রকম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর তারা এই ডলার তৈয়ারীর যন্ত্র চালাইয়া তাদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সার্থক করিতেছে। সে দিন একটী জুতায় কালী দেওয়ার দোকানে বসিয়া যখন আমার জুতা বুরুশ করাইতেছিলাম তখন এটা যেন আমার খুব বেশী রকম মনে পড়িয়া গেল। লোকটীর দোকান সাম্নের ঘরে—পিছনের ঘরে স্ত্রী ও একটী ছেলে সহ সে বাস করে। কথায় কথায় শুনিলাম তার বাড়ী ইটালিতে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে সেই অপূর্ব্ব পদার্থ "ডলারের" সন্ধানে এ দেশে আসে। শেষে এ দেশে বিবাহাদি করিয়াছে, ডলার উপায় মন্দ করে নাই। কিন্তু বিশেষ কিছুই জমাইতে পারে নাই। এদেশটী কেমন লাগে

জিজ্ঞাসা করায় তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল "Oh dont ask me that, it is hell" অর্থাৎ "ওকথা জিজ্ঞাসা ক'রোনা—এ নরক বিশেষ"। ছোটলোকে ইংরাজী শিখিতে প্রথম খারাপ কথাগুলিই শেখে। তার কথার মর্ম্ম এই যে এ দেশে টাকা উপায়ের পথ অনেক বটে কিন্তু বাঁচাইতে পারা এক রকম অসম্ভব। তা ছাড়া এ দেশে জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য এক রকম নাই বলিলেও চলে। এ শ্রেণীর শ্রমিকদের সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ডলারভক্ত আমেরিকান সকলেই যে সাধারণের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাদের "ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ"-রূপ ডলার উপায় করিতেছেন আমি তাহা বলিতে চাহিনা। এ কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল। অনেকে সীমায় পৌছিবার পূর্ব্বে—অনেকে পৌঁছিয়া—এবং অনেকে তার পরে বুঝিতে পারেন যে জীবনের উদ্দেশ্য আরও কিছু থাকিতে পারে ও আছে। যখন তাঁহারা এটা ভাল রকম বুঝিতে পারেন তখন তাঁহারা এই দেশের এবং অনেক সময় সমস্ত দেশের মনুষ্য সমাজের উপকারের জন্য প্রাণ খুলিয়া দান করেন। এ রকম উদাহরণ এ দেশে অনেক পাওয়া যায়। দাতকির্ণ কার্ণেগীর দান বোধ হয় সকলেই জানেন। তারপরেও অনেকে সে রকম বা তার চেয়ে কমবেশী দান করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একটী নূতন রকমের দান এ দেশে হইয়া গিয়াছে, আমি এখানে সেইটীরই উল্লেখ করিব। ইঁহার নাম পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই লোকে জানেন, (দাতা হিসাবে নয়, ব্যবসায়ী হিসাবে)। বিশেষতঃ যাহারা ফটোগ্রাফী করেন তাঁহারা ইঁহার নাম শুধু নয় ইঁহার প্রস্তুত কোডাক্ ক্যামেরার (Kodak Camera) কথাও জানেন। আমি যাঁহার কথা বলিতে চাই তার নাম শ্রী জর্জ ইষ্টম্যান (Mr George Eastman). ইনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য এ যাবৎ ৫৮,০০০,০০০ ডলার (১ ডলার সাধারণতঃ ৩৶০) দান করিয়াছেন। দানের নূতনত্ব এই যে ইহার আংশিক টাকা ২,০০০,০০০ ডলার শুধু আমেরিকার নিগ্রোদের শিক্ষার জন্য নিগ্রো চালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছেন। এ যাবৎ যত দাতা শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন তাঁহারা হয় শাদাদের জন্য অথবা সাধারণের জন্য দিয়া গিয়াছেন, কেহ নিগ্রোদের জন্য বিশেষ কিছু দিয়া যান নাই। এ দেশের "জাতি ভেদের" জন্য হতভাগ্য নিগ্রোরা তাই এ সব দানের সুযোগ হইতে একরূপ বঞ্চিত হইয়াছে। ইস্ট্ম্যান ভাবিলেন নিগ্রোদের শিক্ষা ব্যতীত দেশের কাজ হইতে পারিবে না। নিগ্রোদের ত্যাগ করা সম্ভব নয়—(সম্ভব হইলে হয়ত বা তাহা করিতেন) তাই তাহাদিগকে যথাসম্ভব মানুষ করা—অর্থাৎ সমাজের উপযুক্ত করার চেষ্টা সময়োচিত।

ডলারের কথা বলিতে বসিয়া নিগ্রোদের কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সময়োপযোগী বলিয়া উল্লেখ করিলাম। শুধু সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ দেশে যেমন এরা কার্য্যক্ষম ও ডলার ভক্ত, আমাদের দেশে তেমন আমরা প্রথমটীর উল্টা এবং দ্বিতীয়টীর বেলায় অক্ষম বলিয়া দর্শনের দোহাই দিই। ইষ্ট্ম্যানের জীবনের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিয়া আমি আমার দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতে চাই। কথায় কথায় আমরা শ্লোক আওড়াই

—তা আবার সংস্কৃত বা ইংরাজী অথবা ফরাসী ভাষায়,—বাংলা কদাচিৎ—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধে কৃষি কর্ম্মণি ইত্যাদি কিন্তু কাজের বেলায় চাকুরীং চাকুরীং সর্ব্বং—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষং (আমার নিজ রচিত, তাই ভ্রম মার্জ্জনীয়)।

জর্জ ইষ্ট্‌ম্যানের বর্ত্তমান বয়স ৭০ বৎসর। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁর বাবা মারা যান। দরিদ্র মায়ের কাছে দরিদ্রভাবে লালিত পালিত হইয়া ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাধারণ হাইস্কুলে শিক্ষা করেন। অভাবের জন্য এই সময়ে তাঁহাকে চাকরী লইতে হয়। তখনকার দিনে ডলারের প্রভাব ও প্রাচুর্য্য এত বেশী ছিল না। তাই তখন সাপ্তাহিক ৩ ডলার বেতনে একটা আপিসের (office boy) চাকর নিযুক্ত হন। মা ও ছেলে উভয়েই বড় মিতব্যয়ী, তাই প্রথম বৎসরের বেতন হইতে জর্জ ৩৭১/২ ডলার বাঁচাইতে সক্ষম হন। এইরূপ মিতব্যয়িতার সহিত থাকিয়া জর্জের ২৫ বৎসর বয়সের সময় ২৫০০ ডলার জমে। এই জমান টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে জর্জের মা তাঁহাকে পরামর্শ দেন। তখনকার দিনে ক্যামেরা ও চশমা ইত্যাদি জার্ম্মাণীই সমস্ত পৃথিবীকে সরবরাহ করিত। জর্জের মাথায় ঢুকিল যে কেন সে আমেরিকার বাজার দখল করিতে পারিবে না। তবে সামান্য পুঁজিতে অতবড় কারবার করা সহজ নয়। নিজের মিতব্যয়িতা তাঁহাকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছে। প্রথম ছোট রকমে নিজে একটী স্বাধীন দোকান দিয়া পরে ক্রমোন্নতি করিয়া এই বিরাট ব্যবসায় করিয়াছেন। এমন সময় অনেক বার আসিয়াছে যখন জর্জের কারবার শেষ হইবার মত হইয়াছে, কিন্তু নিজের ধৈর্য্য ও শান্ত বুদ্ধিতে জর্জ সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, আর আজ বহু লক্ষপতি হইয়া বসিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একদল আমেরিকান ডলার উপায় করিয়া লক্ষপতি বা কোটীপতি হইয়া মরিয়া যান। জীবনের উদ্দেশ্য তাঁদের ডলার উপায় ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ থাকে না। কিন্তু জর্জ ইষ্ট্‌ম্যানের জীবন তার চেয়ে অন্য রকম। অনেক কষ্টে ডলার উপায় করিয়া এখন দেশের ও দশের উপকারের জন্য তাহা ব্যয় করিতেছেন। তার দানের একটা বিশেষত্ব এই যে তিনি এ দেশে যে গুলির অনুশীলনের অভাব বোধ করিয়াছেন তাহার জন্য দান করিয়াছেন। দানের সর্ব্বপ্রধান দ্বিতীয় অংশ পাইয়াছে সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন জন্য।

ইষ্ট্‌ম্যানের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানকার কাগজে বাহির হইয়াছে। একজন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা লিখিয়াছেন। ইষ্ট্‌ম্যান মাকে বড় ভালবাসিতেন—তাই তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য কখনও বিবাহ করেন নাই। আমাদের দেশে এ রকম কথা খুবই আশ্চর্য্য বোধ হইবে, তবে কারণ এ দেশের মত নয়। বিবাহের পর এ দেশে সাধারণতঃ ছেলে সংসার হইতে পৃথক হইয়া যায়। মা বাবার সঙ্গে থাকে না। অনেক সময় ছেলের শাশুড়ী অর্থাৎ স্ত্রীর মা আসিয়া গৃহিণী হন। আমাদের দেশের ঠিক উল্টা। যা হোক ইষ্ট্‌ম্যান মায়ের জন্য বিবাহ করেন নাই এইরূপ প্রবাদ, মায়ের মৃত্যুর পর আর বিবাহের ইচ্ছা হয় নাই। বয়স তখন ৫৩। তাই সঙ্গীতের

দিকে ইঁহার বিশেষ আগ্রহ এই সময়ে দেখা যায়। ধীর, শাস্ত, স্থিরবুদ্ধি এবং অনেকের মতে বরং একটু লাজুক এই জর্জ ইষ্ট্‌ম্যান নিজের বুদ্ধি বলে ব্যবসায়ে লক্ষপতি হইয়া আজ জগতের হিতে দান করিতেছেন, ইনি ডলার যেমন উপায় করিয়াছেন তেমনি তাহার সদ্ব্যয় করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে হয়ত আরও করিবেন।

অপর দলের একটী উদাহরণ দিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। এ দলের লোক ডলার উপায় করিতে খুব জানে কিন্তু ব্যয়ের ভাগ বড় কম। এ রকম উদাহরণ এ দেশ হইতে অনেক দেওয়া যায়, এখানে একটী মাত্র দিব। ইঁহারও শৈশব অনেকটা জর্জ ইষ্ট্‌ম্যানের মত। ইঁহার নাম এ দেশে সকলেই জানে, বিদেশে তত বেশী নয়। ইঁহার নাম জন্‌ ওয়ানামেকার (John Wanamaker). ইঁহার বাবা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ইঁট্ তৈয়ারী করিয়া কোনও রকমে জীবন যাপন করিতেন। ১৮৩৮ সালে জনের জন্ম হয়। ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া সংসারের সাহায্য করিবার জন্য একটী বইএর দোকানে চাকর (Errand Boy) নিযুক্ত হন। ৪ বৎসর পরে একটী কাটা কাপড়ের দোকানে কেরাণীর (Clerk) কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে একদিন জন্‌ তার মাকে উপহার দেওয়ার জন্য একটী দোকানে কিছু জিনিষ কিনিতে যান। তখনকার দিনে এ দেশে জিনিষের দাম লেখা থাকিত না। যে যতদূর পারিত দরাদরি করিয়া হারিত বা জিতিত। জন্‌ যে জিনিষটী কিনিয়াছিল তাহা যখন লোকটী বাঁধিতেছিল তখন সে অপর একটী জিনিষ দেখিয়া প্রথমটীর পরিবর্ত্তে ঐটী চাহিল। কিন্তু যদিও এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিলে দোকানের কোনও ক্ষতি হইত না—তবুও তখনকার দিনে ঐটুকু করিতেও দোকানদার চাহিত নাই। সেইদিন জন্‌ প্রতিজ্ঞা করিল যে সে তার জীবনে একটী দোকান দিবেই এবং তার দোকানে দরাদরি চলিবে না—সমস্ত জিনিষের দাম উপরে লেখা থাকিবে—এবং যে কেহ যখন ইচ্ছা অব্যবহার্য্য জিনিষ বদল করিতে পারিবে, শুধু বদল নয়, পছন্দ না হইলে জিনিষ ফেরৎ দিলে মূল্য ফেরৎ পাইবে। জন্‌ ওয়ানামেকার তার প্রতিজ্ঞা জীবনে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। শুধু ঐটুকু নয়, দোকানের যত রকম উন্নতি করা সম্ভব তাহা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ক্রম-সঞ্চিত ডলার আস্তে আস্তে একটী বড় দোকানের শেয়ার কিনিবার সুযোগ দেয়—পরে নিজের বুদ্ধিবলে তিনি সমস্ত দোকানের মালিক হন। আজ তাঁর নামে যে দোকান এদেশে ও বিলাতে আছে তাহা শুধু এদেশের বড় নয়, পৃথিবীর মধ্যে সকল বড় দোকানগুলির একটী বলিয়া খ্যাত; বর্ত্তমানে এ দেশে এই শ্রেণীর দোকানগুলি ৫ হইতে ১০ বা ১২ তলা প্রকাণ্ড বাড়ীতে অধিষ্ঠিত। দোকানে না পাওয়া যায় এমন জিনিষ নাই। ছুঁচ থেকে সোনা সবই, সব জিনিষেরই দাম গায়ে লেখা থাকে। জিনিষ কিনিয়া কোনও কারণে অপছন্দ হইলে যখন ইচ্ছা ফেরৎ দেওয়া চলে। কোনও কারণ দেখাইতে হয় না—বা অন্য জিনিষ কিনিতে হয় না। সহরের ২৫।৩০ মাইল দূর পর্য্যন্ত যায়গায় জিনিষ বিনা খরচে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যাঁহারা দোকানে কোনও জিনিষ কিনিতে যান, তাঁহারা সেখানে খাওয়া

দাওয়া করিয়া বিরাম বিশ্রাম করিয়া, স্বচ্ছন্দে সময় কাটাইয়া যাইতে পারেন। পত্র লিখিবার যায়গা ও কাগজ কলম সমস্ত বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। দোকানের ব্যাঙ্ক আছে, ইচ্ছা করিলে (account) একাউণ্ট্ খোলা যায়, তাহা হইতে জিনিষ পত্র কেনা চলে। মাঝে মাঝে দোকানে বক্তৃতা দেওয়ান হয় এবং কখনও কখনও বায়স্কোপ বিনামূল্যে দেখান হয়। এক কথায় যত কিছু সুখসাচ্ছন্দ্য চিন্তা করা যায়, এখানে তাহার কোনওটী বাদ নাই। দোকানে কর্ম্মচারীদের ক্লাব, দৈনিক সংবাদপত্র, নানা রকম খেলার দল ইত্যাদি এবং বর্ত্তমান রেডিও ষ্টেশন (তারহীন যন্ত্র (Radio)) এ সমস্তই আছে। কর্ম্মচারীও কম নাই। এ রকম শ্রেণীর দোকানে সাধারণতঃ ৫ হইতে ৭ হাজার স্ত্রী পুরুষ দৈনিক কাজ করে। (X'mas) বড় দিনের সময় ইহাতে আরও ২।৩ হাজার বেশী লোক লওয়া হয়।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা দেখানর জন্য দোকান সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম। জন ওয়ানামেকার এই ব্যবসায় হইতে বহু লক্ষপতি হইয়া গত বৎসর প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য "ডলার" উপায় করা পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ একটী দিক ছাড়া আর কিছু তাঁর অর্থে সাধিত হয় নাই। আমি ওয়ানামেকারের দোষ দেখানর জন্য এ প্রবন্ধ লিখি নাই, বরং উল্টা। ওয়ানামেকারের ব্যবসায়ে অন্য রকমে বহু সহস্র স্ত্রী পুরুষ উপকৃত হইয়াছে এখনও হইতেছে। তাঁহার ব্যবসায় না থাকিলে প্রায় ২০ হাজারের উপর স্ত্রী পুরুষের জীবিকা উপার্জ্জনের অন্য ব্যবস্থা করিতে হইত। আমাদের দেশের লোক ওয়ানামেকারের ব্যবসায় বুদ্ধি থেকে অনেক ব্যবসায় বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। আমি যখন ইষ্ট্‌ম্যান ও ওয়ানামেকারকে এক সঙ্গে চিন্তা করি তখন আমেরিকার ডলার মাহাত্ম্যের দুই রকম চিত্র দেখি। উভয়েই আমেরিকার এবং সেই সঙ্গে আংশিক জগতের উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তবু যেন মনে হয় ইহাই মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। দর্শনশাস্ত্রের কথা বলিতেছিনা, তবু মনে যেন একটু ধাঁধা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে এ দেশের কাছে অনেক শিখিতে পারে—কিন্তু অন্ধভাবে সবটুকু নকল করিতে বলি না ও বাঞ্ছনীয় নয়। দুইয়ের মাঝামাঝি একটা কিছু উপায় নাই কি?

শ্রীশরৎ মুখোপাধ্যায়

একতা

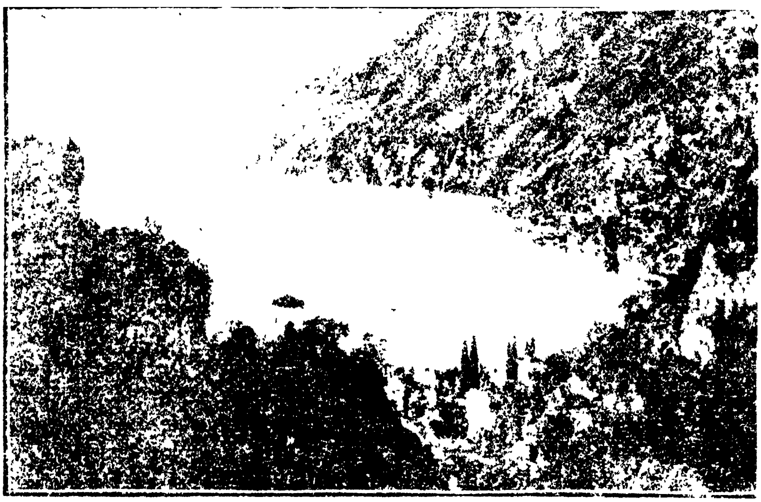
কাঞ্চির হাতল দুটি বলে—'ওগো খিল্
নিষ্ফল জীবন লয়ে কি কাজে এখানে'?
খিল্ বলে—'তীক্ষ্ণধারে কি কর্ম্ম সাধিবে
বান্ধি নাহি রাখি যদি একতা-বন্ধনে'?

শ্রীশিবরতন মিত্র

উত্তর ইতালি

(১)

নীল আকাশে গা ধুইয়া সবুজ পাহাড়গুলা লুগানো হ্রদের স্বচ্ছ জলে ডিগ্‌বাজি খাইতেছে। ষ্টীমার হইতে যেদিকে তাকাই সেই দিকেই চঁছা-ছোলা তক্‌তকে সুইস পল্লীর মনোরম দৃশ্য দেখিতেছি। গাছ গাছড়ার প্রভাব খুবই কম। বসন্তের মাঝামাঝি, গ্রীষ্ম আসিতেছে। কিন্তু দক্ষিণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আল্পস তরু-সম্পদে দরিদ্র।



লুগানো হ্রদের এক টুক্‌রা

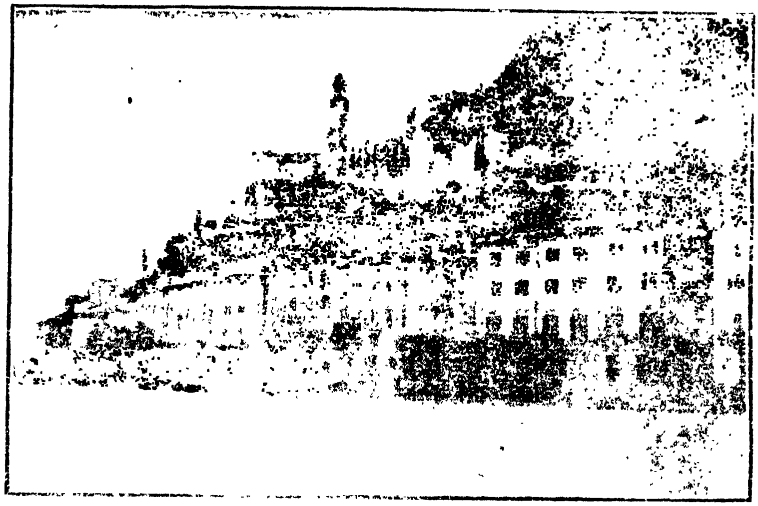
সুইস সহযাত্রীরা সপরিবারে পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চাখিতে বাহির হইয়াছে। দুই চার মিনিট পরে পরেই এক একটা গাঁয়ে ষ্টীমার ধরিতেছে। লোকজনের উঠা-নামা মন্দ নয়। সুইস নর-নারীরা তাহাদের দেশের মাটিকে যার পর নাই ভালবাসে। প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক পাথরের টুকরা ইহাদের নিকট অতিপ্রিয়। এই কারণেই বোধ হয় আবার সুইসরা বিদেশের ধার খুবই কম ধারে।

বিদেশ ভ্রমণে পয়সা খরচ করিতে যাওয়া সুইসদের চিন্তায় অনেকটা অমার্জ্জনীয় বিবেচিত হয়। সুইটসার্ল্যাণ্ডের হ্রদ পাহাড় "তাল" উপবন ইত্যাদি ছাড়িয়া বাহিরে সৌন্দর্য্য ঢুঁড়িতে গেলে সুইস নর-নারীর এক প্রকার যেন জাতই মারা যায়। ফলতঃ অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের তুলনায় সুইসরা বোধ হয় কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণচেতা। অবশ্য কড়ায়-ক্রান্তিতে হিসাব করিয়া মন্তব্যটা ঝাড়িতেছি না।

(২)

ইতালীয় সুইস পল্লীগুলা জার্ম্মাণসুইস-পল্লী হইতে বাহ্য সৌষ্ঠব হিসাবে বিভিন্ন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় দুয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ। একথা অনেকবার শুনিয়াছি। কিন্তু ষ্টীমার হইতে

মোর্কোতে পল্লীর গড়ন অপূর্ব্ব দেখাইতেছে। একটা পাহাড়ের কোণা জলের সীমানা হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ঘরবাড়ীতে গাঁথা। মাথার উপরে গির্জ্জা ও কেওরাতলা। দেখিবার জন্য দলে দলে লোক নামিয়া গেল।



মোর্কোতে পল্লী

পাহাড়ের গায়ে সারি সারি আঙুরের ক্ষেত। রহিয়াছিল। চাবাগুলি শীতে মরিয়া বসন্তের ডাকে সবুজ পাতা গজাইতে সুরু করিয়াছে। মাচাঙগুলা ক্রমে ভরিয়া আসিতেছে।

পোর্তো চেরেজিও পল্লীতে ষ্টীমার আসিয়া ঠেকিল। এইখানে সুইটসার্ল্যাণ্ড ও ইতালির সীমানা। রেলওয়ে ষ্টেশন ইতালির জমিনের উপর। আজকাল পাসপোর্টের হাঙ্গামা এক প্রকার নাই। তবে দেখানো চাই: ষ্টীমারের ভিতরেই কাষ্টম আফিসের বাবুরা "নমো নমো" করিয়া মাল পাশ করিয়া দিয়াছে।



মোর্কোতের কেওরাতলা

(৩)

টিকেট কিনিতে গিয়া দেখি মেসাফিরেরা যে আগে হাত বাড়াইতে পারে সেই আগে টিকেট পায়। অথবা অনেক পশ্চাতে দাঁড়াইয়াও একমাত্র গলার জোরেই কোনো কোনো যাত্রী টিকেট আদায় করিয়া লইতেছে।

পশ্চিমা মুল্লুকে এই এক নূতন দৃশ্য। সুইটসার্ল্যাণ্ডে, জার্ম্মানিতে, আমেরিকায় লোকেরা

লাইন বাঁধিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শৃঙ্খলা ভাঙিয়া অপরের ঘাড়ে চড়িয়া হাত বাড়াইয়া টিকেট আদায় করিবার রেওয়াজ কোথায়ও দেখি নাই। ভারতবর্ষে অবশ্য এই দৃশ্য সুপরিচিত। ইতালিতে পদার্পণ করিবামাত্র সেই ভারতপ্রসিদ্ধ হুড়াহুড়ির চিত্রই কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম।

তুঁতগাছের আবাদ দেখিতেছি রেল-পথের দুই ধারে। পাহাড়ী অঞ্চল। পার্ব্বত্য পল্লীগুলা অদূরে ইতালিয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জেরই চালাইতেছে। একজন সহযাত্রী বলিতেছেনঃ—“পল্লীগুলা ইতালিয়ানদের স্বাস্থ্য জনপদ। আর মাসখানেকের ভিতর গ্রীষ্মের শফর সুরু হইলে এই সকল অঞ্চল সহুরে বাবুদের জীবনকেন্দ্রে পরিণত হইবে।”



মোর্কোতের এক দৃশ্য

(৪)

কোনো কোনো ষ্টেসনের নিকট দু-একটা ফ্যাক্টরি দেখিতেছি। কোথাও কোথাও নবীন নগরের নবীন বাড়ীঘর মাথা তুলিতেছে। মরা পুরাণা বাসি মাল লইয়াই ইতালিয়ানরা সন্তুষ্ট নয় বুঝা যাইতেছে। ঠাঁইয়ে ঠাঁইয়ে পল্লীপোষাকে সাজিয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা চলাফেরা করিতেছে।

একটা বড় গোছের শহর পথে পড়িল। নাম ভারেজে। কিছু কিছু শিল্প-কারখানার প্রভাব পাইতেছি। ইতালিয়ান সমাজে ভারেজে হ্রদ আর ভারেজে নগর বেশ

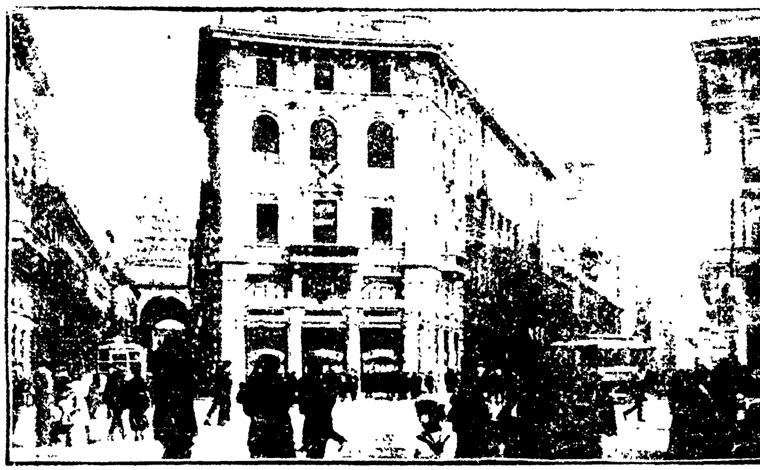


সেনাপতি গারিবাল্‌দি

প্রসিদ্ধ। গ্রীষ্ম-কেন্দ্ররূপেই উত্তর ইতালির লোকেরা এই অঞ্চলের তারিফ করিয়া থাকে। রেল হইতে হ্রদটা এবং পাহাড়ী ঘরবাড়ীগুলা ছবির মতনই দেখাইল। এই অঞ্চলের আল্পস পাহাড়েই গারিবাল্‌দির "শিকারীর দল" উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য হাত পোক্ত করিত।

বিদ্যুতের জোরে গাড়ী চলিতেছে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ার অনেক রেল পথেই আজ কাল বিদ্যুৎ কায়েম হইয়া থাকে। ধীরে ধীরে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই বিদ্যুতের যুগ আসিতেছে। সম্প্রতি চলিতেছে কয়লার বিরুদ্ধে বিদ্যুতের বিদ্রোহ।

হ্বারেজের অল্প পর হইতে জমিন একদম সমতল। পঞ্চনদ অথবা গঙ্গা যমুনা ধৌত উত্তর ভারত যেরূপ, আল্প্‌সের পদতলে উত্তর ইতালিও সেইরূপ। প্রায় দুই ঘণ্টার রেল যাত্রায় মিলানে পৌঁছিলাম। আশেপাশে ফ্যাক্টরির রাজত্ব।



মিলানোর এক দৃশ্য

(৫)

ষ্টেশনটা খুব বড় বটে, কিন্তু যার পর নাই নোংড়া। ঘরগুলা বহু দিনের পুরাণা। এক মিনিটও প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। দেওয়াল ও মেজে অপরিষ্কার।



মিলানো সহরের এক দৃশ্য।

বাহিরে আসিয়া দেখি বিপুল শহরের আয়োজন। সম্মুখেই গোলাকার বিরাট তরুবীথি। লাল অটোমোবিলের সারি এক দিকে, আর ট্রামগাড়ীর আড্ডা অপর দিকে।

মুটে, কেরাণী, টিকেটবাবু কেহই ফরাসীও বলে না জার্ম্মাণিও বলে না। মাল-ঘরে মোট জমা রা'খিয়া রাস্তায় হাজির হওয়া গেল। "কোরিয়েরে দেল্লা সেরা" নামক দৈনিক এক কপি খরিদ করিলাম। এক অক্ষরও বুঝিলাম না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। তবে ফরাসী বা জার্ম্মাণ শব্দের গা ঘেঁশা শব্দ ইতালিয়ানে যে কয়টা হামেশা কায়েম হইয়া থাকে তাহার জোরে কোনো রচনা বুঝা সম্ভব নয়। বুঝিলাম, ইতালিয়ান ভাষা নতুন করিয়া না শিখিলে চলিবে না।

তরুবীথির দুই ধারে বড় বড় হোটেল। বাজার দর যাচাই করিবার জন্য দু'একটায় ঢুঁ মারিয়া দেখিলাম। বলাই বাহুল্য অত টাকার জোর আমার ট্যাকে নাই। তবে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বড় বড় হোটেলের নিকটবর্ত্তী হোটেলগুলা কিছু শস্তা।

(৬)

অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। রাস্তাগুলা পাথরে বাঁধানো। দুই ধারে বাড়ীগুলাকে প্রাসাদ বলাই উচিত। নানা মহাল্লায় ঘুরাফিরা করিতে করিতে ভাবিতেছি, মিলান প্রাসাদপুরী সন্দেহ নাই। রেলওয়ে ষ্টেশনের ভিতরটা এই সহরের কলঙ্কবিশেষ।

বাস্তুরীতি আগাগোড়া "রেণেসাঁস"। স্তম্ভের শ্রেণী, খিলানের সারি আর জানালার শৃঙ্খলা দেখিলেই পুলকিত হইতে হয়। প্যারিসের দৃশ্য মনে পড়ে।

বসত বাড়ীগুলা সাধারণতঃ দোতলা বা তেতালা। প্যারিস বার্লিন ইত্যাদি শহরে পাঁচ ছয় তলার রেওয়াজ। নিউইয়র্কের বিশ পঁচিশ পঁয়ত্রিশ তলওয়ালা বাড়ী গুণ্‌তিতে বেশী নয়। পাঁচ ছয় তলা বাড়ীই সেখানে সার্ব্বজনিক। মিলানে ভারতীয় মাপকাঠিই দেখিতেছি।

বস্তুতঃ মিলানের রেণেসাঁস গড়নও ভারতে নতুন কিছু নয় আমাদের দেশে আজ-কাল যে-সব দালানবাড়ী দেখা যায় তাহার অধিকাংশই "রেণেসাঁসের" মাসতুত ভাই। বর্ত্তমান ভারত বর্ত্তমান ইয়োরোপেরই অধিক জের বা উপনিবেশ মাত্র।

(৭)

এক "পাংসিওনে" ডেরা লইয়াছি। বাড়ীওয়ালী ইতালিয়ান। ফরাসীতে কথা বলার অভ্যাস আছে। বাড়ীতে অতিথি পনর ষোল জন। কেহ মার্কিণ, কেহ জার্ম্মাণ, কেহ ইংরেজ, আর কয়েকজন ইতালিয়ান।

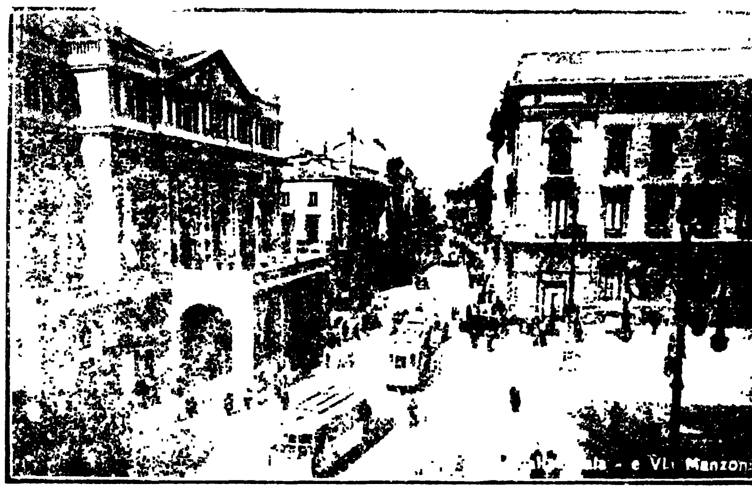
"ওলিহ্ব্" ফলের তেল দিয়া ইতালিতে রান্নাবাড়া করা হয়। ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশে এতদিন হয় মাখন না হয় চর্ব্বির রান্না উদরসাৎ করিয়াছি। এইবার ভারত-পরিচিত তেলের রান্নায় মুখ বদলাইতে সুরু করা গেল। ওলিহ্ব্ আমাদের জলপাই জাতীয় ফল।

ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, আমেরিকায়,—বস্তুতঃ পাশ্চাত্য মুল্লুকের সকল দেশেই ওলিহ্ব্

তেলের আদর আছে। "সালাড্" নামক শব্জীর পাতা এই তেলে মাখাইয়া কাঁচা খাওয়া হইয়া থাকে। সালাড্ বাঁধা কপির পাতার মতন দেখায়।

"রিজোত্তো" নামক ভাত ইতালিয়ানদের এক সার্ব্বজনিক খাদ্য। ঘি-হীন মাংস-হীন পোলাও যে বস্তু, রিজোত্তো তাই। খাইতে লাগে মন্দ নয়।

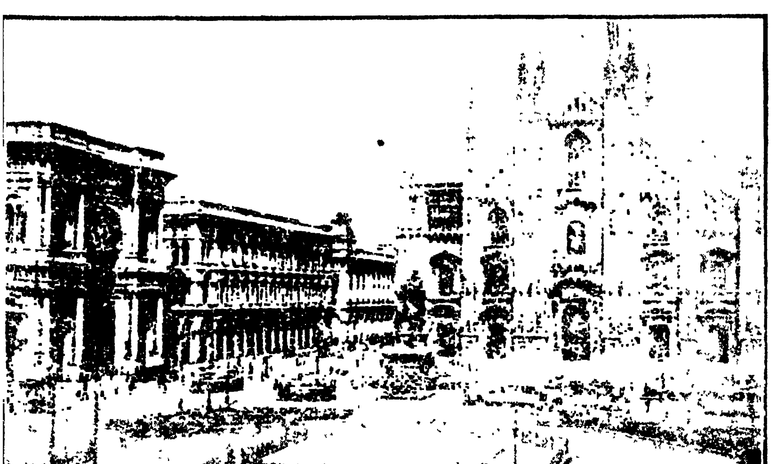
মার্কিণ সহভোজিনী বলিতেছেন:—"আর কিছু দিন আগে মিলানে আসা উচিত ছিল। তাহা হইলে স্কালা থিয়েটারে 'নেরোণে' পালার অভিনয় দেখিতে পাইতেন। এই অপেরায় আট শ নরনারীকে ভূমিকা লইতে হয়। সঙ্গীত-মুল্লুকে একটা যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। থিয়েটারে বসিবার জন্য লোকেরা অসম্ভব রকমের আড়াআড়ি করিয়াছে। সবসে চড়া টিকেটের দাম অবশ্য ছিল মাত্র ১৫০৲। কিন্তু অনেকে এক হাজার টাকা খরচ করিয়াও সীট্ সংগ্রহ করিয়াছিল।"



স্কালা থিয়েটার

(৮)

শহরের কোথায়ও পুরাণা ঘরবাড়ী দেখিতেছিনা। ভাঙ্গাচূরার চিহ্ন অথবা 'প'ড়ো বাড়ী' বলিলে যাহা কিছু বুঝায় মিলানে তাহা মিলে না। সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্য, ধনদৌলত আর নবীন তেজ। নতুন নতুন সড়ক তৈয়ারি হইতেছে। বড় বড় অট্টালিকাও অনেক অনেক মাথা তুলিতেছে।


পিয়াৎসা দুয়ামো

"দুয়োমো পিয়াৎসা"র মতন চৌরাস্তা জগতে বিরল। "পিয়াৎসা" ফরাসী

প্লাস্‌, জার্ম্মাণ প্লাট্‌স্‌ আর ইংরেজি প্লেস্‌ ইত্যাদির প্রতিশব্দ। ডুয়োমো শব্দে জার্ম্মাণ ডোম বা ইংরেজী ক্যাথিড্রাল অর্থাৎ গির্জ্জা বুঝিতে হইবে। মিলানের এই ডুয়োমো ইয়োরোপের এক তাজমহল।

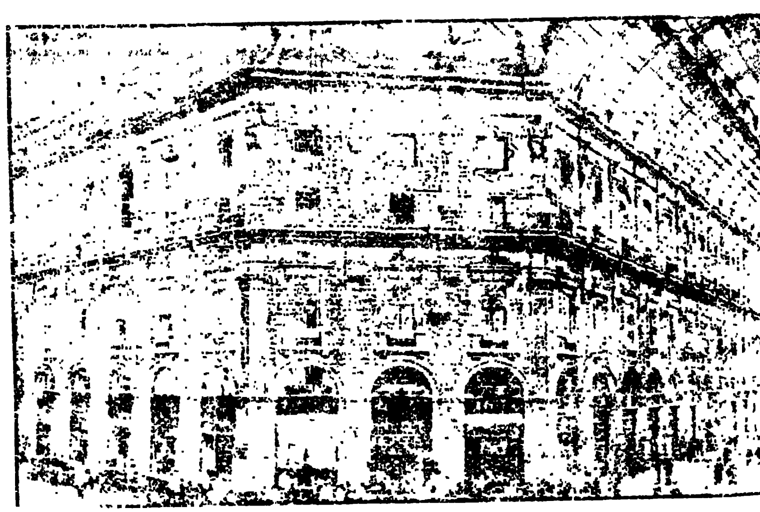


ডুয়ামোর পার্শ্ববর্ত্তী সৌধশ্রেণী

পিয়াৎসার মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে হ্বিক্তর এমানুয়েল। এই রাজার আমলেই ফ্রান্সের সাহায্যে ইতালিয়ানরা স্বদেশের স্বাধীনতা ও ঐক্য লাভ করে। পিতলের মূর্ত্তি জাঁদরেল বটে।

চৌরাস্তার উপরকার সৌধসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ। সবই দোকান ঘর। পাশে দুইটা রাজপ্রাসাদ। এই সকল অট্টালিকায় রেণেসাঁসের ছড়াছড়ি। কিন্তু গির্জ্জাটা স্বয়ং "গথিক" রীতির বাস্তু।

বাঁদিকের এক অট্টালিকায় বর্ত্তমান-জগৎসুলভ বিপুল বাজার। ইয়াঙ্কি স্থানে এই ধরণের বাজারকে "ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর" বলে। মানুষের যা-কিছু কাজে লাগে সবই এই দোকানে পাওয়া যায়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি প্যারিসের "লাফায়েৎ গ্যালারি", বার্লিনের হাইম" ইত্যাদির সঙ্গে মিলানের "রিণাসেন্ত্‌" দোকান, বাজার বা হাট টক্কর দিতে সমর্থ।



"গালারি"র এক দৃশ্য

এ-বিভাগ ও-বিভাগ ঘুরিয়া দরদস্তুর করা গেল। কিনিবার কোনো দরকার নাই। কাজেই দোকানের সর্ব্বোচ্চ

তলের এক অংশে চা খাওয়ার আড্ডায় আসিয়া বসা গেল। বসিয়া বসিয়া মার্ব্বেল পাথরের গির্জ্জাটার উপরের অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি।

রিণাসেন্স্ কোম্পানী কন্সার্টের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। চা খাইতে খাইতে বিনা পয়সায় নং ১ শ্রেণীর সঙ্গীত-গুরুদের তৈয়ারী ভাল ভাল গৎ শুনা গেল।

এই পাড়ার এক দর্শনযোগ্য চিজ্ ভিক্টর এমানুয়েল গালারি। ইংরেজিতে "আর্কেড" বলিলে যে ধরণের শড়ক বুঝা যায় এই "গালারি" সেই বস্তু। অত্যুচ্চ খিলানে ঢাকা রাস্তা ক্রসের আকারে গড়া হইয়াছে। অষ্টভুজ গম্বুজ কারুকার্য্যপূর্ণ। রাস্তার উপর "কাফে"-সমূহের টেবিল চেয়ার আর অগণিত নরনারী। রাত্রিকালেই গালারিটা জাঁকিয়া উঠে।

(৯)

শ্রীমতী তেরেসা আঞ্জেলোনি কোপ্পোলা একজন নামজাদা গায়িকা। ইঁহার দুই ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইঁহাদের নিমন্ত্রণে কোপ্পোলার বাড়ীতে যাওয়া গেল। মিলানের বহু গায়ক-গায়িকা কোপ্পোলার শাগ্রেতি করিয়াছে। অনেক প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর গুরুরূপে কোপ্পোলার ইজ্জৎ আছে।



অপেরা-গায়িকা কোপ্পোলা

কোপ্পোলার নিকট আজকাল প্রতিদিনই কয়েকজন দেশী বিদেশী লোক নিয়মিতরূপে গান বাজনা শিখিতে আসে। কোপ্পোলার বাড়ী বাস্তবিক পক্ষে একটা বে-সরকারী সঙ্গীত-বিদ্যালয়।

ছাত্রীরা গলা সাধার পরীক্ষা দিলেন। কোপ্পোলা পিয়ানো বাজাইয়া গেলেন। তাহার পর একজনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে অপরজন গাহিতে লাগিল। কোপ্পোলা অতি ধীরে ধীরে হাত নাড়িয়া বা আঙ্গুল চালাইয়া গৎ ও সুর শুধরাইয়া দিতে থাকিলেন। সামান্য-মাত্র অঙ্গভঙ্গীতেই বুঝা গেল,—সঙ্গীত কলা ইঁহার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।

(১০)

কোপ্পোলার স্বামীও ছিলেন গায়ক। দুয়ে এক সঙ্গে মিলানের "স্কালা" অপেরায় ইঁহারা ভূমিকা লইয়াছেন। "সোপ্রানো" বা উচ্চতম নারী-কণ্ঠের আওয়াজে শ্রীমতী কোপ্পোলা হেবনিস

নগরে জীবন সুরু করেন। পরে স্পেনের বার্সেলোনায়, পোল্যাণ্ডের হ্বার্সাওয়ে, এবং রুশিয়ার পেট্রোগ্র্যাডে বিদেশী সঙ্গীত-প্রেমিকেরা ইঁহার গান শুনিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ইতালির ছোট বড় মাঝারি সকল শহরেই ইঁহার ডাক পড়িয়াছে।



আঈদো সাজে কোপ্‌পোলা

অপেরায় গান করিতে হইলে একসঙ্গে দুই শিল্পে দখল থাকা চাই। প্রথমতঃ কণ্ঠসঙ্গীত, দ্বিতীয়তঃ অভিনয়-কলা। কেননা, একটা নাটক আগাগোড়া গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করাই অপেরা রচনার কায়দা। অপেরায় নট-নটীদের প্রত্যেক কথোপকথনই গান। অপেরা ঠিক আমাদের "যাত্রা" নয়। অভিনয়শিল্পে ওস্তাদ না হইলে কোনো গায়ক বা গায়িকাকে অপেরার ভূমিকা দেওয়া হয় না।

কোপ্পোলা ইতালির সর্ব্বপ্রসিদ্ধ অপেরাগুলায়ও প্রধানা নারীর ভূমিকা পাইতেন। হ্ব্যার্দি নামক সঙ্গীতগুরু বর্ত্তমান ইতালির অপেরা-শিল্পে অদ্বিতীয়। ইঁহাকে ইয়োরোপীয় সমজদারেরা, জার্ম্মাণ হ্বাগ্নারের জুড়িদারই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। হ্ব্যার্দি-প্রণীত "আঈডা" আজকালকার এক জগদ্বিখ্যাত অপেরা বা গীত-নাটক। এই অপেরায় আঈডা সাজিবার সৌভাগ্যও কোপ্পোলার জুটিয়াছিল।

কোনো থিয়েটারে অভিনয় করিবার দিকে কোপ্পোলার এখন আর প্রবৃত্তি নাই। বোধ হয় বয়সও পার হইয়া গিয়াছে।

(১১)

মিলানের ব্যাঙ্ক ভবনগুলা সৌষ্ঠবপূর্ণ গড়নের প্রতিমূর্ত্তি। পিয়াৎসা কোর্দুজিয়োর উপর "ক্রেদিতো ইতালিয়ানো" নামক ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি বন্দোবস্ত বিরাট শ্রেণীর অন্তর্গত। হ্বিয়েনার "হ্বীনার বাঙ্ক ফারাইণ" অথবা বার্লিনের "ড্যয়চে বাঙ্ক্‌" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিপুলতা এখানে নাই। কিন্তু শৃঙ্খলা, নিয়ম বদ্ধতাইত্যাদির হিসাবে "ক্রেদিতো"র আফিসে কোনো ত্রুটি পাওয়া যাইবে না। জুরিখের "শোআইট্‌সার বাঙ্ক্‌ ফারাইণ" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এই "ক্রেদিতো"র চেয়ে বড় নয়।

"বাঙ্কা কমার্চিয়ালে"র বাড়ীটা বাহির হইতে দুএক মিনিট দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রসিদ্ধ বাস্তুশিল্পী বেল্‌ত্রামি এইটা গড়িবার কাজে মোতায়েন ছিলেন। বেলত্রামির গড়া বীমা-ভবনটা কোর্দ্রজিয়ো চৌরাস্তার এক গৌরব।

ইতালির সব্‌সে সেরা ব্যাঙ্কের নাম "বাঙ্কা দিতালিয়া"। তাহার শাখাও মিলানে আছে। বড় বড় রাস্তার ধারে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যাঙ্কের বাড়ী দেখিতেছি। বলা বাহুল্য এইগুলার অধিকাংশেরই প্রধান আফিস রোমে অবস্থিত।

(১২)

মিলান লম্বার্দি প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র,—কাজেই ইতালিয় মফঃস্বলের এক শহর মাত্র। কিন্তু এই মফঃস্বলেই এতগুলা ব্যাঙ্কের শাখা দেখিয়া উত্তর ইতালিতে টাকা চলাচলের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে মিলান মফঃস্বল হইলেও ইতালির ধন-কেন্দ্র।

কোর্দ্রজিয়ো পিয়াৎসায় "বোর্সা" (বুর্স্, বার্স্, ব্যোর্জে) ভবন অবস্থিত। আমদানি রপ্তানির দরদস্তুর আর দেশী বিদেশী টাকার দাম এই বোর্সায় স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন এবং ভিয়েনা ইত্যাদি নগরে ইতালির বাজার দর যাচাই করিবার জন্য লোকেরা রোমের বোর্সার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালায় না। চালায় মিলানের বোর্সার সঙ্গে। মিলানের দরই ইতালির দররূপে দুনিয়ায় পরিচিত। বিদেশের দৈনিক সংবাদপত্রে মিলানের বার্স্, বা ষ্টক এক্‌সচেঞ্জের উঠানামাই উল্লিখিত হইয়া থাকে।

মিলানকে ধনদৌলতের তরফ হইতে কোনো হিসাবে বিলাতী ম্যাঞ্চেষ্টার বা জার্ম্মাণ হাম্বুর্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভারতের কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ বাদ দিলে বোধ হয় গুজরাতের আহমদাবাদ ছাড়া আর কোনো শহর মিলানের সমকক্ষ নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

পর-নিন্দা

নিন্দাবাদী হয় কবে বিরত নিন্দায় ?—
ঘৃণা করে লোকে যবে পরের কুৎসায়।

শ্রীশিবরতন মিত্র

মরীচিকা

(১)

দশটা তখনো বাজেনি। পশ্চিমের কোন বড় সহরের একটা আফিসের মধ্যে একদল কেরানী দল পাকিয়ে জটলা করছিল। দেবেশ চেঁচিয়ে বলছিল "বুঝলি ভবেন, কাল বড় সাহেবকে একচোট যা শুনিয়ে দিয়েছি।" ভবেন তার প্রায় নিবু নিবু সিগারেটটায় একটা জোরে টান দিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে চেপে ধরে বললে—"ওরে যা যা, তোর তো শুনানো—সে বটে আমি। সেদিন—' বলেই ভবেন কাকে দেখে সোৎসাহে বলে উঠ্‌ল—"এই যে নবকার্ত্তিক যে এস এস—You are too punctual sir."

যিনি ঢুকলেন তিনি একজন কাল রোগা লম্বা কেরাণী। চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ায় উঁচু দাঁতগুলো বড় বেশী রকম বেরিয়ে পড়েছে। লম্বা নাকের কোলে, বড় বড় গোল গোল চোখ দুটো একেবারে অনেকখানি কোটরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। খোঁচা খোঁচা গোঁফ আর দাড়ীতে মুখটী ভরা। বয়স বোধ হয় বছর পঁচিশ, কিন্তু হঠাৎ দেখলে মনে হয় চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো আর তেল কপাল গড়িয়ে গালের উপর এসে পড়েছে। অতিমাত্রায় লম্বা বলেই হোক বা বড় বেশী রোগা বলেই হোক লোকটা একটু কোল কুঁজো হয়ে পড়েছিল। একটী কালো ছিটের কোটের উপর একটী ময়লা উড়ানী জড়ানো। লোকটীর নাম নরেন্দ্র কিন্তু তার এই অদ্ভুত চেহারা দেখেই আফিসের বাবুরা নাম দিয়েছিল নবকার্ত্তিক।

উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই লোকটী সারাদিন বড় সাহেবের গালাগাল ও সমস্ত কেরাণীদের উপহাস বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করত। আর বড় অসহ্য হলে বল্‌ত—"কি যে করিস ভাই।"

আফিসের সমস্ত কেরাণীর চিঠি আসত, আসত না শুধু নরেনের। কিন্তু যে ফাইলটায় কেরাণীদের চিঠি থাক্‌ত সেটা খুঁজে দেখা তার একটা মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তিন কুলে তার কেউ ছিল না, তবু যে কেন সে রোজ একবার করে চিঠির খোঁজ করে তা সেই জানে। এ নিয়ে কেরাণীর দলের আর পরিহাসের অন্ত ছিল না।

চিঠিগুলো দেখে যখন সে চলে যেত, তখন রোজই একজন না একজন বলে উঠ্‌ত—"কি নবকার্ত্তিক কেউ চিঠি লিখ্‌ল না?" সে শুধু একটা মৃদু হাসি হেসে নিজের চেয়ারটায় গিয়ে বসে পড়ত। সে হাসির মধ্যে যে কতটা রিক্ততার বেদনা লুকান, তা শুধু সেই জানত......

বড়বাবু মাঝে মাঝে চটে যেতেন, বলে উঠতেন—"নরেন What is that? কেউ তোমায় চিঠি দেয় না জানো, তবু তুমি কেন ডেসপ্যাচ টেবিলে সময় নষ্ট কর?"

বেচারা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠত—"না না ভেবেছিলাম পিসিমার আজ একটা চিঠি পাব।" এ পিসিমা যে কে জানতে কারও বাকী ছিল না। মাসের মধ্যে পঁচিশবার ও ঐ একই কৈফিয়ৎ

দিত। তাই বড় বাবু আরও চটে বলে উঠ্‌তেন—"Hang your পিসিমা।" সিদিন সে বড় বড় গোল গোল চোখ দুটোয় জল ধরে রাখতে পারত না। অতি সঙ্গোপনে মুছে ফেল্‌ত।

(২)

সেদিন সকালে চিঠির ফাইলটার কাছে গিয়ে নরেন নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারলে না। আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে ভবেনকে ডেকে এনে বল্‌লে—"ভবেন, ছাখ্‌ আমাকে কে চিঠি লিখেছে।" ভবেন চিঠিঠা নিয়ে নেড়ে চেড়ে নেহাত তাচ্ছিল্য করে বল্‌লে, "কে আবার! তোর পিসিমা বোধ হয়!''—নরেন আরও আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে "পিসিমার কি করে হবে? পিসিমার হাতের ত এরকম সুন্দর লেখা নয়।" ভবেন বিরক্ত হয়ে বল্‌লে "তবে কে লিখেছে কি করে বুঝ্‌ব বল্‌"—বলে সে তার নিজের কাজে চলে গেল। নরেনের মনের ভাঙ্গা বীণায় তখন বহুকালের পুরাণ মরচে ধরা একটা তন্ত্রী সজোরে রিম ঝিম করে বেজে উঠল। চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে—তার মনে হল যেন এক রাশ্‌ চাঁপাফুলের গন্ধ বুকে নিয়ে এই চিঠিখানি বাংল দেশের মিঠে দখিন হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়েছে এই বহু পুরাতন, অন্ধকার আফিস ঘরের ভিতর।

চিঠিটায় লেখা ছিল—প্রিয়তম, আমি তোমায় ভালবাসি—আমার সমস্ত মনটুকু দিয়ে ভাল বাসি তোমার রূপকে নয়, তোমার যৌবনকে নয়, তোমার সরল তাজা প্রাণটীকে—ইতি শেফালি।

সেদিন সে সারাদিন কাজে মন দিতে পার্‌লেনা। কতবার যে ভুল করতে লাগল তার ঠিক নেই। শেষে সন্ধ্যার সময় মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে তার ছোট খোলার ঘরটার মধ্যে ভাঙ্গা খাটিয়ার উপর পাতা ময়লা বিছানাটার উপর কোন রকমে শুয়ে পড়ল। এমন নারীও জগতে আছে যে তাকে ভালবাসে—তার বিশ্বাস হলো না। বহুপূর্ব্বে যখন গ্রামে মা বাপহারা ছেলেটী বুড়ী পিসিমার কোলে মানুষ হয়ে কিশোর ছাড়িয়ে যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিয়েছে তখন তার পিসিমা অনেক জায়গায় বিয়ের ঠিক করেছিলেন—কিন্তু ছেলেটীর চেহারা দেখে কন্যার সদ্য বৈধব্যের ভয় পেয়ে অতিবড় শত্রু বাপও তার হাতে মেয়ে দিয়ে পরকালে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেনি। সে-পাড়ার সবচেয়ে কুরূপা আর সবচেয়ে মুখরা ছিল রঙ্কাকালী। সেই রঙ্কার সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা হয়, তখন মুখরা রঙ্কা নাকি এক পাড়া নারীর সামনে কোঁদল করে বলে উঠেছিল—"মরণ আর কি। ও মড়া হাড়গিলেকে বিয়ে করার চেয়ে সাত জন্ম থুবড়ী হয়ে থাকা ভাল।" শুনা যায় অভিমানী ছেলেটা সেই কথার পরই নাকি দেশ ত্যাগ করে।

তাকে আজ লিখ্‌ল জ্যোৎস্নার মত মন-মাতানো নামের একটী মেয়ে যে,—সে তাকে ভাল বাসে! সত্যই ত রূপই কি সব? তার কুরূপের ভিতর দিয়ে যে একটী যৌবন বেদনা গুম্‌রে উঠতে থাকে—তার নিষ্ফল জীবনটা যে এতটুকু স্নেহ এতটুকু মমতার জন্য কাঙ্গালের মত উন্মুখ হয়ে থাকে সে খবর কি কেউ রাখ্‌ত না? মানুষ ভালবাসা পেতে চায়—এ জগতে যে ভালবাসা পায়না তার ব্যথাহত প্রাণের কান্নাটা যে কত করুণ, ব্যথিত ছাড়া তা' আর কেউ বোঝে না।

তাই যখন পর পর তিন দিন শেফালির চিঠি পেলে তখন, তার বহুকালের ভাটা-পড়া যৌবন স্রোত ফিরে এসে আবার যেন তার শিরায় শিরায় উদ্দাম নৃত্যছন্দে মেতে উঠল।

একদিন ভবেন হেসে বলে ফেল্‌লে—"কি গো হাঁড়ি মুখে যে আজকাল আর হাসি ধরে না।"

সে দিন নরেনের প্রাণ একটা রূপালি নেশায় মেতে উঠেছিল। সে বল্‌লে—"জীয়ন কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে ভাই।"

শুনে সকলেই উচ্চহাস্য করে উঠল আর কাব্যি ধরণের কেরাণী যতীন সুর করে বলে উঠল "শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল,—ভ্রমর বঁধু গুঞ্জরিল।"

(৩)

নির্জ্জন অবসর পেলেই যখন তখন সে ভাবত এই শেফালি মেয়েটীর কথা। কত রাত্রি ঘুমের মধ্যে মনে হত বুঝি শেফালি এসে দাঁড়িয়েছে এই তার খোলার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে একরূপ জ্যোৎস্না বহন করে। লোকটী এই অদেখা-অজানা তরুণীর প্রেমে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

বিকালে খোলার ঘরের বস্তিটা হিন্দুস্থানী নারীদের কলহ কোলাহলে ঝঙ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। মৃদু আলোকে ছোট রকটায় বসে নরেন্দ্র তার দাড়িগুলো পরিষ্কার করে একটা চিরুণী দিয়ে চুলগুলো আঁচড়ে, তার ঘরের পশ্চিমের দিকের বন্ধ জানালাটা সজোরে খুলে দিয়ে সামনে দোতলা বাড়ীটার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রইল। না মেয়েটা আজ আর এল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ বাড়ীরই বছর বার তের একটী মেয়ে নরেন্দ্রের চেহারা দেখে এমনি হেসে গড়িয়ে পড়েছিল যে রাগে অতি-বড় শান্ত নরেন্দ্রের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। সে সজোরে সে দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল আর খোলে নি। আজ সেই রূপপ্রিয় মেয়েটাকে দেখতে পেলে সে শুনিয়ে দেয় রূপটাই মানুষের সবখানি নয়, এবং তাদেরই নারী জাতির ভিতরে এমন একজনও আছে যে রূপ দেখে ভালবাসতে শেখেনি—আর স্বেচ্ছায় সেই আজ তার গৃহলক্ষ্মী হতে আসছে আর তাকেই সে আনতে যাচ্ছে আজ সন্ধ্যায়। কালই উদ্ধত মেয়েটা দেখতে পাবে—তার কুঁড়ে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী রাণী তার চেয়ে কম সুরূপা নয়—মেয়েটীকে কিন্তু সেদিন দেখা গেল না। নরেন্দ্র আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়্‌ল গুণ গুণ করতে করতে—"মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কাণে" ইত্যাদি।

গোলাপ বাগের যে বড় আমগাছটার নীচে শেফালির অপেক্ষা করার কথা সে গাছটার নীচে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আর পত্রচ্ছায়ায় মোহন জাল বোনা হয়ে গিয়েছিল—প্রাণে একটা অসহ্য পুলকের ভার নিয়ে নরেন্দ্র এগিয়ে যেতে লাগল—ঐ না অন্ধকারের মধ্যে শেফালি দাঁড়িয়ে তার সাদা সাড়ীর খানিকটায় চাঁদের আলো পড়েছে। তার মাথার মধ্যে টগ্‌ বগ্‌ করে রক্ত ফুটে উঠল—সে আবেগে বলে উঠল—"এসেছ শেফালি, আমি এই ক্ষণটুকুর জন্যে বুঝি কত যুগ ধরে অপেক্ষা করছিলুম"—সঙ্গে সঙ্গেই দুজন পুরুষ কণ্ঠের উচ্চহাস্য রোল নির্জ্জন স্থানটাকে মুখরিত

করে তুল্‌ল। নরেন্দ্র বুঝলে তারই আফিসের ভবেন ও দেবেশের স্বর। গাছটায় ঠেস দিয়ে সে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * * *

বহুদূর থেকে নীরব নিশীথিনীর বুকচিরে একটা করুণ সুর ভেসে আসছিল—বুঝি কোন বিরহীর কান্না তার হারানো প্রিয়ার উদ্দেশে।

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রূপ-বিদ্যা

অরুচি নেই! এতকাল ধরে মানুষ বিশ্বের সৌন্দর্য্য রূপ ভাব সমস্তই উপভোগ করছে কিন্তু কই অরুচিতো নাই দেখায় শোনায়! তাছাড়া আর এক রহস্য এই—মানুষ যা দেখলে শুনলে শুধু তাই পেয়ে সে চুপ করে বসেও নেই, নিজে দেখাতে শোনাতে চলেছে অক্লান্তভাবে যুগ যুগ ধরে—ছবি লেখে মূর্ত্তি গড়ে গান গায় কথা বলে চোখ-জোড়ানো মন-ভোলানো কত সৃষ্টি! বনের কোলেই প্রথম মানুষ ফুলের সঙ্গে পাতার সঙ্গে পশু-পক্ষি জল-বাতাস এদের সঙ্গে রূপের মধ্যে সুরের মধ্যে ডুবে থাকলো, কিন্তু শুধু দেখেই সে তৃপ্ত হ'লনা, শুনে শুনেও সে বল্লেনা যে যথেষ্ট হল! মানুষ তখন ঘর বাঁধতে শেখেনি—গুহায় থাকে বনে ঘোরে—জীবন্ত হরিণ খেলে বেড়ায় চোখের সামনে, দিনের পর দিন পাখী গেয়ে চলে ফুল ফোটে পাতা খোলে পাতা ঝরে—অশেষ ছবি অশেষ সুর—তাই দেখে মানুষ গাছের ছবি লেখে, ফুল লেখে পাতা লেখে, হরিণের ছায়ামূর্ত্তি ঘরের দেওয়াল ভর্ত্তি করে লেখে! ময়ূর নাচে কোকিল ডাকে কিন্তু মানুষ এটুকু দেখেই খুসি হয়ে নকল নিতে বসেনা—সে নিজের নাচ নিজের সাড়া খুঁজে খুঁজে বার করে, তার নাচ ময়ূরের নাচের তার সাড়া কোকিলের প্রতিধ্বনি করেনা, নতুন সুরে নতুন ছন্দে প্রকাশ পায়! ক্রমে বিশ্বের রূপ সমস্তকে বিরাট ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ চালাতে চলে, স্বর সমস্তকে নিয়ে খেলতে খেলতে সুরের সৃজন করতে থাকে, চরাচরের চলাচল নাট্যরূপে নতুন করে দেখিয়ে যায় সে, চোখ-জোড়ানো মন-ভোলানো ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্য ছবিতে মূর্ত্তিতে নাচেগানে ধরে বেধে যায়। মানুষ কোন আদি যুগ থেকে এই খেলা খেলছে তার ঠিক ঠিকানা নেই, আজও তার খেলা বন্ধ হলনা—একি রহস্য এ কেমন খেলা!

মানুষ কোন কালে ছবি লিখে লিখে খেলতে সুরু করেছে—আজও সেই সেই খেলাই চল্লো মানুষের এ খেলায় অরুচি হল না কেন! সুরের যত রকম খেলা হতে পারে মানুষ তা খেল্লে, নাচের ভঙ্গী কথার ছন্দ রংরেখার ছন্দ সব নিয়ে খেল্লে মানুষ কিন্তু; এখনো সে খেলেই চল্লো—

থামলো না! শুধু এই নয়, মানুষ নিজের এক কালের খেলার সব খেলেও আবার সেই খেলার রস পেতে চল্লো নতুন নতুন উপায়ে নয়, সেই সব পুরোনো উপায়েই। সেই বাঁশি আজকে বাজছে নতুন সুরে, সেই তুলি আজ লিখছে নতুন কথা, সেই লোহার তার তারি সুর কিন্তু বাজছে আজকের সুরে। আদি যুগের মানুষ তার হরিণ যেমন করে আঁকতে হয় তা এঁকে গেল, কিন্তু আজকের মানুষ তেমনিভাবেই হরিণ গাছ আরো কত কি নিয়ে নিজের লেখা খেলতে লাগলো! কালোয়াৎ যেমন গাইতে হয়, নট নটী তারা যেমন করে নাচতে হয় নেচে গেল গেয়ে গেল, কিন্তু ওসব হয়ে গেছে এখন স্থির হয়ে বসে থাক মৌনীবাবা হয়ে কিম্বা আগের যা তাই পুনরাবৃত্তি করা যাক এতো বল্লে না মানুষ। হঠাৎ মনে হয় এই যে ছবি মূর্ত্তি কবিতা গান নাট্য নৃত্য এসব মানুষের ছেলেমানুষির মতো মানুষের একটা নেশার মতো! কোনো কোনো পণ্ডিত তাবৎ রূপ-বিদ্যা এই ছেলে-খেলার ভিতে দাঁড় করিয়ে আর্টকে দেখতে চলেছেন এবং একদল মানুষও এদেশে আজকাল দেখি—যাঁরা নেশা এবং খেলার কোঠায় রূপ-বিদ্যাকে ফেলে এসব থেকে মানুষকে নিরস্ত করতে চাচ্ছেন! ছবি লেখার বিষয়ে একদিন মুসলমান ধর্ম্মে কঠিন শাসন, মানুষ লেখার বিরুদ্ধে আমাদের শাস্ত্র শুধু নয় দলে দলে মানুষের নিজের মনেও একটা বিষম ভয় এক এক সময় উদয় হয়েছিল। রূপ-বৈরাগ্য রস-বৈরাগ্য এরও প্রমাণ যুগে যুগে দিয়েছে মানুষের ইতিহাস কিন্তু রূপ-বিদ্যাকে তো মানুষ ছাড়তে পারলে না এপর্য্যন্ত। যদি এসব সত্যিই ছেলে খেলা হতো তবে লোকের ধম্‌কানির চোটে নয়তো আপনা হতেই এসব খেলা কোন কালে বন্ধ হতো! ছেলে খেলায় ছেলের অরুচি হয়—সে আজ খেলে ফুটবল, কাল খেলে হাডু-ডু-ডু; বয়স হলে দেখি অনেক ছেলে খেলতেই চায় না, এমন কি ফুটবল খেলতেও তার অরুচি হয়, কিন্তু কতক ছেলে সত্যি ফুটবল খেলছে তো বটে! ছেলে শেলেটে ছবি লেখে, মাস্টারের তাড়ায় আঁকা বন্ধ করে, আঁক কসতে লেগে যায় এবং অঙ্ক বিদ্যায় পণ্ডিত হয়ে যায়—তখন আঁকাকে ছেলেখেলা বলেই ভাবে সে—এই যে সমস্ত রূপ নিয়ে ব্যাপার এযে খেলা নয়—লীলা মানুষের—এ বল্লেও তখন সে চটে ওঠে! এই দুই রকমের ঘটনা যে মানুষে নেই তা বলিনে কিন্তু মানুষের লীলার ইতিহাস যুগে যুগে সাক্ষ্য দিচ্ছে—মানুষ প্রথম থেকেই এই রূপ-বিদ্যাকে তার লীলার সহচর বলেই গ্রহণ করেছে এবং এখনো এই ভাবেই একে দেখছে। "গৃহিণী সচীব সখী মিথঃ" এ কথা রূপসীর বেলায় যেমন, তেমনি রূপ-বিদ্যার বেলাতেও বলা চলে।

রূপ-বিদ্যাকে যারা সখের দিক দিয়ে দেখতে চলে তারা নেশা ছুটলে অন্য কিছুতে লেগে যায় কিন্তু রূপ-বিদ্যা যার কাছে সত্য হয়ে উঠলো সেই বল্লে এ খেলা নয় এ লীলা—

"এতো খেলা নয়
এযে হৃদয় দহন জ্বালা"।

(রবীন্দ্র নাথ)

অন্তহীন রূপের জন্যে অফুরন্ত রসের জন্যে জ্বালা আর তৃষ্ণার শেষ নেই মানুষের সমস্ত রূপরচনা এরি সাক্ষ্য দিয়ে চল্লো রূপের জ্বালা রসের জ্বালা বহ্নির সমান জ্বলেছে সব উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে রূপদক্ষের জীবন লীলামম জ্বালাময় হয়ে উঠছে—প্রদীপ্ত সমস্ত রূপ ও রসের তপস্যা মানুষ জীবন পাত করছে—রূপবিদ্যার সাহায্যে এই জ্বালাকে এই তৃষ্ণাকে রূপের পাত্রে ধরতে—মানুষের এই তপশ্চরণ তাকে সখের ব্যাপার বলে যারা ভাবে তারা রূপবিদ্যাকে কি ছোট করেই না দেখে। বৈদুর্য্যমণি নিজের অন্তরের জ্বালা নিয়ে বাইরের বিরাট আলোক রূপকে স্পর্শ করে দীপ্তি দিয়ে চল্লো, মানুষের প্রতিভা তেমনি গিয়ে মিল্লো বিশ্বের দিকে দিকে ধরা ভাস্বর সমস্ত রূপের ও রসের সঙ্গে এই ঘটনা নিয়ে রূপবিদ্যার সূত্রপাত প্রতিভাবানের লীলা তারি সাক্ষী রূপরচনা সমস্ত, রূপ নিয়ে ছেলেখেলা নয় প্রাণের জ্বালা নিয়ে রূপের জ্বালাকে গিয়ে স্পর্শ করা রূপের সঙ্গে চোখ-ফোটাফুটি খেলা একেবারেই নয়।

খেলার নেশা ছুটলে খেলা থেমে যায়—কিন্তু লীলার অবসান নেই, লীলা করে চলায় অবসাদ নেই, আজীবন রূপদক্ষ মানুষের কাছে লীলাময়ী মায়াময়ী বিশ্বরূপিণী তিনি আসছেন যাচ্ছেন অনন্তলীলা দেখিয়ে তারি ছন্দ ধরছে মানুষ রূপবিদ্যা দিয়ে নিজের রচনায় সে নিজের ও বিশ্বের লীলার পরিচয় ধরছে—যুগ যুগ ধরে। প্রতিভার প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি হচ্ছে অফুরন্ত রূপরসের দেবতার। জগতের প্রাণী মাত্রের সঙ্গে সমানভাবে প্রাণবন্ত মানুষ শক্তি নিয়ে প্রতিভা নিয়ে অথচ সবার বড় হল সে। রূপরচনা ধরে মানুষের প্রতিভা প্রকাশ করলে আপনাকে।

রূপবিদ্যা এতো একদিনে কোনো এক মানুষ আবিষ্কার করেনি—কালে কালে রূপদক্ষ এবং প্রতিভাবান সমস্ত এসে এই বিদ্যার এক এক সত্য ও তথ্য আবিষ্কার করে গেলেন, মানুষের রূপজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ পেতে পেতে ক্রমে রূপবিদ্যার সকল দিক পরিপূর্ণ করতে থাকলো মানুষ যখন পাথরে পাথরে কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালতে শিখছে মাত্র এবং তারও পূর্ব্বে যে সেখানেও দেখি মানুষ রূপ লিখছে—গুহার দেওয়ালে রূপবিদ্যার প্রথম পাঠ নিচ্ছে যেন—রূপের নকল রূপের ধারণা নামতা মুখস্ত এবং কাপিবুক লেখার মতো করে চলেছে তখন থেকে মানুষ। যে প্রতিভা নিয়ে মানুষ আগুন জ্বালালে শুকনো পাতার রাশিতে, সেই প্রতিভা নিয়েই মানুষ জ্বাল্লে রংএর আগুন, যে প্রতিভা নিয়ে মানুষ লিখলে প্রথম অক্ষর, সেই প্রতিভা নিয়েই মানুষ টানলে প্রথম টান ছবিতে প্রথম টান সুরের প্রথম টান তার বাঁকা ধনুকের। রূপবিদ্যা এইভাবে আশৈশব মানুষের সহচারিণী হয়ে প্রতিভাবানের ঘর আলো করে মানব জাতির কল্যাণে নিযুক্ত রইলো।

সঙ্গীত নাট্যনৃত্য ছবি কবিতা নানা বিভূষণ শিল্প এ সমস্তই প্রতিভা থেকে উৎপন্ন—এ সবই একই রূপ বিদ্যার অন্তর্গত বলে ধরা যায়, কেননা এরা সকলেই নানা ভাবের রূপই দিচ্ছে। নানা উপাদান নিয়ে প্রতিভাবান রূপ সৃষ্টি করছে, এই সব রচনা মানুষের কি কাযে এসেছে এপর্য্যন্ত

এবং এখনো এসবের দরকার আছে কি না, মানুষের জীবন যাত্রার পক্ষে এ নিয়ে সত্যিই তর্ক ওঠে মানুষের মনে। শুধু এই নয় রূপকর্ম্ম সমস্ত নিয়ে নাড়া চাড়া করলে একদল মানুষ আছে যারা সত্যি ভয় পায় পাছে মানব সমাজ ও সেই সঙ্গে কচি কচি মানবক গুলিও সুপথভ্রষ্ট হয়। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; রূপ-বিদ্যার সাধনা পথে চলতে অনেক সময়ে অনেক মানুষ অনেক ছেলে বিগড়েছে—যেমন ধর্ম্ম সাধনের পথে চলতে গিয়ে মানুষ বকা-ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছে সেই ভাবের বকা দেখা দিয়েছে রূপ-বিদ্যা-সাধকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু এ বলে ধর্ম্মের পথ রুদ্ধ করলে কে, রূপের পথই রুদ্ধ করলে কোথা? এ সব তর্ক বিতর্ক নতুন নয়। অতি পুরাকালেও এই সব তর্ক উঠে চুকেছে, প্রতিভাবান রূপ-দক্ষকে যাদুকর ডাইন ইত্যাদি বলে পুড়িয়ে মেরেছে মানুষ, তারও কথা ইতিহাস খুঁজলে পাই। কিন্তু এততেও রূপের আকর্ষণ মানুষের প্রতিভাকে কম্পাশের কাঁটার মতো টানছে তো টানছেই। মানুষের প্রতিভাকে রূপ-কর্ম্মের পথে আকর্ষণ করে চলেছে যে সব রূপ, তাদের বিরাট শক্তিতে বাধা দেয় এমন দৈত্যের দল সৃষ্টি হয়নি হবেনা কোনো কালে।

প্রতিভা মানুষের চিরকালই আছে, রূপ কর্ম্ম সমস্ত ধরে চিরকাল থাকবেও, তর্ক করে তাকে ঠেকানো যায় নি যাবেও না। প্রতিভাবানের উপর নির্য্যাতন যারা করলে পুরাকালে তারা বিলুপ্তির তলায় চলে গেল, কিন্তু নির্জ্জিতের প্রতিভা দিয়ে রচিত অতৈল-পুর প্রদীপ রূপলোকে একটা একটা ধ্রুবতারার মতো জ্বলে রইলো যুগযুগ ধরে আলো দিয়ে সৌন্দর্য্য দিয়ে।

মানুষ নিজেকে নিজে আবিষ্কার করতে পারে না, নিজেকে অপরের নিকটে প্রকাশ করতে পারে না, চোখে দেখা রূপ শোনা রূপ মনে ভাবা রূপ সমস্তই তার কাছে অর্থহীন যার কাছে রূপ-বিদ্যা নেই।

প্রতিভাবানের রচনা সমস্ত অর্থহীন বলে যারা উড়িয়ে দিতে চলে, জগতে কোন কিছুর অর্থ তাদের কাছে আবিষ্কৃত হবে কোনো কালে এতো বিশ্বাস করা যায় না।

বিশ্বজোড়া এই এই যে সমস্ত রূপ, প্রতিভার আলোয় এদের স্বরূপ আবিষ্কৃত হতে থাকলে যুগে যুগে তবেইতো মানুষ বিশ্বের দেবতাকে দেখলে জাজ্বল্যমান এই সৃষ্টির ভিতরে। জীবনের অর্থই অনাবিষ্কৃত থাকতো যদি না রূপদক্ষ মানুষের প্রতিভা জীবন্তরূপ সমস্তকে স্পর্শ করতো!

অনাবিষ্কৃত যা তা প্রতিভার আলোকে আবিষ্কৃত হলো—নিউটনের আবিষ্কার যেমন! তেমনি রূপের জগতে প্রতিভাবান এল এবং ধরে গেল নানা সত্য; প্রতিভা রূপের জগতে যে সমস্ত অঘটন ব্যাপার ঘটিয়েছে তার মধ্যে কত দৃষ্টান্ত দেবো—একটা ঘটনা যা ঘটেছে রূপ-জগতে তার কথা বলি—রূপের জগতে বসে মানুষ পাখি আঁকে—যুগের পর যুগ যায়—কল্পনার পাখি, গাছের পাখি, ডালের পাখি রংএ রেখায় ধরে রূপ বিষয়ে ধীমান মানুষ—বসা পাখি হয় ভাসা পাখি হয় ঘুমন্ত পাখি হয় চলন্ত পাখি হয় কিন্তু একটি পাখি হয় না—দূর আকাশের উড়ন্ত পাখি! ধীমানের

হাতের রেখা হার মানে ; রং হার মানে যুগে যুগে এই পাখিকে ছবিতে ধরতে ডানা মেলানো পাখি হয়, কিন্তু নীল পটে সে স্থির নিশ্চল—যেন লাগিয়ে দেওয়া ভাবে থাকে ! হঠাৎ একদিন একজন প্রতিভাবান এল হয়তো ছিল সে নিউটনের মতোই বালক মাত্র, হয়তো বা ছিল সুলেমান বাদশার মতো প্রকাণ্ড শক্তিমান—উড়ন্ত পাখিকে তুলির একটি টানে ছবির আকাশে উড়িয়ে দিয়ে গেল সে ! যেমন আলোর কম্পন—বিজ্ঞান জগতে, রূপের জগতে, এই উড়ন্ত পাখির ডানার ওঠা পড়া বুঝিয়ে জীবন্ত রেখার একটু কম্পন, একটা মস্ত আবিষ্কার,—রেখা প্রাণ পেলে !

রত্নাকরের মুখে দুটি ছত্র শ্লোক প্রতিভার প্রভায় যেদিন ঝলমল করে উঠলো, সাহিত্য ও কাব্য জগতে সে একটা মহাদিন, ভাষা নতুন ডানা মেল্লে আলোর ছন্দে ! সঙ্গীতকার তাঁরা চটবেন—যদি না বলি গানের সাতসুর দেবতার কাছ থেকে না এসে মানুষের প্রতিভার কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু মানুষের ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে তিন পাঁচ এবং পরে সাত যুগ ধরে একটি পর একটি প্রতিভার আলো এসে ধ্বনিকে বাতাসের ফাঁদে ধরেছে তবে পেয়েছি আমরা সঙ্গীত বিদ্যাকে পূর্ণ ভাবে।

সহজ কথা, কিন্তু টীকাকারের বোঝানোর চোটে শক্ত হয়ে উঠলো এটাতো সংস্কৃত টীকাশুদ্ধ একটা বই পড়লেই বোঝা যায়। প্রতিভাবান কবি একছত্রে সহজে বল্লেন কিছু-ধীশক্তিমান সেটাকে এতখানি করে পেঁচিয়ে বলে গেলেন। প্রতিভার বিশেষণ হল যেমন সর্ব্বতো-মুখী তেমনি ধীশক্তির বেলাতেও নানা বিশেষণ এল সূচ্যগ্র সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি ! বালকেরপ্রতিভা আর বয়স্কের প্রতিভা দুয়ের ভিন্নতা কেমন তা বোঝাতে হলে প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রতিভা জ্বলছে সূচ্যগ্র পলতেটি হয়ে আসছে যে বুদ্ধি বা ধী তা নিয়ে স্বল্পতৈলের প্রদীপ আর অনেক তৈলের প্রদীপ অপরিষ্কৃত তৈলের আলো আর সুপরিষ্কৃত তৈলের নানা দরের আলো নিয়ে যুগে যুগে মানুষের ঘরে জ্বল্লো প্রতিভা এবং তারি খবর নানা রূপ রচনায় এবং লীলায় ধরা রইলো। মানুষের যুগে যুগে উৎকর্ষের ইতিহাস এই প্রতিভা ও ধীশক্তির ক্রিয়ার ইতিহাস। প্রতিভার আলো ধরে কোন দেশের মানুষ কোন দিকে কতটা এগোলো তার হিসেব রূপ-বিদ্যা দখল না হলে তো ঠিক ধরা মুস্কিল। কলাবিদ্যার চর্চার আনন্দই সেখানে যেখানে প্রতিভার আলোয় দেখছি মানুষের অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ দুই নতুন নতুন দিকে বিস্তৃতি পাচ্ছে, কর্ম্ম-জগৎ ধর্ম্মজগৎ রসের ধারায় আপ্লুত হচ্ছে, শ্রান্তিহরা নব রসের ধারা বর্ষিত হচ্ছে চিত্ত ক্ষেত্রে মানুষের !

রূপ বিদ্যার চর্চ্চা তো তুচ্ছ করবার মতো নয়। এ সেই আদি যুগ থেকে মানুষের সহচর, এর ব্যাপার সমস্ত যুগযুগান্তর ধরে মানুষের অন্তরে বাহিরে যা ব্যাপার ঘটছে তার পথ দেখায় অভ্রান্ত পরিষ্কারভাবে।

আলোর কম্পন ইথরের সাড়া প্রভৃতি ব্যাপার কোন কালে কোন মানুষের মধ্যে কোন দেশে কোন বছরে কোন মাসের কোন তারিখে প্রথম ধরা পড়লো এটা জানা যেমন দরকারি ঠিক

ততখানি দরবারি রূপ-বিদ্যার চর্চ্চা করতে করতে খুঁজে পাওয়া কোনো একটা রূপ সৃষ্টির আদ্যন্ত ইতিহাস।

রেখার নানা কম্পন কিভাবে মানুষের প্রতিভা একটার পর একটা আবিষ্কার করে গেল তার কথা সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়লে একটা বিস্ময়কর ইতিহাস খুলে যাবে আমাদের কাছে। শুধু ছবি মূর্ত্তির দিক দিয়ে রূপ-বিদ্যার চর্চ্চা তার মধ্যেও এত অদ্ভুত রহস্য মানুষের ইতিহাসে রয়েছে যে বলবার নয়।

টেলিগ্রাফের বিনা তারের খবরের ব্যাপার কি ভাবে সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে চল্লো দেশের পর দেশ সাগরের পর সাগর অতিক্রম করে তার ইতিহাস বিচিত্র যেমন তেমনিই অদ্ভুত, এমনি একটা নয় অনেক গুলো কাণ্ড রূপ জগতে ঘটে গেছে।

দাঁড়ি আর কসি এই নিয়ে এতটুকু স্বস্তিক চিহ্নটি এটি কাল চক্রের সঙ্গে সঙ্গে এক ধর্ম্ম এক সভ্যতা এমনি এক এক দেশের সংস্পর্শে কি ভাবে এল নানা দিক দিয়ে তা জেনে নিতে হলে পৃথিবী ব্যেপে যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়; একটি শঙ্খলতা এই বাংলার রূপ-বিদ্যার ইতিহাসের একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে রেখেছে—প্রাচীন কালের গ্রীক স্পাইরাল পেঁচ আর বাংলার ব্রত-চারিণীদের শঙ্খলতা একই কিন্তু এদের উৎপত্তি এক সময়ে নয়, এক সভ্যতা থেকে নয়, দুই বিভিন্ন দেশ দুই বিভিন্ন কালে একে ফুটিয়ে গেল—এ কেন হল কেমন করে হল, জানতে হলে যুগ যুগান্তরের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে হয় কত দেশের কত শিল্পের আচারের ব্যবহারের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই।

রূপবিদ্যার দিক দিয়ে যুগযুগান্তরের মানব জাতির কর্ম্মকাণ্ডের ইতিহাস ও রহস্য প্রত্যক্ষ গোচর হয় যেমন, এমন কোনো দিক দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। কেননা রূপ প্রথম থেকে মানুষের সব কর্ম্মকে নিরূপিত করে ধরে গেল শুধু এই নয়, রূপের মধ্যে মানুষের অন্তর বাহির দুয়েরই হাব ভাব সমস্তই অভ্রান্তভাবে আটকা পড়লো। মানুষ যখন প্রথম আরম্ভ করলে মানুষের মুখ আঁকতে—ইতিহাসের ঠিক ঠিকানার বাইরের যুগের সে কথা—সে সময়ের অনেকগুলি ছবি অল্পদিন হল ইউরোপ এবং অন্য স্থানেও আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এর প্রত্যেক ছবি দেখাচ্ছে—মানুষকে মানুষ এঁকেছে হয় একেবারে সামনে থেকে নয় তো পিছন থেকে,—দুএকজায়গায় দেখি মানুষের দেহটি আঁকা একপাশে থেকে কিন্তু মুখের বেলায় সামনের বা পিছনের গোলাকৃতি ছাড়া পাশের মুখ আঁকা সাধ্য হচ্ছে না! জন্তু জানোয়ার আঁকার বেলায় তখনকার মানুষ কিন্তু দেখি সম্পূর্ণ পাশ থেকেই আঁকছে তাদের! কত যুগ যুগান্তর গেল এই ভাবে আঁকতে আঁকতে, তার পর ইজীপ্তের সভ্যতার সুত্রপাত হল, সেইখানে প্রথম দেখি মানুষ মানুষকে আঁকছে একেবারে পাশ থেকে! এখন সহজে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক আর ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে পাশের মুখ আঁকার হিসেব সম্বন্ধে মানুষের প্রতিভা ঘুমিয়ে ছিল, কিন্তু তা নয় সেই ইতিহাসের যুগের

পূর্ব্বেকার মানুষের মধ্যে একজন প্রতিভাবান এল সে অভ্রান্তভাবে গুটিকতক রেখায় লিখে গেল পাশথেকে দেখে একটি মানুষের মুখ (Fig. 47. Page 76. The Childhood of Art. Spearing). এই কাণ্ড ঘটলো aurignacian যুগে স্পেন দেশের গুহাবাসী মানুষের মধ্যে! এর পরের একটা যুগ সে সময় দেখি ঐসব মানুষ মূর্ত্তি গড়তে সুরু করেছে ছবি আঁকা রেখে। এই যুগকে Solutrian নাম দেওয়া হয়েছে। সেখানেও দেখি প্রতিভা কায করছে থেকে থেকে মূর্ত্তিশিল্পকে উৎকর্ষ দিচ্ছে (Fig 12. The Childhood of Art) তার পরে এল Magdalenian যুগ সেখানে আর একজন প্রতিভাবানের দেখা পাই যে শুধু একটা দুটো কি দশটা হরিণ পটে নিয়ে বোঝাতে চলছে না হরিণের দঙ্গল ও পাল। সে গতিমান রেখা দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে হরিণের পাল চলেছে এইটে বুঝিয়ে দিচ্ছে (Fig 76. Page 123. The Childhood of Art. Speaning.)

এমনি কতশত দিক দিয়ে কত প্রতিভা রূপ দিয়ে চিহ্নিত করলে এক একটা যুগ পরিবর্ত্তন তার বিচিত্র ইতিহাস রূপ-বিদ্যার দ্বারায় আবিষ্কার করা ছাড়া তো উপায় নাই!

আমরা দেখতে পাই স্পেন দেশের গুহাবাসী যে কালে মানুষের সম্মুখ দৃশ্যই এঁকে চলেছে, ঠিক সেই কালেই অষ্ট্রেলীয়ার (বুস্‌ম্যেন্‌) জঙ্গলবাসী—তারা আঁকছে তাদের প্রত্যেক মানুষ একেবারে পাশ থেকে এবং এই যুগের পর কত যুগ কত সভ্যতা এল গেল তার ঠিক ঠিকানা নেই তারপর মানুষ না-পাশ না-সামনে এই ভাবে আধফেরা অবস্থায় আঁকতে শিখে নিলে কোনো এক দেশের প্রতিভাবানের কাছ থেকে, অজন্তার ভিত্তি চিত্রণের মধ্যে এই ভাবের আধ ফেরা মূর্ত্তি সমস্ত পাই। সেখান থেকে আরম্ভ করে কত যুগ ধরে চলতে চলতে কোন দেশে কোন কালে দেখি একজন প্রতিভাবান এই ভাবে আঁকার সূত্রপাত করলেন।

সুলেমান বাদশার একটা কবজ ছিল—যেটা ধারণ করলে পৃথিবীর গোপন রহস্য সমস্তই অবগত হতে পারতেন তিনি। এইরূপ বিদ্যা সেই কাযই করে মানুষের সমস্ত গোপন রহস্য ধরে দিতে আজকের দিনের আমাদের সামনে। ইউরোপ অক্লান্তভাবে এই রূপ-বিদ্যার চর্চ্চা করে চল্লো তাদের সামনে দিনের পর দিন রূপের সমস্ত রহস্য ধরা পড়তে থাকলো; আমরা রূপ-বিদ্যাকে চাইনা কাযেই পাইওনা এসব খবর,—যতক্ষণ না ওদের কাছ থেকে খবরটা কাগজে ছাপা হয়ে আসে!

আমরা উত্তরাধিকার সূত্রের পাইনি এমন কিছু নেই বল্লেও চলে—কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য নৃত্য বাদ্য চিত্র মূর্ত্তি সবই, এতবড় ঐশ্বর্য্য কোনো দেশের মানুষ তার সন্তানদের জন্যে রেখে গেলনা, কিন্তু আমরা জানিনে যে এই সম্পদ এর কতখানি আমাদের প্রতিভাবানদের স্বোপার্জ্জিত, কতখানি বা দেশ দেশান্তর থেকে জয় করে সংগ্রহ করে ধার করে এমন কি চেয়ে আনা তাও!

একটা ছোট খাটো দৃষ্টান্ত দিই—সঙ্গীত নিয়ে আজ কাল খুবই চর্চ্চা চলেছে, কিন্তু খুব ভাল

ওস্তাদ—তাকে বল ইমন কল্যাণ এটার সঠিক বিবরণ দাও—বড় জোর শুনবে একটা যাবনিক ও একটা হিন্দু দুটো সুরে মিলে একটা হয়েছে ব্যাপার, কিম্বা এটাও শুনবে হয়তো আমীর খস্রু কি আর কেউ এটার আবিষ্কর্ত্তা! তারপর যদি প্রশ্ন কর কল্যাণ কোথা থেকে এল,—শুনবে 'মহাদেবের কাছ থেকে! নয়তো নারদের কাছ থেকে বা ভরত মুনির কাছ থেকে! এ ভাবের চর্চ্চাকে রূপ-বিদ্যার দিক দিয়ে চর্চ্চা বলেনা। কল্যাণ সুর কি ইমন সুর এদের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে মানুষের কি ভাবে কোথায় কোথায় পরিচয় তা দেখতে সাত বারের বেশি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে হবে, রূপ-বিদ্যার প্রদর্শিত পথ ধরে কত মানুষ কত সভ্যতা অসভ্যতার কোঠায় কোঠায় সন্ধান করতে হবে তবে পাওয়া যাবে সঠিক খবর ইমন-কল্যাণের!

মনে হয় শুনলে, এই ভাবে সব জিনিষের চর্চ্চা করে চলা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু ইউরোপের মানুষ—তারাতো চলেছে এইভাবে, তারাতো মাটির তলা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের এক একখানি পাতা এক এক অধ্যায় উঠিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করছে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত তার রূপের নানা পরিবর্ত্তনের ইতিহাস—উপন্যাসের মতোই যা মনোহর, রূপ-কথার মতোই অদ্ভুত।

রূপ-বিদ্যা মানুষকে বিষয়টির সত্যে পৌঁছে দিতে চায়। যার কাছে রেখার সত্য রংএর সত্য সুরের সত্য ছন্দের সত্য ধরা রইলো না সে ছবিই বা জানবে কি, গানই বা গাইবে কি, কবিতাই বা লিখবে কি এবং এদের ইতিহাসই বা বুঝবে কি! একটা সোজা কসির মধ্যে প্রাণ কি অনিমেষ-ভাবে জ্বলছে, একটা তরঙ্গিত রেখার প্রাণ শক্তি কি উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে আর একটা দপ্তরীর টানা রেখায় প্রাণ কি ভাবে নিষ্পেষিত হয়ে গেছে,—রূপ-বিদ্যার সাহায্য ছাড়া এ কেমন করে জানা হবে। সুরের অভিমতে সমস্ত কি রূপ ধরছে, ছন্দের দোলা সব কেমন ভঙ্গী ধরে ধরে নৃত্য করে চলেছে রূপ-বিদ্যা দখল না হলে কে তা বুঝবে?

বাতাস ঝড়ের উন্মাদ রূপ ধরে আসে, বাতাস বসন্তের ছন্দ ধরে বয়, বাতাস শীতের শিহরণ দিয়ে দিয়ে চলে, জলে স্থলে আকাশে তার রূপ নিরূপিত হয়ে যায়, মেঘের বিস্তারে ফুলের ছন্দে জলের কম্পনে ধরা থাকে তার কথা সুর রূপ ভাব ভঙ্গী সমস্তই, রূপ-বিদ্যার জ্ঞান যার নেই সে দেখে সব, শোনে সব—অবাক হয়ে—দেখাতে পারেনা শোনাতে পারেনা বলতে পারেনা কিছুই।

ধীশক্তির প্রতিভার আলোর অনুগামী এবং ধীশক্তির অনুগামী নিপুণতা প্রভৃতি কতকগুলি আলঙ্কারিকরা এইজন্যে বলেছেন—

শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্র কাব্যাদবেক্ষণাৎ কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতু সমুদ্ভবে—প্রতিভার সঙ্গে ধীশক্তি নিপুণতা লোকশাস্ত্র ও কাব্যাদির অবেক্ষণ কবি জনের নিকট শিক্ষা এবং অভ্যাস—এতগুলো ব্যাপার জুড়ে থাকে—তবে হয় রূপ-বিদ্ মানুষ।

প্রতিভা হল—অতৈলপুর প্রদীপ, দৈবাৎ কোনো কোনো মানুষ আসে রূপের জগতে সেটি বহন করে এক কালের থেকে এক কালের মধ্যে মধ্যে জ্ঞান অজ্ঞান উৎকর্ষ অনুৎকর্ষ আচার

অনাচার সমস্তের হিসাব মিটিয়ে নতুন পথে চালিয়ে নিতে মানুষকে। প্রতিভাবান নতুন পথ খুলে দিয়ে গেল—মানুষের চিন্তাস্রোত কর্ম্মস্রোতে সেই ধারার অনুসরণে চল্লো যুগ যুগ ধরে নতুন সমস্ত রূপ সৃষ্টির পথে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে যার একটু মাত্র পরিচয় আছে সেই জানে বাংলা গদ্য পদ্য এ দুয়েরই মধ্যে এক এক প্রতিভাবানের পরিচয় কি ভাবে সুস্পষ্ট ধরা রয়েছে—ছন্দের দিকে বর্ণনার ধরণ ধারণ সমস্তেরই দিকে। ভাব প্রকাশের বাধা সমস্ত প্রতিভাবান কাব্য ও সাহিত্যের দিক দিয়ে কালে কালে যেমন দূর করে চলেছেন তেমনি সব প্রতিভাবানের আসা যাওয়া চিত্রকলা সঙ্গীত কলার বেলাতেও ঘটছে এবং ঘটে গেছে কালে কালে। প্রতিভাবান নতুন নতুন যে পথ সৃজন করে তার সঙ্গে যার কোনো প্রতিভা নেই কিন্তু একটা কিছু নতুন তরো কাণ্ড করে বসলো তার কর্ম্মে তফাৎ রয়েছে।

কবি বাল্মিকীর প্রতিভা যখন সাতকাণ্ড রামায়ণ সৃষ্টি করলে তখন কাব্য জগতে একটা নতুন রসের পথ খুল্লো, কালিদাসের মেঘদূত শকুন্তলা সেখানেও নতুন রসের ধারা ঝরলো রূপ জগতে, তারপর এল কবির লড়ায়ের কালে ভ্রমর দূত হংস দূত এমনি কত দূত তার ঠিক নাই, কিন্তু কোনো দূত পাঁচালী কোনো দূত ছড়া কেটেই চলে গেল, কিন্তু নতুন ফুল ফুটলো না কাব্যজগতে নতুন পথও খুল্লো না নতুন যুগের। বৈষ্ণব কবিরা এলেন প্রতিভার স্পর্শে নতুন ছন্দে বেজে উঠলো কাব্য লক্ষ্মীর নূপুর কঙ্কণ।

এক কবির সঙ্গে অন্য কবির কাযের খুঁটিনাটি হিসেব নিয়ে দেখলে হংসদূতের ভ্রমরদূতের কবিদের মধ্যে কিছু যে পাইনে তা নয় শুধু একটা যুগ পরিবর্ত্তনের মধ্যে বৈষ্ণব কবির কাব্যকলা আর ইতর কবিদের কাব্যকলার স্থান কি ভাবে ধরা সেইটেই দেখানো উদ্দেশ্য আমার!

প্রতিভাশালী কবির রামায়ণ সে দেশ কাল অতীত, আর যে কবি তা নয় তার রামায়ণী গান শুধু এক দেশের বা এক দলের,—এটা কালই প্রমাণ করে দিচ্ছে—অন্য প্রমাণের অপেক্ষাতে নেই এখানে!

ধীশক্তিমানদের অগ্রণী বলে ধরতে পারি চাণক্য পণ্ডিতকে তাঁর একটা শ্লোক আর প্রতিভাবান কবি কালিদাস তাঁর একটা শ্লোক—দুয়ের ইতর বিশেষ আছে এবং ঠিক সেই রকমের ইতর বিশেষ আছে আজকের যথার্থ কবির গানে এবং অসত্য কবির গানে—এ নিয়ে ঝগড়া তো নেই কারু সনে।

আমাদের প্রাচীন আমলের একখানা স্থানচিত্র—স্থানচিত্রের গভীর রহস্য সবটা তার মধ্যে যে নেই সেটা আজকের ইউরোপের বা চীনের বা জাপানে অপূর্ব্ব একটি স্থান-চিত্রের পাশে ধরলেই বোঝা যায়। স্থানচিত্র আঁকার প্রতিভা কখন কোন দেশে প্রথম জাগলো, তার ইতিহাস জেনে আনন্দই পাই, এ দুঃখতো মনে আসে না যে আমাদের দেশে স্থানচিত্র সম্পূর্ণ বিকাশ

পেলে না! রূপ-বিদ্যা আমাদের যে রাস্তা ধরে চালায় সেটা যে বড় রাস্তা সেখানে একটা জগৎব্যাপি রূপের প্রকাশ-বেদনার সামনে গিয়ে আমরা পৌঁছই—ভুলে যেতে হয়, এদেশ ওদেশ এ-জগৎ ও-জগৎ এ-মানুষ সে-মানুষ এ-কাল সে-কাল। মানুষের রূপ-সৃষ্টি সেখানে বৃহত্তর ভাবে চোখে আসে দেখি যে মানুষের প্রতিভার আলো বিকীর্ণ হয়েছে সেখানে বৃহত্তম রূপের রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে।

প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যা তা দিয়ে একটা জিনিষের কাল স্থান সবই ঠিক হল কিন্তু তখন সেটিকে জানতে অনেকখানি বাকি থাকলো। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই:—তাজমহলটা কখন হল, কারা গড়লে, কি ধাচে গড়লে, গড়তে কত টাকা পড়লো, কত মানুষ খাটলে, তারা কে কত তঙ্কা মাইনে পেলে, কোন্ কোন্ দেশ থেকে তার পাথর এল, কার কার ভাণ্ডার থেকে তাকে সাজাবার মণিমুক্তা এল এ সবই জ্ঞান হল পুরাতত্ত্ব ইতিহাস দিয়ে কিন্তু তবু অনেকখানি জানার বাকি রইলো, রূপ-বিদ্যা দিয়ে সে খবর না নিলে উপায় নেই! সেদিক দিয়ে দেখি তাজমহল শুধুতো একটা বাড়ি মাত্র নয়, করর মাত্র নয়, সে একটা কবিতা মানুষের ভাষা রূপ জগতের একটা যুগ চিহ্ন, প্রতিভার আকাশ-প্রদীপ হিন্দু মুসলমান দুই সভ্যতার উৎকর্ষের পরিণয়ের সাক্ষী, এবং দেখি তার ইতিহাস ইজীপ্তের পিরামিড, জগন্নাথের রথ, বৌদ্ধস্তূপ এবং যুগ যুগান্তরের মানুষের প্রতিভা দিয়ে রচনা করা সমস্ত স্মৃতিমন্দির এবং স্মরণীয় গীত ও কথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিবিড় ভাবে। চার মিনারের মাঝে দেউল দুই পাশে দুই জওয়াব্—পার্শ্বদেবতার মাঝে এ কেবল চতুর্ভূজা, এ কেন সপ্ততন্ত্রী বীণা! এই রহস্য রূপ-বিদ্যা না হলে ধরি কোথা থেকে?

রূপের যথার্থ পরিমাপ একমাত্র রূপ-বিদ্যার দ্বারায় হওয়া সম্ভব, আর কোনো বিদ্যা রূপের তল পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে না। দপ্তরী সোজা রেখা টেনে যায় বটে কিন্তু রেখার যে রহস্য তার তল তো সে পায় না কোনো দিন, রূপবিদ্ তার কাছে সামান্য আঁচড়টিও আপনার জীবন রহস্য ধরে দেয়। রূপবিদ্যা নিয়ে যারাই চর্চ্চা করছে তারাই জানে এতে করে একটা জিনিষের গুণটিও যেমন দোষটিও তেমনি সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় চোখে!

অজন্তা গুহার ছবির সামনে যদি একজন এমনি মানুষ, একজন পুরাতত্ত্ববিদ্ এবং একজন রূপদক্ষ গিয়ে দাঁড়ায় তবে দেখবো কজনেই বলবে চিত্রগুলো চমৎকার কিন্তু কেন চমৎকার তার বেলায় কজনই আলাদা আলাদা কথা বলবে। সাধারণ মানুষটি কেন যে চমৎকার তা ধরতে পারবে না—সেই ব্যাপারটির সামনে অভিভূত হয়ে থাকবে; পুরাতত্ত্ববিদ্ ছবির প্রাচীনতা তার ইতিহাস বিশ্লেষণ এমনি কতক ইতিহাস কতক কুলপঞ্জী ইত্যাদি মিলিয়ে সুন্দর একটা বক্তৃতা দিয়ে চলবে এবং ঐ সাধারণ মানুষটির মতোই রসও গ্রহণ করবে জিনিষটার; কিন্তু সত্যি যে রূপদক্ষ সে ছবির খবর সব দিক দিয়ে পাবে। সে দেখবে ছবির প্রাচীন ইতিহাস শুধু নয় ছবিগুলো চিত্রবিদ্যার কতটা উৎকর্ষ দেখাচ্ছে সেটাও দেখবে—এক কথায় সে দেখতে পাবে অজন্তার চিত্র যেন তার সামনে আজ

আঁকা হচ্ছে,—কারু হাত নির্ভয়ে রেখা টানছে, কারু হাত ভয়ে কাঁপছে, শুধু এই নয় এই সব চিত্রের পিছনে মানুষের চিত্রবিদ্যার ধারা কত যুগ ধরে বইতে বইতে কি রেখে গেল রংএর কুলে রেখার কুলে কি চিন্তার ছাপ—তাও দেখবে রূপবিদ্!

পুরাতত্ত্বের বিষয় এক জিনিষ, রূপতত্ত্বের বিষয় অন্য এটা বলা ভুল। একই অজন্তার ছবি তার পুরাতত্ত্বও রয়েছে তার রূপতত্ত্বও রয়েছে তার রসতত্ত্বও রয়েছে, সুতরাং বলতে পারি রূপবিদ্যার মধ্যে এ সবারই স্থান আছে।

রূপবিদ্যা নানাদিক দিয়ে রূপটির পরিমাপ করতে নিযুক্ত করে মনকে রূপের অন্তর বাহিরের খবর এত করে ধরা পড়ে রূপবিদের কাছে। বৃহত্তর ভাবে রূপকে দেখায় বলে রূপবিদ্যার দিক দিয়ে চর্চ্চায় রূপ-রচনা সমস্তের বিস্তৃত ইতিহাস ধরে চলতে হয় শিক্ষার্থীকে। কোনো একটা তত্ত্ব ধরে চল্লে রূপের এক অংশ যেমন তার ঐতিহাসিক অংশ বা তার কোনো এক জাতি বা ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধের দিক পরিষ্কার হয়ে উঠলো কিন্তু বিশ্বজোড়া রূপ ও রসের রচনা সমস্তের সঙ্গে কি প্রকারের যোগ নিয়ে জিনিষটি রয়েছে মহাকালের মানদণ্ডে তার কি মূল্য নির্দ্ধারিত হল—এর হিসেব রূপ-বিদ্যার অধিকারীর হাতে!

রূপ রচনা সমস্তকে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে বুঝতে বা বোঝাতে হলে রূপবিদ্যার দরকার কোনো একটা রচনার রসতত্ত্ব পেতে হলে অলঙ্কার শাস্ত্রে নানা দিক দিয়ে রচনাটি আলোচনা করে দেখার উপদেশ সমস্ত রয়েছে তেমনি রূপতত্ত্ব তারও আলোচনার পথ হয়েছিল এ দেশে। রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে হেমচন্দ্র বলেছেন—

> " রূপতত্ত্বং স্যাদ্রূপং লক্ষণং ভাবশ্চাত্মপ্রকৃতিরীতয়ঃ
> সহজো রূপতত্ত্বশ্চ ধর্ম্ম সর্গোনিসর্গবৎ।" ইতি
>
> (হেমচন্দ্র)

ললিত বিস্তরে কলা-বিদ্যার যে সব হিসাব ধরা গেছে তার মধ্যে 'রূপম্' এবং 'রূপকর্ম্ম' এই দুয়ের কথা বলা হয়েছে। ইউরোপের একজন পণ্ডিত যিনি এই রূপতত্ত্ব ও রূপবিদ্যা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন তিনি শুনেছি আমাদের মেয়েদের হাতের আলপনার যে নক্সা আমি ছাপিয়েছি সে গুলি পেয়ে বলেছেন যে তাঁর দেশের অনেকগুলি ঐ ভাবের নক্সা কোথা থেকে কেমন করে উৎপত্তি হল তার ইতিহাসের সন্ধান তিনি পেয়েছেন এই বাংলার আলপনা থেকে। এই ভাবে দেখি সেকালে এবং একালেও রূপবিদ্যা রূপতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চলেছে রূপ সমস্তের পরিষ্কার ধারণা পাবার জন্য!

রূপের রাজত্বে প্রবেশ রূপের রহস্যে অনুপ্রবেশ এসব রূপ-বিদ্যা নিয়ে চর্চ্চা না করলে হবার জো নেই।

ছাত্র যখন প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন তার সমস্ত বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় করে নেবার অধিকার পেলে সে, বিদ্যার দ্বার মুক্ত হল তার সামনে। তেমনি এই রূপ-বিদ্যার প্রবেশিকা পরিক্ষা পাস হলো শিল্পি তবে তার রূপের তথ্য রূপের তত্ত্ব জানার জন্যে যে সব বিদ্যা রয়েছে যে সব শাস্ত্র রয়েছে তাদের নিয়ে নাড়া চাড়া করার ক্ষমতা পেয়ে গেল সে, রূপরাজত্বে রহস্য-নিকেতন মুক্ত হল তার কাছে।

একটা বিদ্যা দিয়ে আমরা ফুলের রহস্য অবগত হচ্চি, কোনো বিদ্যা আমাদের পশু পক্ষির বিষয়ে জানাচ্ছে, কোনোটা মানব চরিত্র, কোনো বিদ্যা বা শিশুচরিত্র স্পষ্ট করে ধরছে আমাদের কাছে, রূপের তত্ত্ব তেমনি রূপবিদ্যা জানাচ্ছে মানুষকে রূপটির রচনার দোষ গুণ তার সমস্ত ইতিহাস কলাকৌশলে গুণ দোষ সবই জানাছে!

আমরা যখন নিজেদের কিছুর চর্চা করতে চলি তখন অনেক সময়ে মা যে চোখে তার ছেলেকে দেখে সেই চোখেই দেখে চলি, এতে করে দোষ চোখে পড়ে না, দোষগুলোও গুণ হয়ে দেখা দিয়ে চর্চার বিষয়টি সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পৌঁছে দেয়, মনে কিন্তু রূপদক্ষের চোখে রূপের সামান্য খুঁৎটিও এড়ায় না যেমন গুণটিও তেমনি, রূপটি ঠিক যা তা যথাযথভাবেই উপস্থিত হয় তাদের কাছে।

ধর, এই অজন্তার চিত্রাবলী কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত—এই কথাই শুনে আসছি, ওর রং যেমন রেখা তেমন সবই তখনকার সমস্ত রূপ কল্পনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এইতো শুনে এলেম এবং মেনেও নিলেম তাই কিন্তু অজন্তা চিত্রের একটা দিক আছে সেটা তখনকার শিল্পির চিত্রকরণে অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে সুস্পষ্ট করে—একটা শুধু চোখে যারা কিম্বা ইতিহাস পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যা দিয়ে আলাদা আলাদা দেখে গেল ছবিগুলো তাদের চোখ এড়িয়ে গেল, অথচ সেই অক্ষমতা শুধু অজন্তায় নয় অজন্তার আগে অজন্তার পরে পৃথিবীর চিত্রকরদের মধ্যে ধরা যাচ্ছে। অনেক কাল মানুষ ছবিতে পাহাড় আঁকতে পারেনি, একটা স্থান-চিত্র আঁকতে পারেনি, নদী আঁকতে পারেনি, আকাশ আঁকতে পারেনি, মেঘ আঁকতে পারেনি, বাতাস ঝড় উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্র কত কি আঁকতে অক্ষম ছিল জগতের শিল্পি তার ঠিক নেই,—এ সব পরিচয় অজন্তার গুহায় এখনো ধরা ইউরোপের খুব উৎকৃষ্ট ছবিতে ধরা রয়েছে, ইতালীর বড় বড় শিল্পি বাতাস আঁকছেন দুটো গাল ফুলো ছেলের মুণ্ডু ফুঁ দিচ্ছে মানুষের গায়ে! অজন্তার শিল্পিরা এত বড় ছেলেমানুষি করেনি সত্য কিন্তু এক জায়গায় চিত্রবিদ্যার খুব বড় দিকের বিষয়ে তখনো তাদের চোখ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের শিল্পির সঙ্গে একেবারেই ফোটেনি দেখা যাচ্ছে।

সেকালের মানুষকে যদি বলা যেতো—বুদ্ধ যাত্রা করেছেন পথের দিকে—আঁকো, তবে সে ঘটনার মধ্যে তিন চারবার একই বুদ্ধকে না এঁকে কিছুতে বোঝাতে পারতো না ব্যাপারটা! একটা বুদ্ধ দিয়ে তিনি ওখান থেকে এলেন এখান দিয়ে চলেন সেখানে পৌঁছতে, এই যে অতীত

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনা পরম্পরার ইঙ্গিত তিনটি বৃক্ষ না এঁকে দেওয়া চলতে পারে তা তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল একটা প্রতিভার ইঙ্গিত অপেক্ষা করেছিল পৃথিবী জুড়ে সমস্ত চিত্রকর এই কলা কৌশল টুকু লাভের জন্য! সেই প্রতিভা কোন দিন কবে কোন্ দেশে কার কাযের মধ্যে প্রথম দেখা দিলে রূপ-বিদ্যার সাহায্যে এটা দেখতে পেলে একটা নতুন তরো দেখার চেয়ে যে কম জিনিষ দেখা এবং দেখানো হয় তা তো নয়! একটা মূর্ত্তি গুপ্ত রাজার আমলে না সেন রাজার আমলে এই তত্ত্বের চেয়ে একটা কম জিনিষ আবিষ্কার করা হয় তাও তো নয়! ভারত শিল্প সবই আধ্যাত্মিক এমনি একটা বড় গোছের রহস্যের চেয়ে কিছু ছোট রহস্য ভেদ করে যাওয়া হয় শিল্প বিষয়ে তাও তো নয়!

সমস্তখানি জল স্থল আকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে তবে ফোটে একটি ফুল একটি ফল, তাই তো ফুল ফলের মর্ম্ম এত বিচিত্র বিস্তার নিয়ে ধরা পড়ছে কবিতার ছবিতে গানে নাচে, কত ভাবে কত রূপে কত কাল ধরে কত রূপ দক্ষের রচনায় তার ঠিক নেই! তেমনি মানুষের দেওয়া একটি রূপ রচনা বিশ্বের মানব জাতির ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখ সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা দীক্ষা সমস্তেরই সঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে! মানবজাতির পূর্ব্বাপর সমস্ত সংস্কার বাদ দিয়ে কোনো রূপ-দক্ষ তো ফোটায় না কিছুই সেই জন্যেই একটি রূপ কিন্তু তার ইতিহাস জগৎ জুড়ে, তার খবর ছড়িয়ে আছে সারা মানবজাতির ভাবনার রাজত্বে, আজকের রচিত গান সে যুগযুগান্তরের সুরের রেশ ধরে আছে, কালকের ছবি মূর্ত্তি কবিতা সে ধারণাতীত কালের রহস্য সমস্ত বহন করছে। যেমন আজকের গোলাপ সেই প্রথম দিনের এবং তার পর থেকে সমস্ত গোলাপের সৌরভ ও বর্ণ ধরে প্রস্ফুটিত হল, আজকের চাঁদ সে যেমন আজকের সে যেমন কালকের সে যেমন যুগযুগান্তরে চাঁদনী আর স্বপ্ন ধরে রইলো তেমনি প্রতিভাবান রূপদক্ষের রূপ সৃষ্টি সমস্ত মানুষের পূর্ব্বাপর যা কিছুর সাক্ষী স্বরূপে বর্ত্তমান হল এই প্রকাণ্ড রহস্য ভেদ হয় রূপ-বিদ্যার শক্তিতে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব ?

বিগত আশ্বিন সংখ্যার "বঙ্গবাণী"তে শ্রীমতী সাহানা দেবী "কীর্ত্তন ও উচ্চসঙ্গীত" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য কতিপয় বন্ধু আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। উপরোধ অনুরোধে সমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাকে যদি বিড়ম্বিত হইতে হয়, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কারণ আমি "উচ্চ সঙ্গীত", সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। একথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল; কারণ হয়ত সমালোচনা

প্রসঙ্গে অনিচ্ছাক্রমেও উচ্চ সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন কিছু বলিয়া ফেলিতে পারি যাহা অভিজ্ঞের নিকট বেয়াদবী মনে হইতে পারে। সুতরাং যদি এই প্রবন্ধের কোথায়ও সেরূপ মন্তব্য প্রকাশের প্রলোভন সংবরণ না করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে সুধী পাঠকবৃন্দ তাহা অবান্তর বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন।

শ্রীমতী সাহানা দেবীর বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপতঃ এই যে "অনেকের মনে ধারণা আছে যে কীর্ত্তন সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সে ধারণা সত্য নহে।" কারণ সঙ্গীত মাত্রের প্রধান অবলম্বন সুর; "কীর্ত্তনের প্রাধান্য সুরের চাইতে ভাবেই বেশী।" "কীর্ত্তন বাঙ্গালীর কাছে মধুর" সুতরাং ইহা "একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর—একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ"——"কীর্ত্তনের যদি কথা বাদ দিয়া খালি সুর শোনা যায়, তা হ'লে শুধু যে তার সুরের মধ্যে বিশেষ কোনও নতুন প্রাণের বা তত্ত্বের সাড়া পাওয়া যায় না, তাই নয়, উপরন্তু ক্লান্তি আসে, ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।" "কীর্ত্তনের সুরের অপেক্ষাকৃত দৈন্যের অভিযোগের উত্তরে" যদি বলা যায় যে শ্রীভগবানের লীলারসে মন যখন ডুবিয়া যায়, তখন "সুরের মহত্ত্বের পরিচয় দেবার সময় বা নেবার ধৈর্য্য থাকে না," সে উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া চলে না; কারণ "কীর্ত্তনকে যে সঙ্গীতের মধ্যে দাবী করা হচ্ছে।" লেখিকার আর একটি আশঙ্কা এই যে কীর্ত্তনের মধ্যে কথার আবেদনই যখন প্রধান, সুরের আবেদন তেমন নাই, তখন অ-বাঙ্গালী "কীর্ত্তন" শুনে আনন্দের খেয়াল ততখানি সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। এক কথায় তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে কীর্ত্তনকে বিশুদ্ধ সঙ্গীত হিসাবে গণ্য করা বা বড় বলা উচিত নয়।

প্রবন্ধ লেখিকা একাধিকবার প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে কীর্ত্তনকে খর্ব্ব করিবার কোনও উদ্দেশ্য তাঁহার নাই। তাঁহার আপত্তি আর কিছুই নহে; "কীর্ত্তনকে অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করে বিশুদ্ধ সঙ্গীত হিসাবে (ও) শ্রেষ্ঠ বলে দাবী" করিতেই তিনি নারাজ।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি যদি অন্য কোনও প্রবন্ধের জবাব হিসাবে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে লিখিকার যুক্তিতর্ক সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু আমি এরূপ কোনও প্রবন্ধ দেখি নাই, যাহাতে কীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া ইহাই মনে হয় যেন কোনও কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-প্রয়াসী লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদ হিসাবে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। সেরূপ যদি কোনও পূর্ব্বপক্ষ থাকে, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বেই বলিতে চাহি যে সেরূপ কোনও মতের পক্ষপাতী আমি নহি। আমার মনে গোল বাধে সেইখানে যেখানে ললিতা কলার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে তারতম্য নির্দ্ধারণের এইরূপ অনর্থক, অনাবশ্যক ও নিস্ফল চেষ্টা দেখিতে পাই। আর দুঃখ হয় যখন সাহানা দেবীর মত কলাভিজ্ঞ নিপুণ শিল্পীকে এইরূপ বিফল চেষ্টায় ব্রতী হইতে দেখা যায়। সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ কি কাব্য শ্রেষ্ঠ, চিত্রবিদ্যা শ্রেষ্ঠ অথবা ভাস্কর্য্য শ্রেষ্ঠ একথা লইয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছে এবং

চলিবে। কিন্তু শিল্পীকে সে সকল স্পর্শ করিতে পারে না। ললিত কলার যে কোনও একটির সেবা যে কেহ অবলম্বন করে, সে তাহাতেই ভরপুর হইয়া থাকে; তাহার মন মজিয়া না গেলে সে রস পায় না, তাহার সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। সাহানা দেবী সুগায়িকা; তাঁহার সঙ্গীতে যেরূপ মর্ম্ম স্পর্শ করে, তাহা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গায়কগায়িকাদের মধ্যে দুর্ল্লভ। তিনি যে সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন, তাহাতেই তাঁহার চিত্তের স্ফূর্ত্তি। সাধনার দ্বারা তিনি যে সঙ্গীতের মূর্ত্তি মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের নরনারীকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়াছে। তাহার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার নিকট অবিসংবাদিত সত্য। তাহা না হইলে তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন না; তাঁহার সঙ্গীতের প্রাণমাতানো শক্তি কখনও লোকে উপলব্ধি করিতে পারিত না। যিনি কীর্ত্তনের সাধক, তাঁহার নিকট কীর্ত্তনও সেইরূপ একান্ত নিরলস সাধনার বিষয়। কীর্ত্তন যদি তাঁহাকে মুগ্ধ না করিত, তাহা হইলে তিনি কীর্ত্তনের সেবক কখনই হইতে পারিতেন না। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? যে ব্যক্তি যে ললিত কলার অনুরাগী, সে তাহার রসে বিভোর। সুতরাং তাহার বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর যে অনুরাগী নহে, তাহারও অভিমত কোনও কাজে লাগে না; কারণ ঈসপের গল্পের সারস পক্ষীর মত তাহার চঞ্চুপুট শৃগালের থালায় ঢালা তরল রসের আস্বাদনের পরিবর্ত্তে কেবল ক্ষত বিক্ষত হইয়া সারা হয়। এই জন্যই আর্টক্রিটিকের স্থান শিল্পকলার আসরে অনেক নিম্নে।

মানবের রুচিই ললিত কলার ভিত্তিভূমি। একখানি ছবি আপনার মনের মত হইল, আপনি অনেক দামে তাহা কিনিয়া আনিয়া আপনার গৃহ সাজাইলেন। আর একজন সে ছবি দেখিয়া এবং অজস্র অর্থব্যয়ের কথা শুনিয়া মনে করিল, আপনি বাতুল। যাহা রুচির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা ভাল লাগা না লাগার উপর নির্ভর করে তাহার মাপকাটি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যাহা যুক্তি বিচারণার উপর নির্ভর করে, তাহার সম্বন্ধে মতভেদের স্বাধীনতা বড় একটা থাকে না। যেমন জলের গতি নীচের দিকে, ইহা যুক্তি ও পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত সত্য; কাজেই যদি কেহ বলে যে গঙ্গা সমুদ্রে জন্ম লইয়া হিমালয়ের শিখরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহা হইলে সে কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। রুচির সম্বন্ধে যে মতভেদ হইতে পারে, তাহা প্রবচনেও বলে। বাগবাজারের নবীনের রসগোল্লা ভাল অথবা বৌবাজারের ভীমনাগের সন্দেশ ভাল, এ তর্ক লইয়া লাঠালাঠি ও মাথা ফাটাফাটি হইলেও তাহাতে মীমংসার কোনও কূলকিনারা হয় না।

রুচির সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, ইহাও ঠিক যে সে মতভেদ একটা খেয়ালের জিনিস নহে। যেখানে খেয়ালের পূরা রাজত্ব,—যেখানে যাহা খুসী তাহাই সম্ভব হইতে পারে,—সেখানে সার্ব্বজনীন আনন্দের অবকাশ নাই। ললিত কলার যে আনন্দ-দানের শক্তি, তাহা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে নিয়মানুবর্ত্তিতার ফল। আর্টে যথেষ্ট ধরাবাঁধা আছে, আবার যথেষ্ট স্বাধীনতাও আছে। এই যে নিয়মের মধ্যে অনিয়ম, রুচির মধ্যে শৃঙ্খলা, খেয়ালের মধ্যে সংযম, মুক্তির মধ্যে বন্ধন

ইহাই সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রধান উপজীব্য। ভাল ছবি আঁকিতে গেলে নিতান্ত গতানুগতিক হইলে চলিবে না, রূপ ও রেখা সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিলেই ভাল চিত্রকর হওয়া যায় না; ভাল কবিতা লিখিতে হইলে শুধু অক্ষর গুণিয়া, মিল জুটাইয়া যতি ঠিক রাখিয়া গেলেই হয় না; ভাল গায়ক হইতে হইলে শুধু তাল ও সুরের ফসরৎ অভ্যাস করিলেই চলিবে না;—এসকল আবশ্যক, আবার ইহার মধ্যে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, বা যাহাকে ব্যক্তিত্ব (individuality) বলে তাহাও ফুটিয়া উঠা চাই। অনেকে মনে করেন যে গোটাকতক মিষ্ট সুর মিষ্ট গলায় মিষ্ট করিয়া গায়িতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ গায়ক হওয়া যায়; তাল বা লয়ের কোনও পার্থিব প্রয়োজনই তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। এই সকল মতের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই, তবে আমার মনে হয় যাঁহারা এইরূপমত পোষণ করেন, তাঁহারা আর্টের মূলসূত্রটি ধরিতে পারেন নাই। তাল লয়ের নিগড় হইতে সঙ্গীতকে বিচ্যুত করিলে, সেটা সঙ্গীতের মুক্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু সে মুক্তি একেবারে নির্ব্বাণে পর্য্যবসিত হইবারই সম্ভাবনা বেশী। ধ্রুপদ খেয়ালে যেমন তাল লয় আছে, দ্রুত-বিলম্বিত ছন্দ আছে, গতির নানা প্রকার ভঙ্গী আছে, কীর্ত্তনেও সেই প্রকার। যাঁহারা মনে করেন, কীর্ত্তনে নিয়মকানুনের বাঁধাবাঁধি নাই, তাঁহাদের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। সকল রকমের সঙ্গীতেই ছন্দ মাত্রা যতি ও কাল আছে। কবিতায় যদি ছন্দ মিল প্রভৃতি না থাকে, তাহা যেমন গদ্যে পরিণত হয়, সঙ্গীতে এ সকল না থাকিলে তাহাও তেমনি গোলযোগে (noise) গিয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব সঙ্গীত, বাঙ্গালীর শিল্প প্রতিভার অক্ষয়কীর্ত্তি কীর্ত্তনে যে তাল লয় থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। তাহা না থাকিলে এ সঙ্গীতরীতি এমন করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ মন স্পর্শ করিতে পারিত না। নাকীসুরে বিনাইয়া বিনাইয়া গান গায়িলেই তাহা কীর্ত্তন হয় না, কতকগুলি আঁখর দিয়া ভাবসৃষ্টি করিতে পারিলেও কীর্ত্তন হয় না। কীর্ত্তনেরও কতকগুলি ধরা বাঁধা নিয়ম আছে। কঠিন কঠিন সুর, কঠিন কঠিন তাল কীর্ত্তনেও বিরল নহে। ইহাতেও সুর বৈচিত্র্য, সুরের কারুকার্য্য, যথেষ্ট আছে, একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

তবে, তাঁহার মতে বাঙ্গালার কীর্ত্তনে তেমন সুর-সম্পদ নাই, যেমন উচ্চ সঙ্গীতে আছে। উচ্চ সঙ্গীত অর্থে অবশ্য উচ্চ চীৎকার সহকৃত সঙ্গীত নহে; কারণ নাম কীর্ত্তনে যথেষ্ট উচ্চ সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীমতী সাহানা দেবীর মতে সুরই সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন; এ সম্বন্ধে কাহারও মত-দ্বৈধ নাই। তবে তিনি যে উচ্চ সঙ্গীত বা high class music বলিতে শুধু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই বুঝেন, ইহার কোনও অভিধানিক তত্ত্ব আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। সুর বলিতে যদি কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব উপলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উচ্চ সঙ্গীতে যে সে দ্রব্যের একান্তই অভাব, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। কালোয়াতী সঙ্গীতে স্বরের মিষ্টত্বকে প্রথমতঃ অর্দ্ধচন্দ্র দান করিয়া, তবে পাকা গায়ক হইতে হয়। অনেকেই জানেন, যে ওস্তাদদিগের পসার যে এদেশে মাটী হইয়া

গিয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ সুরের মিষ্টত্বের অভাব। পক্ষান্তরে যদি 'সুর' অর্থে স্বরের কারিগরি লেখিকার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ স্থির করিতে হইবে যে ইহা ব্যক্তি-বিশেষের উপর কতটা নির্ভর করে; দ্বিতীয়তঃ ইহা সাধনার দ্বারা কতটা লভ্য। কাহারও গলায় (যন্ত্র সঙ্গীতেও) মীড় মূর্চ্ছনা এত সুন্দর ফুটিয়া উঠে, প্রত্যেক স্বর-গ্রামকে বিভাগ করিয়া এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরের প্রকাশ হয় যে তাহাতে বাস্তবিকই কারুকলার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে স্বর চাতুরী ইহা কাহারও কাহারও প্রতিভা মৌলিকতা বা ঈশ্বরদত্ত শক্তি হইতে সঞ্জাত; আবার কাহারও কাহারও পক্ষে সাধনাসাপেক্ষ। স্বাভাবিক শক্তি না থাকিলে শুধু সাধনায় মনোমত ফললাভ হয় না। পরন্তু স্বাভাবিক শক্তি থাকিলেও সাধনার প্রয়োজন। স্বর সাধনা যোগেরই ন্যায় কঠিন ও আয়াস-সাধ্য। প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞের কর্ত্তব্য স্বর-সাধনা করা এবং সঙ্গীত কলার চাতুরী যে ইহার উপর অনেকটা নির্ভর করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কীর্ত্তন সম্বন্ধেও এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হইতে পারে না, ইহাতেও স্বর-সাধনার একান্ত প্রয়োজন। যে গান এত ভাব প্রবণতার দাবী করে, যে গানে ভগবল্লীলা প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইবার প্রয়াস করে, যে গানে সাধনভজনের অনুকূলতা সম্পাদন করে, তাহা বিনা সাধনায় লাভ করা যায়, এরূপ ধারণা করা অন্যায় নহে কি ?

কেহ বলিতে পারেন হয়ত যে, যে সকল কীর্ত্তন গায়ক সচরাচর এই ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগকে ত বড় একটা স্বর সাধিতে দেখা যায় না। বরং তাঁহাদের গান শুনিলে উল্টা ধারণাই মনে আসে। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে কীর্ত্তনের অবনতিই ইহার জন্য দায়ী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কীর্ত্তনের আদর একরূপ ছিল না বলিলেও চলে। আজকাল শিক্ষিত সমাজে কিছু অনুকূল পবন বহিতে দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু তাহাও বিশেষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন সভাকবি শ্রীকৃষ্ণলীলার পদ রচনা করিয়া পরম ভট্টারক রাজাধিরাজগণের মনোরঞ্জন করিতেন; সেদিন গিয়াছে, যখন পূর্ব্বে মণিপুর হইতে পশ্চিমে কাংড়ার উপত্যকা পর্য্যন্ত কবি, চারণ ও গায়কগণ ব্রজলীলানুস্মরণ করিয়া জনসাধারণের মনে রস-সঞ্চার করিতেন, যখন এদেশে কানু ছাড়া গীত ছিল না; সেদিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালার বিখ্যাত অ-বিখ্যাত সকল কবিই কীর্ত্তনের পদাবলী রচনা করিয়া আমাদের জন্য এক অক্ষয় অফুরন্ত বিরাট কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেন। এক্ষণে কীর্ত্তনের আর সেদিন নাই। ভাল কীর্ত্তন আর প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বেও কীর্ত্তন কেবল আদ্যশ্রাদ্ধের উপলক্ষেই শুনা যাইত। তাহাও আবার ঢপকীর্ত্তনওয়ালীদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইলে কেহ খাঁটী কীর্ত্তনওয়ালার মুখে শুনিতে চাহিত না। এই ত সাধারণতঃ কীর্ত্তনের অবস্থা। সুতরাং কীর্ত্তনের প্রকৃত সমালোচনা বর্ত্তমান যুগে বড়ই সাবধান হইয়া করিতে হয়। কেননা, সমালোচনার রীতি অনুসারে কোনও দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যে দ্রব্য তাহাকেই গ্রহণ

করিতে হয়। কাশ্মীরের শাল ভাল কিম্বা জর্ম্মণীর শাল ভাল এরূপ তুলনা করিতে গেলে কাশ্মীরের একখানি নিকৃষ্ট শাল এবং জর্ম্মণীর একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাল লইলে চলে কি ?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই সমালোচ্য প্রবন্ধে যে কীর্ত্তনের সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, তাহা কি উচ্চ শ্রেণীর কীর্ত্তন ? লেখিকা সে বিষয়ে আমাদের বুঝিবার পক্ষে একটুও সহায়তা করেন নাই। কীর্ত্তনের মধ্যে অনেক প্রকার ভেদ আছে, একথা নিশ্চয়ই লেখিকা মহাশয়ার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রবন্ধে একবারও সেবিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। ভাল কীর্ত্তন শুনিতে পাওয়ার সুযোগ আজকাল এতই বিরল যে আমার এই প্রশ্নে কেহ বিরক্ত হইবেন না। যাঁহারা মনে করেন, সব কীর্ত্তনই একরূপ, তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে যাওয়া নিষ্ফল মনে করি। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। যাঁহারা কীর্ত্তনের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত শুনিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের পক্ষে কীর্ত্তনের সমালোচনা করিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই। কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া আমরা প্রায়শঃই কতকগুলি সহজ ও মিষ্ট সুর শুনিবার প্রত্যাশা করি; শুনিয়াও আসি তাই। কতকগুলি ভাবযুক্ত পদ, মিষ্টসুরে গীত হইলেই আমরা সুখী হই; তাহাতে যদি চট্‌পট্ কতকগুলি রসযুক্ত বা আধ্যাত্মিক আঁখর জুটানো যায়, এবং 'সখিগো' বলিয়া পুনঃ পুনঃ তরল রাগিণীতে উচ্চ তান ছাড়া যায়, তাহা হইলেই সুন্দর কীর্ত্তন হইল। আমরা যেরকম চাই, গায়কেরাও সেইরকম সওদা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। কাজেই কীর্ত্তনের যে একটা উচ্চ অঙ্গের প্রণালী আছে, একথা আমরা ভুলিয়া যাই। যদি কখনও কোনও গায়ক সুর তালের বৈচিত্র্যে একটু আলাপচারী করিয়া কীর্ত্তন ধরিতে যান, তৎক্ষণাৎ শ্রোতারা গাত্রোত্থান করিতে আরম্ভ করেন। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনিবার মত আগ্রহ, শিক্ষা এবং ধৈর্য্যের অত্যন্ত অভাব। আসল কীর্ত্তনের খদ্দের যেমন কম, আসল হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের খদ্দেরও তেমনি কম। 'ধৈর্য্যচ্যুতি' যে কেবল কীর্ত্তনেই ঘটে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

কাহারও নাম না-ই করিলাম, কিন্তু যাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির কীর্ত্তন শুনিয়াছেন, তাঁহারাই আমার উক্তির সত্যতা স্বীকার করিবেন। একজন ভাল গায়ক অনেক চেষ্টা করিয়াও আমল পাইল না, অথচ আর একজন যাত্রা-কীর্ত্তন-থিয়েটারের সমন্বয়ে এক আধুনিক ব্যাপারের কীর্ত্তন করিয়া টেক্কা দিয়া গেলেন, এ ঘটনা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন নিশ্চিত। একজন দু চার পালা গান করিয়া সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইল, আর একজন সকল স্থানে গান করিবার ফুরসৎ পাইল না। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, উচ্চ শ্রেণীর কীর্ত্তনের কদর কিরূপ। লেখিকার একটি মন্তব্য শুনিয়া মনে হইয়াছে যে হয়ত তিনি শেষোক্ত প্রকারের কীর্ত্তনই শুনিয়াছেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন "আমাদের মধ্যে একটু ভাল গানের ও নকল করবার ক্ষমতা থাকলে অনেকে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন গায়কের নকল করে' গাইতে পারেন দেখা গিয়ে থাকে।" এ কথায় কেবল যে একটি প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছে তাহা নহে; এত বড় একটা অবিচার কীর্ত্তনের

সম্বন্ধে আর কিছুই হইতে পারে না। 'মরিব মরিব সখি'—যাহা গ্রামোফোনে এবং ঢপওয়ালীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর কীর্ত্তন সম্বন্ধেই শুধু এ কথা খাটে। ভাল কীর্ত্তন অনেক পরিশ্রম করিয়া অভ্যাস করিতে হয়, ন সিদ্ধিঃ সাধনং বিনা। যাঁহারা লেখিকার মতে উচ্চ সঙ্গীতের 'গগনচুম্বী' শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বহুদিন ধরিয়া সাধনা করিয়া উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন শিখিতে হয়। সাহানা দেবী উচ্চ সঙ্গীতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, আমি তাঁহাকেই অভ্যাস করিয়া দেখিতে বলি গরাণহাটী বা মনোহর সাহী সঙ্গীতের অনতিকঠিন একখানি পদ শিখিতে কত দিন লাগে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ওরূপ কণ্ঠে যদি কীর্ত্তন শেখা যায়, তাহা হইলে তিনি যে শুধু পাষাণ গলাইতে পারিবেন, এমন নহে; পরন্তু বাঙ্গালার একটি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

লেখিকা তাঁহার প্রবন্ধে কোথায়ও বলেন নাই যে কীর্ত্তন বলিতে তিনি কি বুঝেন; আমিও সুতরাং বলি নাই যে কীর্ত্তন বলিতে আমি কি বুঝি। তিনি নিশ্চয়ই মনে করেন যে কীর্ত্তনের কোনও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, এবং সেইরূপ সংজ্ঞা থাকাতে ইহার দ্বারা বিশেষ এক প্রকারের সঙ্গীত সব সময়ে লক্ষিত হইতে পারে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক সময় বাউল, মধুকাণের ঢপ, সখি-সম্বাদ, হাফআখড়াই ও যাত্রার গান পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অথচ ইহাদের সঙ্গে কীর্ত্তনের জ্ঞাতিত্ব থাকিলেও, ইহারা যে কীর্ত্তন নহে এ কথা সকলেই জানেন। অনেকে আবার মনে করেন যে কীর্ত্তন বলিতে একটি বিশেষ রকমের সুর বুঝায়। অনেক মুদ্রিত পুস্তকে দেখিয়াছি, গানের উপরিভাগে লেখা আছে "কীর্ত্তনের সুর"। ঝিঁঝিট, ছায়ানট, আশাবরী প্রভৃতি যেমন এক একটি বিশেষ সুরের পরিচায়ক, 'কীর্ত্তনের সুর' তেমনি একটি বিশেষ সুরের দ্যোতক; এমনি একটা সংস্কার অনেকের মধ্যে আছে। আমার বোধ হয় এ ধারণাও অত্যন্ত ভ্রান্ত। কারণ আর যাহাই হউক, কীর্ত্তন কোনও সুর বিশেষে নিবদ্ধ নহে। ইহাতে বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। বৈঠকী সঙ্গীতে যে সকল রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়, তাহা কীর্ত্তনেও আছে। বেহাগ, সিন্ধুড়া, ভূপালী, কল্যাণ, বসন্ত, মল্লার, দেশ, কেদার প্রভৃতি যখন কীর্ত্তনে রহিয়াছে, তখন একথা বলা যায় না যে কীর্ত্তনে সুরের অত্যন্ত দৈন্য। কোনও একজন ওস্তাদকে মাত্র কয়েকটি সুরের আবৃত্তি করিতে শুনিয়া যদি বলা যায় যে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য নাই, একথা যেমন সঙ্গত হয়না, তেমনি বর্ত্তমান কীর্ত্তন ওয়ালাদের মধ্যে কতকগুলি সুরের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়া কীর্ত্তনে সুর-দৈন্যের প্রসঙ্গ তুলিলে, তাহা তেমনি অসার হইয়া পড়ে। কীর্ত্তন প্রচলিত সুরগুলিকে অঙ্গীকার করিয়া ত লইয়াছেই, তাহা ছাড়া অনেকগুলি নূতন সুরেরও সৃষ্টি করিয়াছে। মায়ুর, ধানশী, সুহই প্রভৃতি অনেক নূতন রাগিণী কেবল কীর্ত্তনেই শুনিতে পাওয়া যায়। এ সকল রাগিণীও পুরাতন সুরের সংমিশ্রণেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কীর্ত্তনে সুরের দৈন্য হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? বৈষ্ণবদাসের বিখ্যাত পদাবলী সংগ্রহে (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু)

কীর্ত্তনে বাঙ্গালীর প্রাণ যেমন করিয়া সাড়া দেয়, এমন আর কোনও সঙ্গীতে নহে। সেইজন্য অকারণ ইহাকে খর্ব্ব করিতে দেখিলে অনেকের মনে ব্যথা লাগে। কীর্ত্তনের সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প, ইহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আজকালকার দিনে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন; যে সমস্ত কীর্ত্তন সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই অভিপ্রেত; উৎসাহের অভাবে কীর্ত্তনের উন্নতির স্রোত বহুদিন থামিয়া গিয়াছে, প্রতিকূলতার জন্যও ইহা বহুল পরিমাণে অবসাদগ্রস্ত ও সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; যাঁহারা অন্য কোনও সঙ্গীতের রসগ্রহণ করিতে অসমর্থ তাঁহাদিগকেও আনন্দ দান করিবার জন্য ব্যবসায়ের খাতিরে প্রচলিত কীর্ত্তনকে অনেক ধাপ নিম্নে নামিয়া আসিতে হইয়াছে—এই সকল কারণ প্রণিধান করিলে কীর্ত্তনের সমালোচনা অত্যন্ত ধীরতার সহিত করিতে হয়। শ্রীযুত দিলীপ কুমার রায়ের দুই একটি প্রবন্ধেও কীর্ত্তন সম্বন্ধে এই প্রকারের মতামত আমি দেখিয়াছি, সেইজন্যই এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমি কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিলাম। ইহার দোষগুণ সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী কীর্ত্তন, ইহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলেই আমাদের কল্যাণ। ইহা শ্রেষ্ঠ কিম্বা নিকৃষ্ট ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার কি? শ্রদ্ধা না থাকিলে এই লুপ্তপ্রায় জাতীয় সম্পদের উদ্ধার সাধন হইতে বিলম্ব হইবে। প্রবন্ধ লেখিকার সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করিতে না পারিলেও, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে তিনি কীর্ত্তনের সরসতা, ভাবপ্রণতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও এই কীর্ত্তন সঙ্গীতের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে আমার এমনও মনে হইয়াছে যে কীর্ত্তনকে তিনি যে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার সিদ্ধান্ত মোটেই খাপ খায় নাই। সুরের দিক দিয়া দেখিলে কীর্ত্তন যে নিকৃষ্ট ইহা যে লেখিকা মহোদয়ার ঠিক মনের কথা তাহা সমস্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অমল

অমরনাথের কথা

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ আজ জগতের কথা মনে হইল। এই নির্জ্জন প্রদেশে ছয়টি বৎসর কাটিয়া গেছে। এই হিমালয় পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশে, এই ক্ষুদ্র কুটীরে, সব মায়া ছাড়িয়া, একাকী এই ক্ষুদ্র শিশু লইয়া সময় কাটাইলাম। যখন আমার সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া গেল, আমার চির-আদরিণী অলকা ছায়ার মত কোন অজানা রাজ্যে, আমার সাধের স্বপ্ন

ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল—তখন আর সে সংসারে থাকিতে পারিলাম না। ক্ষুদ্র শিশু অমলকে লইয়া আমি দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া, এই নিভৃত পর্ব্বতের তলে আশ্রয় লইয়াছি। এই নির্জ্জনে, প্রকৃতির কোলে অমলকে লালন পালন করিয়াছি, আর নিজের সাধনায় মগ্ন রহিয়াছি। আর ত এ ভাবে দিন কাটে না, এ জীর্ণ শরীর আর বহে না, আর শক্তি নাই! অমল আমার ক্ষুদ্র শিশু! তাকে কার কাছে ফেলিয়া যাইব? সেই কোন অজানা রাজ্য হইতে অলকার আহ্বান পাইতেছি। যেতে হবে আর বুঝি দেরি নাই। এইবার অমলের জন্য আমার দেশে ফিরিতে হইবে। সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। বালকের মৃদুকণ্ঠের স্বর শোনা গেল, 'বাবা! বাবা'!

আমার আর উঠিবার শক্তি নাই, আজ আর নিজেকে কোনমতে রাখিতে পারিতেছি না। তবু বলিলাম "অমল"!

অমল আগ্রহের সহিত বলিল "এসো বাবা খাবার করে রেখেছি খাবে এসো।" নিজের, সন্তান, বলিতে নাই, এই নির্জ্জন প্রদেশে অযত্নে থাকিয়াও তাহার সুকুমার মুখখানি স্বাস্থ্যে পূর্ণ। পর্ব্বতের সেই বিমল বাতাসে সেই মুখে যেন স্বর্গের ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। সে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল "বাবা আজ আমি রুটি করেছি বোধ হয় ভালই হয়েছে এসো খাবে এসো।"

আমি বাহু প্রসারিত করিয়া সেই ক্ষুদ্র শিশুকে বক্ষে ধরিয়া বলিলাম "আমার অমল তুমি আমার সোণার অমল।"

বালকের চক্ষু হাসিয়া উঠিল, বলিল "তোমার নয়ত কার অমল, নিশ্চয় তোমার। উঠ চল বাবা।"

অনেক কষ্টে উঠিলাম, বুঝিলাম সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা। মনের দুর্ব্বলতায় এতদিন যে কথা ভাবি নাই, আজ সেই কথাই স্মরণ হইল। যদি হঠাৎ ইহলোক হইতে অপসৃত হই, তাহা হইলে এই শিশুর অবস্থা কি হইবে? সে ত কিছুই জানে না, আত্মীয় স্বজন কাহারও নাম পর্য্যন্ত জানে না। চার বৎসরের শিশু লইয়া, আমি লোকালয় ত্যাগ করিয়া, এই নির্জ্জন প্রদেশে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাটাইয়াছি। এই দশ বৎসরের বালককে যতদূর সম্ভব শিক্ষা দিয়াছি। আমার নিজের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় বিদ্যা—সঙ্গীত ও বাদ্য তাহাকে শিক্ষা দিয়াছি। তাহাকে এই নির্জ্জন লোকালয়হীন স্থানে কোন প্রাণে ফেলিয়া যাইব। কালই এখান হইতে বাহির হইয়া দেশে ফিরিতে হইবে। আবার অমল ডাকিল, "এসো বাবা এসো রুটি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" অতিকষ্টে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। আমার সোণার পুত্তলী অমল! আমি নিজের খেয়ালে, কি কঠোরতার মধ্যেই তোমায় ফেলিয়াছি। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই শূন্য ঘর—তাহাতে সাজ সজ্জা কিছু নাই। সেই অর্দ্ধপক্ক দুগ্ধ রুটির দিকে চাহিয়া চোখে জল আসিল। না না আর না আমার সোণার বাছাকে

আর দুঃখ দিব না। তাহাকে আমি আবার সংসারের আরামে ও শান্তির মধ্যে লইয়া যাইব, স্নেহের ছায়ায় রাখিয়া দিব, তবেত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। নতুবা তাহাকে একা ফেলিয়া স্বর্গ—ওঃ, সেও আমার পরম দুঃখের স্থান হইবে। হঠাৎ পার্শ্বের বেদনায় কাতর হইলাম, বুঝিলাম ডাক আসিবার আর দেরি নাই।

অমল হাসিয়া বলিল "দেখ বাবা রুটি কেন এমন হয়েছে ? তুমি যখন কর তখন ত খেতে বেশ ভাল লাগে। দুধটাও কি জানি কেন টক হয়ে গেছে, কাল থেকে ভাল করে রাখবো"।

আমার চোকে জল ভরিয়া উঠিল, তবু হাসিয়া বলিলাম "না অমল আজও ঠিক হয়েছে, তবে কাল থেকে তোমায় আর কিছু কর্ত্তে হবে না।"

সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল "কেন বাবা ? কাল থেকে আমায় বুঝি কিছু কর্ত্তে দেবে না ?"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "না অমল তা নয়, এখন তুমি খেয়ে নাও আমার আজ তত ক্ষুধা নাই।" আমি মুখে কিছু দিতে পারিলাম না। অমলও বিশেষ কিছু আহার করিল না। পারিবে কেন ?

শিশু সে কি এই সব কাজ পারে ? আহারাদির পর সে সব পরিষ্কার করিয়া লইল, ও আমরা বাহিরে আসিয়া বসিলাম। অমলের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, খুব ঝড় বৃষ্টি না হইলে সে ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিত না। প্রকৃতির কোলে সে প্রকৃতির শিশুর মতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সে আকাশের রঙের, বাতাসের ভাষা, আলো ও জলের খেলা, পাখীর কণ্ঠের সুর, সূর্য্যের কিরণের, বনের মর্ম্মরের ভাষা সব বুঝিত। বাহিরে গিয়া সে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল "বাবা দেখ আজকের সন্ধ্যা যেন সোণায় ভরে উঠেছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ; দেখ দেখ ঐ জলের উপর আলোর ছায়া কেমন পড়েছে, যেন রূপার পাতায় গা ঢেকে দিয়েছে।"

তার সেই আনন্দের স্বরে আমার ব্যথা যেন বাড়িয়া উঠিল। অমল ছুটিয়া গিয়া তার বাঁশিটি আনিয়া সুর ঠিক করিয়া বাজাইতে লাগিল। এই বাজনায় তার প্রাণের সকল কথা জাগিয়া উঠে ; আলোর সুর, হাসির সুর, পাখীর গানের সুর, বনের মর্ম্মরের সুর, জলের সুর, সব যেন বুঝিয়া সে বাঁশীর সুরে বাজাইতে পারে। সে তখন সেই সূর্য্যাস্তের বিষয় কি মধুর সুরেই বাজাইতে লাগিল। আমার আশা সফল হইবে ; আমার জীবনের সাধ যাহা অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়া জগৎ হইতে দূরে চলিয়া আসিয়াছি অমল আমার সেই সাধ পূর্ণ করিবে। তার সেই সুরের ভাষা প্রকাশের নয়। আমি বিস্মিত হইয়া শুনিতে লাগিলাম। দূরে সেই উপত্যকার ধারে পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি নানা আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ সমুদ্রে লাল মেঘে যেন নৌকার মত পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। উপত্যকার তলে ক্ষুদ্র সরোবরে শ্যামল বনের ছায়া পড়িয়াছে, সূর্য্যের কিরণ কি সুন্দর দেখাইতেছে। প্রকৃতির এই সুন্দর সকল দৃশ্য অমলের বাঁশীর সুরে বাজিয়া উঠিল, আর তার সেই সুকুমার সুন্দর মুখে প্রতিভাত হইল।

যখন সন্ধ্যার সেই স্বর্ণ রাগ মিলাইয়া গেল ও ধূসর বর্ণে সব ঢাকিয়া গেল, ধীরে ধীরে অমলের বাঁশীর সুর বন্ধ হইয়া গেল।

আমি যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিলাম।

"আর নয় এবার সময় হয়েছে আমাদের এখানে আর নয়—এ সব ছাড়তে হবে—।"

বালক চমকিত হইয়া বলিল, তখনো তার মুখে সুরের রাগ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে,

"কি ছাড়তে হবে, বাবা।"

"এই সব।"

"এই সব কি বাবা? এযে আমাদের বাড়ী।"

"হাঁ এ আমাদের ছিল বটে, কিন্তু আমরা চিরদিন এখানে এভাবে থাকিতে পারি না।"

"কেন থাকবোনা বাবা? এর চেয়ে আর ভালো বাড়ী কোথায় পাবে বাবা? আমি এইখানেই থাকতে ভালোবাসি।" আমার বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, আমার শরীরে যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হইল। বুকের ব্যথা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অমল এসব কিছু বুঝিবেনা। সে এই বনের মধ্যে প্রকৃতির শিশুর মত বাড়িয়া উঠিয়াছে, কোন কথাই সে শেখে নাই। সংসারের কোন কথাই সে জানে না। এখন বুঝিতেছি ইহা উচিত হয় নাই। এতদিন ভাবিবার সময় পাই নাই। আজ ছয় বৎসর আমি এই সংসারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখি নাই। শুধু অমল আর আমি। তারই শিক্ষার জন্য, তারই মনের উন্নতির জন্য, যতটা পারিয়াছি করিয়াছি। এই শিশু পুত্রকে আমি যাহা শিখাইয়াছি, অন্যে কেহ তাহা এক যুগেও পারিতনা। খেলাচ্ছলে, কথাচ্ছলে, তার ভাষার কত উন্নতি হইয়াছে। সে অতটুকু শিশু তা'র মত বাজনার হাত কয় জনের আছে? আমি এ কয় বৎসরে শুধু তাহাকে সৌন্দর্য্যের মধ্যে, সুরের মধ্যে, গানের মধ্যে লইয়া ঘুরিয়াছি। তাহার মনের মধ্যে কেবল আনন্দের ধ্বনিই বাজিয়া উঠিয়াছে। জরা মরণের কোন কথাই সে জানে না। আজ আমার একি জাগরণ, আমি কি করিয়াছি, আমার অমলকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব, কি বলিয়া তাহাকে বুঝাইব? হঠাৎ মনে পড়িল ছয় বৎসর বয়সের সময় অমল একটি ছোট পাখী মরিয়া যাওয়ায় বলিয়াছিল, "দেখ বাবা এ কেমন ঘুমিয়েছে, একি আর জাগবেনা?" তারপর তাকে স্পর্শ করে বলিয়াছিল, "কি রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখ।"

সেদিন আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথায় সে কথা ভুলাইয়া দিয়াছিলাম। তার পর দিন আবার বালক ভীতভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবা মরণ কি?"

"কি বলছো অমল।"

"আমাদের দুধওয়ালার ছেলেটি বলছিল যে পাখীটা ঘুমোয়নি, মরে গেছে।"

"এর মানে যে সত্যিকার যে পাখীটা পালকের মধ্যে ছিল, সে চলে গেছে অমল।"

"কোথায়?"

"অনেক দূর দেশে।"

"তার কি চ'লে যাবার ইচ্ছা ছিল ? আবার কি ফিরে আসবে ?"

"না।"

"সে যে পালক রেখে গেল, ওটা কি আর তার দরকার হবে না ?"

"সে তাহলে ওটা নিয়ে যেত, ওটা তার আর দরকার নাই।" এই কথা শুনিয়া, অমল স্তব্ধ হইয়া যেন গভীর চিন্তামগ্ন হইল। তারপর একদিন হঠাৎ বনের মধ্যে, নদীর ধারে সে বলিয়া উঠিল, "বাবা বাবা আমি জানতে পেরেছি মরণ কি ?"

"কি বলছো অমল ?"

"এই নদীর স্রোতের মত মরণ, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা ? স্রোত যেমন দূর দেশে চলে যায়, আর ফিরে আসেনা, কিন্তু জলটা যেমন আছে তেমনি থাকে, তেমনি মরণ চলে যায় আর আসেনা। তুমি কি দেখছনা ? কেমন গান গেয়ে গেয়ে চলে যাচ্ছে—যাচ্ছে আর গান গাইছে, যাবার জন্য কত ব্যস্ত হয়েছে।" আমার হৃদয়ের গুরুভার নামিয়া গেল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "হাঁ অমল।"

তারপর একদিন পুস্তকে মৃত্যুর কথা পড়িয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা তোমার-আমার মত সত্যিকার মানুষও কি মরে যায় ? তারাও কি দূর দেশে চলে যায় ?"

"হাঁ অমল, তাদের সময় হলে তারাও যায়, সে অনেক দূর দেশে;—সে রাজ্যের রাজা, অনন্ত করুণাময়, সকলে তাই বলে।" এই কথা বলিয়া আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। শিশু হয়ত আবার কি প্রশ্ন করিবে।

শিশু হাসি মুখে যখন বলিল "তারাও কি নদীর স্রোতের মত গান গেয়ে যায় ? তুমি জান আমি সে গান শুনেছি।" সে আজ চার বৎসর পূর্ব্বের কথা। অমল এখন দশ বৎসরের বালক। তখন মৃত্যুর বিভীষিকায় তার অন্তর কাঁপিয়া উঠে নাই। কিন্তু এখন কি হবে, আর ত আমার দেরি নাই, ডাক আসিয়াছে। সেই মহাসিন্ধুর ওপার হইতে সঙ্গীতের আহ্বান আসিয়াছে। আমি বলিলাম "অমল শোন।"

"কি বাবা।"

"আমরা এইবার এই নির্জ্জন বন হতে চলে যাব। আমাদের এবার সংসারের মধ্যে ফিরতে হবে। সেখানে আমাদের মত অনেক লোক আছে। কত পুরুষ, কত মেয়ে, তোমার মত কত ছেলে আছে। সেখানে তোমায় আরও অনেক সুন্দর কাজ শিখতে হবে। এই নির্জ্জন পাহাড়ের ধারে সে সব কাজ হয় না।"

"কেন হয় না, আমি যে এখানে থাকতে ভালবাসি। চিরদিন এখানে আছি।"

"চিরদিন নয় অমল কেবল ছয় বৎসর আছ। তুমি যখন চার বৎসরের ছিলে, তখন তোমায় এনেছিলাম, তোমার বোধ হয় সে কথা মনে নাই।"

অমল মাথা নাড়িয়া, আকাশের দিকে বিস্তৃত নয়নে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমি যেতে পারি, যদি আমি ঐ মেঘের ছোট নৌকায় যেতে পাই।"

"না অমল আমাদের মেঘের নৌকায় যাওয়া হবে না। আমাদের হেঁটেই যেতে হবে, আর আমাদের শীঘ্রই যেতে হবে। আমি চাই তোমায় আমার বন্ধুদের কাছে রেখে নিশ্চিন্ত হই। যদি তার পূর্ব্বে কিছু হয়"—আর বলিতে পারিলাম না, সমস্ত শরীর যেন ভয় ভাবনায় যন্ত্রণায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল।

আমি উঠিয়া বলিলাম "না অমল আমাদের কালই যেতে হবে। আর দেরি নয়।"

শিশু বিস্ময় বিহ্বল নয়নে চাহিয়া বলিল "বাবা।"

"হাঁ এসো অমল এবার।" আমি দ্রুত গৃহে প্রবেশ করিলাম। অমল আমার সহিত ছুটিয়া আসিল।

মনের সহিত শরীরের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। কদিন পূর্ব্বে যে কাজ করা অসম্ভব ছিল, মনের জোরে আজ তাহা সম্ভব হইল। কয়েকদিন যে একপদও উঠিতে কষ্ট হইতেছিল, আজ তা হইলনা। সেই কুটীরে আবশ্যকীয় দু চারিটি সামগ্রী যাহা ছিল সব গুছাইয়া লইলাম। কয়েকটি বস্ত্র আর বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়া, গানের সুর যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা লইলাম। অমল সেইখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তার চোকে এক নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিল, সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল "আমরা কোথায় যাব বাবা?"

"আমরা বাড়ী ফিরে যাব অমল!"

"আমরা কি ওই গ্রামে যাব যেখান থেকে খাবার দাবার কিনে আনা হয়?"

"না অমল ওধারে নয় আমরা নীচে ওই উপত্যকার দিকে সহরে যাব।"

"ওই নীচে যাব, ওই রূপার স্রোতের মত জলের কাছে যাব?"

"আরো দূরে যাব।"

কাগজের মধ্য হইতে কয়েকটি ছবি বাহির হইয়া পড়িল। অন্যমনস্ক ভাবে সেইগুলি দেখিতে লাগিলাম। বহুদিন বিস্মৃত আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিয়া আনন্দে হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অমল বিস্মিত হইয়া বলিল "এঁরা সব কে বাবা? তুমি ত আর কারো কথা আমায় বলনি, শুধু তোমার কাছে যে আমার মায়ের ছবি কেবল তাঁরি কথা বলেছ। এঁরা কে?"

"এঁরা তোমার আপনার লোক অমল, এঁরা তোমায় কত ভালবাসবেন। কিন্তু দেখো অমল তাঁরা যেন তোমায় অন্য পথে না নিয়ে যান। আমি তোমায় যা শিখিয়েছি তা কিন্তু ভুলোনা।"

আমার মনে হইল এই আত্মীয়দের নিকট গেলে অমল নিরাপদ হবে। এই সময় অমল আবার কি জিজ্ঞাসা করিল। এই সময় আমার মন এত উদ্বিগ্ন ছিল, আমি আর উত্তর দিতে পারিলাম না। যত শীঘ্র সম্ভব গৃহের সামগ্রী গুছাইয়া ফেলিলাম। আমার কাজ শেষ হইলে একবার শেষবার আমার সাধের বাদ্যযন্ত্র এস্‌রাজটি লইয়া বসিলাম। সমস্ত সংসার ভুলিয়া শেষবার আমার প্রাণের যাতনার কথা নিরাশার কথা তাহাতে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলাম। জানিনা কি ভাবে বাজাইলাম। যখন সুর শেষ হইল, চাহিয়া দেখি অমলের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে আমায় ফিরিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন করিল।

উষার আলোক ফুটিতে না ফুটিতে অমলকে উঠাইলাম। দুজনে যাহা কিছু পারিলাম আহার করিয়া কিঞ্চিৎ পথের জন্য সংগ্রহ করিয়া আমরা যাত্রার পথে বাহির হইলাম। আমার ও অমলের বাদ্যযন্ত্র দুটি সঙ্গে লইলাম। বাকি কিছুই লইতে পারিলাম না। পথে কে গুরুভার বহন করিবে? অমলকে বলিলাম "শীঘ্র চল অমল, অনেক পথ চলিয়া আমাদের ট্রেণ ধরিতে হইবে?"

"ট্রেণে আমরা যাব? আর আমাদের এই জিনিস পত্র সব এখানে রয়ে গেল?"

"তার কথা এখন ভাবিওনা অমল!"

"আমরা আবার ফিরে আসব ত?"

সে কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। আবার সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "বাবা আমরা আবার ফিরে আসব ত?"

আমি আবার ফিরিব? শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছি তবু হাসি আসিল, বলিলাম, "হাঁ অমল তুমি আবার ফিরে আসবে। যা জিনিস রেখে গেলে সব ত দেখে এসেছ।" আবার একবার সেই গৃহের দিকে চাহিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাত্রার জন্য বাহির হইলাম। বাহিরের সেই মধুর প্রভাতে, সূর্য্যের সেই বিমল আলোকে অমলের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে বলিল "না বাবা আমরা যাবনা, এখানেই থাকি।"

"না অমল, শীঘ্র চল, আর দেরি নয়।" পশ্চিম দিকে আমাদের যাত্রার পথ, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলাম।

সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। একদিন শোকের আঘাতে জগৎ ভুলিয়া যে পথে আসিয়াছিলাম, আজ আবার সেই পথে ফিরিতেছি। হয়ত ঠিক পথও জানিনা, শুধু সন্তানের মুখের প্রতি চাহিয়া, এই রোগজীর্ণ শরীর লইয়া অগ্রসর হইতেছি। বন হইতে বনান্তরে চলিতেছি, পাখীর কলকণ্ঠে প্রভাতকাল মুখরিত হইতেছে। বনের শোভায় অমল মুগ্ধ হইয়া চলিতেছে। মাঝে মাঝে সে যেখানেই জলধারা দেখিতেছে ছুটিয়া যাইতেছে। পাখীর কণ্ঠস্বরে স্বর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিতেছে। প্রস্তরখণ্ড হইতে লাফাইয়া প্রস্তর খণ্ডে পড়িতেছে। আমার আর চলিবার শক্তি নাই। সম্মুখে দুরূহ পথ; জানিনা কি করিয়া অগ্রসর হইব। সঙ্গের

বোঝা ক্রমশঃ ভারবহ হইতেছে, আর ত বহিবার শক্তি নাই। বুকের ভিতর দারুণ বেদনা, দরুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। কতদূর পথ—জানিনা কি হইবে! দুর্ভাবনায় আর যেন চলিবার শক্তি নাই। 'হে জগদীশ্বর, এ পথ কি অতিক্রম করিতে পারিবনা? অমলকে নিরাপদ স্থানে রাখিতে পারিবনা? যদি না পারি, যদি তাই হয়, হে ভগবান,—আমার আর ভাবিবার শক্তি নাই।

দ্বিপ্রহরে অল্প বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যার সময় আমরা একটি নদীর ধারে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে আর সঙ্গের বোঝা লইবার শক্তি পাইলাম না। সেইখানে বৃক্ষতলে ছাড়িয়া আসিলাম।

অমলকে বলিলাম "আর আমাদের কোনও দ্রব্যের আবশ্যক নাই। সামান্য খাবার দ্রব্য সঙ্গে থাকিলেই হইবে। আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা ঠিক স্থানে যাইব। অমল হাসিয়া বলিল "নিশ্চয়ই, আমাদের কিছুই দরকার নাই।" বেচারা শিশু সংসারের কোন ধার ধারেনা। সে কিন্তু বাঁশী ও এস্‌রাজটি কোন মতে ছাড়িল না।

সন্ধ্যার সময় আমরা সেই বনের ধারে পথের নিকট আসিলাম। সেই স্থান দিয়া যেখানে চারিটি পথ মিলিত হইয়াছে সেইস্থানে আসিলাম। অমল আমার দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিতেছে। বোধ হয় সে আমার মুখে কিছু অস্বাভাবিক দেখিতে পাইয়াছে। ক্রমে যেন আমার কথা বলিবার শক্তি হ্রাস হইতেছে। নিশ্বাস বন্ধ হইতেছে। পথে দু চারিটি পথিক আনা-গোনা করিতেছে। চলিতে চলিতে আর পারিলাম না। হঠাৎ বসিয়া পড়িলাম ও ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িলাম। অমল ছুটিয়া আসিল, বলিল "বাবা একি হল? কি হয়েছে বল?" উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই, কণ্ঠ শুষ্ক, যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সে পুনরায় বলিল "কেন কথা বলছনা বাবা, দেখ এই যে আমি, অমল।"

আমি বুকে বল বাঁধিয়া একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া তাহার হাতে আমার ঘড়ি চেন তাহার মায়ের ছবিখানি দিলাম। তারপর চারিদিক খুঁজিয়া দেখি, সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি মাটিতে পড়িয়া আছে, অমলকে বলিলাম, "অমল এগুলি ভাল করে লুকাইয়া রাখ, খুব যত্ন করে রাখ, এর বড় দরকার হয়। টাকা না হলে কিছু হয় না। কিন্তু মনে রেখো খুব দরকার না হলে বাহির করিওনা। তারপর তুমি কোথাও চলিয়া যাও যেখানে আশ্রয় পাবে—

বালক ভীতকণ্ঠে বলিল,—"সে কি বাবা, তোমায় ফেলে একা যাব? না বাবা তা হবে না, তোমায় ফেলে একা যাব না। আমি ত পথ জানিনা—কোথায় যাব?"

সে আসিয়া আমার অতি নিকটে বসিল। আমি পুনরায় তাহাকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে বলিলাম। সে আমার কথামত কার্য্য করিল। সেই সময় সেই পথ দিয়া একটি গোযান চলিয়া গেল, শকট চালক আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আমি উঠিয়া গাত্র বস্ত্র হইয়া কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া দুখানি পত্র লিখিতে লাগিলাম। অমল চারিদিক চাহিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। আমি তখনো লেখায় ব্যস্ত, চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি, কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না।

আমার লেখা শেষ হ'লে দেখি, অমল ফিরিয়া আসিয়াছে, তার মুখ বড় শুষ্ক, চোকে জল ভরিয়া উঠিয়াছে। সে আমায় ফিরিতে দেখিয়া বলিল,—"বাবা ওই বাড়ীতে আশ্রয়ের জন্য গিয়াছিলাম, কেহ দিল না।"

"আশ্রয় কোথায়, আর আশ্রয় নাই! শিশু বালক কার নিকট তোমায় রাখিয়া যাইতেছি, সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় নাই।"

অমল বলিল,—"বাবা আমি ওই বাড়ীটায় গিয়াছিলাম, আমায় একটু দুধ দিতে আসিয়াছিল, আমি একটি সোনার টাকা দিতে গেলাম, আমায় চোর বলিয়া তাড়াইয়া দিল।"

আমি তাহাকে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলাম,—"বিশেষ আবশ্যক না হলেও টাকা বাহির করিও না। খুব সাবধানে, খুব যত্ন করে লুকাইয়া রেখো। এ টাকা পরে তোমার অনেক কাজে লাগিতে পারে।"

অমলের চোখ ছল ছল করিতেছে, সে বলিল—"এসো বাবা আমরা যাই চল।"

"হাঁ অমল"—বলিয়া তাড়াতাড়ি চিঠি দুখান পকেটে ফেলিলাম। দুচার পদ অগ্রসর হইতে না হইতে নিকটেই শকটের শব্দ পাইয়া দাঁড়াইলাম। শকট-চালক আমাদের দাঁড়াইতে দেখিয়া থামিয়া বলিল,—"কোথায় তোমরা যাইতেছ, গ্রামে?"

অমল বলিল,—"হাঁ মহাশয়।"

বেচারা আর কিছুই বলিল না। শকট চালক দয়ার্দ্র হইয়া বলিল,—"আমি ওই পথে যাচ্ছি, তোমরা কি যাবে? যদি যাও এসো।"

অমল আনন্দিত হইয়া শকট চালকের সাহায্যে আমায় লইয়া শকটে আরোহণ করিল।

স্বপ্ন-ভারে যেন নয়ন জড়াইয়া আসিতেছে। শকট দ্রুত চলিয়াছে। আমি অজানা রাজ্যের যাত্রী, কোন পথে চলিয়াছি, কতক্ষণ এভাবে চলিলাম মনে নাই! হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেল, চালক বলিল "এইবার তোমাদের নামিতে হবে। ওই গ্রামের আলো দেখা যায়, এখান থেকে বেশীদূর নয়।

অমল আবার তাহার সাহায্যে আমায় নামাইয়া ধন্যবাদ জানাইল। আহা সুকুমার শিশু! তাহার তখন মনের ভাব কি হয়েছিল কে জানে। আমরা খানিক দূর চলিলাম, জ্যোৎস্না রাত্রি, সম্মুখে প্রশস্ত পথ। অমল আমায় হাত ধরিয়া বলিল,—"বাবা সামনে ওই একখানি বাড়ী, চল ওইখানে বারান্দায় আমরা গিয়া বসি। ওইখানেই আজ রাত কাটাইব।"

"সেই ভাল অমল, সেই ভাল।" আর চলিবার শক্তি নাই, শরীর এলাইয়া পড়িতেছে। বারান্দায় আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম। অমলকে একবার বুকের কাছে টানিয়া বলিলাম—

"অমল বাজাও, তুমি বাজাও, সেই নদীর স্রোত, যে যায় আর ফেরেনা তারি সুর বাজাও আমি সেই সুর শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ি—"

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

একটী ইঁদুরে-কাটা কবিতা

আজ ষাট্‌ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর ছেলে "রসাল ও স্বর্ণলতিকা" পড়িয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ কবিতাটী যে মূষিকভুক্তাবশিষ্ট, সে কথা, বোধ হয়, কেহই জানেন না। কবিতাটীর সহিত এ হেন মূষিক-কীর্ত্তির কথা চির-অমরতা লাভ করুক, এই ইচ্ছায় আমি সেই লুপ্ত কথাটী আজ ব্যক্ত করিতেছি।

ফ্রান্সে প্রবাস কালে মধুসূদন যখন চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ও অন্যান্য কয়েকটী কবিতার পাণ্ডুলিপি কলিকাতায় তাঁহার পুস্তক-প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসুর কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তখন সেই অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে তিনটী নীতিগর্ভ কবিতা ছিল—"রসাল ও স্বর্ণলতিকা," "ময়ুর ও গৌরী" এবং "কাক ও শৃগালী।" বসু মহাশয় পাণ্ডুলিপিগুলি যথাস্থানে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ছাপিতে দিবার সময় দেখিলেন যে, ঐ তিনটী কবিতার স্থানে-স্থানে ইঁদুরে কাটা। যাহ ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াছে ভাবিয়া বসুমহাশয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া কবিতাগুলি যথাযথরূপে ছাপাইয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলেন। তাহাতে দষ্টস্থলগুলি * চিহ্নে চিহ্নিত থাকিল।

তিনটী কবিতার মধ্যে "কাক ও শৃগালী" এমন বিষমরূপে আহত যে, উহার কবিত্ব একেবারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। "ময়ুর ও গৌরী"র বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু "রসাল ও স্বর্ণলতিকা"র একেত অনেকখানি নষ্ট এবং তাহারই জন্য আবার আরও খানিক অসংলগ্ন ও অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেকালের পদ্যপাঠ সঙ্কলয়িতা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ "রসাল ও স্বর্ণলতিকা"র লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ভাল সার্জ্জনের মত ঐ কাটা ও অকেজো সমস্তটুকু বাদ দিয়া কবিতাটীকে "মানুষের মত" করিয়া তুলিলেন। সেই অবধি ঐ যোড়া লাগানো "রসাল ও স্বর্ণলতিকা" বাঁচিয়া আছে এবং বালক বালিকাদের মনোরঞ্জন করিতেছে। এই কবিতাটী প্রথমে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাই অবিকল উদ্ধৃত হইল।

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি' সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে হায়,
নত শিরা তুমি তা'য়,
মধুকর-ভরে তুমি পড়, লো, হেলিয়া।
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
হিমাদ্রি সদৃশ-আমি,
মেঘ-লোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।

কালাগ্নির মত তপ্ত-তপন-তাপন,
আমি কি, লো, ডরাই কখন্ ?
দূরে রাখি' গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে,
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ ;—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন ;—
কেহ অন্ন রাঁধি খায়,
কেহ পড়ি' নিদ্রা যায়,
এ রাজচরণে !
শীতলিয়া, মোর ডরে,—
সদা আসি' সেবা করে,
মোর অতিথির, হেথা আপনি পবন !
মধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে !—
তুমি কি তা' জাননা, ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি'
বাঁসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুঃখ দেখি' নিত্য আমি দুখী !
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ বিধুমুখি !"
× × মধুর স্বরে
× × × রে
× × × ×
× × × ×
× × প্রভু,
× × দয়ামি ×
× × যথা × ×
যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে !
সুধা আশে আসে অলি,
দিলে সুধা, যায় চলি,
কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে ?"
"ক্ষুদ্রমতি তুমি অতি"
রাগে কহে তরুপতি,
"নাহি কিছু অভিমান ?—ধিক্ চন্দ্রাননে !"
নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ ; গম্ভীর স্বননে
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি' ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে !
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত পিঠে চড়ি'—
রাগে দাঁত কড়মড়ি,'
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড়-কড় কড়ে !
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি ;
রসাল ভূতলে পড়ি',
হায় ! বায়ু-বলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে,
করিওনা ঘৃণা তবু নীচশির জনে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

দষ্টস্থল গুলি (×) চিহ্নে চিহ্নিত। তৎপরে "যুদ্ধার্থ" হইতে "ধিক চন্দ্রাননে" পর্য্যন্ত দষ্ট না হইয়াও অসংলগ্নতা দোষে নষ্ট হইয়াছে। পদ্যপাঠে এই উভয় অংশ বাদ দিয়া কবিতাটীকে বেমালুম জোড়া দিয়া খাড়া করা হইয়াছে। এখন আর বুঝাই যায় না যে উহার অনেক খানি নাই !

এই কবিতাটী ফ্রান্সের কবি Jean La Fontaine এর যে কবিতাটীর আদর্শে রচিত এখানে তাহারই ইংরেজী অনুবাদটী উদ্ধৃত করিলাম। মধুর হাতে পড়িয়া কবিতাটীর মধুরতা বাড়িয়াছে কিনা. পাঠক তাহার বিচার করুন।

La Fontaine প্রণীত

Le Chine et le Rosean কবিতাটীর ইংরেজী অনুবাদ—

THE OAK AND THE RUSH,

The Oak said to the Rush (when oaks could talk)--
"Nature has dealt but hardly with you, friend ;
The wren's light weight sits heavy on your stalk –
The lightest breeze that for a moment's space
Ruffles the water's face,
Will make you bend :
While my grand crest like Caucasus up soars,
Baffles the high sun's scorching heat,
Braves every wind that roars :—
All blasts to you are storms—to me are zephyrs sweet.
Yet still, had you been born,
Within the circle of these branches vast,
Which round my trunk their sheltering shadows cast,
Your lot had not been so forlorn—
I should have screened you from the sweeping blast.
But you are wont to grow
Down in the marshes low,
The bleak dominions of the tyrant Wind .
Nature to you has been indeed unkind."
Then the Rush spake—
"Your pity shows a generous heart, 'tis true ;
But pray be not uneasy for my sake :
Storms are less dangerous to me than you—
I bend, but do not break.
You to this hour have held their force in check,
Nor ever bowed your neck
To any wind that blows—yet wait the end"
As the Rush spoke,
For the o'er the horizon's verge the tempest broke—
The fiercest of his sons the North could send.
The Oak bore stoutly up—the Rush bent low
Fiercer and fiercer raged the storm,
Nor would its wrath forego,
Till all uprooted lay the giant form,
Whose topmost branch had seemed to touch the sky,
Whose roots pierced down to where the dead men lie.

শ্রীদীননাথ সান্যাল

পথের দাবী*

(২৭)

শশী অতিশয়োক্তি করে নাই। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখা গেল খাদ্য-বস্তুর অত্যন্ত বাহুল্যে ঘরের দক্ষিণ ধারটা একেবারে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। ছোট বড় ডেক্‌চি, প্লেট, কাগজের ঠোঙা, মাটির বাসন পরিপূর্ণ করিয়া নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য সম্ভার দোকানদার ও হোটেল ওয়ালার দল নিজেদের রুচিও মর্জ্জি মত এপার হইতে ওপারে অবিশ্রাম সরবরাহ করিয়া স্তূপাকার করিয়াছে,—অভাব বা ত্রুটি কিছুরই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে কেবল সে গুলি উদরসাৎ করিবার লোকের! ডাক্তার ক্ষণকাল মাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোফা! তোফা! চমৎকার! শশী কি হিসেবী লোক দেখেচ ভারতী, কে কি খাবে না খাবে সমস্ত চিন্তা করে দেখেচে! বহুৎ আচ্ছা!

ভারতী অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, এবং শশী হাসিবার একটুখানি বিফল চেষ্টা করিল মাত্র। কোন দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়াও ডাক্তারের উল্লাস অকস্মাৎ অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গৃহস্থের জয় জয়কার হোক্‌,—শশী! কবি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী আর সহিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া সজল চক্ষে রুষ্ট দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মনের মধ্যে কি একটু দয়া-মায়াও নেই দাদা? কি কোর্‌চ বলত?

বাঃ! যাদের কল্যাণে আজ ভাল ভাল জিনিস পেট পুরে খাবো,—তাদের একটু আশীর্ব্বাদ—বাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী রাগ করিয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। মিনিট দুই তিন পরে শশী গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলে সে প্লেটে করিয়া মাংস, পোলাও ফল-মূল মিষ্টান্নাদি সযত্নে সাজাইয়া ডাক্তারের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কৃত্রিম কুপিতস্বরে কহিল, নাও, এবার দশ হাত বার করে রাক্ষসের মত খাও। হাসি বন্ধ হোক্‌, পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যাবে।

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা! উপাদেয় খাদ্য! এর স্বাদ গন্ধও ভুলে গেছি।

কথাটা ভারতীর বুকে গিয়ে বিঁধিল। তাহার সে রাত্রের শুক্‌না ভাত ও পোড়া-মাছের কথা মনে পড়িল।

ডাক্তার আহারে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন, কবিকে দিলেনা ভারতী?

এই যে দিচ্চি, এই বলিয়া সে প্লেট সাজাইয়া আনিয়া শশীর কাছে রাখিয়া দিয়া ডাক্তারের সম্মুখে বসিয়া বলিল, কিন্তু সমস্ত খেতে হবে দাদা, ফেল্‌তে পার্‌বে না।

নাঃ—কিন্তু, তুমি খাবেনা?

আমি ? কোন মেয়েমানুষ এ সব খেতে পারে দাদা ? তুমিই বল ?

কিন্তু রেঁধেছে যেন অমৃত !

ভারতী কহিল, এর চেয়ে ভাল অমৃত রেঁধে আমি রোজ রোজ তোমাকে খাওয়াতে পারি দাদা।

ডাক্তার বাঁ হাতটা নিজের কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, কি করবে দিদি অদৃষ্ট! যাকে খাওবার কথা সে এসব খাবেনা, যে খাবে, তাকে একদিনের ওপর দুদিন খাওয়াবার চেষ্টা করলেই সুখ্যাতিতে তোমার দেশ ভরে যাবে। ভগবানের এম্‌নি উল্টো বিচার! কি বল কবি, ঠিক না ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

এবার ভারতী নিজেও হাসিয়া ফেলিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, তোমার দুষ্টুমির জ্বালায় না হেসে পারা যায় না, কিন্তু এ তোমার ভারি অন্যায়। তার পরে পেট পুরে খেয়ে দেয়ে টাকার থলিটিও নিয়ে চলে যাবে না কি ?

ডাক্তার মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া কহিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয় ;—অর্দ্ধেকটাত গেছে নবতারার বাড়ী তৈরির খাতায়, বাকিটা কি রেখে যাবো অহমেদ-আবদুল্লা সাহেবের গাড়ি-জুড়ি কিন্‌তে ? তামাসা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করতে নেহাৎ মন্দ পরামর্শ দাওনি ভারতী। কি বল শশি ? হাঃ হাঃ হাঃ——

ভারতী বলিল, দাদা, তোমাকে হাসি ঠাট্টা করতে আগেও দেখেচি বটে কিন্তু এমন ক্ষ্যাপার মত হাস্‌তে আর কখনো দেখিনি।

ডাক্তার জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। ভারতী পুনশ্চ কহিল, নর-নারীর ভালবাসা কি তোমারি মত সকলের উপহাসের বস্তু, দাদা, যে তাসের ছক্কা-পঞ্জা হারার মত এর হার-জিতে অট্টহাসি করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই ? স্বাধীনতা পরাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যথা পাবার কি দুনিয়ায় কিছুই তুমি ভাব্‌তে পার্‌বে না ? দেখ ত একবার শশীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ? একটা বেলার মধ্যে উনি কি হয়ে গেছেন ? অপূর্ব্ব বাবু যখন চলে গেলেন, সেদিন আমাকে উপলক্ষ করেও হয়ত তুমি এম্‌নি করেই হেসেছ।

না, না, সে হল——

ভারতী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না বলছো কিসের জন্যে দাদা ? শশীবাবু তোমার স্নেহের পাত্র, তুমি এই ভেবেই খুসি হয়ে উঠেছ যে নির্ব্বোধ-তাঁকে ফাঁদের মধ্যে ফেলে নবতারা অনেক দুঃখ দিত। ভবিষ্যতের সেই দুঃখের হাত থেকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎই কি মানুষের সব দাদা ? আজকের এই একটি মাত্র দিন যে ব্যথার ভারে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎকে ডিঙিয়ে গেল এ তুমি কি করে জান্‌বে বল ? তুমি ত কখনো ভালোবাসোনি !

শশী অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কোন মতে বলিতে চাহিল যে তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুল, সাংসারিক সাধারণ বুদ্ধি না থাকার জন্যই—

ভারতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, লজ্জা কিসের শশিবাবু? এ ভুল কি সংসারে একা আপনিই করেছেন? আপনার শতগুণ ভুল আমি করিনি? তারও সহস্রগুণ বেশি ভুল করে যে দুর্ভাগিনী নিঃশব্দে এ দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে তাকে কি ডাক্তার চেনেন না? নবতারা ঠকিয়েছে? ঠকাক্ না। তবু ত আমাদেরই বঞ্চনার গান গেয়ে জগতের অর্দ্ধেক কাব্য অমর হয়ে আছে।

ডাক্তার বিস্মিতচক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু ভারতী গ্রাহ্য করিলনা। বলিতে লাগিল, শশিবাবু, সাংসারিক বুদ্ধি আপনার কম? কিন্তু আমার ত কম ছিলনা? সুমিত্রা দিদির বুদ্ধির তুলনাই হয়না। অথচ, কিছুই ত কারও কাজে লাগেনি। এ শুধু পরাভূত হল, দাদা, তোমার বুদ্ধির কাছে। যে চিরদিন অজেয়, পথ যার কখনো বাধা পায়নি, সেও তোমারই পাষাণ-দ্বারে কেবল আছাড় খেয়ে খান্ খান্ হয়ে পড়ে গেল,—প্রবেশ করবার এতটুকু পথ পেলেনা।

ডাক্তার এ অভিযোগের উত্তর দিলেন না, শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভারতী বলিল, শশিবাবু, আমি আপনার প্রতি মহা অপরাধ করেছি, আজ তার ক্ষমা চাই——

শশী বুঝিতে পারিলনা, কিন্তু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ভারতী নিমেষ মাত্র মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, একদিন দাদার কাছে বলেছিলাম, কোন মেয়ে মানুষেই কোনদিন আপনাকে ভালবাস্‌তে পারেনা। সেদিন আপনাকে আমি চিনিনি। আজ মনে হচ্চে অপূর্ব্ব বাবুকে যে ভালবেসেছিল সে আপনাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতো। সবাই আপনাকে উপেক্ষা করে এসেছে, শুধু একটি লোক করেনি, সে এই ডাক্তার।

ডাক্তার অধোমুখে এক টুক্‌রা মাংস হইতে হাড় পৃথক করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, মুখ তুলিবার অবকাশ পাইলেন না। ভারতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দাদা, মানুষকে চিনে নিতে তোমার ভুল হয়না, তাই সেদিন দুঃখ করে আমার কাছে বলেছিলে শশী যদি আর কাউকে ভালবাস্‌ত! কিন্তু একটা দিনও কি তুমি আমাকে সাবধান করে বলে দিতে পারতেনা, ভারতী, এতবড় ভুল তুমি কোরোনা! পুরুষের দুই আদর্শ তোমরা দুজনে আমার সুমুখে বসে,—আজ আমার বিতৃষ্ণার আর অবধি নেই!

ডাক্তার মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপূর্ব্ব কি বল্‌লে শশি?

জবাব দিল ভারতী। কহিল, মা পীড়িত। চিকিৎসার প্রয়োজন, অতএব, টাকা চাই। ফিরে এসে লুকিয়ে গোলামি করলে কেউ জান্‌তে পারবেনা। ভয় তলওয়ারকরকে, ভয় ব্রজেন্দ্রকে।

কিন্তু, কাকা পুলিশ কর্ম্মচারী,—সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে দাদা। তুমি আমিও বোধ হয় এখন আর বাদ যাবোনা। ক্ষুদ্র! লোভী! সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ভীরু! ছি!

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, যথার্থ ভাল না বাস্‌লে এমন প্রাণ খুলে যশোগান করা যায়না। কবি, এবার তোমার পালা। বাগেদবীকে স্মরণ করে তুমি এবার নবতারার গুণকীর্ত্তন সুরু কর,—আমরা অবহিত হই!

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, দাদা, তুমি আমাকে তিরস্কার করলে?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে হয়ত।

অভিমানে, ব্যথায়, ক্রোধে ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি কখ্খনো আমাকে বক্‌তে পাবেনা। ভেবেছ, সবাই শশীবাবুর মত মুখ বুজে সইতে পারে? তুমি কি জানো কি হয় মানুষের! উচ্ছ্বসিত বেদনায় কণ্ঠস্বর তাহার অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, তিনি ফিরে এসেছেন, এবার আমাকে তুমি কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও দাদা,—আমি এ কোন্ দুর্ভাগার পায়ে আমার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছি! বলিতে বলিতেই মেঝের উপর মাথা লুটাইয়া ভারতী ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল।

ডাক্তার স্মিতমুখে নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্বিকার ভাব দেখিয়া মনে হয়না যে, এই সকল প্রণয় উচ্ছ্বাস তাঁহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিয়াছে। মিনিট পাঁচ সাত পরে ভারতী উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া চোখ মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আর তোমাদের কিছু দেব?

ডাক্তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে কিছু ছাঁদা বেঁধে দাও, দিন দুই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ময়লা রুমালটা ফিরাইয়া দিয়া ভারতী খোঁজ করিয়া একখানা ধোয়া তোয়ালে বাহির করিল, এবং রকমারি খাদ্যবস্তুর একটি পুঁটলি বাঁধিয়া ডাক্তারের পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এই ত হল বামুনের ছেলের ছাঁদা। আর ঐ টাকার ছোট্ট থলিটি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ওটি হল বামুনের ছেলের ভোজন দক্ষিণা।

ভারতী বলিল, অর্থাৎ তুচ্ছ বিবাহ ব্যাপারটা ছাড়া আসল দরকারি কাজগুলো সমস্তই নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হল।

অকস্মাৎ, হাঃ হাঃ—করিয়া আরম্ভ করিয়াই ডাক্তার সজোরে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসি থামাইলেন, গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কি যে ভগবানের অভিশাপ, ভারতী, হাস্‌তে গেলেই মুখ দিয়ে আমার অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু বার হতেই চায়না। অট্ট-কান্না কাঁদবার জন্যে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে এলে আজ মুখ দেখানোই ভার হোতো।

দাদা, আবার জ্বালাতন কোরচ?

জ্বালাতন করচি ? আমি ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করচি।

ভারতী রাগ করিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইল, জবাব দিলনা।

শশী বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে কথা কহিল। অকস্মাৎ অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, আপনি যদি রাগ না করেন ত একটা কথা বল্‌তে পারি। কেউ কেউ ভয়ানক সন্দেহ করে যে, আপনার সঙ্গেই একদিন ভারতীর বিবাহ হবে।

ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, বল কি হে শশি, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, এমন সুদিন কি কখনো এতবড় দুর্ভাগার অদৃষ্টে হবে ? এ যে স্বপ্নের অতীত, কবি !

শশী কহিল, কিন্তু অনেকে ত তাই ভাবেন।

ডাক্তার কহিলেন, হায় ! হায় ! অনেকে না ভেবে যদি একটি মাত্র লোক একটি পলকের জন্যও ভাব্‌তেন !

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভাগার ভাগ্য ত একটি পলকেই বদ্‌লাতে পারে দাদা। তুমি হুকুম করে যদি বল, ভারতী, কালই আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে, আমি তোমার দিব্যি করে বল্‌চি, বোলব না যে আর একটা দিন সবুর কর।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব বেচারা যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ফিরে এল, তার উপায়টা কি হবে ?

ভারতী বলিল, তাঁর কনে বৌ দেশে মজুদ আছে, তাঁর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি বুক ফেটে মারা যাবেন না।

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাও, তোমার ভরসা ত কম নয় ভারতী !

ভারতী কহিল, তোমার হাতে পোড়'ব তার আর ভয়টা কিসের ?

ডাক্তার শশীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, শুনে রেখো কবি। ভবিষ্যতে যদি অস্বীকার করে তোমাকে সাক্ষি দিতে হবে।

ভারতী বলিল, কাউকে সাক্ষি দিতে হবে না দাদা, আমি তোমার নাম দিয়ে এত বড় শপথ কখনো অস্বীকার কোরব না। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়।

ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা দেখে নেবো তখন।

দেখো। এই বলিয়া ভারতী হাসিয়া কহিল, দাদা, আমিই বা কি, আর সুমিত্রাই বা কি,—স্বর্গের ইন্দ্রদেব যদি উর্ব্বশী মেনকা রম্ভাকে ডেকে বল্‌তেন সেকালের মুনি ঋষিদের বদলে তোমাদের একালের সব্যসাচীর তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে ত আমি নিশ্চয় বল্‌চি দাদা, মুখে কালি মেখে তাঁদের ফিরে যেতে হোতো। রক্ত-মাংসের হৃদয় জয় করা যায়, কিন্তু পাথরের

সঙ্গে কি লড়াই চলে! পরাধীনতার আগুনে পুড়ে সমস্ত বুক তোমার একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে!

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ভারতীর দুই চক্ষু শ্রদ্ধা ও স্নেহে অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কহিল, এ বিশ্বাস না থাকলে কি দাদা, এমন কোরে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম? আমি ত নবতারা নই। আমি জানি, আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে,—কিন্তু এ জীবনে সংশোধনের পথও আর নেই। একদিনের জন্যেও যাঁকে মনে মনে—

ভারতীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দাদা, ফেরবার সময় হয়নি? ভাঁটার দেরি কত?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখনো দেরি আছে বোন্। তাহার পরে ধীরে,ধীরে ডান হাত বাড়াইয়া ভারতীর মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, আশ্চর্য্য! এত দুর্দ্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাঙ্লার খোয়া যায়নি। থাক্না নবতারা, তবু ত ভারতীও আমাদের আছে। শশি, সমস্ত পৃথিবীতে এর আর জোড়া মেলে না! এখানে সহস্র সব্যসাচীরও সাধ্য নেই তুচ্ছ অপূর্ব্বকে আড়াল করে দাঁড়ায়! ভাল কথা শশি, মদের বোতল কই?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী যেন কিছু লজ্জিত হইল, বলিল, কিনিনি ডাক্তার। ও আমি আর খাবো না।

ভারতী বলিল, তোমার মনে নেই দাদা, নবতারা ওঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন?

শশী তাহারই সায় দিয়া কহিল, সত্যিই নবতারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মদ আর খাবোনা। এ সত্য আমি ভাঙ্বোনা ডাক্তার।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, কিন্তু বাঁচ্বে কি করে শশি? মদ গেল, নবতারা গেল, যথা-সর্ব্বস্ব-বিক্রী-করা টাকা গেল, একসঙ্গে এত সইবে কেন?

শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ভারতী ব্যথা পাইল, কহিল, তামাসা করা সহজ দাদা, কিন্তু সত্যি সত্যি একবার ভেবে দেখ দিকি?

ডাক্তার বলিলেন, ভেবে দেখেই বল্‌চি ভারতী। এই টাকটার ওপরে যে শশীর কতখানি আশা ভরসা ছিল তা' আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। ওর পরিচিত এমন একটা লোকও নেই যে, এ বিবরণ শোনেনি। তার পরে এলো নবতারা। ছ সাতমাস ধরে সেই ছিল ওর ধ্যান-জ্ঞান্। আর মদ? সে তো শশীর সুখ দুঃখের একমাত্র সাথী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা' কিছু আনন্দ, যা কিন্তু সান্ত্বনা একদিনে একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যেন ওকে ত্যাগ করে গেল। তবু, কারও বিরুদ্ধে ওর বিদ্বেষ নেই. নালিশ নেই,—এমন কি আকাশের পানে চেয়ে একবার সজল চক্ষে বল্‌তে পারলে না যে, ভগবান! আমি কারও মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি সত্যির যদি ও ত তাদের ভাল কোরো!

ভারতীর মুখ দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কহিল, তাই তোমার এত স্নেহ।

ডাক্তার বলিলেন, শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধা। শশী সাধু লোক, সমস্ত অন্তরখানি যেন গঙ্গা-জলের মত শুদ্ধ, নির্ম্মল। ভারতী, আমি চলে গেলে বোন্, একে একটু দেখো। তোমার হাতেই শশীকে আমি দিয়ে গেলাম, ও দুঃখ পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবেনা।

শশী লজ্জা ও কুণ্ঠায় আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ করি কথার অভাবেই তিন জনেই নীরব হইয়া রহিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এখন থেকে কি করবে কবি? তোমার বাকি রইল ত কেবল ওই বেহালা খানি। আগের মত আবার দেশে দেশে বাজিয়ে বেড়াবে?

এবার শশী হাসিমুখে বলিল, আপনার কাজে আমাকে ভর্ত্তি করে নিন,—বাস্তবিকই আমি আর মদ খাবো না।

তাহার কথা এবং কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া ভারতী হাসিয়া ফেলিল। ডাক্তার নিজেও হাসিলেন, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, না, কবি, ওতে তোমার আর ভর্ত্তি হয়ে কাজ নেই। তুমি আমার এই বোন্‌টির কাছে থেকো, তাতেই আমার ঢের বড় কাজ হবে।

শশী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিল, আগে আমি কবিতা লিখতে পারতাম ডাক্তার,—হয়ত, এখনও পারি।

ডাক্তার খুসী হইয়া কহিলেন, তাও ত বটে। আর তাতেই যে আমার মস্ত কাজ হবে কবি।

শশী কহিল, আমি আবার আরম্ভ কোরব। চাষা ভূষা কুলি মজুরদের জন্যই এবার শুধু লিখ্‌ব।

কিন্তু তারা ত পড়তে জানেনা কবি?

শশী কহিল, নাই জান্‌লে, তবু তাদের জন্যেই আমি লিখ্‌বো।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, সেটা অস্বাভাবিক হবে, এবং অস্বাভাবিক জিনিস টিক্‌বেনা। অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা করা যাবেনা। তাদের সুখ দুঃখের বর্ণনা করার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোন দিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই করে নেবে,—নইলে, তোমার গলায় লাঙ্গলের গান লাঙ্গল-ধারীর গীতিকাব্য হয়ে উঠ্‌বেনা। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি কোরোনা, কবি।

শশী ঠিক বুঝিতে পারিলনা, সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবে আমি কি কোরব?

ডাক্তার বলিলেন, তুমি আমার বিপ্লবের গান কোরো। যেখানে জন্মেছ, যেখানে মানুষ হয়েছ, শুধু তাদেরই।—সেই শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্যেই।

ভারতী বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কহিল, দাদা, তুমিও জাত মানো? তোমার লক্ষ্যও সেই কেবল ভদ্র জাতির দিকে?

ডাক্তার বলিলেন, আমি ত বর্ণাশ্রমের কথা বলিনি, ভারতী সেই জোর-করা জাতিভেদের ইঙ্গিত ত আমি করিনি! সে বৈষম্য আমার নেই,—কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিতের জাতিভেদ, সে ত আমি না মেনে পারিনে! এইত সত্যকার জাতি,—এইত ভগবানের হাতে-গড়া সৃষ্টি! ক্রীশ্চান বলে কি তোমারে ঠেলে রাখতে পেরেছি দিদি? তোমার মত আপনার জন আমার কে আছে?

ভারতী শ্রদ্ধা-বিগলিত-চক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিন্তু তোমার বিপ্লবের গান ত শশীবাবুর মুখে সাজবেনা দাদা! তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির——

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, না, আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার পরেই থাক্ বোন্,—ও বোঝা বইবার মত জোর,—না না, সে থাক্,—সে শুধু আমার! এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল যেন আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। কহিলেন, তোমাকেত বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তা-রক্তি কাণ্ড নয়,—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন! রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,—সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান সুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন,—ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক্,—আর কিছু না পারো, শশি, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই—তারপরে থাক্ দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়! কে?

শশী কান খাড়া করিয়া বলিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ যেন——

ডাক্তার চক্ষের পলকে পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে অন্ধকার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ভারতী, সুমিত্রা আসছেন!

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণে

নূতন ভাবী লাট—নিয়ম ভাঙ্গিবার কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার শাসনের জন্য প্রতি পাঁচ বৎসরে এক-একজন বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আসিবেন ও হইয়া আসিতেছেন; এই নিয়মের চাকার পাকে লর্ড রেডিঙ্গ তাঁহার তক্ত ছাড়িবেন ও সেই তক্তে বসিবেন শ্রীযুক্ত উড্ মহোদয়। ১৭৫৭ হইতে এ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই উচ্চতম পদ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কীর্ত্তি বিশ্বের ইতিহাসে রক্ষা করিবার মত না হইলেও এদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি রক্ষিত হইবেই হইবে। তাঁহাদের সকলের নামের ছড়া বাঁধিয়া পাঠশালার বালকেরা ইতিহাস আবৃত্তি করিতে বাধ্য। লাটের পর লাটের পরিবর্ত্তনে আমরা ঋতুর পরিবর্ত্তনের মত বা সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তনের মত নূতন কিছু অনুভব করি না, তবুও প্রতি নিয়োগের সময়ে এক একবার করিয়া আমাদের ভাবী আশার কথা আলোচনা করিয়া থাকি।

কথা উঠিয়াছে, শ্রীযুক্ত রেডিঙ্গ বাহাদুর আইনের ন্যায় বিচারে দক্ষ ছিলেন, আর সেই দক্ষতা দেখাইবার মত সময়েই তিনি আসিয়াছিলেন; আবার এখন নাকি শান্তিতে চাষ আবাদ করিবার সময় আসিয়াছে, তাই চাষের বিদ্যায় পটু ভাবী লাটের আমলে এদেশের অনেক মঙ্গল হইবে। এ পাঁচ বৎসরে ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে যে "তৈলই" পাত্রের আধার; অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে কয়েকজন ইংরেজ আছেন ও আসেন তাঁহারাই ভারতবর্ষের আধার ও সেইজন্য এদেশ স্বরাজ পাইয়া প্রবাসীদিগকে শাসন করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত গান্ধিজি যখন আড়ির উদ্যোগ করিয়াছিলেন তখন ভাবিয়াছিলেন যে, লোকে যদি তাঁহার ন্যায় বিচারের অনুসরণ করিত তবে শাসন-ঘানিতে জোতা কর্ম্মচারীরা নাকি দাঁড়াইয়া ঘণ্টা নাড়িতে পারিতেন। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন বিলাতি কৌশলে চাষের কাজের পরিচালনা কিরূপ হইবে ও তাহার ফলে আমরা দুমুঠা বেশি খাইতে পাইব কি না, তাহা জানিতে পারিব ভবিষ্যতে। মানুষের হিসাবে আমরা অকপটে সকলের মঙ্গল কামনা করি; আমরা লর্ড রেডিঙ্গের মঙ্গল কামনা করিতেছি ও ভাবী লাটের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

নির্ব্বাসিতের বিচার—পঞ্জাবের যে গবর্ণরের আমলে জালিনওয়ালা বাগের কাণ্ডটি ঘটিয়াছিল, তিনি একখানি গ্রন্থে নাভার নির্ব্বাসিত রাজার প্রজাপীড়ন ও স্বেচ্ছায় রাজগি ত্যাগের কথা লিখিয়াছেন; সেই উক্তিগুলির বিরুদ্ধে পদচ্যুত রাজা যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতি পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কিনা, জানিনা। রাজা লিখিয়াছেন, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন নাই, আর তিনি যে প্রজাপীড়ন না করিয়া প্রজাদিগকে সুখেই রাখিয়াছিলেন, তাহাও দৃঢ়ভাবে লিখিয়াছেন। প্রজাদের এজাহার নিলেই যখন সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তখন গবর্ণমেণ্ট তাহা করিবেন না কেন? তবে গোপনে আফিসি অনুসন্ধানে গবর্ণমেণ্ট যাহা করেন, কিছুতেই সে বিষয়ের প্রকাশ্য বিচার করেন না। যে কাজে মানুষের মনে খট্‌কা বাধে ও ভক্তির লাঘব হয়, সে কাজ যে কিরূপে রাজনীতির অনুকূল হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

নির্ব্বাসিত সুভাষচন্দ্র বসু অতি গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া অনেকবার গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে আভাস পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু অতি দৃঢ়ভাবে যখন এদেশের লোক বারে বারে তাঁহার প্রকাশ্য বিচার চাহিতেছেন, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য বিচারে লোক সাধারণের কাছে সপ্রমাণ করিলেই ভাল হয় যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহা ন্যায় বিচারেই করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে সত্য কথা কহিতে সাক্ষীরা যে কেন ভয় পাইবে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। গবর্ণমেণ্ট সকল চোর ডাকাতকে শাসন করিতে পারেন, সকল বিদ্রোহের উদ্যোগ পায়ে দলিয়া সারা দেশের মাথা বাঁচাইতে পারেন, আর জন কতক সত্যবাদী সাক্ষীর মাথা বাঁচাইতে পারিবেন না, ইহা ত আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কলিকাতা করপোরেশনের মত দেশমান্য সভা সুভাষচন্দ্রকে প্রকাশ্যে বিচার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ

করিয়াছেন; এরূপ অনুরোধ বারে বারে উপেক্ষিত হইলে দেশের লোকে বড় ব্যথিত হইবে। আমরা অনুরোধ করি, যে নিজের হাতে সন্দেহের অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেন নিজেকে আবৃত ও কলঙ্কিত না করেন। আমরা দুইজন নির্ব্বাসিতের কথা বলিলাম; বিনা প্রকাশ্য বিচারে নির্ব্বাসিত সকলের সম্বন্ধেই আমাদের একই কথা,—একই অনুরোধ।

রাষ্ট্র-পরিচালনের ক্ষমতা—বড় ব্যবস্থাপক সভার আগেকার সভাপতি সার ফ্রেডরিক্ হোয়াইট্ এদেশের লোকের রাষ্ট্র পরিচালনের ক্ষমতার আলোচনা করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় বক্তৃতা করিয়াছেন ও তাঁহার পূর্ণ মন্তব্য বিলাতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। হোয়াইট্ মহোদয় একজন যোগ্য ব্যক্তি; তবে তাঁহার উক্তিতে এমন কোন নূতন কথা নাই, যাহা আমরা বার বার রাজপুরুষদের মুখে শুনিয়া পরিশ্রান্ত হই নাই। হোয়াইটের মত ব্যক্তি নূতন করিয়া পুরাণ কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উক্তির আলোচনা চলিতেছে। এদেশের শিক্ষিতেরা ইংরেজি পড়িয়া ও ইংরেজের শাসন-পদ্ধতি দেখিয়া যদি স্বরাজ গড়িবার জন্য প্রয়াসী হইয়া থাকে তবে তাহাতে ক্ষতি কি হইল? কাহার সাহায্যে ও কি উপায়ে একজনের বুদ্ধি ফুটিল সে ইতিহাস দিয়া বিচার করা চলেনা যে, নূতন বুদ্ধিতে একজন লোক যাহা বলিতেছে বা চাহিতেছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত কি না। আমি আগে যাহা বুঝি নাই তাহা যদি ইংরেজের সাহায্যে বুঝিয়া থাকি, তবে ইংরেজেরা সে কথার খোঁটা দিয়া আমাকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন কিরূপে? বুদ্ধির জন্মের ইতিহাস যাহাই হউক, আমার বুদ্ধিটুকু সুবুদ্ধি কিনা, তাহাই একমাত্র বিচার্য্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, রাষ্ট্র পরিচালনার যে পদ্ধতি এদেশে চলিতেছে ও যাহাকে উন্নততর করিয়া আমরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি, তাহার জন্মস্থান ইয়োরোপে; যাহার জন্মস্থান ভারতে নয়, তাহা সহজে ভারতের মাটিতে বাড়িতে পারে না। কথাটি হঠাৎ যত মূল্যবান্ মনে হয়, উহা সেরূপ মূল্যবান্ নয়। ভারতে বিদেশীয়দের অধিকার স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে ইয়োরোপীয় ধরণের শাসন পদ্ধতির জন্ম হইতে পারে নাই; সে বিবরণ দিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি ইতিহাস লিখিতে হয়। মুসলমান অধিকারের সময়ে রাজা ও রাজ-পুরুষেরা এদেশের অধিবাসী হইয়াছিলেন,—বিদেশের স্বার্থের চাপে এদেশ শাসিত হইতনা। তাহা ছাড়া সে সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যে বিদেশের সংঘর্ষ হয় নাই ও বহু জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেশরক্ষার নীতি রচিতে হয় নাই। বিনা প্রয়োজনে কোন পদ্ধতির বা নীতির জন্ম হয় না। এখন ইংরেজের অধিকারে যে সকল রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমরা তাহা উল্টাইয়া দিতে পারি না; এখন নূতন অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া আপনাদের স্থিতি বজায় রাখিবার উদ্যোগ করিতে হইবে। ইংরেজ যে শাসন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত, তাহাই যখন রাজা হইয়া চালাইতেছেন ও চালাইবেন, তখন সে পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইয়াই আমাদের পদ্ধতি গড়িতে হইবে। আমাদের প্রয়োজনে ও

স্বার্থে এই পদ্ধতিকে আয়ত্ত করিতে হইতেছে। ঐ পদ্ধতি অতি ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে বাড়িয়াছিল বলিয়াই যে এদেশের লোকে উহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবেনা, ইহা ঠিক কথা নয়। আমাদের এখন কোন পদ্ধতিই নাই, কারণ আমরা পরাধীন; কাজেই কোন প্রাচীন পদ্ধতি উপড়াইয়া তুলিয়া আমাদিগকে নূতন পদ্ধতি বসাইতে হইবে না। যাহা স্বার্থের জন্য চাই, তাহা লোকে প্রাণের টানে লইয়া সহজেই অভ্যাসের বশে আনিতে পারে।

একটি জাতি বহু পুরুষের ও বহু যুগের সাধনায় ধীরে ধীরে বর্ণমালার আবিষ্কার করিতে পারে, আর একটি বর্ব্বর জাতি আবিষ্কারকদের সকল সাধনার অভিনয় না করিয়া একেবারেই উহা আয়ত্ত করিতে পারে। স্বার্থের ও প্রয়োজনের টান জন্মিলেই অতি দুরূহ বিষয় সহজে অভ্যস্ত হয়। পশ্চিম দেশে বর্দ্ধিত পদ্ধতি পূর্ব্বদেশে বাড়িতে পারে না বলিয়া যাহা শুনি, তাহার অধিকাংশ স্থলেই রূপক-অলঙ্কারের ধাঁধা থাকে,—মূলে কিছু সত্য থাকে না।

শোক-সংবাদ—যাঁহার স্মৃতিতে আমরা অল্প দু-চারিটি কথা লিখিতেছি, তিনি শিল্পী ও সাহিত্যিক গোকুলচন্দ্র নাগ। গত ৮ই আশ্বিনে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল সবে একত্রিশ বৎসর। এ বয়সের মধ্যে গোকুলচন্দ্র প্রভূত খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার চিত্র-শিল্পের ও সাহিত্যিক প্রতিভার যৎটুকু নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এদেশে বিশেষ আদৃত হইবে, বিশ্বাস করি। এদেশের বালক-বালিকাদের পড়ার উপযোগী করিয়া তিনি অতি সুকৌশলে কবি টেনিসনের Princess ও মেতারলিঙ্কের Blue Bird এর তর্জ্জমা করিয়াছিলেন; প্রথম বইখানির নাম 'রাজকন্যা' ও দ্বিতীয় খানির নাম 'পরীস্থান'। এই বই দুইখানি (বিশেষভাবে পরীস্থান-খানি) বালকদের পক্ষে যে শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর, তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। ইঁহার "সোনার ফুল" গল্পটি বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, আর ইঁহার "পথিক" নামক সুন্দর উপন্যাসখানি যে সময়ে বঙ্গবাণীতে সমালোচিত হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গোকুলচন্দ্র "কল্লোল" পত্রের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন ও সেই পত্রে জগদ্বিখ্যাত রোঁলার অতি প্রসিদ্ধ John Christopher বইখানির অনুবাদ প্রকাশ করিতেছিলেন,—আর এখনও উহা সেই পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। আশা করি আমাদের সাহিত্য এই ক্ষমতাশালী, সচ্চরিত্র অবিবাহিত যুবকের স্মৃতি বহন করিবে।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.



বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

পৌষ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৫ম সংখ্যা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে নারীজাতি সম্পর্কে আন্দোলন

ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে নারীজাতির উন্নতি সম্পর্কে একটা আন্দোলন হইয়াছিল। সেই আন্দোলনের এক অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, পরিবার ও সমাজের মধ্যে নারীজাতি কিরূপ ব্যবহার পাইতেন,—কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের অধিকার ছিল, এবং কোন কোন বিষয়ে ছিল না—, পুরুষজাতি সাধারণভাবে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল,—তাহার একটা আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে যদি নারীসমাজে বা এমন কি নারী-চরিত্রে কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, কোন কোন আচার যদি পরিহার করা কর্ত্তব্য মনে হয়, কোন কোন ব্যবহার যদি পরিবর্ত্তন করা সৎযুক্তি হয়, তবে বুঝিতে হইবে, পরিহার ও পরিবর্ত্তনযোগ্য সেই সমস্ত আচার-ব্যবহার নারী-সমাজে একদিনে দেখা দেয় নাই। ইতিহাসের পথে, সমাজের উন্নতি বা অবনতি মুখে সেই সমস্ত আচার-ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বিকাশ ও বিস্তারলাভ করিয়াছে

পরিবার ও সমাজে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের নারীজাতির অবস্থা।

এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত বিকাশমান আচার-ব্যবহার আমাদের দেশের নারী চরিত্রকে,—ভাল ও মন্দ দুই দিকেই একটা বৈশিষ্ট্য দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

আমি ষোড়শ শতাব্দীর কথা এইজন্য তুলিলাম যে এই শতাব্দী হইতেই নব্য-ন্যায়, নব্য-স্মৃতি, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের নব কলেবর নব রূপান্তরে দেখা দেয়। বিশেষতঃ এই শতাব্দীর রাজনীতি ক্ষেত্রে দিল্লীর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বাঙ্গলার ভূঞা-জমীদারগণের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ও বিশেষভাবে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহার সর্ব্বশেষ স্ফুলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী এই যুগের সাহিত্য। বস্তুতঃ বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের মধ্যে এই শতাব্দীতে পুরাতনের ভিত্তির উপর, একটা নূতন বাঙ্গালী-সভ্যতার পত্তন হয়। সভ্যতার এই পুনর্গঠন কালে বিশেষতঃ—আচার-ব্যবহার-সংক্রান্ত স্মৃতি-শাস্ত্রের দিক হইতে নারীজাতি সম্পর্কেও একটা পরিবর্ত্তন ও সংস্কার স্বভাবতঃই হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম রঘুনন্দনের স্মৃতির দিক হইতেই আমরা পরিবার ও সমাজের মধ্যে এবং বিবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম সংক্রান্ত আচারে ও সম্পত্তির উপর অধিকারে এই শতাব্দীর নারীজাতি কিরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠ তাহাই লক্ষ্য করিব।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার উপকরণ।

রঘুনন্দন, সাধারণতঃ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য এই নামে খ্যাত। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। ত্রয়োদশ হইতে তিন শতাব্দী বাঙ্গালী-হিন্দু, পাঠান-মুসলমানের অধীনে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল। প্রতিবাসী বৌদ্ধগণও তখন লুপ্ত বা এমন কি হীনবল হয় নাই। বৌদ্ধ ও মুসলমানের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মে কর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে যে পরিবর্ত্তন আসিয়া দেখা দিল, সেই শিথিলতা দূর করিয়া ও পরিবর্ত্তনমুখে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য রঘুনন্দন বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামে এক সুবৃহৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্মৃতির মীমাংসা গ্রন্থ উপঢৌকন দিয়া যান। ব্যবহারের দিকে—অর্থাৎ দায়ভাগ সম্পর্কে—নারীজাতির অধিকার নির্ণয়ে রঘুনন্দন তাঁহার পূর্ব্বগামী জীমূতবাহন অপেক্ষা কোন মতেই উদারতা দেখান নাই। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা অপেক্ষা জীমূতবাহনের দায়ভাগ—পরিবার মধ্যে বিষয়-সম্পত্তির অধিকার নির্ণয়ে ও ভাগ বণ্টন সম্পর্কে পুরুষের ব্যক্তিত্বকে অধিকতর প্রসারতা দিয়াছে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে একান্নবর্ত্তী পরিবারের নিষ্পেষণ হইতে অনেক রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু কি জীমূতবাহন কিংবা রঘুনন্দন পুরুষের ব্যক্তিত্বের বিস্তার ও পরিপুষ্টির জন্য বিষয় অধিকারে যে স্বাধীনতাকে বাঙ্গালী সমাজে আহ্বান করিলেন, নারীজাতির ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার জন্য তাহা করিলেন না। কিন্তু এই সম্পর্কে আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে জীমূতবাহন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। ঐ সুদূরবর্ত্তী কালে কেবল বাঙ্গালী কেন মধ্যযুগের সমকালীন ও তাহার কিঞ্চিৎ পরে, পৃথিবীর কোন সুসভ্য জাতিই ব্যবহার শাস্ত্রে নারীর অধিকারকে বিশেষ উচ্চ স্থান

রঘুনন্দন।

দায়ভাগে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকার, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল।

দেয় নাই। অবশ্য প্রাচীনযুগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিতে নারীজাতির বিষয় সম্পত্তির উপর অধিকার ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সুতরাং আপনারা দেখিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য বিষয় অধিকারে, নারীজাতিকে কোন নূতন অধিকার দিলেন না। এমন কি, স্মৃতি শাস্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ মীমাংসক বলিয়া ইতিহাসে এত বড় পরিচয় যাঁহার, তিনি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণ করিয়াও নারীজাতির অধিকার কিঞ্চিন্মাত্রও বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। নারীজাতির একটা পৃথক অস্তিত্ব, তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্ব্বপ্রথমে যে পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির উপর তাঁহাদের একটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি স্বীকার করিলেন না। সম্ভবতঃ এমন একটা ধারণা তখন ছিল, বা এখনও যে একেবারে নাই তাহা নহে, যে সকল অবস্থাতেই নারীজাতি পুরুষের অধীন হইয়া বাস করিলেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। পুরুষনিরপেক্ষ তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব তখন কল্পনায় আসিত না। এইরূপ একটা ধারণা বা কারণ ব্যতিরেকে চতুর্দ্দশ বা ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি,—প্রাচীন স্মৃতি অমান্য করিয়া নারীজাতির বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকারকে এত অধিক খর্ব্ব করিতে পারিত না।

চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি প্রাচীন স্মৃতি অমান্য করিয়া নারীজাতির অধিকার খর্ব্ব করিয়াছে।

রঘুনন্দনের স্মৃতির তিনটি ভাগ—আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। ব্যবহার-ভাগে নারীজাতির কি স্থান তাহা দেখিলেন। এখন আচার বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে রঘুনন্দনীয় স্নান দান ব্রত উপবাস দেবপ্রতিষ্ঠা দীক্ষা আহ্নিক মঠ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের কোন এক তত্ত্বই বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে এত সহজে প্রচারিত হইয়া এবং এত দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত না, যদি নারীজাতি ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ ও বহন না করিত। ইহা নারীচরিত্রের একটা বিশেষত্ব। বিশেষতঃ নারীজাতি সম্পর্কে কোন কোন আচারকে রঘুনন্দন পরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া আরো অধিক কঠোর করিয়া ফেলিলেন। এই সমস্ত আচার ধর্ম্মের সহিত বিধিবদ্ধ হওয়ায় এবং নারীজাতির স্বভাবে রক্ষণশীলতা মূলক অন্ধ ধর্ম্মভাব প্রবল থাকায় ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙ্গালী হিন্দুনারীগণ এই আচারগুলিকে যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছেন। আচার পুরুষদের অপেক্ষা নারীগণই অধিক পালন করেন। তবে আচার পালনে নারী-ভাবাপন্ন পুরুষ যে না আছে তাহা নয়। আর আচার লঙ্ঘনে পুরুষভাবাপন্ন নারীও যে না আছে, তাহাও নয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে স্বভাবতঃ পুরুষ অনাচারী, আর নারী আচারী। গতিশীল সমাজের পরিবর্ত্তন মুখে যখন নারীগণও পুরুষের মত অনাচারী হইতে আরম্ভ করেন, তখন সমাজ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই বিপ্লবের স্বাভাবিক কারণ আছে, ভাল মন্দ দুইটা দিকও আছে।

এখন দেখিতে হইবে রঘুনন্দন কোন কোন আচারকে কঠোর করিলেন, আর কোন কোন আচারকে শিথিল করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তখন নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে সিদ্ধ চাউল, মৎস্য ও মশুর

ডাইল খাইত দেখিয়া, রঘুনন্দন ইহার ব্যবস্থা দিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি অনিবার্য্য যুগ প্রয়োজনে আচারকে শিথিল করিলেন। আবার প্রাচীন মতে, যতক্ষণ একাদশী তিথি থাকিত, ততক্ষণ উপবাস করিলেই একাদশী পালন করা হইত। রঘুনন্দন এই প্রথা রহিত করিয়া বিধি দিলেন যে একটা গোটা দিন ও রাত্রি উপবাস করিতে হইবে। প্রাচীনমতে, নিয়ম ছিল,—বিধবাগণ অল্পবয়স্কা, অসুস্থা বা রুগ্না হইলে এবং একাদশীর উপবাসে অসমর্থ হইলে, অনুকল্প করিতে পারিতেন। রঘুনন্দন বিধবার পক্ষে কোন অবস্থাতেই অনুকল্পের বিধি দিলেন না। এইখানে তিনি আচারকে কঠোর হইতে কঠোরতর করিলেন।

পুরুষ ও নারী সম্পর্কে আচারের সংস্কারে পার্থক্য।

যেমন বিষয় সম্পত্তির অধিকারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকার, প্রাচীন স্মৃতি হইতে রঘুনন্দনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তেমনি আচার সম্পর্কেও পুরুষের পক্ষে কোন কোন আচার শিথিল হইয়া, নারীজাতি সম্পর্কে কোন কোন আচার কঠোর হইয়াছে। কাশীরাম বাচস্পতি ও রাধামোহন গোস্বামী রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দুইখানি টীকা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত টীকাকারগণও আমাদিগকে সুস্পষ্ট বুঝাইতে পারেন নাই যে, ষোড়শ শতাব্দীর কোন্ বিশেষ যুগ-প্রয়োজনে বাঙ্গলার হিন্দুনারীগণের অধিকার, কি দায়ভাগে বা কি আচার ও প্রায়শ্চিত্তে অর্থাৎ পরিবার ও সমাজে, এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। এই ব্যবস্থা ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের বা স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল হইতে পারে নাই। আমি এই সম্পর্কে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি আবারও তাহাই বলিতেছি যে পুরুষনিরপেক্ষ রমণীর কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতার কথা, জাতীয় চিন্তায় তখন স্থান পায় নাই।

এই ষোড়শ শতাব্দীয় স্মৃতির ব্যবস্থার উপরেই বাঙ্গালী হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি। এবং এই ব্যবস্থাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। নারী-জাতির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের ধারার মধ্য দিয়া অনুসরণ করিতে হইলে এই স্মৃতির ব্যবস্থাই অবলম্বন। এই মধ্যযুগের স্মৃতির মধ্যে নারীজাতি সম্পর্কে বাল্যবিবাহ আছে, সহমরণ আছে, বিধবার পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, অবরোধ-প্রথা আছে, স্ত্রীশিক্ষার সম্যক অভাব আছে, আর পুরুষের বহু বিবাহও আছে, অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নারীজাতি সম্পর্কে সংস্কারের জন্য যে সমস্ত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যে সমস্ত আচার জাতীয় উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার সমস্ত গুলিরই মূল ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতিতে ও সামাজিক জীবনে পাওয়া যায়। ক্রমে এই সমস্ত আচার পরিবর্ত্তন মুখে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নারীজাতির অধিকারকে এতদূর ক্ষুণ্ণ করে যে পুনরায় রাজা রামমোহন নারীজাতির অবস্থার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। নারীজাতির অবস্থার উন্নতিকল্পে, তিনি পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

এতক্ষণ স্মৃতির কথাই হইল। স্মৃতি কেবল গার্হস্থ্য অর্থাৎ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকেই নিয়মিত করে। কিন্তু গার্হস্থ্যের বাহিরেও ষোড়শ শতাব্দীতে, নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেবল গৃহীর জন্য ছিল না। গৃহত্যাগী স্মৃতির সম্যক শাসনের বাহিরের নরনারীর জন্যও শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছিল। বাঙ্গলার লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম এই কাল হইতেই বিশেষ করিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবরণে, সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীকে অবলম্বন করিয়া গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করিল। বীরাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ে একশ্রেণীর নারী ভৈরবীরূপে আবির্ভূত হইল। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের মধ্যেও একশ্রেণীর নারী পরকীয়া সাধনার অন্তর্ভূত হইয়া দেখা দিল। গৃহস্থের নিকট এই সমস্ত রমণীগণ অশ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন না। বরং ধর্ম্মের আবরণে তাঁহারা বিশেষরূপেই শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার মৃতচিতা-ভস্ম এই সমস্ত সাধকদের মধ্যে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উপঢৌকন দিয়া অন্তর্হিত হইল। কালক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের, যথাক্রমে বীরাচারী ও সহজিয়া সাধকগণ নরনারী সম্পর্কে, নারীজাতিকে গৃহস্থাশ্রমের বাহিরে ধর্ম্মের ও এক প্রকার স্বাধীনতার আবরণে লালসাবদ্ধ মূঢ়তায় ও জড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে পরিবার ও সমাজের বাহিরে, নারীজাতির স্থান।

স্মৃতির কঠোর বন্ধনের ও গৃহস্থাশ্রমের বাহিরে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে নারীগণ যে একটা অবাধমুক্ত স্বাধীনতা পাইত, তাহাই তাহাদিগকে অধিক আকর্ষণ করিত। শাক্তের "মাতৃভাব"—ও বৈষ্ণবের "কান্তভাব," আধ্যাত্মিক দিক হইতে বড় জিনিষ হইলেও—ইহা অবনতির মুখে নারীর স্বাধীনতাকে অজ্ঞানতায় ও স্বেচ্ছাচারিতায় পঙ্কিল করিয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নারীজাতি সম্পর্কে ইহারও সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল। শুধু দায়ভাগে নয়, এক্ষেত্রেও রাজা রামমোহন সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী ১৮০০—১৮২৫ খৃঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর চারি ভাগের প্রথম ভাগেই যে সংস্কার স্রোত দেখা দেয়,—সেই স্রোতাবর্ত্তে চারিটি ধারার কথা আমি প্রথম বক্তৃতাতেই বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছি। এই চারিটি ধারা যথাক্রমে, (১) শ্রীরামপুরের পাদরীদের খৃষ্টানী সংস্কার ধারা, (২) হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট ডিরোজীও ধারা, (৩) রাজা রামমোহনী ধারা এবং (৪) সার রাধাকান্ত দেবের রক্ষণশীল ধারা। এই চারিটি ধারাকে ভিত্তি করিয়া এই অত্যল্প কাল মধ্যে, বাঙ্গলা দেশে নারীজাতির উন্নতির জন্য কি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়—তাহাই অগ্রে দেখিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংস্কার-ক্ষেত্রে ৪টি বিভিন্ন ধারা।

আপনারা জানেন—আমাদের বিধবাগণ মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে—মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায়

প্রবেশপূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন। এই সহমরণ প্রথা, লর্ড বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে, ১৮২৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে রাজবিধি দ্বারা রহিত করা হয়। কিন্তু এই সতীদাহ নিবারণ কল্পে যে আন্দোলন হয় তাহা এই প্রথা রহিত হইবার পূর্ব্বে প্রায় ২৫ বৎসরের পরিশ্রমের ফল। একদিনে বা বিনা আপত্তিতে এই প্রথা রহিত হয় নাই। নারীজাতি সম্পর্কে সমগ্র শতাব্দীতে এই সতীদাহ নিবারণই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। এই সংস্কারের সঙ্গে রাজা রামমোহনের নাম চিরকাল ইতিহাস সোনার অক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। এই প্রথা রহিত হওয়ায় রক্ষণশীল সমাজ রামমোহনের প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, রাজা তাহাদের দ্বারা গুপ্তভাবে হত হইবার পর্য্যন্ত আশঙ্কা করিতেন, এবং রাস্তায় ভ্রমণকালে পোষাকের অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র লুক্কায়িত রাখিতেন। একথা স্মরণ করিয়া এক শতাব্দী পর—বাঙ্গলার নারীজাতির এই নির্ভীক ও পরম বান্ধবের প্রতি, কৃতজ্ঞতায় ও সম্ভ্রমে চক্ষু বাষ্পার্দ্র না হইয়া পারে না।

২৫ বৎসর আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খৃঃ সতীদাহ প্রথা আইনদ্বারা রহিত করা হয়।

রাজা রামমোহন রায় রংপুর হইতে ১৮১৪ খৃঃ কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালে ১৮০৫ খৃঃ তাঁহার আদেশ মত, বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ, ডাওডেস্‌ওয়েল সাহেব, নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গুড্‌ সাহেবকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সতীদাহ প্রথা হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত কিনা? এবং যদি না হয় তবে ইহা রহিত করা যায় কিনা? আর যদি হয় তথাপি সহমরণের সময় স্ত্রীলোকদিগকে যাহাতে নেশা করান না হয়—তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর একখানি পত্র ঐ বৎসরেই নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মাকে দেওয়া হয়। তাহাতে গভর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করেন যে সহমরণ-প্রথা শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ? উক্ত শর্ম্মা উত্তরে জানান যে, শিশুসন্তানবতী, গর্ভবতী, ঋতুমতী, অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবাগণ সহমৃতার যোগ্যা নহেন। এই সকল প্রতিবন্ধক না থাকিলে সহমৃতা হইতে নিষেধ নাই। ঔষধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। অঙ্গিরা, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ ইহার প্রবর্ত্তক।

সতীদাহ রহিত কল্পে আন্দোলনের ইতিহাস।

ইহার পর ১৮১২ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর সতীদাহ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন,—

১ম—ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকদিগকে যাহাতে তাঁহাদের আত্মীয়েরা সহমৃতা হইবার প্রবৃত্তি দিতে, বা উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে না পারেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২য়—কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না।

৩য়—হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী, সহমরণে উদ্যতা রমণীর বয়স নির্ণয় করিতে হইবে।

৪র্থ—সহমরণে উদ্যতা নারী গর্ভবতী কিনা জানিতে হইবে।

৫ম—উপরি উক্ত কারণ থাকিলে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সতীদাহ অসিদ্ধ। ঐ সকল স্থলে সতীদাহ নিবারণ করিতে হইবে।

হেষ্টিংসের সময় সতীদাহের একটা তালিকা সংগৃহীত হয়। পার্লেমেণ্টে ঐ তালিকা প্রচারিত হয়। সেখানেও একটা আন্দোলন হইয়া—পরিণামে ১৮২৯ খৃঃ এই প্রথা রহিত হইবার পথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হয়।

১৮২৩ খৃঃ সতীদাহ সম্পর্কে আর একটা পুলিশ-রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। তাহাতে দেখা যায় কেবল বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ঐ বৎসর ৫৭৫ জন বিধবা সহমরণে যায়। ২০ বৎসরের কম হইতে ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্কা বিধবাও ইহাতে ছিল।

এ পর্য্যন্ত আমরা সতীদাহ নিবারণ কল্পে গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতিপূর্ণ কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে এই প্রথা নিবারণ কল্পে রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা ও উদ্যমের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব। এবং তৎপূর্ব্বে সতীদাহ কালে কিরূপ বলপ্রয়োগ করা হইত তাহারও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

সতীদাহে বলপ্রয়োগ।

যদি এরূপ বিশ্বাস আপনাদের থাকে যে সতীদাহের সময় বলপ্রয়োগ হইত না, তবে তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। সদ্যবিধবা শোকে মুহ্যমান,—তাঁহার সহমরণের পর বিষয়লোলুপ নিকট আত্মীয়ের সহমরণে উত্তেজনা ও পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গবাসের প্রলোভন তারপর মাদক দ্রব্য সেবন—ইহাই ত একপ্রকার বলপ্রয়োগ; তারপর চিতায় ঐ বিধবাকে মৃত স্বামীর সহিত রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া, শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়, এবং বাঁশ দ্বারা চারিদিকে চাপিয়া রাখিয়া, পরে অনেক কাঠ চিতার উপর চাপান হয়। অগ্নি সংযোগের পর, অগ্নির উত্তাপে যদি বিধবাগণ চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেন তবে জোরপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঐ জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত চাপিয়া রাখা হইত। ইহা যদি বলপ্রয়োগ না হয় তবে বলপ্রয়োগ কি? স্বদেশী ও বিদেশী অনেক মহাত্মার চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রন্থরূপে এই সম্পর্কে এখনো আছে।* বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে রামমোহন বলিতেছেন——

সতীদাহে বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে রামমোহনের উক্তি।

"সংকল্প বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও, যাহাতে ঐ বিধবা আর উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া রাখ। এই সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রী হত্যা হয়।"

---

* (1) " The Suttee's Cry to Britain, " by J. Peggs.

(2) " Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque during four and twenty years in the East with Revelations of life in the Zenana " by Fanny Parks.

এরূপ নৃশংস বর্ব্বরোচিত নারী হত্যাকাণ্ড ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীগণ করিতে লজ্জা অনুভব করিতেন না। পরন্তু রক্ষণশীল সমাজ এই প্রথা রহিত হইলে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে এরূপ আশঙ্কা করিয়া, ১৮২৯ খৃঃ পরেও—এই প্রথাকে পুনরায় প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বিলাতে আপীল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

সভ্যজাতির মধ্যেও কোন কোন বর্ব্বরোচিত আচার কিরূপে প্রশ্রয় পায়—এই সম্পর্কে রাজা রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে রাজাকে একজন তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্ বলিয়া নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যায়। রাজা বলিয়াছেন—

রাজা রামমোহনের মতে সতীদাহে বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে, লোকসকলের উদাসীনতার কারণ।

"অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ যথার্থ বটে; কিন্তু বালককাল অবধি আপন প্রাচীনলোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রী দাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের **বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে,** এই নিমিত্ত, কি স্ত্রী কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধ-কালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত দয়া হয়।"

বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে রাজা সর্ব্বত্রই সুবিচার করেন নাই এমন নহে।

যাহা হউক, আপনারা দেখিলেন গভর্ণমেণ্ট—দেওয়ান রামমোহন রংপুর হইতে কলিকাতা আসিবার ১০ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। রামমোহন আসিয়া এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে, অপর কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীই—এই কার্য্যে গভর্ণমেণ্টকে তেমন সাহায্য করিতে সাহসী হন নাই। রামমোহন সাহসী হইলেন, কেননা তাঁহার সাহসের অন্ত ছিল না। রামমোহন হইতে ঘনশ্যাম শর্ম্মার পার্থক্য এইখানে। সমাজ-সংস্কার শুধু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না। সংস্কারকের নৈতিক সাহসের উপরেই তাহার প্রধান নির্ভর।

গভর্ণমেণ্ট এই প্রথা রহিত কল্পে শাস্ত্রের পোষকতা চাহিয়াছিলেন। রামমোহন যথাক্রমে "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের" বাদানুবাদচ্ছলে তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম এই যে—(১) সহমৃতা না হইলে যে প্রত্যবায় হয়, শাস্ত্রে এমন কোন আদেশ নাই। (২) সহমৃতা হইবার প্রধান কারণ স্বর্গে পতি-সঙ্গ লাভ করা এবং ইত্যাদি। কিন্তু স্বর্গাদি সুখ ভোগেচ্ছাও সকাম কর্ম্ম। শাস্ত্রে তাহা নিন্দিত। সুতরাং শাস্ত্র-নিন্দিত সহমৃতা না হইয়া মোক্ষলাভের জন্য বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য যাপন করাই অধিকতর শাস্ত্র-সম্মত। (৩) শাস্ত্র বলে স্বাধীন ইচ্ছায়—সুস্থ অবস্থায়—সংকল্প করিবে—চিতায় উঠিবে—জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহকে ভস্মে পরিণত করিবে। তাহা না হইয়া—বলপূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া চিতায় রাখা হয়, তৎপূর্ব্বে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য

সতীদাহ নিবারণ কল্পে রামমোহনের শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে তিনটি অভিমত।

সেবন করাইয়া একরূপ অজ্ঞান করা হয়। ইহা শাস্ত্রের আদেশ নহে। ইহা পুরুষের পক্ষে জ্ঞানতঃ বলপূর্ব্বক নারীহত্যা করা হয়। সুতরাং অশাস্ত্রীয় এই প্রথা রহিত হওয়া বিধেয়।

বঙ্গদেশে, সমাজ-সংস্কারে শাস্ত্র অপেক্ষাও প্রবলতর বিঘ্ন দেশাচার। দেশাচার সম্পর্কে রামমোহন বলিয়াছেন যে—(১) সতীদাহ প্রথায় স্ত্রীবধ, ভগিনী-বধ, মাতৃবধ করা হয়। (২) ব্রহ্মবধও করা হয়। কেননা, উহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের বিধবাও ছিলেন। শোকে মুহ্যমান বিধবাকে অশাস্ত্রীয় স্বর্গাদির প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি, মৃত্যুর পর আত্মসাৎ করা—ও তাহাদিগকে বন্ধনপূর্ব্বক অগ্নিতে দাহ করা, দেশাচার হইলেও ধর্ম্ম নহে। ইহা অধর্ম্ম। কেবল এদেশের লোক কেন, যদি সকল দেশের লোকে একমত হইয়া এরূপ স্ত্রীহত্যা করে তথাপি ইহা অধর্ম্ম। অনেকে একমত হইয়া বধ করাতে—ঈশ্বর শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।

রামমোহনের অভিমত—সমস্ত দেশের লোক একমত হইয়া যাহা করে তাহাও অধর্ম্ম হইতে পারে। সতীদাহ সমস্ত দেশের লোক একমত হইয়া করিলেও—অধর্ম্ম।

এই সতীদাহ নিবারণ কল্পে তিনি বাঙ্গলা দেশের নারীজাতির সম্পর্কে যে একটি সাধারণ উক্তি করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘ হইলেও তাহা আমি এখানে উদ্ধার না করিয়া পারিতেছি না।

—"নিবর্ত্তক। এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে; কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখ-দায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে; কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।"

রামমোহন রায়ের মত—স্ত্রীলোকদের দুর্ব্বলতা সংস্কারের ফল। স্বভাবসিদ্ধ নহে। কেবল শারীরিক বলে তাহারা পুরুষ অপেক্ষা হীন।

"প্রথমতঃ **বুদ্ধির বিষয়**। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাতা আছে; বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন। মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।"

বুদ্ধির বিষয়।

"দ্বিতীয়তঃ—তাহারদিগকে **অস্থিরান্তঃকরণ** কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।"

অস্থিরান্তকরণের বিষয়।

"তৃতীয়তঃ—**বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়।** এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, বিবেচনা কর যে কত স্ত্রী, পুরুষ হইতে প্রতারিত হইয়াছে, আর কত পুরুষ, স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে; আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক; তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে, আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্য্যন্ত, যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।"

বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়

"চতুর্থ,—যে **সানুরাগা কহিলেন,** তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি; আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।"

'সানুরাগা' স্ত্রী কিংবা পুরুষ অধিক?

"পঞ্চম,—তাহাদের **ধর্ম্মভয় অল্প!** এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ, কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাঁহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্মনির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যে হেতু, স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থান-মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে; যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাইসকল ও অমাত্যসকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন; এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাঁদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটী হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এসকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি

স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভয় অল্প বিষয়ে।

উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথম ভাগে গার্হস্থ্যে অর্থাৎ পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য অর্থাৎ করণীয় কার্য্য দাস্য-বৃত্তি।

উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাঁহাদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘোষী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়। এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে। আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ ক্লেশ সহ্য করে ;. কখন এমত উপস্থিত যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটী পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে, চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" ইতি—

সমাপ্ত ১৭৪১ অগ্রহায়ণ।

রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর চারিভাগের প্রথম ভাগে নারী জাতি সম্পর্কে এই সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, যাহা আমি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা সত্বেও এইমাত্র উপরে উদ্ধৃত করিলাম। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহার অপেক্ষা নারী জাতির সম্বন্ধে অধিকতর উদার কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীর সভ্যজাতিদিগকে বলিতে পারেন নাই।* রাজা রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর চারিভাগের প্রথম ভাগের মধ্যেই এই সমস্ত কথা বাঙ্গালী জাতিকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা পৃথিবীর সভ্যজাতিসকল গ্রহণ করিয়া উন্নতিলাভ করিতেছে। যেহেতু নারীজাতির উন্নতি ছাড়া, এযুগে সভ্যতাভিমানী কোনও জাতিরই উন্নতি সম্ভব নহে। সভ্য জাতি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা শুনিল, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে মিলের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ নারী জাতি সম্বন্ধে এত অধিক উদার কথা বাঙ্গালাদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ;——হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব ও রঘুনন্দন, রঘুমণি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিশের সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালী জাতি

জন্‌ষ্টুয়ার্টমিলের ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে, রামমোহন বাঙ্গালীকে তাহাদের নারী জাতির অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে অধিকতর উদার কথা বলিয়াছেন।

* The Subjection of Women—by John Stuart Mill—date 1869.

তাহার কথা আজও এক শতাব্দি পরে শুনিল না। "আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি" নারী জাতি সম্বন্ধে অধিকতর আত্মবিস্মৃত।

রামমোহন ও নারী জাতির দায়ভাগ আইনে বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকার।

রাজা রামমোহন রায় শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নারী জাতির বিষয় সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে দায়ভাগ সম্পর্কে যথেষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে প্রাচীন স্মৃতিতে নারী জাতির যে অধিকার ছিল, মধ্য যুগের স্মৃতিতে সে অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে। * এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও বাঙ্গালা দেশে মাতা, বিমাতা, স্ত্রী, কন্যা, ও বিশেষতঃ বিধবা পুত্রবধূ ধনীব্যক্তিদের পরিবার মধ্যেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে নিতান্তই বঞ্চিতা। সম্পত্তির উপরে অধিকার ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য নারীজাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; ইহা রামমোহন শতাব্দীর প্রথমেই বুঝিতে পারিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু রামমোহনের এক শতাব্দীর পরেও ঐ সম্পর্কে দায়ভাগ আইনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন সংস্কার হয় নাই। হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মধ্যযুগে বিষয় সম্পত্তির উপর অধিকার হইতে নারীজাতি বঞ্চিত হওয়াতে সতীদাহ ও বহুবিবাহের প্রচলনে ক্রমে অধিক হইতে ছিল।

বিষয় সম্পত্তির উপর নারী জাতির অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সতীদাহ ও বহুবিবাহ প্রথা সমাজে অধিকতর প্রচলন হইতে আরম্ভ করে, ইহাই রামমোহনের অভিমত। বহুবিবাহ প্রথা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন প্রাচীন স্মৃতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে নারী জাতির সম্মানহানিকর কুপ্রথা প্রাচীন স্মৃতিকে বহু অংশে অমান্য করিয়া সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ নিবারণ কল্পে রাজা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন দোষ আছে। যদি ঐ ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করিতে না পারে তাহা হইলে সে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্ট রাজার এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই। করিলে বহুবিবাহ প্রথা আরও দ্রুত সমাজ হইতে লোপ পাইত। এখন যে লোপ পাইতেছে সে কেবল দরিদ্রতার নিষ্পেষণে।

স্যার রাধাকান্ত দেব সহ মরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার বিরোধী হইলেও স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে শতাব্দীর প্রথমে অগ্রণীব্যক্তি।

নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দোলন প্রবল হইলেও, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর তাহাই অভিমত হইলেও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নারী জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত দেখা দেয়। স্যার রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটীর অধীনস্থ কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকদের সহিত বালিকাদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন, তিনি "স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তকে বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার বিরোধীদিগের মতের তিনি খণ্ডন করেন। স্যার রাধাকান্ত দেব সহ-মরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার বিরোধী হইলেও স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনে তিনি

* Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females —1822 Raja Rammohan Roy.

শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন অগ্রণী ব্যক্তি। এক্ষণে আমরা শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে প্রবেশ করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দী—১৮২· হইতে ১৮৭৫ খৃঃ

আপনারা দেখিলেন যে সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আন্দোলনের সূত্রপাত হইলেও এই প্রথা শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রহিত হয়।

স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের শেষেই বেশী লক্ষিত হয়। মহাত্মা হেয়ার যেমন বালকদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন, মহাত্মা বিটনও (বেথুন ?) সেইরূপ এদেশের বালিকাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা বিটন্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই দুই পণ্ডিতের সহায়তায় স্ত্রী-শিক্ষার জন্য যে বিপুল আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত দুই পণ্ডিতের সহিত মহাত্মা বেথুনের নামও স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। মহাত্মা বেথুনের নামে ১৮৪৯ খৃঃ যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাই অদ্যকার বেথুন কলেজ। বালিকাদের শিক্ষার জন্য সহরে ও মফঃস্বলে আর যত কিছু স্কুল হইয়াছে, তাহা এই ইতিহাসে স্মরণীয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের অনুকরণে। এইবার আমরা শতাব্দীর মধ্যভাগে বিধবা বিবাহের আন্দোলন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব। ১৮৫৩ এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "বিধবা বিষয়ক প্রস্তাব" লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালী সমাজের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা রামমোহনের পরে নারীজাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি লইয়া এমন তেজস্বী পুরুষ বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর আবির্ভূত হন নাই।

বেথুন ও বালিকা বিদ্যালয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ইতিহাস।

সহ-মরণ প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার মাত্র পঁচিশ বৎসর পরেই যখন বিদ্যাসাগর বলিলেন যে "বিধবা-দিগকে বিবাহ দিতে হইবে এবং শাস্ত্রে তাহার নির্দ্দেশ আছে" তখন পণ্ডিত ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে আন্দোলন দেখা দিল তাহার তুলনা নাই। মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর সহিত চিতায় উঠাইয়া দিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হইত, সেই বিধবাদিগকে কি না পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে! সুতরাং আবার স্যার রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল সকল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন, যাহাতে বিধবা বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত হইতে না পারে। তিনিও পণ্ডিতদিগের সাহায্যে পরাশরের বচন "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে"র ভিন্ন অর্থ করিলেন। বাঙ্গালী হিন্দু সমাজকে স্যার রাধাকান্ত বলিলেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ। কিন্তু তথাপি বিধবা বিবাহ আইন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হইল। বিধবা বিবাহ ব্যাপারে দায়ভাগ আইন সম্পর্কে যে অন্তরায় ছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। বিধবা বিবাহের সন্তানগণ আইন সম্পর্কে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু এই বিধবা-বিবাহ আইনে, বহুবিবাহ প্রথা

দূরীভূত হইতে পারিল না। কেননা বিধবা-বিবাহও হিন্দু-বিবাহ এবং হিন্দুবিবাহে বহু-বিবাহ অসিদ্ধ নহে। এই বিধবা বিবাহের মূলে জাতিভেদ প্রথাও রহিয়া গেল। ভিন্ন জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ হইলে তাহা হিন্দু-বিবাহ হইবে না। যেহেতু তাহা দেশাচারবিরুদ্ধ। যাহা হিন্দু-বিবাহ হইবে না, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিধবা-বিবাহ হইলেও সেই বিধবা-বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হইবে না। ইহাই আইনের মর্ম্ম। বিশেষতঃ পুনর্বিবাহিতা বিধবা তাহার পূর্ব্ব স্বামীর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইবেন। অত্যন্ত দ্রুত উন্নতিশীল সমাজ-সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহের সঙ্গে এই সমস্ত অন্তরায় থাকাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। আমরাও মনে করি, কপর্দ্দকহীন নিঃসম্বল বিধবার বিবাহ বা স্বাধীনতা পরিবার ও সমাজে অসম্ভব। বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও রামমোহন ইহা সম্ভবতঃ অধিক বুঝিয়া-ছিলেন।

বিধবা বিবাহে জাতিভেদ রহিয়া গেল।

বিধবা-বিধবা প্রচলন করিবার দুইটী কারণ এই আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি। প্রথম কারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজে অত্যন্ত দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে,—সে ভ্রূণহত্যার কলঙ্ক উদ্‌ঘাটন করিবার ইচ্ছা আমার নাই। দ্বিতীয় কারণ বিধবাদিগকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে না দেওয়ায় পুরুষ নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছে। প্রথম কারণের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশী জোর দিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণটীর উপরেই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একমাত্র নির্ভর করিয়াছেন। আমাদের ধারণা দুই কারণের উপরেই নির্ভর করিয়া সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া সম্পর্কে দুইটি কারণ। ১ম সামাজিক দুর্নীতি; ২য় বিধবাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের ১৪।১৫ বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ লইয়া আর একটী আন্দোলন উপস্থিত হয়। সকল ব্রাহ্মগণ সেই সময় অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজ সংস্কারে স্বভাবতঃ রক্ষণশীল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিদেশী গভর্ণমেণ্টের আইনের দ্বারা অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়েরও সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নানারূপ বাধা আপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মবিবাহ বিল্ আইনের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করাইয়া দেন। এই বিলের নাম "সিভিল্ ম্যারেজ বিল্"—১৮৭২ খৃঃ তিন আইনের বিবাহ। এই বিলের আশ্রয়ে যাঁহারা বিবাহ করেন তাঁহাদিগকে বলিতে বাধ্য করা হয় যে তাহারা হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতি কোন ধর্ম্মের লোক নহেন। এখন বিবাহের সময় "আমি হিন্দু নই", একথা বলিতে অনেক ব্রাহ্মদেরও হিন্দুত্বাভিমানে আঘাত লাগে এবং ইহা লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতান্তর এবং মনান্তরও আছে এবং দেখা যায়। যাহা হউক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এই তিন আইনের বিবাহ মূলভিত্তি, বিবাহে জাতিভেদের উচ্ছেদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহে জাতিভেদ আছে, কিন্তু

১৮৭২ খৃঃ তিন আইনের বিবাহ। এই বিবাহে জাতিভেদ নাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিন আইনের বিবাহে জাতিভেদ নাই, বাল্যবিবাহও একরূপ নাই; বহু বিবাহ তো নাই বটেই। কেবল কবুল জবাব দিয়া হিন্দুত্ব বর্জ্জন অপরাধ ব্যতিরেকে নারী জাতির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহাদের সুবিধা ও সুযোগ এই বিবাহে যথেষ্ট অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শতাব্দীর চারিভাগের শেষ ভাগে প্রবেশ করিতেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দী—১৮৭৫ হইতে ১৯০০ খৃঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর চারি ভাগের শেষ ভাগে, সংস্কার যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

শতাব্দীর এই শেষ ভাগকে আমি প্রথম বক্তৃতাতেও একটা প্রতিক্রিয়া-মূলক সমন্বয় যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। ইহা রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যুগ। এই যুগে সংস্কার যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে অথচ একটা সমন্বয়ের ভাবও আছে। এখন দেখিতেছি প্রতিক্রিয়ার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

নারী জাতি সম্পর্কে এই প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের মনোভাব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের ভগ্নি নিবেদিতার লেখার মধ্যে আমরা কিছু কিছু পাইয়া থাকি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মিলন হয় তাহাতে ভগ্নি নিবেদিতা হিন্দু নারী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাপূর্ণ কথা বলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। * তিনি বলেন হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ একবার হইলে আর ইহ

* "Marriage in Hinduism is a sacrament and indissoluble. The notion of divorce is as impossible as the remarriage of widow is abhorrent. Even in orthodox Hinduism this last has been made legally possible by the life and labours of the late Pandit Iswarchandra Vidyasagar, an old Brahmnical scholar, who was one of the stoutest champions of individual freedom, as he conceived of it that the world ever saw. But the common sentiment of the people remains as it was, unaffected by the changed legal status of the widow" * * *

"* * * " In India the sanctity and sweetness of family life have been raised to the rank of a great culture. Wifehood is a religion, motherhood a dream of perfection." * * * "The Woman of the East is already embarked on a course of self transformation which can only end by endowing her with a *full measure of civic and intellectual personality.* Is it too much to hope that as she has been content to quaff from our wells in this matter of the extension of the personal scope, so *we* might be glad to refresh ourselves at hers, and gain therefrom a renewed sense of the sanctity of the family, and particularly of the inviolability of marriage"—Sister Nivedita—" The Present Position of Woman"—a paper communicated to the first Universal Races Congress in 1911.

জন্মে তাহা ছিন্ন করা যায় না। হিন্দু নারীগণ বলিয়া থাকেন যে আমরা একবার জন্মি, একবার মরি এবং একবার বিবাহ করিব। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আইনতঃ বৈধ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণ হিন্দুর মনের ভাব বিধবা-বিবাহের পক্ষে অনুকূল নয়। বিধবা-বিবাহ হওয়া ভগিনী নিবেদিতার অভিমত নহে। এই অভিমত বিদেশিনী মহিলার হইলেও শতাব্দীর শেষ ভাগে এই মনোভাবই সাধারণে প্রচলিত এবং প্রতিক্রিয়ামূলক। আমি বিশ্বাস করি ইহা অনিষ্টকারকও বটে।

ভগিনী নিবেদিতা ও বিধবা বিবাহ।

আমাদের দেশের সহিত পাশ্চাত্য দেশের নারী জাতির অবস্থা তুলনা করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আমাদের দেশের নারীগণ যেমন পরিবারের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষার্থে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তেমনই পাশ্চাত্য দেশের নারীগণ সমাজের ও রাষ্ট্রের শক্তির উদ্বোধনার্থে পারিবারিক বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অবশেষে ভগ্নি নিবেদিতা, সুখের বিষয়, এরূপ আশাও পোষণ করেন যে, হিন্দুনারীগণ পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়াও সমাজে ও রাষ্ট্রে আপন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ করিয়া, সামাজিক ও রাষ্ট্র শক্তির উদ্বোধনে সহায়তা করিবেন। অন্যপক্ষে, পাশ্চাত্য নারীগণও বিবাহ বন্ধনকে হিন্দুনারীর মত অচ্ছেদ্য মনে করিয়া পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষাকল্পে যত্নবতী হইবেন।

হিন্দুনারীগণ পরিবারের পবিত্রতা রক্ষাকল্পে যত্নবতী, পাশ্চাত্য নারীগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তি উদ্বোধনে ব্রতী, —দুই আদর্শের একত্রে সমন্বয় প্রয়োজন।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করিলে তিনি কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিতেন যে, "আমি কি বিধবা যে তোমরা আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিতেছ?" এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "কোন জাতির উন্নতি যদি সেই জাতির বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে তবে সেরূপ উন্নতিশীল জাতি আমি এখনও দেখি নাই।" * ইহা প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের কথা। তাঁহার কথার গূঢ় মর্ম্ম এইরূপ অনুমান হয় যে, সধবা, বিধবা, কুমারী যিনিই হউন না কেন, সর্ব্ব প্রথম জ্ঞান শিক্ষা লাভ করিবেন। এবং জ্ঞানলাভ করিবার পরে স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিতা হইয়া বিবাহ করিবেন। বিধবাকে জোর করিয়া বিবাহে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিতে গেলে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। শতাব্দীর শেষ ভাগে উগ্র সন্ন্যাসী কোন অবস্থাতেই নারীজাতির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়া আমেরিকার সমাজ গড়িতে পার।"

বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কথোপকথনচ্ছলে তিনি বলিয়াছেন যে—

(১) প্রথমে একজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত।

* "If the prosperity of a nation is to be gauzed by the number of husbands its widows get, I am yet to see such a prosperous nation."—Swami Vivekananda.

(২) প্রথমেই একেবারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে—বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।

এই দুইটি উক্তি হইতে বুঝা যায় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হওয়া স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রেত ছিল না। তবে এই সম্পর্কে কম বাধা বিপত্তির পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন।

নারীজাতি সম্পর্কে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। যে বিদ্যালয়ে কুমারী ও ব্রহ্মচারিণী রমণীগণ আধুনিক সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সে কল্পনা আর তাদৃশ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।*

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

সমুদ্রগুপ্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মালিনী।

ভাগীরথী-তীরে বিস্তৃত পুষ্পবাটিকা মধ্যে উষার শুভ্র আলোকে শ্বেত কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত এক দীর্ঘকায় পুরুষ পুষ্পচয়ন করিতেছিল। হিমালয়ের পাদমূল হইতে যে তুষার-শীতল বায়ু প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া তুষারের ন্যায় তীক্ষ্ণধার হইয়াছিল তাহার স্পর্শে তরুলতা জড় হইতেছিল, প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম তাহার দারুণ স্পর্শে ভয়ে মুদ্রিত হইয়া যাইতেছিল। ভীষণ শীতে সদ্যঃস্নাত আদিত্যনাথ ক্ষিপ্রহস্তে পুষ্পচয়ন করিতেছিল, সেদিন উত্তরায়ণ সংক্রান্তি এবং রাজদ্বারে তাহার বিশেষ কার্য্য ছিল। সহসা দূর হইতে তাহাকে কে ডাকিল, "আদিত্যনাথ! আদিত্যনাথ!" শব্দের দিকে চাহিয়া দেখিল যে আপাদমস্তক উর্ণাপরিহিত এক ব্যক্তি উদ্যানের প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। আগন্তুককে দেখিয়া আদিত্যনাথ কহিল, "কি হে, আড়ালে দাঁড়িয়ে আছ কেন, উদ্যানের ভিতরে এস।" আগন্তুক কহিল, "বাগানে যে ঠাণ্ডা হাওয়া,—তুমি বিলম্ব করোনা, আজ আর ফুল তুলতে হবে না। আজ আর বোধ হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পূজা গ্রহণ করবেন না।" আদিত্যনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি কথা মধুসূদন? তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে এমন কথা বলছ কেন? আজ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, আজ ভগবান পূজা গ্রহণ করবেন না?"

* লেখক কর্ত্তৃক শীঘ্র প্রকাশ্য "স্বামী বিবেকানন্দ ও উনবিংশ শতাব্দী" গ্রন্থের দ্বাদশ বক্তৃতার ইহাই একাদশ বক্তৃতা। বঃ সম্পাদক।

"ভগবান বোধ হয় এতক্ষণ গরুড় ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে গৌড়ে পলায়ন করেছেন।"

আদিত্যনাথ এতক্ষণে বুঝিল যে মধুসূদন পরিহাস করিতেছে। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এত দেশ থাকতে ভগবান ঘোড়ায় চড়ে গৌড়দেশে গেলেন কেন?" মধুসূদন বলিল, "এটা আর বুঝলেনা আদিত্যনাথ? অনেকদিন শকরাজার দাসত্ব করে তোমার বুদ্ধি ক্রমশঃ লুপ্ত হচ্ছে। গৌড় দেশে অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথম সুবিধা, সে দেশে শক নাই, দ্বিতীয় সুবিধা, সে দেশে শক মহাক্ষত্রপ নাই, তৃতীয় সুবিধা, সে দেশে শক মহা দণ্ডনায়ক নাই, আর সকলের উপর চতুর্থ সুবিধা সে দেশে মগধের অন্নে পুষ্ট কপোতিক মহাসঙ্ঘারামের সঙ্ঘস্থবির নাই। তুমি বিলম্ব করোনা', পাটলিপুত্রের বৈষ্ণব নাগরিকদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যারা শকরাজার বেতনভোগী ভৃত্য নয় তারা সকলের স্ত্রী পুত্র দূর গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি কি করবো তাই পরামর্শ করতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তুমি কি মালিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

বিস্মিত হইয়া উদ্যানের তোরণের দিকে যাইতে যাইতে আদিত্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছি? তুমি কি বলছ মধুসূদন? সে হয়তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।"

"তুমি কি তবে কিছুই শোননি? কাল রাত্রিতে গৌড়দেশ থেকে এক পাগল ব্রাহ্মণ এসে বাসুদেবের জীর্ণ মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে। পাটলিপুত্রের সমস্ত নাগরিক ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কপোতিক সঙ্ঘারামের মহাস্থবির বোধ হয় এতক্ষণ মহাক্ষত্রপের সমীপে উপস্থিত হয়েছেন। কেবল মহাক্ষত্রপের নিদ্রাভঙ্গটা একটু বিলম্বে হয় বলে সদয়হৃদয় দণ্ডনায়ক এখনও শ্বেত শকসেনা বৈষ্ণব নাগরিকদের শাসন করতে পাঠাননি।"

মধুসূদনের নিকটে আসিয়া আদিত্যনাথ শেষের কয়েকটী কথা শুনিল, পুষ্পপাত্র তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পথে পড়িয়া গেল, তিনি মধুসূদনের হস্তধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পুরাতন বাসুদেবের মন্দিরের দ্বার যদি সত্য সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকে, তাহলে উন্মত্ত শ্বেত শক সেনা পাটলিপুত্র নগর ধ্বংস করবে। তুমি সত্য বলছ মধুসূদন?"

"একি রহস্যের সময় আদিত্য, আমি জানি যে এ সংবাদ তোমার কাছে বিলম্বে পৌঁছিবে কারণ শকের বেতনভোগী কর্ম্মচারী বলে বৈষ্ণব নাগরিক মাত্রেই তোমাকে ঘৃণা করে সুতরাং বিপদের সংবাদ তোমায় দিবেনা।"

"মালিনী তো এখনও ওঠেনি।"

"তুমি তাকে এখনই গঙ্গাপারে পাঠিয়ে দাও।"

"তার পূর্ব্বে একবার বাসুদেবের মন্দিরে গেলে হতনা?"

"তার আর সময় নাই আদিত্য, তুমি মালিনীকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এস, আমি তোমার জন্য সেখানে মাত্র অর্দ্ধদণ্ডকাল অপেক্ষা করতে পারব।"

উত্তর না দিয়া আদিত্যনাথ দ্রুতপদে উদ্যান বাটিকার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিজের

আবাসে প্রবেশ করিলেন। শতাব্দীত্রয় ব্যাপী মগধের শকাধিকার কালে যে সমস্ত মাগধী শৈব বা বৈষ্ণব শকরাজার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল আদিত্যনাথ তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। বিক্রমাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে দরিদ্রের সন্তান আদিত্যনাথ অর্থলোভে শকরাজার দাসত্ব স্বীকার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজস্ব ও শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে পাটলিপুত্রে সে সমস্ত মাগধী রাজকর্ম্মচারীছিল তাহাদিগের মধ্যে আদিত্যনাথই প্রধান ছিলেন। তিনি বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র তাম্র মুদ্রা বেতন পাইতেন, শক মহাক্ষত্রপ তাহাকে শক পরিচ্ছদ ও শক জাতির উচ্চচূড় শিরোভূষণ পরিধানের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল ভারতবাসী শকাধিকার কালে শকরাজার দাসত্ব করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত তাহারা শকপরিচ্ছদ পরিধানের অনুমতি সর্ব্বোচ্চ রাজসম্মান বলিয়া মনে করিত! সম্প্রতি আদিত্যনাথ শ্বেত শক অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজসভায় উপবেশন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। শতাব্দীত্রয় ব্যাপী শকাধিকার কালে কোনও অসিতবরণ ভারতবাসী এই উচ্চ সম্মান লাভ করিতে পারে নাই; সেইজন্য শ্বেত শক অভিজাত সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ক্ষমতায় ও অধিকারে শক সাম্রাজ্যে আদিত্যনাথ মগধের দেশের শাসনকর্ত্তা মহাক্ষত্রপের নিম্নের স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন।

ত্রিতলের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আদিত্যনাথ দেখিলেন যে তাঁহার পত্নী তখনও নিদ্রাগত। তিনি মালিনীর হস্তাকর্ষণ করিয়া ডাকিলেন, "মালিনী, মালিনী।" মালিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি এখন উঠতে পারব না।" আদিত্যনাথ পত্নীর হস্তাকর্ষণ করিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন, "শীঘ্র ওঠ, এখনই তোমাকে গঙ্গাপারে যেতে হবে।"

সদ্যোত্থিতা মালিনী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কি ক্ষেপলে নাকি? এই শীতে গঙ্গাপারে যেতে হবে কেন! মহাক্ষত্রপের আদেশ হয়ে থাকে, তুমি যাও, শকরাজার দাসত্ব তুমি স্বীকার করেছে বলেছ বলে আমিও কি মহাক্ষত্রপের দাসী হয়েছি নাকি?"

আদিত্যনাথ বলিলেন, "তুমি বুঝতে পাচ্ছনা মালিনী, বিষম বিপদ উপস্থিত। শ্বেত শকসেনা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সেই জন্য পাঠলিপুত্রের সমস্ত শৈব ও বৈষ্ণব নাগরিক স্ত্রীপুত্র স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মধুসূদন আমাকে বলে গেল যে তার স্ত্রী তোমার জন্য অর্দ্ধদণ্ডকাল গঙ্গাপারে অপেক্ষা করবে। শীঘ্র ওঠ।"

"তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছিনা, তুমি মহাক্ষত্রপের প্রধান কর্ম্মচারী, সামান্য শকসেনা কি তোমার গৃহে প্রবেশ করতে ভরসা করবে?"

"শ্বেত শকের প্রকৃত পরিচয় তুমি এখনও পাওনি মালিনী। আমি কেন, মহাস্থবির, সঙ্ঘাস্থবির প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যেরাও তাদের নিকট পরিত্রাণ পান না। তুমি বিলম্ব করোনা অর্দ্ধদণ্ড প্রায় শেষ হয়ে এল।"

মালিনীকে লইয়া আদিত্যনাথ যখন গঙ্গাতীরে পৌঁছিলেন তখন সমস্ত নৌকা পাটলিপুত্রের

নাগরিকগণের স্ত্রী-পুত্রে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহু কষ্টে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আদিত্যনাথ ও মধুসূদন তাঁহাদিগের পত্নীদ্বয়ের স্থান সংগ্রহ করিলেন। সহসা মালিনী মধুসূদনের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, শ্বেত শকেরা ক্ষেপে উঠেছে কেন ?" মধুসূদনের পত্নী বলিলেন, "বহুকাল পরে বাসুদেবের জীর্ণ মন্দিরের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়েছে। গৌড় দেশ থেকে এক উন্মাদ ব্রাহ্মণ এসে রুদ্ধদ্বারের পাষাণ আবরণ একা অমানুষিক শক্তির বলে ভেঙ্গে দিয়েছে। সেই সংবাদ শুনে কপোতিক মহাসঙ্ঘারামের সঙ্ঘস্থবির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাক্ষত্রপের প্রাসাদে গিয়েছেন। শ্বেত শক সেনা কেবল মহাক্ষত্রপের আদেশের অপেক্ষা করছে, এখনই তারা নগর দগ্ধ করতে আসবে।"

"বাসুদেবের মন্দিরের কি অবস্থা হল ?"

"আর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দুই চারি জন বৈষ্ণব মন্দির রক্ষা করতে গিয়েছে বটে কিন্তু তারা শ্বেত শক সেনা দেখলেই পালিয়ে যাবে। সকলেই স্ত্রী পুত্র পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

তখন সমস্ত নৌকা তীর পরিত্যাগ করিয়াছে, সহসা মালিনী নৌকার উপরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "আদিত্য, আদিত্য ?"

তীরে দাঁড়াইয়া আদিত্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

মালিনী বলিল," আমি যাবনা।"

উত্তরে আদিত্যনাথ কি বলিলেন মালিনী তাহা শুনিল না, সে ভাগীরথীর তুষারশীতল জলে ঝম্প প্রদান করিল। তীরে দাঁড়াইয়া পাটলিপুত্রের অসংখ্য নাগরিক মালিনীর অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু, কোন নৌকাই ফিরিল না। মালিনী তীরে উঠিলে আদিত্যনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি করলে—এখন কোথায় যাবে—কোথায় আশ্রয় পাবে ?"

মালিনী শান্তভাবে কহিল, "ঠিক করেছি প্রভু, বাসুদেবের মন্দিরে যাব, বিশ্বরূপ তোমাকে আমাকে আশ্রয় দেবেন। ভগবানের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়েছে সে কথা তো আমাকে বলনি স্বামিন্। আমার দেশ, আমার ঘর, আমার নগর, আমার দেবতা পরিত্যাগ করে আমি গঙ্গাপারে কোথায় যাব ?"

তখন মালিনী শক রাজার প্রধান কর্ম্মচারী আদিত্যনাথের হস্তাকর্ষণ করিয়া বিশ্বরূপ বাসুদেব মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(গৌড় ব্রাহ্মণ)

তৃতীয় প্রহর নিশার ঘোর অন্ধকারে বাসুদেব মন্দিরে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের মনে হইল যে দূরে কে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার এসেছিস্ ভিক্ষু ?"

অন্ধকার ভেদ করিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, "আমি ভিক্ষু নই প্রভু, আমি চন্দ্রগুপ্ত, নিবাস পাটলিপুত্র নগরে।"

"তবে তুমি ভিক্ষুর চর ?"

"প্রভু, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি পাটলিপুত্র নগরে পরম বৈষ্ণব নামে পরিচিত, আপনি ব্যতীত কেহ চন্দ্রগুপ্তকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর গুপ্তচর বলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারেনি।"

চন্দ্রগুপ্তের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ক্রোধ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল; তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কি জন্য এসেছ ?"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "প্রভু, আপনার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। সে প্রার্থনা কেবল আমার নিজের নয়, সমগ্র পাটলিপুত্রের বৈষ্ণব ও শৈব নাগরিকদের বিনীত অনুরোধ।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল, "চন্দ্রগুপ্ত, তুমি জান আমি কে ?"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "না, তবে আমি শুনেছি যে আপনি গৌড় দেশ থেকে এসেছেন।"

"তবে শোন চন্দ্রগুপ্ত গৌড় নগরে গৌড় দেশে আমার জন্ম, ভিক্ষা আমার উপজীবিকা, আমার নিকট পাটলিপুত্র মহানগরের প্রবীণ নাগরিকগণের বিনীত অনুরোধ কি হতে পারে ?"

"প্রভু, যতদিন পাটলিপুত্রে শক রাজা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ততদিন কাম্ববংশীয় মহারাজাধিরাজ বাসুদেব প্রতিষ্ঠিত এই পুরাতন জনার্দ্দন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ আছে, নানা উপায়ে কপোতিক সঙ্ঘারামের বৌদ্ধাচার্য্যদিগকে তুষ্ট করে প্রতি বৎসর শক মহাদণ্ডনায়কের চরণে রাশি রাশি সুবর্ণ বর্ষণ করে পাটলিপুত্রের বৈষ্ণব নাগরিকেরা অতি সঙ্গোপনে জীর্ণ বাসুদেবের মন্দিরে বিশ্বরূপের উপাসনা করবার অধিকার পেয়েছে। নিশীথ রাত্রিতে সমস্ত পাটলিপুত্র নগর সুষুপ্তিমগ্ন হলে নাগরিক বা নাগরিকা অন্ধকারে আত্মগোপন করে বাতায়নপথে আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করে যায়। শকরাজা বৌদ্ধ, মগধ বৌদ্ধপ্রধান দেশ, বৈষ্ণব ও শৈব বহু কষ্টে পাটলিপুত্র নগরে আত্মগোপন করে থাকে। শক মহাক্ষত্রপ বা কপোতিক সঙ্ঘারামের মহাস্থবির যদি জানতে পারে যে বাসুদেবের জীর্ণ মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার আবার মুক্ত হয়েছে তা হলে পাটলিপুত্রে বৈষ্ণব উপাসনা রুদ্ধ হয়ে যাবে।"

সহসা হাসিয়া উঠিয়া ব্রাহ্মণ কহিল, "আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, তোমার নাম শুনেছি, সুদূর গৌড় নগরে তোমার নাম অজ্ঞাত নয়। আমি গৌড় নগরের বাসুদেব দেবকুলের পরিচারক, বাসুদেব আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন যে আমাকে পাটলিপুত্র মহানগরের জীর্ণ বাসুদেব মন্দিরের চিররুদ্ধ দ্বার মুক্ত করতে হবে। চন্দ্রগুপ্ত, সেই আদেশ পেয়ে আমি গৌড় হতে পাটলিপুত্রে এসেছি। বিশ্বরূপ ক্ষুদ্র মন্দিরের অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে চাননা। সেই আদেশের

বলে আমি রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করেছি। পাটলিপুত্রের বৈষ্ণব নাগরিক কি নাসিকাকর্ণের ভয়ে সে দ্বার আবার রুদ্ধ করতে চান ?"

উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চন্দ্রগুপ্ত লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তখন পশ্চাৎ হইতে আর একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, আমরা বৈষ্ণব বটে কিন্তু স্ত্রী পুত্র নিয়ে বৌদ্ধ রাজার রাজত্বে বাস করতে হবে ত ?"

উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমরা স্বচ্ছন্দে বাস কর, আমি কি তোমাদের নিষেধ করেছি ?"

সেই নাগরিক আবার বলিয়া উঠিল, "মুখে বারণ করনি বটে কিন্তু কাজে যে একেবারে বাস তুলে দিয়াছ। কাল সকালে মহাস্থবির যখন দেখতে পাবে যে মন্দির দ্বার মুক্ত তখন আর কি কারো রক্ষা থাকবে ?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "এত যদি ভয় তা হলে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেও কেন ? ত্রিবিক্রমকে পরিত্যাগ করে ত্রিশরণকে গ্রহণ করলেই পার ? কপোতিক মহাসঙ্ঘারামের দ্বার তো দিবানিশি মুক্ত আছে।"

"আমাদের দুঃখ তো তোমরা বোঝনা ঠাকুর। কোনও রকমে পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম রক্ষা করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে কায়াক্লেশে জীবন অতি বাহিত করাই পাটলিপুত্রের বৈষ্ণবদের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

"ভেবেছ কি মরতে হবে না—এমনভাবে শৃগাল কুক্কুরের অধম হয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার চাইতে মরণ কি শ্রেষ্ঠ নয় ?"

"বল কি ঠাকুর, এই এতগুলি লোক কি বিনা কারণে মরবে ? না ম'রে যদি চলে তা হলে অনর্থক মরবার কি প্রয়োজন ?"

"আছে প্রয়োজন, সে প্রয়োজন তুমি বুঝতে পারবে না নাগরিক, কারণ ক্ষুদ্র স্বার্থে তুমি অন্ধ হয়ে আছ। যেখানে মানুষ হৃদয়ের দেবতাকে প্রকাশ্যে পূজা করতে না পায় সেখানে মানুষ মানুষ থাকে না, পশু হয়ে যায়। একবার অতীতের কথা মনে করে দেখ, যে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেছিল, সেও মগধ দেশে জন্মেছিল, যে শিল্পী তার গোপন প্রাণের মাধুরী পাষাণে বিকশিত করে এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করেছিল সেও মাগধ, আর তুমিও মাগধ। মন্দিরের শিল্পী বৌদ্ধের ভয়ে গোপনে মেদিনীর গর্ভে মন্দির নির্ম্মাণ করেনি। শিল্পীর যে হাত বুদ্ধ ভট্টারকের বিম্বনির্ম্মাণ করত, সেই হাত দিয়েই সে বাসুদেবের মূর্ত্তি গঠন করেছিল। তারা তোমার মত রজনীর অন্ধকারের আশ্রয়ে ইষ্টদেবতার আরাধনা করতে আসত না, পূজা শেষ হলে গৃহিণীর বসনাঞ্চলের আশ্রয়ে আত্মগোপন করে থাকত না। বাসুদেব তোমারও ইষ্টদেব, আমারও ইষ্টদেব, বাসুদেবের আদেশে আমি সুদূর গৌড়দেশ হতে বাসুদেবকে কারামুক্ত করতে এসেছি। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, মাগধ নাগরিক শকের ভয়ে বা বৌদ্ধের ভয়ে ইষ্ট-

দেবতাকে যদি আবার এই কারাগৃহে আবদ্ধ করতে চাও, সে কাজ তোমরা কর। তার পূর্ব্বে আর একটা কাজ আছে. আমি জীবিত থাকতে আমার চোখের সম্মুখে আমার আরাধ্য দেবতাকে ঐ অন্ধকার দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করতে দেবনা। বাসুদেব দীর্ঘকাল উপবাসী আছেন, আমার বলি গ্রহণ কর, আমার রক্তে মন্দিরের মুক্তদ্বারের নূতন প্রাচীর দৃঢ় হবে।"

চন্দ্রগুপ্তের পশ্চাতে একজন দুইজন করিয়া বহু নাগরিক সমবেত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই। তাহাদিগের মধ্যে একজন অল্পবয়স্ক যুবা অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, বহুদিন ধরে মাগধ নাগরিক শৃগাল কুকুরের মত নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে বাসুদেবের পূজা করে যায়। শুনেছি তিনশত বৎসর ধরে পাটলিপুত্রের বৈষ্ণব নাগরিক এই অপমানের বোঝা নীরবে মাথায় বয়ে আসছে, আর কতদিন এভাবে যাবে? শক সাম্রাজ্যে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব প্রজা আছে, শকরাজা জানেন যে তারা বৌদ্ধ নয়, বৈষ্ণব। মথুরা আর পাটলিপুত্র ব্যতীত আর কোন নগরে বৈষ্ণব গোপনে দেবার্চ্চনা করে না, তবে আমরা কেন তা করি? আর্য্য সুদূর গৌড় হতে ভিখারী ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্র নগরের জীর্ণ বাসুদেবের মন্দিরের চিররুদ্ধদ্বার মুক্ত করতে এসেছে, আর আমরা কপোতিক সঙ্ঘারামের সঙ্ঘস্থবিরের ভয়ে রাত্রিতে ভয়ে গোপনে ইষ্টদেবতার মন্দিরের মুক্তদ্বার রুদ্ধ করতে এসেছি; আর্য্য, একথা বলতে পাটলিপুত্রের বৈষ্ণবের লজ্জা হয় না! বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিতে মস্তক নত হয় না! ক্ষণিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন দিয়ে অন্ধকারে শৃগালের মত বাতায়নপথে প্রবেশ করে পাটলিপুত্রে বৈষ্ণব নাগরিক আর কতদিন বাস করবে? বৃদ্ধেরা কি বলেন তা শুনতে চাই না, আমাদের মত, বাসুদেব স্বয়ং যে মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করেছেন কোন বৈষ্ণব তা রুদ্ধ করতে যাবে না।"

বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "দেখ মাধব, রমণী ও বালকের মুখে দেবতা আত্মপ্রকাশ করেন। আমি যখন জনার্দ্দনের আহ্বানে গৃহ ত্যাগ করে আসি তখন কুমারদেবী আমাকে মন্দিরের মুক্তদ্বার রুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিল।"

মাধব বলিল, "আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, তবে কি বালক আর পাগলের কথায় পাটলি পুত্রের বৈষ্ণব ধ্বংস হবে?"

সহসা দ্বিতীয় যুবা বলিয়া উঠিল, "আর্য্য মাধব, পাটলিপুত্র নগরে বৈষ্ণব যেভাবে বাস করে সে ভাবে জীবিত থাকার চাইতে মরণ মঙ্গল। আজ যদি আমরা মন্দিরের মুক্ত দ্বার রুদ্ধ করি তা হলে চিরদিন সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব পাটলিপুত্রের বৈষ্ণবের কলঙ্ক ঘোষণা করবে।"

চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত হইয়া যুবার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কচ, তুমি কি বলছ?"

যুবা চন্দ্রগুপ্তকে প্রণাম করিয়া কহিল, "পিতা, মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, বৈষ্ণব মহিলাগণের আদেশে, গৌড়বাহ্মণ মন্দিরের যে রুদ্ধদ্বার মুক্ত করেছেন পাটলিপুত্রের বৈষ্ণব তা আবার রুদ্ধ করবে না।"

চন্দ্রগুপ্ত তৃতীয় ব্যক্তিকে ডাকিয়া কহিলেন, "ধ্রুবভূতি, দ্রুতপদে নগরে ফিরে যাও, প্রতিগৃহের রমণী ও শিশু স্থানান্তরে পাঠিয়ে দাও, কারণ প্রভাতে যুদ্ধ অনিবার্য্য।"

তখন পৌষের সেই দারুণ শীতের রাত্রিশেষে দ্বিতীয় বার অবগাহন স্নান করিয়া গৌড়ব্রাহ্মণ মন্দির মধ্যে অসংখ্য ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিল এবং পূজার উপকরণ সাজাইয়া লইয়া নিবিষ্টচিত্তে বিষ্ণুপূজায় রত হইল। ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণিহারা

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থবিয়োগ)

বিশ বছরের সঙ্গী আমার নিত্য সহচর,
হারিয়ে তোমায় দারুণ ব্যথায় ব্যাকুল এ অন্তর,
বন্ধু-বিহীন এই নিখিলে
তুমি আমার কি যে ছিলে
আমিই তাহা ভাল জানি—বুঝবে কি তা' পর,
বাজ্‌লে বুকে প্রেমের বাঁশী
আমার মুখে উঠ্‌তে হাসি,
দুখের দিনে আমার সনে কাঁদতে ঝর'ঝর,
দিল-দরদী মর্ম্ম সখা, নর্ম্ম সহচর।

ভালবেসে তোমায় আমার মিট্‌ত না যে সাধ,
সকল কাজেই তোমার মাঝে পেতাম সুধার স্বাদ,
সকাল বেলায় নিত্য উঠি'
চিত্ত আমার চল্‌ত ছুটি'
তোমার পাশে পাবার আশে ব্রজের সুসংবাদ,
আঁধার ক'রে হৃদয়ভূমি
লুকিয়ে কোথায় আছ তুমি,
দাও হে দেখা, মার্জ্জনা চায় দীনের অপরাধ,
কোন দোষে, হায়, বিধি আমায় সাধ্‌লে এমন বাদ

তোমার কাছে নিত্য পেতাম চিত্তে নূতন বল,
মন্ত্রে তোমার ক্ষান্ত হ'ত কর্ম্ম কোলাহল,
শচী মাতার শোকের কথা
আন্‌তো' মনে অস্থিরতা,
জাগিয়ে দিয়ে মর্ম্মব্যথা কর্‌ত যে চঞ্চল,
কী বিরহের মুর্ত্তি নিয়া
জাগ্‌ত মনে বিষ্ণুপ্রিয়া,
তাহার শোকে ঝর্‌ত' চোখে লক্ষ ধারায় জল,
এত দুখের মধ্যে তুমি চিত্তে দিতে বল।

কলুষহরা, পীযূষভরা সরস রচনাতে
কৃষ্ণ-রাধা পড়্‌ত বাঁধা তোমার পাতে পাতে,
মায়ার বাঁধন পড়্‌ত টুটি,'
মানস-কমল উঠ্‌ত ফুটি,'
যেতাম মনে বৃন্দাবনে ভক্তজনের সাথে,
বাধ্‌ত নাক সঙ্গে যেতে
শ্রীধাম প্রভুর অঙ্গনেতে,
কীর্ত্তনেতে উঠ্‌তে মেতে মহোৎসবের রাতে
কৃষ্ণ বলে' তালে তালে নাচ্‌তে খোলের সাথে।

পড়্‌ত' মনে নিতাই চাঁদের রজত গিরির ঠাম,
নাম অবতার হরিদাসের লক্ষ তিনেক নাম,
তুলসীদলে গঙ্গাজলে
ভগবানের আসন টলে,
ভক্তিবলে পাষাণ গলে দৃশ্য অভিরাম,
অদ্বৈতের হুহুঙ্কারে
কৃষ্ণ আসি' ভক্ত দ্বারে
গৌররূপে নবদ্বীপে পূরাণ মনস্কাম,
পূর্ণ যে হয় শূন্য হৃদয়, ধন্য ধরাধাম।

হৃদয় ভরি' শ্রদ্ধা করি স্বরূপ দামোদরে,
রঘুনাথের সাথে প্রেমে আপনি আঁখি ঝরে,
রামানন্দ, রূপ, সনাতন
কখনো কি হন পুরাতন?
গদাধরের গুণে এ প্রাণ থাক্‌ত সদা ভরে',—
হৃদয়পুরে পুরী গোঁসাই
ছিলেন জুড়ে সমস্ত ঠাঁই,
অবগাহন কর্‌ত এ মন সুধার সরোবরে,
বিশবরষের হর্ষ আমার কে নিল আজ হরে?

সকল ধনের নিদান তুমি, তুমিই পরশ মণি,
লৌহকে মোর স্বর্ণ করে' কর্‌লে মোরে ধনী,
অশ্রু মোতির রজের রথে
ছুট্‌ত হৃদয় ব্রজের পথে
বাজ্‌ত মনে বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশীর ধ্বনি,
হৃদয়-গুহায় চুপে চুপে
রাজ্‌ত "যুগল," গৌর-রূপে,
তোমার কৃপায় পেয়েছিলাম কৃষ্ণ প্রেমের খনি,
কোথায় গেলে পরশমণি আমার নয়ন মণি।

না জানি কোন মোহের ঘোরে কোন সে সকাল বেলা
নভেল প'ড়ে ক'রেছিলাম তোমায় অবহেলা,
লুকা'লে তাই অভিমানে
কোনখানে সে কেউ না জানে,
মুখ পানে চাও, শেষ করে দাও লুকোচুরীর খেলা,
ডাক্‌ছি তোমায় নয়ন নীরে
হৃদ্-যমুনার শ্যামল তীরে
এস ফিরে; আবার সেথায় বসুক্ প্রেমের মেলা,
পারের কড়ির যোগাড় করি জীবন-সাঁঝের বেলা।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপ-রেখা

প্রত্যেক রূপের সঙ্গে রূপের ডৌলটি কতকগুলি রেখা দিয়ে সুনির্দ্দিষ্ট আকারে আমাদের চোখে পড়ে এবং তাই দিয়ে আমরা বুঝি এটি এ, ওটি তা। ইনি অমুক তিনি অমুক, এটা মানুষের মুখ না দেখেও খুব দূরে থেকে চিনি, মানুষটি যে কে তা বুঝি এই সমস্ত রেখা দিয়ে যা তার রূপের সঙ্গে এক হয়ে আছে! রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন মানুষটি চড়াতে হল তখন তার নিজের রূপটি নিয়ে বা রূপরেখাগুলি নিয়ে কায হল না—অন্য এক প্রস্থ রেখা দিয়ে তাকে ভিন্ন রূপ করে নিতে হল। এখন, যে রূপকার রঙ্গমঞ্চের চরিত্রগুলিকে নির্দ্দিস্ট রূপ দিয়ে উপযুক্তভাবে সাজাবে সে যদি দক্ষ না হয় রূপ-রেখার বিষয়ে, তবে নানা অঘটন উপস্থিত হয় অভিনয়ের রস ফোটবার কাযে, তেমনি ছবিতে—রেখার রহস্য ভেদ করতে যে পারলে না, রূপকে দিয়ে রসও ফোটাতে সে পারলে না—রেখার ঘোর পেঁচ্ দিয়ে সে চমক লাগিয়ে দিলে, হয়তো সে ভাবে তান মানের কর্ত্তব দিয়ে চমকে দেয় তথাকথিত কালোয়াৎ সমস্ত শ্রোতার কান, কিম্বা জমকালো সাজগোজ দিয়ে ভুলিয়ে দেয় যাত্রার অধিকারি দর্শকের চোখ সেই ভাবে বিস্ময় জাগালে—কিন্তু একে রূপদক্ষতা বলা গেল না। রূপদক্ষতা সেইখানে যেখানে রূপে-রেখায়, রূপে ভাবে, সুরে কথায় এবং এক রেখায় অন্য রেখায় এক রূপে অন্য রূপে এক সুরে অন্য সুরে একাত্ম হয়ে রস সৃষ্টি করে, রেখা ছাইলো রূপে রূপ ছাইলো রেখায় এমনভাবে যেকেউ কাউকে মারলে না কিন্তু মিল্লো সহজ ছন্দে তখনি হল রস, না হলে বিরস হল ব্যাপারটি।

বর্ষার ধারা—সরু সরু রেখা টেনে আকাশ থেকে পড়ে, হঠাৎ দেখে মনে হয়, একটা আবছায়া ছবির উপরে হাল্কা 'রংএর রেখা টেনে বৃষ্টিছবি সহজেই দেখানো যাবে—আঁক্‌বা মাত্র বুঝি এ বৃষ্টি পড়লো না রেখার জাল পড়লো ছবির উপরে। পদে পদে ঠেকি কেন এই জলের রেখা টানতে? বৃষ্টিধারা রূপ-রেখা দিয়ে সৃষ্টি সেই এক একটি রেখার মধ্যে বর্ষার ছায়া করা রূপ জলের ঝরে পড়ার সুর এবং বৃষ্টি থেমে রোদ ফোটার মাঠের সবুজ হয়ে ওঠার নানা স্বপ্ন এক হয়ে আছে রূপদক্ষতা না পেলে এই রেখা আঁকাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। অলঙ্কারের মধ্যে বৃষ্টি ধারা ধরে নেওয়া চলে—মুক্তার ঝুরি থেকে আরম্ভ করে সোনার তার দিয়ে বর্ষার একটা প্রতীক ধরে নেওয়া যায় রেশমের পর্দ্দায় কিম্বা আর কিছুতে কিন্তু এই অলঙ্কার শিল্পের উপরের জিনিষ হল রূপদক্ষের হাতের টান! এ কথাতো মিছে নয় যে ভিজে মাটির সুবাসে ভরপুর জল-ঝরার শব্দে মুখর রেখার টাঁন কথার টান সুরের টান রূপদক্ষের কাচ থেকেই আমরা পেয়েছি। যে রূপ-দক্ষ ওধারে বসে কায করছেন আর যে রূপদক্ষ আমাদের মাঝে বসেই কায করছেন—দুজনেই রূপ রেখার অধিকারি।

প্রকৃতির লীলা যা চলেছে আমাদের চোখের সামনে—তা নিরীক্ষণ করে দেখলে দেখি তার

মধ্যে কারিগর এবং রূপদক্ষের হাত একই সঙ্গে কাষ করছে—কারিগর বাঁধলে নানা রেখা দিয়ে গাছের কাঠামো, পাতার শিরা উপশিরা, জীবের অস্থিপঞ্জর এমনি কত কি একেবারে শক্ত করে বাঁধা রেখা দিয়ে, আর রূপ-দক্ষ লীন করে দিলেন এই বাঁধা রেখার কসন এবং কর্কশতা, রূপ-রেখার আবরণ-অবগুণ্ঠন পড়লো সবটার উপরে। নরকঙ্কালের বাঁধা রেখা দিয়ে বাঁধা চক্ষুকোটর তাকে ঢেকে রূপ-রেখা টেনে দিলে দুটি কালো চোখের হাসি কান্নার সুরের টান, শক্ত রেখা দিয়ে টানা বাঁশ পাতা তার উপরে রং আর আলো টান টোনের ঘোমটা ফেল্লে! একই সঙ্গে কারিগরি এবং রূপ-কর্ম্ম এ মানুষের কাযেও দেখা দিয়েছে অনেক স্থলে যে রেখায় বাঁধা গেল সেই রেখা দিয়েই ছাড়া পেলে রূপ এই অভাবনীয় দক্ষতা যে লাভ করেছে মানুষ এর পরিচয় ধরেছে তারা পাথরে ছবিতে কবিতায় গানে। দেশভেদে কোনো এক জাতি যে এই রূপরেখা প্রথম পেয়ে গেল তা নয়—যেমন সব ছোট ছেলের মধ্যে দেখা যায় যে বড় হয়ে একটা কেউ হয়ে না উঠেও রূপকথা বলছে,—বেশ গাইছে, বেশ নাচছে, তেমনি সব দেশের মানুষের শিল্প চর্চ্চা করে দেখি দেশে দেশে খুব আদি কালেরও মানুষ রূপ-রেখা বিষয়ে সম্পূর্ণ পাকা হয়ে গেছে! ইতিহাসে অখ্যাত যুগের মানুষ তাদের বাল্যে বিশ্বদেবতার রূপ-রেখা বিষয়ে কত উপদেশ—রূপ-রেখা দিয়ে কেমন করে গড়তে হয়, লিখতে হয়, সুর বাঁধতে হয় তার সব শিক্ষা ধরে দিলেন জলে স্থলে আকাশে—আজও সে শিক্ষার পথ খোলা রয়েছে—শুধু এইটুকু তফাৎ হয়েছে—আগেকার তারা শিখতো রূপ-রেখাকে চোখের সামনে দেখে, আর আজ ছাত্র এবং মাষ্টার দুইদলেই বক্তৃতায় শুনে বুঝতে চলি রূপ-রেখার আমূল তত্ত্ব! দুগ্ধফেননিভ বিছানার কথা শুনে শুনে বস্তুটির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ আর বিছানাটায় একবার গড়িয়ে নিয়ে বস্তুটি কি জেনে নেওয়া দুই রকমের জ্ঞান লাভের মধ্যে প্রভেদ আছে তো! একজন যে রূপ-রেখা টান্‌লে বা রচলে সে এবং যে বই পড়লে রূপ-রেখার হিসেবের কিন্তু টেনে দেখলে না ব্যাপারটা কি—দুজনের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রইলো। যে শুধু গান গাইতে পারে এবং যে গান রচতে পারে দুজনের মধ্যে যেমন স্বর জ্ঞান বিষয়ে বিষম অমিল, তেমনি অমিল কারিগরে আর রূপ-দক্ষে, তেমনি অমিল রূপ-রেখাকে যে জানে আর রূপ-রেখাকে জানেনা কিন্তু রেখা দিয়ে রূপকে বাঁধতে জানে তাদের কাযের মধ্যে। একটি ছোট মেয়ে যে পল্লিগ্রামের দাওয়ায় বসে আলপনা টানছে, কাঁথা বুন্‌ছে—সে পেয়ে গেছে রূপ-রেখাকে কিন্তু একজন মস্ত ইঞ্জিনিয়র যে রুল কম্পাস দিয়ে রেখা টানছে কিম্বা কারখানা ঘরের শিল্পি যে বাঁধা চালে কার্পেটের ফুল তুলে চলেছে—দুজনের মধ্যে কেউ পায়নি রূপ-রেখার সন্ধান—এতো মিছে কথা নয়। এমনি দেখি একজন বাউল পথে পথে ঘুরছে কিন্তু গলার সুরে সুরে রূপ-রেখার টান এসে গেছে তার কাছে, কিন্তু একজন তথাকথিত কালোয়াৎ যে হারমনিয়ম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে সভাস্থলে—চাল দোরস্ত হিন্দি গান কিম্বা হিন্দুস্থানি সুর দিয়ে ঘাড় মোচড়ানো বাংলা কথা—তার ডাকাডাকির ত্রিসীমায় রূপ-রেখা আসছেনা সুরের সূত্র ধরে।

এ-গাছে ও-গাছে এ-ফুলে ও-ফুলে এ-পাখিতে ও-পাখিতে তোমাতে আমাতে শুধু রূপের বিভিন্নতা নয়, চলা বলা ভাবনা চিন্তা কায কর্ম্মও আমাদের এক এক রূপ।

এই যে রূপে রূপে ভিন্নতা এটা সবারই চোখে পড়ছে কিন্তু এই ভিন্নতা টুকু ছবিতে কি কবিতায় কি কথায় ধরে দেখানোর কৌশল সবার কাছে নেই! মানুষে পাখিতে যে একরূপ নয় তা ছোট ছেলেও জানে, তাকে মানুষ আঁকতে বল্লে সে এক প্রস্থ রেখা ব্যবহার করে যেগুলি পাখির বেলায় সে মোটেই ব্যবহার করেনা! যেমন লিখে আমরা জানাচ্ছি মা'নু'ষ এই তিনটি অক্ষর দিয়ে, তেমনি ছেলেও বোঝাচ্ছে এক প্রস্থ রেখা দিয়ে মানুষ। ছেলের লেখা মানুষ যেমন কোনো বিশেষ মানুষ নয় সে তার আপনার মানুষের প্রতীক্ তেমনি রূপদক্ষের লেখা রূপ সেও তার আপনার কল্পিত রূপ, দেখা রূপের ছাপ নয়, কিন্তু এক জায়গায় রূপদক্ষের সঙ্গে ছেলের লেখার পার্থক্য—রূপের বিভিন্নতা দিয়ে রসের বিচিত্রতা ছেলের দ্বারা হয়ে ওঠেনা বড় একটা, তাছাড়া ছেলের হাতের সঙ্গে তার হাতে টানা রেখার একটা আড়ি থাকে—ছেলে জানেনা রেখাকে বাগ্ মানাতে হয় কি উপায়ে! এই যে রেখা-জ্ঞান—রহস্য ভেদ করে তাকে দিয়ে ইচ্ছামতো রূপ বাঁধা এবং রূপে ও রেখায় এক করে দিয়ে রসের পথ খুলে দেওয়া জেনে শুনে এ হল রূপদক্ষের সাধনার বিষয়।

চোখে দেখছি যে সমস্ত বাঁধা রূপ—ঘরে ধরা রূপ বাইরে ধরা রূপ—এরা যদি রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-পটে আঁকা জিনিষগুলোর মতো সম্পূর্ণভাবে অনড় ও অপরিবর্ত্তনীয় রূপে ধরা থাকতো তবে পৃথিবীতে এদের চিত্রিত করতে চাইতোনা বা কবিতায় গানে গল্পে এদের কথা বলতেও চাইতোনা মানুষ। খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো রেখা, মড়ার মতো পড়ে রইলো রেখা—দুটিই অবিচিত্র সম্পূর্ণ নিস্পন্দ এবং অচল এই দুই রেখা বেয়ে চলতে গিয়ে—রেল গাড়ির দৌড়ের ধারে ধারে সাইন্‌বোর্ডগুলো যে ভাবে পড়তে পড়তে চলে যায় যাত্রি—শ্রীরামপুর হুগলী বর্দ্ধমান বোলপুর—সেইভাবে খালি দেখে যায় চোখ আম গাছ জাম গাছ লাল পাখি কালো পাখি এ-দেশ সে-দেশ এ-মানুষ সে-মানুষ, মন খোঁজে চলাচলের বিচিত্রতা কিন্তু পায় না। সৃষ্টির কঠিন নিয়মে বাঁধা সমস্ত রূপ, একের সঙ্গে অন্যের ভিন্নতা দিয়ে বন্দি করা রূপ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই রূপ-মুক্তি কামনা করে এরা মুখ তুলে চাইলে আলোর দিকে, হাত পেতে দিলে বাতাসের কাছে, কবির কাছে, চিত্রকরের কাছে জানালে এরা নানা ছন্দে মুক্তি পাবার কামনা—রূপ বাজলো রূপের কান্না বাজলো রূপদক্ষের মনে, রূপের বেদনার মধ্যে রূপ সমস্ত মুক্তি লাভ করলে—এযেন পাথরে বাঁধা জল নির্ঝর দিয়ে ঝরলো, নদী হয়ে বইলো, রসের সমুদ্রে গিয়ে মিল্লো! বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে রূপ বাঁচলো যখন ভাবকে সে বহন করলে আপনার মধ্যে।

যে পথকে নিরেটভাবে বেঁধেছে রেল কোম্পানী কিম্বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সেই পথের রেখা, আর যে পথকে বেঁধেও বাঁধেনি পথিক সেই "গ্রামছাড়া রাঙ্গা মাটির পথ"—তার টানটোন রূপে

রসে সব দিক দিয়ে বিভিন্ন দেখা যায়—ইস্পাতে বাঁধা পথের রেখা তার সকাল সন্ধ্যার আলোতে সবুজ পৃথিবীর কোলে ছাড়া পাওয়া আঁকা বাঁকা পথের টান্ একে মনকে টেনে নিয়ে যায় দিগন্তরের শ্যাম শোভার মধ্যে আরেকে আস্ত মানুষটাকেই ঝাঁকানি দিতে দিতে, টেনে নিয়ে চলে বন্ধ খাঁচায় ভরে নিয়ে! এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে পথিক তারা চল্লো—তাদের কারু মনে থাকলোনা যে পথ রচনা করছি—অথচ চলার ছন্দে তাদের গাঁয়ের পথ আপনা হতেই তৈরি হয়ে গেল কিন্তু বাঁধা পথের রেখা ইঞ্জিনিয়ার রুল কম্পাস প্লেন্ ধরে তৈরি করছি বলেই টেনে চলে কাযেই সেটা ভয়ঙ্কর রকম ঠিক ঠাক থাকে বলেই রয়াল-রোড্ বা সাধারণ পথ হয়ে ওঠে। গাঁয়ের পথের চলায় যে ছন্দ এবং মুক্তি সেটি সাধারণ সড়ক্ বেয়ে চলার হিসাব থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি ছবি মূর্ত্তি এ সবের যে রেখা তার কোনোটা বেয়ে মন চলতে গিয়ে দেখে—মন রেলে বাঁধা গাড়ির মতো গড়গড়িয়ে চল্লো কিন্তু রেখাকে অতিক্রম করে আর কোনো দিকে চলা তার সম্ভব হলনা। আবার কোনো রেখা গাঁয়ের পথের মতো মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দগতি সেখানে পথের রেখাও যেমন মুক্ত পথের রূপও তেমনি সুবিচিত্র এবং মোটেই বদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ নয়, বাঁধারূপ দেখা থেকে মুক্তি পেয়ে মন সেখানে ডানা মেলে দিলে ভাবের হাওয়ায়। গাঁয়ের পথের রেখা সে বল্লে—আমি পথ বটে আবার পথ নয়ও বটে আমি মুক্ত-রূপ, আর রেল পথ সে কেবলি বলে চল্লো আমি পথ—পথ ছাড়া আর কিছুই নয়—আমি বদ্ধ-রূপ!

রেল পথের মতো কসে বাঁধা রেখা আর গাঁয়ের পথের মতো ঢিলেঢালা রেখা দুই ধরে মন কোন্ দিকে কি ভাবে কত খানি পায় তার দু একটা নমুনা যারা এই দুই পথ চেয়ে চল্লো তাদের দুটো লেখা থেকে বোঝবার চেষ্টা করি, যথা……"পৃথিবী-জোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ করে চলেছি, তখন কেবল শুনছি পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝন্‌ঝনা লৌহ নির্ঝরের মতো ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে!" এখনে রেল চলার শব্দ তার মধ্যেও বৈচিত্র্য আসতে পাচ্ছে অল্পই যুগযুগান্তর ধরে যেন একটানা শব্দের পথ কেটে চলেছে গাড়ি গুলো উপর নীচে আশপাশ কোনোদিকের কোনো খবরই পৌছচ্ছেনা মনে তাই বল্লে মন পুনরায়……"নিশাচর পাখিরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলিয়ে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায় এ তেমন করে যাওয়া নয়—এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ করে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে, আর চলার প্রচণ্ড বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচড়ে চারিদিকে অগ্নিকণা ছিটিয়ে অন্ধকুহরের ভিতর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে!" এই ভাবে চলার ফল তাও আমার নিজের কাছে ধরা পড়েছিল সেদিন যেদিন এই বর্ণনা লিখেছিলেম রেল-রাস্তার, যথা—"সুদীর্ঘ অনিদ্রা, অফুরন্ত অস্থিরতা তার পরে বিরাট অবসাদ—নির্জ্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মতো চুপ করে পড়ে আছে অপার অন্ধকারের মুখে দুই চোখ মেলে!" রূপ দিলে বটে একটা—এই বাঁধা পথের একটানা ভাবে চলা কিন্তু সে হল অবিচিত্র নির্জ্জিত রূপ, মুক্ত রূপ মুক্ত

রেখার আনন্দ যা মালার মতো মনকে দোলায় তা এ লেখার মধ্যে ধরা গেল না—কিন্তু গাঁয়ের পথের মুক্ত রেখা ধরে চলতে চলতে এই গান যে কবি গাইলেন এর মধ্যে দিয়ে মুক্তির স্বাদ আপনা আপনি সহজে পৌঁছলো মনে যেমন—

"গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে—কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥
ওযে—আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে॥
ও সে—কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন খানে কি দায় ঠেকাবে
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে
ভেবেই না কুলায় রে॥"

(রবীন্দ্রনাথ)

রেখামাত্রশেষ যে চন্দ্রকলা সে যেমন পরিপূর্ণ রূপ ও রসের আধার, তেমনি পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডল—রেখায় ঘেরা আলো করা রূপ—সেও রূপে রসে ভরপুর। কিন্তু এই যে খাতার একখানি পাতা যা রেল লাইনের মতো রেখার পর রেখা দিয়ে ভর্ত্তি—সাদা কাগজে রুল টানা হয়েছে এই টুকুইমাত্র বোঝাচ্ছে—এই রুলটানা রেখা সমস্ত চাচ্ছে আঁকা বাঁকা অক্ষর মূর্ত্তির তলায় আপনাকে লুপ্ত করে দিয়ে সার্থক হতে! রূপদক্ষের হাতে টানা রেখা এই ভাবের সার্থক রেখা, বিস্তীর্ণ পটখানির প্রসারের উপরে আকাশের বুকে ধরা চন্দ্র-রেখার মতো—রূপে ভর্ত্তি লেখা! ত্রিপদী চৌপদী নানা ছন্দ আছে যা দিয়ে কবিতার সচ্ছন্দরূপটি বাঁধা হয়ে থাকে, সকোণ নিষ্কোণ নানা রেখা আছে যা নিয়ে রূপের ছাঁদ বাঁধা হয়, সঙ্গীতে টান-টোন তাল লয় ইত্যাদি নানা মাত্রার কসন্ আছে—যা বেঁধে রাখে সুর ও কথা একত্রে, কিন্তু এই যে কথা বাঁধা পড়ছে ছন্দে, রূপ বাঁধা পড়ছে রেখায়, সুর বাঁধা যাচ্ছে তানে লয়ে—এদের সবারই দাবী আছে রূপদক্ষের কাছে—ছন্দ যেন নিগড় না হয় নূপুর কাঞ্চি হয়ে বাজতে থাকে, রেখা যেন বেড়ি না হয় ফুলের মালা হয়ে দোলে, তাল লয় ইত্যাদি যেন ভয়ঙ্কর রকমে ঠিক ঠাক একটা বেতাল হয়ে গলা জড়িয়ে না ধরে "তমাল তালি বনরাজী লীলা" কাজল রেখার মতো যেন তার বাঁধন হয়! অতি প্রকট জিনিষ সুদর্শন হয় না সুশ্রাব্য হয় না সব সময়ে, রেখার টান-টোনের বেলাতেও এই কথা, বেহালার ছড়ি যখন খ্যোঁচ্ খ্যোঁচ্ করে সুর টানতে থাকে তখন

সঙ্গীত কোথায় থাকে ভেবেই পায়না। ছাঁদ্‌লা-তলায় কন্যা বাঁধা পড়ে বরের সঙ্গে একগাছি রক্ত-সূত্রে কিন্তু কন্যার দাবী থাকে—এই বাঁধন যেন নিগড় হয়ে—গলার ফাঁসি হয়ে তাকে পীড়ন না করে। এমনি রূপ ধরা দেয় রেখার বাঁধুনীর মধ্যে কিন্তু রূপের দাবী থাকে রেখার কাছে—রেখার বাঁধুনী যেন রূপকে পরিখার মতো ঘিরে না বন্দি করে—মেখলার মতো, নূপুরের মতো, কাজলের মতো, কূল উপকূলের মতো রেখা যেন রূপের সহচারিণী সহধর্ম্মিণী হয়ে সুরের ছন্দে বাঁধা বীণার ঝক্‌ঝকে তারের মতো বাজতে থাকে, রূপের সঙ্গে এক হয়ে থাকে যেন রেখা, এককে না মারে অন্যে, রূপ ও রেখা দুজনের সত্তা এক হয়ে যেন রস জাগায়।

রূপদক্ষের হাতে টানা রেখা আর খবরের কাগজে যে সব সচিত্র বিজ্ঞাপন বার হয় তার রেখা দুয়ের তফাৎ এইটুকু নিয়ে—রূপদক্ষের রেখা সে রূপ-রেখা, সেখানে রেখা রূপ রং সমস্তই এক হয়ে আছে, কালীঘাটের পটে-টানা রেখা সেখানেও এই হিসেব, কিন্তু বায়স্কোপের দরজায় যে সচিত্র মস্ত মস্ত বিজ্ঞাপন মাসিক পত্রের মলাটে যে রঙ্গীণ আবরণ সেখানে রেখা রূপ রং সবই আলাদা আলাদা বর্ত্তমান।

রূপ এবং রেখা দুয়ের যথার্থ মিলন সপ্রমাণ করে রূপবতী-রেখা, সেখানে রূপকেও পাই রেখাকেও পাই রসকেও পাই একসঙ্গে মিলিয়ে। দপ্তরীর টানা খাতার রেখায় খালি রেখাকে পাচ্ছি এই সোজা সোজা পাহারার মধ্যে একটা রেখা একটু যদি বেঁকে দাঁড়ায় কিম্বা নেচে চলে তখনি খাতার পাতা শুধু আর রেখার সমষ্টি থাকেনা সোজা রেখা বাঁকা রেখায় মিলে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে নক্সা হয়ে উঠতে চলে! যেমন এই রেখায় সম্বন্ধ তেমনি রূপ আর রেখার সম্বন্ধ নিয়ে তবে ছবিতে ফোটে ভাব রস ইত্যাদি। দপ্তরীর রেখা সে যা তাই বলে পড়ে থাকে সোজা, লেখার বেলাতেও তেমনি খাড়া খাড়া শব্দ—কাক বল্লে আমি কাকই আর কিছুই নয় কিন্তু যখন বল্লেম কাক-চক্ষু জল তখন কথা-রূপি কাক এবং জল এবং চক্ষু এরা স্বকীয়তা ছেড়ে তিন সখীর মতো গলাগলি মিল্লো পুকুর পাড়ে! সা, রি, গা, মা, এরা প্রত্যেকে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চল্লো প্রত্যেকের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করে অনেকখানি, তবেই হল গান। এমনি রূপে রেখায়, কথায় কথায়, সুরে ও সুরে, সুরে এবং কথায়, এমন কি বলতে পারি সুরে বেসুরেও একত্রে মিলে তাবৎ রস রচনার সহায়তা করছে দেখি। বাঁধন এবং মুক্তি এরি ছন্দ নিয়ে রেখা হল রূপবতী ছবির বেলাতে, কথার বেলাও এই কথা গানের বেলাতেও ঐ কথা। এক অন্যেতে লীন এই লয়ে বাজ্‌ছে রূপ জগৎটাই একখানি বীণার মতো—যেখানে এই লয় ভঙ্গ হল সেখানেই ব্যাপারটি নিরস হল।

যেমন কথা সুর এবং লয় তেমনি রং রেখা ও রূপ তিনে মিলে এক হতে চায়, রূপদক্ষ সে এদের এক করবার উপায় জানে কিন্তু যে মোটেই দক্ষ নয় সে এদের আলাদা আলাদা রাখে, নয়তো এদের কষ্টে-স্রষ্টে এমনভাবে মেলায় যাতে করে এদের আপনার আপনার ছিরি ছাঁদ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে একটা বিশ্রী জিনিষের সমষ্টি গড়ে ওঠে।

এই যে রূপ-রেখা— যা পরিখার মতো রূপকে আপনার মধ্যে বন্দি করেনা—একে কারিগর নয় রূপদক্ষেরাই খুঁজে বার করেছে—খুব প্রাচীনকালের মানুষ তারা দেখি একদল রেখাকে দিয়ে রূপকে বাঁধছে—হরিণের শিং কাঠের ফলক গায়ের কাপড় কত কিতে টানছে রেখা তারা, কিন্তু রেখা সে রেখা থাকছে, রূপ সে রূপ থাকছে—রেখার অটুট জালে বন্দি রূপ! কিন্তু সেই অতকাল পূর্ব্বেও মানুষের কারিগরিকে সার্থক করতে দুএকজন রূপদক্ষ দেখা দিয়েছিল যাদের হাতের লেখায় রূপ ও রেখা এক হয়ে রয়েছে দেখি এক অন্যের ধর্ম্ম পেয়ে, রূপের কুহকে সেখানে রেখা ভুল্লো রেখার স্বপ্নে রূপ আপনাকে হারালে।

খুব প্রাচীনকালে ইজীপ্তের ভাস্কর্য্য থেকে দেখি রেখাকে সত্যিই দুর্গের পরিখার মতো করে কেটে রূপকে তার মধ্যে বদ্ধ করেছে মানুষ, আমাদের তালপাতার লেখা পুঁথির ছবি সেখানেও রেখার এই ভাব—তারের খাঁচার মতো রেখা ধরে রেখেছে রূপকে! কিন্তু মানুষের মূর্ত্তি শিল্প যখন যেখানে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা পেয়েছে সেখানে দেখি—রেখা থেকেও নেই, রূপের হিল্লোলে ভাবের বাতাসে রেখা স্রোতের জলে মালার মতো ভরা পালের বাঁকটির মতো কখন রূপের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রইলো কখন বা রূপের গরবে ভর্ত্তি হয়ে থাকলো।

যেমন রূপটির সঙ্গে রেখা ঠিকভাবে মেলাতে পারলে রেখা হয় সুন্দরী, তেমনি রূপও হয় সুন্দর যখন ঠিক রেখাকে সে পেয়ে যায়।

খাতার পাতায় টানা রেখাগুলি রূপ না পেয়ে যেমনভাবে আছে তেমনিই যদি থাকে তো আমরা পাতাটাকে বিশ্রী বলিনে রেখা গুলিকেও বিশ্রী বলিনে—সাদা পাতায় সাদাসিধে রেখা তারা দুয়ে মিলে একটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করলে যেমন সাদা সাড়ির কিনারায় কিনারায় পাড়ের টান কিম্বা বীণা দণ্ডের উপরে ঝক্‌ঝকে গুটিকতক তারের টান। এই ভাবের একাকিনী রেখা সে রইলো যেন না-বাজা বীণ। খাতার রেখাগুলি তারা চাইছে অক্ষর মূর্ত্তিকে পেতে, বীণার তার তারা চাইছে স্বর মূর্ত্তিকে পেতে, যখন সেই মিলনটি ঘটলো তখন সার্থক হল বীণা এবং খাতা দুইই। এ না হলে শুধু দৃষ্টিসুখটুকু দিয়ে গেল মাত্র সুদৃশ্য যে রেখা ও টান সে শুধু চোখের বস্তু, অলঙ্কার শিল্পে এই সুদৃশ্য রেখা ব্যবহার করা হয়। সুশ্রাব্য ছন্দ ও সুর কিছু না বল্লেও যেমন শ্রবণ মাত্রেই তৃপ্তি দেয় তেমনি একটি নিখুঁৎ সোজা বা সুন্দর বাঁকা রেখার দ্বারায় দর্শন সুখ পাই আমরা। অলঙ্কার দিয়ে মানুষ যখন চোখ ভোলাতে চাচ্চে তখন চোখে পড়ে এমন সব রেখা দিয়ে রূপ বাঁধ্‌ছে। অলঙ্কার গায়েই পরি বা তা দিয়ে একটা পুঁথির পাতা কি ঘরের দেওয়াল কি পাটের কাপড়ইবা সাজাই সেটা বাইরের জিনিষ বাইরে বাইরেই রইলো এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল কায তার কিন্তু মানুষের সুন্দর চোখের ভুরুর ঠোঁটের হাতের আঙ্গুলের আগা থেকে পায়ের আঙ্গুলটির পর্য্যন্ত যে সমস্ত রেখার টানটোন দেখি সেই রেখা সমস্ত তো শুধু মানুষটিকে দেখতে কেমন এইটুকু প্রমাণ করতেই থাকলোনা, সে সব রেখা-ভঙ্গী

সঙ্গীত কোথায় থাকে ভেবেই পায়না। ছাঁদ্‌লা-তলায় কন্যা বাঁধা পড়ে বরের সঙ্গে একগাছি রক্ত-সূত্রে কিন্তু কন্যার দাবী থাকে—এই বাঁধন যেন নিগড় হয়ে—গলার ফাঁসি হয়ে তাকে পীড়ন না করে। এমনি রূপ ধরা দেয় রেখার বাঁধুনীর মধ্যে কিন্তু রূপের দাবী থাকে রেখার কাছে—রেখার বাঁধুনী যেন রূপকে পরিখার মতো ঘিরে না বন্দি করে—মেখলার মতো, নূপুরের মতো, কাজলের মতো, কূল উপকূলের মতো রেখা যেন রূপের সহচারিণী সহধর্ম্মিণী হয়ে সুরের ছন্দে বাঁধা বীণার ঝক্‌ঝকে তারের মতো বাজতে থাকে, রূপের সঙ্গে এক হয়ে থাকে যেন রেখা, এককে না মারে অন্যে, রূপ ও রেখা দুজনের সত্তা এক হয়ে যেন রস জাগায়।

রূপদক্ষের হাতে টানা রেখা আর খবরের কাগজে যে সব সচিত্র বিজ্ঞাপন বার হয় তার রেখা দুয়ের তফাৎ এইটুকু নিয়ে—রূপদক্ষের রেখা সে রূপ-রেখা, সেখানে রেখা রূপ রং সমস্তই এক হয়ে আছে, কালীঘাটের পটে-টানা রেখা সেখানেও এই হিসেব, কিন্তু বায়স্কোপের দরজায় যে সচিত্র মস্ত মস্ত বিজ্ঞাপন মাসিক পত্রের মলাটে যে রঙ্গীণ আবরণ সেখানে রেখা রূপ রং সবই আলাদা আলাদা বর্ত্তমান।

রূপ এবং রেখা দুয়ের যথার্থ মিলন সপ্রমাণ করে রূপবতী-রেখা, সেখানে রূপকেও পাই রেখাকেও পাই রসকেও পাই একসঙ্গে মিলিয়ে। দপ্তরীর টানা খাতার রেখায় খালি রেখাকে পাচ্ছি এই সোজা সোজা পাহারার মধ্যে একটা রেখা একটু যদি বেঁকে দাঁড়ায় কিম্বা নেচে চলে তখনি খাতার পাতা শুধু আর রেখার সমষ্টি থাকেনা সোজা রেখা বাঁকা রেখায় মিলে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে নক্সা হয়ে উঠতে চলে। যেমন এই রেখায় সম্বন্ধ তেমনি রূপ আর রেখার সম্বন্ধ নিয়ে তবে ছবিতে ফোটে ভাব রস ইত্যাদি। দপ্তরীর রেখা সে যা তাই বলে পড়ে থাকে সোজা, লেখার বেলাতেও তেমনি খাড়া খাড়া শব্দ—কাক বল্লে আমি কাকই আর কিছুই নয় কিন্তু যখন বল্লেম কাক-চক্ষু জল তখন কথা-রূপি কাক এবং জল এবং চক্ষু এরা স্বকীয়তা ছেড়ে তিন সখীর মতো গলাগলি মিল্লো পুকুর পাড়ে। সা, রি, গা, মা, এরা প্রত্যেকে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চল্লো প্রত্যেকের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করে অনেকখানি, তবেই হল গান। এমনি রূপে রেখায়, কথায় কথায়, সুরে ও সুরে, সুরে এবং কথায়, এমন কি বলতে পারি সুরে বেসুরেও একত্রে মিলে তাবৎ রস রচনার সহায়তা করছে দেখি। বাঁধন এবং মুক্তি এরি ছন্দ নিয়ে রেখা হল রূপবতী ছবির বেলাতে, কথার বেলাও এই কথা গানের বেলাতেও ঐ কথা। এক অন্যেতে লীন এই লয়ে বাজছে রূপ জগৎটাই একখানি বীণার মতো—যেখানে এই লয় ভঙ্গ হল সেখানেই ব্যাপারটি নিরস হল।

যেমন কথা সুর এবং লয় তেমনি রং রেখা ও রূপ তিনে মিলে এক হতে চায়, রূপদক্ষ সে এদের এক করবার উপায় জানে কিন্তু যে মোটেই দক্ষ নয় সে এদের আলাদা আলাদা রাখে, নয়তো এদের কষ্টে-স্রেষ্টে এমনভাবে মেলায় যাতে করে এদের আপনার আপনার ছিরি ছাঁদ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে একটা বিশ্রী জিনিষের সমষ্টি গড়ে ওঠে।

এই যে রূপ-রেখা— যা পরিখার মতো রূপকে আপনার মধ্যে বন্দি করেনা—একে কারিগর নয় রূপদক্ষেরাই খুঁজে বার করেছে—খুব প্রাচীনকালের মানুষ তারা দেখি একদল রেখাকে দিয়ে রূপকে বাঁধছে—হরিণের শিং কাঠের ফলক গায়ের কাপড় কত কিতে টানছে রেখা তারা, কিন্তু রেখা সে রেখা থাকছে, রূপ সে রূপ থাকছে—রেখার অটুট জালে বন্দি রূপ! কিন্তু সেই অতকাল পূর্ব্বেও মানুষের কারিগরিকে সার্থক করতে দুএকজন রূপদক্ষ দেখা দিয়েছিল যাদের হাতের লেখায় রূপ ও রেখা এক হয়ে রয়েছে দেখি এক অন্যের ধর্ম্ম পেয়ে, রূপের কুহকে সেখানে রেখা ভুল্লো রেখার স্বপ্নে রূপ আপনাকে হারালে।

খুব প্রাচীনকালে ইজীপ্তের ভাস্কর্য্য থেকে দেখি রেখাকে সত্যিই দুর্গের পরিখার মতো করে কেটে রূপকে তার মধ্যে বদ্ধ করেছে মানুষ, আমাদের তালপাতার লেখা পুঁথির ছবি সেখানেও রেখার এই ভাব—তারের খাঁচার মতো রেখা ধরে রেখেছে রূপকে! কিন্তু মানুষের মূর্ত্তি শিল্প যখন যেখানে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা পেয়েছে সেখানে দেখি—রেখা থেকেও নেই, রূপের হিল্লোলে ভাবের বাতাসে রেখা স্রোতের জলে মালার মতো ভরা পালের বাঁকটির মতো কখন রূপের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রইলো কখন বা রূপের গরবে ভর্ত্তি হয়ে থাকলো।

যেমন রূপটির সঙ্গে রেখা ঠিকভাবে মেলাতে পারলে রেখা হয় সুন্দরী, তেমনি রূপও হয় সুন্দর যখন ঠিক রেখাকে সে পেয়ে যায়।

খাতার পাতায় টানা রেখাগুলি রূপ না পেয়ে যেমনভাবে আছে তেমনিই যদি থাকে তো আমরা পাতাটাকে বিশ্রী বলিনে রেখা গুলিকেও বিশ্রী বলিনে—সাদা পাতায় সাদাসিধে রেখা তারা দুয়ে মিলে একটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করলে যেমন সাদা সাড়ির কিনারায় কিনারায় পাড়ের টান কিম্বা বীণা দণ্ডের উপরে ঝক্‌ঝকে গুটিকতক তারের টান। এই ভাবের একাকিনী রেখা সে রইলো যেন না-বাজা বীণ। খাতার রেখাগুলি তারা চাইছে অক্ষর মূর্ত্তিকে পেতে, বীণার তার তারা চাইছে স্বর মূর্ত্তিকে পেতে, যখন সেই মিলনটি ঘটলো তখন সার্থক হল বীণা এবং খাতা দুইই। এ না হলে শুধু দৃষ্টিসুখটুকু দিয়ে গেল মাত্র সুদৃশ্য যে রেখা ও টান সে শুধু চোখের বস্তু, অলঙ্কার শিল্পে এই সুদৃশ্য রেখা ব্যবহার করা হয়। সুশ্রাব্য ছন্দ ও সুর কিছু না বল্লেও যেমন শ্রবণ মাত্রেই তৃপ্তি দেয় তেমনি একটি নিখুঁৎ সোজা বা সুন্দর বাঁকা রেখার দ্বারায় দর্শন সুখ পাই আমরা। অলঙ্কার দিয়ে মানুষ যখন চোখ ভোলাতে চাচ্চে তখন চোখে পড়ে এমন সব রেখা দিয়ে রূপ বাঁধ্‌ছে। অলঙ্কার গায়েই পরি বা তা দিয়ে একটা পুঁথির পাতা কি ঘরের দেওয়াল কি পাটের কাপড়ইবা সাজাই সেটা বাইরের জিনিষ বাইরে বাইরেই রইলো এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল কায তার কিন্তু মানুষের সুন্দর চোখের ভুরুর ঠোঁটের হাতের আঙ্গুলের আগা থেকে পায়ের আঙ্গুলটির পর্য্যন্ত যে সমস্ত রেখার টানটোন দেখি সেই রেখা সমস্ত তো শুধু মানুষটিকে দেখতে কেমন এইটুকু প্রমাণ করতেই থাকলোনা, সে সব রেখা-ভঙ্গী

দর্শকের মনের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ তুলে দিলে, রেখা রূপ রস তিনে মিল্লো সেখানে এবং একেই বলতে হল রূপ-রেখা—বাইরে এর স্থান অন্তরে এর স্থান! গ্রীক মূর্ত্তিতে এই রেখা, বুদ্ধ মূর্ত্তিতে এই রেখা চমৎকারী শুধু রেখা দিয়ে টানা চীন এবং জাপানী ছবিতে এই রেখা, শীতের গাছ মাঠের মাঝে একলা দাঁড়িয়ে নীল আকাশের কাছে সবুজ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছে সেখানেও এই রেখা! একটুকরো পাথর একখানা কাগজ খানিকটা শুকনো কাঠ এদের কি এমন শক্তি আছে যে রসিকের মন টানে কিন্তু এদের যখন রূপদক্ষ রূপ-রেখার সঙ্গে মেলালে তখন মানুষে পাথরে যোগ হয়ে গেল প্রাণে প্রাণে।

মাঠের ধারে পাতা-ঝরা গাছ তার ডাল পালা গুলি রেখার জাল পেতে বাতাস ধরছে যখন তখন আকাশের এবং মাটির সম্পর্কে এসে সুন্দর ঠেকছে তার আঁকা বাঁকা টান টোন কিন্তু কাঠুরে যখন তাকে কেটে ঘরে এনেছে তখন দেখা গেল ধরিত্রী ও আকাশের সঙ্গে যে সম্বন্ধটি নিয়ে শুকনো গাছের আঁকা বাঁকা রেখা-জাল সুন্দর ঠেকছিল সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গাছটি বিশ্রী হয়ে গেছে! বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন যে হতশ্রী গাছ তাকে জ্বালানী কাঠ করে কেউ আর কেউবা সেই কাঠের টুক্‌রো সমস্ত নিয়ে তাদের নতুন করে গড়ন দেয় তখন আবার রূপ-লোকে তাদের স্থান হয়, রূপরেখার মন্ত্রবলে একখানা জ্বালানি কাঠ একটা ভাঙ্গা পাথর এক টুক্‌রো যেমন-তেমন কাগজ রূপে ও রসে ভর্ত্তি হয়ে নতুন প্রাণ পেয়ে যায়।

রেখা নিরূপিত করে দিলে যাকে আঁকা হবে তার স্থানটি চিত্রপট, ডৌল দিলে রেখা, সুনির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী দিলে রেখা এক কথায় রূপের পত্তন দিলে রেখা! ঘর বাড়ি টেবেল চৌকি এদের পত্তন দিতে হল সুনির্দ্দিষ্ট সমস্ত রেখা দিয়ে—কোথাও কসি সে কসে বাঁধলে কোথাও দাঁড়ি দাঁড়িয়ে পাহারা দিলে রূপকে ধরে রাখতে এই ভাবের বন্ধনী রেখা সমস্ত যা রূপদক্ষের হাতের কাছে হাজির রইলো তারা সকলেই ভৃত্যের মতো—তালপাতার লেখা ছবি পাথরের ফলক এবং নানা ধাতুতে নকাসীর কায করতে কাযে এল, এরা সব স্থির রেখা পাহারা দিলে রূপকে—যেমন খাতার রুল টানা অংশ লেখাকে আঁকতে দেয় না বাঁকতে দেয় না তেমনি এই সব বাঁধা রেখা ধরে থাকলো শক্ত করে নানা রূপ। শ্রম-জাত যে সমস্ত শিল্প তাতে রেখার বাঁধুনী প্রধান হয়ে উঠলো কিন্তু মানুষের মানস থেকে জাত হল যখন কিছু তখন এ ধরণের রেখা নিয়ে কায চল্লো না রেখাকে রূপের মধ্যে মেলাতে হল রংএর তলায় তলাতে হল—এতে ওতে তাতে একত্রে গাঁথা হল। ভাল পাথরের মূর্ত্তি সেখানে রেখা কি সুন্দর ভাবে একদিকে বাতাসে মিলিয়ে একদিকে রূপটির ডৌলের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে দেখ! এই যে রেখার সংযোগ রংএর সঙ্গে রূপের সঙ্গে এর রহস্য রূপদক্ষ জানলে কারিগর সে তো জানলে না তাই দুটো থাক হল দুই রকমের শিল্পির মধ্যে। কারিগর সুনির্দ্দিষ্ট প্রকট রেখা ধরে চল্লো রূপদক্ষ অনির্দ্দিষ্ট অপ্রকট রেখা দিয়ে বাঁধলে রূপকে যেন বিনি সুতোর হারে! গাড়ীর চাকায় যে রেখা গুলি দাগলে সামান্য কারিগর এবং যে রেখা টান্‌লে একজন অসামান্য রূপদক্ষ মাথার

এক এক গাছি চুলের টান দেখাতে এই দুই রকমের টান থেকে পরিখা-রেখা আর রূপ-রেখার তফাৎটা বুঝি।

খোন্তা দিয়ে খুঁড়ে চল্লো নানা রেখা মানুষ—যুগের পর যুগ গেল রূপের সঙ্গে মিলতে পারলে না সে সব রেখা—রূপের গায়ে গায়ে থাকে কিন্তু রূপের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না!—বৃষ্টির ধারা যেমন এক হয়ে মেলে বর্ষার মেঘ বাতাস আলো ছায়ার সঙ্গে সে ভাবে মিলতে পারে না—টেলিগ্রাফের তার থেকে লট্‌কানো ঘুড়ির সুতোর মতো ঘরের কোণে ঝুলের মতো ঝুলতে থাকে রূপকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। খোন্তা ফেলে মানুষ তুলি ধরলে যে তুলি রূপকেও টানে রেখাকেও টানে রংকেও টানে মানুষের মনের কথা রূপ-রেখায় ব্যক্ত হল চিত্রপটে, চারিদিকের আলো বাতাসের সঙ্গে পাথরের মূর্ত্তির গায়ের রেখাগুলি মেলাবার অস্ত্র এবং মন্ত্র পেয়ে গেল মানুষ পাষাণ তখন তরল ভাষায় ব্যক্ত করলে মানুষের মনের ছবি! এমনি সঙ্গীতে ও ভাষায়, সুর বার করলে মানুষ সাতটা, কথা বার করলে অসংখ্য কিন্তু মেলাতে পারলে না কতকাল ধরে কথাকে সুরকে সঙ্গীতে; সুর রইলো আকাশে ভেসে শকুনের মতো কথা পড়ে রইলো মাঠে সুর শুধু কথার গায়ে আপনার কালো ছায়াটা বুলিয়ে যেতে লাগলো! নক্সা করতে মানুষ অনেক অনেক রেখা সন্ধান করে বার করে আনলে—যে রেখা জেগে দাঁড়িয়ে আছে, যে রেখা ঘুমিয়ে আছে—সটান অঘোরে যে রেখা আলু থালু বেশে কাঁদছে, যে রেখা শিউরে উঠেছে ভয়ে, যে রেখা দুলে উঠেছে আনন্দে—যে রেখা নুয়ে পড়েছে—ভাবের হাওয়ায়, যে রেখা ঢেউয়ে চলেছে তালে তালে—এমনি কত কি রেখা যার অন্ত নেই এরা সবাই মিলে রূপকে ঘিরে দাঁড়ালো সকোণ নিষ্কোণ নানা ভঙ্গীতে, রূপের পেয়ালার গায়ে গায়ে এরা ছায়া ফেলে অলকা তিলকার মতো থাকলো কারিগরের দ্বারায় রূপ ও রেখার মিলন ব্যাপার এই পর্য্যন্ত এসে থামলো। রূপদক্ষ দেখে বল্লেন "এহ বাহ্য" রূপ যে পিঠে বইতে থাকলো রেখাকে, একি হল! গোণা যায় না এত রেখা রূপের বাঁশী শুনে মুগ্ধ তারা সখীর মতো ঘিরলো রূপকে এ এক শোভা কিন্তু রূপদক্ষ বল্লেন—এহ বাহ্য—রূপের সঙ্গে এক আত্মা হয়ে এরা মিল্লো কই? রূপের সঙ্গে মিলতে পারে যে রেখা তাকে খুঁজতে চল্লো মানুষ যুগ যুগ ধরে সাধনার ফলে পেলে মানুষ রূপ-রেখার দেখা প্রতিপদের চাঁদের মতো যার রূপ!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একখানি পত্র

ভাই মেজদি, তোমায় পত্র লিখতে সত্যি বলচি ভয় করে। কারণ তুমি বারণ মানোনা। সেবারে অত করে মাথার দিব্যি দিয়ে পত্র দিলাম, তবু দেখচি সেখানা 'সাধনায়' ছাপার অক্ষরে বার হয়েছে। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা ও তার সঙ্গে সঙ্গে নাম বেরুণ অবশ্য একটা চাওয়ার জিনিষ। তবুও সানুনয়ে তোমাকে জানাচ্চি যে সে লোভ আমার আর একটুও নেই।

তোমায় পত্র লেখার এত বিপদ জেনেও আজ আবার তোমায় পত্র লিখতে বসলাম। কেন না একটা হাসার কিছু পেলে তোমায় না লিখে থাকতে পারিনে। যতক্ষণ সেটা তোমায় না জানাতে পারি, ততক্ষণ চাপা হাসির চোটে নাড়ী ছিড়ে যাওয়ার মত হয়।

তুমি বোধ হয় জানো—আমি এখন অরক্ষণীয়া এবং নানাদিক হতে আমার অনেক সম্বন্ধও আসচে। সবগুলির কথা জানাতে গেলে হয় একখানা দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত হবে, নয় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত হবে। চিঠিতে তা' অসম্ভব। তাই সে চেষ্টা না করে একবারের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা জানাচ্ছি।

এবারে যিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন—তিনি একজন সহকারী অর্থাৎ সম্পাদক (Editor) কার্য্যাধ্যক্ষ (manager) ইত্যাদি সব। হয়ত এঁর কাগজে পণ-প্রথা সম্বন্ধে অনেক কথা বার হয়েছে, নয়ত এঁর প্রস্তাবে পণপ্রথা সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে;—তাই এঁর দাবী অলঙ্কার অপেক্ষা নগদে অনেক বেশী। লোক পরম্পরায় শুনছি—ইনি ঐ পণের টাকা হতে বিনাপণে বিয়ের আর মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে আড়ষ্ট না হওয়ার সম্বন্ধে একখানি বই লিখে ছাপাবেন—এই মনস্থ করেছেন। উদ্দেশ্য সাধু বলতে হবে। হাঁ শেষের কথাটুকু—অর্থাৎ মেয়ে দেখার সময়ে মেয়েদের আড়ষ্ট ভাবের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যটা নিজের কানে শুনেচি। অর্থাৎ আমি তখন তাঁর সামনে পরীক্ষা দিতে হাজির—রক্তমুখে চোখ নীচু করে সামনের একটা আসনে বসে আছি—এমন সময়ে কানে গেল—হাঁড়িচাঁচা গলায় বলচেন—'দেখুন, আমি এই ভাবটা মোটেই পছন্দ করিনে। এটা মেয়েদের একটা পরীক্ষা। তারা সপ্রতিভভাবে পরীক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে তারা জীবন-পথের বোঝা নয়। এই কথা আমি একখানা বইতে লিখেছি। মেয়ে বেশ সপ্রতিভভাবে পরীক্ষা দিয়ে বার হয়ে এল—বাড়ীর সকলে তাকে বকতে লাগল তার বেহায়াপনার জন্য। মেয়ে আধ আধ গলায় (এ'টুকু অবশ্য তিনি বলেননি আমি জুড়ে দিলাম) বাবাকে এসে আবদারের সুরে বলল—'দেখ বাবা আমি 1st. divisionএ পাশ করে এলুম, তবু সবাই আমাকে বকছে।"

ছোড়দা বইখানার কথায় জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় বইখানা পাওয়া যায় ও বইখানার দাম কত?'

তিনি বললেন—'এখনও বইখানা বার হয়নি তবে প্রকাশ করবার বাসনা আছে—সম্ভবতঃ এই বিয়ের পর পণের টাকা থেকে। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ?'

তাঁর সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন। উচিত ছিল—যত কথা সব তাঁরই বলা। তিনি যে কথা বলতে না জানেন তাও নয়। শুনলাম তিনি বি, এ। কিন্তু এঁর মুখে ফুটছিল খই আর ছুটছিল তুবড়ী। আর তিনি একেবারে বোবা—বোধ হয় এঁর ব্যাপার দেখে।

সত্যি লিখচি মেজদি—পরীক্ষা দেওয়ার ভয়ও ছিল, হাসিও আসছিল। আমার তখন কি রকম স-সে-মি-রে অবস্থা।

এর মধ্যে অর্ডিন্যান্সের কথা উঠ্‌ল। হঠাৎ ভাঙ্গা কাঁসির আওয়াজ কানে গেল—'অ্যাঁ। আমাকেও অর্ডিন্যান্‌সে ধরত। কিন্তু ম্যানেজার বাবু আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে এ যাত্রা খুবই বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

বুঝেছ মেজদি অমৃত বাবুর—'যা করে মোর পোস্টাফিস' গোছের ওর এক ম্যানেজার আছেন। তিনি তাঁর অধীনে sub-managery করেন। সব কথাতেই দেখলাম তাঁরই দোহাই মানা আছে। ছোড়দা হেসে বললেন—'তাহলে দেখছি—আপনিও একদল স্বদেশীদলের পাণ্ডা।'

'অ্যাঁ' আবার সেই আওয়াজ শোনা গেল। 'আমি আসছিলাম খদ্দর পরে আর খদ্দরের গায় কাপড় গায়ে দিয়ে। কিন্তু ম্যানেজার বাবু বলিলেন—'Unless you take a shawl, I won't accmpany you.

দেখলাম—মাইরি বলচি মিথ্যে নয়— আমি সবই লক্ষ্য করেছি—পাশের ভদ্রলোকটি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি যেন কি ইঙ্গিতও করলেন। কিন্তু ইনি তা গ্রাহ্যও করলেন না। সমান উৎসাহে বকে যেতে লাগলেন—'এ শালখানা আমার নয়—আমার এক ছাত্রের। কাজেই কি করি চেয়ে আনতে হল।' ভড়কে যেওনা। এ পর্য্যন্ত বলেও ক্ষান্ত দেননি। দাম শুনিয়ে দিলেন আড়াইশ' টাকা।

আমি বসে বসে শীতকালেও ঘামতে লাগলাম—আর তিনি বকতে লাগলেন। অন্য যারা ছিলেন—তাঁরা সকলেই চুপ। কেবল মাঝে মাঝে ছোড়দা ফোড়ন্ কাটছিলেন। এই সময় ছোড়দা আর একবার ফোঁস করে উঠলেন—'আপনার নাকের নীচে ওটা কি হয়েছে ?' সেটা ক্ষুরের ঘা, সহজে স্বীকার করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু তাহলে যে কথা বলা কম হয়। তিনি বললেন—'আপনারা যা ভাবছেন—ওটা কিন্তু তা' নয়। ও একটা ব্রণ ছেল—কেটে গ্যাছে।'

ছোড়দা হেসে বললেন—'শেষটুকু বললেই হত। আমি ত কিছু ভাবিনি।'

তারপরে এল—আমার পড়ার কথা। তুমি আশ্চর্য্য হবে মেজদি—আমি কিন্তু এবার ফেল করলাম। কিছুই বলতে পারলাম না, ভয়ে নয়—হাসিতে আর বিস্ময়ে। মানুষ কত 'ইডিয়ট' হতে পারে। অথচ তিনি আসলে ইডিয়ট নন—তিনি গ্র্যাজুয়েট।

খেতে দেওয়া হল। তিনি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে লুচির সামান্য একটুকু ফুলকি মুখে দিলেন। শোনা ছিল—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে না খাওয়াটাই ভদ্রতা ছিল কিন্তু এই টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে যখন ঐ সব প্রবঞ্চনা গল্পের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—তখনও এই ব্যাপার। কিন্তু পরে শুনলাম—এর প্রায়শ্চিত্ত তিনি কিরণদা'দের বাড়ীতে রাতে ভাত খেয়ে করেছেন। কিরণদার আত্মীয় হন কিনা, তাই সেখানে রাতে নিমন্ত্রণ ছিল। শেষকালে পাতে দুই'খানি মাছ ছিল—তা' লক্ষ্য করে নাকি বলেছিলেন—'মাছ কখানা খেয়েই উঠি।'

উঠোনা মেজদি! এখনও চাট্‌নি আছে। ছোড়দা চা করতেই গিয়েছিলেন। তাঁর বোধ হয় দেরী সচ্ছিল না, পাশের ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে বললেন—'একটু চা দেবে না?' কিন্তু মজার কথা মেজদি—যেই ছোড়দা চা আনলেন, অমনি বলে উঠলেন—'আমি কিন্তু চা খাইনে, তা দিন—আজ একটু খাওয়াই যাক।'

অবিশ্বাস করোনা। আমি এর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। যা হলপ করতে বলো, তাই পারি। এখন বলো দেখি আমি যদি এই জানোয়ারটিকে পছন্দ করতে না পারি—তাও কি আমার দোষ?

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

তিলক চরিত

তিলকের পূর্ব্বে পুণার সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণেডে। এক হিসাবে তাঁহাকে কেবল পুণার নহে সমস্ত হিন্দুস্থানের গুরু বলা যাইতে পারে। এমন কোন প্রদেশ নাই যেখানকার সুশিক্ষিত লোকেরা সে সময় রাণাডেকে তাঁহার পাণ্ডিত্য, রাজনীতি-কুশলতা এবং স্বদেশ-প্রেমের জন্য গুরু বলিয়া মানিত না। গত ২০।২২ বৎসরের মধ্যে অনেক নবীন রাজনৈতিকের নেতৃত্বে আমাদের দেশের অপ্রত্যাশিতরূপে উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এখনও রাণাডের নাম করিলেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার যোগ্যতা স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে বন্দনা করেন।

দেশের সর্ব্ব প্রকার সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় হইতে পারেন নাই। প্রার্থনা সমাজ বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তিনি গোঁড়া হিন্দু সমাজে অপ্রিয় হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্য তাঁহার রাজনৈতিক নেতৃত্বও কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল। কিন্তু লোকমতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তিনি সারা জীবন দিবারাত্রি সর্ব্ব প্রকার সংস্কারের আন্দোলনে নিরত ছিলেন। তিনি যেমন জন সাধারণের মতামতের পরোয়া রাখিতেন না—তেমনই সরকারের অনুগ্রহ নিগ্রহেরও পরোয়া রাখিতেন না। ইংরেজ জাতির গুণের তিনি আদর করিতেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কখনও তাহাদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি করিতেন না। উদার

মতের দেমাক দেখাইবার জন্য কখনও তিনি পারতপক্ষে সাহেবদিগের গৃহে ভোজন করিতেন না কিম্বা তাঁহাদের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতেন না, তাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ হইলে তাহা স্পষ্ট ভাবে লিখিয়া কিম্বা বলিয়া প্রকাশ করিতেন। মোটের উপর অপরের অসম্মান কিম্বা নিজের অপমান হইতে পারে এরূপ আচরণ রাণাডে কখনও করিতেন না। তেলঙ্গ এবং ভাণ্ডারকর বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণাডেকে সরকার সে সম্মান কখনও দেন নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য যে কম ছিল তাহা নহে। কিন্তু সরকার তাঁহার প্রতি তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। তেলঙ্গের পরে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে যে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা কেবল গত্যন্তর ছিল না বলিয়া। তিনি এল, এল, বি এবং এড্‌ভোকেটশিপ দুইটী পরীক্ষা পাশ করিয়াও ব্যবহারাজীবের ব্যবসার উপর আন্তরিক বিরাগ ছিল বলিয়া সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। যদি তিনি দাদাভাইর মত অন্য কোন ব্যবসা গ্রহণ করিতেন কিম্বা বিষ্ণুশাস্ত্রী এবং তিলকের মত স্বার্থ-ত্যাগ করিয়া কোনও বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাঁহার আরও যশোলাভ হইত। কিন্তু সরকারি চাকুরি করিয়াও তিনি যেরূপ দেশসেবা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। রাণাডে মনে করিতেন সে সরকারি কর্ম্মচারিরা একেবারে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দিলেই হইল। সূক্ষ্ম পরদার আড়াল রাখিলে আর দোষ নাই। তিনি এমন ভাবে কাজ করিতেন যে সরকারি তরফ হইতেও প্রকাশ্যভাবে তাহাকে দোষ দেওয়ার উপায় ছিল না। যে দুই চারি জন লোক রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত রাণাডে তাঁহাদের অন্যতম। রাষ্ট্রীয় সভা স্থাপনের পূর্ব্বেও পুণায় যে সব আন্দোলন হইয়াছিল সরকার মনে করিতেন রাণাডের সহিত তাঁহার নিকট সম্বন্ধ ছিল। গোপাল রাও গোখ্‌লে রাণাডের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন। তিলক অনেক বিষয়ে রাণাডের প্রতিপক্ষীয় হইলেও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াও তিনি রাণাডে সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত কথা বলিতেন। পাণ্ডিত্যের হিসাবে তিলক প্রাচীন কালের হিমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের সহিত রাণাডের তুলনা করিয়াছেন। রাণাডের বিদ্যা যেমন বহু বিষয়িণী ছিল, তিনি যে সকল সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও সেইরূপ বিবিধ প্রকারের ছিল। বসন্ত ব্যাখ্যান মালা, প্রদর্শন, ফিমেল হাই স্কুল, প্রার্থনা-সমাজ, লাইব্রেরি সার্ব্বজনিক শোভা পুণায় এমন কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠান ছিলনা যাহার প্রকাশ্য কিম্বা গুপ্ত পরিচালক-দিগের মধ্যে—রাণাডে ছিলেন না। একথা সরকার বাহাদুর অনেকদিন হইতেই জানিতেন। টেম্পল্ সাহেবের আমলে রাণাডের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা না হইলেও অভিযোগ নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। ১৮৭৪ সাল হইতে ৭৯ সাল পর্য্যন্ত ভাবি রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্ব্বচিহ্ন পুণা নগরে বহু প্রকারে প্রকটিত হইতেছিল। ১৮৭৪।৭৫ সালে বরদার রাজা মহ্লাররাও গাইকোয়ারের বিরুদ্ধে তথাকার রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফ্রেয়ারের প্রতি বিষপ্রয়োগ করিবার অভিযোগ হয়, এবং একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়া তাহার তদন্ত করা হয়। এ ব্যাপারের আগাগোড়াই অসাধারণ। মহ্লাররাও নবাবি মেজাজের

উচ্ছৃঙ্খল সামন্ত নরপতি, রেসিডেণ্টের চামড়া সাদা কিন্তু তিনিও নবাব, তাঁহার নবাবি মেজাজের উত্তাপে দাদাভাই নেউরজীর মত শান্ত প্রকৃতির মনুষ্যকেও বরদার দেওয়ান-গিরি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। অভিযোগও এমন ভয়ঙ্কর যে তাহার প্রকাশ্য তদন্ত না হইলে কাহারই মনের সন্দেহ দূর হইত না। এত বড় সামন্ত রাজাকে আসামী করিয়া অভিযোগের তদন্ত করিবার ইংরেজ আমলে এই ২য় দৃষ্টান্ত। সমস্ত ভারত বক্ষে এই মামলার সাড়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রেই এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে আন্দোলন হয়। কমিশনের তদন্ত অবশ্য দোতরফা হইবে। সরকারের পক্ষে উকিল ব্যারিষ্টারের অভাব ছিলনা, কারণ, পয়সারও অভাব ছিল না। কিন্তু মহ্লাররাও আটক হইয়া ছিলেন বলিয়া পয়সা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন ছিলেন। বিপদের আশঙ্কা দেখিয়াই তিনি মোটা রকমের টাকা সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। লক্ষ টাকার নোট, খাস তহবিলের টাকা জহরৎ প্রভৃতি সমস্তই ইংরেজ কর্ম্মচারিরা বাজেয়াপ্ত করিয়া সিল মোহর করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া উকিল ব্যারিষ্টার রাখিবার টাকার জন্য তাঁহাকে সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত। এই কাযের জন্য মহারাজকে কত টাকা দিতে হইবে তাহা লইয়া কথাকথি আরম্ভ হইয়াছিল। মহারাজের সলিসিটর ছিলেন জেফারস্‌ন ও পেইন্‌। তাঁহারা মোকদ্দমার খরচের জন্য ৪৩২০০০, টাকার আনুমানিক হিসাব দিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার পক্ষ এত টাকা দিতে নারাজ। অবশেষে মহ্লররাও বড়লাট সাহেবের নিকট তার করিলেন যে পয়সা অভাবে তাহার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা হইতেছেনা, বরদার কোষাগার হইতে অবিলম্বে তাহাকে ২০০০০০, টাকা দেওয়া হউক। সলিছিটররা তাহার হিসাব দিবেন। Deeply pained to learn from my Solicitors that preparation for my defence is at a standstill for want of funds, their requirements for legitimate expenses not granted. Promises of ample opportunity for vindicating my innocence thus practically ignored. Private purse attached. Rani's marriage ornaments and money seized. My character, liberty and kingdom at stake. এই তারের কথা রাষ্ট্র হইবামাত্রই সমগ্র মহারাষ্ট্রে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মহ্লারাওর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কাহারও সহানুভূতি ছিলনা। কিন্তু সকলেরই মনে হইল সে মামলায় ঝোলাইবা উকিল মোক্তারের পয়সা না দেওয়া একটা সরকারি ফন্দি মাত্র। ইহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছিল কেবল পুণার লোকেরা। তাহারা বরদায় ও লাটসাহেবের নিকট তার করিল যে মহারাজের পক্ষ সমর্থনের জন্য মহারাষ্ট্রবাসী এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত চান্দা দিতে প্রস্তুত। তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবহারাজীবের ব্যবস্থা করা হউক। পরে সরকার বাহাদুর মামলা খরচের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ভাল ব্যারিষ্টার আসিয়া মহারাজকে বাঁচাইবার যথাযোগ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং পুণাবাসিগণের তাঁহার জন্য একটী পাইও খরচ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে পুণার যেমন বাহিরে নাম পড়িয়াছিল তেমনই পুণা সরকারের চক্ষুশূল

হইয়াছিল। পুণা সহরে গোয়েন্দা পুলিসের আনাগোনা চলিতে লাগিল। টেলিগ্রাম প্রকাশ্য ভাবে স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারেরই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মূল বাহির করিবার সরকারি বানর বৃত্তি প্রসিদ্ধ। সুতরাং পুলিসের লোকেরা খুব জোর তদন্ত চালাইয়াছিল। এ সকল ব্যাপারে সাধারণতঃ বড় বড় লোকের উপরই সন্দেহ হয়। মাধব রাও রাণাডের উপরও হইয়াছিল। এবং অনেক দিন পুণায় থাকার অজুহাতে তাঁহাকে নাসিকে বদলি করিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীমতী রমাবাই রাণাডে তাঁহার পুস্তকে সে কালের একজন বড় গোয়েন্দা পুলিস কর্ম্মচারির একটী মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। এই ব্যক্তি খুব বড় মানুষের মত পুণায় থাকিত এবং তাহার বাড়ীতে অনেক ভাল ভাল লোকের আড্ডা জমিত। সীতারাম পন্ত চিপ্লুনকরের নিকট রাণাডে ইহার কথা শুনিতে পাইয়া ইহার পত্র কোথায় যায় কোথা হইতে আসে তৎ সম্বন্ধে গোপনে তদন্ত করেন। তদন্তে বাহির হইয়া পড়ে যে ইনি গোয়েন্দা। "তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে সীতারাম পন্ত চিপ্লুন আসিয়া বলিলেন যে কাল ও পরশু আমি ইহার চিঠি পত্রের খোঁজ লইয়াছি। ডাক পিয়নের হাতে ইহার চিঠি আসেনা। লোকটা সকালে উঠিয়া বেড়াইবার জন্যে বাহির হয় তারপর এরাস্তা ওরাস্তা এগলি ওগলি ঘুরিয়া জেনারেল পোষ্টাফিসে যাইয়া নিজের হাতে চিঠি আনে ও নিজের হাতে ডাক ঘরে চিঠি ফেলে। কাল হইতে অনেকদূর দিয়া ইহার পিছন পিছন ঘুরিয়াছি। পথে যাইতে যাইতে ইহার চিঠির ছেঁড়া লেপাফা পাইয়াছিলাম, তাহার উপর সিমলার ছাপ আছে। সুতরাং আমার মনে হয় যে আপনি যে সন্দেহ করিয়াছেন তাহার অনেকটা ভিত্তি আছে। পোষ্টাফিসের একজন বন্ধু আমাকে এই মাত্র বলিলেন যে এই লোকটা কলিকাতা ও সিমলা গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারির সহিত পত্র লেখালেখি করে বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহাদের নামে ইহার নিকট হইতে অনেক পত্র যাইতেছে।" গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ হইবামাত্রই এক দিনের মধ্যেই এই ভদ্রলোকের পুণাবাসী বন্ধুগণ তাহার গৃহ বর্জ্জন করিলেন, আর তিনিও এক রাত্রির মধ্যেই বাসা তুলিয়া অদৃশ্য হইলেন। রাণাডে পরের চিঠির উপর নজর রাখিয়াছিলেন তাই তাঁহার চিঠির উপর সরকারি নজর পড়িল, নাসিক হইতে তিনি ধুলেতে বদলি হইলেন, কিন্তু তাঁহার উপর সন্দেহ দূর হইল না। ১৮৭৯ সালে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের বিদ্রোহের ধুমধাম চলিতেছিল। এই বৎসরের ১৬ই মে রাণাডের পুণা অবস্থান কালে বুধবার ও বিশ্রাম বাগের প্রাসাদ দুইটী রাণাডে নামধারি এক ব্যক্তি পোড়াইয়া ফেলে, এবং সেই হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত সরকারি হুকুমে তাঁহার চিঠি পত্র খোলা হইতে লাগিল। ইহা কেবল অনুমানের কথা নহে। যিনি চিঠি খুলিতেন সেই পোলন সাহেব নিজে রাণাডের নিকট ক্ষমা চাহিয়া চিঠি খোলার কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। রাণাডের নামে যে সকল পত্র আসিত তাহাতে দাঙ্গা লুট ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অনেক কথা থাকিত। বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে কিম্বা হরি রামসির নিকট পত্র লিখিবে কেন? তাঁহার নিকট এরকম পত্র লিখিত পুলিস আর সে

পত্র খুলিতেন সরকার। রাণাডের হাতেও যে অবস্থায় পত্র আসিত তিনি সেই অবস্থায়ই পুলিসের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ অনেক দিন চলিয়াছিল। কালক্রমে রাণাডে সম্বন্ধে সরকারের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রচালক বলিয়া তাঁহার প্রতি সরকারের যে রাগ হইয়াছিল তাহা কোন দিনই একেবারে দূর হয় নাই। রাণাডে ধুলা হইতে পুনরায় পুণায় আসিলেন। পুণা হইতে বোম্বাই গেলেন এবং প্রথম হইতে আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিলেন। রাণাডে এবং তিলকের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ খুব বেশী ছিল। তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিলক রাণাডের নিকট হইতে খুবই উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন।

তিলকের পূর্ব্বে পুণায় যে খুব বড় একটী সমিতি ছিল তাহার কথা বলিয়া এই দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করিব। এই সমিতির নাম সার্ব্বজনিক সভা। বোম্বাই এসোসিয়েশনের অনুকরণে ১৮৬৭ সালে পুণা সহরে পুণা এসোসিয়েসন নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। সে সময় পার্ব্বতী মন্দিরের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল এবং তাহার সংশোধনের ইচ্ছা জনসাধারণের মনে জাগরূক হওয়াতে এই সমিতি স্থাপিত হয়। পার্ব্বতীর ব্যবস্থার জন্য পঞ্চায়েত ছিল সত্য—কিন্তু রীতিমত হিসাব রাখা হইত না এবং যোগ্য রীতিতে খরচ করাও হইত না। এই সকল ত্রুটী দূর করিবার জন্য একটী সমিতি স্থাপিত হয়, এবং পরে সেই সমিতি হইতেই পুণা এসোসিয়েসনের সৃষ্টি হয়, এবং তাহার দৃষ্টান্তে পরে সার্ব্বজনিক সভা স্থাপিত হয়। পরিশেষে পুণা এশোসিয়েসন সার্ব্বজনিক সভার সহিত মিলিত হইয়া যায়। এবিষয়ের অগ্রণী ছিলেন কাশীনাথ পন্থ গাড়্‌গীল, কাশীনাথ পন্থ নাতু, কাশীনাথ পন্থ মরাঠে এবং কেশব রাও গডবোলে প্রভৃতি। তাঁহারা স্থির করেন যে পার্ব্বতী মন্দিরের ন্যায় অন্যান্য অনেক বিষয়েও সভা দৃষ্টি দিবেন এবং সভাকে বাস্তবিক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক একখানি কাগজ সহি করেন। সভায় ধনিদরিদ্র সকলেই এই সভার সভ্য, এবং জনসাধারণে ও সরকার-দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সে কালের মহারাষ্ট্রের বড় বড় সামন্ত ও সরদারদিগকে সভাপতি ও সহকারি সভাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সরদার রাজমাচিকর, সরদার গোখলে, উকিল বাবা গোখলে, গণেশ বাসুদেব গুরকো কাকা যোশী এবং পাণ্ডুরঙ্গ পন্থ কারবে। ইহাদের মধ্যে যোশীই বিশেষ উদ্যোগী এবং পরিশ্রমপরায়ণ ছিলেন। এখনও পুণাবাসিগণ তাঁহার নাম সসম্মানে স্মরণ করে।

১৮২৮ সালে যোশীর জন্ম হয়, পয়সার অভাবে তিনি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে তিনি ওকালতি পরীক্ষা পাশ করিয়া পুণায় আইন ব্যবসায় করিতে থাকেন এবং তাহাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু নিজের ব্যবসা অপেক্ষাও সার্ব্বজনিক আন্দোলনের দিকে তাঁহার অধিক লক্ষ ছিল। এবং সেইজন্য সকলে তাঁহাকে সার্ব্বজনিক কাকা বলিয়া ডাকিত। মহল্লার রাও মহারাজের বিচার করিবার জন্য যখন কমিশন বসে তখন যোশীর চেষ্টায়ই পুণা হইতে

লক্ষ টাকা চান্দা দিবার তার গিয়াছিল। অন্যদিকে তিনি গরীব কৃষকদিগের কল্যাণ চেষ্টায়ও সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। পুণায় শালিসি বিচারালয়ের স্থাপনা তিনিই করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় স্বদেশী আন্দোলনের জনকও তিনিই; কোন আন্দোলনে সফলতা লাভ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন, যোশী সে সকলেরই অধিকারী ছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে তিনি অন্যান্য বড় মানুষের মত পোষাক পরিচ্ছদ করিতেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন সুরু হওয়া মাত্রই তিনি তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ একেবারে বদলাইয়া ফেলিলেন।

সভাসমিতির ইতিহাসই দেশের ইতিহাস আর সভাসমিতি বহুজনের সম্মিলিত চেষ্টার ফল ব্যতীত কিছুই নহে। যে শক্তি একের নাই অনেকের সম্মিলনে তাহা পাওয়া যায়। যে গুণ একে পাওয়া যায় না অনেকের মিলনে তাহা কার্য্যকরী হয়। এই জন্যই ব্যক্তি অপেক্ষা সমিতি অধিক বলবান, অধিক আয়ুষ্মান এবং সমাজের যোগ্যতর প্রতিনিধি। অবশ্য এ কথাও বলা যাইতে পারে যে দশের কাজ কাহারও নিজের কাজ নহে। যে দায়িত্ব দশ জনের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে কাহারও স্কন্ধে পড়ে না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক দেশেই দায়িত্বহীনতার জন্য গতায়ুঃ সমিতির জন্য কার্য্যক্ষম দীর্ঘায়ু সমিতির সংখ্যা অধিক। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমিতি ছিল কিন্তু ঐহিক উন্নতি সাধন কিম্বা রাজনীতি আন্দোলনের জন্য কোন সমিতি ছিলনা, তাহার সৃষ্টি হয় ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পর। ১৮৭১ সালে সিন্ধিয়া মহারাজ যখন পুণায় আসিয়াছিলেন তখন যে সকল অনুষ্ঠান মহারাজের নিকট আর্থিক সাহায্য লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা জ্ঞান-প্রকাশে বাহির হইয়াছিল। সেই তালিকায় নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলির নাম পাওয়া যায়,—১। লাইব্রেরি ২। নারী-দিগের নর্ম্মাল স্কুল ৩। বালিকা বিদ্যালয় ৪। নূতন পেটের ভিক্ষা গৃহ ৫। বে-সরকারি ইংরেজী বিদ্যালয় ৬। জ্ঞান প্রকাশ জ্ঞান চক্ষু কারখানা, ৭। ডেকান কলেজ ৮। সার্ব্বজনিক সভা। ৯। বক্তৃতোত্তেজক সভা ১০। কোশল্য শিক্ষক সভা। এখন অবশ্য সভা-সমিতির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তিলকের আগে ও তিলকের পরের সভাসমিতি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অর্থবল, জনবল ও জনসমাজের প্রভাবের হিসাবে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা যে কেহ অনুভব করিবেন। এই প্রভেদের জন্য তিলক ও তাঁহার সহকারী বন্ধুগণ কি করিয়াছেন তাহা তিলক চরিত্রের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে দেখা যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

রক্ত গোলাপ

মানুষ ভালবাসা পেতে চায়, কিন্তু এ জগতে যে ভালবাসা পায় না, তার দীর্ণ প্রাণের বেদনা যে কত গভীর—ব্যথিত ছাড়া তা' আর কেউ বোঝে না।.........

রাজকন্যা আব্দার করেছেন তাঁকে একটা রক্ত গোলাপ এনে দিতে হবে, রাজপুত্র তারই খোঁজে বেরিয়েছেন। সমস্ত বাগান খুঁজে একটাও ফুল মিল্‌লো না, রাজপুত্র নিরাশ হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

বকুল গাছের মধ্যে দিয়ে বুলবুলি এসব দেখ্‌লে। তার ব্যথাহত প্রাণটা আপনা হতেই গুম্‌রে উঠ্‌লো।

রাজপুত্রের চোখ দুটো লাল হয়ে এল। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"মানুষ সুখী হয় কিসে?—ঐশ্বর্য্যের বাহ্যিক আড়ম্বরের পর্দ্দা দিয়ে আমরা ঢেকে রাখ্‌তে পারি বাইরের দৈন্যকে, কিন্তু মনের দীনতা তো ঢেকে রাখ্‌বার নয়।"

বুলবুলি ভাব্‌লে,—"এতো দেখ্‌ছি একজন সত্যিকারের প্রেমিক। রাতের পর রাততো এঁরই গান গেয়ে এসেছি, তবু এঁকে চিন্তে পারিনি। জ্যোৎস্না রাতে এঁরই কথা আমি চাঁদের কাছে বলেছি তবু এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়নি।—যাক্ এতদিনে দেখা পেলুম। কি চমৎকার এঁর চেহারাখানা!—চুলগুলো রেশমের মত চক্‌চকে, ঠোঁট দু'খানি যেন রাঙা জবা।"

রাজপুত্র হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন,—"আজ রাজবাড়ীতে উৎসব!—রক্ত গোলাপ নিয়ে গেলে মিলন হবে। কি হতভাগ্য আমি, দেশে একটা সামান্য ফুল মিল্‌লো না।"

বুলবুলি আবার ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"এতদিন আমি যে গান গেয়েছি, তাইতো এঁর প্রাণে ব্যথা হয়ে বাজ্‌ছে! বাঃ এতো ভারি মজা—আমার কাছে যা' আনন্দ, এঁর কাছে তাই কান্না!"

রাজপুত্র বল্লেন,—"সভায় এসে রাজকন্যা কত লোকের সঙ্গে হেসে কথা বল্‌বে, কিন্তু রক্ত গোলাপ না পেলে আমার দিকে ফিরেও চাইবে না।" তিনি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

গাছের একটা সবুজ পাতা বল্লে,—"আহা, বেচারা কাঁদ্‌ছে কেন?"

সেই পথ দিয়ে একটা প্রজাপতি যাচ্ছিল সে বল্লে,—"তাইতো, আহা কাঁদ্‌ছে কেন?"

পাশেই একটা গাছে একটা গাঁদা ফুটেছিল। সেও সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লে,—"আহা, কাঁদ্‌ছে কেন? কি দুঃখু ওর?"

বুলবুলি বল্লে,—"উনি চান একটা রক্ত গোলাপ।"

তারা সকলে বল্লে,—"অবাক্ কল্লে, একটা রক্ত গোলাপের জন্য কাঁদ্‌ছে!"

সবুজ পাতা সব-পেছনে ছিল সে শুনে হো-হো করে হেসে উঠ্‌লো।

বুলবুলি কিন্তু রাজপুত্রের ব্যথা বুঝ্‌লে। সে ডালের ওপর বসে প্রেম-রহস্যের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ তার ছোট পাখাগুলো মেলে বাতাসে ভর করে, কত রকম লতানো গাছে ঘেরা কুঞ্জবনের পাশ দিয়ে সে উড়ে গেল, ছায়ারি মত।

বাগানের মাঝখানে একটা সুন্দর গোলাপ গাছ ছিল। বুলবুলি তারই একটা ডালে গিয়ে বস্‌লো। বল্লে,—"আমাকে একটা রক্ত গোলাপ দেবে ভাই, আমি তোমাকে আমার সব চেয়ে যে ভাল গান তাই শোনাব।"

গাছ মাথা নেড়ে বল্লে,—"আমার ফুল যে সমুদ্রের ফেনার চেয়েও শাদা, এ নিয়েতো তোমার কোন কাজ হবে না ভাই। ঐ যে পুরোন সূর্য্যঘড়িটা দেখ্‌ছো ওরই পাশে আমার ভাই থাকে, তার কাছে গেলে পেতে পারো।"

বুলবুলি উড়্‌তে উড়্‌তে তার কাছে গিয়ে হাজির হলো। বল্লে,—"দাওনা ভাই, একটা রক্ত গোলাপ—আমি তোমাকে আমার সব চেয়ে যে ভাল গান তাই শোনাব।"

গাছ মাথা নেড়ে বল্লে,—"আমার ফুল যে কল্‌কে ফুলের রঙের চেয়েও হল্‌দে ভাই। কিন্তু ঐযে রাজপুত্রের বাড়ী দেখছো ওরই পূব দিকে যে জানালা আছে, সেখানে আমার ভাই থাকে, তার কাছে গেলে পেতে পারো।"

বুলবুলি উড়্‌তে উড়্‌তে তারই কাছে গেল। বল্লে,—"দাওনা ভাই, একটা রক্ত গোলাপ—আমি তোমাকে আমার সব চেয়ে যে ভাল গান তাই শোনাব।"

গাছ মাথা নেড়ে বল্লে,—"আমার ফুল যে প্রবালের চেয়েও লাল একথা সত্যি কিন্তু ভাই, শীত আমার শির গুলোকে অবশ করে দিয়েছে—কুয়াসা আমার কুঁড়িগুলোকে নষ্ট করেছে—ঝড় আমার ডালপালাগুলোকে সব ভেঙে দিয়েছে। এ বছরে আমার একটিও ফুল নেই।" গাছ কেঁদে

বুলবুলি বল্লে,—"আহা, কাঁদ্‌ছো কেন? কাঁদ্‌লে কি হারানো জিনিস কখনো পাওয়া যায়? দেখনা ভাই চেষ্টা করে অন্ততঃ একটাও যদি পাও।".........

গাছ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো। খানিক পরে বল্লে,—"এক উপায় আছে, কিন্তু এ এত ভয়ানক যে তোমায় বল্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না।"

বুলবুলি বল্লে,—"বলনা ভাই বলনা। আমি একটুও ভয় পাইনি।"

গাছ বল্লে,—"যদি রক্ত গোলাপ চাও, তা'হলে চাঁদের আলোতে গান গেয়ে তা' সৃষ্টি করতে হবে,—তাকে তোমার বুকের রক্ত দিয়ে রাঙাতে হবে।".........

বুলবুলি বল্লে,—"সে কি রকম?"

গাছ বল্লে—"বল্‌ছি দাঁড়াও। প্রথমে আমার কাঁটাতে তোমার বুক বিঁধিয়ে গান গাইতে

হবে। সমস্ত রাত এমন তন্ময় হয়ে গান গাইবে যে আমার কাঁটা তোমার বুকে ফুঁড়ে ফেল্‌বে, তবু তুমি টের পাবে না। তোমার বুকের রক্ত আমার শরীরে গেলে—রক্ত গোলাপের সৃষ্টি হবে।"......

বুলবুলি প্রথমে চম্‌কে উঠলো। তারপরে ধীরে ধীরে সে বল্লে,—"রক্ত গোলাপের জন্য যদি মরতে হয় সেও স্বীকার। কেননা তবু বুঝবো আমার বন্ধুতো অন্ততঃ সন্তুষ্ট হতে পেরেছে।"

সে চুপ করে রইলো। এ কথাগুলোর মধ্যে কতটা যে বেদনা লুকোন ছিল, তা' শুধু সেই জান্‌তো। তার চোখ বেয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল পড়্‌তে লাগলো। সে শান্ত স্বরে বল্লে,—"জীবন—কি প্রিয়! পৃথিবী—কি মধুময়! ঐ সবুজ বনানীর মধ্যে বসে যখন সূর্য্যকে সোণার রথে ও চাঁদকে মুক্তোর নৌকা বেয়ে শাদা মেঘের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখি, তখন কত আনন্দ পাই। ঐ হাস্নুহানার গন্ধ কি মিষ্টি, এই নিখিল বিশ্ব কি সুন্দর!"

সে তার ছোট ছোট পাখাগুলো মেলে বাতাসে ভর করে আবার নীল আকাশের দিকে উড়ে গেল।

রাজপুত্র তখনো সেই ঘাসের ওপর শুয়েছিলেন—তখনো তাঁর চোখের জল শুখোয়নি।

বুলবুলি কাছে এসে বল্লে,—"কেঁদনা বন্ধু কেঁদনা, আমি তোমাকে রক্ত গোলাপ এনে দেব। চাঁদের আলোতে গান গেয়ে তা' সৃষ্টি করবো—বুকের রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে তুল্‌বো।"

রাজপুত্র উঠে বস্‌লেন, কিন্তু বুঝতে পার্ল্লেন না বুলবুলি কি বল্লে।

বকুল গাছ শুন্‌লে। মনে তার ভারি দুঃখ হোল। বুলবুলি তার ডালে বাসা বেঁধে থাক্‌তো, এতে তার কত আনন্দ! রাত্রিতে যখন সে গান গাইতো তাই শুন্‌তে শুন্‌তে কত নিদ্রাহীন রজনী তার কেটে গেছে। সে বল্লে,—"একখানা শেষ গান গাও। তুমি চলে গেলে আমি কি করে থাক্‌বো বন্ধু?"

বুলবুলি গাইতে লাগ্‌লো। তার গলা ধরে এল, গান থাম্‌লো।

রাজপুত্র পকেট থেকে একটা পেন্‌সিল ও একটা ছোট্ট খাতা বের করে সব টুকে রাখ্‌লেন। তারপরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

* * *

আকাশে চাঁদ উঠ্‌লো। বুলবুলি গোলাপ গাছের কাছে উড়ে গিয়ে, তার কাঁটায় বুক বিঁধোলে। সারারাত গান চল্‌লো, চাঁদ শুনে অবাক হয়ে গেল। তার চিত্ত দুলে দুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সারারাত বুলবুলি যত বেশী গান গেয়েছে, তার বুক কাঁটায় তত বেশী দীর্ণ হয়েছে।......

প্রথমে সে গাইলে বালক বালিকার মধ্যে প্রেমের জন্ম। গাছের আগ্‌ডালে এক অপূর্ব্ব ফুল ফুটে উঠলো। গানের পর গান হতে লাগলো, পাপড়ির পর পাপড়ি গজাতে সুরু হলো।

গাছ চীৎকার করে বলে উঠলো,—"বুলবুলি, আমার কাঁটায় তোমার বুক জোরে চেপে ধর, নইলে ফুল সম্পূর্ণ ফুট্‌বার আগে সকাল হয়ে যাবে।"

বুলবুলি তাই করলো। তার গানের পর্দ্দা আরো বেড়ে গেল। সে তখন গাইতে সুরু করেছে যুবক এবং যুবতীর আত্মার মধ্যে প্রেমের অভিসার।

হঠাৎ গোলাপের গায় লালের আভা ফুটে উঠ্‌লো। কাঁটা তখনো বুলবুলির অন্তরে পৌঁছয়নি,—গোলাপের অন্তরটাও শাদা রয়ে গেল।

গাছ চেঁচিয়ে উঠে বল্লে,—"বুলবুলি, শীগ্‌গির আমার কাঁটায় তোমার বুক চেপে ধরো, নইলে ফুল সম্পূর্ণ হবার আগে ভোরের আলো ফুটে উঠ্‌বে।"

বুলবুলি তাই কর্‌লো। কাঁটা তার অন্তর বিদ্ধ কর্‌লে—এক করুণ আর্ত্তনাদ আকাশে বাতাসে ভেসে গেল।......

গোলাপ তখন এক নিমেষে সিঁদুর হয়ে গেছে—অস্তগামী সূর্য্যের মত।......

বুলবুলির গলার আওয়াজ সরু হয়ে এল। সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো। চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল। গান থাম্‌তে থাম্‌তে একেবারে থেমে গেল।

শেষে সে একবার শেষবার গাইলে। আকাশে চাঁদ তখনো শুন্‌ছিলো তন্ময় হয়ে—উষার আগমন তার মোহকে ভাঙ্‌তে পারেনি! রক্ত গোলাপ চোখ মেলে চাইলে, তার চিত্ত তখন আনন্দে ভরে উঠেছে। ভোরের বাতাসে পাপ্‌ড়িগুলো এক এক করে মেলে দিলে।

গাছ বল্লে,—"দেখ দেখ, রক্ত গোলাপ শেষ হয়েছে!" বুলবুলি কোন উত্তর দিলে না। বুকে কাঁটা বিঁধে সে তখন ঘাসের ওপর মরে পড়ে রয়েছে।.........

দুপুর বেলা রাজপুত্র জান্‌লা খুলে একবার বাইরের দিকে চাইলেন। সূর্য্যদেব তখন আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। রাজপুত্র আনন্দে লাফিয়ে উঠে বল্লেন,—"বাঃ, কি চমৎকার একটা গোলাপ! ওর রঙের আভায় মাটীতে যেন সিঁদুর ঠিক্‌রে পড়্‌ছে।" নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিলেন। মাটীর দিকে তাকিয়ে একবার দেখ্‌বার সময়ও পেলেন না কার ভালবাসার বিনিময়ে এর জন্ম হয়েছে।......

রাজপুত্র ফুল নিয়ে ছুট্‌লেন রাজকন্যার কাছে। রাজকন্যা তখন কার্পেটের ওপর লাল সিল্কের সুতো দিয়ে একটা সুন্দর নক্সা তৈরী করছিলেন, পায়ের কাছে তার মিনি বেড়াল ঘুমোচ্ছিল।

রাজপুত্র বল্লেন,—"এই নাও তোমার রক্ত গোলাপ, পৃথিবীতে এ রকম লাল গোলাপ আর কখনো ফোটেনি। তুমি পরে একে সার্থক কর—সেই হবে আমার প্রেমের পুরস্কার!"

রাজকন্যা শুনে মুখ বেঁকালেন। বল্লেন,—"কাল সন্ধ্যার সময় এক রাজার ছেলে আমাকে একছড়া মুক্তোর মালা দিয়ে গেছে, ভারি সুন্দর!—তুমি দেখ্‌বে? তোমার ফুলের চেয়ে এর দাম ঢের বেশী।"

রাজপুত্র মলিন মুখে বল্লেন,—"তুমিইতো এই ফুল আন্‌তে বলেছিলে, মণিমুক্তোতো আমার ঢের ছিল। অকৃতজ্ঞ!"......

রাজপুত্র ফুলটা ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন। একটা গরুর গাড়ী তাকে দলে মশে চলে গেল।......

রাজকন্যা বল্লেন,—"অকৃতজ্ঞ! কেন? কিসের জন্য?—তুমিতো ভারি দাম্ভিক! তাঁর চেয়ে যে তোমার ঐশ্বর্য্য কম এ কথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে।" রাজকন্যা সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাজপুত্র অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল,—"কি অনাসৃষ্টি এই প্রেম!".........*

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী

প্রাণের ফুল

(M. Benoitর মূল ফরাসী কবিতা হইতে)

সূর্য্য যখন আসছে চড়ে রথে,
নবীন শিশুর দেখা পেলাম চল্‌তে পল্লী-পথে।
গভীর কালো চোখ দুটি তার চায় না কারও দিকে,
সুদূর পানেই দেখ্‌ছে অনিমিখে।
কোলে নিলাম ডেকে,
কপালে তার চুম্বনেরি রেখা দিলাম এঁকে।
তপ্ত রবির তাপে গেলাম গাঁয়ের পথটি ধরে',
দেখি সেথায় আস্‌ছে বালা কলসী কাঁখে করে।
পদ্মভরা সরোবরের তীরে
হেঁট হয়ে সে ধীরে
ভরে নিল বারি। তারি শুভ্র বসন বেয়ে
লম্বা কালো চুলগুলি সব পড়েছে পিঠ ছেয়ে।
আরও তার নির্ম্মল সে আঁখি
তুল্‌ল আমার মুখের পরে মধুর শান্তি মাখি।
সাধ বুঝি বা গেল আমার মনে
ভরে' দি' ঐ কোমল হস্ত চুম্বনে চুম্বনে।
সন্ধ্যা এলে নেমে,
গ্রামের পথে হঠাৎ গেলাম থেমে:—
সামনে দেখি বৃদ্ধ একটি চলে
অতল দুটি চোখে তাহার জ্ঞানের দীপ্তি জ্বলে।
দীর্ঘ শুভ্র কেশ পড়েছে বুকে,
হাসিটুকু আছেই লেগে মুখে।
মুছিয়ে দিয়ে পায়ের ধুলা পদতলের ভূমি,
নিলাম আমি চুমি'।

শ্রীসুনীতি দেবী

---

* Oscar Wilde—অবলম্বনে।

মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ

"হিন্দুধর্ম্ম"

"ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় মহাত্মাজি "হিন্দুধর্ম্ম" (Hinduism) নাম দিয়া একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মতামত মোটামুটি ভাবে জানা যায়। যৌবনে গান্ধীজির ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার মনে সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষম খটকা লাগিয়াছিল। মহাত্মাজি বলিয়াছেন যে "There have been many times when I did not know which way to turn." মহাত্মাজির মনে ধর্ম্মবিষয়ক নানা প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল; এবং এই সব প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত সময়ে সময়ে তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঘোর সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া নৈরাশ্য-মথিত-হৃদয়ে তিনি হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কতগুলি সমস্যার উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া সন্দেহাকুলচিত্তে মোহনদাস করমচান্দ গান্ধী নিজের জীবনটাকে বিষাদময়—অশান্তির আগার করিয়া তুলিতেছিলেন। বাইবেল বা কোর্‌আন মহাত্মাজির "সর্ব্ব সংশয়" ছেদন করিতে পারিল না, খৃষ্টধর্ম্ম বা ইসলাম ধর্ম্ম মহাত্মাজির জীবনে সর্ব্বপ্রকারে শান্তি দিতে পারিল না। একমাত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাই মহাত্মা গান্ধীর "হৃদয়গ্রন্থি" ভেদ করিতে সমর্থ হইল—হিন্দুধর্ম্মই মহাত্মাজির জীবন চির শান্তিময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইল। হিন্দুধর্ম্ম মহাত্মাকে চরমে শান্তি দিবে বলিয়া আজিও তিনি একমন একচিত্তে হিন্দুধর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্রে মহাত্মা গান্ধী আপনার জীবনের সব সমস্যার সমাধান, সব প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সত্যান্বেষী মোহনদাস করমচান্দ দেখিলেন যে সকল ধর্ম্মই অসম্পূর্ণ—আংশিক সত্য, জগতের সকল ধর্ম্মই ভালমন্দ দোষগুণে জড়িত, মূল জিনিষ সকল ধর্ম্মেরই এক। আসল কথা অর্থাৎ সারভাগ সকল ধর্ম্মেই এক। বিবাদ শুধু বাহিরের খোসাটা লইয়া। "খোসার টানাটানি ছাড়িয়া" মহাত্মাজি যখন "সার পদার্থ সঞ্চয় করিতে যত্নবান" হইলেন, হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রন্থাবলী এবং বিশেষতঃ ভগবদ্‌গীতার অমৃতময় উপদেশে তখন মহাত্মাজির নৈরাশ্য, নিরানন্দ, সংশয়-সঙ্কোচ, সব চিরতরে দূরে গেল; মহাত্মাজি আশার আলোক রেখা খুঁজিয়া পাইলেন, তাঁহার জীবন আনন্দোচ্ছাসিত, সুখশান্তিময় হইয়া উঠিল। মহাত্মাজি নিজেও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে যখন সন্দেহ ও নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকারে কোথাও তিনি কোনো আলোকরশ্মি দেখিতে পায়েন নাই, তখন ভগবদ্‌গীতাই তাঁহাকে শাশ্বত শান্তি দিয়াছে। দুঃসহ শোক এবং দারুণ দুঃখ কষ্টে নিপতিত হইয়াও যখন তিনি পাতার পর পাতা উল্টাইয়া এখানে একটী ওখানে আর একটী শ্লোক পাঠ করিয়াছেন,

তখনই ভগবদ্‌গীতা তাঁহার সমস্ত অশান্তি দূর করিয়াছে, তাঁহার অন্তরে আনন্দের অমিয় হিল্লোল বহাইয়া দিয়াছে। মহাত্মা আরও বলিয়াছেন যে "Nothing elates me so much as the *music* of the *Geeta* or the *Ramayana* by Tulasidas, the only two books in Hinduism I may be said to know. *When I fancied I was taking my last breath, the Geeta was my solace.*"

ভগবদ্‌গীতার সুমধুর সঙ্গীত মহাত্মাজিকে মহদ্ভাবে উদ্বোধিত এবং উল্লসিত করিয়া তোলে। গীতার সুমিষ্ট ছন্দলালিত্য ও শব্দ-ঝঙ্কার পাঠক মাত্রকেই অপার আনন্দ দান করে। গীতা ও তুলসীদাসের রামায়ণ—হিন্দুধর্ম্মের এই দুইখানি গ্রন্থই মহাত্মাজির খুব বেশী আদরের জিনিষ—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিলেও চলে; এবং ভগবদ্‌গীতা ও তুলসীদাসী রামায়ণ তিনি সবচেয়ে ভাল করিয়া অধিগত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এর মধ্যে ভগবদ্‌গীতা আবার চরমে মহাত্মার শান্তিদাতা। শেষ নিঃশ্বাস অর্থাৎ প্রাণত্যাগের সময় একমাত্র গীতাই মহাত্মাকে শান্তি দান করিবে। সুতরাং ভগবদ্‌গীতাকে মহাত্মা গান্ধী কি অপরিসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। মহাত্মাজির উপরোক্ত উক্তি হইতে পাঠকপাঠিকা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন ভগবদ্‌গীতা মহাত্মাজির কত বড় প্রিয় গ্রন্থ! এবং এই গীতোক্ত শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষের সঙ্গে মহাত্মাজির বহু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋষি অরবিন্দ বলিয়াছেন যে "গীতার আদর্শ পুরুষ কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।" আন্তরিক স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়া আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি প্রকৃত লোকের ন্যায় সুখ লালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আশ্রিত হ'ন না। পরের দত্ত সুখ দুঃখ গ্রহণ করেন না অথচ কর্ম্মভোগ করেন না বরং মহাসংযমী মহাপ্রতাপান্বিত দেবাসুর যুদ্ধে রাগ ভয়ক্রোধাতীত মহারথী হইয়া ভগবদ্‌-প্রেরিত যে কর্ম্মযোগী রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব অথবা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করিয়া নিষ্কামভাবে ভগবৎ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন, তিনি গীতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ।" ঋষি অরবিন্দ কথিত গীতার এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের সাথে মহাত্মা গান্ধীর যে অসামান্য সৌসাদৃশ্য আছে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই একথা অকপটে স্বীকার করিবেন।

মহাত্মা গান্ধীর মত উদার, অসাম্প্রদায়িক, সার্ব্বভৌম নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে গীতার আদর্শ পুরুষের সঙ্গে তুলনা করিতে কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী", "সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগী" "সর্ব্বভূতের সুহৃৎ", "সর্ব্বভূতহিতেরত" মহাত্মা গান্ধীকে গীতার আদর্শ পুরুষ বলিলে কি সত্যের অপলাপ করা হয়? যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রহ্মাস্ত্র "সত্যাগ্রহ", যে সর্ব্বংসহ, সর্ব্বহিংসানিবৃত্ত মহাপুরুষ বিশ্বাস করেন যে "সহ্য করা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর অস্ত্র আর নাই", যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অবতার নিজে সর্ব্বপ্রকারের নির্য্যাতন নীরবে

ভোগ করেন, স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে স্বীকার তবুও অপরকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেন না, কাহারও হিংসা করেন না, কাহাকেও শত্রু মনে করেন না, খৃষ্ট বা চৈতন্যদেবের মত সকলকে সমানভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন, সেই উদার সাম্যভাবে অনুপ্রাণিত সর্ব্বজনবরেণ্য জগজ্জন-পূজনীয় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকে গীতার আদর্শ পুরুষ বলিব না ত কাহাকে বলিব ?

ভারতের হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টিয়ান সমস্ত জাতির লোকে গান্ধীজিকে আজ অতি আপনার লোক বলিয়া ভাবেন, সকলে সমানভাবে ভক্তি শ্রদ্ধায় সসম্ভ্রমে মহাত্মাজির নিকট নতশির হয়েন। মহাত্মা গান্ধী আজ "নির্ব্বৈর"—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সম দুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥"

....

"সমঃ শত্রৌচ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥"

আমরা আগাগোড়া বলিয়াছি যে মহাত্মাজির ধর্ম্ম—প্রেম "অহিংসা সত্যমক্রোধ"। আত্মত্যাগ সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যকেই তিনি তপোত্তম বলিয়া জানেন। মহাত্মাজি তপস্যাকে তপস্যা বলেন না, তাঁহার মতে ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। "ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ।" 'যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।' 'জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ এবং নারায়ণে ভক্তি কেই. তিনি সকল ধর্ম্মের সার বলিয়া মনে করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাত্মা গান্ধীও বিশ্বাস করেন যে, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' বাহিরের কোনও গোলমাল যাহার বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে না, যিনি সর্ব্বদাই প্রসন্ন, সংযত শান্তচিত্ত সমাহিত ভাবে অবস্থান করেন, যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মানেন, সেই সর্ব্বত্র সমদর্শী সর্ব্বভূত হিতেরত তপস্বীর হিন্দুধর্ম্মের সাধনা যে অতি উচ্চাঙ্গের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ইতর জনসাধারণের জপ তপ পূজার্চ্চনা ধ্যান ধারণার সঙ্গে মহাত্মাজির হিন্দুধর্ম্মের সাধনার খুব বেশী মিল না থাকাই স্বাভাবিক। আমাদের সঙ্গে হুবহু খাপ খাইলে গান্ধীজির সাধনার তেমন কোনো মাহাত্ম্য থাকিত না, তাই বলিয়া আমাদের সঙ্গে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে এ বিষয়ে মহাত্মাজির আদৌ কোনো মিল নাই। গান্ধীজি সাধন জগতে অতি ঊর্দ্ধে অবস্থান করিলেও, তিনি আমাদেরই মত বিশ্বাস করেন যে একজন ঈশ্বর আছেন, এবং সেই সর্ব্বভূতাত্মা ঈশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ম্," আমাদের মত মহাত্মাজিও মোক্ষ, কর্ম্মফল, এবং পুনর্জন্মে সবিশেষ আস্থাবান। এবং মহাত্মাজি নিজকে বরাবর সনাতনী হিন্দু বলিয়াই দাবী করিয়া আসিতেছেন। তবে মহাত্মাজি সনাতনিষ্ট হিন্দু বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেও, তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণা সাধারণ সনাতনী হিন্দুর মত নয়।

মহাত্মাজি একজন প্রাক্‌টিকাল আইডিয়ালিষ্ট, তাই তিনি "ফলিত ধর্ম্মের" (Practical

religion) ধারই বেশী ধারেন,। তুরীয় জটিল সূক্ষ্ম দার্শনিক মতবাদ আমাদের অনেকেরই নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক, মহাত্মাজি মানবজীবনে ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদনের পক্ষপাতী, তাই তিনি ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্মকে কার্য্যে পরিণত করিতে চাহেন। মহাত্মাজি জানেন যে কর্ম্মপরিণত ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতিরেকে মানবসাধারণের মঙ্গলসাধন একরূপ অসম্ভব, তাই তিনি বলিয়াছেন যে * "As a humble student of religion, as I am, one should try to reduce religion to practice" এবং চরিত্র গঠনের উপরই মহাত্মাজি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্ম আর শুধু হিন্দুধর্ম্মই বা কেন, জগতের সকল ধর্ম্মই চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, "আষ্ঠে পৃষ্ঠে" জড়িত। চরিত্রই মানুষের প্রধান সম্বল, মহাত্মাজি বলিয়াছেন, "It is character that counts in the end" চরিত্র গঠনই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা ও তপস্যার মুখ্য লক্ষ্য, এপিক্‌টেটাস্‌ বলেন, "The formation of the spirit and character must be our real concern." (Epictetus)

এ ছাড়া আর একটী কথা এই যে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের আর এক নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইলেও মহাত্মা গান্ধী মনে করেন যে বর্ণাশ্রম অপেক্ষা গোরক্ষণই হিন্দুধর্ম্মকে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুধর্ম্মকে একটী একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, মহাত্মাজির মতে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে গোরক্ষণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এবং গোরক্ষণ ও হিন্দুধর্ম্মের সম্পর্ক এত অঙ্গাঙ্গী রকমের যে মহাত্মা গান্ধী অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি গোরক্ষণে বিশ্বাসবান নহে, সে কদাপি হিন্দু হইতে পারে না', "No one who does not believe in cow-protection, can possibly be a Hindu." গোরক্ষণে সামর্থ্য-অসামর্থ্য দিয়া তিনি হিন্দু অহিন্দুর নির্দ্দেশ করিতে পর্য্যন্ত কসুর করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী আপনাকে যে সনাতনী হিন্দু বলেন তাহার বৈশিষ্ঠ্য ইহাতে সম্যক উপলব্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মহাত্মা গান্ধীর হিন্দুধর্ম্ম সাধনার একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে গীতোক্ত আদর্শ পুরুষের মত তিনি নির্লিপ্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। নিজের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত প্রচেষ্টাসহ আপনাকে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করা ধর্ম্মপ্রাণ মানব মাত্রেরই অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যেক ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ম্মিকের অহঙ্কার আত্মকর্তৃত্ব চিরতরে লোপ পায় তাঁহারা জানেন যে একমাত্র ভগবানই সর্ব্ব নিয়ন্তা, তাহারা কেবল "নিমিত্ত মাত্র।" তাই তাহারা পাপপুণ্য ভালমন্দ লাভালাভ সমস্তই পরমপিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া অনাড়ম্বরভাবে সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত অনাসক্ত হইয়া নীরবে কাজ করিয়া যান। পৃথিবীর ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর প্রত্যেক মহাপুরুষই আপনাদের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই ভগবদ্বাণী শুনিতে পান—

* "ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক, ধর্ম্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্ম খাটাচ্ছে" ইত্যাদি—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমরা "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে" দেখিতে পাই যে হিন্দুগৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে বলা হইয়াছে। গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে এবং যে সমস্ত কাজ করিবে তাহা সকলই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎযৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "সঙ্গ" অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করিয়া কাজ করিতে বলিতেছেন—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

কারণ, "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।" এবং ক্রোধ হইতেই মোহের উৎপত্তি হয়—আর "সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ" "স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

"কার্য্য, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা যাহা কিছু কর, সে সমস্ত, হে অর্জ্জুন, আমাতে অর্পণ করিও।" ভাগবতেও বলা হইয়াছে, "কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা যাহা যাহা করা হয়, সমস্ত পরাৎপর নারায়ণেতে অর্পণ করিবে।"

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানু স্বতস্বভাবাৎ
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ॥"

এই যে "আত্মনিবেদন" অর্থাৎ কার্য্য, বাক্য, চিন্তা সমস্ত ভগবানেতে সমর্পণই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা। হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সমস্বরে এই "আত্মনিবেদনে"র গুণকীর্ত্তন করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীও অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মনিবেদনের সুমহান তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। মহাত্মাজিকে ভগবদগীতার ভাষায় আমরা "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী" বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, মহাত্মা গান্ধী আগাগোড়া "আত্মনিবেদনে"র মহান ভাবে মাতোয়ারা, "ভরপুর" বিভোর হইয়া আছেন। সকল শাস্ত্রের তিনি শুধু সারভাগই আয়ত্ত করিয়াছেন। এই ধরুণ মহাত্মাজি বেদ মানেন কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে বেদের আজ্ঞা পালন মহাত্মাজির "কুষ্ঠীতে লেখে" নাই। বেদের যাহা সারমর্ম্ম অর্থাৎ সত্য, অহিংসা, পবিত্রতা, সরলতা, ক্ষমা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলীর অনুসরণ করিতেই তিনি চিরকাল অভ্যস্ত।*

আর একটী কথা, হিন্দুধর্ম্মের এই যে আত্মনিবেদনের ভাব অর্থাৎ মানুষের প্রাণের পরতে

* "The spirit of the Vedas is purity, truth, innocence, chastity, simplicity, forgiveness godliness and all that makes a man or woman noble and brave."— *Young India.*

পরতে এই যে আত্মসমর্পণ, আত্মবিলোপের প্রচেষ্টা ইহাই আমাদিগকে আত্মত্যাগে প্রবৃত্তি দেয়, ভগবদ্‌ভাবে উদ্বোধিত হইয়াই মানুষ নিজের কথা,—নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা ভুলিয়া পরের জন্য আত্মবলি দিতে উদ্যত এবং অগ্রসর হয়। হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎস হচ্ছে ত্যাগ ও বৈরাগ্য—পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন। "সর্ব্বভূত হিতেরত" মহাত্মা গান্ধী যে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ এবং কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম সাধনায় রত আছেন, একথা সকলেই জানেন। কৃচ্ছ্র সাধনে বৈরাগ্য সাধনে যে মুক্তি তাহাই মহাত্মাজির কাম্য আরাধনার বস্তু। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত তিনি "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ" লাভ করিতে চাহেন না। মহাত্মাজির মতে সংযম তিতিক্ষা ব্যতীত সব সাধনা, সব আরাধনা নিষ্ফল। "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।" তাই সর্ব্বাগ্রে চাই ইন্দ্রিয় সংযম। "বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।" হিন্দুসাধকের সিদ্ধিলাভের পথের আলোক বর্ত্তিকা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, তিতিক্ষা। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা আত্মত্যাগ আত্মবিলোপে উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মার কল্যাণসাধনে রত থাকা বিধেয়। মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস যে একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয় "নান্যপন্থা অয়নায়" সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাই বৈরাগ্য, ভোগবিরতি। মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "Hinduism is undoubtedly a religion of renunciation of the flesh, so that the spirit may be set free." যে গান্ধী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে শরীরের শক্তি অপেক্ষা আত্মার শক্তি অনেক বেশী তিনি যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সমক্ষে শুধু "ত্যাগে"র আদর্শই প্রচার করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের ভিতর তথাকথিত পৌত্তলিকতার প্রভাব অতি অসীম, হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতার অসামান্য প্রভাব বলিয়া "পৌত্তলিকতা" সম্বন্ধে মহাত্মাজির অভিমত আলোচনা একান্ত আবশ্যক। মহাত্মাজি আপনাকে সনাতনী হিন্দু বলার যে সব হেতু দর্শাইয়াছেন তাহার মধ্যে একটী হচ্ছে এই যে তিনি প্রতিমা- পূজায় অবিশ্বাস করেন না। "I do not disbelieve in idol-worship" "হিন্দুধর্ম্ম" প্রবন্ধে মহাত্মাজি আরও লিখিয়াছেন যে-"আমি বলিয়াছি যে মূর্ত্তিপূজায় আমি অবিশ্বাস করিনা। কোনো বিগ্রহ বা প্রতিমা আমার অন্তরে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবোদ্রেক করে না। An idol does not excite any feeling of veneration in me."

কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তিকে তিনি কদাপি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। বরং মূর্ত্তিপূজার আবশ্যকতা অর্থাৎ সাকার উপাসনার প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। "প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস করি" একথা যদিও মহাত্মাজি স্পষ্ট করিয়া বলেন না তবুও অন্তরে অন্তরে তিনি মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করেন।

আর যাহারা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস বা ঠাট্টাবিদ্রূপ করেন তাহারাও যে

মহাত্মাজির কৃপাপাত্র ইহাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই। মহাত্মাজি নিজে একজন উচ্চস্তরের হিন্দু ধর্ম্মের সাধক, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিম্নতম স্তরের সাধকদিগকে অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করিবেন কি প্রকারে? হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ব্যাপকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি মুক্তকণ্ঠে মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করিয়াছেন।

আর বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুরা যে নিছক পুতুলের পূজা করেন না, একথা কি মহাত্মা গান্ধীর অবিদিত? মহাত্মা গান্ধী ভালমতই জানেন যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া পরমপিতা পরমেশ্বরেরই আরাধনা করেন। কাঠ, মাটী, পাথর অথবা ধাতু দ্বারা গঠিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষীর চক্ষে কেবল পুতুল বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু যথার্থ সনাতনী হিন্দু মহাত্মা গান্ধী জানেন যে হিন্দুরা প্রতিমাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তবে তাহার পূজার্চ্চনা করেন। শুধু মাটী বা পাথরের কাছে হিন্দুরা মাথা নত করেন না, দেব দেবীর মূর্ত্তির নিকট যে হিন্দু মাত্রই ভক্তি শ্রদ্ধায় নতশির হয়েন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "বিগ্রহ" দেখিলেই তাহাদের মনে দেবদেবীর স্বরূপের কথা জাগে তাই ভক্তিতে বিগলিত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে নতজানু হইয়া ঐ মূর্ত্তিকে নমস্কার করে। মহাত্মা গান্ধী ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "No Hindu considers an image to be God" অর্থাৎ কোনো হিন্দুই প্রতিমাকে ঈশ্বর মনে করেন না। তাই মহাত্মা গান্ধী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি প্রতিমাপূজাকে পাপ-জনক বলিয়া মনে করেন না; "I do not consider idol-worship a sin." পক্ষান্তরে, প্রতিমাগুলি ঈশ্বরোপাসনায় প্রভূত সাহায্য করে।* সকল মানুষের ধারণাশক্তি সমান নহে। মানুষ স্ব স্ব প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে ঈশ্বরের আরাধনা করে। আর হিন্দুরা কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদে সবিশেষ আস্থাবান। তাই হিন্দুদের ধারণা এই যে প্রত্যেক মানুষই আপন আপন কর্ম্মানুসারে শক্তির তারতম্য লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই দরুণ সকলের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনা ও উপাসনা সম্ভবপর নয় এই বিবেচনায় হিন্দুশাস্ত্রকারগণ হিন্দুধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তন করিয়া সাকারোপাসনার বিধি ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঈশ্বরারাধনায় সাহায্য করে বলিয়াই প্রতিমার আদর নতুবা মূর্ত্তিপূজার আর কি সার্থকতা থাকিতে পারে? যাহার যাহা ধারণায় কুলায় হিন্দুধর্ম্মে ঠিক সেইরূপ অনুকূল ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রতিমাপূজা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, মূর্ত্তিপূজা সাধারণ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য; কারণ মানুষ সহজে স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারেনা। বিগ্রহ বা প্রতিমূর্ত্তি আমাদিগকে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করে বলিয়া প্রতিমাপূজার প্রয়োজনীয়তা অকপটে স্বীকার করিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে "I think that idol worship is part of human nature. We hanker after symbolism. Why should one be more composed in a church than elsewhere?"

* "Images are an aid to worship"—M, K, Gandhi,

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো, ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতি র্জ্জপোঽধমোভাবো, বহিঃ পূজাঽধমাধমঃ॥"

হিন্দুধর্ম্মে "বহিঃ পূজা" অর্থাৎ "পৌত্তলিকতা" কে ধর্ম্মের গণ্ডী হইতে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় নাই বরং "অধমাধম" বলিয়া এক কোণে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে। গীতায়ও দেখিতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন * "

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশরঃ॥"
"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"
অথবা—"যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থই এই প্রকার উদারমতের পরিপোষক। উদার হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্কে আপামর সাধারণ সকলেরই স্থান আছে। উত্তম হইতে অধমাধম কেহই বাদ যায় নাই সকলের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সাধন পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে

* "যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই ভজন করি, হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করে।"

"যিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করি।"

অথবা "হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া যাঁহারা অন্য দেবতাও ভজনা করেন তাঁহারাও আমাকেই অবিধি পূর্ব্বক ভজনা করেন।" গীতার ৭ম অধ্যায়ে আমরা আরও দেখিতে পাই,

যো যো যাং যাং তনুংভক্তং শ্রদ্ধয়াচিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
সতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ তত কামান ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥

অর্থাৎ "যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি।

"সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার (মূর্ত্তির) আরাধনা করে; তদনর আমাকর্ত্তৃক বিহিত সেই সকল কামনা লাভ করে।"

ধ্যানস্তুতি জপতপ এবং প্রতিমাপূজা পর্য্যন্ত সকল প্রকার সাধনার ব্যবস্থা আছে হিন্দু ধর্ম্মে। কিছুরই অভাব নাই, এখন যাহার যাহাতে অভিরুচি। হিন্দুরা বলেন যে

"ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পথ
কিন্তু এক গম্য স্থান,
যে যেমন পারে ট্রেণে ষ্টীমারে
হোক সেথা আগুয়ান।"

"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" এবং এই রুচির বৈচিত্র্য হেতু নানা লোকে নানা পথ অবলম্বন করে—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

নদী ঋজু গামিনীই হোক আর বক্র গামিনাই হোক, তাহার মিলনস্থল এক সমুদ্র। তেমনি মানুষ বিভিন্ন রুচির দরুণ সোজা পথই ধরুক আর কুটিল পথেই চলুক, সকলেরই গম্যস্থল সেই পরমপিতা পরমেশ্বর

হিন্দুধর্ম্মে কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই—পাপীতাপী পুণ্যাত্মা—আবাল বৃদ্ধ বনিতার আপামর সাধারণের সাধনার পৃথক পৃথক পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। তাই মহাত্মা গান্ধী যথার্থই বলিয়াছেন যে "Hinduism is not an exclusive religion. In it there is room for the worship of all the prophets of the world." অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম কাহাকেও পরিত্যাগ করে না, এই ধর্ম্মে জগতের সমস্ত প্রেরিত পুরুষদিগের উপাসনার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বগ্রাসী, ইহা কাহাকেও বর্জ্জন করে না, সকলকেই সমানভাবে আপনার গণ্ডীর ভিতর স্থান দেয়। মোটামুটি ভাবে ধরিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মও মিশনরী রিলিজিয়নের পর্য্যায়ে পড়ে। খৃষ্টধর্ম্মের মত হিন্দুধর্ম্মকে মিশনরী ধর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না, সাধারণ ভাবে মিশনারী ধর্ম্ম অর্থে যাহা বুঝায়, হিন্দুধর্ম্ম ঠিক তাহা নয়। মহাত্মাজীর কথায় "It is not a missionary religion in the ordinary sense of the term" বৌদ্ধ বা খৃষ্টধর্ম্মের মত হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সন্ন্যাসী দ্বারা দেশ বিদেশে কখনো প্রচারিত হয় নাই। হিন্দুরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অদম্য উৎসাহে মাতিয়া দিগদিগন্তে ছুটিয়া যান নাই। হিন্দুরা কোনকালেই হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডী প্রসারণের জন্য ধর্ম্মোন্মাদে মত্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্নশীল হয়েন নাই, তাই বলিয়া একথাও বলা চলে না যে হিন্দুরা অন্য ধর্ম্মের বিদেশীয় লোকদিগকে আপনাদের গণ্ডীর ভিতর ঠাঁই দেন নাই। শক, হুণ, দ্রাবীড়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি বহু জাতি হিন্দু ধর্ম্মের উদার অঙ্কে অবাধে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ইতিহাসে একথা জলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম অন্যধর্ম্মের লোককে দীক্ষিত করিয়া নিজ গণ্ডীর মধ্যে আনে না বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের যে অযথা অপবাদ আছে তাহা সর্ব্বৈব সত্য নহে। যদি কোনো মুসলমান বা খৃষ্টান হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া

হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছুক হয় তবে মনু পরাশর শাসিত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্থান দিতে পারিব কিনা সে বিষয় আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হিন্দুধর্ম্ম ত চিরকালই উদার, অসাম্প্রদায়িক, সার্ব্বভৌম ভাবে ভরপুর। হিন্দুধর্ম্ম আমাদের নিত্যই ত শিখাইতেছেন যে জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই আমাদের আত্মারই বহুরূপ মাত্র। কিন্তু যত সংকীর্ণতা, অনুদারতা, ভেদাভেদ জ্ঞান সব আমাদের সামাজিক আচরণে। "লোকাচার" ও "দেশাচার" আজ আমাদের দেশে ধর্ম্মের উপর মোড়লী করিতেছে—এসব কথা আমরা "অস্পৃশ্যতা" প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্যতা পাপে কলুষিত, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের কি অপরাধ? হিন্দুধর্ম্ম ত সেজন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে, মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে "I believe that untouchability is no part of Hinduism. It is rather its excrescence to be removed by every effort." হিন্দুধর্ম্ম অস্পৃশ্যতাকে পাপজনক বলিয়াই মনে করে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের কথা কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ শোনে? আমরা আজকাল ধর্ম্মতন্ত্রের অধীন হইয়া ধর্ম্মের নামে সমাজে ভয়ানক অধর্ম্ম করিতেছি, তাই হিন্দু সমাজের দোষ বা গলদ হিন্দু ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপান বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না।

একথা নিঃসন্দেহে বুক ঠুকিয়া বলা যায় যে "হিন্দুধর্ম্মে''র মত উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আর জগতে নাই। হিন্দুর কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রই একথা বলে না যে এই বান্ধা পথে না চলিলে মুক্তি নাই—মোক্ষলাভের পথ অনন্ত, "যত মত, তত পথ", যাহার যে পথে ইচ্ছা চলিয়া যাউক্ অন্তে তাহার মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" সকল শাস্ত্রেরই এই একই সুর, একই বাণী, এই সার্ব্বজনীন সাম্যভাবই হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহাত্মাজির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ বৈশিষ্ট্য এড়ায় নাই—তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে "Hinduism tells every one to worship God according to his own faith or Dharma." অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সকলকে স্ব স্ব বিশ্বাস বা ধর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অনুমতি দেয়। মানুষের আপন আপন প্রকৃতি বা নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুযায়ী ঈশ্বরারাধনা করিবার বিধি আর কোনো ধর্ম্মে পাওয়া যায় কিনা জানি না। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে হিন্দুধর্ম্মের এই উদার সার্ব্বভৌম বিধানের নিমিত্ত 'ইহা অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে নির্ব্বিবাদে সুখে শান্তিতে বাস করে।' বেদান্ত দর্শনের সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর মতবাদ, গীতা ও উপনিষদের জটিল তুরীয় আদর্শবাদ, উচ্চতম জ্ঞানের অদ্বৈততত্ত্ব হইতে, নিম্নতম স্তরের তামসিক অধমাধম বহিঃপূজা, এমন কি নিরেট পৌত্তলিকতা, যাহাকে দেশী ভাষায় "গাছ পাথর পূজা" বলে তাহা পর্য্যন্ত উদার হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্কে স্থান পাইয়াছে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রবল। শক্তি উপাসকেরা দুর্গা-কালী-মনসা-শীতলা প্রভৃতির পূজায় ছাগ মেষ মহিষাদি উৎসর্গ করিয়া রুধির দিয়া দেবীকে তৃপ্ত করেন।

বলা বাহুল্য, মহাত্মাজি এই প্রকার জীবি-হিংসার ভয়ানক বিরোধী। অহিংসা যাহার জীবনের মূলমন্ত্র, সেই "সর্ব্বভূতের সুহৃদ্" যে "পূজা-আচ্ছায়" পাঁঠা বলি ইত্যাদি দিবার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। মহাত্মাজির মতে বলিদান দেওয়া কখনো ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। 'ধর্ম্মের নামে এক সময় পশু উৎসর্গ করা হইত—পশুবলি দেওয়াত ধর্ম্মই নয়—হিন্দুধর্ম্ম ত কিছুতেই নয়!'* মহাত্মা গান্ধী অতি দৃঢ় স্বরেই বলিয়াছেন যে "*I consider it positive irreligion to sacrifice goats to Kali, and do not consider it a part of Hinduism.*" অর্থাৎ মা কালীকে পাঁঠা দেওয়া মহাত্মাজি নেহাৎ অধর্ম্ম বলিয়াই মনে করেন, এবং ইহাকে হিন্দুধর্ম্মের কোনো অঙ্গ বলিয়া মনে করেন না। মহাত্মাজি বলেন যে যাহার জীবন দানের ক্ষমতা নাই, জীবন সংহার করিবার তাহার কি কোনো অধিকার আছে? মানুষের সৃষ্টি করিবার কোনো ক্ষমতা যখন নাই, তখন ভগবানের সৃষ্ট নিকৃষ্টতম প্রাণীর প্রাণ সংহার করিবার অধিকার তাহার নাই। ধ্বংসের ক্ষমতা শুধু একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তারই আছে। "I still believe that man, not having been given the power of creation, does not possess the right of destroying the meanest creature that lives. The Prerogative of destruction belongs solely to the Creator of all that lives." যখন আমরা সৃষ্টি করিতে অক্ষম, কোনো প্রাণীকে বধ করিয়া তাহার প্রাণ দানে অসমর্থ, তখন ছাগ মেষ মহিষাদির প্রাণ লইবার আমাদের বিন্দুমাত্র অধিকারও নাই। মহাত্মা গান্ধী আরও বিশ্বাস করেন যে "অহিংসা"ই হিন্দুত্বের মূল উৎস।† তাই বলিদান সমর্থন করা ত দূরের কথা, মহাত্মা গান্ধী পশুবলিকে হিন্দুধর্ম্মের কোনো অঙ্গ বলিয়াই স্বীকার করেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাত্মা গান্ধীও "পৌরোহিত্যে"র উপর সবিশেষ আস্থাবান্ নহেন। মহাত্মাজি কোন ব্যবসাদারিতে বিশ্বাস করিবার লোক নহেন। তিনি জানেন যে অর্থ না বুঝিয়া মন্ত্র আওড়াইলেই মোক্ষলাভ হয় না। মহাত্মাজিও শঙ্করাচার্য্যের মত বিশ্বাস করেন যে "বিনা অপরোক্ষানুভূতে ব্রহ্মশব্দৈর্ণমুচ্যতে।" ধর্ম্মলাভ করিতে চাই অনুভূতি—চাই আন্তরিকতা। শুধু মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করার কোনো সার্থকতাই নাই, তাহার উপর যদি আবার অর্থ না বুঝিয়া যা' তা' মন্ত্র পড়া যায় তাহা হইলে ত "গোদের উপর বিস্ফোটকে"র মতই একটা কিছু ঘটে। মহাত্মাজি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "To mutter a mantra without knowing its value is unmanly." মন্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি না করিয়া মন্ত্র আওড়াইলে বাস্তবিকই কাপুরুষতা প্রকাশ পায়।

* "There was no doubt at one time sacrifice of animals offered in the name of religion. But it is not religion, much less it is Hindu religion."—*Young India.*

† "My life is dedicated to the service of India through the religion of Nonviolence which I believe to be the root of Hinduism."—*M. K. Gandhi.*

মহাত্মাজি কোন শাস্ত্রই অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিতে রাজী নহেন। গোঁড়া হিন্দুর তিনি বেদকে অভ্রান্ত এবং অপৌরুষেয় বলিয়া মানেন না। কোরাণ ও বাইবেলের মতন বেদকে তিনি শুধু ঈশ্বরানুপ্রাণিত বলিয়াই মনে করেন, আর হিন্দুধর্ম্মের সকল শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন বলিয়া মহাত্মাজি দাবী দাওয়া করিয়া থাকেন।* যুক্তিতর্ক ও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী যে কোনো শাস্ত্রাদেশ তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে উল্লঙ্ঘন করিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক। মানুষের যুক্তি বিবেক বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধের সঙ্গে যাহা মোটেই খাপ খায় না তাহা অধর্ম্মেরই সামিল বলিয়া মহাত্মাজি মনে করেন। মানুষের অন্তরাত্মা যাহাতে সায় দেয় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বেদকে যিনি অক্ষয় অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার বলিয়াই জানেন, তিনি যে বেদের জ্ঞানরাশিকে ঐশ্বরিক ও অলিখিত বলিয়া মনে করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ "ব্যখ্যা ঠ্যাখ্যা"—টীকা-টীপ্পনির কোনো ধারই ধারেন না বলিয়াই কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণের দোহাই দিয়া মহাত্মাজি কোনো নজির দেখাইতে চাহেন না। তিনি মানুষের ভিতরের ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধের নিকটই "আবেদন-নিবেদন" করিবার ঘোরতর পক্ষপাতী।

আর খাওয়া ছোঁওয়ার ব্যাপারে অতিশয় নৈষ্ঠিক অর্থাৎ আচারনিষ্ঠ বা আচার পরায়ণ হইলেই যে হিন্দুর হিন্দুয়ানি বজায় থাকে বা লোপ পায়, একথা মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করেন না। স্বামী বিবেকানন্দের মতনই তিনি বিশ্বাস করেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম কখনো ভাতের পাতিল বা জলের কলসীর ভিতর ঢুকিতে পারে না। কাহারো সঙ্গে খাওয়া দাওয়ায় হিন্দুর হিন্দুত্ব ধুইয়া মুছিয়া যাইতে পারে না। মহাত্মাজি বলিয়াছেন যে "A Brahman may remain a Brahman though he may dine with his Shudra brother, if he has not left off his duty of service by knowledge. A Hindu who refuses to dine with another from a sense of superiority misrepresents his *Dhrama.*

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ 'খাওয়া ছোঁওয়া'র ব্যাপারকেই ধর্ম্মাধর্ম্মে পরিণত করিয়া তুলিতেছে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যেন এখন ভিতরের সারভাগ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের খোসাটা লইয়া টানাহ্যাচড়া করিতেছে, হিন্দুর হিন্দুয়ানি যেন তাই কতগুলি বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়া কলাপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে "হিন্দুর ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুৎমার্গে আমায় ছুয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা।" মহাত্মাজিও তাই জোতের

* "My belief in the Hindu Scriptures does not require me to accept every word and every verse as devinely inspired. Nor do I claim to have any first haad knowledge of these wonderful books. But I do claim to know and feel the truths of the essential teachings of the Scriptures"—*M. K, Gandhi,*

সহিত বলিয়াছেন যে "Unfortunately to-day Hinduism seems to consist merely in eating and not eating." "ছুৎমার্গ" ও খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচারের বাড়াবাড়ি দেখিয়া মহাত্মাজি ব্যথিতচিত্তে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে "Hinduism is in danger of losing its substance, if it resolves itself into a matter of elaborate rules as to what and with whom to eat."

"হিন্দুধর্ম্ম" মহাত্মাজির প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইলেও, "হিন্দুধর্ম্মতন্ত্রে" মহাত্মাজি বড় বেশী আস্থাবান নহেন—হিন্দুধর্ম্মের বাহিরের খোসাটা লইয়া নাড়া চাড়া করিবার পক্ষপাতী মহাত্মাজি মোটেই না। তাই হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর গোড়া হিন্দুর মতন ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, মহাত্মাজি হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম (The essential things of Hinduism) নিজে অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব্ব সাধন বলে স্বীয় জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ মর্ম্মে মর্ম্মে আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়াই মহাত্মাজি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি ভাষায় সম্যক ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, তিনি বলিয়াছেন যে "I can no more describe my feeling for Hinduism than for my own wife. She moves me as no other woman in the world can. Not that she has no faults ; I daresay, she has many more than I see myself. *But the feeling of an in dissoluble bond is there.* Even so I feel for and about Hinduism with all its faults and limitations."

মহাত্মাজির ধর্ম্মপত্নী শ্রীযুক্তেশ্বরী কস্তুরিবাইর অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি যেমন ভাবে বিচলিত করেন অন্য কোনো স্ত্রীলোক তাহা পারেন না। কারণ কস্তুরিবাইর সঙ্গে মহাত্মার ইহ জন্মের চিরন্তন একটা বন্ধন আছে, কস্তুরিবাইর প্রতি মহাত্মাজির মনের যে ভাব, সমস্ত ত্রুটি দোষ ও দুর্ব্বলতা-সহ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও মহাত্মাজির সেই রকম একটা অচ্ছেদ্য ও অনির্ব্বচনীয় ভাব বিদ্যমান। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মহাত্মাজির যে বন্ধন—

"নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দাহতি পাবকঃ।"

এবং এই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মই মহাত্মার আত্মাকে সর্ব্ব প্রকারে শান্তি দিয়া তাঁহার সমস্ত জীবন মন ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে—হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা ও উপনিষদ সমূহ পাঠ করিয়া মহাত্মাজি অপূর্ব্ব শান্তিধনের অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ

রামগোপাল ঘোষ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

কেলসেলের সহিত বিবাদ।

এই সময়ে কলিকাতার সহরটিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ হইতে একজন করিয়া Conservancy Commissioner নিযুক্ত হয়। ইহাই ইদানীন্তন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাবস্থা। রামগোপাল এই নির্ব্বাচনে একজন scrutineer ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন কমিশনার নিযুক্ত হন। তাঁহার conservancy কমিশনার পদে নির্ব্বাচিত হইবার সমালোচনা করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১১ জানুয়ারি তারিখের "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হয় যে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে এ পদের জন্য চেষ্টা করিতে দেখিলে তাঁহারা আরও সুখী হইতেন। তাঁহারা দক্ষতা ও কার্য্যকরী ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন এবং যাঁহাদের দৃঢ় চরিত্র ও সামাজিক ও মানসিক অবস্থা এরূপ যে প্রয়োজন হইলে যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট কমিশনারদিগের অভিমতের বিরুদ্ধে আপনাদের মত চালাইতে পারিবেন সেই প্রকার লোকের নির্ব্বাচনই প্রয়োজন। "We should have been much better pleased to see man of a higher order, socially and intellectually, aspiring to the office—man of the grade represented for instance, by Babu Ramgopal Ghose." .... "What is wanted is gentleman of proved ability and sagacity to know what should be done and whose charactter and position are a guarantee for the possession of moral courge sufficient to assert their views even in the face of the Govt. Commissioner when necessary. রামগোপাল তখন সমাজ সৎসাহস ও দৃঢ়চরিত্রের নিমিত্ত সমাজে ও সাধারণে প্রভূত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে কেলসেলের কুটি হইতে পৃথক হইবার পর রামগোপাল স্বয়ং কুটি খুলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন কিন্তু নানা কারণে তাহা তখনও ঘটিয়া উঠে নাই। এই সময়ে সকলে কাণাঘুষা করিতেছিল যে তিনি চাকুরী গ্রহণ করিবেন। এই সময়ে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রসময় দত্ত ছুটি লওয়ায় ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজের পদ খালি হয়। কোম্পানী রামগোপালকে উক্ত পদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তিনি অতি সম্ভ্রমের সহিত উত্তর দেন যে চাকুরী গ্রহণ তাঁহার ইচ্ছা নয়, সে কারণ তিনি উক্তপদ গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে গভর্ণমেণ্ট যে তাঁহাকে এই পদ প্রদানে ইচ্ছা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি বিশেষ সম্মানিত

বিবেচনা করেন। এই সূত্রে তাঁহার এক বন্ধুকে তিনি বলেন যে তিনি কোম্পানীর নুন খাইবেন না, "*I will not eat the salt of the Company.*"

ভারতব্যাপী ব্যবসার দুর্বৎসরে রামগোপালও বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠেন। কেলসেলের কুটিতে থাকিতে থাকিতেই তিনি নিজ নামে বিলাতে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন; তিনি ভীত হইয়াছিলেন যে পাছে কলিকাতায় ব্যবসার এই অনিশ্চিত অবস্থায় বিলাতে তাঁহার বিল অসম্মানিত হয়; তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এই সঙ্কট ও উৎকণ্ঠার সময় তাঁহার এক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি বেনামী করিবার জন্য উপদেশ দেন। এ প্রস্তাবে রামগোপাল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলেন যে ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য যদি পরিধানের বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি এক কপর্দ্দকও বেনামী করিবেন না। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের জন্য ভগবান তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহার একখানি বিলও অসম্মানিত হয় নাই।

এই সময়ে যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন কেলসেল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রামগোপাল লাভবান হইলেন কিন্তু কেলসেল ক্ষতিগ্রস্ত হন, ইহাতে কেলসেলের মনে হইতে লাগিল যে রামগোপাল তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। অবস্থা বিপর্য্যয়ে কেলসেল পুরাতন হিসাব দেখিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি দেউলিয়া হন। উপার্জ্জনের স্রোত যখন ভাগ্য-বৈগুণ্যের বাঁকে আসিয়া ঠেকিল তখন সমস্ত আবর্জ্জনা জমাট বাঁধিয়া উঠিল। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে হিসাব দেখিতে দেখিতে উহার দুইটি জায় মিলাইতে অক্ষম হন। উহার উল্লেখ করিয়া তিনি রামগোপালকে পত্র লিখেন যে তাঁহার দ্বারা কিম্বা তাঁহার কোন লোকের দ্বারা এই প্রবঞ্চনা সাধিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহার বিরুদ্ধে অসাধুতার কোন অভিযোগ কেহ কখন আনয়ন করে নাই বরং তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতার জন্য তিনি প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তির নিকটই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠেন ও উত্তরে লিখেন যে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ তিনি তাঁহার সহিত একত্রে কাজ করিয়াছেন কিন্তু সে কয় বৎসরের মধ্যে কেলসেলের মুখে তাঁহার সাধুতারই প্রশংসা শুনিয়াছেন। তবে ইহা স্থির যে কেলসেলের নির্ব্বোধ ও ভিত্তিহীন সহস্র অভিযোগে তাঁহার সাধুতার বা নির্দ্দোষিতার আদৌ হানি হইবে না। তিনি আরও বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস যে কেলসেল যে-হিসাব অনবগতির উল্লেখ করিয়াছিলেন সে হিসাব সম্বন্ধে কেলসেল জ্ঞাত আছেন। রামগোপাল পত্রে উত্তর দিতে দুই দিন অপেক্ষা করেন। কারণ তিনি আশা করিয়াছিলেন যে কেলসেল তাঁহার অভিযোগের প্রত্যাখ্যান করিবেন। দুইদিনের ভিতর যখন কেলসেলের আর কোন পত্রাদি পাইলেন না, তিনি ক্রোধে বিচলিত হইয়া উঠেন। কেলসেলের নিকট হইতে তিনি যে সমস্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ পাঠান। তিনি তৎসঙ্গে লিখেন যে কেলসেলের অপমানজনক পত্র তখনও প্রতিগৃহীত হয় নাই বলিয়া তাঁহার পক্ষে উপঢৌকনগুলি রাখা অসম্ভব। তিনি আর সে গুলিকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না, তাঁহার সে গুলি রাখাও

কষ্টদায়ক হইবে। বন্ধুত্ব ও সমাদরের চিহ্ন স্বরূপ সেগুলি মূল্যবান, তাহাদের উপর হইতে সে গিল্ট এখন উঠিয়া গিয়াছে, সে মোহকর প্রভাব অপসারিত হইয়াছে; এমন জিনিষগুলি তাহাদের অর্থমূল্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে সুতরাং তিনি সেই অকিঞ্চিৎকর জিনিসগুলি ফেরৎ দিয়া বিশেষ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন। "The deep insult contained in your letter received on the 14th. inst. (July, 1848) having been yet unrecalled it is impossible for me any longer to retain your presents. I cannot use them ; it would be painful even to keep them. They were valuable only as tokens of regard and friendship. The gilt is off, the charm is gone and the things are reduced to their money value. It affords me threfore a great relief to return the worthless pelf." কেলসেল রামগোপালের নিকট যে দশ সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিবার তখন কেলসেলের ক্ষমতা ছিল না, রামগোপাল তাহা জানিয়াও কৃপাপরবশ হইয়া হ্যাণ্ডনোটগুলি আদায়ের চেষ্টা করেন নাই। যে হিসাব লইয়া গোলযোগ হয় তাহা সর্ব্ব সমেত পাঁচ সহস্র মুদ্রারও কম, এই সামান্য মুদ্রার জন্য কেলসেল যে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা রামগোপালকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করে। তিনি পত্রশেষে লিখেন যে কেলসেল প্রকৃতিস্থ হইলে সে এরূপ অন্যায় ভাবে এক ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা ও জুয়াচুরির দোষে কলুষিত করিতে লজ্জা বোধ করিবে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে কেলসেল অন্তরের সহিত জানেন যে সে ব্যক্তি এখনও অকলুষিত। "Shame, shame, ten thousand times repeated, for thus recklessly strigmatising a character that you must in your own heart allow, whenever your violent passions subside, to be, thank God, as yet untainted by fraud on corruption. যে হিসাব লইয়া গোলযোগ হইয়াছিল কলভিন কাউই (Colvein, Cowie Coy.) কোম্পানীর অংশীদার কাউই সাহেব মধ্যস্থতা করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু কেলসেল অসম্মত হন, তিনি কাউই বা রামগোপাল কাহাকেও সে হিসাব দেখিতে দেন নাই। ইহার পর চিরকালের জন্য কেলসেলের সহিত রামগোপালের মনান্তর হইয়া যায়। রামগোপাল যখন কাশীপুরে গঙ্গাতীরে বাগান বাটীতে বাস করেন, তখন একদিকে কেলসেল আর একদিকে রামগোপাল বাস করিতেন, মাঝে শুধু প্রাণনাথ চৌধুরীর ঘাট ব্যবধান ছিল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে কোন পরিচয় কখনও ছিল তাহা আর প্রকাশ পাইত না।

কন্যা

আমরা ঘটনা প্রবাহে রামগোপালের সাধারণ জীবনের অনেকদূর আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এইবার পারিবারিক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

গোরা ও হারা নামক দুইটি পুত্রের অতি শৈশবে মৃত্যুর পর ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রামগোপালের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার নাম হেমলতা। ইঁহার নয় বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় হিন্দু বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আন্দোলন হয়। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বীটন (Drinkwater Bethune) নামক একব্যক্তি বিলাত হইতে বড়লাটের ব্যবস্থা সচিবের পদে নিযুক্ত হয়। বীটন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ র‍্যাঙ্গলার ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও নানা উপায়ে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য কার্য্য আরম্ভ করেন। রামগোপাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শোভাবাজার রাজবাটীর রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। পূর্ব্বে যখন মিসনরীরা সেন্ট্রাল (Central) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন রাজা তাঁহাদিগের পারিতোষিক সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন। রামগোপাল, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির প্রতি বীটনের আপেক্ষিক যত্ন ও মনোযোগে রাজা মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলেন, অনুমিত হয় প্রতিকূলাচরণ ইহারই ফল। তদানীন্তন সময়ে কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইনটেলিজেনসার' পত্রেও এই প্রতিকূলতার বিস্তর পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়। সর্ব্বদেশেই যেরূপ যে-কোন নূতন অনুষ্ঠানের প্রতিকূল ও অনুকূল দুইটি দল সৃষ্টি হয়, এখানেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়াছিল। অনেক সময়ে প্রতিকূল দল নব অনুষ্ঠানের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীকৃত করে। হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষা বিস্তারে তাহাই ঘটিয়াছিল।



রামগোপাল ঘোষের কন্যা (মধ্যভাগে)

বর্দ্ধমানের রাণী বসন্তকুমারীর সহিত ঔপন্যাসিক সম্বন্ধের পর তাঁহার বন্ধুরা (এক্ষণে-রাজা) দক্ষিণারঞ্জনের সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সময়ে রাজা দক্ষিণারঞ্জন আর একবার পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হন। কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজার সুন্দর বাটীতে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম অধিবেশন হয়। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহরে নামে বালিকা বিদ্যালয়ের নামকরণ করিবার অনুমতি দেন কিন্তু বীটনের মৃত্যুর পর ইহা বীটন কলেজ বলিয়া পরিচিত হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুর পরিবারের দৌহিত্র কিন্তু ঔপন্যাসিক ঘটনার পর তাঁহারাও রাজার প্রতি উদাসীন হয়। এই বিদ্যালয়ে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের আনুকূল্যের নিমিত্ত ঠাকুরেরা ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই।

এইরূপে দুইটি প্রতিভাশালী ও ধনশালী সম্প্রদায়ের বিনা সমর্থনে ও সময়ে সময়ে প্রতিরোধিতায় এই নূতন বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন, সুতরাং দলাদলির সহিত সামাজিক প্রতিপত্তিরও প্রভাব চলিতে লাগিল। যে বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিবে তাহাকেই জাতিচ্যুত করা হইবে বলিয়া বীটনের বিপক্ষদল সামাজিক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলেন। যাঁহারা জানিতেন যে জাতি কাচের আসবাব নয়, স্পর্শ মাত্রেই চূর্ণ হইয়া যায় না, তাঁহারা আপন আপন কন্যাদিগকে বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। রামগোপাল তাঁহাদের মধ্যে একজন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারও তাঁহার কন্যাকে পাঠাইয়াছিলেন; "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্‌সার" সেই সময়ে লিখিতে লাগিলেন যে যত দাসীকন্যা এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। মদনমোহন তাহার ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং এই অপবাদের অলীকতা প্রমাণ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর বাঙ্গালার ডেপুটী গভর্ণর সার জন লিটলার (Litler) বেথুন কলেজের ভিত্তি-স্থাপন করেন ও এতদুপলক্ষে নানাবিধ মেসনিক (Masonic) অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। বিদ্যালয়ের ভূমির কতকাংশ রাজা দক্ষিণারঞ্জন দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বেথুন তাঁহার সৎসাহস ও বদান্যতার উল্লেখ করিয়া প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও তৎসঙ্গে যে-সমস্ত বাঙ্গলা সংবাদ পত্র বিদ্যালয়ের আনুকুল্য করিয়াছিল তিনি তাহাদেরও ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনটি ইংরাজ মহিলা এই বিদ্যালয়ের ভারগ্রহণ করেন, মদনমোহন তাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সাহায্য করিতেন। যাহা হউক ঘোর প্রতিকূলতা সত্বেও রামগোপাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ব্যক্তির আনুকূল্যে বিদ্যালয়টী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সেই বৎসর হেমলতার বিবাহ হয় সুতরাং বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে রামগোপাল বীটনকে লিখেন যে তিনি তাঁহার ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার কন্যাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করাইতে বাধ্য হইতেছেন। প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার কন্যার শীঘ্রই বিবাহ দিতে হইবে, সুতরাং বাধ্য হইয়া দেশপ্রথার নিকট তাহার কন্যাকে উৎসর্গ করিতে হইবে।

হেমলতার সহিত বীরচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়। বীরচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহাদের পরিবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটীর মিত্রপরিবার নামে খ্যাত। মিত্রেরা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত কোন্নগর হইতে আসিয়া নৈহাটীতে বাস করেন। বীরচন্দ্রের পিতামহ রঘুনাথ বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিমের অধীনে উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং পরে কৃষ্ণনগরের রাজার অধীনে কর্ম্ম করেন। বীরচন্দ্রের বিবাহের পূর্ব্বে তিনি মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ডাক্তার এফ, জে, মওয়াট (Mouat) তখন মেডিক্যাল কলেজের সেক্রেটারি; বীরচন্দ্রের সন্ধান পাইয়া রামগোপাল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে চান। বীরচন্দ্র তখন ক্লাসে ছিলেন, মওয়াট তাঁহাকে ডাকাইবার জন্য আর্দ্দালীকে আদেশ করেন। রামগোপাল তাহাতে বাধা দিয়া বলেন যে তাহাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, তিনি পুনরায় আসিবেন।

মওয়াট বলেন যে তাঁহার আসিবার আর প্রয়োজন নাই, তিনি বীরচন্দ্রকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবেন। বীরচন্দ্র যখন উপস্থিত হইলেন তখন রামগোপাল গৃহে ছিলেন না, তাঁহার ভাগিনেয় বিজয়চন্দ্র বসু তাঁহাকে রামগোপালের জন্য অপেক্ষা করিত বলিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। রামগোপাল বাটীতে পদার্পণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন ও অল্পক্ষণের মধ্যেই কলেজ স্কোয়ারনিবাসী শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস) কে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন। শ্যামাচরণ ক্যাপ্তেন রিচার্ডসনের একজন খ্যাতনামা ছাত্র। তিনি য়্যাসিষ্টাণ্ট কনট্রোলার ও বহুকাল India treasuryর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন ও পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নির্ভীকতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য্য করেন। তিনি বীরচন্দ্রকে Government রচিত গ্রীসের ইতিহাসের এক অংশ পাঠ করিতে দিয়া তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। শ্যামাচরণ বলেন যে বীরচন্দ্র পাঠের উপযুক্ত অর্থ বলিতে সক্ষম হন নাই। বীরচন্দ্র তাহার উত্তরে বলেন যে তিনি যাহা জানিতেন তাহাই বলিয়াছেন, ভাল মন্দ তিনি বলিতে পারেন না। বীরচন্দ্র তামাকু সেবন করেন কিনা রামগোপাল জিজ্ঞাসা করেন। তখনও সিগার বা সিগারেটের চলন হয় নাই। সাহেবরাও তখন গৃহে ও বেঙ্গল ক্লাবে আলবোলা ব্যবহার করিতেন। ইহার পর বীরচন্দ্রকে একদিন একটি বাগানে নিমন্ত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, রামগোপাল ও তাঁহার বন্ধুরা এই বাগানে উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে তাঁহার জামাতা, নির্ব্বাচন হয়। বীরচন্দ্র নাতি দীর্ঘ, সুকান্তি ও সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার আকৃতিতে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইত।

রামগোপালের পৈতৃক বাসস্থান বাঘাটিতে হেমলতার বিবাহ হয়। কলিকাতা হইতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। রামগোপাল ভদ্রলোকের সম্ভ্রম রক্ষার যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করেন। অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হর, পাছে শীতে লোকে কষ্ট পায় সেই জন্য তিনি চারিশত লেপ তৈয়ারী করান ও জল পানাদির জন্য চারিশত কাঁসার গেলাস ও ঘটি ক্রয় করেন। পূজার দালানের সম্মুখে বৃহৎ আটচালা তৈয়ারী হয় ও তাহা সুন্দররূপে সবুজ বৃক্ষপত্রে ও নানাবিধ পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত হয়। ইংরাজী বাজনার বন্দোবস্ত হয়। বলা বাহুল্য বাঘাটী গ্রামে সেই প্রথম ইংরাজী বাজনা শুনা যায়। কলিকাতা হইতে সকলে নৌকা-যানে বাঘাটী পৌঁছান। অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিতদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য ত্রিবেণীতে ছকুবাবুর ঘাট হইতে রামগোপালের বাটী পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা তিনি নিজব্যয়ে উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দেন। পথে তাঁহাদিগের শ্রান্তি ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য এবং বিবাহের কয়দিন থাকিবার জন্য প্রায় একশত বাটীতে তাঁহাদের আয়োজন করিয়াছিলেন। বাঘাটী গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন খাদ্য দ্রব্যের 'তত্ত্ব'ই সমধিক প্রচলিত ছিল, রামগোপাল ফুলশয্যায় দিন যথাসাধ্য সন্দেশ, তৈজস পত্র ও উপকরণাদি বহুবিধ সামগ্রী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি হয় নাই। ফুলশয্যা যখন চলিয়া গিয়াছে, তিনি তখন ত্রিবেণীর বাজারে যাইয়া শিবু ময়রার দোকানে উপস্থিত

হন এবং তাহার মারফৎ সেদিন ত্রিবেণীর বাজারে যত মিষ্টান্ন প্রস্তুত ছিল সমস্ত ক্রয় করিয়া ছয়খানি নৌকা বোঝাই করিয়া পুনরায় তাহা নৈহাটীতে প্রেরণ করেন। বিবাহ উপলক্ষে সকল দাস দাসীকেই রৌপ্য বালা ও বস্ত্র প্রদান করেন। তাহারা চিরদিন রামগোপালের ও নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করিত। এই বিবাহে তিনি পঁচিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।



রামগোপালের জামাতা ও দৌহিত্রগণ

বিবাহের পর তিনি বীরচন্দ্রকে উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বীরচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিবাহের পর রামগোপাল যখন বাঘাটীতে নব জামাতা লইয়া যান সে ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাঘব সর্দ্দার তাঁহার বাটীতে চাকুরী করিত। সে পূর্ব্বে ডাকাতের সর্দ্দার ছিল, পরে যখন ধরা পড়ে রামগোপালের জননীর নিকট আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করে। রাঘব সর্দ্দার জানিত যে রামগোপাল কখন জননীর কথা ঠেলিতে পারিবেন না। জননী পুত্রকে অনুরোধ করেন যে রাঘব সর্দ্দারকে রক্ষা করিতে হইবে। রামগোপাল ওয়াকব সাহেবকে সমস্ত কথা জানাইয়া বলেন যে ইহা তাঁহার জননীর অনুরোধ সুতরাং রাঘব সর্দ্দারের জন্য তিনি স্বয়ং দায়ী। ইহাতে সাহেব আজ্ঞা দেন যে রাঘব সর্দ্দার যতদিন রামগোপালের বাটীতে থাকিবে ততদিন বিচারে তাহার মামলায় যে রায় দেওয়া হইয়াছিল তাহার কার্য্য স্থগিত থাকিবে। রাঘব সর্দ্দার জীবনের শেষ অংশ তাঁহার বাটীতেই চাকুরী করিয়া কাটাইয়া দেয়। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে তখন ডাকাতী শান্তি ও সমবেত শক্তির অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় গৌরব নষ্ট করিতেছিল। ত্রিবেণী হইতে বাঘাটীর পথে তখন অত্যন্ত ডাকাতের ভয় ছিল। তিনি যেদিন নূতন জামাতা লইয়া যান, সেদিন রাঘব সর্দ্দারকে কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া পাল্কী ও আলো লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। আদেশ অনুসারে

রাঘুব সর্দ্দার ঘাটে হাজির ছিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই পৌঁছিয়া যান। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে স্থির করিল যে তিনি আসিবেন না, সে তখন ফিরিয়া যায়। এদিকে দুইদিন নৌকাযোগে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া যখন তাঁহারা ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা সমাগত, সঙ্গে জামাতা, ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিচন্দ্র মিত্র ও ভাগিনেয় বিজয়চন্দ্র। ডাক্তার ডাফ্ (Duff) যে চারিজন ছাত্রকে প্রথমে শিক্ষা দেন ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন, তিনি পরে কলিকাতা ট্রেজারির য়্যাসিস্ট্যাণ্ট সিভিল মাষ্টারের পদ অধিকার করেন। বাগাটীর মিত্র পরিবারসম্ভূত মতিচন্দ্র রাখালচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা, কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে তাঁহার বাস ছিল। তিনি তখন যুবা পুরুষ ও বেশ বলশালী ছিলেন। এক তাড়িখানার সম্মুখ দিয়া যাইতে হইত; মতিচন্দ্রের সহিত সেই তাড়িখানার কয়েক ব্যক্তির কলহ হয়। তিনি ইক্ষুদণ্ড দ্বারা তাহাদের প্রহার করেন ও গর্ব্ব করিয়া বলেন যে রামগোপালের সঙ্গে বিস্তর লোকজন আছে তাহারা তাড়িখানা ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া যাইবেন। প্রহৃত হইয়া তাহারাও প্রতিশোধ লইবে বলিয়া স্থির করে ও ভয় দেখাইয়া বলে যে রামগোপালের সকলকেই সেইখানে ধরাশায়ী করিবে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাকালে রামগোপালের জনবল মতিচন্দ্রের অবিদিত ছিলনা, তিনি ভয়ে বৃক্ষারোহণে রাত্রি যাপন করেন, ক্ষেত্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র রাধুনী বামুন ও চাকর সাজিয়া পলায়ন করেন। রামগোপাল যখন সব কথা শুনিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার জামাতা ব্যতীত আর কেহই ছিলনা। তাঁহার সহিত বন্দুক ছিল, জামাতার হাত ধরিয়া তিনি রওনা হন। রাত্রি গভীর অন্ধকার, ক্রোড়ের মানুষ দেখা যায় না, মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করেন আর সেই আলোতে পথ নির্ণয় করিয়া তাঁহারা বাগাটী পোঁছান। কিন্তু ইহারই ভিতর অন্ধকারে বীরচন্দ্রের গণ্ডে একজন চপেটাঘাত করে, কিছুদূর আসিয়া কথা প্রসঙ্গে রামগোপাল যখন ইহা জানিতে পারিলেন তখন জামাতাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। এ ডাকাতের দেশে দুর্ব্বলতা দেখাইলে তাঁহাকে তথা হইতে বাস উঠাইতে হইবে এই বলিয়া তিনি আবার ফিরিতে উদ্যত হন কিন্তু বীরচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে উহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। এ ঘটনার আদ্যোপান্ত আমরা জামাতার মুখেই শুনিয়াছি।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

———স্মরণে

(১)

মাঠের মাঝখানে,
প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ-গাছ ছিল সেই স্থানে,—
হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ, উচ্চশির,
দাঁড়াইয়া, যেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মহাবীর!
তারই তলায়, গর্ত্তের ভিতরে,
থাকেন এক শেয়াল সুখে, বহুদিন ধরে'।

(২)

একদিন, সন্ধ্যা হ'লে পর,
শেয়াল তখন গর্ত্তের ভিতর,
উঠিল বিষম ঝড়,
তরুবর করে মড়্-মড়্,
ক্রমে তার শিকড় উপাড়ি,
ফেলিল তাহারে ভূমে পাড়ি।

(৩)

ঝড় থেমে গেল,
ফরসা হ'য়ে এল,
শৃগাল বাহিরায়;—
দেখিল সে—অশথ্-দাদা পড়িয়া ধরায়!
আগা-গোড়া বারবার, দেখিয়া চাহিয়া,
অবাক্ হইল ভায়া, বিস্ময় মানিয়া!—
মনে মনে বলে,—উঃ এত বড়, তাহা
আগে ভাবি নাই, দুঃখ তাই, আহা, আহা!

(৪)

মানুষেরও এই দশা, অশ্বত্থের প্রায়,
কত বড়, বুঝে লোকে, সে যখন ধরায়!*

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

* (ঈশপ্-অবলম্বনে)।

গিরিব্রজপুর

আশ্বিন মাসের শেষের দিকে যেদিন মার্টিন্ কোম্পানীর গোশকট-বিজয়ী ক্ষুদ্র রেলগাড়ীতে চড়িয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে রাজগির্ পেঁাছিলাম সেদিন হৃদয়ের বহুদিনের একটি সঞ্চিত আশা ফলবতী হইল। মগধের রাজধানীতে নয়, পৌঁছিলাম গিয়া একটী বেহারী পল্লীগ্রামে, যাহার নিকটেই কাতারে কাতারে পাহাড়, আর আশে পাশে কয়েকটী ধর্ম্মশালা, দেবমন্দির, ধনীর স্বাস্থ্যভবন ও শ্যামল শস্যক্ষেত্র।

মাঝে মাঝে প্লেগের আক্রমণে উপদ্রুত হইলেও স্থানটী নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর। এখানে মিউনিসিপালিটী নাই, কিন্তু মুক্ত বায়ু আছে। গ্রামের ভিতরে বেহারী পল্লীর অপরিচ্ছন্নতা ও সভ্যতার নিদর্শন পুরীষাগার থাকিলেও বাহিরের দিক টা মানুষের এ সকল গৌরবের চিহ্ন হইতে বঞ্চিত। নানা কারণে আমাদের ডাকবাঙ্গলায় উঠিবার সুবিধা হয় নাই, আশ্রয় লইতে হইয়াছিল একটী ধর্ম্মশালায়। দেখিলাম বাঙ্গালী ভদ্র লোক অনেকেই ধর্ম্মশালার কৃপায় এখানে কয়েকদিন বাস করিবার সুবিধা উপভোগ করিতেছেন। আমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতারা পূর্ব্ব-বঙ্গের পাট ও ম্যানচেষ্টারের কাপড় বিক্রয় করিয়া যে স্তূপীকৃত অর্থের মুখ দেখিতে পান, তাহার সদ্ব্যবহার হয় এই সকল স্থানে। রাজগিরের ন্যায় স্থানে তিনটী সুপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্মশালা দেখা গেল। তিনটিই, আমরা-যাঁহাদিগকে জাতি ও বাসস্থান নির্ব্বিশেষে 'মাড়োয়ারী' বলি, সেই শ্রেণীর লোকের প্রতিষ্ঠিত। একটী হিন্দুর, ২টি জৈনদের। জৈনদের ধর্ম্মশালাই অধিকতর সৌষ্ঠববিশিষ্ট, কিন্তু এখানেও আশ্রয়প্রার্থী হিন্দু সাধারণতঃ নিরাশ হন না। আরও দুইটী ধর্ম্মশালা উঠিতেছে দেখা দেল, একটী নানকশাহী সম্প্রদায়ের অপরটী বৌদ্ধদের। রাজগির্ গয়া হইতে খুব বেশী দূর না হইলেও স্থানের প্রকৃতি অন্যরূপ। গয়ার মশা গর্জ্জনে ও দংশনে বোধ হয় বেহারে অতুলনীয়। ঢাকার সহিত তুলনায় জয়পরাজয় কাহার তাহা বিশেষ গবেষণার বিষয়। রাজগিরে মশারির বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করি নাই। আর জল ? সেত স্বাস্থ্যান্বেষীর বহু তপস্যার জিনিষ—উষ্ণ প্রস্রবণের ধাতুজপদার্থমিশ্রিত জল, যাহাতে স্নানের জন্য দলে দলে লোক জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমাগত, যাহার বাতরোগ প্রতীকারের খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত। এখানে সরস্বতীনদী ক্ষীণকায়া, তাঁহার নিকট ফল্গুর বালুকাগর্ভস্থ বিমল জলের আশা করা যায় না, কিন্তু কূপোদকও মন্দ নয়; আর যিনি পারেন তিনিই পানের জন্য ঐ প্রস্রবণের জল কিছু দূর হইতে আনা আবশ্যক হইলেও তাহারই ব্যবস্থা করেন। ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলেই মৎস্যমাংসত্যাগী, অনেকটা সাত্ত্বিকাহারী হইতে হয়। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য যাহা পাওয়া যায় তাহা সাধাসিধে রকমের। যাঁহারা ধনী এবং দীর্ঘকাল বাসের অভিলাষী তাঁহাদিগকে রসনার তৃপ্তিজনক খাদ্য দূর হইতে আনাইতে হয়। তবে সাধারণ লোকের দিন ডাল, ভাত, তরকারীতে এক রকম কাটিয়া যায়। দধি, দুগ্ধ, মিঠাইও দুষ্প্রাপ্য নহে। দুধ বিক্রয়ের পূর্ব্বে তাহাকে জল দ্বারা কিঞ্চিৎ তরলকরতঃ সুপরিপাকের ব্যবস্থা একটী

সভ্যমানুষের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া। এখানেও উহা অপরিচিত নহে। সভ্যতার দেশ হইতে আগত মানুষ এ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত, সুতরাং তাঁহার ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু আর একটী ব্যাপারে হয়ত তিনি রাজগিরের দিকে মুখ বাঁকাইয়া বসিবেন। একটী আবশ্যক প্রাতঃকৃত্য সারিবার স্থান দেখিলাম নিকটবর্ত্তী অড়হর-ক্ষেত্র। বস্তির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি জাতির ইজ্জত রক্ষার জন্য কূয়া পায়খানা আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অড়হর-ক্ষেত্রও বোধ হয় অপ্রীতিকর নহে।

প্রথমেই অনেক অর্ব্বাচীন ব্যাপারের উল্লেখ করিলাম কিন্তু রাজগিরের গৌরব ইহার প্রাচীনতায়। মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকায় রাজগিরের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত হয় কিন্তু সে সাধারণতঃ একটু ভাসা ভাসা রকমের অথবা সাহেবদিগের লেখার চর্ব্বিতচর্ব্বণ। কোন উপযুক্ত দেশীয় লোক কিছু বেশী দিন রাজগিরে ঘুরিয়া উহার পুরাতত্ত্ব ভাল রকম উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চীন দেশের ভ্রমণকারীদিগের বিবরণে পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের অনেক উপকরণ আছে কিন্তু তাহা ছাড়া প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু সাহিত্যের সহিত পরিচয় আবশ্যক, আর আবশ্যক জঙ্গলাকীর্ণ গিরিতে ভ্রমণ করিবার শক্তি ও সহিষ্ণুতা। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের এ সকল যোগ্যতা না থাকিলেও বিষয়টী এত কৌতূহলপূর্ণ ও জটিল যে এদিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কয়েকটী কথা বলা বোধ হয় ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য হইবে না।

'রাজগির্' শব্দটী 'রাজগৃহ' শব্দের অপভ্রংশ। রাজগৃহে এক সময়ে সত্য সত্যই রাজার বাড়ী ছিল, ধন-জন-গৃহাদি-পূর্ণ মগধের রাজধানী ছিল। সেও অল্প দিনের জন্য নহে, দীর্ঘকাল ইহা মগধের গৌরবস্থল, প্রাচীন ভারতের শৌর্য্যবীর্য্যের একটী বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই ইহা তীর্থস্থান, মুসলমানেরও পুণ্য ভূমি। বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান সমতলবর্ত্তী রাজগির্ গ্রামের দক্ষিণে শৈলসমাকীর্ণ স্থানে মহাভারতোক্ত জরাসন্ধ রাজার গিরিব্রজপুর অধিষ্ঠিত ছিল; ইহা তাঁহার নিজকৃত নহে, পিতৃপুরুষের রাজধানী। মহাভারতের মতে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন এই মগধপুরের দুর্ভেদ্যতা এবং রাজার সৈন্যসামন্ত ও বাহুবল লক্ষ্য করিয়া গুপ্তবেশে মগধরাজকে বধ করিতে আসেন। জরাসন্ধ যে-সে রাজা ছিলেন না, তাঁহারই ভয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় নূতন রাজধানী স্থাপন করিতে হইয়াছিল। বহু রাজাকে ধরিয়া আনিয়া তিনি মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। মহাভারতের মতে তাঁহার বধকার্য্য সম্পাদন করেন ভীমকর্ম্মা ভীমসেন, পরামর্শ-দাতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। জৈন পুরাণ হরিবংশের মতে কিন্তু কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়াছিলেন স্বয়ং বাসুদেব। ভগবান্ এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন্, তাই হিন্দু পাণ্ডা এখনও পর্ব্বতগাত্রে বিষ্ণুপদচিহ্ন দেখাইতে ব্যগ্র। বৈভারগিরি ও উদয়গিরির মধ্যে সমতল প্রান্তর আছে, সেইখানে—জরাসন্ধের আখড়ায়—যে ভীম-জরাসন্ধের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল পুরাতত্ত্ববিতের সন্দেহ থাকিলেও পাণ্ডাদের তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই গিরির দক্ষিণভাগে একটী গুহায় যে জরাসন্ধের

গুপ্তধন রক্ষিত হইত তাহাও তাহারা প্রকাশ্যভাবেই বলিয়া দেয়। যিনি ভক্তির সহিত মহাভারত পড়িয়াছেন তিনিই জানেন জরাসন্ধ জন্মের সময়ে দুই খণ্ডে ভূমিতলে পড়িয়াছিল, জরা নামক রাক্ষসী তাঁহাকে যোড়া দিয়া মানুষ করে। সেই ছিদ্র ধরিয়াই ত শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীমসেন তাহাকে মল্লযুদ্ধের সময়ে ছিঁড়িয়া ফেলেন। জরা রাক্ষসী এক্ষণে জরাদেবী নামে আলৌকিক মূর্ত্তিতে উপত্যকাস্থ উচ্চভূমিতে পূজা পাইতেছে। আর উষ্ণ প্রস্রবণগুলি ত ভগবানেরই লীলা। ভগবচ্ছক্তি যেখানে এরূপ অসাধারণভাবে প্রকট সেখানে হিন্দুর তীর্থ হইয়াই থাকে। এদিকে আবার বুদ্ধদেব যে এখানে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা সুপরিচিত। অনেক গিরিই তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী কালের নানা স্মৃতির সহিত জড়িত। বিপুল গিরি জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর তপস্যার ক্ষেত্র। অন্যান্য গিরিও জৈন সাধুপুরুষদিগের সংস্পর্শে পবিত্র।

মহাভারতের মতে জরাসন্ধের রাজধানী মগধপুর বা গিরিব্রজ পঞ্চশৈলে বেষ্টিত। এই পঞ্চশৈলের নাম বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক। "রাজগৃহ মাহাত্ম্যের" মতেও রাজগৃহ পঞ্চ পবিত্র গিরির মধ্যে মালার ন্যায় অবস্থিত কিন্তু এই পঞ্চ শৈলের নাম বৈভার, বিপুল, রত্নকূট, গিরিব্রজ ও রত্নাচল। বর্ত্তমান কালেও পাণ্ডারা ৫টা শৈলের নাম করে কিন্তু নাম দাঁড়াইয়াছে এখন বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোনাগিরি। জৈন ভক্তেরা খাটুলিতে চড়িয়া এই পাঁচটী শৈলই প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন। বাস্তবিক শৈল এখানে ৫টী নহে, বেশী। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোনাগিরি ছাড়া চৈত্যগিরি, শৈলগিরি ও গিরিয়ক আছে, আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এ সকলই বর্ত্তমান সমতলবর্ত্তী রাজগির্ গ্রামের দক্ষিণে এক উপত্যকা ঘিরিয়া দণ্ডায়মান। পুরাণকার কেন পাঁচটীর অতিরিক্ত গিরির উল্লেখ করিতে অনিচ্ছুক তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। মহাভারতোক্ত বৈহার যে বর্ত্তমান বৈভার তাহা সহজেই ধরা পড়ে। 'বিশ্বকোষ'কার বলেন রত্নাচলই চান পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ঔড়ুম্বর গুহা, পালি গ্রন্থের পাণ্ডব শৈল ও মহাভারতের ঋষিগিরি। তিনি কোথা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা লেখেন নাই, রত্নাচলের বর্ত্তমান নাম কি তাহাও বলেন নাই। তিনি আরও বলেন বর্ত্তমান 'বিপুল' পালিগ্রন্থে "বেপুল্লো" এবং মহাভারতে চৈত্যক নামে কথিত। বিপুল যে "বেপুল্লো" তাহা নামেই প্রকাশ কিন্তু মহাভারতের চৈত্যক কেমন করিয়া চত্য বা চৈত্যগিরি না হইয়া বিপুল গিরির প্রাচীন নাম সাব্যস্ত হইল তাহা বোঝা যায়না। তিনি আরও বলেন "রাজগৃহ মাহাত্ম্যে" যাহা গিরিব্রজ মহাভারতে তাহাই বরাহ এবং বর্ত্তমান কালে তাহার কতকাংশ গিরিএক নামে খ্যাত। ইহারও কোন যুক্তির অবতারণা করা হয় নাই। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের নব্যভারতে ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এক প্রবন্ধে বৈভার, বিপুল, বৃষভ বা পাণ্ডব, গৃধ্রকূট বা চৈত্যক এবং ঋষিগিরি নাম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ঋষিগিরি ও চৈত্যক বর্ত্তমান কোন্ দুইটী গিরি এবং বৃষভগিরিকে পাণ্ডবগিরি ধরিয়া লওয়া হইল কেন, তাহার বর্ত্তমান নামই বা কি তাহা

বলেন নাই। কানিংহাম সাহেব রত্ন গিরিকে পালিগ্রন্থের পাণ্ডব শৈল মনে করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহাকে মহাভারতোক্ত ঋষিগিরি কেন মনে করিলেন তাহা লেখেন নাই। 'বিশ্বকোষ'কার যে রত্নাচল ও ঋষিগিরিকে অভিন্ন এবং বিপুলগিরিকে মহাভারতোক্ত চৈত্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কানিংহাম সাহেবের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র মনে হয়। বাস্তবিক গৃধ্রকূট যে শৈল গিরি বা তাহার একাংশ ইহা এক রকম স্থির হইয়া গিয়াছে। নামসাদৃশ্যে আমরা বর্ত্তমান চতা বা চৈত্যগিরিকে মহাভারতোক্ত চৈত্যক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বিপুল গিরির শিরোদেশে হয়ত কোন সময়ে এক চৈত্য ছিল কিন্তু তাহাতেই তাহার চৈত্যক গিরি হওয়ার দাবি চতাগিরির দাবি অপেক্ষা প্রবল হইতে পারে না। চৈত্য প্রাচীন রাজগৃহের অনেক স্থানেই ছিল। বিপুল গিরিতে শৃঙ্গী ঋষি নামে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।আবার গিরিয়ক পর্ব্বতে "রিখিয়া মাই" এর মন্দির আছে। ইহার কোনটী মহাভারতের ঋষিগিরি বলিয়া মনে হয়। 'রাজগিরি মাহাত্ম্যে'র রত্নকূট বর্ত্তমান রত্নগিরি হইতে পারে।* তাহা হইলে সোনাগিরিকে 'রাজগিরি মাহাত্ম্যে'র রত্নাচল বলিতে হয়।

বৈভার ও বিপুল গিরির পাদদেশেই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি। এ গুলি কতদিনের তাহা বলা কঠিন। মহাভারতে উষ্ণ প্রস্রবণের উল্লেখ নাই, তবে তাহার উল্লেখ বোধ হয় আবশ্যকও ছিল না। বৈভার ও বিপুল রাজগৃহের আর সকল গিরির উত্তরে। এই দুইটীর মধ্যস্থ উপত্যকা দিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সরস্বতী প্রবাহিত। উষ্ণপ্রস্রবণগুলি সরস্বতী নদীর উভয় দিকেই বিদ্যমান। এখন ১৩টী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, বৈভার গিরির পাদদেশে গঙ্গা-যমুনা, অনন্ত ঋষি, সপ্তর্ষি, ব্রহ্মকুণ্ড, কশ্যপ ঋষি, ব্যাসকুণ্ড ও মার্কণ্ডেয়কুণ্ড; বিপুল গিরির পাদদেশে সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, চন্দ্রমাকুণ্ড ও 'শৃঙ্গীঋষি'কুণ্ড। কয়েকটী কুণ্ডে একাধিক প্রস্রবণের জল পড়িতেছে, গঙ্গা-যমুনায় দুইটীর, সপ্তর্ষিকুণ্ডে সাতটীর ইত্যাদি। ব্রহ্মকুণ্ডের জলই বেশী উষ্ণ। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে সপ্তর্ষিকুণ্ডে স্নান করিয়া পরে ব্রহ্মকুণ্ডে আসে, পাণ্ডা ঠাকুর সেই সময়ে সঙ্কল্প করাইয়া মন্ত্র পড়াইয়া দেন। অনেক পাণ্ডারই বিদ্যার দৌড় দাঁড়াইয়াছে এখন ঐ মন্ত্র পড়ান ও অপেক্ষাকৃত সহজগম্য কয়েকটী স্থান প্রদর্শন পর্য্যন্ত। পাহাড়গুলির উপরের অবস্থার সহিত কম পাণ্ডাই পরিচিত। কুণ্ডগুলি সবই বান্ধান আর যে সকল স্থান দিয়া জল কুণ্ডে পড়িতেছে, প্রস্রবণের সেই মুখগুলিও নানা প্রকার আকৃতিতে বান্ধান। কুণ্ডের আশে পাশে বহু দেবমন্দির মস্তক উত্তোলন করতঃ তীর্থ-যাত্রীর ভক্তি ও অর্থের জন্য দণ্ডায়মান। 'শৃঙ্গী ঋষি' কুণ্ডটী অন্যান্য কুণ্ড হইতে উত্তর-পূর্ব্বে—কিছু দূরে ইহার অপর নাম মখ্‌দুম কুণ্ড—মখ্‌দুম শাহ নামক জনৈক ফকির নাকি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। কথিত আছে, তিনি এক প্রস্তর গুহায় ৪০ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন। রাজগৃহের উপত্যকায় ও নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক মুসলমানের সমাধি দেখিতে পাওয়া

---

* ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'নব্য ভারতে' রামলাল সিংহ লিখিত প্রবন্ধ।

যায়। বৈভার গিরিগাত্রে কুণ্ডগুলির অদূরে গিলগিল্‌শা নামক সাধুর সাধন-গুহা এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় বর্ত্তমান।

চীনদেশীয় পর্য্যটক ইউয়ান্ চোয়াঙের বিবরণ হইতে জানা যায় প্রস্রবণের সংখ্যা পূর্ব্বে আরও বেশী ছিল। তিনি কোন গিরির পাদদেশে * এক সময়ে ৫০০ উষ্ণ প্রস্রবণের অস্তিত্বের কথা শুনিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কতক শীতল ও কতক উষ্ণ এমন কুড়ি কুড়ি প্রস্রবণ দেখিয়া গিয়াছিলেন। পর্য্যটক ফাহিয়ান উষ্ণ প্রস্রবণের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ইউয়ান চোয়াঙের সমসাময়িক চীনদূত ওয়াঙ্ সুয়ান নাকি ইহার একটী প্রস্রবণে মস্তক প্রক্ষালনের ফলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত উজ্জ্বল মসৃণ কেশের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। † প্রস্রবণ গুলির রোগনাশক ক্ষমতা ইউয়ান্ চোয়াঙের সময়েও অজ্ঞাত ছিল না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন অনেক সময়ে প্রস্রবণে স্নান করিয়া লোক পুরাতন পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিত। প্রস্রবণের যে কেবল সংখ্যাই কমিয়া গিয়াছে তাহা নহে, সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন জলের উষ্ণতাও কমিয়া যাইতেছে। কালে কিরূপ দাঁড়াইবে বিধাতাই বলিতে পারেন।

পুরাণের মতে জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সহদেব হইতে আরম্ভ করিয়া বহু হিন্দু রাজা মগধপুরে রাজত্ব করেন। জরাসন্ধ বংশের পরে আরও কয়েকটী বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর শিশুনাগ বংশীয় কয়েকজন রাজার রাজত্ব তাহার পর ঐ বংশীয় বিম্বিসারের আমলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বুদ্ধদেবের সময়ে প্রথমে বিম্বিসার ও পরে তৎপুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজা। বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর অনেক কথা বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। হিন্দুপুরাণে বিম্বিসারের নাম বিকৃত হইয়া গিয়াছে, রাজাদের পৌর্ব্বাপর্য্যও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। জৈন গ্রন্থে বিম্বিসারকে শ্রেণিক বলা হয়। বিম্বিসার বা অজাতশত্রু রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া উত্তর ভাগে সমতল ভূমিতে লইয়া আসেন। এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। বিম্বিসারের রাজধানী কুশাগ্রপুর বা কুশাগারপুরে (প্রাচীন রাজগৃহে) প্রায়ই আগুন লাগিয়া লোকের বিশেষ ক্ষতি হইত। বিম্বিসার নিয়ম করিলেন যাহার ঘরে প্রথম আগুন লাগিবে তাহাকে শ্মশানে নির্ব্বাসিত করা হইবে। দৈবক্রমে রাজবাড়ীতেই আগুন লাগিল। তখন রাজা নিজের নিয়ম ঠিক রাখিবার

---

* এই গিরির নাম ইউয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনায় পিপুলো। ওয়াটার্স ইহাকে বিপুল গিরি বলিয়া গিয়াছেন; (On Yuan chwang's Travels in India ১৫৩ পৃঃ) কিন্তু বিপুল গিরির অবস্থানের সহিত ইহার বর্ণনা মেলে না। বিপুল গিরি রাজগৃহের উত্তর তোরণের পশ্চিম দিকে নহে। আবার যদি পিপ্পল গুহার নামানুসারে বৈভার গিরিকে পিপুলো ধরা যায়, তাহা হইলেও সামঞ্জস্য রাখা যায় না, কারণ প্রস্রবণগুলি বৈভার পর্ব্বতের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নহে। আশা করি কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ইউয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনার সহিত প্রস্রবণগুলির বর্ত্তমান অবস্থান মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন।

† "On Yuan Chwang's Travels in India" by Thomas Watters (1905 edition P. 154,)

জন্য উত্তরাধিকারীকে রাজাসনে বসাইয়া স্বয়ং শ্মশানভূমিতে বাস করিতে গেলেন। বৈশালী-রাজ এই সংবাদ পাইয়া মগধ আক্রমণ করিতে আসিলেন। রাজা বিম্বিসার তখন বাধ্য হইয়া নূতন রাজগৃহের পত্তন করিলেন এবং কুশাগ্রপুরের সকল প্রজাকে এই নূতন রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। গল্পটী ইউয়ান চোয়াঙ্ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনিই আবার বলেন যে অন্য মতে রাজা অজাতশত্রু নূতন রাজধানীর নির্ম্মাণকর্ত্তা।

কালের কুটিল গতিতে এই নূতন রাজধানীও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। অজাতশত্রু রাজার পৌত্র (মতান্তরে পুত্র) উদয়াশ্বের আমলে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমান রাজগির্ গ্রাম নূতন রাজগৃহের কতকাংশের উপর।

নূতন রাজগৃহ অপেক্ষা পুরাতন রাজগৃহ যে অধিকতর সুরক্ষিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নূতন ও পুরাতন রাজগৃহের শিলাময় প্রাকারের খানিকটা এখনও বর্ত্তমান; তাহাতে দেখা যায় পুরাতন রাজগৃহ কতক ভগবানের বিধানে, কতক মানুষের চেষ্টায় দুর্ভেদ্য ছিল। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোনাগিরি পরিবেষ্টিত প্রাচীন রাজগৃহের চারিদিকে যে দুর্ভেদ্য প্রাকার ছিল, তাহার মধ্যে আবার রাজবাড়ীর সুরক্ষার জন্য চারিদিক ঘিরিয়া অন্য এক প্রস্তর-প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকের রত্নগিরি হইতে একটী এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের উদয় গিরি হইতে আর একটী প্রাকার যে পূর্ব্বোত্তরে গিরিয়কের দিকে চলিয়া গিয়াছিল তাহারও চিহ্ন রহিয়াছে। এই দুই প্রাকার গিরিয়ক পরিবেষ্টন করিয়া এক সময়ে এক প্রকাণ্ড সুরক্ষিত শৈল-উপত্যকাময়, নদী-সরোবর-প্রস্রবণযুক্ত রাজধানীর শোভা সম্পাদন করিত। পার্ব্বত্য শোভা এখনও আছে কিন্তু মানুষ উহার উপর যে শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নাই। গিরিব্রজপুরের অধিকাংশই এখন জঙ্গলাবৃত, মানুষের পরিবর্ত্তে বন্য শ্বাপদগণই সেখানে বেশী সুখে দিন কাটায়।

এই সুপ্রাচীন প্রকাণ্ড রাজধানীর কোন্ স্থানে কোন্ রাজা বাস করিতেন তাহা ঠিক করা অবশ্যই কঠিন, কারণ এখানে বহু রাজবংশের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে। রাজাদের বাসভবনও বহুকাল হইল ভূমিসাৎ হইয়াছে। যেখানে দুইটী প্রাকারে সুরক্ষিত প্রাচীন রাজগৃহ সেখানেই যে নূতন নগর নির্ম্মাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজধানী ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কালের মহিমায় সে প্রাচীন গৃহাদি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন কীর্ত্তি গুলির যে অনেক লোপ পাইয়াছে তাহাও সহজেই অনুমেয়। অশোক নির্ম্মিত উচ্চস্তূপের স্থান এখন অনুমান করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রাচীন রাজগৃহের মধ্যভাগে যেখানে এখন মণিয়ার মঠ নামক জৈন মন্দির সেখানে মহাভারতোক্ত মণিনাগের বাস-ভবন ছিল কি বৌদ্ধ আমলের স্মৃতিরক্ষক গুহা বা ভাণ্ডার গৃহ ছিল ভাবিয়া গলদঘর্ম্ম হইতে হয়। ইংরাজ আমলে ইহা খুঁড়িতে গিয়া কিন্তু কতকগুলি নাগমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

কেহ কেহ পঞ্চশৈল-বেষ্টিত প্রাচীন রাজগৃহে, রত্নগিরি ও উদয় গিরির পার্শ্ববর্ত্তী

স্থানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল বলিয়া থাকেন। জরাসন্ধের আখড়ার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈভার গিরির দক্ষিণ দিকে সোণভাণ্ডার গুহায় যে তাঁহার কোষাগার ছিল পাণ্ডারা তাহা বলিলেও পুরাতত্ত্ববিৎগণ ইহাকে জৈন সাধুদের গুহার উপরে আর কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। রাজগির্ গ্রামের ৭ মাইল পূর্ব্বস্থিত গিরিয়ক পর্ব্বতের উপর জরাসন্ধ রাজার "বৈঠক" প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পুরাতত্ত্ববিৎগণ কিন্তু ইহাকে একটী বৌদ্ধ স্তূপ মনে করেন। ইহার নিকটেই একটী প্রকাণ্ড জলাশয়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। গিরিয়ক পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র গুহা আছে লোকে বলে ইহার মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ জরাসন্ধের বৈঠকের সহিত সংযুক্ত কিন্তু পুরাতত্ত্ববিৎগণ তাহাও স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলেন ইহাই ইউয়ান্ চোঙাং বর্ণিত ইন্দ্রশিলাগুহা যেখানে বৌদ্ধ মতে শাক্যসিংহ ইন্দ্রদেবের ৪২টী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বাস্তবিক জরাসন্ধের আমলের গিরিব্রজপুরের কি অবস্থা ছিল তাহা ঠিক করা প্রত্নতত্ত্ববিতের গবেষণার পক্ষেও অসম্ভব। বৌদ্ধ ও প্রাচীন জৈনদিগের সময়ে কোথায় কি ছিল তাহা লইয়াই বিস্তর মতভেদ। বুদ্ধদেব ও মহাবীরের পদরেণুতে যে ইহার অনেক শৈলই পবিত্র হইয়াছিল, অনেক সাধু পুরুষ যে এই সকল শৈলের গুহায় এক সময়ে মোক্ষের পন্থা চিন্তা করিতেন, অনেক বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারাম যে এখানে জ্ঞান বিতরণ করিত তাহা পালি সাহিত্যে সুপরিচিত। এইখানেই সিদ্ধার্থ বৈশালী হইতে আসিয়া মুক্তিপথ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন ও শেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া বুদ্ধগয়ার দিকে চলিয়া যান। এইখানেই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে নানা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনার মধ্যে নানা মহাপুরুষের আবির্ভাব। গোলযোগ প্রাচীন স্থান গুলির অবস্থান লইয়া। সেকালকার বর্ণিত ব্যাপার গুলির সহিত একালকার স্থানগুলি মিলাইয়া দেখার যতদূর চেষ্টা হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না। বৈভার গিরিতে তাঁহার ধ্যানের স্থান পিপ্পল গুহার অবস্থান লইয়া কত তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে, তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর যে সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশনে ধর্ম্মনীতি স্থিরীকৃত হয় তাহারও অবস্থান সন্তোষজনকরূপে নির্ণীত হয় নাই। যে পাণ্ডা মহাশয়েরা রাজগৃহে কর্ণধার তাঁহারা সাধারণতঃ এ সকল স্থান দর্শনযোগ্য মনে করেন না। যেখানে এক সময়ে ছত্রধারী নৃপতি ভিক্ষুর পদে প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন, সেস্থান বনজঙ্গলে পূর্ণ ও সাধারণ যাত্রীর অগম্য। ক্রমে স্থানীয় লোকের নিকট তাহার স্মৃতিও বিলুপ্ত হইতেছে। ইউয়ান্ চোয়াঙের পুস্তকে কত বিহার, কত স্তূপ, কত গুহা, কত সুরম্য গৃহের বর্ণনা পাঠ করা যায়। কে জঙ্গলে তাহার খোঁজ করে? পুরাতত্ত্ববিতের প্রচুর কার্য্য এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ কীর্ত্তি বেশী থাকিলেও এখন এখানে হিন্দু ও জৈন তীর্থযাত্রীর সংখ্যাই বেশী। বর্ত্তমান রাজগিরে সুন্দর সুন্দর জৈন মন্দির সকল উঠিতেছে, শৈল গাত্রে স্তরে স্তরে জৈন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এক সময়ে এখানে জৈনকীর্ত্তি ছিল সন্দেহ নাই। তাহা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু আবার বর্ত্তমান ধনকুবেরদিগের চেষ্টায় রাজগৃহ প্রধানতঃ জৈন তীর্থ-স্থানে

পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ-প্রভাবও নষ্ট হয় নাই। পাণ্ডারা ব্রাহ্মণ—হিন্দু, তাহারা আইন আদালতের সাহায্যে নিজেদের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে জানে। পাহাড়ের উপর এত যে জৈন মন্দির, সেখান হইতেও হিন্দু পাণ্ডা বিতাড়িত হয় নাই। বৈভার গিরিতে পাঁচটী সুদৃশ্য জৈন মন্দিরে মূর্ত্তি জৈন মহাপুরুষদিগের, কিন্তু পুরোহিত ব্রাহ্মণ। এই গিরির উপরিস্থ ভূগর্ব্ভোত্থিত প্রাচীন ভগ্ন শিব-মন্দির এখন উপেক্ষিত, কিন্তু জৈন মন্দির হইতেই পাণ্ডাদের উপার্জ্জন চলে। একজন পুরোহিতকে জৈন দেবতার পূজার মন্ত্র জিজ্ঞাসা করায় নিতান্ত লজ্জিতভাবে মন্ত্র আবৃত্তি করিল—উদরের তাড়নায় জৈনের নিকট হইতেই পূজার মন্ত্র শিখিতে হইয়াছে। ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়া গিয়াছেন মহারাজ অশোক রাজগৃহ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া গিয়াছিলেন, ইউয়ান্ চোয়াঙের সময় ১০০০ ঘর ব্রাহ্মণ মাত্র রাজগৃহের অধিবাসী ছিল। এখনও রাজগৃহ ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান—এত পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও সে প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই।

ইউয়ান্ চোয়াঙ্ যখন রাজগৃহে আসেন তখন রাজগৃহ ধ্বংসের মুখে থাকিলেও বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। অনতিদূরস্থিত নালান্দায় তখন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ প্রভাবযুক্ত, সুতরাং রাজগৃহ সেই পতনাবস্থায়ও যে বৌদ্ধ দর্শকের ভক্তি ও মনোযোগ অতিক্রম করিত না তাহা কল্পনার নেত্রেও দেখিতে পারা যায়। এখন কিন্তু যে বৌদ্ধের কীর্ত্তি-কলাপে রাজগৃহ এত গৌরবান্বিত, সেই বৌদ্ধেরই স্থান এখানে সকলের চেয়ে কম। তাহা না হইলে হয়ত স্থানটীর মহিমা লোকের সম্মুখে আরও বেশী রকম জাগিয়া উঠিত। সারিপুত্রের অর্হৎ হইবার স্থান, শ্রীগুপ্তের স্তূপ, জীবন গুপ্ত নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের বক্তৃতা-গৃহ, পিপ্পল গুহা, অসুরের গুহা, করণ্ড বেণুবন, আনন্দের দেহাবশেষ রক্ষার স্থান, কশ্যপের আহুত মহাসভার স্থান, বুদ্ধদেবের জীবনীর সহিত সংসৃষ্ট কত শিলা, কত বিহার, স্তূপ ও স্তম্ভের ভিত্তি আবিষ্কারের চেষ্টা হইত। পাণ্ডাদিগের 'রাজগিরি মাহাত্ম্য' বায়ুপুরাণের অন্তর্গত বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উহা বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। অনেক বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি ও মন্দির হিন্দুদেবদেবীরা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বৌদ্ধেরাও কিন্তু এতদিনে জাগরিত হইতেছে। ব্রহ্মদেশবাসী জনৈক বৌদ্ধ সাধুর উদ্যোগে ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইতেছে। ধর্ম্মশালা হইলেই ভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে বৌদ্ধযাত্রী রাজগৃহ দর্শনের সুযোগ পাইবে। দেখিলাম ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা ইতিমধ্যেই একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছে, পাছে আবার মোকদ্দমা বাধে। মোকদ্দমা বাধুক আর নাই বাধুক বৌদ্ধযাত্রীর সমাগমে যে তাহাদের পুণ্য স্থানগুলির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইবে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহাদের সহযোগিতায় প্রত্নতত্ত্ববিতের কার্য্যও বোধ হয় অনেকটা সহজ হইয়া পড়িবে।

রাজগৃহে তিন বৎসর অন্তর একটী মেলা বসে। এই সময়ে বহুযাত্রীর সমাগমে পুরাতন রাজগৃহের পরিত্যক্ত ভূমি আবার মুখর হইয়া উঠে। পাণ্ডাদিগের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। মুসলমান জমিদারকে কিছু কর দিতে হয়, তাহা মামলা মোকদ্দমার পর ঠিক হইয়াছে। আর সকল উপস্বত্বই পাণ্ডাদিগের। যাত্রীদিগের কল্যাণে, পাণ্ডাদের অবস্থা অসচ্ছল নহে—অনেকের পাকা বাড়ী।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

উত্তর ইতালি

(১৩)

পোষ্ট আফিসে, রেলষ্টেশনে, ও অন্যান্য বাড়ীতে দেওয়ালে দেওয়ালে "ফাসিষ্ট"দের ইস্তাহার দেখিতেছি। এপ্রিল মাসে (১৯২৪) পার্ল্যামেণ্টের সভ্য বাছাই উপলক্ষ্যে জনগণের নিকট ফাসিষ্টরা এই সকল মোসাবিদা পাঠাইয়াছিল।



মেলিদের পুল (লুগানো হ্রদ)

মোসাবিদাটা দুইচারদশটা ফরাসী-ঘেঁশা শব্দের সাহায্যে কথঞ্চিৎ বুঝিয়া লইতেছি। ফাসিষ্টরা বলিতেছেন :— "১৯১৯-২০ সালে, মহালড়াই থামিবার পর ইতালিতে চূড়ান্ত অনিয়ম, শৃঙ্খলহীনতা, অপব্যয় চলিতেছিল। দেশের ভিতর বিরাজ করিতেছিল অশান্তি ও উপদ্রব। আর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইতালির কোনো ইজ্জদ ছিল না। সেই সব দুর্গতি হইতে ইতালিকে রক্ষা করিয়াছে ফাসিষ্টদল এবং ফাসিষ্ট গবর্ণমেণ্ট। অতএব হে পুরবাসী, তোমরা সকলে ফাসিষ্টদের সপক্ষে ভোট দিও। সোস্যলিষ্টরা পার্লামেণ্টে কর্ত্তা হইলে দেশে রুশিয়ার দুরবস্থা আসিয়া জুটিবে।"

মিলানের জনগণ কিন্তু "ফাসি" (সমিতি) পন্থী অর্থাৎ "সমিতিওয়ালা" ন্যাশন্যালিষ্টদের কথায় মজে নাই। এই শহরে মজুর দলের প্রভাব খুব বেশী। সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট বা ঐ ধরণের অন্যান্য নেতারা ন্যাশন্যালিষ্টদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার রাস্তায় বিক্রি হয় বেশী "আহ্বান্তি" কাগজ। ইহা দৈনিক মজুরপন্থীদের মুখপত্র।

অধিকন্তু এখানকার "কোরিয়েরে দেল্লা সেরা" ফাসিষ্টদের যথেচ্ছাচার সমূলে উৎপাটন করিতে ব্রতবদ্ধ। ইতালির বাহিরে যে সকল ইতালিয়ান কাগজ প্রসিদ্ধ তাহার ভিতর "কোরিয়েরে" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কাগজ ডেমোক্রাটিক্ লিবারল বা উদারপন্থী দলের পৃষ্ঠপোষক। বার্লিনের "টাগেব্লাট", ফ্রাঙ্কফর্টের "ৎসাইটুঙ্", ম্যাঞ্চেষ্টারের "গার্ডিয়েন" ইত্যাদি দৈনিক "কোরিয়েরে"র সমশ্রেণীভুক্ত।

(১৪)

এক পরিবারে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়ীর কর্ত্তা এক ব্যবসায়-সঙ্ঘের ডিরেক্টর। সঙ্ঘের অধীনে ইতালির নানা স্থানে আট দশটা ধাতুর কারখানা চলিতেছে। সকলগুলায় মজুর খাটে পাঁচ হাজার।

ইতালির বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বসমেত ২৩টা পাটের কল আছে। বলা বাহুল্য পাট আসে বাংলা দেশ হইতে। ডিরেক্টর মহাশয় বলিতেছেন, "শুনিয়াছি এই পাট আমরা ভারতীয় সওদাগরদের মারফৎ পাই না। পাই বিলাতী ব্যাপারীদের মারফৎ।"

ভারতের সঙ্গে ইতালির আমদানি, রপ্তানি সোজাসুজি চলিতে পারে কি? ডিরেক্টর বলিতেছেন:—"ইতালির কলওয়ালারা ভারতীয় ব্যাপারীদের কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে সুমত পোষণ করে না। দু'এক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতে সোজাসুজি ইতালিতে পাট আমদানি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়েরা নমুনা মাফিক মাল জোগাইয়া উঠিতে পারে নাই।"

(১৫)

আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে সর্ব্বত্রই ভারতীয় ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে ঠিক্ এই নালিশই শুনা যায়। এই নালিশের ভিতর আগাগোড়া ইয়োরামেরিকানদের ভারতীয় বিদ্বেষ দেখিতে চেষ্টা করিলে ভুল বুঝা হইবে। সাদা চামড়াওয়ালা লোকেরা এশিয়ানদের সঙ্গে সমানে সমানে ব্যবসাক্ষেত্রেও লেনদেন চালাইতে ইতস্ততঃ করে। একথা সত্য। কিন্তু আমরা অনেক সময়েই কথা ঠিক্ বলিতে পারি না। আমাদের সঙ্গে কারবার করিতে আসিয়া অনেককেই নাকাল হইতে হয়। একথাও পুরাপুরি মিথ্যা নয়।

কি পাট, কি তুলা, কি চামড়া, কি তেলের বিচি, কি ধাতু,—সকল প্রকার কুদরতি মালের ভারতীয় ব্যাপারীরা নিজ নিজ "কোটে" সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে ইয়োরামেরিকার বাজারে ভারতীয় কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। তখন ইতালিয়ানরা ইংরেজের দোহাই না দিয়া ভারতীয় দালালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে বাধ্য হইবে।

(১৬)

মিলানে পাটের কল নাই। কিন্তু লম্বার্দি প্রদেশে এবং ভেনেৎসিয়া প্রদেশে,—অর্থাৎ উত্তর ইতালির মধ্য ও পূর্ব্ব জেলাগুলায় সাতটা কলে পাটের কাজ চলে। কলগুলাকে বলে "জুতিফিসিও।" এই গুলায় মোটের উপর প্রায় ১২০০ তাঁত খাটে।

কলওয়ালারা মিলানের ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার চালাইতে অভ্যস্ত। জার্ম্মাণির মতন ইতালির ব্যাঙ্কগুলায়ও ব্যাপারীরা আমদানি রপ্তানির কাজে অনেক সাহায্য পায়। ভারতে আমদানি

রপ্তানির জন্য ভারতসন্তানের তাঁবে কোনো ব্যাঙ্ক নাই। এই কারণেও বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতবাসীকে বিদেশীরা বিশ্বাস করে না।

শহরের আশেপাশে ফ্যাক্টরির সংখ্যা অনেক। কিন্তু ধোঁআর আধিপত্য দেখিতেছি না। রাস্তাঘাটে এক টুকরা কাগজ বা কোনো প্রকার ময়লা চোখে পড়ে না। কিন্তু ধূলার দৌরাত্ম্য খুব বেশী। ঠিক্ যেন বিহারের কোনো শহরে ধূলা খাইতেছি।

(১৭)

শড়ককে ইতালিয়ানে বলে "হ্বিয়া"। মহাকবি দান্তের নামে যে রাস্তাটা পরিচিত তাহা লণ্ডন প্যারিসের কোনো কোনো চরম ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ শড়কের কথাই মনে করাইয়া দেয়।



"হ্বিয়া মার্কো"র খাল

ভারতে কালিদাসের নামে, বরাহমিহিরের নামে অথবা বিদ্যাপতির নামে কোনো সড়ক বা গলি আছে কি? অথবা পাণিনি চৌরাস্তা, আর্য্যভট্ট ময়দান, চরক কুঞ্জ ইত্যাদি ধরণের কোনো কিছু দেখা যায় কি?

মিলানের কোথাও দেখিতেছি পিয়াৎসা হ্বির্জিলিয়ো। কখনো বা হাঁটিতেছি হ্বিয়া বোকাচিয়োয়। রাষ্ট্রবীর মাকেয়াহ্বেল্লি, মাৎসিনি ও গারিবাল্দি, চিত্রশিল্পি রাফায়েল, কবিবর মানৎসোনি, সঙ্গীতগুরু প্যালেস্ত্রিণা ইত্যাদির নামেও হয় "হ্বিয়া" না হয় "পিয়াৎসা" মিলানবাসীর নিকট গোটা ইতালির অতীত কীর্ত্তি সর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়াছে।

শড়কে শড়কে যতগুলা প্রস্তর বা পিত্তল মূর্ত্তি দেখিতেছি প্যারিস ছাড়া আর কোনো শহরে এতগুলা এক সঙ্গে দেখি নাই। বার্লিন, নিউইয়র্ক ইত্যাদি শহর মিলানের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

"স্কালা" থিয়েটারের সম্মুখে লেওনার্দো দাহ্বিঞ্চি শিষ্যসহকারে দণ্ডায়মান। মর্ম্মরমূর্ত্তি। চিত্রকর, স্থপতি এবং বাস্তুশিল্পী এই তিন শ্রেণীর লোকই দাহ্বিঞ্চিকে বর্ত্তমান জগতের প্রবর্ত্তকরূপে পূজা করিয়া থাকে। দাহ্বিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর লোক।

(১৮)

"হ্বিয়া দান্তে" দিয়া "কাস্তেল্লো"বা দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে এক পিয়াৎসায় দেখা যায় অশ্বপৃষ্ঠে গারিবাল্‌দি। সেনাপতি গারিবাল্‌দির সাঙ্গোপাঙ্গ যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মূর্ত্তিও শহরের এখানে ওখানে দেখিতেছি।

সার্ব্বজনিক বাগিচার সম্মুখে প্রবেশপথে রাষ্ট্রবীর কাহ্বুর খাড়া আছেন। সেই দুর্গের আর এক বীর রাজা হ্বিক্তার এমানুয়েল "দুয়োমা পিয়াৎসা"র ঐশ্বর্য্য বাড়াইতেছে। এমানুয়েল ছিলেন পিদ্‌মন্ত্‌ প্রদেশের নবাব বা জমিদার।



রাষ্ট্রবীর কাহ্বুর

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লম্বার্জি এবং হ্বেনেৎসিয়া দুই প্রদেশই ছিল অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের জেলা। রাষ্ট্রবীর কাহ্বুর এবং সেনাপতি গারিবাল্‌দি এই দুই কর্ম্মবীরের প্ররোচনায় পিদ্‌মন্তের জমিদার ঐক্যবদ্ধ ইতালি গড়িয়া তুলিতে উৎসাহী হন। কাহ্বুর ফরাসী নরপতি তৃতীয় নেপোলিয়নকে ভজাইয়া এমানুয়েলের সপক্ষে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়াছিলেন। সে ১৮৫৯-৬০ সালের ঘটনা। তখনকার দিনে ভাবুকবীর মাৎসিনি ছিলেন যুবক ইতালির যীশুখৃষ্ট।

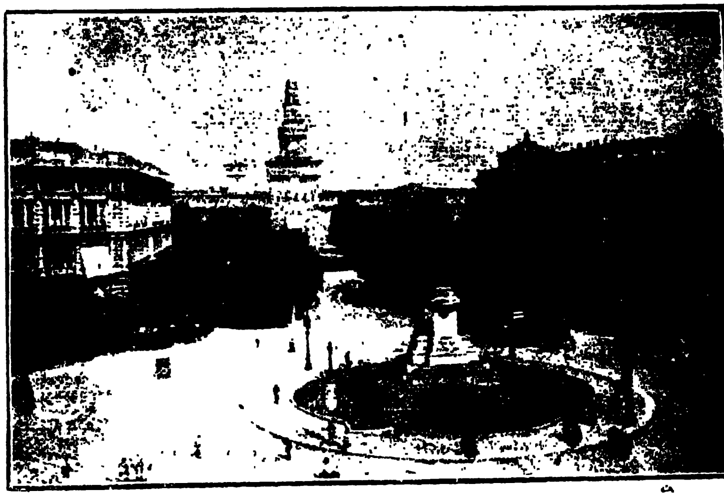


বিপ্লবস্তম্ভ (অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মিলানবাসীরা ১৮৪৮ সালে একবার বিদ্রোহী হইয়াছিল। বিদ্রোহ টিকিয়াছিল মাত্র পাঁচ দিন (১৮-২২ মার্চ্চ)। সেই বিদ্রোহের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই স্তম্ভটি।)

মাৎসিনির কোনো মূর্ত্তি দেখিতেছি না। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের নাম ইতালির স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর। স্থপতি বাৎসাগি প্রণীত মূর্ত্তি এক সরকারী সৌধের আঙিনায় বিরাজ করিতেছে।

(১৯)

"কাস্তেল্লো" টা পঞ্চদশ শতাব্দীর এক বিপুল সৌধ। সে যুগের নবাব বা জমিদার স্ফোৎর্সা মিলানের এবং লম্বার্দি প্রদেশের এক বিক্রমাদিত্য।



"কাস্তেল্লো" পাড়ায়

দুর্গটা বাহির হইতে জাঁকালো দেখায়। অধিকন্তু ঘোড়ার জুতার আকারে তরুবীথি ও সৌধশ্রেণী কাস্তেল্লোর সম্মুখ ভাগকে গৌরবে ভরিয়া রাখিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অট্টালিকাটা আজকাল নাই। বৎসর ত্রিশেক হইল কাস্তেল্লো মধ্যযুগের রীতিতেই পুনরায় নতুন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বাস্তুশিল্পী বেল্‌ত্রামির হাতে ছিল পুনর্গঠনেরভার।

নানা পাড়ায় পায়চারি করা যাইতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি রাস্তার নরনারী অতি ফিটফাট্ পোষাক পরিয়া চলা ফেরা করিতেছে। আর্থিক জীবনে কোনো ইতালিয়ানের অভাব আছে মিলানে এরূপ বোধ হইবে না।

শহরটা আগাগোড়া নতুন বোধ হইতেছে। সবই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের সৃষ্টি। অতীতের চাপ মিলানে বিরল। নবীন ইতালির জীবন-কেন্দ্র মিলানের "ইটকাঠে" যেরূপ পাইতেছি ইতালির অন্য কোনো শহরে সেরূপ পাইব কিনা সন্দেহ।

কেওরাতলা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এক বিশাল প্রান্তর হাজার হাজার সুরম্য স্মৃতি-স্তম্ভের বা সমাধিমন্দিরে পরিপূর্ণ। বাস্তু ও স্থাপত্যের বাগান হিসাবে মিলানের "চিমিতেরো" জগতে অদ্বিতীয়। ভারতবাসী,—বিশেষতঃ হিন্দুরা,—গোরস্থানের মর্য্যাদা বুঝে না। কিন্তু যে সকল নরনারী কবরভূমির সঙ্গে আত্মিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি মাখাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত তাহারা এই অপার্ব্ব



"চিমিতেরো" (কেওরাতলা)

কেওরাতলার আবহাওয়ায় প্রাণ ঠাণ্ডা করিতে সমর্থ হইবে। সুকুমার শিল্পে ইতালিয়ানরা কত বড় জাত তাহা এই "চিমিতেরো"র মূর্ত্তি, সৌধ, স্তম্ভ, মন্দির ও খিলান রচনা দেখিলেই মালুম হইবে।

(২০)

মিলানকে ইতালিয়ানরা জানে "মিলানো" বলিয়া। ফরাসী নাম "মিলঁা", জার্ম্মাণদের ভাষায় এই নগর "মাইলান্ড্"। ভারতবাসী ইংরেজের দেওয়া নাম ও উচ্চারণ মুখস্থ করিয়া আসিতেছে।

ইতালি দেশটারই বা খাঁটি স্বদেশী নাম কি? "ইতালিয়া।" ফরাসী নাম "ইতালী", জার্ম্মাণ নাম "ইটালিয়েন", ইংরেজি নাম অবশ্য "ইটালি"।

ফ্লোরেন্স্ ইতালির এক বিখ্যাত শহর। কিন্তু ইহার আসল ইতালিয়ান নাম আমরা কখনো শুনি নাই। "ফ্লোরেন্স" বলিলে কোনো ইতালিয়ান বুঝে না। তাহাদের দেওয়া নাম "ফিরেন্‌ৎসে"। জার্ম্মাণ নাম "ফ্লোরেন্‌ৎস্", ফরাসী নাম "ফ্লোরাঁস্"।

সেইরূপ জেনোআর ইতালিয়ান নাম "জেনোহ্বা"। জার্ম্মাণরা এই শহরকে জানে "গেনুয়া" বলিয়া। ফরাসী নাম "জেন্"।

(২১)

সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে,—দেশের লোকেরা নিজ নিজ পল্লী শহরকে যে নামে ডাকে বিদেশীরা ঠিক সেই নামে জানেনা। বিভিন্ন ভাষায় একই জনপদ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

ভারতসন্তান ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, রুশিয়া ইত্যাদি দেশের পল্লী শহরগুলাকে কোন্ নামে জানিবে? ভারতীয় জ্ঞানমণ্ডলে এই প্রশ্নটা আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইংরেজ ভূগোল-লেখকেরা যে নামগুলা প্রচার করিয়াছে আমরা তাহার হুবহু নকল চালাইতেছি। ভারতীয় ভাষার "ধাতের" সঙ্গে মিলাইয়া বিদেশী নাম ও উচ্চারণকে স্বদেশী আকার দিবার চেষ্টা কেহ কখনো করিয়াছেন কি?

যাহা হউক, আজকালকার স্বরাজ আন্দোলনের যুগে ভৌগোলিক নাম সম্বন্ধে ইংরেজের গোলামি করা যুবক ভারতের পক্ষে আর সহনীয় নয়। এইদিকে সংস্কার সুরু হওয়া আবশ্যক।

আমি যখন যেখানে গিয়াছি তখন সেখানকার খাঁটি স্বদেশী নাম ও উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই সকল স্বদেশী নাম এবং উচ্চারণ ভারতীয় ভাষার সঙ্গে খাপ খাইবে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখি নাই।

(২২)

এক্ষণে ভারতের নানা কেন্দ্রে "ভৌগোলিক পরিভাষা সমিতি" কায়েম করা আবশ্যক।

ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ, স্পেনিষ ইত্যাদি ভাষায় অভিজ্ঞ লোকেরা এই সমিতির উদ্‌যোক্তা হইবেন। যাঁহারা ইয়োরামেরিকার নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সহকারিতা আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য এশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি মহাদেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে এবং চীনা, জাপানী, ফার্সী, আরবী ইত্যাদি ভাষায় যাঁহাদের দখল আছে তাঁহাদের সাহায্যও চাই।

এই সকল শ্রেণীর লোকের সাহায্য লইয়া "ভাষাতত্বজ্ঞ" পণ্ডিতেরা কাজে ব্রতী হইলে বিশ পঁচিশ বৎসরের ভিতর ভারতীয় ভূগোল সাহিত্যের রূপ বদলাইয়া যাইবে বিশ্বাস করি। ইস্কুল কলেজে যাঁহারা ভূগোল শিখাইয়া থাকেন এবং ইস্কুল পাঠ্য ভূগোল কেতাব রচনা করা যাঁহাদের ব্যবসা তাঁহারাও এই "ভৌগোলিক পরিভাষা সমিতির" কাজে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে ভূগোল সাহিত্যে সংস্কার সহজ-সাধ্য হইবে না।

(২৩)

"পাংসিয়োনে"র সহভোজীদের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষিত ইতালিয় যুবার সঙ্গে সাহিত্যালাপ হইল। যুবা বলিতেছেন:—"দান্নুন্‌ৎসিয়ো বড় কবি বটে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে নাক গুঁজিতে গিয়া ইনি ইজ্জদ হারাইতেছেন। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে কাব্যশিল্পের বনিবনাও হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।"

যুবার মতে দান্নুন্‌ৎসিয়োর গীতিকাব্য গুলা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার উপন্যাস এবং নাটকগুলাও সমসাময়িক ইতালিয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে দান্নুন্‌ৎসিয়োর যশ বেশী দিন টিকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইঁহার আসল ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে গান রচনায়।

লিরিকাল কবিত্বশক্তির আসরে দান্নুন্‌ৎসিয়োর সমান কোনো লেখক নাকি আজকাল ইতালিতে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কার্দুচি ছিলেন ইতালিয় গীতিকাব্যের নং ১। কার্দুচি মাৎসিনি-গারিবাল্‌দির সময়কার কবি।

ইতালিয়ান স্বাধীনতা ও ঐক্য গঠনের যুগকে "রিসোর্জিমেন্তো" বলে। সেই যুগের ইতিহাস-কথা লইয়া কোনো কোনো কবি নাটক রচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভুমিয়াতি সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। ইঁহার এক নাটকে কাহ্বুরের ধড়িবাজি ও রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্রের তারিফ আছে। ছলে বলে কৌশলে কাহ্বুর ফ্রান্সকে পিদমন্তের পক্ষ লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মাৎসিনি যে ইতালির দার্শনিক, গারিবাল্‌দি যে ইতালির কর্ম্মবীর, কাহ্বুর ছিলেন সেই ইতালির কৌটিল্য।

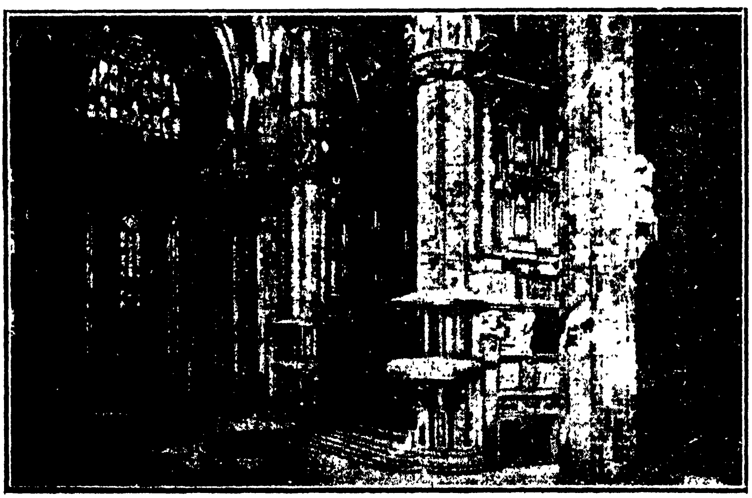
কিন্তু ভুমিয়াতির "হল তেস্‌সিতোরে" সম্বন্ধে যুবা বলিতেছেন:—"নাটকটা ইতিহাসও বটে রাষ্ট্রনীতিও বটে। তবে রচনাটা নাট্যশিল্পের তরফ হইতে নগণ্য। স্বদেশী আন্দোলনের একটা দলিল রচনা করিয়া ভুমিয়াতি যুবক ইতালিকে মাতাইতে পারিয়াছেন এই পর্য্যন্ত।

(২৪)

"দুয়োমোর" পেছন দিককার দেওয়ালে রঙিন কাচের সাহায্যে যীশুলীলা বিবৃত করা হইয়াছে। চিত্রিত কাচের সুকুমার শিল্প ভারতে কখনো বিকাশ লাভ করে নাই। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় গির্জ্জায় এই কাচ-শিল্প এক বিশেষত্ব।

এই ধরণের কাচশিল্প বর্ত্তমান ইয়োরোপের সৌধেও দেখিতে পাওয়া যায়। জার্ম্মাণির বড় বড় প্রাসাদতুল্য সার্ব্বজনিক ভবনগুলার দেওয়ালে গির্জ্জাসুলভ অলঙ্কারের রেওয়াজ আছে। তবে গির্জ্জার কাচে দেখা যায় বাইবেলের গল্প। আর "রাট্‌হাউস," আদালত, কোতোয়ালী, পৌরভল ইত্যাদিতে "সাংসারিক" জীবনের চিত্রই কাচশিল্পে ঠাঁই পাইয়া থাকে।

মিলানের ক্যাথিড্রালটা যত বার দেখিতেছি ততবারই মনে হইতেছে ইহার ভিতর কি একটা যেন পাইতেছিনা। প্যারিসের "নোতর দাম" "গথিক" বাস্তুর অতি সুপরিচিত নিদর্শন। তাহার সঙ্গে মিলানের দুয়োমোটা তুলনা করা স্বাভাবিক। এটা হয় ত প্যারিসের গির্জ্জার সমান পুরাণা নয়। ইহার নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছিল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। কিন্তু গড়ন হিসাবে মিলানের মন্দির প্যারিসের মন্দিরকে কাণা করিয়া দিবে। অথচ দুনিয়ায় আজ পর্য্যন্ত লোকেরা মিলানের "দুয়োমোকে" বড় বেশী জানে না।



দুয়োমোর ভিতরকার দৃশ্য

বস্তুতঃ রাইণল্যাণ্ডে অবস্থিত ক্যোলনের (কোলোনের) "ডোম"ও গঠন-গরিমায় প্যারিসের "নোতর দাম" এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া অষ্ট্রিয়ার হ্বিয়েনা নগরে যে "ষ্টেফান্‌স্ ডোম" দেখিয়াছি তাহার নিকটও প্যারিসের মন্দির দাঁড়াইতে পারে না।

এই তিনটাই মামুলি পাথরের গথিক বাস্তু। মিলানে আগাগোড়া মর্ম্মর। শুনিতেছি এখানকার দুয়োমোর চূড়ায় চূড়ায় ২০০০টা মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল বিশেষত্ব সত্ত্বেও "দুয়োমো" দেখিয়া পেট ভরিতেছে না কেন ?

ক্যোলন্ আর হ্বিয়েনার মন্দির দুইটা বাহির হইতে পাহাড়ের মতন দেখায়। আর এই দুইটারই

চূড়া, আকাশ ফুঁড়িয়া শূন্যে উঠিয়াছে। কিন্তু মিলানে না পাইতেছি সেই বিপুলতা আর না দেখিতেছি অভ্রভেদী শিখর বা শিখরশ্রেণী।

ধরা যাউক যেন কোনো মানুষের সৌন্দর্য্য রঙে, রূপে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার নাকটা বোঁচা। তাহা হইলে মানুষের যে দুর্গতি ঘটে মিলানের এই মর্ম্মর মন্দিরে সেই অভাবই চোখে পড়িতেছে। ইহার ছাদ নেহাৎ নীচু বা বসা। এক কথায় ইহার শিখর বা চূড়া নাই। বাহিরের শিখরগুলার জঙ্গলে প্রধান বাস্তুটা ঢাকা পড়িয়াছে।

(২৫)

প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে যে সকল লোক ধর্ম্মভেদ, আধ্যাত্মিক ভেদ, আদর্শভেদ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারা গথিক গির্জ্জায় একবার "মেস্‌সে" বা "মাস" পাঠের পদ্ধতিটা দেখিলে নিজেদের ভুল নিজেই ধরিতে পারিবেন। মোমবাতীর আলো, পূজারিদের শোভাযাত্রা, খৃষ্টদেবের "রক্তমাংসের" সঙ্গে "সামীপ্য" বা "সাযুজ্য", "সামগান" আর জানু পাতিয়া উপাসনা এই সব দেখিবামাত্র নিরক্ষর হিন্দুনারীও বুঝিবে যে বোধ হয় তাহার নিজ হৃদয়ের কথাই কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতবর্ষকে যাঁহারা "একঘরে" করিয়া রাখিতে প্রয়াসী তাঁহারা ভারতের হিতৈষী ত ননই, বিজ্ঞানের রাজ্যেও তাঁহারা ভ্রান্ত। ইয়োরোপীয় জীবনের সু-কু গুলা ভারতসন্তানেরা নিজ চোখে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যোগাযোগ গুলা গভীরভাবে ধরা পড়িবে। চিত্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার আলোচনায় কেতাবের গোলামী ছাড়িয়া স্বাধীন অনুসন্ধানের দিকে নজর দিবার দিন আসিয়াছে।

(২৬)

ইতালিতে কয়লার খনিও নাই, লোহার খনিও নাই। অথচ ইস্পাতের কারখানা ইতালিয়ানেরা গড়িয়া তুলিয়াছে। বিলাত ও আমেরিকা এবং ফ্রান্স হইতে কুদরত্তি মাল আমদানি করা হয়। সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ইস্পাতের কারখানার নাম "আন্‌সাল্‌দো"। এই কোম্পানীর বড় আফিস জেনোভায়! কিন্তু মিলানেও এক আড্ডা দেখিলাম।

লড়াইয়ের সময় ইতালিয়নেরা লোহালক্কড়ের কারবার ফুলাইয়া তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। লড়াই থামিবার পর কারখানাগুলা দমিয়া গিয়াছে। "আন্‌সালদো" মাথা খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু লোক্‌সান দিতে হইয়াছে বিস্তর। এই লোকসানের হিড়িকেই বৎসর দু'এক হইলে "বাঙ্কা ইতালিয়নো দি স্কোন্তো" ফেল মারিয়াছে।

কয়লার অভাবে তড়িতের ব্যবহার করা আজকাল দুনিয়ার সর্ব্বত্রই দেখা দিয়াছে। উত্তর ইতালির জলের স্রোতকে কাজে লাগাইয়া তড়িৎ তৈয়ারি করার দিকে ইতালিয়ান শিল্প-পতিদের ঝোঁক। তড়িতের সাহায্যে যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার কারখানা গড়িয়া তোলা

হইতেছে। একজন জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন :—"লোহালক্কড়ের কারবারে ইতালিয়ানেরা কচি শিশু মাত্র।"

তথাপি "ফিয়াৎ" কোম্পানীর অটোমোবিল দুনিয়ার বাজারে ইতালির নাম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মিলানে ইতালিয় গাড়িব্যবসার ধূমধাম কথঞ্চিৎ পাইতেছি। আসল কেন্দ্র পিদমোন্তের তোরিণো সহর।

(২৭)

কিন্তু এই অঞ্চলের বড় কারবার বলিলে রেশমের কারখানা বুঝিতে হইবে। পাংসিয়োনের কর্ত্রী বলিতেছেন :—"মিলানোয় কমসেকম ২০০ রেশমের কুঠি আছে।"

তুলা ও লিলেনের কাপড়চোপড় মিলানে তৈয়ারি হয় বিস্তর। অর্থাৎ লম্বার্দি জেলার মজুরেরা প্রধানতঃ তাঁতী ও জোলা। এই জন্যই মিলানকে ভারতীয় আহমদাবাদ বলা চলে।

শহরটা চোপর দিনরাত অটোমোবিলের চলাফেরায় সন্ত্রস্ত দেখিতেছি। আমদানিরপ্তানির কোলাহল,—অন্ততঃপক্ষে লোকজনের গতিবিধি দেখিয়া আর্থিক জীবনের স্রোত আন্দাজ করা সম্ভব।

খানাঘরে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম,—কৃষিজাত দ্রব্যের চালান হয় মিলান হইতে বিদেশে খুব বেশী। ওলিহ্ব তেল, ডিম, মাখন, পনির ইত্যাদির ব্যবসায় উত্তর ইতালির পল্লীবাসীরা লক্ষ্মী লাভ করে।



বিজয়খিলান

(২৮)

তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালিয় স্বাধীনতার ইতিহাসে (১৮৬০) অমর। স্বদেশের শত্রু নিপাত করিবার জন্য বিদেশের সাহায্য কেমন করিয়া আদায় করিতে হয় ইতালিয়ান "রিসোর্জি-মেন্তো" তাহার অন্যতম সুদৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান ইতালির ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়নের ঠাঁই খুব বড়।

প্রথম নেপালিয়নের কীর্ত্তিও মিলানোয় দেখিতেছি কয়েক স্থানে। কাস্তেল্লোর বাগিচার সীমানায় এক বিশাল খিলান বিরাজ করিতেছে। দেখিবামাত্র মনে পড়িল প্যারিসের "আর্ক দ' ত্রিয়োঁফ্" (বিজয়-খিলান)। মিলানের এই খিলান নেপোলিয়নের বিজয়কাহিনীই বিবৃত করিতেছে। বাস্তুশিল্পী ছিলেন কাগ্নোলা (১৮০৭)।

নেপোলিয়নের হুকুমে কাঞোলা আর একটা খিলান তৈয়ারি করিয়াছিলেন (১৮০২)। তাহাতে মারেঙ্গোর লড়াই খোদিত আছে। কাঞোলা নেপোলিয়নের আর এক ফরমায়েস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে দেখিতেছি ডিম্বাকৃতি বিপুল আম্ফি থিয়েটার। ইহাতে লোক বসিতে পারে ৩০,০০০।

প্রথম নিপোলিয়ন উত্তর ইতালিকে অষ্ট্রিয়ার তাঁব হইতে "স্বাধীন" করিয়া দেন। অর্থাৎ উত্তর ইতালি অষ্ট্রিয়ার গোলামি ছাড়িয়া ফ্রান্সের গোলামি করিতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রে মিলানকে প্যারিসের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নেপোলিয়ন এক বিরাট সড়ক কায়েম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮১৫ সালের ঘটনায় নেপোলিয়নের সাধ ধূলিসাৎ হয়। কিন্তু মিলানের বাস্তুগুলাই ইতালিয়ান হৃদয়ে ফরাসী বীরের নাম জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ভিক্ষা

সারাটী দিবস মাধুকরী করি
পূর্ণ ঝুলিটী হাতে
বৈরাগী যায় কুটীরের পানে
ছায়াময়ী সন্ধ্যাতে।
সহসা ক্ষুধিত কাতর নয়নে
দাঁড়াল কে তার পাশে।
পাতিয়া তাহার জীর্ণ আঁচল
কহিল শীর্ণ ভাষে,
কেগো কোথাকার মহাজন তুমি
কোন মন্দিরে যাও ?
সারাটী দিসব অনাহারী আমি
ভিক্ষার ভাগ দাও।
বৃথা ফিরিয়াছি কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গৃহীদের দ্বারে দ্বারে
দ্বারে দাঁড়ালেই বলে হাত জোড়া
চাবি দেয় ভাণ্ডারে।

বৈরাগী কহে, অপবাদ তুই
তাদের দিস্‌নে ভাই,
তাদের দানেতে আমার ঝুলিতে
তিলটুকু ঠাঁই নাই।
নীবার কণায় ঝুলি দিব ভরি
কিসের আকিঞ্চন ?
অথবা আমার কুটীরে তোদের
আজিকে নিমন্ত্রণ।
ভাবিস্ যাহারা ফিরায়েছে তোরে
তারাই করিছে দান,
মোর হাত দিয়ে পাঠাল যাহারা
গা' তাদের জয় গান।
একজন আনে ভিক্ষা মাগিয়া
দশজনে বাঁটি লয়
এই ভাবে ভাবে করুণা প্রচার
করেন করুণাময়।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

করুণাময়ীর কথা

গ্রামের রাত্রি চাঁদের আলোয় সারা গ্রাম যেন হাসিতেছে। আমার স্বামী সারাদিনের কাজ সারিয়া আহারাদির পর বারান্দায় বসিয়াছেন। প্রত্যহই বারান্দায় আমরা কাজ শেষ করিয়া বসি। আমি উঠিয়া ঘরে যাইতেছি এমন সময় দূরে আমাদের ঐ খামার বাড়ীটার মধ্য হইতে এ কিসের সুর বাজিয়া উঠিল। আমি চমকিত হইয়া বলিলাম—"একি? এ কোথায় বাজিতেছে?"

তিনি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম—"এতো বাঁশীর শব্দ—ওই আবার অন্য সুর বাজিয়া উঠিতেছে। আমাদের ঐ খামার বাড়ী হইতে শব্দ আসিতেছে।"

আমার স্বামী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটা আলো লইয়া, সেই বাড়ীর দিকে যাইতে উদ্যত হওয়ায় বলিলাম,—"না না যেওনা, তুমি জাননা ওকি!'

"হাঁ জানি না, ভাত ঠিক; কিন্তু বাজনাত আর শূন্যে বাজেনা। কেউ নিশ্চয় বাজাচ্ছে। কোনও দুষ্ট লোক বা নেশাখোর লোকের এই কর্ম্ম, আমার বাড়ীতে তাদের থাকতে দিবনা। আজ বাড়ী ফিরবার পথে একটি ভদ্র ধরণের লোক ও একটি ছোট ছেলেকে এসরাজ নিয়ে আসতে দেখেছিলুম। এ বোধ হয় তাদেরি কর্ম্ম। তাদের কিন্তু রাস্তার মোড়ে ছেড়ে এলুম, এত দূরে এল কি করে? তুমি কি চাও আমার বাড়ী যে-সে এসে থাকবে?'

"না না, তা কেন?" তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন আমিও ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলাম।

সেই গৃহের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। বাজনার সুরে যেন সারা গ্রাম পূর্ণ হইয়া গেছে। চারিদিকে যেন সেই সুর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর বাঁশীর স্বর, বাঁশীতে এমন সুর ফুটে উঠে কখনো জানিতাম না। আমাদের উভয়ের দৃষ্টি খড়ের গাদার উপর পড়িল, সেখানে একজন লোক শুইয়া আছে। চাঁদের আলো সুস্পষ্টভাবে মুখে পড়িয়াছে। আমরা যাইবা মাত্র বাঁশী থামিয়া গেল। আর গৃহের ছায়ার নিকট হইতে অতি মৃদু কণ্ঠ শ্রুত হইল!

"খুব ধীরে ধীরে আসবেন মশায়, দেখছেন না বাবা ঘুমিয়েছেন, না হলে, এখনি ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

কোথা হতে শব্দ এলো, আলো হইতে অন্ধকারে বোঝা গেল না। আমার স্বামী অগ্রসর হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কে? এখানে কি কচ্ছ?"

একটি বালক অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। প্রথম দৃষ্টিতেই সে মুখটি কি সুন্দর

লাগিল। ভাবনায় শিশুর মুখ ক্লিষ্ট দেখাইতেছে। সে আসিয়া বলিল,—"আপনি একটু ধীরে কথা বলুন। আমার বাবা শুয়েছেন, বড় ক্লান্ত হয়েছেন, আমি অমল, আমরা আজরাত্রে এখানেই থাকবো, আমরা অনেক দূরে যাব।"

তিনি বালকের কথায় আবার আলো নিয়া সেই ভূপতিত দেহের নিকট গিয়া ভালো করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"অমল কি বিমল তুমি যেই হও না কেন, তোমার কি এই বাঁশী বাজাবার সময়? আর সময় পেলে না?"

করুণকণ্ঠে বালক বলিল,—"কেন? বাবা যে আমায় বাজাতে বল্‌লেন, তিনি বল্‌লেন এই সুরের সঙ্গে তিনি নদীর গান শুনতে পাবেন, তাই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

"তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?"

"কেন মশায়, আমি যেখানে থাক্‌তাম সেখান থেকে এসেছি। ওই যে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওইখান থেকে এসেছি। সেখানে সব কেমন খোলা, আকাশ কেমন বড়, কত সুন্দর, এখানের চেয়ে ঢের ভালো।"

বালকের কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল সে বার বার সেই ভূপতিত দেহের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

আমার স্বামী আমার প্রতি স্থিরভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"একে বাড়ী নিয়ে যাও। আজ আমাদের বাড়ীতেই রাখতে হবে। আর কোনও উপায় নাই। আমায় এখনি থানায় গিয়ে চৌকিদারদের খবর দিতে হবে। এ সব কাজ ফেলে রাখ্‌লে বা অবহেলা করলে হবে না। তুমি এখান থেকে ছেলেটিকে নিয়ে যাও।"

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আবার বলিলেন,—"যেমন আছে তেমনি সব থাক, দেখছ না লোকটা মারা গেছে—"

বালক বলিয়া উঠিল "মরে গেছেন?" দুঃখের চেয়ে যেন সে আরও বিস্মিত ভাব প্রকাশ করিল, "বাবা নদীর স্রোতের মত অন্য দেশে চলে গেছেন, অনেক দূরে গেছেন?"

তিনি বলিলেন "বালক তোমার বাবার মৃত্যু হয়েছে।"

বালকের কণ্ঠস্বর যেন ভাঙ্গিয়া গেল,—"আর তাহলে ফিরে আসবেন না?".

সে শিশুর মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলাম না। বুক যেন ফাটিয়া গেল। আমার স্বামীও দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

বালক ছুটিয়া গিয়া পিতাকে জড়াইয়া বলিল,—"এই যে বাবা তুমি এখানে আছ। তোমার অমল তোমায় ডাক্‌ছে, তুমি কি কথা কইবে না?" পিতার মুখে হাত দিয়া পুনরায় বলিল,—"বাবা নেই, চলে গেছেন সেই নদীর স্রোতের মতই চলে গেছেন, সেই পাখীর মত শরীরটা রেখে গেছেন।" তার পর সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— "আমায় তিনি বাজাইতে বলেছিলেন, আমার গানের

সুরের সঙ্গে তিনি সেই স্রোতের মত, বনের মধ্য দিয়া চলে গেছেন। শোন এই সুরের সঙ্গে গেছেন”—সে তাড়াতাড়ি বাঁশিটি লইয়া তাহাতে সুর দিল। সেই নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই জনশূন্য স্থানে সেই সময় তাহা অপরূপ শুনাইল, সমস্ত শরীর যেন সেই সুরের সহিত শিহরিয়া উঠিল। আমাদের জীবন শুধু কাজ নিয়া কাটিতেছে, কখনো এমনভাবে নদীর সুরে, পাখীর সুরে সময় কাটাবার অবসর হয় নাই। আজ এই মৃত পিতার নিকট, বালকের করুণ সুরে আমি স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম। সহসা আমায় স্বামী বলিয়া উঠিলেন।

“বালক আর নয় থাম, তুমি কি পাগল হয়েছ? যাও তুমি আমাদের বাড়ী যাও,—আমি বল্‌ছি শীঘ্র যাও।” বালক বিস্মিতভাবে বাঁশীটি ও এস্‌রাজটি তুলিয়া লইল। আমি চোখের জলে অন্ধ হইয়া, তার হাত ধরিয়া নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম।

জগদীশ্বরের একি রহস্য! আজ এই বালকের মুখে যেন বিশ্বের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। আমার তৃষিত মাতৃবক্ষ যেন চঞ্চল হইয়া পড়িল। হৃদয়ের মাতৃস্নেহ যেন শত বাহু প্রসারিত করিয়া সেই ক্ষুদ্র শিশুকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আর সেই সঙ্গে কার কথা, কার মুখ, কার বাঁশীর সুর আমার মানস পটে জাগিয়া উঠিল। কে আমার ঘর শূন্য করিয়া আমায় একাকিনী ফেলিয়া, কোন দেশে কোথায় চলিয়া গেছে, একবারও আমার কথা মনে করিল না, একবারও ফিরিয়া চাহিল না, অভিমানে ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল।

সে কথা আর যেন ভাবিবারও শক্তি পাই না। তার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিবার অধিকার নাই। আমার একমাত্র সন্তান অমূল্য, পিতার সহিত মনান্তর করিয়া, নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে কোথায় গিয়াছে কিছুই জানি না। তাহাকে হারাইয়া তার স্মৃতি লইয়া বাঁচিয়া আছি। আজ একি ভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, পরের ছেলের জন্য কেন মন এমন ব্যাকুল হইল? জানিনা অদৃষ্টে আবার কি খেলা আছে। বালকের সঙ্গে বেশী কথা বলিবারও আমার সাধ্য নাই। আমার হৃদয়ের কথা ভাষায় ফুটাইবার শক্তি ভগবান কোন দিনই আমায় দেন নাই। আমি তাহাকে ঘরে আনিয়া বলিলাম,

“তুমি কি কিছু খাবে? ক্ষুধা পেয়েছে?” বালক নীরব রহিল। আমি আবার বলিলাম,—“কিছু খাবে? ক্ষুধা পেয়েছে?”

সে নীরবে মাথা নাড়িয়া সায় দিল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে যাহা ছিল আনিয়া তাহাকে দিলাম। সে আগ্রহের সহিত খাইতে আরম্ভ করিয়া, হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল, চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আবার নীরবে আহার করিল। তাহাকে খাওয়াইয়া কত তৃপ্তি পাইলাম। কতদিন—কতদিন হয়ে গেল, এঘরে কোনও শিশু প্রবেশ করে নাই, কোনও শিশুর হাসিতে ঘর ভরিয়া উঠে নাই। কাহারো চোখের আলোক প্রাণে আনন্দ দেয় নাই। আজ যেন

আমি সে আনন্দ প্রাণে অনুভব করিলাম। খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার নাম কি বাবা!"

"আমার নাম অমল!"

"অমল কি?"

"শুধু অমল আর কিছু নয়।"

তাহার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেলাম। আহা! আবার সেই দুঃখের কথা জাগিয়া উঠিবে, বালকের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে। বলিলাম,—"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

"ওই পাহাড়ের উপর ছিলাম, ওখান থেকে সব দেখা যায়। নদী কি সুন্দর দেখায়।"

"তুমি সেখানে একলা থাকতে?"

"না বাবা ছিলেন"—বালকের কণ্ঠ কম্পিত হইল।

আমার এত কষ্ট হইল, কেন বাছাকে এই প্রশ্ন করিলাম। বলিলাম,—"আমি তা বলি নাই আর কি অন্য বাড়ী ওখানে ছিল না?"

"না"

"তোমার মা ছিলেন না?"

"হাঁ বাবার জামার পকেটে থাক্‌তেন।"

"তোমার মা তোমার বাবার পকেটে? সেকি?" আমি আশ্চর্য্য হওয়ায় অমল আমার দিকে চাহিয়া বলিল—,"আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, তিনি যে পরী হয়ে দেবতাদের কাছে গেছেন। তাঁর ত আর কিছু নাই, শুধু ছবি আছে। বাবা তাই সব সময় নিজের কাছে রাখেন।"

সরল শিশু, তার কথা শুনে চোকে জল ভরে এলো, বলিলাম,—"তোমরা কি সব সময় ওই পাহাড়ে ছিলে? তোমাদের একলা কষ্ট হত না? কতদিন ছিলে?"

"বাবা বল্‌তেন ছ' বছর ছিলাম! একলা আবার কি? দু'জনে ছিলাম!

"অন্য লোকেদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ইচ্ছা হত না? অন্য বাড়ীতে যেতে তোমার মত ছোট ছেলের সঙ্গে খেলা কর্ত্তে ইচ্ছা হত না?'

"না একা আমার কষ্ট হত না, বাবা ছিলেন, বাজনা ছিল, অমন বন ছিল, নদী ছিল, পাখী ছিল, তারা সকলেই কথা বলতে পারে। তাদের সব কথা আমি বুঝিতে পারি, বাজনার সুরে তাদের কথা বলতে পারি।"

"বনের সঙ্গে কথা বলতে?"

"হাঁ কেন বল্‌বনা? নদীইত আমার পাখীটি মরে যাবার পর মরণের কথা বলে দিয়েছিল—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম "আচ্ছা আজ থাক, পরে আবার এসব কথা হবে। চল শোবে চল। তোমার সঙ্গে কি কিছু নাই ?"

" না, যা ছিল সব আমরা পথে ফেলে এসেছি। বড় ভারি ছিল তাই আর বইতে পারিনি, সঙ্গে তাই কিছু নাই।"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠলুম " বালক তুমি কি ?"

সে সরলভাবে বলিল 'বাবা বল্‌তেন আমি জীবনের মধ্যে একটি যন্ত্র! আর তিনি বলেছেন যেন আমার এই জীবন যন্ত্রের সুর ঠিক থাকে, কখনো যেন ভুল সুরে বেজে না উঠে।"

জীবনে ত কখনো এমন কথা শুনি নাই, এই টুকু শিশু এ বলে কি ? জীবন যন্ত্রের কথা সুরের কথা! আমি বলিলাম ' চল তুমি শোবে চল। ঘুমালেই তোমার ভাল হবে, একটু এখানে দাঁড়াও, আমি এখনি সব ঠিক করে এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

সেই ছোট ঘরটিতে, আমার অমূল্যের শয্যায় শয্যা রচনা করিলাম, কত দিন পরে কে জানে। তাহারি একটী পুরাতন বস্ত্র সেইখানে রাখিয়া দিলাম। এই ঘরের চারিদিক তার স্মৃতিতে ভরা। তার মাছ ধরিবার ছিপ, ছোট একটি খেলনার বন্দুক। আর তার প্রজাপতি ধরার বড় সখ ছিল, বাক্সে পিন বদ্ধ করিয়া রাখিত, সেই সব কাচের বাক্সে রাখিত, সেই সব বাক্স সাজান রহিয়াছে। চোখ দিয়া জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেকে সামলাইয়া অমলকে ডাকিয়া আনিলাম।

অমলকে গৃহের মধ্যে আনিয়া, শয্যায় শুইতে বলিয়া আমি উন্মুক্ত ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। বালক ধীরে ধীরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরের চারিদিক দেখিল। প্রজাপতির দিকে চাহিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তারপর আলো নিভাইয়া দিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইল, চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। অবশেষে আপনার বাহুলতাটি তুলিয়া লইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এখনো যেন তার সেই কান্নার স্বর শুনিতেছি, যেন শিশুর যাতনায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আহা! আমার যদি সাধ্য থাকিত তাহলে শিশুর সব দুঃখের ভার কাড়িয়া লইতাম। আমি দুর্ব্বল রমণী আমার কোন ক্ষমতা নাই। চোখের জলে সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধুকে ডাকিতেছি তিনি তোমার সহায় হোন, তিনি তোমার রক্ষা করুন। ক্রমশঃ

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা————শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

(ত্রয়োদশ গীত)

বুলা।

পরাণ ভাঙ্গিয়া গেছে, ভেঙ্গে যায় মিছে হাসি খেলা—
ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়া আসে, ফুরায়ে যায় যে বেলা।
প্রভাতে নয়ন মেলি নিরখিনু তরুণ তপন ;
অমনি আপনা ভুলে হৃদয়-দুয়ার খুলে পুলকে করিনু বরণ—
শুনিনু আশার গান, বিলাইয়া দিনু প্রাণ, সে তো হায় হলোনা আপন!
তবু ওই দূরে শুনি তা'র আবাহন বাণী, কেমনে করিগো তারে হেলা!!

স্থর————সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী।

[স্বরলিপি—————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

কানেড়া মিশ্র————ঠুংরী।

স্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১ ২´ .
II {সা সা | -ররা ' রা | রা রা | রা মজ্ঞা I া জ্ঞা
পরা ; • ণ্ ভা ঙ্গি য়া গে ছে • • ভে

| জ্ঞা -রজ্ঞমা | মা -া | জ্ঞঃ জ্ঞাঃ I জ্ঞা মা | -জ্ঞমা -জ্ঞমজ্ঞপা
ঙ্গে • • • যা য় মি ছে হা সি • •

পা পা | -া পা I ণঃ -দাঃ | -া ণা | পা -া |
খে লা • ধী রে • • ধী রে •

| -া -া I মা মা | -া মা | জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা I
• • আঁ ধা র্ না মি য়া আ সে

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা রজ্ঞরা | -মা মা | রা -সরজ্ঞা | রা সা } II
ফু রা•• • য়ে যা •র্ যে বে লা

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১ ২´
II {সা সা | রা রা | রা রা | রা মজ্ঞা I জ্ঞঃ জ্ঞাঃ |
প্র ভা তে ন য় ন মে লি• থি র

৩ ০ ১ ২´ ৩
| মঃ মাঃ | মা মা | পমা পা I ণঃ -দাঃ | -া -ণা |
খি মু ত রু ণ• ত প • • •

০ ১ ২´ ৩ ০
| -া -া | া া I র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা |
• ন্ • • অ ম নি আ প না

১ ২´ ৩ ০
| ণর্সা ণর্সর্ঋর্ঋা I র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সণর্সণা -র্সর্ঋণর্সা |
ভু• লে••• হৃ দ য় দু য়া••• •••র্

১ ২´ ৩ ০ ১
| ণা দা I া দদা | দা -ণা | পা পা | মজ্ঞা -মপা I
খু লে • পুল কে • ক রি মু• •ব

২´ ৩ ০ ১ ২´
I ণঃ -দাঃ | -া -ণা | -পা -া | া া } I {া সসা |
র • • • • ণ্ • • • শুনি

৩ ০ ১ ২´
| সরঃ -জ্ঞা জ্ঞঃ | জ্ঞা -া | জ্ঞা -া I জ্ঞজ্ঞা -রজ্ঞমপা |
মু• • আ শা র্ গা ন্ বিলা ••••

মঃ মাঃ | জ্ঞজ্ঞা -রজ্ঞরা | সা -া } I { সঃ সাঃ |
ই য়া দি মু • • • প্রা ণ্ সে তো

| ঋজ্ঞমপা -দণসর্ঋা | র্সঃ র্সাঃ | ণদা -ণণা I র্ঋা -া |
হা • • • • • • য় হ লো না• •আ প •

| -া -র্জ্ঞা | -র্সা -া | া া } I { র্সঃ র্সাঃ | ণসণর্সা -ণর্সর্ঋা |
• • • ন্ • • ত বু ও• • • • • ই

| র্ঋঃ র্ঋাঃ | র্ঋঃ র্ঋাঃ I র্সর্ঋা -র্সর্ঋর্জ্ঞর্ঋা | -র্সর্ঋর্ণা র্ণণা |
দূ রে শু নি তা• • • • • • • র্ আবা

| র্সা র্সর্জ্ঞা | র্ঋঃ র্জ্ঞাঃ } I { া ণণা | ণাঃ দঃ | দঃ দাঃ |
হ ন • বা ণী • কেম নে ক রি গো

| পা মা I জ্ঞা -মা | -জ্ঞমা -পমা | -জ্ঞা -মা | ঋা -জ্ঞা } II II
তা রে হে • • • • •

১। সুরের পরিচয় সম্বন্ধে ১ম গীতের শেষে মন্তব্য পঠিতব্য।

২। তাল সম্বন্ধে ৫ম গীতের শেষে দ্রষ্টব্য।

৩। ইহা প্রাচীন মিসরীয় সমাজ ও রীতি-নীতি-চিত্র অঙ্কিত "মিসর-কুমারী" নামক নাটকখানির শেষ গীতের স্বরলিপি।

—লেখিকা।

বৌদ্ধগান ও দোহা

আলোচনার ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কয়েক বৎসর হইল নেপাল হইতে খানকতক পুঁথি আনিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে দিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; উহার প্রথম খানার নাম চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়, দ্বিতীয়ের নাম দোহাকোষ ও তৃতীয়ের নাম ডাকার্ণব। শাস্ত্রী মহাশয় ডাকার্ণব খানির ভাষা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই ও অর্থ বুঝিতে পারেন নাই ; কাজেই ঐ বই সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি চর্য্যাপদগুলির নাম দিয়াছেন বৌদ্ধগান, আর ঐ বৌদ্ধগান ও দোহাকোষ বই দুইখানির শিরোনামের উপরে মলাটের বাহিরে লিখিয়া দিয়াছেন যে, ঐ দুইখানি বই "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায়" লিখিত। চর্য্যাপদ ও দোহা বৌদ্ধদের রচনা কি না, উহা হাজার বছরের পুরাণ কিনা, আর উহার ভাষা বাঙ্গলা কিনা, এ কয়েকটি কথাই নিপুণ বিচারে স্থির করার প্রয়োজন। আমাদের মনে হইয়াছে শাস্ত্রী মহাশয় সেইরূপ নিপুণ বিচার করেন নাই। ভাষাতত্ত্বের ও এক সময়ের সমাজের সামাজিক অবস্থার বিচারের জন্য ঐ রচনাগুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে; সেই উদ্দেশ্য সাধনই এই আলোচনার লক্ষ্য।

রচনাগুলির বিশ্লেষণের ও বিচারের আগে দেখা উচিত যে "পাঠ" ঠিক আছে কিনা। ছাপার অক্ষরে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা মূল পুঁথির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার উপায় নাই ; পণ্ডিত হরপ্রসাদ মূল পুঁথিগুলি নিজের কাছে রাখিয়া অন্যের বিনা সাহায্যে উহাদের সম্পাদন ও ছাপা শেষ করিবার পর পুঁথিগুলি নেপালে ফেরৎ দিয়াছেন। সম্পাদক নিজে যত বড় পণ্ডিত হইলেও এই সকল পুঁথি অন্য জন কতক পণ্ডিতের পরীক্ষা ও বিচারের অধীন করা উচিত ছিল ; অন্য কোন উপায়ে পাঠের বিশুদ্ধি ও গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্থির হয় না। পণ্ডিত মহাশয় যে অভ্রান্ত সম্পাদক ন'ন, তাহার পরিচয় তাঁহার এই গ্রন্থেই অনেক পাওয়া যায়; ঐ ত্রুটির অল্প একটু পরিচয় দিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, অবিচলিত বিশ্বাসে রচনা গুলির পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া ধরা অসম্ভব।

রচনাগুলির ছন্দ, রাগ বা সুর, ও টীকায় অবলম্বিত পাঠ ধরিয়া কেমন করিয়া অনেক স্থলে ছাপা পাঠের ভুল ধরিতে পারা যায়, তাহা দেখাইবার আগে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি যে, যেখানে হয়ত মূল পাঠ ছাপিতে ভুল হয় নাই, সেখানেও কিভাবে পণ্ডিত মহাশয় এক শব্দের অক্ষর অন্য শব্দের গায়ে জুড়িয়া পাঠের ও অর্থের গোল ঘটাইয়াছেন। যে প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে (বাঙ্গলা বলিলাম না) দোহাকোষ রচিত, উহাতে খাঁটি সংস্কৃতের অনুরূপ তৃতীয়া বিভক্তিতে করণ কারকের পদ আছে মনে করিয়া পণ্ডিত মহাশয় যেখানে "যেন" পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, অতি বিস্ময়ে সে স্থানটি পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, তিনি অপভ্রংশের "যে" শব্দটির গায়ে পরবর্ত্তী শব্দের

প্রথম অক্ষর "ন"-টি জুড়িয়া "যেন" সৃষ্টি করিয়াছেন, ও "নভজ্জলু" শব্দটিকে "" ভজ্জলু" করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় টীকায় পাইয়াছেন যে সেখানে "বৃষ্টি" -র কথা আছে; তাই তাঁহার করণ কারকের "যেন" বজায় রাখিয়া পরিশিষ্টের দুরূহ শব্দের মধ্যে "বৃষ্টি" অর্থে "ভজ্জলু" লিখিয়াছেন; 'নভের জল' বুঝিলে শব্দটা কঠিন মনে হইত না। সম্পাদক একদিকে পুঁথি পড়িয়াছেন অসাবধানে ভুল করিয়া, আর অন্য দিকে সেই ভুল পাঠের ভিত্তিতে প্রাচীন প্রাকৃতের ব্যাকরণ সম্বন্ধে সৃষ্টিছাড়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুঁথিগুলি অন্যের দৃষ্টির অগোচরে রাখিবার আগ্রহে সম্পাদক যে কত গোল করিয়াছেন, তাহার অনেক পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে।

এক শ্রেণীর সহজিয়ারা তাহাদের গুপ্ত সাধনের যে পদ্ধতি বা আচরণের রীতি চর্য্যাপদ নাম দিয়া রচিয়াছিল, সেই রচিত পদগুলি এক একটি রাগিণীর সুরে, হিন্দীতে পরিচিত চতুষ্পদী বা চৌপাই বৃত্তে পাওয়া যায়। টীকাতে অতি স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, চর্য্যার গানগুলি চতুষ্পদী বা চৌপাই; বিশুদ্ধ হিন্দী চৌপাই রচনার অনুরূপে যে, পদ্যটির প্রথম চারি ছত্র হইয়াছে প্রথম ধুয়ার পদ, ও পরবর্ত্তী অংশের প্রতি দুই ছত্রে এক একটি পদ হইয়া মোট দশ ছত্রে পদ্যটি রচিত হইয়াছে, তাহা টীকাকার স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে ভুলেন নাই। চর্য্যাসংগ্রহের মধ্যে দশম গানটিতে আছে ১৪ ছত্র ও বাইশের গানটিতে আছে ১২ ছত্র ; উহাতে পদ সংখ্যা হইয়াছে—যথাক্রমে ৭ ও ৬। চৌপাই যখন হিন্দী রচনাতে একটা বাঁধা কাঠামে দাঁড়াইয়া ছিল, তখন চৌপাই ধরণ বজায় রাখিয়া চারিটি পদের অধিক পদ বসাইবার পক্ষে বাধা ছিল না। এই চৌপাই, বাঙ্গলা রচনার আমূল ইতিহাসে একেবারে অজ্ঞাত, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা নামে পরিচিত কোন প্রাচীন বা আধুনিক রচনায় ঐ চৌপাই ধরণ পাওয়া যায় নাই।

সে যাহাই হউক, উক্ত চৌপাই ধরণ ও বৃত্ত, ও তাহাদের সঙ্গে গানে গানে নির্দ্দিষ্ট রাগিণী বা সুর ধরিলে ছন্দের হিসাবে সহজে পাঠ বিশুদ্ধ রাখা যায়। হয়ত গানে যে সকল সুর নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কি ধরণে চৌপাই পড়িতে হয়, তাহা পণ্ডিত সম্পাদক মহাশয়ের জানা নাই; তিনি যদি খাঁটি হিন্দীওয়ালাদের কাছে ঐ সকল সুরে পদ্যের আবৃত্তি শুনিতেন, তবে পাঠ মিলাইবার সময় অনেক ভুলের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। কিন্তু তিনি বিনা বিচারে জিনিষটি মনে করিয়াছিলেন খাঁটি বাঙ্গলা, তাই বাঙ্গলা ছন্দের বাহিরের কিছু চর্য্যাপদ গুলিতে আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। এসঙ্গে একথাটাও বলিয়া রাখি যে, চৌপাইএর মত দোহাও বাঙ্গলার বাহিরের হিন্দী সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট রচনার কাঠাম।

গ্রন্থে প্রকাশিত প্রথম গানটি (কায়া তরুবর ইত্যাদি) রচনার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে পড়িলে যে উহা একালের খাঁটি হিন্দী ছন্দে ও ধরণে দাঁড়ায়, তাহা আমরাও আবৃত্তি করিয়া দেখাইতে পারি। ছন্দের দিকে অতি অল্প মাত্র দৃষ্টি দিলেও সম্পাদক দেখিতে পাইতেন যে প্রথম গানটির সপ্তম ছত্রকে তিনি যত দীর্ঘ করিয়াছেন, তাহা করা একেবারে অসম্ভব। তিনি যদি ঐ বেখাপ্পা দীর্ঘ

চরণটির শুদ্ধতা রাখিবার জন্য টীকার দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি দিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন, "পাটের" শব্দটি কিছুতেই ঐ চরণে স্থান পায় না। "পাটের" উঠিয়া গেলে সারা গানটির মধ্যে এমন একটি শব্দ পাওয়া যায় না, এমন একটি বিভক্তি পাওয়া যায় না, যাহাকে বাঙ্গলা বলিয়া দাবি করা চলে। যদি কেহ বলেন যে এখনকার বাঙ্গলার সঙ্গে না মিলিলেও হয়ত বা এক সময়ে ঐরূপ শব্দ ও বিভক্তি প্রভৃতি বাঙ্গলায় ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে এখানে তর্ক করা চলে না; তবে এইটুকু এখানে বলিয়া রাখি,—যদি একজন হিন্দীওয়ালা ও বাঙ্গলাওয়ালার সঙ্গে এই গানটির দাবি লইয়া মোকদ্দমা ওঠে তবে বিচারক কাহার পক্ষে ডিক্রি দিবেন? একজন দেখাইবেন যে, উচ্চারণের ধরণে, ছন্দে ও ভাষায় একালের হিন্দীর সঙ্গে মিল অত্যন্ত অধিক, আর অন্য ব্যক্তি দুই একটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিবেন যে, হয় ত বা এক সময়ে তাঁহার ভাষায় ঐ ধরণের প্রাচীন রূপ ছিল। বইখানি যদি বাঙ্গালী পণ্ডিত আনিয়া না ছাপিতেন, তবে হয়ত এই মোকদ্দমাই দায়ের হইত না।

এ সকল কথা ভাষার বিচারের সময় হইবে; এখানে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কেবল এইটুকু দেখাইবার চেষ্টা করা গেল যে, সম্পাদক মহাশয় নিপুণভাবে রচনার পাঠ ঠিক করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যেরূপ অসাবধানে পুঁথি পড়িয়াছেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে একথাও বলা শক্ত যে, তিনি মূলের অনেক অক্ষর যথার্থভাবে পড়িয়া ছাপাইয়াছেন কিনা। মূল পুঁথি মিলাইয়া পাঠ ঠিক করিবার পথে সম্পাদক মহাশয় কঠিন বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাঁহার পাঠও পূরা বিশ্বাসে অবলম্বন করা আশঙ্কাজনক। কাজেই প্রত্যেকটি গান সযত্নে বিশ্লেষণ করিয়া টীকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব পাঠ ঠিক করিতে হইবে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদের ত্রুটি ধরিয়া সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের উদ্দেশ্য তাঁহার সংগৃহীত রচনাগুলির যথার্থ পরিচয় দেওয়া। তবে তিনি রচনাগুলির সম্বন্ধে যে ভুল মন্তব্য ও ভুল ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন, তাহা অল্পের মধ্যে দেখাইয়া দেওয়া উচিত; সম্পাদকের উক্তির দিকে অধিক দৃষ্টি দিলে একদিকে বৃথা বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতে পারে, আর অন্যদিকে কোলাহলের চাপে আসল কাজটা ঢাকা পড়িতে পারে।

একদিকে পাঠ ঠিক না করিলে খাঁটি অর্থ বোঝা যায় না, আবার অন্যদিকে এই রচনায় যে শ্রেণীর সাধনার পদ্ধতি আছে, সেই শ্রেণীর ধর্ম্মমত জানা না থাকিলে অর্থ-বোধ হওয়া অসম্ভব। উদ্দিষ্ট ধর্ম্মমতের সহিত পণ্ডিত সম্পাদকের পরিচয় থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই; এই জন্য অনেক ব্যাখ্যা দূষিত হইয়াছে। অতি স্পষ্টভাবে এই ধর্ম্মমতের পরিচয় দেওয়াও বড় সম্ভব নয়; কেন, তাহা বলিতেছি। এই সাহিত্যে আছে একশ্রেণীর অবধূত-অবধূতিকাদের গুপ্ত সাধনের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া; এ যুগের বিচারে সে সকল কথা অতিশয় অশ্লীল জঘন্য ও কুৎসিৎ; সেকালের ভদ্র বিচারেও সেইরূপই ছিল। পাঠকেরা যদি কেবল প্রকাশিত

টীকাখানির দিকে মনোযোগ দেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, আসল কথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য রচনায় অনেক চেষ্টা হইয়াছে ও সেই জন্য টীকাকার ভাষাকে বলিয়াছেন সন্ধ্যাভাষা। টীকায় (মূল পদেও বটে) বলিয়া দেওয়া আছে যে, খাঁটি পদ্ধতি গুরুর কাছে শিখিতে হইবে ও ঐ পদ্ধতির কথা সহজিয়া সম্প্রদায়ের অমুক অমুক-গ্রন্থে আছে। এমন জিনিসের খোলা ব্যাখ্যা এ পত্রিকায় বা কোন পত্রিকায় ছাপা চলেনা; তবুও ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের খাতিরে পদগুলির অর্থের কিছু কিছু আভাষ দিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে পণ্ডিত হরপ্রসাদের সমালোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়, আর এই জন্য তাঁহার ত্রুটি দেখাইবার প্রয়োজন যে, পাঠকেরা তাঁহার মন্তব্য ও ব্যাখ্যার দিকে একেবারে দৃষ্টি না দিয়া সংগৃহীত সাহিত্যটি বুঝিতে চেষ্টা করেন। রচনাগুলির বিচার ও বিশ্লেষণের সময়ে উহাদের রচনা-কাল ও ভাষার প্রকৃতি কি, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পণ্ডিত হরপ্রসাদ যে বিনা বিচারে চর্য্যাপদগুলিকে ও দোহা-কোষ দুইখানিকে একই হাজার বছরের আগেকার বাঙ্গলা ভাষা বলিয়াছেন, সেই উক্তিটি ধরিলেই সম্পাদকের বিচার-ক্ষমতার অভাব স্পষ্ট দেখা যাইবে। উদ্দিষ্ট সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গলাই হউক আর যাহাই হউক, চর্য্যাপদের ভাষা হইতে যে দোহা-কোষের ভাষা বহু পরিমাণে ভিন্ন, ইহা একজন সাধারণ প্রাকৃতজ্ঞ পাঠকও দেখিতে পাইবেন; যে দুইখানি দোহা-কোষ সংগৃহীত আছে উহারও একখানি যে অপরখানি হইতে ভাষার হিসাবে কিছু ভিন্ন, তাহাও সহজে অনুমেয়। হইতে পারে প্রাচীন পূর্ব্বমাগধী ভিন্ন ভিন্ন যুগে যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা দোহাকোষ দুইখানিতে ও চর্য্যাপদগুলিতে ধরিতে পারা যাইবে; সে বিচার পরে হইবে। এখানে কেবল এইটুকু বলিয়া রাখি যে, দোহাকোষের ভাষা ও চর্য্যাপদগুলির ভাষা কিছুতেই এক যুগের এক সময়ের একটি ভাষা নয়, সে যুগ হাজার বৎসরেরই হউক আর যাহাই হউক। পণ্ডিত হরপ্রসাদ রচনাগুলির ভাষা ধরিবার জন্য প্রাচীন প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশের বিচার করেন নাই; শুধু তাহাই নহে, ঐ রচনার মধ্যে নেপালী, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার কোন প্রাদুর্ভাব আছে কিনা, তাহাও ব্যাকরণের পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। একস্থানে "গাইড়" ও "শুনাইড়" শব্দ ধরিয়া বলিয়াছেন যে হয়ত উহা ওড়িয়া; তাহা আদপে সত্য নয়। ওড়িয়ার ঐ শ্রেণীর ক্রিয়া পদের "ল" কখনও "ড" উচ্চারিত হয় না। যেখানে যথার্থই ওড়িয়া প্রভৃতির প্রাধান্য আছে, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই; হয়ত ওড়িয়ার মত অন্য প্রাদেশিক ভাষা না জানার দরুণ তুলনা করিয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। পাঠকেরা দেখিতেছেন যে, নানাদিকের নানা বিচারে রচনাগুলির বয়স, ভাষা ও রচনায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিপুণ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিদায়ক্ষণে

(শ্যামের প্রতি গোপীগণ)

কোথায় গোকুল ছেড়ে প্রাণবঁধু চলিলে,
ভাসাইয়া আশারাশি নয়নের সলিলে ?
এমন করিয়া হায় চলে' যাবে মথুরায়
আগে হ'তে শ্যামরায় কেন নাহি বলিলে ?
অখলা অবলা মোরা কাননের হরিণী,
ছুটিয়াছি বাঁশী শুনে কখনো ত ডরিনি,
বাঁশী যে শায়ক হবে কে কোথা ভেবেছে কবে ?
এমন করিয়া সবে হে নিঠুর ছলিলে ?
গোকুলে অকূলে ফেলে কি সুখে বা রহিবে ?
ব্রজের বিরহ-ব্যথা ও বুকে কি সহিবে ?
সেথা উদাসীন র'বে ধূমরাশি হেরি নভে,
যমুনার এই পারে দাবানল জ্বলিলে ?
রাধারে না হয় শঠ অবাধেই ছাড়িবে,
রাধানামে-সাধা-বাঁশী ছাড়িতে কি পারিবে ?
রাসতলা হবে মরু ; শুকাইবে চূত তরু
করিতে উৎসব ঘটা যা'তে ফল ফলিলে।
শ্বসিতেছে বেণুবন নুয়ে নুয়ে ভূতলে,
পথরোধে ধেনুগণ চোখে নীর উথলে।
ফুলের বদলে শিলা ছুড়ে, শেষে একি লীলা ?
নিজ হাতে গাঁথা মালা রথতলে দলিলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পথের দাবী*

(২৮)

এই নিশীথ রাত্রে সুমিত্রার আগমন সম্বাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রাতিকর। ভারতী কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে সে প্রবেশ করিতে ডাক্তার সহজকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, বোস। তুমি কি একলা এলে নাকি?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ। ভারতীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছো ভারতী?

এই মিনিট খানেক সময়ের মধ্যেই ভারতী কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার সীমা নাই। সেদিনকার মত আজিও যে সুমিত্রা তাহাকে গ্রাহ্য করিবে না ইহাই সে নিশ্চিত জানিত, কিন্তু শুধু এই কুশল প্রশ্নে নয়, তাঁহার কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধ কোমলতায় ভারতী সহসা যেন চাঁদ হাতে পাইল। অহেতুক কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, ভালো আছি দিদি। আপনি ভাল আছেন? আজ আর তাহাকে তুমি বলিয়া ডাকিতে ভারতীর সাহস হইল না।

হাঁ, আছি, বলিয়া জবাব দিয়া সুমিত্রা একধারে উপবেশন করিল। কথোপকথন বেশি করা তাহার প্রকৃতি নয়,—একটা স্বাভাবিক ও শান্ত গাম্ভীর্য্যের দ্বারা চিরদিনই সে ব্যবধান রাখিয়া চলিত, আজও সে রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ বা বিরক্তির পরিচায়ক নহে তাহা জানিয়াও কিন্তু ভারতীর নিজে হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না।

ডাক্তার কথা কহিলেন। বলিলেন, শশীর মুখে শুনলাম, তুমি প্রচুর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জাভায় ফিরে যাচ্চো।

সুমিত্রা কহিল, হাঁ, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে।

কবে যাবে?

প্রথম ষ্টিমারেই—শনিবারে।

ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, যাক্ এবারে তা'হলে তুমি বড়লোক হলে।

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কহিল, হাঁ, সমস্ত পেলে তাই বটে।

ডাক্তার বলিবেন, পাবে। এটর্ণির পরামর্শ ছাড়া কাজ কোরোনা। আর, একটু সাবধানে থেকো। যাঁরা তোমাকে নিতে এসেছেন, তাঁরা পরিচিত লোক ত?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ, তাঁরা বিশ্বাসী লোক, সকলকেই আমি চিনি।

তা'হলে ত কথাই নেই, এই বলিয়া ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া ভারতীকে লক্ষ করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ শশী কথা কহিল; বলিল, এ হল মন্দ নয় ডাক্তার। যে তিনজন বাঙালী মহিলাকে আপনি সিলেন—নবতারা গেলেন, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট যেতে উদ্যত, শুধু ভারতী—

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, তোমার দুশ্চিন্তার হেতু নেই, কবি, ভারতীও মহাজনের পন্থা অনুসরণ করবেন তা' এক প্রকার স্থির হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু জবাব দিল না।

ডাক্তারের পরিহাসের মধ্যে যে ব্যথা আছে শশী ইহাই অনুমান করিয়া কহিল, আপনাকেও শীঘ্র চলে যেতে হচ্ছে। তাহলেই দেখুন, আপনার পথের দাবীর এ্যাক্টিভিটি বর্ম্মায় অন্ততঃ শেষ হয়ে গেল। কে আর চালাবে! এই বলিয়া শশী গভীর নিশ্বাস মোচন করিল। তাহার এই দীর্ঘশ্বাস অকৃত্রিম এবং যথার্থই বেদনায় পূর্ণ. কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ডাক্তারের মুখের পরে ইহার লেশমাত্র প্রতিবিম্ব পড়িল না। তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, ও কি কথা কবি? এতকাল এত দেখে শুনে শেষে তোমারই মুখে সব্যসাচীর এই সার্টিফিকেট! তিনজন মহিলা চলে যাবেন বলে পথের দাবী শেষ হয়ে যাবে? মদ ছেড়ে দিয়ে কি এই হল নাকি? তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি আবার ধরো।

কথাটা তামাসার মত শুনাইলেও যে তামাসা নয় তাহা বুঝিয়াও ভারতী ঠিক মত বুঝিতে পারিল না। কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল সুমিত্রা নতনেত্রে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তখন সে মুখ তুলিয়া ডাক্তারের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, দাদা, আমার ত আর বোঝবার জন্যে মদ ধরবার আবশ্যক নেই, কিন্তু তবুত বুঝতে পারলাম না। নবতারা কিছুই নয়, আর আমি তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সুমিত্রা দিদি—যাঁকে তুমি নিজে থেকে প্রেসিডেণ্টের আসন দিয়েছ,—তিনি চলে গেলেও কি তোমার পথের দাবীতে আঘাত লাগ্‌বে না? সত্যি কথা বোলো দাদা, শুধুমাত্র কাউকে লাঞ্ছনা করবার জন্যেই রাগ করে যেন বোলোনা। এই বলিয়া সে চোখাচোখি হইবার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসায় পলকমাত্র সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু অন্যত্র অপসারিত করিল। চোখে চোখে মিলিলনা, সুমিত্রা সেই যে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি নির্ব্বাক নতমুখে মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আমি রাগ করে বলিনি ভারতী, সুমিত্রা অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু তুমি হয়ত জানো না, কিন্তু নিজে সুমিত্রা ভালরূপেই জানেন যে এ সকল ব্যাপারে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ গণনা করতে নেই। তা'ছাড়া প্রাণ যাদের এমন অনিশ্চিত তাদের মূল্য স্থির হবে কি দিয়ে বলত? মানুষ ত যাবেই। যত বড়ই হোক, কারও অভাবকেই যেন না আমরা সর্ব্বনাশ বলে ভাবি, একজনের স্থান যেন জলস্রোতের মত আর একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে এই শিক্ষাই ত আমাদের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা ভারতী।

ভারতী কহিল, কিন্তু এ তো আর সংসারে সত্যই ঘটেনা। এই যেমন তুমি। তোমার অভাব কেউ কোনদিন পূর্ণ করতে পারে এ কথা তো আমি ভাবতেই পারিনে দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র ভারতী। আর, এই যেদিন টের পেয়েছিলাম, সেই দিন থেকেই তোমাকে আমি আর দলের মধ্যে টান্‌তে পারিনি। কেবলি মনে হয়েছে, জগতে তোমার অন্য কাজ আছে।

ভারতী বলিল, আর কেবলি আমার মনে হয়েছে আমাকে অযোগ্য জ্ঞানে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্চো। যদি আমার অন্য কাজ থাকে, আমি তারই জন্যে এখন থেকে সংসারে বার হবো, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হোলোনা দাদা। আসলে কথাটা তুচ্ছ। তোমার অভাব জলস্রোতের মতই পূর্ণ হতে পারে কি না? তুমি বোল্‌ছ পারে,—আমি বল্‌চি পারেনা। আমি জানি পারে না, আমি জানি, মানুষ শুধু জলস্রোত নয়,—তুমি ত নও-ই।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, কেবল এই কথাটাই জানবার জন্যে তোমাকে আমি পীড়াপীড়ি কোরতামনা। কিন্তু যা নয়, যা নিজে জানো তুমি সত্য নয়, তাই দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও কেন?

ডাক্তার হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেননা, উত্তরের জন্য ভারতী অপেক্ষাও করিল না। কহিল, এ দেশে আর তোমার থাকা চলেনা,—তুমিও যাবার জন্যে পা তুলে আছো। আবার তোমাকে ফিরে পাওয়া যে কত অনিশ্চিত এ কথা ভারতেও বুকের মধ্যে জ্বল্‌তে থাকে, তাই ও আমি ভাবিনে, তবুও এ সত্য ত প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব না করে পারিনে। এ ব্যথার সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও আমার বড় ব্যথা তোমাকে এমন করে পেয়েও পেলাম না। আজ আমার কত দিনের কত প্রশ্নই মনে হচ্চে দাদা, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করেছি তুমি সত্য বলেছ, মিথ্যা বলেছ, সত্যে-মিথ্যায় জড়িয়ে দিয়ে বলেছ,—কিন্তু কিছুতেই সত্য জান্‌তে দাওনি। তোমার পথের-দাবীর সেক্রেটারি আমি, তবু যে তোমার কাযের পদ্ধতিতে আমার এতটুকু আস্থা ছিল না, এ কথা তোমাকে ত আমি একটা দিন ও লুকোইনি। তুমি রাগ করোনি, অবিশ্বাস করোনি,—হাসিমুখে শুধু বারবার সরিয়ে দিতে চেয়েছ। অপূর্ব্ববাবুর জীবন দানের কথা আমি ভুলিনি। মনে হয়, আমার ছোট্ট জীবনের কল্যাণ কেবল তুমিই নির্দ্দেশ করে দিতে পারো। দোহাই দাদা, যাবার দিনে আর নিজেকে গোপন করে যেয়োনা,—তোমার, আমার, সকলের যা পরম সত্য তাই আজ অকপটে প্রকাশ কর।

এই অদ্ভুত অনুনয়ের অর্থ না বুঝিয়া শশী ও সুমিত্রা উভয়েই সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, এবং তাহাদেরই উৎসুক চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভারতী নিজের ব্যাকুলতায় অকস্মাৎ নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা ডাক্তারের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সহাস্যে কহিলেন, সত্য, মিথ্যা, এবং সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে ত সবাই বলে ভারতী, আমার আর বিশেষ দোষ হ'ল কি? তা ছাড়া লজ্জা যদি পাবার থাকে ত সে আমার, কিন্তু লজ্জা পেলে যে তুমি!

ভারতী নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। সুমিত্রা ইহার জবাব দিয়া কহিল, লজ্জা যদি, তোমার

না-ই থাকে ডাক্তার! কিন্তু মেয়েরা সত্যি কথাটাও মুখের উপর স্পষ্ট করে বল্‌তে লজ্জা বোধ করে। কেউ কেউ বল্‌তেই পারেনা।

এই মন্তব্যটি যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের জন্য বলা হইল তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিলনা, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহার প্রাপ্য বোধহয় তাহাই অপর সকলকে নিরুত্তর করিয়া রাখিল। মিনিট দুই তিন এম্‌নি নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার ভারতীকে পুনরায় লক্ষ করিয়া কহিলেন, ভারতী, সুমিত্রা বল্‌লেন, আমার লজ্জা নেই, তুমি দোষ দিলে আমি সুবিধা মত সত্য ও মিথ্যা দুই-ই বলি। আজও তেম্‌নি কিছু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে পারতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার পথের দাবীর সম্বন্ধ থাক্‌তো। এর ভাল-মন্দ দিয়েই আমার সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারিত হয়। এই আমার নীতি শাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্ত্তি!

ভারতী অবাক্ হইয়া কহিল, বল কি দাদা, এই তোমার নীতি, এই তোমার অকপট মূর্ত্তি?

সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, হাঁ, ঠিক এই! এই ওঁর যথার্থ স্বরূপ। দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম্ম নেই এই পাষাণ মূর্ত্তি আমি চিনি ভারতী।

তাঁহার কথা গুলা যে ভারতী বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য;—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দ গুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত সনাতন অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানব জাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে,। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি সত্য সৃষ্টি করি।

এ পরিহাস নয়, সব্যসাচীর অন্তরের উক্তি। ভারতী যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল, অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, এই কি তোমার পথের দাবীর নীতি?

ডাক্তার জবাব দিলেন, ভারতী, পথের দাবী আমার তর্ক শাস্ত্রের টোল নয়—এ আমার পথ চলার অধিকারের জোর! কে কবে কোন্ অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল পথের দাবীর সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার হৃদয়ের বাক্য হবে মিথ্যা? তোমার পরম সত্য কি আছে জানিনে, কিন্তু পরম মিথ্যা যদি কোথাও থাকে ত সে এই!

উত্তেজনায় সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু এই ভয়ানক কথা শুনিয়া ভারতী শঙ্কায় ও সংশয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

কবি!

আজ্ঞে।

শশীর কি ভক্তি দেখেচ? এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু এ হাসিতে কেহ যোগ দিলনা। ডাক্তার দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, জোয়ার শেষ হতে আর দেরি

নেই, আমার যাবার সময় হয়ে এল। তোমার তারা-বিহীন শশি-তারা লজে আর আসার সময় পাবোনা।

শশী কহিল, কালই আমি এ বাসা ছেড়ে দেব।

কোথায় যাবে?

শশী কহিল, আপনার আদেশ মত ভারতীর কাছে গিয়ে থাক্‌বো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, দেখেচ ভারতী, শশী আমার আদেশ অমান্য করেনা। ও বাসাটার নাম কি দেবে কবি? শশী-ভারতী লজ? বার তিনেক ফস্‌কাতে ত আমিই দেখ্‌লাম, এবারে হয়ত লাগ্‌তেও পারে। ভারতী লোক ভাল। ওর শরীরে দয়া-মায়া আছে।

এত কষ্টেও ভারতী হাসিয়া ফেলিল। সুমিত্রা হাসি-মুখে মাথা নত করিল।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার টাকার থলিটি কিন্তু সঙ্গে নিলাম। ভারতীর কাছে রেখে যাবো, ও একটা বাড়ী কিন্‌বে।

ভারতী বলিল, দাদা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কি তোমার থাম্‌বেনা?

শশী বলিল, টাকা আপনি নিন ডাক্তার আপনাকে আমি দিলাম। আমার দেশের বাড়ী ঘর সর্ব্বস্ব বেচা টাকা যেন দেশের কাজেই লাগে।

ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল। বলিলেন, টাকা আমার আছে, শশি, এখন আর দরকার নেই। তা ছাড়া, আর বোধ হয় টাকার অভাব হবে না। এই বলিয়া তিনি স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রার দুই চক্ষে কৃতজ্ঞতা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুখে সে কিছুই বলিলনা, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এই কথাটাই ফুটিয়া বাহির হইল, সবই ত তোমার, কিন্তু সে কি তুমি ছোঁবে?

ডাক্তার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া ডাকিলেন, কবি!

বলুন।

ব্রাহ্মণ ভোজনটা একটু আগাম সেরে নিলাম বলে তুমি দুঃখ কোরোনা, শশি, কারণ শুভক্ষণ যখন সত্যি এসে পৌঁছবে তখন দ্বিতীয়বার আর আমি ফুরসৎ পাবো না। কিন্তু সেদিন আস্‌বে। নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে আজ তোমাকে বর দিলাম তুমি সুখী হবে। কিন্তু দুটি কাজ তুমি কখনো করোনা। মদ খেয়োনা, আর রাজনীতিক বিপ্লবের মধ্যে যেয়োনা। তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় এ কথা ভুলোনা।

শশী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনি যাতে আছেন, আমি তার মধ্যে থাক্‌লে দোষ হবে,—আমি কি আপনার চেয়েও বড়?

ডাক্তার কহিলেন, বড় বই কি। তোমার পরিচয়ই ত জাতির সত্যকার পরিচয়। তোমরা

ছাড়া এর ওজন হবে কি দিয়ে? একদিন এই স্বাধীনতা-পরাধীনতা-সমস্যার মীমাংসা হবেই,— এর দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবেনা, কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে? তুমিই ত দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ধারাকে সূত্রের মত গেঁথে।

সুমিত্রা মৃদুহাস্যে বলিল, কবে গাঁথ্‌বেন সে উনিই জানেন, কিন্তু তুমি কথা গেঁথে-গেঁথে যে মূল্য ওঁর এখনি বাড়িয়ে দিলে ভারতী সাম্‌লাবে কি কোরে?

শুনিয়া সবাই হাসিল, ডাক্তার কহিলেন, শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খৃষ্টানের নয়,—শুধু আমার বাঙ্‌লা দেশের কবি। সহস্র নদ-নদী-প্রবাহিত আমার বাঙ্‌লা দেশ, আমার সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা মাঠের পরে মাঠে-ভরা বাঙ্‌লা দেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের সুদুঃসহ অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্ব-হীনতার লাঞ্ছনা নেই,——তুমি হবে শশি, তারই চারণ কবি! পারবেনা ভাই?

ভারতীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, শশী ভ্রাতৃ-সম্বোধনের মাধুর্য্যে বিগলিত হইয়া বলিল, ডাক্তার, চেষ্টা করলে আমি ইংরাজিতেও কবিতা লিখ্‌তে পারি। এমন কি——

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, ইংরাজি নয়, ইংরাজি নয়,—শুধু বাঙ্‌লা, শুধু এই সাত কোটী লোকের মাতৃভাষা! শশি, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই আমি জানি, কিন্তু সহস্র দলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই! আমি অনেক সময়ে ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এ দেশে কবে, কে এনেছিল?

ভারতীর চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, সে কহিল, আর আমি ভাবি দাদা, দেশকে এতখানি ভালবাসতে তোমাকে কে শিখিয়েছিল। কোথাও যেন এর আর সীমা নেই!

ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া শশী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, এই বিগত গৌরবের গানই হবে আমার গান, এই ভালবাসার সুরই হবে আমার সুর। নিজের দেশকে বাঙ্‌লা দেশের লোকে যেন আবার তেম্‌নি করে ভালবাসতে পারে এই শিক্ষাই হবে আমার শিক্ষা দেওয়া।

ডাক্তার বিস্মিত চোখে মুহূর্ত্তকাল শশীর প্রতি চাহিয়া সুমিত্রার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে উভয়েই হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির মর্ম্ম অপর দুইজনে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া দুজনেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, আবার তেমনি কোরে ভালবাস্‌বে কি? তুমি যে ভালবাসার ইঙ্গিত কোরছ শশি, সে ভালবাসা বাঙালী কস্মিন কালেও বাঙ্‌লা দেশকে বাসেনি। তার তিলার্দ্ধ থাক্‌লেও কি বাঙালী বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই সাত কোটী ভাই-বোন্‌কে অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপে দিতে পারতো? জননী জন্মভূমি ছিল শুধু কথার কথা! মুসলমান বাদ্‌শার পায়ের তলায় অঞ্জলি দেবার জন্যে হিন্দু মানসিংহ হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মত কোরে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে রসদ যুগিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছিল বাঙালী! বর্গীরা দেশ লুঠ

করতে আসত, বাঙালী লড়াই করত না মাথায় হাঁড়ি দিয়ে জলে বসে থাকতো। মুসলমান দস্যুরা মন্দির ধ্বংস করে দেবতাদের নাক কান কেটে দিয়ে যেতো, বাঙালী ছুটে পালাত, ধর্ম্মের জন্যে গলা দিত না। সে বাঙালী আমাদের কেউ নয়, কবি, গৌরব করবার মত তাদের কিচ্ছু ছিলনা। তাদের আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলবো,—তাদের ধর্ম্ম, তাদের অনুশাসন, তাদের ভীরুতা, তাদের দেশদ্রোহিতা, তাদের সামাজিক রীতি নীতি,—তাদের যা কিছু সমস্ত। সেই ত হবে তোমার বিপ্লবের গান, সেই ত হবে তোমার সত্যকার দেশ প্রেম!

শশী বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, এই উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলনা।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে হেয়, স্বার্থপরতার ভারে দায়গ্রস্ত, পঙ্গু। শুধু কি কেবল দেশ? যে ধর্ম্ম তারা আপনারা মানতোনা, যে দেবতাদের পরে তাদের নিজেদের আস্থা ছিলনা, তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদ-মস্তক যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে! এ অধীনতা অনেক দুঃখের মূল।

শশী ধীরে ধীরে কহিল, এ সব আপনি কি বলচেন?

ভারতীর ক্ষোভের অবধি রহিলনা, বলিল, দাদা আজ আমি ক্রীশ্চান, কিন্তু তাঁরা আমারও পূর্ব্বপিতামহ। তাঁদের আর যা দোষ থাক্ ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রবঞ্চনা ছিল এ রকম অন্যায় কটূক্তি তুমি কোরোনা।

সুমিত্রা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, এখন কথা কহিল। ভারতীর প্রতি চাহিয়া বলিল, কারও সম্বন্ধেই কটূক্তি করা অন্যায়, কিন্তু অশ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করাও অন্যায়, এমন কি তিনি পূর্ব্বপিতামহ হলেও। এতে মিষ্টতা থাকতে পারে কিন্তু যুক্তি নেই ভারতী, যা কুসংস্কার তাকে পরিত্যাগ করতে শেখো।

ভারতী নির্ব্বাক হইয়া রহিল, ডাক্তার শশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কোন বস্তু কেবলমাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠেনা কবি। পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয় তাছাড়া আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সুমুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই ত শুধু আমাদের পথ করতে হয়! এর মধ্যে মায়া মমতার অবকাশ কই? জীর্ণ, মৃত পথ জুড়ে থাকলে আমরা পথের দাবীর পথ পাবো কোথায়?

ভারতী কহিল, আমি কেবল তর্কের জন্যেই তর্ক করছিনে দাদা, আমি সত্যই তোমার কাছ থেকে আমার জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্চি। কোন একটা সংস্কার বা রীতিনীতি কেবল মাত্র প্রাচীন হয়েছে বলেই কি তা নিষ্ফল, বৃথা এবং পরিত্যজ্য হয়ে যাবে? মানুষে তাহলে অসংশয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে কার পরে দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, এত খানি ভারসহ বস্তু দুনিয়ায় কি আছে তা জানিনে। তবে এ কথা

জানি, ভারতী, বয়সের সঙ্গে একদিন সমস্ত জিনিসই প্রাচীন, জীর্ণ এবং অকেজো, সুতরাং পরিত্যজ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যহ মানুষেই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতি নীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাক্‌বে, এমন হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তা হয়না। শুধু একটা বিপদ হয়েছে এই যে কেবলমাত্র বছরের সংখ্যা দিয়েই কোন একটা সংস্কারের প্রাচীনতা নিরূপণ করা যায়না। না হলে তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল্‌তে, দাদা, যা কিছু পুরাতন, যা কিছু জীর্ণ সমস্ত নির্বিচারে নির্ম্মম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নূতন মানুষ, নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক্।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, নিজে তুমি পারো?

কি পারি, বোন্?

যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু পবিত্র, সমস্ত নির্ম্মম-চিত্তে ধ্বংস করে ফেল্‌তে?

ডাক্তার বলিলেন, পারি। সেইত আমাদের ব্রত। পুরাতন মানেই পবিত্র নয় ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েছে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি পবিত্র হয়ে ওঠেনা। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেউ ত আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নেই। থাক্‌লে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাকেই পবিত্র মনে কর্‌বে কে জানো ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাক্‌তে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন্! যে সংস্কারের মোহে অপূর্ব্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি! আর শুধু কি অপূর্ব্বর বর্ণাশ্রম? তোমার ক্রীশ্চান ধর্ম্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ভারতী ভীত হইয়া বলিল, যে ধর্ম্মকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তাকেই তুমি ত্যাগ করতে বল দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, বলি। কারণ সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা,—আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্ব-মানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।

ভারতী বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, দাদা যেখানেই থাকো, তোমাকে আমি চিরদিন ভাল বাস্‌বো, কিন্তু এই যদি তোমার সত্যকার মত হয়, আজ থেকে তোমার আমার পথ একেবারে বিভিন্ন। একটা দিনও আমি ভাবিনি, এত বড় পাপের পথই তোমার পথের দাবীর পথ।

ডাক্তার মুচকিয়া একটুখানি হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর ধ্বংসের পথে কিছুতেই

কল্যাণ নেই। তোমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্ম্ম বিশ্বাসের পথ,—সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ, সেই পথই আমার সত্য।

তাই ত তোমাকে আমি টান্‌তে চাইনি ভারতী। তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন সুমিত্রা, কিন্তু আমার ভুল একটা দিনও হয়নি। তোমার পথেই তুমি চলগে। স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবেনা শুধু পথের দাবী, পাবেনা শুধু—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের দৃষ্টি পলকের জন্য জ্বলিয়াই যেন নিবিয়া গেল। কণ্ঠস্বর স্থির গভীর। ভারতী ও সুমিত্রা উভয়েই বুঝিল, সব্যসাচীর এই শান্ত মুখশ্রী, এই সংযত, অচঞ্চল ভাষাই সবচেয়ে ভীষণ। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাকে ত বহুবার বলেছি, ভারতী, কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোরকে যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন, সমস্ত মাড়বারে তারচেয়ে অকল্যাণের মূর্ত্তি আর কোথাও ছিলনা—সে আজ কত শতাব্দের কথা,—তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়ে বড় হয়ে আছে। কিন্তু থাক্ এ সব নিস্ফল তর্ক, যা আমার ব্রত তার কাছে কিছুই আমার অসত্য, অকল্যাণ নেই।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তর্ক এবং মতভেদ অনেকদিন ত অনেকবারই হইয়া গেছে, কিন্তু এমন ধারা নয়। আজ তাহার সমস্ত মন যেন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে চাহিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পরে সেই স্নিগ্ধ, সহজ হাসিমুখে কহিলেন, কিন্তু এদিকে যে নদীতে ফের জোয়ার এসে পড়বার সময় হয়ে এল ভারতী, ওঠো।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল।

ডাক্তার খাবারের পুঁটুলি হাতে করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র কোথায়?

সুমিত্রা উত্তর দিল না, নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

তোমাকে কি পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো?

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

ডাক্তার কি একটা পুনরায় বলিতে গেলেন, কিন্তু আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া শুধু কহিলেন, আচ্ছা। ভারতীকে কহিলেন, আর দেরি কোরোনা দিদি, এস। এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুমিত্রা তেম্‌নি নতমুখে বসিয়া রহিল। ভারতী তাঁহাকে নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

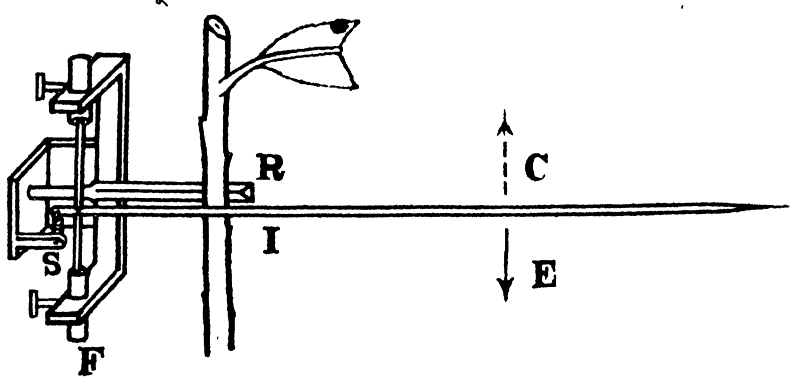
উদ্ভিদের হৃদ্‌স্পন্দন

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এক বাঙ্গলা পত্রিকায় যেদিন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখিয়াছিলেন 'বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনের ছায়ামাত্র' তখন দেবতা বোধ হয় অলক্ষ্যে একটু হাসিয়াছিলেন। সেদিন যখন অনুভূতির উত্তেজনায় এ কথা হঠাৎ বলিয়াছিলেন, তখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন দৃশ্য আলোকের সীমার বাহিরে অদৃশ্য আলোকের রহস্য উদ্ঘাটনে। সেদিন বোধ হয় দেবতাই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, যে ভারতবর্ষে একদিন বাণী উঠিয়াছিল 'এই পরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডে যাহারা এক্‌কেই দেখিতে পায় সত্যকে শুধু তাহারাই পায় আর কেহ নয় আর কেহ নয়' সেই ভারতবর্ষেরই সাধকের দ্বারা একদিন জীব ও উদ্ভিদের ব্যবধান ধূলিসাৎ হইবে।

তারহীন বার্ত্তা ধরিবার যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য্য একদিন দেখিলেন যে হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে কলের সাড়া বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ লক্ষিত হয় যন্ত্রের সাড়া-লিপিতেও সেইরূপ চিহ্ন দেখা গেল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে কিছুকাল বিশ্রামের পর যন্ত্রের ক্লান্তিদূর হইল, সে আবার সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল, বিষপ্রয়োগে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। সাড়া দিবার শক্তি যদি জীবনের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয় তো জড়েও এই চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল যে প্রতিদিন এই যে এক বৃহৎ উদ্ভিদ্-জগৎ মানবচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত তাহাদের জীবনের সহিত কি মানবজীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা উদ্ভিদের সহিত মানবের তো দূরের কথা নিম্নশ্রেণীর জীবেরও কোনরূপ একতা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সার্ব্বভৌমিক বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রেও এমন এক স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকে। ভারতীয় চিন্তার ধারা এই দৃশ্যজগতের বিভিন্নতার মধ্যে এক বিরাট সাম্যের অনুসন্ধানে ছুটিল। উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে ব্যবধান লুপ্ত হইল।

উদ্ভিদের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সেই উদ্ভিদকে দিয়াই তাহার জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহার জন্য এমন সব যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে যদ্দারা বৃক্ষ তাহার নিজের কথা নিজে লিখিতে পারে—মানুষের কোন হাত না থাকে। এসব যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে লাগিল—ভারতীয় মনীষা কর্তৃক ইহার মনন, ভারতীয় কারিকর কর্তৃক ইহার গঠন। এই সব যন্ত্রের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পাশ্চাত্য দেশের বিখ্যাত কারিকররাও ইহার অনুকরণে অসমর্থ হইয়াছে। এইসব যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। বৃক্ষের যে বৃদ্ধি চোখে দেখা যায় না সেই বৃদ্ধি লক্ষগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। বিভিন্ন আহারে ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধির মাত্রার পরিবর্ত্তন ধরা যাইতে

লাগিল। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদ ভিন্ন বিষপ্রয়োগে পুনর্জ্জীবিত হইল। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ হইল। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কৃত হইল, সেই প্রবাহের বেগ নির্ণীত হইল। প্রমাণিত হইল যে, যে সকল কারণে মানবদেহের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদ স্নায়ুর বেগ উত্তেজিত বা প্রশমিত হয়। এইরূপ বহুকৌশলে নির্ম্মিত যন্ত্রে বহু পরীক্ষায় আচার্য্য জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে সেতু বাঁধিয়া দিলেন।



গাছের নাড়ী স্পন্দন পরীক্ষার যন্ত্র

আরও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। দেখা যায় উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে যে রস গ্রহণ করে তাহার সমস্ত দেহে সেই রস সঞ্চারিত হয়। ইউক্যালিপ্টস্ বৃক্ষ প্রায় সাড়ে চারিশত ফিট অবধি উচ্চ হয়। শিকড় ভূমি হইতে যে রস গ্রহণ করে কোন্ শক্তি সেই রসকে উর্দ্ধে চারিশত পঞ্চাশ ফিট অবধি ঠেলিয়া তোলে? পদার্থ বিজ্ঞানের কোন নিয়ম এখনে খাটে না, এসব রহস্যের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। পক্ষান্তরে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একথাও বলিতেন যে আর যাহাই হউক, সজীব জীবকোষ দ্বারা এ রস সঞ্চালিত হয় না।

আচার্য্য দেখিলেন যে উদ্ভিদের দেহে যখন দ্রুত রস-সঞ্চালন হয় তখন তাহার পাতাগুলি খাড়া হইয়া উঠে, আবার যখন রস সঞ্চালন আস্তে আস্তে হইতে থাকে তখন পাতাগুলি নুইয়া পড়ে। রসের সহিত উত্তেজক দ্রব্য মিশাইয়া দিলে রস-সঞ্চালন দ্রুত হইতে থাকে। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে জীবদেহে এইসব ব্যাপার যে ভাবে হয় উদ্ভিদেও ঠিক সেইরূপে হইতে থাকে। তবে কি জীবের ন্যায় উদ্ভিদেরও হৃদ্‌পিণ্ড আছে ও সেই হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন হইতে থাকে? মানবের হৃদ্‌পিণ্ডের সহিত কতকগুলি স্পন্দনশীল নাড়ী যুক্ত আছে, কেঁচো প্রভৃতি জীবের দেহে কতকগুলি স্পন্দনশীল লম্বমান তন্ত্রী আছে। গাছেরও কি সেইরূপ কিছু আছে? থাকে তো গাছের মধ্যে কোথায় উহাদের অবস্থিতি? এ প্রশ্নের সমাধানে তিনি ব্যাপৃত রহিলেন।

গ্যালভানোমিটার বলিয়া এক যন্ত্র আছে যদ্দারা তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব জানা যায়। সেই গ্যালভানোমিটার হইতে একটা তার আনিয়া যদি জীবদেহের বাহিরে যোগ করিয়া দেওয়া যায় এবং আর একটা যদি জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ স্পন্দনশীল হৃদ্‌পিণ্ডের সহিত যুক্ত হয় তো দেখা যায় যে, হৃদপিণ্ড যেই সঙ্কুচিত হয় অমনি গ্যালভ্যানোমিটারের একদিকে তড়িৎ যায়, আবার হৃদ্‌পিণ্ডের প্রসারণের সঙ্গে তড়িতের প্রবাহ অন্যদিকে হয়; হৃদ্‌পিণ্ডের সহিত যোগ না করিয়া অন্য কোথাও যোগ করিলে গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা নড়ে না। উদ্ভিদে কি এইরূপ কিছু হয়? পরীক্ষা করিলেন ইলেক্‌ট্রিক প্রোব দিয়া। উদ্ভিদের বাহিরটা গ্যালভ্যানোমিটারের একদিকে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। আর একদিকটাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইল একটী ছুঁচাল তার যাহার ডগাটা ছাড়া আর চারিদিক তড়িৎ চালনে অক্ষম বস্তুতে দিয়া ঘেরা। এই ছুঁচাল তার—এই ইলেক্‌ট্রিক প্রোব, আস্তে আস্তে গাছের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। কিছুই হয় না—কিছুই হয় না, হঠাৎ ঐ ডগাটা গাছের মধ্যে যেই একস্থানে আসিয়া পৌঁছিল অমনি গ্যালভ্যানোমিটরে তড়িৎ সঞ্চালন দেখা গেল। ব্যস, ঐখানেই প্রোবটা রাখা হইল; দেখা গেল—গ্যালভানো-মিটারের কাঁটা একবার এদিকে একবার ওদিকে ক্রমাগত নড়িতেছে। ঠিক এইরূপই হইয়াছিল যখন জীবদেহের হৃদপিণ্ডের সহিত গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত ছিল। তবে তো বলিতে হয় উদ্ভিদের দেহের এই স্তরে স্পন্দন-ক্রিয়া হইতেছে জীবদেহের হৃদপিণ্ডে যেরূপ হইয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় লক্ষিত হইল যে, যে সব উত্তেজক দ্রব্য হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াকে দ্রুত করে, রসের সহিত সেই সব দ্রব্য মিশাইয়া দিলে উদ্ভিদের স্পন্দন বর্দ্ধিত হয়, আবার বিষ প্রয়োগে ঠিক উল্টা ফল লক্ষিত হয়। তবে তো জীবের হৃদপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভিদের অভ্যন্তরে এই স্পন্দন হইতে থাকে। আচ্ছা আগেকার প্রোবটা আর একটু ঠেলিয়া দেওয়া যাক্। আচার্য্য দেখিলেন স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেলে। সুতরাং উদ্ভিদের অভ্যন্তরে একটা স্তর আছে, একটা রেখা আছে, যেখানে সেই স্পন্দন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়—ঠিক যেমন কেঁচোর দেহের হৃদপিণ্ডের রেখা। আর এই স্পন্দন-ক্রিয়া, এই আকুঞ্চন প্রসারণ, এই পাম্পিং (pumping) দ্বারা রস ৪৫০ ফিট কেন, যে কোন উচ্চতায় উঠিতে পারে। এরূপে উদ্ভিদে রস চালনের প্রকৃত ব্যাপারটা তিনি নির্দ্দেশ করিলেন এবং দেখাইলেন যে জীবের ন্যায় উদ্ভিদের দেহেও স্পন্দন-ক্রিয়া নিয়তই চলিতেছে।

কিন্তু একটা আপত্তির কথা অনুমান করিয়া আচার্য্য প্রস্তুত হইলেন। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, ঐ যে উদ্ভিদের দেহে প্রোব চালান হইল তাহাতে উদ্ভিদের দেহ ক্ষত হইল এবং তজ্জন্য কিনা কি হইল। ক্ষত হইবার ফলে তড়িতের একবার এদিকে একবার ওদিকে যাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না; কিন্তু তবুও এই হৃদস্পন্দন ব্যাপারটা অন্য দিক হইতে প্রমাণ করিতে তিনি চেষ্টিত হইলেন, যদ্দারা গাছ সুস্থ অবস্থায়ই তাহার এই স্পন্দন জানাইতে পারে।



বিজ্ঞানাচার্য্য

সার জগদীশচন্দ্র বসু

মনে করা যাউক একটা রবারের নল আছে, সেই নলটা জলে ডুবান এবং সেই নলের মধ্য দিয়া জল পম্প করা হইতেছে। যেই একবার জল যায় অমনি নলটা ফুলিয়া উঠে, জলের একটা ঢেউ চলিয়া যায়, আবার জল চলিয়া যাইবার পর নলটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আমি যদি এই নলে হাত দিয়া বসিয়া থাকি তবে ঐ নলের উঠা-নামা হইতে উহার ভিতরকার পম্পিং ক্রিয়া ধরিতে পারি। জীবদেহে হৃদপিণ্ড হইল সেই পম্পিং ষ্টেশন এবং সেই পম্পিং ষ্টেশনের সহিত যুক্ত হইয়াছে কতকগুলি নল। যেমন হৃদপিণ্ডে পম্পিং ক্রিয়া চলিতে থাকে, অমনি এই নল—এই নাড়ীগুলি একবার ফুলিয়া উঠে, পরক্ষণে আবার চুপসিয়া যায়। সুতরাং এই নাড়ীর উঠা-নামা হইতে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া সঠিক অনুমিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে মানবদেহে একটা নাড়ী—হাতের কব্জির কাছে শরীরের উপরে আসিয়া পড়িয়া আছে। সুতরাং এখানে এই নাড়ীটা টিপিয়া ইহার উঠা-নামা দেখিয়া ভিতরকার হৃদপিণ্ডের অবস্থা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

কিন্তু উদ্ভিদের নাড়ী তো কোথাও বাহিরে আসিয়া পৌঁছায় নি। সুতরাং উহার উঠা-নামা কিরূপে ধরা যাইবে? আচ্ছা, মনে করা যাউক আগেকার সেই রবারের নলটা। ধরা যাউক উহার চারিদিকে অনেকটা করিয়া ন্যাকড়া জড়ান আছে। তাহা হইলে রবারে নলটা যেমন ফুলিয়া উঠিবে অমনি ন্যাকড়া জড়ান এই সমস্ত জিনিষের বাহিরটাও ফুলিয়া যাইবে। অবশ্য রবারটা যতটা ফুলিয়াছে এটা ততটা না হইতে পারে। আবার রবারের নল চুপসিয়া গেলে বাহিরটা একটু নামিয়া যাইবে। উদ্ভিদের মধ্যকার নাড়ীর যদি সঙ্কুচন-প্রসারণ হয় তো তাহার বাহিরটাও একটু আধটু উঠা-নামা করিবে। কিন্তু এ উঠা-নামা ধরা যাইবে কিরূপে? চোখে দেখা তো দূরে যাউক ভাল অণুবীক্ষণেও তো ইহা ধরা পড়িবে না। আচ্ছা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপিবার যে ক্রেস্কোগ্রাফ নির্ম্মিত হইয়াছে—যাহার নিকট পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অণুবীক্ষণ হার মানিয়াছে—তাহা তো যে কোন গতিবিধিকে কোটী গুণ বর্দ্ধিত করিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দেয়,—সেই ক্রেস্কোগ্রাফের সাহায্য লওয়া হইল। পরীক্ষাটা এইরূপে হইল। গাছ একটা মোটা শলাকার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। এ শলাকা যন্ত্রের সহিত আঁটা, নড়িতে চড়িতে পারে না। গাছের অপর দিকটা ঠেস দিল আর একটা সরু শলাকার উপর। উহার একদিকটায় কব্জা আঁটা, দাঁড়াইয়া ঘুরিতে পারে। গাছটা যেই ফুলিয়া উঠে, অমনি শলাকার অপর দিকটা একদিকে নড়ে, আবার ফুলাটা চুপসিয়া গেলে উহা অন্য দিকে নড়ে। সুতরাং শলাকার এই নড়া-চড়া হইতে গাছের উঠা-নামা এবং তাহা হইতে উহার ভিতরকার নাড়ীর ফুলিয়া উঠা বা চুপসিয়া যাওয়া অর্থাৎ উহার হৃদ্‌স্পন্দন ধরা যাইবে। কিন্তু এই শলাকার নড়াচড়া ধরা যাইবে কিরূপে? লাগান হইল শলাকার এই দিকটা একটা ক্রেস্কোগ্রাফের সহিত যাহা এই নড়াচড়া কোটি গুণ বাড়াইয়া চোখের সামনে ধরিয়া দিবে।

গত ৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আচার্য্য এইরূপ পরীক্ষা করিয়া জীবের ন্যায় উদ্ভিদেরও হৃদপিণ্ডের স্পন্দন প্রদর্শন করিলেন; জগতে এক মহান সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সমালোচনা

" সুদুর্লভাঃ সর্ব্ব-মনোরমা গিরঃ।"

চিত্র

প্রবাসী—কার্ত্তিক—

"সাথী"—"শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর"—(রঙীণ)—দাঁড়ি কমা প্রভৃতি বিরামদ্যোতক চিহ্নগুলির অপরাধ কি বুঝিলাম না। পুরাতনের যাহা ভালো, তাহা লওয়ায় হানি কি? শিল্পী শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথই বা এক্ষেত্রে "শিল্পী"-ত্ব চ্যুত হইলেন কেন?

উন্মুক্ত প্রান্তরের কোনো স্থলে একটী রোমশ বন্য ছাগ গতপ্রাণ হইয়া পড়িয়া—আর তার পৃষ্ঠদেশে—মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে গ্রীবা নির্ভর করিয়া, তাহারই এক সাথী হনুমান তাহাকে জড়াইয়া বসিয়া। হইতে পারে, পুরাতন বন্ধুর সুখস্পর্শে ছাগরাজের চোখ যেন ঝিমিয়া আসিতেছে। ছবির সবটুকুই ভালো। প্রবাসীর এই দীর্ঘশ্মশ্রু ছাগের চিত্রে শিল্পীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বভাবসিদ্ধ সংস্থান-বিন্যাসে প্রবাসীর হনুমানও দেখিতে সুন্দর। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্র স্থায়ী হইবে সন্দেহ নাই।

"বন্ধু"—"চিত্রকর শ্রীবিপিনচন্দ্র দে"—ঘুরিতে ঘুরিতে বোধ হয় হঠাৎ দুইবন্ধুর দেখা হইয়াছে। দুইজনই এখনকার "সন্ন্যাসী" জাতীয়। বন্ধু-প্রেমে হাতের গাঁজার কল্‌কে মুখের কাছে ধূম উদ্গিরণ করিতেছে। ও-সব কলকের কিন্তু মাথা অত মোটা হয় না। এসব ছবি আঁকায় এবং তাহা আবার ছাপায় কোনোই লাভ নেই।

"ভিক্ষুবুদ্ধ"—" চিত্রকর শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত"—

বুদ্ধদেবের নাম মাহাত্ম্যে ছবিখানির আদর হইতে পারে, নতুবা চিত্রকরের নৈপুণ্যে ইহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ—

"স্বাধীনতার স্বপ্ন"—"শিল্পী—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়"—(রঙীণ)—চিত্রের নিম্নে "স্বাধীনতার স্বপ্ন" নামটুকু না থাকিলে দর্শক চিত্রকরের অভিপ্রায় হয়ত বুঝিতে পারিতেন না। চিত্রকলায় কীর্ত্তিমান ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথের দিগন্তবিশ্রুত যশ এই ছবি খানিতে বর্দ্ধিত হয় নাই।

"হংসদূত"—চিত্রকর শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ শান্তিনিকেতন। (রঙীণ) পরিচায়ক কর্ত্তৃক রামকিঙ্কর বাবু "শিল্পী"—বলিয়া পরিচিত না হইলেও—তদীয় চিত্রে শিল্প-নৈপুণ্যের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহিণী গোপবালার নয়নে মুখে দুঃসহ বিরহের তাপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। "চিত্রকর" রামকিঙ্কর যে একজন সুদক্ষ না হইলেও দক্ষ শিল্পী, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। তবে বিরহকৃশা সতীর বামহস্তের অঙ্গুলীচতুষ্টয় অঙ্গুরীর ভারে পীড়িত থাকায় "প্রোষিতে মলিনা কৃশা"-মূর্ত্তির কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পরিচ্ছদের পারিপাট্য

আর একটু কম হইলেই ভালো হইত। তবুও চিত্রখানি কলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

"রক্তসন্ধ্যা"—"চিত্রকর শ্রীঅন্নদা মজুমদার"—(রঙ্গীণ)—জনহীন স্থানে শ্যামল পত্র-পল্লব, সুন্দর তরুতলে সুন্দর বসন-ভূষণে সাজিয়া একটী ললনা দাঁড়াইয়া। বুঝিলাম, কিন্তু "রক্তসন্ধ্যা" নামের সার্থকতা কি? রমণীর পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত বেণীর অগ্রভাগই বা কেন লোহার তারে জড়ানো খোকা খুকুদের পুতুলের ঝুমঝুমের ন্যায়—নায়িকার পিঠ ছাড়িয়া অতটা দূরে ডাঁট হইয়া আছে? বেণীর ত দেহলতিকার গায়ে দুলিয়া থাকা উচিত। চিত্রিতার বাম হস্তই বা কণ্ঠহারা হইয়া অতটা দূরে গিয়াছে কেন? চিত্রে চিত্রকরের ভাব কল্পনার কোনো পরিচয় নাই।

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ—

"কচ ও দেবযানী"—"শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার"—(রঙ্গীণ)—কচ ও দেবযানীর পৌরাণিক আখ্যান বস্তু মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কৃপায় আজকাল সর্ব্বজনবিদিত। তাহারই পূর্ব্বরাগ প্রকাশে, অথবা পূর্ব্বরাগেরও পূর্ব্বাবস্থা ফুটাইতে চিত্রকর প্রয়াস পাইয়াছেন। দেবযানী ফুলভরা সাজিখানি বামহস্তে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আর সুঠাম কচ তাহা লইবার জন্য দক্ষিণ হস্ত সসঙ্কোচে বাড়াইয়াছেন। অনেক শিশুদের মা-মাসী ছেলেদিগকে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিবার সময়ে যেমন নিজেরাও অতর্কিতে মুখ ব্যাদান করিয়া বসেন, কচের বামহস্ত খানিও তদ্রূপ আপনিই দক্ষিণ হস্তের মত যেন কি ধরিবার জন্য সবটুকু পাতিয়া দিয়াছে। চিত্রের জীবন ভাবের অভিব্যক্তি। তাহার কোন পরিচয় এ চিত্রে পাইলাম না। তবে আলেখ্য বস্তুর গুণে চিত্রখানি দেখিতে ইচ্ছা করে। ফুলের সাজির তলদেশে দেবযানীর বামহস্তের অঙ্গুলী-সংস্থান পূর্ব্বরাগ বা প্রস্তুত রসের অভিব্যক্তির পরিপন্থী হইয়াছে।

"প্রতীক্ষা"—"শিল্পী—শ্রীযুক্ত শরদিন্দুকুমার সিংহ"—(রঙ্গীণ)—নির্জ্জন সঙ্কেত স্থানে, শুষ্ক বনস্পতি কাণ্ডে তনু নির্ভর করিয়া উৎসুবনয়না দাঁড়াইয়া। দূরে অতিদূরে,—কোথায় যেন কার প্রতীক্ষায় দৃষ্টি নিবদ্ধ। ভাব এবং কল্পনায় ছবিখানি উপভোগ্য হইয়াছে। ছবিখানি দেখিলে—

"স্খলিত-কবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালং—
বিরহবিধুরা ইন্দীবরাক্ষী গোপী"র—

মূর্ত্তি মনে পড়ে।

"চাঁদিনী রাতে"—"শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল"—বোধ হয় জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে সালঙ্কারা কুণ্ডলকর্ণা কোনো বর্ষিয়সী নারী চন্দ্রের দিকে চাহিয়া করযুগলধৃত ঘট হইতে জলসেচন বা "জলদান" করিতেছেন। চিত্রিতার চক্ষুতে, অধরোষ্ঠে এবং দেহের সংস্থান কৌশলে—শুধু মাতৃত্ব নহে, মাতাপিতৃমহীত্ব পর্য্যন্ত ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেঅংশে চিত্রকরের শ্রম ব্যর্থ হয় নাই। তবে মারা গিয়েছে ঐ গরীব "চাঁদিনী রাতে" শব্দ। কতকগুলি এমন শব্দ আছে, যাহার একটী বলিলে সেই দলের অন্যান্য শব্দ আপনিই আসিয়া মনে উদিত হয়। যথা, রত্ন, কর, কেশ, কর্ণ ইত্যাদি। নির্দ্দোষ বা অচ্ছিদ্র রত্ন, কর-প্রসূন বা কর-কুসুম, কেশ-সমূহ বা কেশ-রাশি এবং কর্ণ-পল্লব বা কর্ণ-কিশলয়—এই শব্দ গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ দলের। ইহাদের সংযোগ তেমন খাপ খায় না, পরন্তু কানে লাগে। অবিদ্ধ রত্ন, করপল্লব বা করকিশলয়, কেশকলাপ, কেশপাশ বা

কেশদাম এবং কর্ণপাশ,— বা প্রভৃতির সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। সেইরূপ "চাঁদিনী রাতে" বলিলেই তাহার স্বদলের অনেক কথা মনে আপনিই উদিত হয়। মনে পড়ে সেই তমালবীথিকা, সেই বাঁশরী, সেই যমুনা আর তায় সেই বাঁশীর তানে উজান বয়ে যাওয়া। কোনো ক্রমেই ঠাকুরমার স্খলিত ঘটের কথা মনে আসে না। মহাজনপদপ্লাবিত বঙ্গদেশের বাংলা ভাষায় একটু হিসাব করিয়া চিত্রের নামকরণ করা সঙ্গত। নাম চিত্রের অভ্যন্তর ভাব প্রকাশের প্রধান সহায়। এস্থলে তাহার বিপরীত হইয়াছে।

বসুমতী—কার্ত্তিক—

"হৃদয়ের তান"—"শিল্পী শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা"—(রঙ্গীণ)—সুসজ্জিত কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় নিশীথে আলুলায়িতবসনা যুবতী শয়ানা। গবাক্ষপথে চাঁদের উঁকি। শয্যাতল ললনার হৃদয়ের ন্যায় কচিৎ কুসুমে উল্লসিত। অদূরে "পাখী পঞ্চমেতে তান ধরিয়াছে" আর সেই তানে "বিরহিণীর হৃদি মাঝে তান জাগিতেছে।" সুতরাং নাক চোখ মুখ হাত সব কেমন একটা অপূর্ব্বরসে যেন ভরিয়া গিয়াছে। এই হইল ছবির প্রতিপাদ্য। যদি আমাদের এ অনুমান ঠিক হয়, তবে চিত্রকরের শ্রম সার্থক হইয়াছে, কিন্তু এতাদৃশ আলেখ্যে সাহিত্যের চিত্রশালায় কোনো পরিপুষ্টি হয় না। যেখানে বহিরূপকরণে অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে হয়, তথায় প্রকাশকের ক্ষমতার নৈপুণ্য প্রকাশ পায় না।

মানসী ও মর্ম্মবাণী,—অগ্রহায়ণ—

"কায়া ও ছায়া"—"চিত্রকর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী"—

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে জলের ধারে অর্দ্ধাবৃত পীনবক্ষে কোনো এক সুন্দরী আপনার প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি-দর্শনে আপনিই বিমুগ্ধ। এই হইল আলেখ্য বস্তু। ললনার হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলী-সংস্থান চিত্রকরের সংকল্পিত ভাব প্রকাশে কোন সহায়তা করিতেছে না। দেখিয়া মনে হয় ভামিনীর বয়ঃক্রমও কম নহে। অঙ্কনকার এই ছবিদ্বারা কি বুঝাইতে চান?—অবশ্য কাল মাহাত্ম্যে মাসিক পত্রিকাদিতে নানাবর্ণের ছবির বিশেষতঃ এইরূপ আপাত-চটক রমণী মূর্ত্তির মুদ্রণ একটা সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের মঙ্গলকামীদিগের এরূপ সহজলভ্য অবাক্ জলপান হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়।

সাময়িক সাহিত্য।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ ১৩৩২—

"হরিৎদ্বীপে"—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী লিখিত প্রায় এগার পৃষ্ঠাব্যাপী একটী গল্প।

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র "মাছেদের রাণী" যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাছে গল্পটী ভালো লাগিবে না। তাঁহারা "কঙ্কাবতী" ও "খেতু"র স্থানে, এই গল্পে পাইবেন "মৎস্যনারী সাগরিকা" ও কোন এক রাজ্যের "রাজকুমার।"

গল্পটী উপভোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য লেখক অপরিসীম আয়াস স্বীকার করিয়াছেন,—চিরতুহিন মেরুদেশ হইতে অতল সাগরতল পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছেন,—মাটীর পৃথিবী ত কোন্ ছার। তবে এর একটা কৈফিয়ত আছে, সেটা শুনিলে লেখকের প্রতি সহানুভূতি হইতে পারে। যথা—সদাসর্ব্বদা আমরা যা' কিছু দেখি,

যা' কিছু করি, এই ধরাতলে নিত্য নিত্য যা' কিছু ঘটে বা ঘটিতে পারে, এমন বস্তু লইয়া গল্পলেখা বড়ই শক্ত। কেননা সবাই যা' দেখিতেছে, বুঝিতেছে, ভোগ করিতেছে, আমি যদি তাহাই দেখাই, বুঝাই, বা তারই ভোগের চিত্র অঙ্কন করি, তবে তাহাতে পাঠকের তৃপ্তি হইবে কেন? তবে আমার যদি এমন ক্ষমতা থাকে যে, সকলের পরিদৃষ্ট বস্তুতে আমি এমন একটা কিছু দেখিতেছি, যাহা তাহাতে আছে, অথচ আমার দেখাইয়া দিবার পর, অন্য সকলে দেখিতে পাইতেছেন, অথচ সেটা সত্য, যথার্থই ঐ বস্তুতে আছে, তবেই আমি সর্ব্বজন-পরিদৃষ্ট খুঁটিনাটি লইয়াও গল্প লিখিতে পারি, কেননা আমি অধিকারী। আর সে ক্ষমতা যদি না থাকে, তবে আমি নিত্য দৃষ্ট বস্তু লইয়া গল্প লিখিবার সম্পূর্ণ অনধিকারী। তখন আমার আর একটা দিক্ খোলা আছে,—আমি যদি এমন কোন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে পাঠককে লইয়া যাইতে পারি যেখানকার তিল হইতে তাল পর্য্যন্ত মাত্র আমিই আমার কল্পনাযন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছি,—আর কেহ দেখে নাই, তাহা হইলে, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থান সম্বন্ধে আমি যাহাই বলি না কেন, পাঠক তাহা শুনিতে বাধ্য। আর আমারও সেখানে ক্ষমতা অপরিসীম। যাহা ইচ্ছা বলিতে পারি,—সেখানকার নদীতে সোনার পদ্ম ফুটাইতে পারি, তার পরাগ আবার সোনার চূর্ণ,—ইত্যাদি যাহাই করিনা কেন, কারো কিছু বলবার যো নাই, কেননা, সে যে আমারি তৈরি দেশ।

"হরিৎদ্বীপের" লেখকও তাই স্বীয় পাঠকদিগকে সাহসের সহিত একেবারে সাগর পারের এক দ্বীপে চকিতে লইয়া গিয়াছেন এবং মনের ক্ষোভ মিটাইয়া কত কি দেখাইতেছেন—শুনাইতেছেন। গল্পটীতে সবই পাওয়া যায়,—সকল ঋতুর ফুল এক ঋতুতে, জন্ম হইতে ২২।২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাজপুত্রের দেহ ও মনের অবস্থার চিত্র ও সেই চিত্রানুকূল করুণ ও বীভৎস রসের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড। ব্যাপারটা এই :—

এক রাজার দুই রাণী, দুয়ো ও সুয়ো, কারোই সন্তান হয় না। সন্ন্যাসীর প্রদত্ত ফল খাইয়া শেষে হইল সুয়োর এক মেয়ে ও দুয়োর ছেলে। প্রসবের কিছু পরেই সুয়ো তা' জেনে বাপের বাড়ীর সঙ্গে থাকা ভৃত্যের দ্বারা দুয়োর অগোচরে সেই ছেলেকে একটা কাঠের বাক্‌সে পুরে অপর্ণা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন ও দুয়োর পাশে এক সদ্যঃপ্রসূত "বানরীর বাচ্চা" রেখে দিলেন। প্রাতঃকালে রাজা এসে দেখে "বানরীবাচ্চা" সহ দুয়োকে বনবাস দিলেন। আর সুয়ো সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বিরাজ করতে লাগিলেন। বানরীটাও তালমাফিক্ ঐ রাত্রিতেই একটা "বাচ্চা পেড়েছিল।"

বাক্‌স ভাসতে ভাসতে "কত নগর-নগরী, কত পল্লীপ্রান্তর, কত বনপর্ব্বত অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে গিয়ে পড়্‌ল, তার পর সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এক দ্বীপে গিয়ে লাগ্‌ল।" শেষে এক জেলে পেয়ে ঐ সিন্দুক খুলে ছেলে নিয়ে বাড়ী গেল ও আহ্লাদে পালতে সুরু কর্‌ল। ছেলে আঠারোবছরের হলো। রাত দিন কেবল বাঁশী বাজায়। আর কিছুতেই তার মন বসে না। এক পূর্ণিমা রাত্রিতে ঐ রাজপুত্র সমুদ্রের চড়ায় বাঁশী বাজাচ্ছেন, হঠাৎ একটী "মৎস্য নারী" (Mermaid) দেখ্‌লেন নাম তার সাগরিকা। দু'জনে যেমন দেখা অমনি খুব নাহোক, খানিকটা ভাব হ'লো। সাগরিকা রাজপুত্রকে নিয়ে চলে গেল একদম সমুদ্রের তলদেশে মৎস্য রাণীর রাজধানীতে। সেখানে রাজপুত্রের চেহারায় অন্যান্য মৎস্য নারীরা চমকে গেল। তারা সবাই চিরকিশোরী। রাণীকে জানা'লো "এমন ধাবা কাঁচা খোকা রাজপুত্র এখানে থাক্‌লে আমরা সশরীরে মারা যাবো, already খানিক গিয়াছি, সুতরাং একে বিদায় ক'রে দিন।" তৎক্ষণাৎ রাণী বিদায় কর্‌লেন। রাজপুত্র চল্লেন, সঙ্গে গেল সাগরিকা। হরীৎদ্বীপে গিয়ে এক বেলা-

সংলগ্ন গিরিগুহায় রাজপুত্র অন্তরীণ হইলেন, গুহার দ্বারে প্রহরা দেন সাগরিকা। তারপর যথারীতি যা যা' হবার সব হলো। একদিন খুব ঝড় উঠেছে, পৃথিবী রসাতলে যায় আর কি, সাগরিকা বড়ই ভয় পাইয়া রাজপুত্রের বুকের মধ্যে চোখ্‌ বুঝে পড়ে রইল,—শেষে হঠাৎ রাজপুত্র দেখেন সেই মৎস্য-নারী এক সুন্দরী যুবতী নারী হইয়াছেন।—কেন এমন হইল—জবাব—"ধরিত্রীর স্নেহস্পর্শে মৎস্য-নারী মানবী হইল।" গল্প শেষ।

এই ব্যাপার হইল গল্পের উপজীব্য। লেখকের লিখিবার শক্তি আছে, তবে যে সম্পদে লেখা মনোহারিণী হয়, পাঠককে আত্মবিস্মৃত করে, সে ভাব সম্পদে লেখক বড়ই দীন। হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবার মতো বা ভাব-মাহাত্ম্যে পাঠকের হৃদয়ে আপনিই অঙ্কিত হইয়া আসিবার মতো কোনো চিত্র বা কথা "হরিৎদ্বীপে" নাই। প্রত্যুত সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরের নানা কারুকার্য্য খচিত গাত্রে ঐরূপ হাবভাবময়ী ছবি আঁকায় মন্দিরের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। লিখিতে বসিয়া মাথা হারাইলে চলিবে কেন? "ফুলের গাছে ফুল ধরে' না, ফলের গাছে ফল ধরে না, জোছনার গায়ে পুলক লাগে না, কোকিল ডাকে না, পাপিয়া গায় না, দোয়েল শীস দেয় না—রাজারা দুঃখে সব ম্রিয়মাণ।" এই বাস্তববর্ণনায় "সব ম্রিয়মাণ" হোক্‌ নাহোক্‌, পাঠকরা যে ম্রিয়মাণ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলার বঙ্কিম রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র শরৎ প্রভৃতি কেহই কিন্তু এপর্য্যন্ত জোছনার গায়ে পুলক লাগাইতে পারেন নাই। "হরিৎদ্বীপের" লেখকের কৃপায় তাহাও লাগিয়াছে। তারপর সন্ন্যাসীর দেওয়া "দৈব ফলের" প্রভাবে লেখক গর্ভোৎপাদনেও মস্ত এক কসরৎ দেখাইয়াছেন। নমুনা,—"রাজা ফলটী বাসন্তী পূর্ণিমার দিন দু'রাণীকে খাওয়াইলেন"। সুতরাং বুঝিতে হইবে বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রিতে, বা দিনে কোনো সময়ে দুই রাণীই অন্তর্বত্নী হইলেন। অবশ্য যুগপৎ। "তার পর—"একদিন শেষরজনীতে—ঢোল, কাঁশী, বাঁশী বেজে উঠ্‌ল কাড়া-নাকাড়া দামামা করতাল ডিম্‌ ডিম্‌ দম্‌ দম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ করে উঠ্‌ল নবৎখানায় সানাইয়ের গলা চিরে আগমনীর আলাপ বেরিয়ে এল—কি হয়েছে! কি হয়েছে! কি হয়েছে? দু'রাণীর সন্তান হয়েছে—।" সুতরাং পাঠক বুঝিলেন যে, "দু'রাণীর সন্তান হয়েছে।" "আগমনীর আলাপ" বেরুচ্ছে কিন্তু, অতএব শারদীয়া পূজার কিয়ৎপূর্ব্বে। "আগমনী" বল্লেই শরতকালে কৈলাস হইতে পিতৃগৃহে—হিমালয়ের গৃহে—দুর্গার আগমনের কথা মনে পড়ে। নবৎখানায় সত্যই ঐসময়ে "আগমনীর" আলাপ বড় মধুর লাগে।

তাহ'লে শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাণীদ্বয় সন্তান প্রসব করিলেন। বুঝিতে হইবে—বাসন্তী পূর্ণিমায় অর্থাৎ চৈত্রের শেষার্দ্ধে রাণীদের "দৈবফল" ভক্ষণ ও সসত্ত্বা হওন এবং আশ্বিনের (না হয় শেষেই ধরিলাম) অর্থাৎ সাড়ে ছয় মাসে অথবা এর মাঝে মলমাস পড়িলে—একমাস পিছাইয়া যাইবে সুতরাং সাড়ে ৭ মাসে প্রসব। সকলি "দৈবের" কৃপায় সম্ভব। দৈবের কৃপা না হইলে লেখক এতটা advanced হইতেন না।

লেখককে একবার সমুদ্র দর্শন করিতে অনুরোধ করি। "সন্ধ্যেকালের আবছায়াতে যখন সাগরবুকের উচ্ছল কলরোল মৃদু হয়ে আসে—" তাই নাকি? দীর্ঘকাল সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বেলা সমীপে বাস করিয়াও কিন্তু সিন্ধুর এই সায়ং মৃদুত্ব আমাদের অনুভূত হয় নাই। প্রত্যুত রাত্রিতে সাগরের গর্জ্জন আরও ভীষণতর বলিয়াই মনে হয়। তবে "দৈবের" কৃপায় হয়ত সম্ভব হইতে পারে।

রাজকুমার বাঁশী বাজাচ্ছেন। "পূর্ণিমা রাত। চারিদিকে জ্যোৎস্না ধারায় বান ডেকেছে।" আর 'রাজপুত্র সৈকতে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল।" * * "বাঁশীর সুর যেন বল্‌ছিল—মানবজীবনের নিষ্ঠুর

বাস্তবতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—হে বাতাস তোমার সুদূরের বারতা, সত্য হোক,—সত্য হোক্, সত্য হোক্॥" বাপরে! কি বিরাট ফিলজফি!! হায় রবীন্দ্রনাথ, "এক হউক, এক হউক, এক হউক," বলে যদি না কাঁদতে, তবে ত আজ আমরা এই অপূর্ব্ব বাণীর আর্ত্তনাদ শুনতেই পেতাম না। একেই বলে—" কবির্ব্বাস্তং মনশ্নুতে।" সাহিত্যের নামে এই সকল স্বৈরাচার অমার্জ্জনীয়।

এইক্ষণে রাজপুত্র ও সাগরিকার প্রথম প্রেমালাপের সামান্য নমুনা দিয়াই আমরা এই বিরক্তিকর কার্য্য হইতে বিরত হইব।

খুব নির্জ্জনে—"একদিন রাজপুত্র বল্লে—সাগরিকা, জানো কি আমার এই বুকের উন্মত্ত বাসনা?"

"কি?"

"তোমার ঐ বক্ষ আমার এই অনলভরা বুকের উপর নিষ্পেষিত করতে।" জবাবে সাগরিকা "বল্লে—রাজপুত্র আমি যে তোমারই।"—বাস্! প্রথম মিলনোৎসুক স্ত্রী পুরুষের এমন ভাব এক চড়ুই পাখীর সমাজ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এর পরের টুকু উদ্ধার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সাগরিকার কৈশোর বর্ণনায় লেখক চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন,—সে "অনাবৃত-দেহ কিশোরী। দীর্ঘ নিবিড় কুন্তল, গায়ের রঙ্ জ্যোৎস্নার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, দুইটী নিটোল স্থির বক্ষ, পল্লবের মতো দুইটী বাহু—" ইত্যাদি। বাপরে লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন বোধ হয়, যে তাঁহার লেখা হয় ত, দশজনে পড়িতে পারে এবং কোনো নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় নহে, সকল সম্প্রদায়ই পড়িতে পারে।—নতুবা এমন "অনাবৃত" রূপ সাধারণ্যে কদাচ তিনি প্রকাশ করিতেন না।

স্থলে স্থলে লেখকের লিপি কৌশলের পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও কেন যে তিনি এত বড় একটা বেয়াদবি করিলেন, বুঝিলাম না। তবে যদি মাসিক পত্রিকার গল্প-সাহিত্য অতিক্রম করিয়া বাহবা লইবার প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে সে পৃথক কথা। এই "হরিৎ দ্বীপে" লইয়া এতটা লেখার কারণ, আজ কাল অনেকেই ঠিক যেমন ভাবেন-করেন, সাহিত্যে তাহাই ফুটাইয়া প্রসাদ লাভ করিতে চান। তাঁহাদের প্রত্যেকের লেখা না তুলিয়া ঐ "অনাবৃত" সাহিত্যের একটি আদর্শ আমরা তুলিয়া দেখাইলাম। হায় বঙ্গদর্শন, আজ তুমি থাকিলে—হয়ত এত দুঃসাহস অতি কম লোকেরই হইত। সকলের উপর জমেছে—কবির অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা। "খরস্রোতা অপর্ণা (নদী) চলেছে উদ্দাম রণতুরঙ্গমের মতো।" অপর্ণা খুব ছুট্‌ছে। আর—"অপর্ণার অন্তরের সুদূরের ডাক থামেনি। অপর্ণার সে ডাক বুঝি চিরন্তনের—সারাবিশ্বের প্রতি—অপর্ণা যেন ডাক্‌ছে।"—

"আয়রে হেথায় ক্ষণেক বসে শোন্‌রে আমি কি গাই গান,
কোন্ কাহিনী কোন্ স্বপনে ব্যাপ্তরে মোর হৃদয় প্রাণ"

—বলিয়া একচল্লিশ লাইনের এক বিরাট কবিতা। কোথায় লাগে এর কাছে, কোম্‌ত-প্লেটো-এরিষ্টটল লেখক যে একাধারে ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও একটি কবিও—তাহা আর অস্বীকার করিবার যো নাই।

"সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ"—শ্রীহরিশচন্দ্র কবিরত্ন। কবিরত্ন মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। বর্ত্তমানে পুরাতন দলের মধ্যে তিনটী লোক এখনও জীবিত, যাঁহাদের ঐ কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বিপিনবিহারী গুপ্ত ও কবিরত্ন মহাশয়। সুতরাং কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট অনেক নূতন কথা এখনকার নবীনগণ শুনিতে পাইবেন, এবং তিনি তাহা শুনাইয়াছেনও। প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। অনেক জ্ঞাতব্য ও আনন্দজনক বিষয় আছে। সবই সত্য, কিন্তু লেখকের আত্মম্ভরিতার বুদ্বুদ্‌টিকায় এমন সুন্দর লেখাটি স্থানে স্থানে বড়ই ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে। আর যাঁহারা এখন

পরপারে, স্তুতিনিন্দার অতীত স্থানে, তাঁহাদের উদ্দেশে বিষোদ্গার করা কবিরত্ন মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ এবং প্রাচীন ব্যক্তির সঙ্গত হয় নাই। চাঁদে কলঙ্ক হইয়াছে।

"নামঞ্জুর"—গল্প শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশপ্রেমিকের দেশাত্মবোধশ্লাঘায় ভরপুর হৃদয়ের নিখুঁত চিত্র। আর সেই সঙ্গে,—প্রাচীন পরিবারের পিসি, মাসী, খুড়ী, জেঠীর স্নেহমাখা প্রাণের অতুলনীয় আলেখ্য। পড়িতে পড়িতে উদ্দেশে কবিকে শতবার নমস্কার করিতে হয়। ভাষা দাসীর মত কবির ভাবের অনুবর্ত্তিনী। অন্য কোনো গদ্য প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি না লিখিলেও, মাত্র এই একটি "গল্পে"র দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক ও শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক বলিয়া পরিচিত হইতেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, মর্ম্মেরও মর্ম্মস্থানে, কখন্ কোন সুর, কোন্ রাগিনী বাজিতেছে বা বাজে, তাহা কবিবর—গল্পের নায়ক—অমিয়া, ও হরিমতীর মুখের দুই একটি কথায়, কোথাও বা—নীরব দৃষ্টিতে এমনই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যে, প্রবাসীর ১০।১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী বড় বড় গল্পের "অনাবৃত" বর্ণনে তার সহস্রাংশও প্রকাশ পায় নাই। বাংলার বর্ত্তমান দুর্গত ভদ্র-সমাজের জন্য চিরদিন রবীন্দ্রনাথ অশ্রুপাত করিতেছেন। তাঁহার এই গল্পের নানাস্থানে সে অশ্রুলেখা ভাসিয়া উঠিয়াছে। একদিন ক্ষয়োন্মুখ পরনির্ভরশীল বাংলার অধিবাসীদের দিকে চাহিয়া যিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননি!
রেখেছ বাঙ্গালি করি, মানুষ করনি॥"

—সেই তিনিই আজ ঘৃণিত পণ-ব্যাধিক্ষত বঙ্গসমাজের দিকে চাহিয়া গল্পনায়কের মুখ দিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিতেছেন—

"আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জান্ত, অতএব ইচ্ছা করলে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে ক'রে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশপঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাস্তে হাস্তে আদায় করতে পারতেম।" বঙ্গীয় সমাজের অসাড় শবদেহে এইরূপ অশ্রুদিগ্ধ কশাঘাতে কোনো ফল হইবে কি? গল্পনায়ক "ডায়ার্কির" বড় চমৎকার ফটো তুলিয়াছেন—"একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডায়ার্কি, দ্বৈরাজ্য,—সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।" ইহার উপর মল্লীনাথ অনাবশ্যক।

স্বদেশসেবা একটি প্রধান যজ্ঞ। স্বার্থ তাহার আহুতি, মানসম্ভ্রম তাহার দক্ষিণা। যদি সেই আহুতি ও দক্ষিণা দিবার মতো সামর্থ্য তোমার থাকে, তবেই যজ্ঞে ব্রতী হও, অন্যথা, শুধু মাতব্বরী ও হাততালির জন্য যেওনা। এই মস্ত কথাটা ছোট্ট একটী রেখাপাতে কবি সুন্দর ফলাইয়াছেন—"বল্লেন—তুমি চল্‌বে নিজের সখ অনুসারে আর আশ্রয়হীনারা চল্‌বে তোমার হুকুম অনুসারে; তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী। তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে, বুঝতে পার্‌বে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অভিভূত করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবী নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।" স্বরাজ-বিরাজ—সকল দলেরই কবির এই ঝঙ্কার কাণ প্যাতিয়া শোনা দরকার ও উচিত। স্বহস্তে বঙ্গভারতীর যে কমনীয় মাতৃমূর্ত্তি গড়িয়া কবি নিজের হাতে-গড়া কত সুন্দর সুন্দর সাজসজ্জায় তাঁহাকে সজ্জীভূত করিয়াছেন, এই "নামঞ্জুর"-মঞ্জীরে সেই মায়েরই পাদপদ্ম চিরদিন শোভা পাইবে।

চিঠি *—(পাদটীকায়)" * এই চিঠি গুলি রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন।" এ চিঠি গুলি না ছাপিলেই ভালো হইত। ইহাতে সাহিত্যের বা সমাজের কোনই উপকার হয় নাই, তবে ব্যবসায়ের

উপকার, মাসিক পত্রিকার উপকার খানিকটা হইতে পারে। তা 'সেজন্য কবিকে লইয়া " হাসেন-হোসেন " না করিলেই শোভন হইত। একটা কথা মনে প'লো। ৩০।৩৫ বছর পূর্ব্বে গোয়াড়ি হইতে কতগুলি নবদ্বীপযাত্রীর সহিত সেয়ারের নৌকায় নদেয় যাচ্ছিলাম। নৌকা নদের ঘাটে লাগলেই যাত্রীদের অনেকে তীরে নেমেই খানিক মাটি তুলে' নিয়ে, প্রথমত কিছু মাথায় ছুঁইয়ে অধঃকরণ করলো, পরে বাকিটা গায়ে মাখতে লাগলো। জিজ্ঞাসায় জবাব পেলাম, " এই মাটীর তৈরি খোলেই মহাপ্রভু কীর্ত্তন করেছিলেন, ইহা যে সেই 'শ্রীখোলের' মাটি। পরম পবিত্র বস্তু।"—ইত্যাদি মহাপ্রভুর খোল যে মাটীতে হইয়াছিল, সেই পার্থিব মৃত্তিকাকেও অপার্থিব ভাবিতে দেখিলে চোখ কট্ কট্ করে, চোখে লাগে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্লাঘা, ভারতের স্পর্দ্ধা ও জগতের আদরের পাত্র, সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার হাঁচিটি পর্য্যন্ত গ্রামোফোনের রেকর্ডে তুলিতে হইবে—এর মানে কি? ইহাতে বিশ্ববরেণ্য কবিকে খাটো করা হয়। মানুষ মানুষ, কতগুলি অনন্যসুলভ গুণ থাকিলেও একটা আস্ত-মানুষকে দেবতা করিয়া তোলা যায় না। সে চেষ্টাও সঙ্গত নহে। তাহাতে সেই মানুষে যাহা সত্য সত্য আছে, তাহাও খর্ব্বিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতন হইতে চারুবাবুকে কলিকাতায় চিঠি লিখিয়াছেন, সুতরাং শান্তি নিকেতন ডাকঘরের ছাপ চিঠিতে থাকবেই। সেই ডাকঘরের ছাপটাও প্রবাসীর মধ্যস্থ "চিঠি" তে তুলিয়া দেখানো হইয়াছে। কেন? এতটা গোড়ামোতে কবির যে ক্ষতি হইল, তাহার জন্য দায়ী কে? এই সবও যদি মানিয়া চলিতে হয়, তবে চৈতন্য মঠের সেই জীর্ণ শতছিদ্র "প্রভুর কাঁথা"র অপরাধ কি? তা' দেখে ত আর চোক্ বুজলে চলবে না।

সমাজ সঙ্গতি—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ইহা একটী চিন্তাপূর্ণ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ। এরূপ লেখা যত অধিক বাহির হয়, বর্ত্তমান সময়ে ততই মঙ্গল। অধুনা আমাদের সমাজের সর্ব্বাঙ্গ পুরাতন এবং নূতন-নূতন ব্যাধিতে পূর্ণ। সমাজে অনেক সময়ে আমরা ভালো করিতে যাইয়া মন্দ করিতেছি, চোর তাড়াইয়া ডাকাত পত্তন করিতেছি। এই ঘোর দুঃসময়ে, নরেশ বাবুর মত লোক চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন যে, প্রকৃত ব্যাধি, প্রকৃত ক্ষত কোন জায়গায়, বাহিরে কোনো চিহ্ন না দেখা গেলেও ভিতরে কিন্তু শোষ নালি হইয়া ক্যান্‌সার হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখনও সতর্ক হওয়ার সময় আছে।—তিনি সত্যই বলিয়াছেন,—

" সমাজ একটা কল নয়, একটা সজীব বস্তু। তার ভিতরকার প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যেমন নিয়ত আদান-প্রদানের সম্বন্ধ আছে, তেমনি বাহিরের জগতের ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সঙ্গেও আছে। এই বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রত্যেক অবস্থার প্রতিক্রিয়াই সমাজের জীবন।"

নরেশ বাবুর এ উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রবন্ধটি পড়িবার সময়ে স্বর্গীয় চিন্তাশীল ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সামাজিক প্রবন্ধাবলী মনে পড়ে।

সুদর্শন

পুস্তক পরিচয়

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী।—৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর প্রণীত। ৫ম সংস্করণ। মূল্য ১৲। ৩১৯ পৃষ্ঠা।

ছাপা ও কাগজ ভালো না হইলেও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। সুকবি প্রেমচন্দ্রের প্রসার বঙ্গের পণ্ডিত সম্প্রদায়ে এখনও প্রভূত। তবে অনেক অবান্তর গল্পে বইখানির কলেবর বৃদ্ধি না করিলেই ভালো হইত। গ্রন্থ শেষে প্রেমচন্দ্রের মধুমাখা অনেক সমস্যা পূরণ দেখিলে বুঝা যায় যে অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি কত বড় একজন পণ্ডিত ছিলেন। এখনকার কালে পণ্ডিতমহলে ওপাঠ উঠিয়া গিয়াছে। অধিকাংশই "অ্যাংলি ছাইজ্‌ড্‌"। বঙ্গের শ্লাঘার বস্তু প্রেমচন্দ্রের জীবনী বাঙ্গালী পাঠক যে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থের "পঞ্চম সংস্করণ"ই ঘোষণা করিতেছে।

রোগ ও আরোগ্য।—বৈদ্যরাজ শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত ভিষক্‌শাস্ত্রী প্রণীত—মূল্য চারি আনা। ৩২ পৃষ্ঠা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। আয়ুর্ব্বেদের কোথাও সম্পূর্ণ শ্লোক, কোথাও বা দুইপাদ বা একপাদ উল্লেখপূর্ব্বক তাহার ব্যাখ্যামুখে, এক টানে—বিরাট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আগুন্ত রেখাপাত। বইখানিতে সাধারণের কোনো উপকার না হইলেও, অভ্যাস রাখিলে লেখক কালে একজন গ্রন্থকার হইতে পারেন।

ফুলের ব্যথা।—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ছাপা ও কাগজ উত্তম। মূল্য ১৲। ১০০ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আমরা যে কবিতাগুলো প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি মাসিকের পাতায় এতদিন ধরে' ছড়িয়ে পড়েছিল তারি গুটিকত কুড়িয়ে নিয়ে 'ফুলের ব্যথা" গড়ে' উঠল। এদের সঙ্গে দু'চারটি নূতন অপ্রকাশিত কবিতাও অবশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে।" কবিতাগুলি বাছবার ভার নিয়েছিলেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকলের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, বার-এট্‌-ল।—"তিনিই এই বাছাই করে দিয়েছেন।" * * * সুতরাং কবির লেখার প্রায় সবটুকু পরিচয়ই পাওয়া গেল। কেননা, কোনোরূপ বাজে বা মেকি জিনিষ "বীরবলে'র অঙ্গুলী পেষণে টিঁকিতেই পারে না। সে বজ্রবাহু হইতে যখন হেমেন্দ্রবাবুর কবিতাসুন্দরী অব্যাহতি পাইয়াছেন, তখন তাঁহার অকালমরণ অন্ততঃ ঘটিবে না, বলা যাইতে পারে।

সুকবি হেমেন্দ্রলালের এই "ব্যথা" পড়িয়া প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়াছি। চিরন্তন একঘেয়ে কতগুলি বহুচর্চ্চিত ভাবের রোমন্থ করিয়া নবীন লেখক পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করেন নাই, প্রত্যুত অনেকস্থলে অনেক নূতন ভাব প্রকাশপূর্ব্বক পাঠককে প্রচুর আনন্দ দিয়াছেন। বইখানিতে মোট আটত্রিশটী কবিতা আছে—সবগুলিই উপভোগ্য। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্র দত্তের ন্যায় ইঁহার লেখায়ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রাণস্পর্শ করে, পাঠককে ভুলাইয়া লইয়া যায়। কবির "লক্ষ্মী পূর্ণিমা"র

"আয় ছুটে আয় মাঠের মাঝে, জেগে স্বপন দেখ্‌বি কে ?
হীরের গুঁড়া ঝর্‌ছে আজি—পা ফেলেছেন লক্ষ্মী যে।"

" খেয়াল শেষে "

" মোতির মালা আজ পরেছে ময়ূরকণ্ঠী গাছপালা,
আজ আঁধারের টুক্‌রো গুলোয় জোনাক পোকায় দীপজ্বালা।"

প্রভৃতি কবিতা পাঠের সময়ে বাংলার বড় শ্রাবার বড় আদরের লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত্রি চথের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে।

" দেহের মহিমা" র—

" তোমারে ধরেছি বলে' মনে করি যত
জানি তার বেশী খানি পড়ে নাই ধরা,
যেটুকু পেয়েছি তারি গর্ব্বে অবিরত
যে খানি পাইনি তারে মিছে মনে করা!"

এবং " সিন্ধুর মাতৃত্বে " আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া সিন্ধুমাতোরা বেলায় আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া কান্না ও

" দীর্ণ বক্ষ-বন্ধ টুটি ফোটে' আর্ত্তনাদ,
কহে—" দেহ ফিরাইয়া অভাগীর ধন,
সমুদ্র মন্থন এ তো নহে বিশ্বনাথ,
হায় এ যে কমনীয় অন্তর মন্থন।"
উন্মাদিনী বিবসনা উর্ম্মিবাহু তুলি,
তনীয়ে কাড়িতে চাহে হৃদয়ে কৌতুকে ;
নিস্ফল আবেগে শুধু দিগন্ত আকুলি'
আপনি ফিরিয়া আসে আপনার বুকে।
উর্দ্ধে গৃহহারা চন্দ্র পলক-বিহীন—
আর্ত্ত মাতৃ-অঙ্ক চাহি আড়ষ্ট-তুহিন।"

এবং " নদীর প্রতি সিন্ধু"র

আয় ওরে ব্যথাতুর, ওরে গৃহহারা
উপল-আহত-গতি তাপতপ্ত ধারা,
আমার অগাধ বুকে—অন্তরের মাঝে
যেখানে সকল রাগে সব ছন্দে বাজে,
সবার বেদনাগীতি সমবেদনায়,
নিভৃত-মধুর সেই বক্ষ মাঝে আয়।
যেথা হ'তে যতকিছু এনেছিস্ বয়ে'
যত দৈন্য, যত ক্লান্তি, গর্ব্ব-ভরে সয়ে'
মানবের যতগ্লানি, পশুর লাঞ্ছনা,
অভিশপ্ত ধরণীর যত আবর্জ্জনা,
সমস্ত নামায়ে রাখ নীরবে নির্ভয়ে
আমার বুকের পাশে নির্জ্জন নিলয়ে।"

প্রভৃতি কবিতাগুলি কবিহৃদয়ের ভাবোন্মাদনা সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এক কথায় "ফুলের ব্যথা" পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে পাঠকেরও প্রাণে ব্যথা লাগে, পাঠক বাষ্পদিগ্ধ নয়নে কবির উদ্দেশে আনত হন।

বিরক্তি-শঙ্কার, ইচ্ছাসত্ত্বেও আমরা আর উদ্ধৃত করিলাম না; কিন্তু পাঠককে অন্ততঃ "ফুলের ব্যাথা"র "খেয়াল" কবিতাটী পড়িতে অনুরোধ করি। আমরা অকপট হৃদয়ে বলিব—যে, এইরূপ খেয়াল বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

নিরক্ষরা। উপন্যাস। শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। "ব্রজধাম" মহেশপুর পোঃ (যশোহর) মূল্য দেড় টাকা। মহেশপুর স্বস্ত্যয়ন সাহিত্যমন্দির হইতে শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১০। ছাপা ও কাগজ চলনসই।

লেখক স্বয়ং বৈদ্যনাথ হইয়াও কেন যে বর্ত্তমান সময়ের সংক্রামক উপন্যাস লেখার রোগে আক্রান্ত হইলেন বুঝিলাম না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আদর্শে ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় "নিরক্ষরায়" মধ্যে মধ্যে কবিতাও উদ্গীরণ করিয়াছেন। তাহার কোনোস্থল উদ্ধার করিয়া পাঠকের অতৃপ্তি জন্মাইতে চাহিনা। তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুরোধ,—তাঁহারা যখন লেখার শক্তি আছে, তখন তাহার অপব্যবহার করিয়া—শ্রম ও অর্থের অযথা ক্ষয় করেন কেন? "নিরক্ষরা"র পরিবর্ত্তে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিতের "মিতাক্ষরায়" মণোনিবেশ করিলেই সঙ্গত হয়। এরূপ গ্রন্থ সাহিত্যের অঙ্গনের কোনো শোভাবর্দ্ধন করে না। তবে সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, গ্রন্থখানিতে একটী বিষয় দেখিবার মতো।

নাম—"নিরক্ষরা"

গ্রন্থকার—বৈদ্যনাথ, (কাব্যপুরাণতীর্থ ভট্টাচার্য্য)

জন্মস্থান—"ব্রজধাম"—মহেশপুর।

সূতিকাগৃহ—"স্বস্ত্যয়ন"-সাহিত্যমন্দির।

ষষ্ঠী—প্রকাশক ব্যোমকেশ (ভট্টাচার্য্য)

এইরূপ রাজযোটকের ফল যেমন হওয়া উচিত,—তেমনই হইয়াছে।

মৃদঙ্গ (কবিতাপুস্তক)—শ্রীযোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী প্রণীত, মূল্য বারো আনা। ছাপা ও কাগজ ভালো। ৭৫ পৃষ্ঠা। ১লা আশ্বিন, ১৩৩২। আলোচ্য গ্রন্থে ২৮টী কবিতা আছে।

লেখকের অতি সামান্য ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহার কবিতায় মুহূর্ত্তের জন্য পুলকিত হইতে হয়, ইহা কবিতার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। দেওয়ানজী মহাশয়ের কবিতায়ও স্থানে স্থানে আমরা আনন্দ অনুভব করিয়াছি। তবে এরূপ কবিতা যে সমালোচনায় কর্কশহস্তে পরিত্রাণ পাইবে না, তাহা গ্রন্থকর্ত্তা অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন, তাই তিনি মৃদঙ্গ-প্রিয় করুণাময়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিতেছেন—

"ধন্য হবে এ মৃদঙ্গের ধ্বনি পাইলে করুণা তব,
কি হইবে প্রভো! সমালোচনায়,
তুমি যদি এরে রাখ রাঙাপায়
রসহীন বোল হইবে সরস, অর্থ হইবে নব।"

সুতরাং "নব অর্থ"-লোলুপ ভক্তগণের ইহা অপাঠ্য নহে। লেখকের "জন্মভূমি" কবিতাটি পড়িতে পড়িতে মাসিক বসুমতীর কিছুকাল পূর্ব্বের "পাঁচশবছর পরে" কবিতাটি হুবহু মনে পড়ে। জানি না—কোন্‌টি আগের।

ছিটে-ফোঁটা

ডাক্তার ও রোগী

দাঁতে তোমার কিসের অসুখ? "সেটা হয়ত দাঁতের।"
ভারি ফক্কড়!—"কি জানি চাই কফ-পিত্ত-বাতের?"
বেব্‌সা নয় ক ইয়ার্কির, সময় আমার দামি।
"মশাই নেবেন্ ফিসের টাকা, নিদান বল্‌ব আমি?"

* * * *

ভদ্র ভিক্ষুক

ভদ্র—ডাক্তার বাবু! আপনাদের দেশেই আমাদের বাড়ী; অদৃষ্টের ফেরে এখন দেশ-ছাড়া —।

ডাক্তার—ভালই করেছেন; দেশে ভারি মেলেরিয়া—কালাজ্বর!

ভদ্র—দেশে যে সকলেই আছেন,—অর্থাৎ ছেলে-পিলে—

ডাক্তার—সেখানে থাকলে যে আপনার নিজের পেটেই পিলে হবে।

ভদ্র—আজ্ঞে, কথাটা এই, পেটে ভাত নাই —

ডাক্তার—ভাত খান্ না, সেটা খুব ভাল; বেরিবেরির আশঙ্কা নাই।

ভদ্র—আমার দুর্দ্দশার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।—

ডাক্তার—ওঃ! এখন সময় নাই, তিনটার সময় আসবেন; বাড়ীতে পরীক্ষা ও উপদেশের ফিস্ খুব অল্প,—সবে চার টাকা।

ভদ্র—আমার কথা এই,—অবস্থা বড় মন্দ, দু-এক টাকা ভিক্ষা চাই।—

ডাক্তার—বেশ কথা; দুটাকা রেহাই দিচ্ছি,—আপনি ফিসের হিসাবে দুটাকাই দিবেন।

* * * *

বুড়া ও উপদেষ্টা

বুড়া—আমার কি বিবাহ করা চলে না? লোকে বলে, এ বয়সে স্ত্রীনিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়।

উপদেষ্টা—এদেশে ত বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই; ছোট ছেলেরাও বিবাহের পর স্ত্রী নিয়ে ঘর করে না।

বুড়া—শিশুদের একটা ভবিষ্যৎ আছে, আর আমার স্ত্রী যদি বিধবা হ'ন্?

উপ—ভবিষ্যৎ আপনারও আছে,—যদি পরলোক না মানেন, তবুও আছে ; আর অন্য দিকে শিশুদের স্ত্রীর পক্ষেও বিধবা হওয়ায় মানা নাই।

বুড়া—তবে আর বিবাহে আমার লাভ কি ?

উপ—Love-এর হিসাবে এদেশে বিবাহ হওয়ার প্রথা নাই।

* * * *

রাজনীতি

তুর্কীদের ব্যবহারে জানা যায় যে, তাহারা "মোসলমান" থাকিতে চায় না ; এ অবস্থায় তুর্কীকে মোসল এলাকা দিলে তাহাকে জোর করিয়া "মোসলবান" অর্থাৎ "মোসলমান" করা হয়। এই জন্য লীগ্ সেরূপ অন্যায় কাজ করিবেন না।

তুর্কীরা বলিয়াছিলেন যে মোসল এলাকায় যে তেল পাওয়া যায়, তাহা ইংরেজেরাই পাইবেন। কিন্তু যত তেল দিলেও ইংরেজেরা অন্যায়ের পক্ষ হইবেন না। আবার অন্য দিকে তুর্কীরা দাবি হাসিলের জন্য দিতে চাহিবেন তেল, ও লীগ্ দিতে বসিয়াছেন তুর্কীর দাবির গায়ে জল ; তেলে জলে মিশ্ খায় না।

পৌষে

বিচ্ছিন্ন ভারত—যাঁহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া প্রভুতার আসন পাতিয়াছেন তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সারা দেশের লোক কিছুতেই এক প্রাণে এক লক্ষ্যে একত্র জুটিতে পারিব না। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও তাঁহারা মনে করেন যে, এখনও সেদিন বহুদূরে যেদিন এদেশের শিক্ষিতদের আদেশে ও ইঙ্গিতে অশিক্ষিত সাধারণ লোকেরা কোন ঝুঁকির কাজের দিকে পা বাড়াইবে। যখন আড়ির আন্দোলন খুব জাঁকিয়াছিল, তখন রাষ্ট্রপরিচালকেরা বহু রাজপুরুষের রিপোর্ট বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভূমিশূন্য শ্রমজীবিরা একটা অসম্ভব আশার কল্পনায় ক্ষণেকের জন্য উত্তেজিত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা নিজের জমি চষিয়া বা অন্য কোন স্থায়ী ধরণের উপার্জ্জনে সংসার চালায়, তাহারা ঐ আন্দোলনে মাতিবে না। যাহাতে ক্ষণিক উত্তেজনার উৎপাত কমে, রাষ্ট্র-পরিচালকেরা সেইরূপ ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। সুচতুর ও কর্ম্মদক্ষ ইউরোপীয় মহাজন সঙ্ঘের লোকেরা গবর্ণমেণ্টকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, এদেশের শিক্ষিত দলের নেতারা গোটাকতক হরতালে দোকান-পাট বন্ধ করাইয়া লোকসাধারণকে তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত করিতে পারিবেন না। তাঁহারা লোকের প্রকৃতি ধরিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, সরকারের আদালত ছাড়িয়া বেশী দিন হুজুগের জোরে লোকেরা বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইতে পারিবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশের শিক্ষিত লোকেদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখিয়া সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা কোন কাজ করিবে না, ইহাই ছিল মহাজনদের মন্তব্য। রাজপুরুষদের মধ্যেও কেহ কেহ রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, যাহারা গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী নাম পাইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই স্বদেশপ্রেমে মত্ত নয়,—তাঁহারা বে-রোজগারের দায়ে দেশের নামের ছুতা করিয়া চুরি-ডাকাতি করে, ও বোকা নেতারা তাহাদিগকে দেশ-হিতৈষী-ভাবিয়া আস্কারা দেন।

রাজপুরুষদের এই শেষোক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে সরকারের যে ধারণাই হউক না কেন, মহাজনদের মন্তব্য খুব পাকা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সম্প্রতি কালাজ্বর প্রতীকারের প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সরকারকে যাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে মহাজনদের অভিমতির মূল্য ও আদর বাড়িয়াছে। দেশের পীড়িত ও দুঃস্থ লোকেদের খাঁটি উপকারের জন্য ডাক্তারেরা দেশের বহুস্থানে ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়া চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কাজ এইজন্য ভাল হইতেছে না যে, দেশের যথার্থ হিতৈষীদের ডাকে পীড়িত লোকেরা কাছে আসিতেছে না। এখন সরকার বাহাদুরের আদেশে সরকারের তাঁবেদারেরা যদি পীড়িতদিগকে জুটাইয়া না দেয়, তবে এই অতি প্রয়োজনের কাজটি চলিতে পারিবে না বলিয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র সরকারের সাহায্য ও সহযোগ চাহিয়াছেন। আইনের সভায় এই ডাক্তার বিধানচন্দ্র স্বরাজ-সাধকদের একজন প্রতিনিধি, যাঁহারা সরকারের সঙ্গে সংশ্রব না রাখিয়া আত্ম-শক্তিতে দেশের লোককে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের একজন প্রতিনিধি। কাজেই এ উক্তিটি সরকার বাহাদুর বিশেষভাবে পুঁজি করিবেন।

ডাক্তার মহাশয়ের উক্তির ছল ধরিবার জন্য এ সমালোচনা নয়; আমাদের স্থায়ী উন্নতির জন্য (বিনা উত্তেজনায় ও বিনা আত্ম-প্রতারণায়) খাঁটি রকমে বুঝিবার প্রয়োজন যে আমাদের অবস্থাটি কি। যে মহাজনেরা অতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধানে লোক সাধারণের রুচি ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া সকলের মনের মত সামগ্রী বিলাতে তৈরি করিয়া এদেশে ঘরে ঘরে চালাইতেছেন, তাঁহাদের উক্তি উপেক্ষা করিবার নয়। আমাদের বিচ্ছিন্ন দেহ কি করিয়া জোড়া লাগিবে, কি করিয়া তাহাতে একই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা জিদ ও দলাদলির উত্তেজনা ছাড়িয়া ধীরতায় স্থির করিতে হইবে।

যেখানে রাজনীতি নাই, আছে ধর্ম্মপ্রচারের স্বার্থ, সেখানে ইউরোপীয় পাদ্রীরা কেন যে শিক্ষিত দেশী খৃষ্টানদের হাতে খৃষ্টান সমাজ গড়িবার ও বাড়াইবার ভার দেন না, তাহাও এ প্রসঙ্গে বুঝিতে চেষ্টা করা ভাল। দেশী পাদ্রীরা যত সুবোধ্য ভাষায় বাইবেল বুঝাইতে পারেন ইউরোপীয় পাদ্রীরা নিশ্চয় তাহা পারেন না, তবুও প্রচারের সকল ব্যবস্থার গোড়াটা ইউরোপীয়েরা আপনার মুঠায় রাখেন কেন? ইউরোপীয় পাদ্রীদের প্রথম বিশ্বাস, এদেশীয়েরা কোন ব্যবস্থাই সুনিয়ন্ত্রিত রাখিতে পারে না; এখানে সিবিল সরবিসের স্বার্থের কথা নাই, তবুও এইরূপ ধারণায় কাজ হইতেছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় পাদ্রীরা মনে করেন যে, ইউরোপীয়দের নামে এদেশীয়দের মোহ ও আকর্ষণ আছে, তাই তাঁহাদের কাছে তাঁহাদের সংস্পর্শ পাইবার ভাগ্যের জন্য লোকে বেশি আসিবে। শিক্ষিতদের মনের ভাব যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, আর ক্ষণিক উত্তেজনায় সাধারণ লোকে যাহাই বলুক বা করুক না কেন, লোকসাধারণের কাছে ইউরোপের নামের একটা দবদবাই আছে বলিয়া ইউরোপীয়দের বিশ্বাস। রাগে ও অভিমানে এ কথাগুলি উড়াইয়া দিলে আমরা আত্ম প্রতারিত হইব কিনা,—উপায় খুঁজিবার পথে বাধা হইবে কিনা, তাহা সুধীরা বিবেচনা করিবেন।

* * * *

নির্ব্বাসিতদের ভবিষ্যৎ—পার্লামেণ্টে যাঁহারা শ্রমসঙ্ঘের প্রতিনিধি, তাঁহারা নাকি এদেশের বিনা-বিচারে দণ্ডিত ১১০ জনের মুক্তির জন্য পার্লামেণ্ট সভায় প্রস্তাব তুলিবার উদ্যোগে আছেন। অনেকে আঁচিতেছেন যে এখন পার্লামেণ্টে যে রক্ষণশীলদের প্রভুতা, তাঁহারা এ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিবেন না। ভাবী বড়লাটকে তাঁহার নূতন পদ-গ্রহণের মুহূর্ত্তে এ

বিষয়ে আবেদন করিবার উদ্যোগের সংবাদও প্রচারিত হইয়াছে। ইচ্ছা মাত্রেই সরকার বাহাদুর কাহাকেও যে দাবাইয়া রাখিয়া শাসন চালাইতে পারেন ও অতি বড় লোকপূজ্য ব্যক্তিকেও যে অক্লেশে দণ্ডিত করিতে পারেন, ইহাত লোক সাধারণের কাছে যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে; তবে আর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে সরকার বাহাদুর শতাধিক লোককে বিড়ম্বিত করেন কেন? জনরবের প্রস্তাবগুলি উঠিবার আগেই নির্ব্বাসিতদের মুক্তি দিলেই অযথা তর্ক-বিতর্কের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

* * * *

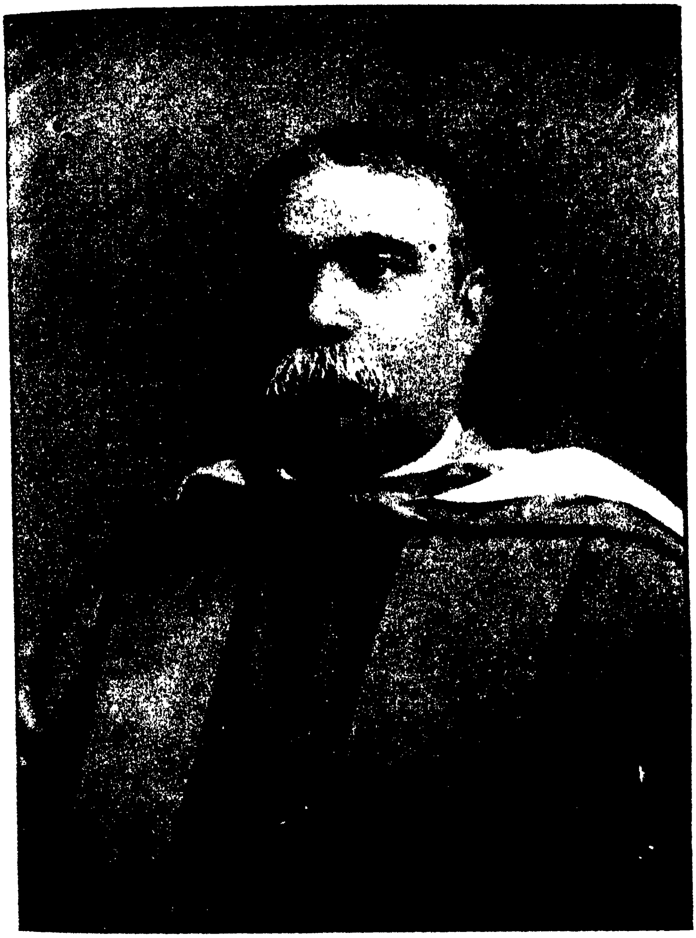
ব্যবস্থাপক সভার বিচার—সরকারি পক্ষ হইতে প্রস্তাব হইয়াছিল যে, রেলপথের প্রসার ও সুবিধার জন্য বালির নিকটে গঙ্গার উপরে যে পুল করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সরকারি তহবিল হইতে তাহার জন্য টাকা দেওয়া চাই। যাঁহারা রেলের অংশীদার তাঁহারা যখন রেলপথের আয় হইতে অনায়াসে পুলের টাকা তুলিতে পারিবেন ও অতিরিক্ত অনেক লাভ করিতে পারিবেন, তখন সরকারি তহবিলের টাকা কিছুতেই দেওয়া উচিত নয়; এই সুবিবেচনায় সরকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। এরূপ কথার সূত্র ধরিয়া যে সরকারের পক্ষ হইতে অসহযোগের নামে অভিযোগ উঠিতে পারে, তাহা আশ্চর্য্য। দ্বিত্বশাসন চালাইবার অনুকূলে স্বরাজের দলের লোকেরা ভোট দিবেন কিনা, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা; কো-অপারেসন্ অর্থে যখন ইহা হইতেই পারে না যে, যাহা কিছু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত হইবে তাহাই সকলে মাথা পাতিয়া লইবে, তখন উক্তবিধ প্রস্তাবের সম্পর্কে অসহযোগের খোঁটা দেওয়া কেন?

সমাজে যাহারা অবজ্ঞাত তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। দেশের যে শ্রেণীর লোকের জন্যই হউক না কেন, শিক্ষার জন্য যে উদ্যোগ হইবে তাহাই কল্যাণকর। তবে প্রাথমিক শিক্ষা কি পদ্ধতিতে দেওয়া উচিত, ও কি কি বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা বেসরকারি ভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচারে স্থির হওয়া উচিত, নহিলে বিস্ সাহেব প্রভৃতির পন্থা অনুসরণ করিলে সকল উদ্যোগ ও সকল ব্যয় নিষ্ফল হইবে।

* * * *

বিক্রমপুরে পুঁথি-সংগ্রহ—শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দাস সাহিত্যরত্ন লিখিয়াছেন যে তিনি ও তাঁহার সহযোগীরা ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে অনেক হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। একাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিতেছেন, সাহিত্য-পরিষৎ করিতেছেন ও তাহার উপর এইরূপ কয়েকটি সঙ্ঘে একাজ চলিতেছে। কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনের, তাই আমরা এই বিবরণ পাইয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু মনে হয় বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা স্থানে এই কাজ না চালাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কাজ করিলে ভাল হয়, কারণ প্রাচীন সাহিত্যের প্রামাণিকতা ধরিয়া সম্পাদন কার্য্য খুব সহজ নয়। যাহাই হউক, উদ্দিষ্ট উদ্যোগের পরিচালকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন সকল পুস্তকের পরিচয় দিয়া কেটেলগ্ প্রস্তুত করেন; তাহাতে অন্য স্থানের অনুসন্ধানকারীরা পুস্তকগুলি পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাইবেন, ও তাহাতে উপযুক্ত পুঁথি ছাপাইবার কাজ ভাল হইতে পারে। ইউরোপে ঠিক এই প্রথায় কাজ হইয়া থাকে।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.



সম্পাদক

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

কার্য্যালয়

৭৭ নং রসারোড নর্থ,

ভবানীপুর।

বার্ষিক ৪৸০ প্রতি সংখ্যা ।৶০



কৃষ্ণ ও গোপিণীগণ

পাটনা নিবাসী মিঃ পি, সি, মাণুক সাহেবের সংগৃহীত চিত্র

"রূপম"—সম্পাদক মিঃ অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলি মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

THE INDIAN ART SCHOOL
[illegible] BOWBAZAR STREET CALCUTTA

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ ১৩৩১-'৩২ | মাঘ | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ফরিদপুরের প্রাচীন তাম্রলিপি *

নদীমাতৃক ফরিদপুর জেলায় প্রাচীন কীর্ত্তি খুব বেশী নাই। এই জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের ভূমি উন্নত এবং নিকটবর্ত্তী পশ্চিমস্থ জেলাগুলির ভূমির সহিত অনেকটা সম-ভাবাপন্ন, দক্ষিণাংশ—কোটালিপাড়া প্রভৃতি—নিম্নভূমি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এই নিম্নভূমি হইতে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম বা মধ্য ফরিদপুর হইতে ততটা হয় নাই; হয় ত' আবিষ্কারের চেষ্টাও হয় নাই। দক্ষিণ ফরিদপুরে আবিষ্কৃত এই সকল নিদর্শন কেবল ফরিদপুরের নহে সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের সহিত জড়িত। ইহাতে খুব প্রাচীন কালের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় প্রাচীন নিম্ন বঙ্গের সেরূপ চিত্র আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

অনেকের মতে কোটালিপাড় বা কোটালিপাড়া চিরকাল এতটা নিম্নভূমি ছিল না। এক সময়ে অবশ্যই সমুদ্রজল-বিধৌত ছিল, কিন্তু উন্নত হওয়ার পর পুনরায় কোন নৈসর্গিক কারণে অবনমিত হইয়া গিয়াছে। ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে পূর্ব্ববঙ্গে সভ্যতার কেন্দ্র প্রথম কোটালিপাড়া, দ্বিতীয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার, তৃতীয় বিক্রমপুর।

* ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ—স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

প্রতীহারোপরিক (১৩) নাগদেবের অধিষ্ঠানকালে তাঁহা কর্তৃক বারকমণ্ডলবিষয়ে ব্যাপারকারণ্ডয় (১৪) (পদে) গোপালস্বামী অধিনিযুক্ত (আছেন)। ইহাঁর কার্য্যকালে বাসুদেব স্বামী জ্যেষ্ঠকায়স্থ (১৫) নয়সেন-প্রমুখ অধিকরণ-মহত্তর (১৬) ও সোমঘোষ-প্রমুখ বিষয়-মহত্তরদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে জানাইলেন—(আমি) "আপনাদের অনুগ্রহে আপনাদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্ষেত্রখণ্ড ক্রয় করতঃ মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য অভিবর্দ্ধনের জন্য কাণ্ব বাজসনেয় লৌহিত্যগোত্রীয় গুণবান্ ব্রাহ্মণ সোমস্বামীকে দান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমার নিবেদনমত ভূমিখণ্ড পৃথক্ করিয়া দিন।" এই প্রার্থনানুযায়ী—যেহেতু এই পূর্ব্বাঞ্চলে ক্রয় ব্যাপারে এক কুল্য-বপনোপযোগী ক্ষেত্রের চারি দীনার মূল্য এইরূপ হার নির্দ্দিষ্ট—বসুস্বামীর নিকট দুই দীনার গ্রহণ করিয়া (১৭)..............কুল্যবপনোপযোগী খিল ভূমি ও তদতিরিক্ত এক (১৮) প্রবর্ত্তবপনোপযোগী ভূমি...........পুস্তপাল জন্মভূতির অবধারণমত স্থির করত: শ্রীমান্ মহত্তর থোড়ের ক্ষেত্রখণ্ড হইতে...........বিশ্বাসী ও ধর্ম্মশীল শিবচন্দ্রের হস্তে ৮ ও ৯ নলের (মাপে) বিচ্ছিন্ন করিয়া বসুদেব ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিলাম, তিনিও ক্রয় করিলেন। এবং সীমার চিহ্ন এইরূপ :—পূর্ব্বদিকে সোগের (?) তাম্রপট্টের সীমা, (দক্ষিণে) প্রাচীন পট্টুকি ও পর্কটী বৃক্ষের (১৯) সীমা, পশ্চিমে গোরথ্য (২০) (?) এবং নৌদণ্ডক (২১) সীমা, উত্তরে গর্গস্বামীর তাম্রপট্টের জমীর সীমা। এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোক আছে—ভূমিদ ষষ্টিসহস্র বৎসর স্বর্গে আনন্দে থাকেন, আক্ষেপকারী (২২) ও তাহার অনুমন্তা (২৩) ততকাল

(১৩) মহাপ্রতীহার—পার্জিটার সাহেব ইহার অর্থ Chief warder of the gate করিয়াছেন, রাখাল বাবু বলেন মহাপ্রতীহার আরও বড়দরের কর্ম্মচারী ছিলেন, অনুবাদ "Chief or Prefect of the guards" হওয়া উচিত (J. A. S. B vol X); বোধ হয় ইহার অর্থ সীমান্তরক্ষীদের প্রধান। উপরিক—উপরিস্থ কর্ম্মচারী, শাসনকর্ত্তা।

(১৪) ব্যাপারকারণ্ডয়—পার্জিটার সাহেব ইহার অর্থ Customs officer করিয়াছেন, বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ বলাই অধিকতর সঙ্গত।

(১৫) জ্যেষ্ঠকায়স্থ—প্রবন্ধের শেষাংশে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১৬) অধিকরণ-মহত্তর—রাজকার্য্যপরিচালন-সমিতির সভাসদ।

(১৭) স্থানে স্থানে তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই, এই সকল স্থানে.........দেওয়া গেল।

(১৮) প্রবর্ত্ত—কথাটা ঠিক পড়া গিয়াছে কি না সন্দেহ, জমীর পরিমাণ বিশেষ।

(১৯) পট্টুকি—সম্ভবতঃ সুপারিগাছ, পর্কটী—পাকুড় গাছ।

(২০) গোরথ্য—ইহার পরবর্ত্তী অংশ তাম্রফলকে অস্পষ্ট, গোপথ বা গোগাড়ীর পথ উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

(২১) নৌদণ্ডক—নৌকার বা জাহাজের মাস্তল। সম্ভবতঃ কোন মাস্তল মাটীতে পোতা ছিল।

(২২) আক্ষেপ্তা বা আক্ষেপকারী—হরণকারী

(২৩) অনুমন্তা——অনুমতিদাতা।

নরকে বাস করে। যে স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ পচিতে থাকে।

৩। গোপচন্দ্রের সময়ের তাম্রলিপি—*

(বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণের মোহর)

স্বস্তি। এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ধৃতিতে যযাতি ও অম্বরীষের তুল্য, মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্র ভট্টারকের রাজ্যে (তাঁহার অনুগ্রহে) লব্ধগৌরব নব্যাবকাশিকায় মহাপ্রতীহার ও বাণিজ্যব্যাপারপরিচালনার প্রধান অমাত্য উপরিক নাগদেবের অধিষ্ঠান-কালে, যখন তিনি কার্য্য পরিচালনায় ছিলেন, বারুকমণ্ডলবিষয়ব্যাপারে (২৪) বিনিযুক্ত বৎসপালস্বামী জ্যেষ্ঠকায়স্থনয়সেন-প্রমুখ অধিকরণমহত্তর ও বিষয়কুণ্ড..........ঘোষচন্দ্র, অনাচার, রাজ্য ....প্রমুখ বিষয়মহত্তর ও প্রধান ব্যবসায়ীদিগকে (?)...........যথাযথ রূপে জানাইলেন "আপনাদিগের অনুগ্রহে...... মহাকোট্টিকনামা.........কুল্যবপনোপযোগী ক্ষেত্র উপযুক্ত মূল্যে মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য অভিবর্দ্ধনের জন্য ক্রয় করিয়া গুণবান্ কাণ্ব (?) বাজসনেয় লৌহিত্য (ভ) ট্ট গোমিদত্তস্বামীকে দান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনারা ভরদ্বাজগোত্রীয় আমা হইতে (২৫) মূল্য গ্রহণ করিয়া ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া দিন (?)। এই প্রার্থনানুযায়ী—যেহেতু পূর্ব্বদেশীয় ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে প্রতিকুল্য-বপনোপযোগী ভূমির বিক্রয়-মূল্য চারি দীনার—পুস্তপাল নয়ভূতির তিন স্থলে নির্দ্দেশক্রমে বিষয়াধিকরণ কর্ত্তৃক অধিকরণের লোককে কুলবার (২৬) সাব্যস্ত করিয়া বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মশীল শিবচন্দ্রের হস্তে আট ও নয় নল (হিসাবে) বৎসপালস্বামীকে এক কুল্য-বপনোপযোগী ক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করা হইল। ইনিও ক্রয় করিয়া বিধিপূর্ব্বক ভট্ট গোমিদত্ত স্বামীকে পুত্রপৌত্রক্রমে দান করিলেন—এবং সীমার চিহ্ন এইরূপ :—পূর্ব্বদিকে ধ্রুবিলাটি অগ্রহারের (২৭) সীমা, দক্ষিণে করঙ্ক, (২৮) পশ্চিমে শিলাকুণ্ড গ্রামের সীমা, উত্তরে

* এই তাম্রলিপিতে লিপিকর-প্রমাদ অনেক।

(২৪) বিষয়ব্যাপারে—বিষয়ের বাণিজ্য-বিভাগে।

(২৫) পার্জ্জিটার সাহেব বলেন " ভরদ্বাজ গোত্রীয় আপনারা "। তিনি যেরূপ পড়িয়াছেন তাহাতে ঐরূপ অর্থই হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ যাহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন তাহারা সকলেই ভরদ্বাজগোত্রীয় একথাটাও কেমন কেমন লাগে। তাহাদিগের গোত্রের পরিচয় অপেক্ষা ভূমিদাতা ব্রাহ্মণের গোত্রের পরিচয় বোধ হয় অধিক প্রাসঙ্গিক। তাম্রলিপির অবোধ্যতাই পার্জ্জিটার সাহেবের ঐরূপ পাঠোদ্ধারের কারণ বলিয়া মনে হয়।

(২৬) কুলবার—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে "Chief men of the Public", পার্জ্জিটার সাহেবের মতে arbitratry বা reference, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু 'কুলীন' অর্থ করিয়াছেন ; মূল অর্থ যাহাই হউক ইঁহারা সালিস বা মধ্যস্থের ন্যায় কাজ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

(২৭) অগ্রহার—রাজদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি।

(২৮) করঙ্ক—স্থান বিশেষ।

করঙ্কের সীমা। যে স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিতে থাকে। সম্বৎ ১৯

৪। সমাচারদেবের আমলের তাম্রফলক—

স্বস্তি। এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ধৃতিতে নৃগ, নহুষ, যযাতি ও অম্বরীষের তুল্য, মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবের প্রতাপযুক্ত রাজত্বকালে তাঁহার চরণকমলযুগল আরাধনা করিয়া নব্যাবকাশিকায় সুবর্ণবীথ্যাধিকারী (২৯) অন্তরঙ্গ উপরিক জীবদত্ত এবং তাঁহার (জীবদত্তের) অনুমোদনক্রমে বারকমণ্ডলে পবিত্রক বিষয়পতি (ছিলেন)। যেহেতু ইঁহার কার্য্যকালে সুপ্রতীক স্বামী জ্যেষ্ঠাধিকরণিক (৩০) দামুক প্রমুখ অধিকরণ এবং বিষয়-মহত্তর বৎসকুণ্ড, মহত্তর শুচিপালিত, মহত্তর বিহিত ঘোষ, শূরদত্ত, মহত্তর প্রিয়দত্ত, মহত্তর জনার্দ্দনকুণ্ড প্রভৃতিকে এবং অন্য অনেক প্রধান ও অন্যান্য ব্যবহারজ্ঞ লোককে এইরূপ জানাইলেন, আমি আপনাদের অনুগ্রহে দীর্ঘকাল অবসন্ন পতিত ভূমিখণ্ড বলিচরুসত্র প্রবর্ত্তনের (৩১) জন্য ও ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য ইচ্ছা করি, আপনারা তাম্রপত্র দ্বারা এই অনুগ্রহ করুন," তজ্জন্য উপরিলিখিত ব্যক্তিগণ ও অন্যান্য ব্যবহারজ্ঞ লোক এই প্রার্থনা শুনিয়া এবং গহ্বরযুক্ত শ্বাপদ-সেবিত ভূমি রাজার ধর্ম্ম ও অর্থের পক্ষে নিষ্ফল, আর যে ভূমি ভোগ্যীকৃত তাহা রাজার অর্থ ও ধর্ম্মজনক ইহা স্মরণ করিয়া উহা এই ব্রাহ্মণকে দেওয়া হউক এইরূপ স্থির করতঃ করণিক (৩২) নয়নাগ প্রভৃতিকে কুলবার সাব্যস্থ করিয়া পূর্ব্বে তাম্রপট্টীকৃত তিনকুল্যবপনোপযোগী ক্ষেত্র পৃথক্ করিয়া ব্যাঘ্রচোরকের অবশিষ্ট চতুঃসীমার চিহ্ন নির্দ্দেশ করতঃ সুপ্রতীক স্বামীকে তাম্রপট্ট দ্বারা অর্পণ করিলেন এবং ইহার সীমার চিহ্ন এইরূপ:—

পূর্ব্বে পিশাচপর্কটী, দক্ষিণে বিদ্যাধরজোটিকা, পশ্চিমে চন্দ্রবর্ম্মার কোটের কোণ, উত্তরে গোপেন্দ্রচোরক গ্রামের সীমা ইতি। এবিষয়ে শ্লোক আছে—ভূমিদ ষষ্টি সহস্র বর্ষ স্বর্গে আনন্দে থাকেন, আক্ষেপকারী এবং তাহার অনুমতিদাতা ততকাল নরকে বাস করে; যে স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ পচিতে থাকে॥ সম্বৎ ১৪ কার্ত্তি দি ২॥

এই সকল লিপি পুরাবিৎগণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর মনে করেন। রাখালবাবু বলেন এগুলি কূটশাসন অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালের জাল কিন্তু সে পরবর্ত্তীকালও প্রাচীন কাল। পার্জিটার সাহেব প্রমুখ অনেকেই কিন্তু এগুলিকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। * রাখালবাবুর বিরুদ্ধ

(২৯) সুবর্ণবীথ্যাধিকারী—সোণারূপার বাজারের অধ্যক্ষ (কোষাধ্যক্ষ ও হইতে পারে)।

(৩০) জ্যেষ্ঠাধিকরণিক—রাজ-কার্য্যপরিচালন সমিতির প্রধান সভাসদ।

(৩১) বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তন—গার্হস্থ্যজীবন পরিচালন।

(৩২) করণিক—লেখক বা পাত্র।

* ১৯১০, ১৯১১, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে বাদপ্রতিবাদ দ্রষ্টব্য।

যুক্তের একটী প্রধান যুক্তি বিভিন্ন শতাব্দীর প্রচলিত অক্ষরের একত্র সমাবেশ। পার্জিটার সাহেব এই যুক্তির অনেকটা খণ্ডন করিয়াছেন, দিনাজপুর জেলার দামোদরপুরে আবিষ্কৃত গুপ্ত-আমলের তাম্রলিপি রাখালবাবুর যুক্তিকে আরও দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। দামোদরপুরে যে পাঁচটী লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পাঠোদ্ধারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন রাখাল বাবুর মত এখন আর কিছুতেই টিকিতে পারে না, পার্জিটার সাহেবকেই মানিয়া লইতে হইবে, ফরিদপুরের তাম্রলিপিগুলি সম্পূর্ণ খাঁটি। *

তাম্রলিপিগুলি যে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী কালের ধ্বংসকারী শক্তি। তাহা দ্বারা এগুলি কূটশাসন প্রতিপন্ন হয় না। এগুলি যে রাজদত্ত শাসন নহে তাহাও এগুলিকে জাল প্রতিপন্ন করার পক্ষে অনুকূল প্রমাণ হইতে পারে না। লোকে জাল করিতে গেলে প্রাচীন প্রথানুযায়ী দলীলের নকল করিয়া থাকে, এগুলি সেরকম নকল নহে। তাম্রলিপিগুলির এমন একটু বিশেষত্ব আছে যাহা দলীলের অকৃত্রিমত্ব দেখাইয়া দেয়। আবার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে সমাচারদেব নামে বাস্তবিকই এক প্রাচীন রাজা ছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত একটী মুদ্রা যশোহর জেলার মহম্মদপুরের নিকট অরুণখালি নদীর তীরে পাওয়া গিয়াছে, আরও একটী মুদ্রা অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। † রাখালবাবু যে পরবর্ত্তী সময়ের কথা বলেন সে সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে সমাচারদেবের নাম ভুলিয়া যাওয়ার কথা। কোন প্রকৃত অথচ অজ্ঞাতনামা রাজার নাম তাম্রফলকে কেমন করিয়া আসিবে? অক্ষরও দেশের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নরকম হইতে পারে। যিনি কোন প্রাচীন দলীলকে জাল বলেন, প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। রাখালবাবু যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন অক্ষর-তত্ত্বজ্ঞ অনেকেই যখন সে প্রমাণ মানিতেছেন না তখন পার্জিটার সাহেবের মতেরই আমরা অনুসরণ করিতে বাধ্য।

পার্জিটার সাহেব ডাঃ হর্ণলীর মত গ্রহণ করতঃ মনে করেন তাম্রফলকের 'ধর্ম্মাদিত্য' বঙ্গবিজেতা রাজা যশোধর্ম্মদেবের নামান্তর। যশোধর্ম্মদেবের শাসন বাঙ্গলায় ৫২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু 'ধর্ম্মাদিত্য' যে যশোধর্ম্মদেবের বিরুদ বা উপাধিবিশেষ এমন কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা ধর্ম্মাদিত্যকে যশোধর্ম্মদেব বলিয়া গ্রহণ করিতে অপারগ। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ধর্ম্মাদিত্যকে যশোধর্ম্মদেবের পরবর্ত্তী কোন রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে ধর্ম্মাদিত্য যশোধর্ম্মদেবের সমসাময়িক বা

* Epig. Indica, vol XV.

† Dacca Review 1920 3 J. A. S. B. 1923

অত্যল্প কাল-পরবর্ত্তী।* প্রসিদ্ধ গুপ্তবংশীয় নৃপতিদের অনেকের 'আদিত্য' শব্দযুক্ত নামান্তর ছিল। খুব সম্ভব ধর্ম্মাদিত্যও এই গুপ্তবংশীয় ছিলেন। আলোচ্য তাম্রলিপিগুলি হইতে জানা যায় ইঁহার প্রথমখানি তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে উৎকীর্ণ, দ্বিতীয়খানি কোন বৎসরে তাহার উল্লেখ নাই। পার্জিটার সাহেব অক্ষর ধরিয়া এবং তাম্রলিপিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম ধরিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ধর্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রলিপি সময়ের হিসাবে প্রথম, তাঁহার আমলের অপরখানি দ্বিতীয় এবং গোপচন্দ্রের আমলের খানা তৃতীয়। অক্ষর হিসাবে ৩০।৩৫ বৎসরের পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক করিতে যাওয়া আমি দুঃসাহসিকতা মনে করি। তবে দেখা যাইতেছে শেষোক্ত দুইখানিতেই উপরিক নাগদেব এবং জ্যেষ্ঠকায়স্থ নয়সেন আছেন সুতরাং এই দুইখানির মধ্যবর্ত্তী সময়ে অপরখানি স্থান পাইতে পারে না; সে খানির স্থান হয় ইহাদের পূর্ব্বে, নয় ত পরে। যাঁহার হস্তে জমির মাপ হইতেছে সেই শিবচন্দ্র তিনখানিতেই আছেন, কিন্তু ধর্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে খোদিত তাম্রলিপির সময়ে তিনি শুধুই শিবচন্দ্র, অপর দুইখানির সময়ে 'বিশস্ত' ও 'ধর্ম্মশীল' শিবচন্দ্র। এই গৌরব লাভ করিতে তাঁহার আবশ্যই সময় লাগিয়াছিল, সুতরাং ধর্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের তাম্রলিপিই প্রাচীনতম এবং গোপচন্দ্রের আমলের খানা তৃতীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন কথা হইতেছে সমাচার দেবের সময়ের। পার্জিটার সাহেব ইঁহাকে তাম্রলিপির অক্ষর বিচারে ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের পরবর্ত্তী রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনার পর এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন; সুতরাং অন্য বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই মতই গ্রহণ করিলাম।

ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যকালের পরিমাণ সম্বন্ধেও পার্জিটার সাহেব অনেকটা যুক্তিযুক্ত প্রণালীতে একটী মত দাঁড় করাইয়াছেন। তৃতীয় তাম্রলিপিখানি গোপচন্দ্রের রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে উৎকীর্ণ। শিবচন্দ্রের যখন প্রথম চাকরী তখন তাঁহার বয়স ১৮ এবং তৃতীয় তাম্রফলকের সময়ে তাঁহার বয়স ৭০ ধরিয়া লইলে প্রথম ও তৃতীয় তাম্রলিপির সময়ের ব্যবধান ৫২ বৎসরের অধিক দাঁড়ায় না। প্রথম তাম্রলিপি ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে খোদিত সুতরাং ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে গোপচন্দ্রের আমলের তাম্রলিপির ব্যবধান বড় জোর ৫৫ বৎসর,† খুব সম্ভবতঃ আরও কম। অনাচার ও ঘোষচন্দ্র নামক দুইজন মহত্তরের নাম আবার প্রথম ও তৃতীয় তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগেরও 'মহত্তর' পদবী লাভে অবশ্য কিছু সময় লাগিয়াছিল। যাহা হউক উভয় তাম্রলিপির ব্যবধান ৫২ বৎসর ধরিয়া লইলে এবং তাহা হইতে গোপচন্দ্রের রাজত্বের ১৮ কি ১৯ বৎসর বাদ দিলে আমরা ধর্ম্মাদিত্যের রাজত্বকাল ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩৬ কি ৩৭

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড ৪০ পৃঃ

† পার্জিটার সাহেব শিবচন্দ্রের বয়স এই দুই লিপির সময়ে যথাক্রমে ১৮ ও ৭০ বৎসর ধরিয়া পরে কেমন করিয়া দুই তাম্রলিপির সময়ের ব্যবধান ৫৫ বৎসর করিলেন তাহা বোঝা যায় না।

বৎসর পাই। * পার্জিটার সাহেব আরও মনে করেন দ্বিতীয় তাম্রলিপির মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান প্রথম ও দ্বিতীয় তাম্রলিপির মধ্যে ব্যবধান তাহা অপেক্ষা বেশী। তাঁহার এইরূপ অনুমানের প্রথম কারণ—দ্বিতীয় তাম্রলিপির সময়ে যখন শিবচন্দ্র "বিশ্বস্ত" ও "ধর্ম্মশীল" আখ্যা পাইয়াছেন তখন তাঁহার চাকরী অবশ্য অনেকদিনের হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় কারণ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় তাম্রলিপিতেই নয়সেন জ্যেষ্ঠ কায়স্থ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কায়স্থ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রাচীন ব্যক্তি আর কত কালই বা কর্ম্মজগতে থাকিতে পারে? এই মতের সারবত্তা কিন্তু আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রথমতঃ 'বিশ্বস্ত' ও 'ধর্ম্মশীল' বিশেষণ অর্জ্জন করিতে অবশ্য কিছু সময় লাগে, কিন্তু এই অর্জ্জনে যতকাল লাগে অর্জ্জনের পর লোকটী যে আরও তত কাল কর্ম্মজগতে থাকিতে পারে না এ কথা স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, "জ্যেষ্ঠ কায়স্থ" শব্দ জাতিবাচক বলিয়া আমার মোটেই মনে হয় না। সে সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

পার্জিটার সাহেব ধর্ম্মাদিত্যকে যশোধর্ম্মদেবের সহিত অভিন্ন ধরিয়া লইয়া তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষ অর্থাৎ প্রথম তাম্রলিপির সময় ৫৩১ খৃষ্টাব্দ মনে করিয়াছেন এবং ৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বের শেষ ও গোপচন্দ্রের রাজত্বের আরম্ভ অনুমান করিয়াছেন। নলিনী বাবু খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া ধর্ম্মাদিত্যের সময় ৫৫০—৫৬৫ খৃষ্টাব্দ (হয়ত ৫৫০ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে) এবং গোপচন্দ্রের সময় ৫৬৫—৫৮৫ খৃষ্টাব্দ অনুমান করেন। তাঁহার মতে আমাদের চতুর্থ তাম্রফলকে উল্লিখিত সমাচার দেবের সময় অনুমান ৫৮৫—৬০২ খৃষ্টাব্দ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি দুইটী সুবর্ণমুদ্রায় সমাচারদেবের নাম পড়িতে পারিয়াছেন। ইহার একটী কোথায় পাওয়া গিয়াছে জানা যায় না,—মুদ্রাটীতে রাজার ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি, তাঁহার মস্তকের চারিদিকে জ্যোতিঃ, বামদিকে কোঁকড়ান চুল, তিনি নিজের দক্ষিণদিকে চাহিয়া আছেন, গলায় সুবর্ণের অথবা মুক্তার মালা, বামহস্তে ধনুক, দক্ষিণহস্তে দেবতাকে গন্ধদ্রব্য দিতেছেন, রাজার দক্ষিণদিকে একটী বৃষলাঞ্ছিত পতাকা। মুদ্রার বিপরীত দিকে একটী পদ্মাসনা দেবীমূর্ত্তি, বামদিকে লেখা 'নরেন্দ্র বিনত,' লেখাটী অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর মুদ্রা অরুণখালি নদীর তীরে অন্যান্য মুদ্রার সহিত প্রাপ্ত; এই অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে একটী শশাঙ্ক রাজার সুবর্ণমুদ্রা, একটী গুপ্তরাজাদের নকল সুবর্ণমুদ্রা, আর কয়েকটী গুপ্ত-রাজগণের রজতমুদ্রা। সমাচার রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রায় রাজা আসনে উপবিষ্ট, বামে ও দক্ষিণে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি। বিপরীত দিকে পদ্মাসনে সরস্বতীমূর্ত্তি, নীচে হংস, বামধারে 'নরেন্দ্রবিনত' লেখা। নলিনী বাবু মনে করেন অক্ষর হিসাবে সমাচার দেব কর্ণসুবর্ণপতি বৃষভলাঞ্ছন শশাঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি লিখিয়াছেন ইহা একরূপ নিশ্চয় যে ইঁহারা একই বংশীয়, সমাচারদেব

* পার্জিটার সাহেব হিসাবের ভুলে ৪০ বৎসর ধরিয়াছেন।

শশাঙ্কের পিতাও হইতে পারেন। এত সহজে পিতৃত্বের আরোপ আমাদের সাহসে কুলায় না, তবে সমাচারদেব শশাঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী ও একবংশীয় হইতে পারেন মনে হয়। পার্জিটার সাহেব তাঁহাকে ব্রাহ্মণ রাজা অনুমান করিয়াছেন কিন্তু এই অনুমানের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। শশাঙ্কের বহু সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যের আরম্ভকাল খৃঃ ৬০২ খৃষ্টাব্দ ধরিলে তাহার পূর্ব্বেই সমাচারদেবের রাজত্ব ধরিতে হয়। পার্জিটার সাহেব সমাচারদেবের রাজত্বের আরম্ভ ৬০১—৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করিয়াছেন কিন্তু নলিনী বাবুর হস্তে সময় বিচারের উপকরণ অধিক ছিল। নলিনী বাবুর মতই এস্থলে অধিক প্রামাণ্য তবে সামান্য উপকরণের উপর ঠিক বৎসরটীর হিসাব করা বড় কঠিন, মোটামুটি আমরা তিনটী রাজাকেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ধরিয়া লইতে পারি।

গোপচন্দ্র কোন্ বংশীয় ছিলেন এবং কেমন করিয়া ধর্ম্মাদিত্যের স্থান অধিকার করিলেন তাঁহা অনুমান করিবারও উপযুক্ত উপকরণ নাই। ডাঃ হর্ণলী অনুমান করেন ইনি ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র অভিন্ন।* পার্জিটার সাহেব এই মত অনুসরণ করতঃ বলেন যে তাহা হইলে ইনি গুপ্তবংশীয় রাজা হইতে পারেন। কিন্তু এই মত অসার। ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র যে ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়ের চন্দ্রবংশীয় এবং সম্ভবতঃ বহু পরবর্ত্তী রাজা স্থানান্তরে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।† রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের দেববংশের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "আমাদের মনে হয় যে, ধর্ম্মাদিত্য গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব এই তিন জনেই কাণসোণা সমাজস্থ ঐরূপ কোন দেববংশ হইবেন।" ‡ ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র, ইতিহাসে এরূপ প্রমাণশূন্য অনুমানের মূল্য নাই।

প্রথম তাম্রলিপির ভূমি ছিল ধ্রুবিলাটি গ্রামে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রলিপিতে কোন গ্রামের উল্লেখ ছিল কিনা বলা যায় না, কারণ সকল অংশ পড়া যায় নাই। চতুর্থ তাম্রলিপিতে গ্রামের নাম 'ব্যাঘ্রচোরক'। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ তাম্রলিপিতে দত্ত ভূমির যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় বর্ত্তমান কালেও তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নলিনী বাবু স্থানীয় অনুসন্ধানের পর চতুর্থ তাম্রলিপির ভূমি নির্দ্দেশ করতঃ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের Dacca Review পত্রে উহার একখানা মানচিত্র দিয়াছেন। তাম্রলিপিতে যে চন্দ্রবর্ম্মার কোট বা দুর্গের উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই স্থানের মোটামুটি পরিচয় খুব সহজ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এই কোট এখনও বর্ত্তমান। কোটালিপাড়ায় এরূপ কোট একটাই আছে। দিল্লীর নিকট মেহেরৌলীর লৌহস্তম্ভে যে চন্দ্ররাজার কীর্ত্তি

* Indian Antiquary 1910, P. 208

† কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "গোপীচন্দ্র" গ্রন্থের ভূমিকা

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড,

লিপিবদ্ধ আছে, এই কোট বা দুর্গ খুব সম্ভবতঃ তাঁহার। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভে লিখিত বিবরণ হইতে পাওয়া যায়, তিনি বঙ্গদেশে যুদ্ধকালে সমবেত শত্রুগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে অনেক স্থানে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এতটা বিস্তৃত দুর্গের চিহ্ন বাঙ্গালায় আর কোথাও নাই। এই কোট হইতেই "কোটালিপাড়া" নামের উৎপত্তি। 'কোটালিপাড়া' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিত। 'কোটাল' শব্দ হইতে কেহ ইহার ব্যুৎপত্তি সমাধা করিতেন, কেহ বা সফি খাঁ নামক এক কোটালের নামের সহিত 'কোটালিপাড়া' মিলাইয়া দিতেন। কিন্তু এই তাম্রলিপি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে নামটী অতি প্রাচীন। যে চন্দ্ররাজার কোট হইতে কোটালিপাড়া নামের উৎপত্তি ধরা হইল, তাঁহার সময় খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমভাগ। এই কোটের পশ্চিম প্রাকারের উপরিভাগের বিস্তার এখন প্রায় ৫০০ ফিট্; উপরে সমৃদ্ধ গ্রাম, নীচে পরিখার দেহাবশেষ। নলিনী বাবু মনে করেন এই কোটের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সুপ্রতীক স্বামীর ভূমির অবস্থান ছিল। উত্তরে যে গোপেন্দ্রচোরক গ্রামের উল্লেখ আছে তাঁহার মতে উহা বর্ত্তমান গোবিন্দপুর গ্রাম। গোপেন্দ্র ও গোবিন্দ দুইই শ্রীকৃষ্ণের নাম। উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে প্রায় ½ মাইল উত্তরপশ্চিমে বিদ্যাধর বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের ও তাহার স্ত্রী জটিয়াবুড়ীর বাসস্থানের প্রবাদ আছে। ইহার উত্তরদিকে দুইটী সমান্তরাল রাস্তা পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে গিয়াছে। একটী রাজার, অপরটী প্রজাদের চলিবার জন্য—এইরূপ প্রবাদ। নলিনী বাবুর মতে এই রাস্তা দুইটীই তাম্রলিপিতে উক্ত 'বিদ্যাধর জোটিকা'। পূর্ব্বদিকে যে পিশাচপর্কটী বা ভূতে পাওয়া পাকুড় গাছ ছিল, তাহার অবশ্য সরেজমিন তদন্তে কোন সন্ধান হয় নাই; কিন্তু ইহারও আনুমানিক স্থান নলিনী বাবুর মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পার্জ্জিটার সাহেব চোরক শব্দের চর অর্থ করিয়া, 'ব্যাঘ্রচোরক' ও 'গোপেন্দ্রচোরক' নদী হইতে নূতন উত্থিত স্থান মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্থানীয় তদন্ত করেন নাই। চোরক শব্দের অর্থ যাহাই হউক, চর বলিয়া মনে হয় না। এই স্থানের অব্যবহিত নিকটে যে কোন বড় নদী ছিল এমন দেখা যায় না।

প্রথম ও তৃতীয় তাম্রফলকে যে ধ্রুবিলাটি গ্রামের উল্লেখ আছে তাহার এপর্য্যন্ত কোন সন্ধান হয় নাই, * তবে এই দুই তাম্রফলকে পশ্চিম সীমায় যথাক্রমে যে শিলাকুণ্ড ও শিলাকুণ্ড গ্রামের নাম পাওয়া যায়,—তাহা যে বর্ত্তমান শৈলদহ নদী ও শৈলদহ গ্রাম তাহা

* পার্জ্জিটার সাহেব মানচিত্র খুঁজিয়া ধুলটগ্রাম বাহির করিয়াছেন এবং ধ্রুবিলাটের অপভ্রংশে ধুলট হইতে পারে লিখিয়াছেন। কিন্তু ধুলট দক্ষিণ ফরিদপুরের ধারে কাছেও নয়। তাম্রলিপির ধ্রুবিলাটি বর্ত্তমান ধুলট হইতে পারে না।

নলিনী বাবু সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। শৈলদহ কোটালিপাড়ার দক্ষিণদিকে, এক্ষণে বাখরগঞ্জ জেলাভুক্ত। করঙ্কগ্রাম কোথায় ছিল তাহা স্থির হয় নাই।

প্রথম তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় মহারাজ স্থাণুদত্ত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের অধীনে এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বসতি কোথায় ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তাম্রফলকে নব্যাবকাশিকায় শাসনকর্ত্তার অবস্থানের সংবাদ পাই। এই নব্যাবকাশিকা শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ জনপদের নাম কি রাজধানীর নাম তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না। পার্জিটার সাহেব একসময়ে ডাঃ হর্ণলির মতানুসরণ করিয়া মনে করিয়াছিলেন নব্যাবকাশিকা কোন স্থানের নাম নহে, মহারাজ স্থাণুদত্তের পরে নূতন স্থায়ী শাসনকর্ত্তার আবির্ভাবের পূর্ব্বকার অবস্থা, যে অবস্থায় উপরিক নাগাদেব প্রভৃতি রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু এই অর্থ খাটে না, কারণ নব্যাবকাশিকার উল্লেখ তিনটী তাম্রফলকে আছে, স্থাণুদত্তের পুত্র নাবালক হইলেও এত দীর্ঘকাল নব্য অস্থায়ী অবস্থার উল্লেখ চলে না। পার্জিটার তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এবং নলিনী বাবু উভয়েই মনে করেন উহা তাৎকালিক রাজধানীর নাম। নলিনী বাবু আরও মনে করেন ইহা কোটালিপাড় পরিত্যাগের পর যে স্থানে নূতন শাসনকর্ত্তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহারই নাম এবং সে স্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার। কোটালিপাড়া যে রকম বিলখালে পরিপূর্ণ তাহাতে এস্থান যে রাজধানীর উপযুক্ত নহে তাহা সকলেই বোঝে কিন্তু এমন স্থান এত সুরক্ষিত করার বন্দোবস্ত কেন হইয়াছিল? মনে হয়, স্থানটী তখন এত নিম্ন ছিল না। সেকালে যেখানে দুর্গ নির্ম্মিত হইত সেখানে শাসনেরও একটা কেন্দ্র বসিত। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, কোটালিপাড় কিছুদিন এইরূপ একটী শাসন-কেন্দ্র ছিল। নিম্ন জলাভূমির মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত স্থান বাহির হইয়া পড়ে শুনিতে পাওয়া যায়। কোটালিপাড়ার কোটের ভগ্নাবশেষের নিকট হইতে বহু প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গুয়াখোলা গ্রামে প্রাপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটী ও স্কন্দগুপ্তের দুইটী খাঁটী সুবর্ণমুদ্রা এবং কায়খাগ্রামে প্রাপ্ত সুবর্ণমুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর, স্কন্দগুপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর সম্রাট্। সাভারের নিকট যে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা গুপ্ত সম্রাটদিগের নকল ও পরবর্ত্তী সময়ের। সাভারে বংশাই নদী হইতে নিঃসৃত ও তাহাতেই পতিত যে একটী খাল আছে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় টানিয়া আনিয়া অবকাশ বা অবকাশিকা বলা চলে কিন্তু মোটের উপর স্থান বিশেষের সহিত নব্যাবকাশিকার অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা বড়ই সূক্ষ্ম সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মাত্র বলা যায় যে নব্যাবকাশিকা রাজধানীর নাম হওয়াই সম্ভব. এবং ইহার অবস্থান যেখানেই থাকুক যে বারকমণ্ডলে কোটালিপাড়া অবস্থিত ছিল তাহা এই স্থান হইতেই শাসিত হইত।

এইবার বারকমণ্ডল। কেহ কেহ ইহাকে বরেন্দ্র মণ্ডলের সহিত অভিন্ন অনুমান করিয়াছেন কিন্তু দক্ষিণ ফরিদপুর এক সময়ে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত থাকিলেও কোন কালেই "বরেন্দ্র-মণ্ডল" বা "বরেন্দ্রীমণ্ডল" এর অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। "বারকমণ্ডল"এর স্থান নির্দ্দেশ করিতে গেলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থার একটু আলোচনা আবশ্যক। পদ্মার তখন অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ, থাকিলেও তাহা ক্ষুদ্র নদী। পশ্চিমে ভাগীরথীস্রোত তখন প্রবল, ভৈরব ও মধুমতীও বোধ হয় দুর্ব্বল নহে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ তখন বর্ত্তমান যমুনা দিয়া বহিত না, ঢাকা জেলার পূর্ব্বদিক্ দিয়া আসিত। আর উত্তরবঙ্গে করতোয়া তখন ভীষণ নদী। রেনেলের ম্যাপ খুলিলে দেখা যাইবে যেখানে ধলেশ্বরীর প্রবাহ আরম্ভ, সেইখানেই করতোয়া আসিয়া পদ্মায় পড়িতেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন ইহারও পূর্ব্বে করতোয়া স্বাধীনভাবে দক্ষিণ সমুদ্রে আসিয়া পড়িত। কেহ অনুমান করেন মাথাভাঙ্গা নদী ইহার দক্ষিণাংশ, কেহ বলেন ইহার জল হরিণ ঘাটার মোহানা দিয়া সমুদ্রে আসিত। আর ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার স্থলভাগ তখনও খুব পুষ্টিলাভ করে নাই। দক্ষিণ ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ তখন দ্বীপমালার সমষ্টি ছিল বলিয়াই মনে হয়। কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গদেশ 'গাঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু' বলিয়া বর্ণিত এবং ইহার অধিবাসিগণ 'নৌসাধনোদ্যত'; বাস্তবিক নৌকাই ছিল তাহাদের সকল কার্য্যে সম্বল। এ অবস্থায় যে স্থলভাগ অথবা জলস্থলে মিশ্রিত ভূভাগ বড় নদীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে অথবা তাহার ধ্বংসকারী শক্তিকে বারণ করিতেছে তাহাকে অনায়াসেই বারকমণ্ডল বলা চলে। আমরা বারক-মণ্ডলের পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমসীমা ভাগীরথীর কোন প্রবলশাখা ধরিয়া লইতে পারি। করতোয়া এই সময়ে পূর্ব্বে বা পশ্চিমে কোন নদীকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের দিকে আসিয়াছিল অনুমান করা যায়। দক্ষিণ সীমা সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগর, উত্তর সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। সাগর যে তখন আরও নিকটে ছিল এবং এখনকার সুন্দরবনের ন্যায় কতকস্থান জঙ্গলাবৃত ছিল তাহাও নিঃসন্দেহ।

মণ্ডল বড় ছিল কি বিষয় বড় ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে কতকগুলি 'বিষয়' লইয়া সেকালে মণ্ডল গঠিত হইত, কেহ বলেন কতকগুলি মণ্ডল লইয়া একটী 'বিষয়' হইত। বর্ত্তমান জেলাগুলি সেকালকার বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিষয় বড় কি মণ্ডল বড় তাহা লইয়া তর্ক নিষ্প্রয়োজন কারণ সকলগুলি তাম্রলিপির ভাষা মিলাইলে দেখা যাইবে যে সমগ্র বারকমণ্ডলকেই 'বিষয়' বলা হইয়াছে। বারকমণ্ডল ছিল কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি আর এই সমষ্টি দ্বারা একটী 'বিষয়' গঠিত হইয়াছিল।

এইবার দেশের শাসন পদ্ধতি ও রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম তাম্রলিপির সময়ে সকলের উপরে ছিলেন মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য আর তাঁহার নীচে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মহারাজ স্থাণুদত্ত, আবার তাঁহার নীচে বিষয়পতি জজাব। দ্বিতীয় তাম্রলিপির সময়ে মহারাজাধিরাজ উপাধিযুক্ত ধর্ম্মাদিত্যকে আবার 'ভট্টারক' উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাই। এই

সময়ে হয়ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল অথবা প্রতাপ বাড়িয়া গিয়াছিল। মহারাজ স্থানুদত্তের কি হইল তাহা বোঝা যায় না, তাঁহার পরিবর্ত্তে মহাপ্রতীহারোপরিক নাগদেবের প্রাদেশিক কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাই, তাঁহার অধীনে আবার বারকমণ্ডলে "ব্যাপারকারণ্ডয়" বা বাণিজ্য ব্যাপারের অধ্যক্ষ পদে গোপালস্বামী নামক এক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গোপালস্বামীকে বিষয়পতি বলা হয় নাই। বোধ হয় তখন বিষয়পতির পদ শূন্য ছিল, বাণিজ্য ব্যাপারের অধ্যক্ষের উপরই কর্ত্তৃত্ব ছিল অথবা ভূমি ক্রয়বিক্রয় ব্যাপার ব্যাপার-কারণ্ডয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকায় বিষয়পতির নামোল্লেখ আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। তৃতীয় তাম্রলিপির সময়ে সম্রাট্ ছিলেন মহারাজাধিরাজ ও 'ভট্টারক' উপাধিযুক্ত গোপচন্দ্র আর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন পূর্ব্বোক্ত নাগদেব, কিন্তু এই নাগদেবের পদবী এবার 'মহাপ্রতীহার-ব্যাপারণ্ডধৃত-মূল-ক্রিয়ামাত্য উপরিক'। তিনি যে সম্রাটের একজন বড় রকমের মন্ত্রীর পদাভিষিক্ত ছিলেন এই উপাধি তাহারই প্রমাণ। বিষয়পতি বা বাণিজ্যাধ্যক্ষের পদে কে ছিলেন তাহার উল্লেখ নাই তবে ভূমিগ্রহীতা বৎসপালস্বামী বাণিজ্য বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। ৪র্থ তাম্রলিপির সময়ে মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন সুবর্ণবীথ্যাধিকৃতান্তরঙ্গ উপরিক জীবদত্ত, তাঁহার অধীনে বারকমণ্ডলে পবিত্রক ছিলেন বিষয়পতি (District officer)। ভূমির ক্রয় বিক্রয় বা হস্তান্তর বিষয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা বিষয়পতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন এমন দেখা যায় না। প্রথম তাম্রলিপিতে যে সাধনিক বাতভোগ ভূমি ক্রয় করিতেছেন তিনিও একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া মনে হয়। প্রথম তাম্রলিপির সময়ে ভূমিদানে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন বিষয়-মহত্তরগণ ও প্রজাসাধারণ, দ্বিতীয় তাম্রলিপিতে অধিকরণ-মহত্তর ও বিষয়-মহত্তরগণ, তৃতীয় লিপিতে অধিকরণ-মহত্তর, বিষয়-মহত্তর ও প্রধান ব্যবসায়িগণ। ৪র্থ তাম্রলিপিতে অধিকরণ, বিষয়-মহত্তর অন্যান্য প্রধান ও ব্যবহারজ্ঞ লোক সকলেরই কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনটীতেই বিষয়পতির কর্ত্তৃত্ব ধরা পড়ে না। প্রথম তিনটী তাম্রফলকের প্রত্যেকটীর বামপার্শ্বে একটী মোহর অঙ্কিত আছে, চতুর্থটীর মোহর খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু মোহর যে আঁটা ছিল তাহার চিহ্ন একটী ছিদ্র রহিয়া গিয়াছে। এই মোহর স্থানীয় অধিকরণ বা কার্য্যপরিচালনসমিতির— "বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য।" প্রথম তাম্রলিপিতে এই মোহরের উপর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, তাহার দুই দিকে দুইটী মূর্ত্তি যেন জানু পাতিয়া আছে, আর উপরিভাগে দুইটী হস্তী যেন রমণীর মাথায় জলধারা দিতেছে। দ্বিতীয় তাম্রলিপির মোহরেও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, তাহার দক্ষিণ দিকে যেন একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং বামে একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, দুইদিকে দুইটী হস্তীর মূর্ত্তি। তৃতীয় লিপির মোহরের উপরটা পুছিয়া গিয়াছে তবে বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য পড়া যায়। এগুলি রাজার মোহর নয়, বিষয়পতির মোহরও নয়, বিষয়াধিকরণের মোহর। দেখা যাইতেছে দেশে রাজকার্য্য যথেচ্ছাচার প্রণালীতে চলিত না, প্রজার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। 'অধিকরণ'কে বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের স্থানীয় মনে করিলে দেখা যাইবে

একালকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা অনেক অধিক ছিল। অভিধানে অধিকরণ অর্থে সাধারণতঃ বিচারালয় বুঝায় কিন্তু তখন শাসন ও বিচার বিভাগের কার্য্য পৃথক্ ছিল না। আমরা অধিকরণের সদস্য বা অধিকরণ-মহত্তরগণকে ভূমি বিক্রয়ে কর্তৃত্ব করিতে দেখিতে পাই। বিষয়ে মহত্তর বা প্রধান ব্যক্তি ছিল দুই শ্রেণীর, অধিকরণ-মহত্তর ও বিষয়-মহত্তর। অধিকরণ-মহত্তর বোধ হয় রাজার বা তাঁহার স্থানীয় প্রতিনিধির নিযুক্ত বিষয়ের কার্য্যপরিচালনপরিষদের সদস্য, তাহা না হইলে অধিকরণের মোহর ব্যবহারে অধিকার থাকিবে কেন ? আর বিষয়-মহত্তর স্থানীয় স্বাধীনজীবী প্রধান লোক। ভূমি বিক্রয়ে শেষোক্ত শ্রেণীরই স্বার্থ বেশী সুতরাং আমরা বিষয়-মহত্তরদিগের নাম ও কর্তৃত্ব সকল তাম্রফলকেই বিশেষরূপে দেখিতে পাই। প্রথম তাম্রলিপিতে অধিকরণ মহত্তরদিগের উল্লেখ নাই। ভূমি-ক্রেতা সাধনিক বাতভোগ রাজপ্রভাব-যুক্ত বলিয়াই হয়ত অধিকরণের নিকট উপস্থিত হওয়ার আবশ্যকতা হয় নাই অথবা অধিকরণের অনুমতি পূর্ব্বেই পাইয়া থাকিবেন। বিষয়-মহত্তরগণের ও প্রজা সাধারণের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারাই মূল্য লইয়া কার্য্যটী সমাধা করিয়া দিল। এ ক্ষেত্রে ভূমি কাহার ছিল তাহার উল্লেখ নাই, হয়ত গ্রামের সাধারণ ভূমিই দেওয়া হইল এবং সেই জন্যই সাধারণ লোকের উপস্থিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রলিপির ভূমি থোড় নামক এক মহত্তরের জমী হইতে বিক্রয় করা হইয়াছিল। অধিকরণমহত্তর ও বিষয়মহত্তরগণ কর্তৃত্ব করিলেও জমী যে থোড়ের সম্মতিক্রমেই গৃহীত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তৃতীয় তাম্রলিপির জমি কাহার নিকট ক্রীত হইল বোঝা যায় না। পার্জিটার সাহেব যে লিখিয়াছেন এই জমি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রহ্মণদিগের নিকট ক্রীত তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বৎসপালস্বামী জমি চাহিয়াছেন সেই অধিকরণমহত্তর ও বিষয়-মহত্তরগণ কি সকলেই ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিল ? আমার বিশ্বাস এখানে তাম্রলিপির ঠিক পাঠোদ্ধার হয় নাই। 'Indian antiquary' তে এইখানে তাম্রফলকের যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বড়ই অস্পষ্ট। চতুর্থ তাম্রফলকে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিবার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পতিত ভূমি দান। এখানে অধিকরণ-মহত্তর ও বিষয়-মহত্তরগণ অন্যান্য ব্যবহারজ্ঞ লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া ভূমি দান করিতেছেন ; ভূমি পুর্ব্বে কাহার ছিল তাহার উল্লেখ নাই। বিষয়পতির অনুমোদনেরও কোন কথা নাই। পার্জিটার সাহেব বলেন গ্রামে নূতন লোকের আমদানি হইলে গ্রামবাসী সকলেই তাহাতে সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়ে সুতরাং ভূমি-বিক্রয়ে সকলেরই স্বার্থ জড়িত, তাই প্রধান লোকদিগের মধ্যস্থতায় বিক্রয়-কার্য্য চলিত। একথার যুক্তিবত্তা অস্বীকার করিবার যো নাই। ১ম তাম্রলিপিতে সামন্ত রাজগণের উল্লেখ আছে। ইঁহারাও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সহিত ইঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা পরিস্ফুট হয় নাই।

বিক্রয়-কার্য্যও নিতান্ত অসভ্য জাতির প্রথায় সম্পাদিত হইত না; পুস্তপাল ছিল, পরিমাপক ছিল। ভূমিসংক্রান্ত কাগজপত্রাদি ঠিক রাখাই পুস্তপালের কার্য্য ছিল, তাঁহাকে Record keeper বলা যাইতে পারে; আর পরিমাপক ছিলেন বর্ত্তমানকালের আমিন। চারিদিকে জল, রাজার আয়ের পক্ষে ও লোকের সমৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যব্যাপারের খুবই সুবিধা। বাণিজ্যবিভাগ তত্ত্বাবধানের জন্য যে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারী ছিল তাম্রলিপিতে তাহার ভাল প্রমাণই পাওয়া যায়। তখনকার নিম্নবঙ্গের বড় নদী খুব বড় হইবারই কথা, মোহানার কাছে বোধ হয় উপসাগরের ন্যায় দেখাইত। সাধারণ নৌকায় সর্ব্বত্র যাতায়াত সম্ভবতঃ নিরাপদ ছিল না, সমুদ্রপোতের ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল। নাবাতাক্ষেণী (পোত নির্ম্মাণের বন্দর, পার্জিটার সাহেবের ভাষায় shipbuilding harbour) এবং নৌদণ্ডক (জাহাজের মাস্তুল—পার্জিটার সাহেবের ভাষায় ship's mast) যে সীমানার চিহ্ন ছিল তাহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে নৌবিদ্যার অনুশীলন ভালরূপই হইত। ভূমির মূল্য যে দীনারে নির্দ্দিষ্ট হইত তাহা হইতেও বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এসিয়া ও ইউরোপের বহুস্থানে দীনার নামে পরিচিত মুদ্রার প্রচলন ছিল (লাটিন denarius)। প্রাচীন তাম্রশাসনে ও সংস্কৃতগ্রন্থে ইহার বহু উল্লেখ আছে কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য হইতেই শব্দটীর এতটা প্রচলন সম্ভব। ভিন্নদেশীয় বণিকদিগের সহিত ভারতের নানা স্থানে বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল।

পার্জিটার সাহেব মনে করেন পুস্তপাল গ্রাম্য কর্ম্মচারী ছিল কারণ তাহাকে মহত্তরদিগের কথামত কাজ করিতে দেখা যায়। মহত্তরদিগকে যখন অধিকরণমহত্তর ও বিষয়মহত্তর বলা হইয়াছে তখন পার্জিটার সাহেবের এ যুক্তি খাটে না, তবে ভিন্ন ভিন্ন তাম্রফলকে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তপালের উল্লেখ তাঁহার মত কতকটা সমর্থন করে। পুস্তপালের কার্য্যক্ষেত্র সমস্ত 'বিষয়' ব্যাপী হইলে পুনঃ পুনঃ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ দেখা যায় না। শিবচন্দ্রকে বিষয়ের সর্ব্বত্রই পরিমাপ-কার্য্য করিতে দেখা যায়।

প্রতিকুল্যবপনোপযোগী ভূমির মূল্য ৪ দীনার এই হিসাবে কৃষ্টভূমির মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইত। এক 'কুল্যবাপ' কতটা জমী এবং 'দীনার' শব্দে ঠিক কিরূপ মুদ্রার পরিমাণ বুঝাইত তাহা এখনও গবেষণার বিষয়। আরবী স্বর্ণমুদ্রা দীনারের ওজন ছিল ৬৫ গ্রেণ, এদেশে ৩২ রতি ওজনের ও অন্যান্য প্রকার দীনারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমান অরিয়াস্ ১২৪ গ্রেণে হইত। খাঁটি দীনার দেশে বেশী প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ, থাকিলে উহা এখনও অনেকস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িত। শব্দটী হয়ত কেবল মূল্যের পরিমাণজ্ঞাপক, অন্য মুদ্রায় ঐ হিসাবে বিনিময়কার্য্য চলিত বলিয়া মনে হয়। পার্জিটার সাহেব 'কুল্য' শব্দের কুলা অর্থ করিয়া মনে করেন এক কুলায় যে পরিমাণ ধান আঁটে তাহা হইতে যে চারা উৎপন্ন করা যায় সেই চারা যতটা জমীতে রোপণ করা যাইতে পারে তাহার মূল্য ছিল ৪ দীনার। কিন্তু 'কুল্যবাপ' বোধ হয় নির্দ্দিষ্টপরিমাণ

জমীকে বুঝাইত, কুলার বা বীজধান্যের স্থানীয় প্রয়োগ আবশ্যক হইত না। 'কুল্য' শব্দের কুলা ছাড়া আরও প্রচলিত অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, ৮ দ্রোণে এক 'কুল্য'। দ্রোণের পরিমাণও সর্ব্বত্র একরকম ছিল না। ৩২ সেরে এক দ্রোণ ধরিলে এক কুল্যে অনেক ধান হইয়া পড়ে। পার্জ্জিটার সাহেব বলেন জোয়ার ভাঁটার দেশে রোয়া ধানের প্রচলন বহুকাল হইতে আছে এবং কালিদাসের রঘুবংশ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোটালিপাড়া অঞ্চলে কিন্তু এখন সাধারণতঃ বোনা ধানেরই প্রচলন। যদি ৩২ সেরী দ্রোণের ৮ দ্রোণে এক কুল্য ধরা যায়, তাহাহইলে ছিটে বা বোনা ধানের হিসাবেও জমীর পরিমাণ ১২।১৩ বিঘা দাঁড়ায়। এই পরিমাণ জমীর মুল্য ৪ দীনারই সেকালকার পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ৮×৯ নলে মাপ চলিত কিন্তু নল কত বড় ছিল লেখা নাই। ১৬ হাতী নল ধরিলে ৮×৯ নলে বর্ত্তমানকালের ৩ বিঘার কিছু বেশী জমী হয়। পার্জ্জিটার সাহেব এই পরিমাণ জমীকেই 'কুল্যবাপ' মনে করেন কিন্তু ইহাই যে 'কুল্যবাপ' তাম্রলিপিতে তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এ হিসাবে মূল্য ৩১।৩২৲ টাকা সে সময়ের পক্ষে অতিরিক্ত।

প্রথম তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় বিক্রয়মুল্যের ষষ্ঠভাগ রাজার প্রাপ্য। রাজা বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না, মূল্যের ষষ্ঠভাগ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে প্রজাস্বত্ব আইনে জমীদারকে বিক্রয়-মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ দেওয়ার কথা হইতেছে, তাহাতেও অনেক জমীদার অসন্তুষ্ট। তাঁহাদের একবার হিন্দু আমলের কথা ভাবিয়া দেখা উচিত।

তাম্রলিপিতে অনেক লোকের নাম আছে, নামগুলি প্রায়ই সংস্কৃতশব্দজ। তখনও জগতে মুসলমানের আবির্ভাব হয় নাই। লোকের নাম হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আর্য্যসভ্যতার বিস্তৃতি বেশ বোঝা যায়, কিন্তু এই সকল লোকের জাতি ছিল কি? "সেন" দেখিয়াই বৈদ্য অথবা 'ঘোষ', 'দত্ত' দেখিয়াই কায়স্থ মনে করা নিরাপদ নহে। 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' শব্দের অর্থ প্রধান লেখক বা প্রধান সভাসদ্। জাতিবাচক 'কায়স্থ' শব্দের তখনও প্রচলন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রলিপির 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' শব্দ এবং চতুর্থ তাম্রলিপির জ্যেষ্ঠাধিকরণিক' শব্দ একার্থবোধক। চতুর্থ তাম্রশাসনের 'করণিক' শব্দও 'কায়স্থ' অর্থবোধক মনে হয়। তাম্রফলকোক্ত হিন্দু মহারাজাধিরাজদিগের অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা স্থানুদত্তের জাতি কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। স্থানুদত্তের 'দত্ত' শব্দ নামেরই একাংশ। 'দেবদত্ত' ব্রাহ্মণ হইতে পারিলে স্থানুদত্তও কায়স্থ না হইয়া ব্রাহ্মণ বা অপর কোন জাতীয় হইতে পারেন। কুলস্বামী, চন্দ্রস্বামী, বসুদেবস্বামী, গোপালস্বামী, সোমস্বামী, বৎসপালস্বামী, গর্গস্বামী, গোমিদত্তস্বামী ও সুপ্রতীকস্বামী যে ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। অন্য যাঁহাদের নামোল্লেখ আছে তাঁহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণও হইতে পারেন কিন্তু অধিকাংশই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। দেব, চন্দ্র, মিত্র, সেন, ঘোষ, দত্ত, পালিত, নাগ প্রভৃতি শব্দ নামেরই একাংশ বলিয়া

মনে হয়। বাতভোগ, কালসখ প্রভৃতি নামের সহিত তুলনা করিলেই তাহা বোঝা যাইবে। পার্জিটার সাহেব ও রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এগুলিকে কায়স্থদের উপাধি ধরিয়া লইয়াছেন, রাখাল বাবু পার্জিটার সাহেবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এগুলি কায়স্থজাতিবাচক না হইলেও লেখক সম্প্রদায়ের নামের শেষাংশ এইরূপ থাকিতে থাকিতে কালে কায়স্থজাতির উপাধিতে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সেটা আদিশূর ও শ্যামলবর্ম্মা রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। এই সকল তাম্রলিপিতে বর্ত্তমান রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ব্রাহ্মণদিগের ভরদ্বাজগোত্র ও কাণ্বগোত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে এবং দুইটী ব্রাহ্মণকে লৌহিত্য বলা হইয়াছে। 'লৌহিত্য' ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর। এই ব্রাহ্মণদিগকে কামরূপী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়। সুপ্রতীক স্বামীকে ভূমিদানের সময়ে বলি চরু ও সত্র প্রবর্ত্তনের কথা আছে। ইহা হইতে ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্য জীবনে মনুসংহিতায় উক্ত পঞ্চযজ্ঞের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল তাম্রলিপিতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিম্নবঙ্গের যে চিত্র পাওয়া যাইতেছে সেটা সভ্যদেশের চিত্র। রাজা, বিবিধ রাজকর্ম্মচারী, প্রজাদের অধিকার, বাণিজ্যব্যাপারের সুবন্দোবস্ত, ভূমির স্বত্বনিরূপণে ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের বসতি, ধর্ম্মের জন্য দান প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। তাহার বহু পূর্ব্বে যে কোটালিপাড়ায় দুর্গ ও রাজকর্ম্মচারীর অবস্থান ছিল তাহাও পাওয়া যাইতেছে। আর পাওয়া যাইতেছে—দূরবর্ত্তী নৃপতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গের পারিবারিক জীবনে বেশী সংস্পৃষ্ট থাকিতেন না। সময়ে সময়ে কোন প্রবল প্রবল সম্রাট্ বিস্তীর্ণ জনপদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসন করিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শাসন প্রজার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে বেশী প্রসারিত ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় বিভাগগুলি অল্প বা অধিক স্বাতন্ত্র্যের উপর আপন আপন দৈনন্দিন কার্য্য চালাইত।

এই তাম্রফলকোক্ত রাজাদিগের সময়ে ইংলণ্ডে একরূপ অরাজকতা। ব্রিটেন দ্বীপ এঙ্গ্লো-স্যাক্সন জাতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত, খৃষ্টান ধর্ম্ম তখনও এ জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে নাই। সেকালে আমাদের প্রভুদের দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশেই লোক বেশী সুখে বাস করিতেছিল।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

নিশার সরোবর

অন্ধকারের এই সরোবর—এই যে কালো জল,
বসি ইহার কূলে
অতিসুখের ক্লান্তিভারে নয়ন ছল ছল,
অশ্রু আসে ভুলে।
সারাদিনের স্বপ্নখানি রাত্রি রূপে মম
আমায় ঘিরি আছে,
চপল রাঙা হৃদয়টুকু কমল কলি সম
ঘুমিয়ে পড়ে বাঁচে!
একা চলার শ্রান্তি মম স্তব্ধ আলস লয়ে
মগ্ন জলের বুকে,
পথের চেনা দৃষ্টিগুলি একটি আঁখি হয়ে
চাহে আমার মুখে!
মৌন স্নেহের চিত্ত উহার গভীরতায় হারা
জাগে সুনীল তলে,
ঝাপ্‌সা তারার বিম্বদলে আমার জীবন ধারা
উদাস হয়ে টলে!
গভীর নিশার এই সরোবর আমার নেশা এ যে,
দুখ্‌ ভোলানো বাঁশি,
একটি করুণ সুরের মত মর্ম্মে ওঠে বেজে,
তাইত ছুটে আসি।
শেষ মিলনের লগ্ন সম ইহার প্রতীক্ষাতে
কেটেছে মোর দিবা,
পথ-হরা এই তিমিরে ফুট্‌লো আঁখি পাতে
মরণ-লোভী বিভা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

উত্তর ইতালি

(২৯)

ইতালিয়ান ভাষায় এখনো হাতেখড়ি সুরু করি নাই। কিন্তু দু'একটা খবরের কাগজ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছি। ফরাসী-ঘেঁশা শব্দের সাহায্যে কথাগুলা একটু আধটু বুঝিয়া লইতেছিও।

ইতালিয়ানের আওয়াজ কাণে মিঠা শুনায় না। ফরাসীরা যখন কথা বলে তখন দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া শুনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইতালিয়ান কথোপকথনে কাণ তৃপ্ত হয় না।

অথচ ইতালিয় গানগুলার ভিতর যে সকল শব্দ শুনা যায় সেই সব মিঠাই লাগিয়াছে। সুইট্সার্ল্যাণ্ডে থাকিবার সময়ে ঘরে বসিয়াই ইতালিয় নরনারীর গান শুনিতে পাইতাম। কাস্টাঞোলার পল্লীবাসীরা দলে দলে গান গাহিয়া হোটেলের পাশ কাটিয়া যাইত। সুর এবং শব্দ দুইই উপভোগ করিবার বস্তু মনে হইত।

তাহা ছাড়া ব্যবসাদার গায়কেরা হোটেলে আসিয়া ইতালিয়ান ভাষায় গান গাহিয়া গিয়াছে। সেসবও ফরাসী গানের মতনই শ্রুতিমধুর মনে হইয়াছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, লোকের মুখে যে সব আটপৌরে শব্দ শুনিতেছি সে সব অনেকটা বিরক্তিজনক বলিলেও মিথ্যা কওয়া হইবে না। ইতালিয় কথোপকথন ঠিক্ যেন বিড়ালের লড়াই বোধ হইতেছে।

এইরূপই ত মিলানের হাটেবাজারে প্রথম অভিজ্ঞতা। দেখা যাউক, বেশী দিন এদেশে থাকিলে অথবা ইতালিয় ভাষায় প্রবেশ করিলে আওয়াজ গুলা কেমন ঠেকে।

(৩০)

ঘরে ঘরে আজ নিশান্ উড়িতেছে। কাল জামা পরিয়া কাল টুপি মাথায় দিয়া ফাসিষ্টরা রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে। ব্যাপার কি ? মুসোলিনি আজ মিলানে (১৮ই মে ১৯২৪)।

বেলজিয়ামের দুই মন্ত্রী আসিয়াছেন মুসোলিনির সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে। ফ্রান্সে ন্যাশন্যালিষ্ট দলের পরাজয় হইয়াছে। পোঁআকারে আর ফরাসী-রাষ্ট্রের কর্ণধার থাকিবেন না। সোশ্যালিষ্ট এবং মজুরপন্থী দলের লোকেরা ফ্রান্সে কর্ত্তামি করিবার সুযোগ পাইল। এই অবস্থায় জার্ম্মণি সম্বন্ধে ফ্রান্সের রাজনীতি কিরূপ আকার ধারণ করিবে সেই সম্বন্ধে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র কাণাঘুষা চলিতেছে। বেলজিয়াম আর ইতালি দুয়ে মিলিয়া একটা শল্লা করিয়া চুকিল।

মুসোলিনি বেলজিয়ামকে বলিয়াছিলেন:—"কুছ পরোআ নাই। ইতালি আছে তোমার পশ্চাতে। যাহাতে জার্ম্মণির সপক্ষে ফরাসী সোশ্যালিষ্টরা বেশী বাড়াবাড়ি না করে তাহার জন্য ইতালির উপর নির্ভর করিতে পার। ইতালি সকল বিষয়ে ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের

স্বার্থ বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। জার্ম্মাণির নিকট হইতে যাহাতে লড়াইয়ের ক্ষতিপূর্ত্তির টাকা আদায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা ইতালিয়ান সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য থাকিবে।”

(৩১)

কাস্তেল্লোর নিকটবর্ত্তী এক “কাফে”তে বসিয়া আড্ডা মারা যাইতেছে। কাষ্টানিয়েন বা চেষ্টনাট গাছগুলা গ্রীষ্মে জাঁকিয়া উঠিয়াছে। গাছতলায় বসিয়া চা পান চলিতেছে। অদূরের পিয়াৎসায় অশ্বপৃষ্ঠে গারিবাল্‌দি।

স্কালা থিয়েটারের এক বেহালাবাদক প্রধান সঙ্গী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:—“বৎসর কয়েকের ভিতর এই থিয়েটারটা ইয়োরামেরিকায় এত নামজাদা হইয়া উঠিল কি করিয়া?” বেহালাবাদক ফরাসীতে জবাব দিলেন:—“তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইহার বর্ত্তমান পরিচালক শ্রীযুক্ত তোস্কানিনি আজকালকার সঙ্গীতজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ। অপেরা-ভবনটা বিশেষ বড় নয়। মাত্র তিন হাজার লোক বসিতে পারে। বাহির হইতেও স্কালা সৌধ জাঁকজমকপূর্ণ দেখায় না। তথাপি একমাত্র তোস্কানিনির সঙ্গীত-পরিচালনার গুণে মিলানের এই অপেরা ইয়োরামেরিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে।”

তোস্কানিনি নিজে নাটক রচনাও করেন নাই অথবা সুর, গৎ বা রাগরাগিণীও লেখেন নাই। সঙ্গীতের “জিরিজেন্ত্‌” বা “কণ্ডাক্টর” মাত্রকে একসঙ্গে বহু বাদ্যযন্ত্রের ওস্তাদ হইতে হয়। তাহা ছাড়া গায়ক গায়িকাদের সামঞ্জস্য বিধান করা এবং বাদকদিগকে শৃঙ্খলীকৃত করাও অপেরার কণ্ডাক্টরের কাজ। অধিকন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে “রেজিষ্টর” ও ষ্টেজ ম্যানেজারের যে দায়িত্ব অপেরা-কণ্ডাক্টরেরও সেই দায়িত্ব।

এক কথায়, লড়াইয়ের মাঠে সেনাপতির যে ঠাঁই বর্ত্তমান জগতের সঙ্গীত-পরিচালকদের সেই ঠাঁই। অর্থাৎ হিণ্ডেনবুর্গ, লুডেনডোর্ফ হওয়া যেমন মুখের কথা নয়, তোস্কানিনি হওয়াও সেইরূপ মুখের কথা নয়।

বর্ত্তমান ভারত হিণ্ডেনবুর্গ-লুডেনডোর্ফের মর্ম্ম বুঝে না। আর সঙ্গীতশিল্পের সেনাপতিগিরি কি চিজ্‌ তাহা ত ভারতবাসীর মাথায় বসিতে এখনো অনেক দেরি।

(৩২)

“নেরোণে” সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। আমরা ইংরেজের মুখে যে রোমাণ রাজাকে নেরো বা নিরো বলিতে শিখিয়াছি সেই রাজাকে ইতালিয়ানরা জানে “নেরোণে” বলিয়া। নিরোর কথা উঠিলেই দুইটা তথ্য মনে আসে। প্রথমতঃ এই রাজা খৃষ্টানদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, রোমে যখন আগুন লাগিয়া ঘরবাড়ী ধনদৌলত পুড়িয়া ছাই হইতেছিল তখন নিরো বাজনা বাজাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

এহেন রাজার কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে রোমাণ জাতির বংশধর ইতালিয়ানরা সঙ্গীত নাটক

রচনা করিয়া কি সুখ পাইতেছে ? আর সেই গান শুনিবার জন্য ইতালিয়ান সমাজে এত হুড়াহুড়ি কেন ?

বেহালাবাদক বলিলেন :—"ইতিহাসের নেরোণে আর বর্ত্তমান সঙ্গীত-নাটকের নেরোণে এক ব্যক্তি নয়। নাট্যকার বোআতো এক অপূর্ব্ব চরিত্র খাড়া করিয়াছেন। কর্ম্মবীর, দৃঢ় স্বভাব, শক্তিযোগী ইতিহাসস্রষ্টারূপে নেরোণে এই নাটকের প্রথম পুরুষ। কবিবরের ভাবুকতাই যুবক ইতালিকে স্কালার রঙ্গমঞ্চে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে।"

বোআতোর মৃত্যু হইয়াছে। তোস্কানিনি বোআতের বন্ধু। নাটকটাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রচার করিবার জন্য তোস্কানিনি বহুকাল খাটিয়াছেন।

বুঝা যাইতেছে যে, মুসোলিনি যুবক ইতালিকে যে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন সেই শক্তি মন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন বোআতো। আর, তোস্কানিনিও বর্ত্তমান ফাসিষ্টযুগের ভরা জোয়ারে সঙ্গীতশিল্পের সাহায্যে এক শক্তিধরকে ইতালিয়ান সমাজে দাঁড় করাইয়া দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণ সঙ্গীতগুরু হ্বাগ্নার নিবেলুঙ বীরদের গাথাগুলা অপেরায় ঢালিয়া জার্ম্মাণ সমাজে এই ধরণের শক্তিই ছড়াইয়াছিলেন।

(৩৩)

স্কালা থিয়েটারের "অর্কেষ্ট্রা"য় একশ জন ওস্তাদ বাজনা বাজাইয়া থাকেন। তাহার ভিতর বেহালাবাদক ষোলজন। তোস্কানিনি স্বয়ং "চেলো" যন্ত্রের ওস্তাদ। কিন্তু সঙ্গীতভবনে তাঁহার প্রধান কাজ সকল শ্রেণীর বাদককে "চালানো"। ইনি নিজে কোনো যন্ত্র বাজাইবার ভার লন না। ইনি "অর্কেষ্ট্রা" বা সঙ্গীতমঞ্চের মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া একশ জনকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কখন কিরূপে কোন্ যন্ত্রটায় ঘা দিতে হইবে। এই নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি এক যন্ত্র ব্যবহার করেন। সেটাকে সঙ্গীত-দণ্ড বলিতে পারি। এ এক কাঠি বিশেষ। হাত নাড়া ইঁহার প্রধান বা একমাত্র ভাষা।

"নেরোণে" পালার জন্য আট শ নরনারী রঙ্গমঞ্চে খাড়া হয়। প্রাচীন রোমের গোটা সমাজ একসঙ্গে চোখের সম্মুখে দেখা দেয়। ঝী চাকর, নকীব বরকন্দাজ, পাহারাওয়ালা, পুরোহিত, কুস্তীগির "গ্লাদিয়তের", পালোয়ান, যোদ্ধা, সেনেটার; আমীর ওমরাও ইত্যাদি সবই হাজির হয়।

তাহা ছাড়া সে যুগের রোমাণ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ নানা জাতীয় লোককে—ফরাসী, জার্ম্মাণ, গ্রীক, আর্মিনিয়ান, আফ্রিকান, এশিয়ান—বিভিন্ন পোষাকে দেখা যায়।

(৩৪)

এই সকলের ভিতর সময়ে সময়ে অনেকের সমবেত একতান গীত (কোরাস) চলিয়া থাকে। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত একলা গানের সুযোগও আছে। অপেরায় সবই গান। কোনো দুই জনে

কথাবার্ত্তা চালাইবার সময়ও গানই ব্যবহৃত হয়। কাজেই আট শ জন লোকের গলার উপর কর্ত্তামি করা তোস্কানিনির এক মস্ত সমস্যা।

যান্ত্রিকেরা যেমন তোস্কানিনির দণ্ড অনুসারে নিজ নিজ যন্ত্র-সঙ্গীত নিয়ন্ত্রিত করিতে বাধ্য গলাওয়ালারাও সেইরূপ তোস্কানিনির হুকুম অনুসারে নিজ নিজ কণ্ঠ শাসন করিতে বাধ্য থাকে। কোনো ব্যক্তি বেহালায় বা বাঁশীতে নিজ কেরদানি জাহির করিবার চেষ্টা করিলে গোটা অর্কেষ্ট্রায় একটা অসঙ্গতি জন্মিতে পারে। আবার সেইরূপ কোনো গায়ক যদি নিজ খেয়াল-মাফিক নিজ কণ্ঠের ওস্তাদি প্রকটিত করিতে ঝুঁকেন তাহা হইলেও সঙ্গীতভবনে রসভঙ্গ হইবারই সম্ভাবনা।

অধিকন্তু যাঁহারা "সোলো" বা একলা গাহিবার ভূমিকা পান তাঁহাদিগকেও গোটা পালার সুরের খাদচড়াইকে সম্মান করিয়া নিজ কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক বাদক ও গায়ককে নিজ নিজ ওস্তাদি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া চাই অথচ সমগ্র সঙ্গীতবস্তুটার সামঞ্জস্য এবং ঐক্য রক্ষা পায়,—এই দুইকূল বাঁচাইয়া "দণ্ড" চালাইবার শিল্পে তোস্কানিনি আজ জগতে অদ্বিতীয়।

(৩৫)

মানুষের গলা অনেক প্রকার। এক এক গলার এক এক দাম বা স্বাদ। ভিন্ন ভিন্ন "রসের" কণ্ঠধ্বনি প্রত্যেক অপেরায়ই থাকা চাই। অপেরা-পরিচালকের পক্ষে গায়কেরা এবং গায়িকারা কে কোন্ ভূমিকা লইল এই কথাটা বড় জিনিষ নয়। আসল কথা কোন্ ভূমিকার জন্য কিরূপ গলা কোন্ শ্রেণীর কণ্ঠধ্বনি কায়েম করা হইল।

গায়ক্ গায়িকারা কণ্ঠধ্বনি অনুসারে অপেরায় এবং সমাজেও পরিচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গলা তৈয়ারি করা ইয়োরামেরিকায় এক বিপুল সুকুমার শিল্প। ভারতীয় ওস্তাদজিরাও গলা সাধার কিস্মৎ বেশ জানেন।

ফুটবলের মাঠে যে ব্যক্তি "গোল" সামলাইতে ওস্তাদ তাহাকে দেশের লোক "গোলকীপার" বলিয়াই জানে। আবার যে "হাফ্ব্যাক সেণ্টার" ঠাঁইয়ে পাকা খেলোয়াড় তাহার নাম ঐ ঠাঁইয়ের সঙ্গে গাঁথা থাকে। কণ্ঠধ্বনির মুল্লুকেও কেহ "বাস্" কেহ "টেনর", কেহ "বারিটোন" কেহ "কণ্ট্রালটো", কেহ "সোপ্রানো" ইত্যাদি।

গলার আওয়াজের স্বাভাবিক উচ্চতা হিসাবে এই সব নামকরণ হইয়া থাকে। মিঠা, কড়া, ভাঙ্গা, চাঁছা ইত্যাদি তফাৎ করা হইতেছে না। নারী-কণ্ঠ ছাড়া সোপ্রানো আওয়াজ বাহির হইতেই পারে না। বাস্ধ্বনি একমাত্র পুরুষের গলায় সম্ভব। এই গেল গলার জাতি-ভেদ।

(৩৬)

পুরুষেরা সাধারণতঃ "টেনর" বা "বারিটোন"। বাঙ্গালী লালচাঁদ বড়ালকে বোধ হয় "বারিটোন" বলা চলে। ইয়োরোপের নামজাদা "টেনর" ছিলেন ইতালিয়ান কারুসো।

তাঁহার জায়গায় আজকাল পার্ত্তিলে জাঁকিয়া উঠিতেছেন। স্কালা ভবনের "নেরোণে" পালায় ইনি নেরোণে সাজিয়া থাকেন। প্যারিসের অপেরায় মার্সেল জুর্ণে প্রসিদ্ধ "বারিটোন।"

আমেরিকার নিউইয়র্কে মেট্রোপলিটান অপেরা জগতের সর্ব্ববৃহৎ সঙ্গীত ভবন। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই গায়ক গায়িকারা এই অপেরায় গাহিয়া থাকেন। ইয়াঙ্কি মুল্লুকে টাকার অভাব নাই। আট দশ বিশগুণ বেশী বেতনে জগতের সেরা ওস্তাদদিগকে এখানে বাঁধিয়া রাখা হয়। কারুসো ডলারের টানেই মার্কিণ হইয়াছিলেন,—গাহিতেন অবশ্য ইতালিয়ানে। আজ কাল নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ "সোপ্রাণো" হইতেছেন শ্রীমতী রোজারাইজা। স্কালার "নেরোণে" পালায় রোজা গাহিতেছেন। ইনি পোল্যাণ্ডের লোক।

(৩৭)

মিলানের টেক্‌নিক্যাল কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন। শুনিলাম এই সহরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই। এত বড় শহর, এত ধনী লোকের বাস, অথচ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই! শুনিলাম—মিলানের নিকটবর্ত্তী পাহ্বিয়া নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু পাহ্বিয়ার নাম কেহ কখনো শুনিয়াছে কি?

এখানেই নবীন প্রবীণের প্রভেদ বুঝিতে হইবে। মধ্যযুগের ইতালিয়ান সমাজে পাহ্বিয়া, ফেরারা ইত্যাদি নগর সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। কাজেই সে সব ঠাঁইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু মিলানো নতুন শহর—বর্ত্তমান জগতে মাথা তুলিতে সুরু করিয়াছে। এখনো একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

জার্ম্মাণিতেও দেখা যায়,—আজকালকার হিসাবে যে সকল নগর নেহাৎ ছোট বা অপ্রসিদ্ধ সেই সকল কেন্দ্রেই বড় বড় নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে। আর্লাঙ্গেন, মার্বুর্গ, হ্ব্যুর্ৎস্‌বুর্গ, হাইডেলব্যর্গ, ফ্রাইবুর্গ্‌ ইত্যাদি সহরের কথা মনে রাখিলে ইতালির পাহ্বিয়া, ফেরারা, পাদোহ্বা, বোলোঞা ইত্যাদি কেন্দ্রের জ্ঞানমণ্ডল সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইবে।

(৩৮)

প্রাচীন কীর্ত্তি মিলানে অবশ্য আছে। দুয়োমোটো চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইতালিয়ান আধ্যাত্মিকতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তখনকার দিনে মন্দিরগুলাই ছিল এক সঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের নিকেতন। কি এসিয়া কি ইউরোপ দুই ভূখণ্ডের মানবজীবনই সে কালে পুরোহিত সন্ন্যাসীদের তাঁবে পরিচালিত হইত।

সাহিত্য, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, বাস্তু, সঙ্গীত ইত্যাদি মানবজীবনের সকল অভিব্যক্তিই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিত। এই সকলের পুষ্টির জন্য রাজরাজড়া কিষাণ মজুর নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করিয়াও জীবন ধন্য করিত।

মিলানে নবীন ধনদৌলতের জাঁকজমক দেখিতেছি অনেক। কিন্তু রাস্তার মোড়ে গলি

ঘোঁচে মন্দির দেখিতেছি কতগুলা তাহার সংখ্যা করা কঠিন। নয়া পুরাণা গির্জ্জা নাকি গুণতিতে প্রায় শ দেড়েক! ইস্কুল পাঠশালার সংখ্যাও এত বেশী নয়। থিয়েটার নাচঘর সঙ্গীতভবন সিনেমা ইত্যাদি ত মাত্র বিশটা। মঠ মন্দির কায়েম করা যদি ধর্ম্মজীবনের প্রমাণ বা লক্ষ্য হয় তাহা হইলে ভারতের কোনো শহর মিলানকে হারাইতে পারিবে কি?

(৩৯)

দুচারটা মন্দিরের ভিতর আনাগোনা করা গেল। অধিকাংশই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা গথিক মন্দির সেইণ্ট মার্কের নামে পরিচিত। আজকাল যে বাড়িটা দেখা যায় সেটা অবশ্য নতুন তৈয়ারি করা। পুরাণার চিহ্ন কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।


আম্ব্রোজিয়ো গির্জ্জা

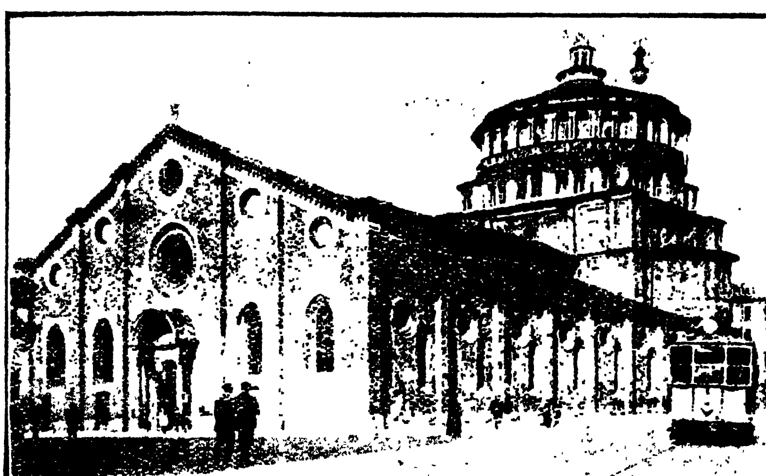
সর্ব্বপ্রাচীন মন্দির চতুর্থ-শতাব্দীর গড়া। সেইণ্ট আম্ব্রো-জিয়ো পুরাণো অখৃষ্টান দেবালয় ভাঙিয়া তাহার ঠাঁইয়ে এক গির্জ্জা কায়েম করেন। বিখ্যাত সেইণ্ট অগষ্টিন এই গির্জ্জায় খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

লম্বার্দির রাজারা এবং "জার্ম্মাণ" সম্রাটরা আম্ব্রো-জিয়োর গির্জ্জায় রাজপদে অভিষিক্ত হইত। এই মন্দিরটার ভিতর-বাহির কয়েকবার দেখিবার জিনিষ।

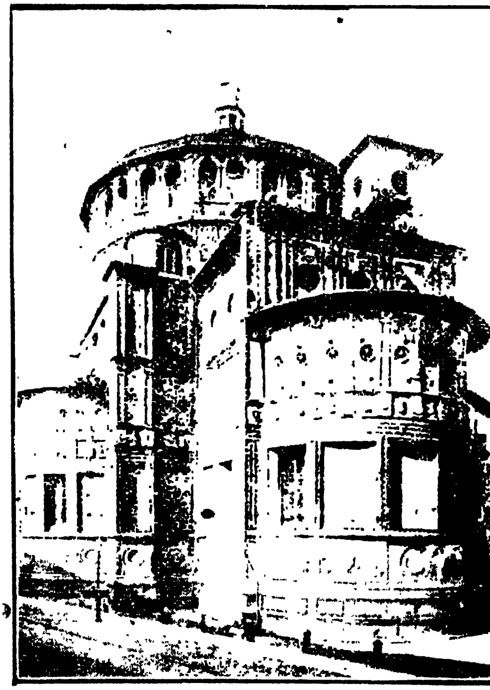
এই যুগের আর একটা "কিয়েজা" বা মন্দির সেইণ্ট লোরেণ্টের নামে পরিচিত।

(৪০)

'কিয়েজা দেল্লে গ্রাৎসিয়ে' নামে যে মন্দিরটা বিবৃত হয় সেইটা দেখিবার জন্য টুরিষ্টদের ভিড় খুব বেশী। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাস্তু নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছিল। পুরোহিতেরা মন্দিরের সংলগ্ন যে ঘরে বসিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেন তাহার এক দেওয়ালে খোদ লেওনার্দো দাভিঞ্চির (১৪৫২—১৫১৯) হাতের কাজ দেখা যায়।


গ্রাৎসিয়ে গির্জ্জা

‘যীশুখৃষ্টের শেষ নৈশভোজন” দাভিঞ্চির চিত্রিত বিষয়। রঙ্গুলা খানিকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনো মূর্ত্তি এবং অঙ্গভঙ্গী সমূহ বেশ বুঝা যায়। খৃষ্ট বলিতেছেন:—“তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর হাতে সঁপিয়া দিয়াছ।” এই কথা শুনিবামাত্র সহভোজী বারজন প্রিয় শিষ্যের মুখে চোখে নানা ভাব উদিত হইয়াছিল। বামদিকের তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ কোনো অঙ্গ চাঞ্চল্য দেখাইতেছে না। ত্রিশ রজতখণ্ডের লোভে এই ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরি করিয়াছিল। নাম ইহার জুদাস।


গ্রাৎসিয়ে গির্জ্জার পশ্চাদ্ভাগ

খৃষ্টানদের পক্ষে এই কাহিনীর মতন বিপদাত্মক কথা আর নাই। রোমাণ ক্যাথলিক গির্জ্জায় যে “মাস্” পাঠ করা হয় তাহার সঙ্গে এই নৈশভোজনের নিবিড় সম্বন্ধ। এই সময়েই খৃষ্ট বলিয়াছিলেন:—“তোমাদিগকে এই যে রুটি ও মদ বাঁটিয়া দিতেছি ইহা আমারই মাংস ও রক্ত।” তদবধি যীশুর রক্তমাংস প্রত্যেক “মাস্” পাঠের পর কাটিয়া দেওয়া হয়!



(৪১)

“গ্রাৎসিয়ে” গির্জ্জার এক প্রকোষ্ঠের দুই দেওয়ালে কাঠের উপর চিত্রাঙ্কণ দেখিলাম বাইবেলের পুরাণা এবং নয়া “টেষ্টামেণ্টে”র গল্পগুলা এই সকল চিত্রের ভিতর বাঁচিয়া রহিয়াছে।

ছবিগুলা মঠের পুরোহিতদের আঁকা। এই ধরণের পুরোহিতের আঁকা ছবি প্রত্যেক গির্জ্জার প্রত্যেক দেওয়ালেই দেখিতেছি। অধিকন্তু কাচের ফ্রেমে বাঁধানো আল্‌গা তৈলচিত্রের সংখ্যাও প্রায় প্রত্যেক “কিয়েজা”য়ই গণ্ডাগণ্ডা।

খাঁটি পুরোহিত বা সন্ন্যাসী ছাড়াও সে যুগে অনেক দেখিলাম “[illegible]” [illegible]

এই সকল গৃহস্থ বা সংসারী চিত্রশিল্পীরাও বাইবেলের গল্প এবং যীশুজীবনী ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে হাত দিত না।

প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে যে ছবিগুলা দেখা গেল সেগুলা অতি সরল রঙিন কাজ। দুই চারটা রেখার টানেই যেন চিত্র সমূহ আঁকা হইয়াছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাংসল পরিপূর্ণতা ফুটিয়া উঠে নাই। "রাজপুত" ও "পাহাড়ী" চিত্রশিল্প নামে মধ্যযুগের যে সকল ভারতীয় চিত্র আজকাল প্রচারিত হইতেছে সেইগুলার সঙ্গে এখানে অনেক সাদৃশ্য সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

দাহ্বিঞ্চির "শেষ নৈশ ভোজন" তত সহজ সরল নয়। ইহাতে "পারিপ্রেক্ষিক" পূরা মাত্রায় বিদ্যমান। অধিকন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়নে রঙের সাহায্যে রূপ ফুটাইয়া তুলিবার কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়। দাহ্বিঞ্চির শিল্পধারাই চার শ বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে চলিতেছে। এই ধারার শিল্পরীতি ভারতে কখনো বিকাশ লাভ করে নাই।



দাহ্বিঞ্চির "শেষ নৈশ ভোজন" (গ্রাৎসিয়ে গির্জ্জা)

(৪২)

দাহ্বিঞ্চির আগেকার যুগে এশিয়ায় ইয়োরোপে শিল্প-প্রভেদ একপ্রকার নাই। দাহ্বিঞ্চিকে মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমান জগতের মাঝখানে ফেলা চলে। যে সকল চিত্রশিল্পী নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছিলেন দাহ্বিঞ্চি তাঁহাদের অন্যতম। ভারতে এবং এশিয়ার অন্যত্র মধ্যযুগের পর কোনো একটা নতুন শিল্পরীতি গড়িয়া উঠে নাই বলিলেই চলে।

ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় চিত্রশিল্প বলিলে সাধারণতঃ লোকেরা দাহ্বিঞ্চির পরবর্ত্তী যুগের কাজই বুঝিয়া থাকে। দাহ্বিঞ্চির পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ ইহাদের হিসাবে "মান্ধাতার আমল।" ইতালির প্রাচীনতম মন্দিরে তাহার দৃষ্টান্ত দুচার দশটা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে হয়। সোজাসোজি সেগুলাকে বলা হয় "প্রিমিটিভ্" আদিম বা প্রাথমিক।

বিংশ শতাব্দীর যুবক ভারত প্রত্নতত্ত্বে অনুরাগী হইয়া ভারতীয় চিত্রশিল্পের কতকগুলা পুরাণা নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। শিল্পরীতির মাপকাঠিতে এই সবকে পাশ্চাত্য "প্রিমিটিভ্"

বা আদিম শিল্পকর্ম্মের কোঠায় ফেলিতে হইবে। দাহ্বিঞ্চি যে শিল্প কায়দার প্রতিনিধি তাহার প্রবর্ত্তন করা ভারতাত্মার ক্ষমতায় কুলায় নাই।

(৪৩)

মধ্যযুগে এবং কথঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালেও খৃষ্টানরা ছবি আঁকিত মন্দির সাজাইবার জন্য। ধর্ম্মের কাহিনী প্রচার করাই ছিল চিত্রশিল্পীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। গির্জ্জার সুকুমার শিল্প ষোল আনা ভক্তিযোগের প্রতিমূর্ত্তি। ভক্তিযোগের মাত্রা এশিয়ার হিন্দু বৌদ্ধশিল্পে খৃষ্টানদের আধ্যাত্মিকতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এই কথাটা স্বীকার না করা নেহাৎ "গাজুরি" বা একগুঁয়েমি মাত্র!

আজকালকার দিনে অবশ্য উচ্চশিক্ষিত খৃষ্টানরা সেই গির্জ্জাশিল্পকে আর ভক্তিযোগ বা আধ্যাত্মিকতার খোরাক বিবেচনা করে না। ইহাদের চিন্তায় এই সব জিনিষ মিউজিয়ামে, যাদুঘরে, প্রদর্শনীতে জাহির করিবার মাল। বৈঠকখানায়, শোআর ঘরে, রান্নাঘরে ছবিগুলা শিল্পের নিদর্শন মাত্র রূপে ঠাঁই পায়।

খাঁটি ক্যাথলিক নরনারীরা কিন্তু আজও মধ্যযুগের সেই ভক্তিভাব এবং আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিয়াই চলে। ইহারা একমাত্র সুকুমার শিল্প হিসাবে বাইবেল চিত্রাবলী বা যীশু জীবনের অঙ্কন-সমূহ নিরীক্ষণ করিতে অভ্যস্ত নয়। ইহাদের চিন্তায় মন্দির সমূহ হইতে পবিত্র মূর্ত্তিগুলি সরাইয়া আনিয়া মিউজিয়ামে সংগ্রহ করিয়া রাখা পাপকর্ম্ম বিশেষ। এই ধরণের ভক্তিযোগ প্রটেস্টাণ্ট মহলেও,—বিশেষ করিয়া নারী-সমাজে—হামেশা দেখা যায়।

(৪৪)

যাহা হউক,—ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়ানরা এখানে ওখানে গির্জ্জার আব-হাওয়াকে একটু আধটু সাংসারিক চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছিল। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে সেই সাংসারিক চোখের দিগ্বিজয় চলিতেছে। যার ট্যাঁকে টাকা আছে সেই গির্জ্জাগুলা হইতে প্রসিদ্ধ চিত্রগুলি কিনিয়া নিজ নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে। আর সেই সকল দেশে মিউজিয়াম গড়িয়া উঠিতেছে।

মূল চিত্রগুলা অনেকক্ষেত্রে দেওয়ালে গাঁথা। সে সব সরাইবার জো নাই। কাজেই নামজাদা চিত্রকর বাহাল করিয়া সেই সমুদয়ের নকল প্রস্তুত করানোও বর্ত্তমান মিউজিয়াম ব্যবসায়ীদের এক বড় বাতিক। বস্তুতঃ এই ধরণের বাতিক না চাগিলে আর এই বাতিকের পেছনে টাকার তোড়া না থাকিলে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, হ্বিয়েনা ইত্যাদি নগরের মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে গির্জ্জাশিল্প দেখিতেই পাওয়া যাইত না।

(৪৫)

ইতালির মন্দিরগুলা তীর্থক্ষেত্র। সাধু মোহন্ত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই হিসাবে ইতালি

খৃষ্টানদের পবিত্র দেশ। সঙ্গে সঙ্গে এই মুল্লুক সুকুমার শিল্পের প্রত্যেক ভক্তের পক্ষেই অবশ্য দ্রষ্টব্য পুণ্যভূমি।



লুঈনির "মাতৃমূর্ত্তি" (ব্রেরা সংগ্রহালয়ে)

ইতালির বুকের উপর এই সব মন্দির রহিয়াছে বলিয়া ইতালিতে কোনো মিউজিয়াম থাকার দরকার নাই, ইতালিয়ানরা এরূপ ভাবে নাই। মিলানে সুকুমার শিল্পের মিউজিয়াম দেখিতেছি এক গণ্ডা।

"কাস্তেল্লো" দুর্গটা বর্ত্তমানে মিউজিয়াম ছাড়া আর কিছু নয়। স্কালা থিয়েটারের অনতিদূরে পেৎসোলি প্রাসাদ। এই ভবনেও লুঈনি, বোত্তিচেল্লি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শিল্পীদের কাজ সংগৃহীত আছে। লুঈনির আঁকা ছবি বড় ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী "পিনাকোতেক" ভবনে রক্ষিত হইতেছে। দাভিঞ্চি ইত্যাদিও বাদ পড়ে নাই।



MILANO — Palazzo Brera - Cortile d' Onore

"ব্রেরা" মিউজিয়ামের আঙিনা

"ব্রেরা" সংগ্রহালয়টকে ছোটখাটো লুভ্‌র বলা চলে। প্রথমেই চোখে পড়ে আঙিনার মধ্যস্থলে পিতলের বিপুল নেপোলিয়ন-মূর্ত্তি। স্থপতি কানোভার কাজ।

ঘরগুলার ভিতর ষোড়শ শতাব্দীর বহু শিল্পবীরকে দেখিতে পাইলাম। কোথাও কোথাও চিত্রকর কোনো কোনো দেশী বিদেশী ধনীদের ফরমায়েস অনুসারে ছবি নকল করিতেছেন।

রাফায়েলের আঁকা "কুমারীর বিবাহ" দাভিঞ্চির "শেষ নৈশভোজন"এর মতনই ইয়োরামেরিকায় অতি প্রিয় বস্তু। এক শিল্পী নকল করিতেছেন আর দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া



রাফায়েলের "কুমারীর বিবাহ" (ব্রেরা সংগ্রহালয়ে)

দাঁড়াইয়াছে। রাফায়েলও দাভিঞ্চির মতনই নবযুগের প্রবর্ত্তক। রাফায়েলের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে পারিপ্রেক্ষিকবিহীন সহজ-সরল রেখা-প্রাণ চিত্রশিল্প খৃষ্টান সমাজের আবহাওয়ায় সুপ্রচলিত ছিল।

সম্পূর্ণ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীর যোগসূত্র—রামমোহন ও বিবেকানন্দ

রাজা রামমোহন হইতে যে শতাব্দীর আরম্ভ,—এবং স্বামী বিবেকানন্দে যে শতাব্দীর শেষ হইয়াছে,—সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় আলোচনায়, উল্লিখিত দুই মহাপুরুষের প্রসঙ্গ অধিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ ইহাদের উভয়ের চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জাতীয় জীবনে ইঁহাদের প্রভাবও খুব বেশী।

বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা চিন্তার ধারা অব্যাহত আছে।

বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা চিন্তার ধারা অব্যাহত আছে, একটা কর্ম্মের প্রেরণা তরঙ্গের মত সাময়িক উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে,—ক্রমশঃই জাতীয় জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছে। রাজা রামমোহনের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের যে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়াছে,—যাহা স্বামীজী নিজে স্বীকার করিয়াছেন,—সেই মানসিক যোগসূত্রই বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীকে এক অখণ্ড,—অবিভাজ্য সুসম্পূর্ণ রূপ বা আকার প্রদান করিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস রামমোহন ও বিবেকানন্দে কোন যোগসূত্র নাই কিন্তু যাঁহারা জানেন না,—তাঁহারাই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দের যোগসূত্র এত সুদৃঢ় যে, এই উভয় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুশিষ্যগণ যদি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই যোগসূত্র ছিন্ন করিবার প্রয়াস করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা ব্যর্থকাম হইবেন। নৈনিতাল পাহাড়ে ভগিনী নিবেদিতার সহিত, স্বামীজীর একবার রামমোহন প্রসঙ্গে কথোপকথন হয়। সেই সময় ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী বলেন যে তিনটি বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহনকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। যথা:—(১) রামমোহনের বেদান্তগ্রহণ ও প্রচার;—(২) রামমোহনের স্বদেশপ্রীতি ও তাহার প্রচার;—(৩) রামমোহনের স্বদেশ-প্রেমের উদারতা যাহা হিন্দু ও মুসলমানকে সমানভাবে আলিঙ্গন করে।* বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটা ভাবের ধারা অব্যাহত থাকিয়া জাতিকে চালিত করিতেছে,—আশা করি, আপনারা তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি যে নূতন নূতন ভাবই জাতিকে চালিত করে। মহাপুরুষেরা এই সমস্ত

---

* "It was here, too, that we heard a long talk on Rammohon Roy, in which he pointed out *three things* as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love of country that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he (Swamiji) claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohon had mapped out," *Notes on some wandering*—p, 19 by sister Nivedita,

নূতন ভাবরাশির প্রকাশকমাত্র। তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া এই নূতন ভাব জাতির মনে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহা যাঁহারা পারেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জন্য রাজা রামমোহন যেমন অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন সেই সঙ্গে তিনি ইউরোপের বিজ্ঞানকে যথা, "Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy" এবং অন্যান্য "useful science" গুলিকেও বরণ করিয়া লইবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রসার ব্যতিরেকে এ যুগে কেবল শাঙ্কর বেদান্ত যে নিতান্তই নিষ্ফল হইবে এবং তাহা যে বাঞ্ছনীয় নয় একথা রামমোহন Lord Amherst-এর নিকট সেই স্মরণীয় চিঠিখানিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানবর্জ্জিত শুধু বেদান্তবিলাসী করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা রামমোহনকে ভুল বুঝিয়াছেন। এ যুগে বেদান্তের সহিত বিজ্ঞান চাই—ইহাই ছিল রামমোহনের অভিপ্রায়। বেদান্তবর্জ্জিত বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবর্জ্জিত বেদান্ত এ দুই রামমোহনের অনভিপ্রেত ছিল।

রামমোহন বিজ্ঞানবর্জ্জিত বেদান্ত বিলাসী হইতে বলেন নাই।

বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব কি?

এক্ষণে আমি বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আমার আগেকার বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়া আপনাদের মনে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে, এমনকি আমি জানি অনেকের মনে উঠিয়াওছে—যে ঊনবিংশ শতাব্দীই কি বাঙ্গালী সভ্যতার প্রথম শতাব্দী? তাহার পূর্ব্বে কি, বাঙ্গালী-সভ্যতা ছিলনা? যদি থাকিয়া থাকে, তবে—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালী সভ্যতার কি কি উপাদান ছিল? এবং এই সভ্যতার বিশেষত্ব যদি কিছু থাকে, তবে তাহা কি?

পরিশেষে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার,—অর্থাৎ রামমোহন হইতে বিবেকানন্দের উদ্যম,—বাঙ্গালী সভ্যতার মধ্যে কোন গুলি রক্ষা করিতে বলিয়াছে,—কোনগুলি বা কিরূপ আকারে সংশোধন করিতে বলিয়াছে,—এবং কোনগুলিই বা একেবারে বর্জ্জন করিতে বলিয়াছে,—এক্ষণে এই প্রশ্নের আমি সাধ্যমত উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালী সভ্যতার যে সমস্ত উপাদান লক্ষ্য করা যায়, তাহার প্রায় সবগুলিরই উৎপত্তিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে মধ্য ভাগের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মত, ষোড়শ শতাব্দীও একটা সংস্কারের শতাব্দী। শুধু তাই নয়,—বাঙ্গালী সভ্যতার আধুনিক যা কিছু বিশেষত্ব,—তাহার প্রায় সবগুলিই রূপ পাইয়াছে, পরিপুষ্ট হইয়াছে—ষোড়শ শতাব্দীতে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব গুলির উদ্ভব হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে যে বাঙ্গালী সভ্যতা দেখা দিয়াছিল সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী যাহার আলোকে আলোকিত,—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাহা, পলাশীর যুদ্ধের কিঞ্চিৎ আগে বা পর হইতে, খণ্ড, বিখণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল,—এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সভ্যতার উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া লইবার প্রয়োজন অনুভব করা গেল,—সেই অল্লাধিক মাত্র তিন শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার রূপকে আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিব। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, (অর্থাৎ রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ,) সংস্কার ও সংশোধন করিতে চাহিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতাকে, যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহা প্রাণ পাইয়াছিল—পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে—যাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, রঘুমণি, নব্যন্যায়ের দার্শনিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ,—তন্ত্রশাস্ত্রের মীমাংসক ও সংগ্রহকার এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মের যুগাবতার অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক একজনে দিক্‌পাল। যে কোন দেশে—যে কোন জাতির মধ্যে—যে কোন যুগে ইহাদের কেহ এক জন জন্মিলে, সেই দেশ সেই জাতি সেই যুগ ধন্য হইত।

এখন প্রশ্ন, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার কি এই সভ্যতা, যাহা অষ্টদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়িল,—যাহা বাহিরের আঘাতে স্থির থাকিতে পারিল না এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই পুনরায় সেই বহুধাবিচ্ছিন্ন—বিচূর্ণ—সভ্যতার উপদানগুলিকে একত্র করিয়া যাহার মধ্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিল এবং রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব প্রথম এই কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইলেন,—আজীবন প্রাণান্তকর পরিশ্রমে দেহপাত করিয়া গেলেন? ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সেই সভ্যতা কি ?

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতা

আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন আমি মনে করিনা যিনি আমার কথা হইতে মনে করিবেন যে বাঙ্গালী জাতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে অসভ্য ছিল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে সভ্যতার সোপানে প্রথম পদক্ষেপ করিল। না,—তাহা নহে। বাঙ্গালী জাতি যে কতদিন হইতে সভ্য তাহা ঐতিহাসিকগণ এখনও সম্যক্ স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতার প্রসঙ্গ আপনারা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গলার নব আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপাদান পরীক্ষা করিয়া বুঝা যাইতেছে যে তৎকালেও বাঙ্গালী জাতি সভ্য ছিল। বাঙ্গালীর রাজত্ব, সাম্রাজ্য, বাণিজ্য,—দিগ্বিজয়,—তাহার ধর্ম্ম,—সাহিত্য,—ভাস্কর্য্য,—এই সমস্তের ভগ্নাংশ যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে—এবং যাইতেছে, তাহা সমস্তই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সম-সাময়িক এবং সে সমস্তই একটা সভ্য জাতির বিলুপ্ত অস্তিত্বের নিদর্শন। সে বাঙ্গালী জাতি বিলুপ্ত। তার অস্তিত্ব আজ

নাই। আমি আপনাদিগকে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার সম্পর্কে,—শুধু ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার কথা সংক্ষেপে—অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

এই শতাব্দীতে বাঙ্গালী তাহার সাম্রাজ্য হারাইয়াছে। মুসলমানের অধীনে ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি বাঙ্গলায় নহে;—দিল্লীতে। বাঙ্গলা ষোড়শ শতাব্দীতে ভারত সাম্রাজ্যের অনেক প্রদেশের মধ্যে একটি প্রদেশমাত্র। অথচ এই শতাব্দীতে বাঙ্গলা সম্পূর্ণ দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনতা স্বীকার করে নাই। বাঙ্গলার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ত দূরের কথা—দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধেই বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর ভুঞা জমিদারগণ বিদ্রোহ করিয়াছিল, যুদ্ধ করিয়াছিল—কোন কোন যুদ্ধে জয়লাভ পর্য্যন্ত করিয়াছিল। এই জমিদারদিগের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলমান আর অল্পাংশ ছিল হিন্দু। দ্বাদশ ভুঞার মধ্যে নয় জন ছিল মুসলমান পাঠান, আর তিনজন—কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, মধুসিংহ ভৌমী ছিল হিন্দু। দিল্লীর মোগলের বিরুদ্ধে ইহা প্রধানতঃ ছিল বাঙ্গলার পাঠানের বিদ্রোহ। কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি যে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রথম কারণ, দিল্লী সম্রাটের শাসন তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুদূর পল্লীগুলিকে আষ্টেপৃষ্টে বদ্ধ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর জমিদারগণ তখনও স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রের উপরই নির্ভর করিতে জানিত ও পারিত। এবং এই বিদ্রোহ জয়যুক্ত না হওয়ার কারণ তখন প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় ভবানন্দ-মজুমদারের মত বিশ্বাসঘাতক ছিল,—আর কেদার রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈশা খাঁর মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বদেশ-দ্রোহী ব্যক্তিও ছিল। বাঙ্গলার বারভুঞা কখনো বাঙ্গলার স্বাধীনতার জন্য একত্র হইয়া যুদ্ধ করে নাই। নয়জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু—সেদিন একত্র হইলে হয়ত দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে পারিত। কিন্তু তখন হিন্দু মুসলমান এক হইতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীতে আজিও পারিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। হিন্দু মুসলমানের মিলন এক কঠিন সমস্যা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাঙ্গালী হিন্দু সভ্যতার আধুনিক বিশেষত্ব—স্মৃতি, ন্যায়, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বাঙ্গলা সাহিত্য—আত্ম-প্রকাশ করে। সেই সময় দিল্লীর বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বার-ভুঞার বিদ্রোহ ধীরে ধীরে একের পর আর চলিতেছিল। রাজনৈতিক এক মহা বিপ্লবের মধ্যেই আধুনিক বাঙ্গালী-সভ্যতা জন্মলাভ করে। বাঙ্গলার জমিদারগণ যখন স্বতন্ত্র-ভাবে দিল্লীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল তখন যে বাঙ্গালী সভ্যতার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের নিকট বলিব।

বাঙ্গলার বার-ভুঞা।

রাজনৈতিক বিপ্লব।

এই ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লীতে রাজত্ব করেন প্রথম বাবর ১৫২৬—৩০ = ৫ বৎসর। ক্রমে হুমায়ুন ১৫৩০—৪৩ = ১৪ বৎসর। পরে সের সা ১৫৪০—১৫৪৫ = ৬ বৎসর এবং সর্ব্বশেষে পৃথিবী-বিখ্যাত সম্রাট আকবর ১৫৫৬—১৬০৩ = ৩৮ বৎসর। আর এই শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন ১৫ জন শাসন কর্ত্তা। তাহার মধ্যে টোডরমল ও মানসিংহ ব্যতিরেকে আর ১৩ জন

মুসলমান। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে রাজা টোডরমলের পূর্ব্বে—হোসেন সা সোলেমান কেরাণী ও দায়ুদ খাঁর নাম সসম্মানে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

যে সময় বাঙ্গলার জমিদারগণ প্রত্যেকে পৃথক ভাবে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিত সেই সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু সভ্যতায় একটা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী সেই যুগের বাঙ্গলাসাহিত্য। এই চণ্ডীর যা উপাখ্যান তাহা লইয়া কবিকঙ্কণের পূর্ব্বে ও পরে অনেক কবি অনুরূপ অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে যে সমস্ত চরিত্রের মানুষ দেখা যায় যে রকম দেবতা ও দেবীর লীলাভিনয় দর্শন করা যায়, তাহাতে এই কাব্য—শুধু কাব্য নয়, সমাজ-জীবনের একখানি আলেখ্য বলিয়াও আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। বাঙ্গালীর সাহিত্যের সহিত তাহার সামাজিক জীবন তখনও অঙ্গাঙ্গীযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। এই চণ্ডীতে ভাষার সাক্ষ্যে "দালান এমারত" "পেয়াদা বরকন্দাজ" প্রভৃতিতে যেমন মুসলমানী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়,—তেমনি "চন্দ্র-সূর্য্য তরু, ফুল-পল্লব" হিন্দুর মন্দিরে দেবী প্রতিমার অর্চ্চনারও পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। এই চণ্ডী কাব্যে ভাড়ুদত্তের ধূর্ত্ততা আছে, পুরুষ চরিত্রের অবনতি আছে, নারী-চরিত্রের উৎকর্ষ বিশেষ নাই, ধর্ম্ম বিপ্লবের ছায়া আছে—চতুর্দ্দিক হইতে টানিয়া লইবার, একটা আহরণ করিবার শক্তি আছে, সমাজের এই প্রাণ শক্তিই চণ্ডী কাব্যকে জাতীয় সাহিত্য অতি উচ্চে স্থান দিয়াছে। আর সাহিত্যে চতুষ্পার্শ হইতে আহরণ করিয়া নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রকাশ করিবার শক্তি যে শতাব্দীর আছে সেই শতাব্দীই জীবন্ত। তাহার ইতিহাসে থাকিবে।

সাহিত্য—কবিকঙ্কণের চণ্ডী।

সাহিত্যের পর সমাজ ব্যবস্থা। কিরূপে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী, তাহার সমাজ ব্যবস্থায় একটা সময়োপযোগী নূতন পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই আপনাদের নিকট বলিব। রঘুনন্দন স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে বলা কঠিন। রঘুনন্দন যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব রচনা করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজকে সমাজ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা অন্ততঃ তাঁহার ২৫ বৎসরের পরিশ্রমের ফল। রঘুনন্দনের সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া শতাব্দীর মধ্য ভাগে আন্দোলন হয়। সুতরাং শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রঘুনন্দন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গলাদেশ বখ্‌তিয়ার খিলিজী আক্রমণ করে। হিন্দুর রাজা লক্ষণ সেন পরাজিত হয়। ক্রমে পশ্চিম বঙ্গ পরে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে পূর্ব্ববঙ্গ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে মুসলমান শাসন কর্ত্তার অধীনে আসে। সুতরাং প্রায় তিন শতাব্দী পাঠান মুসলমানের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর আচার ও ব্যবহার এমন পরিবর্ত্তিত হয় যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সমাজ ব্যবস্থার অর্থাৎ স্মৃতির নব সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রঘুনন্দনের স্মৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব।

বাঙ্গলায় তখন প্রাচীন স্মৃতিকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছিল না। চারি বর্ণও ছিল না। চারি

আশ্রমও ছিল না। ছিল মাত্র দুই বর্ণ—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। কায়স্থ জাতি ত দূরের কথা, কলিতে বৈদ্য জাতিকেও রঘুনন্দন শূদ্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলৌ বৈদ্যঃ শূদ্রবৎ।

মুসলমান অধিকারে জাতিভেদ শিথিল না হইলেও নিম্ন জাতির অনেক লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বাণিজ্যব্যবসায়ী বৈশ্য বর্ণের জাতি সকল, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও অর্থশালী ছিল বলিয়া সহসা মুসলমান হয় নাই। পরে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেখা দিলে তাহারা বৈষ্ণব হইয়া হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিল।

ব্রাহ্মণদিগের আচারে এই শতাব্দীতে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে সিদ্ধ-চাউল মৎস্য ও মশুর ডাইল আহার করিত না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া রঘুনন্দন উহার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। উপনয়ন ও শ্রাদ্ধবিধিও তিনি প্রাচীন স্মৃতি হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে উপনয়ন ও পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধবিধি প্রচলিত হইতে পারিল না। রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তখনকার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথাপি পরিবর্ত্তিত সময়োপযোগী সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ বলিয়া রঘুনন্দনের স্মৃতির উপরেই বাঙ্গালী হিন্দু ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া নির্ভর করিয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীতেও রঘুনন্দনই বাঙ্গালী হিন্দুর প্রামাণিক স্মৃতি। ইহাতে স্বভাবতঃই কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন।

রঘুনন্দন একজন উচ্চশ্রেণীর মীমাংসক। তাঁহার পূর্ব্বে জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু আচার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মতের তাদৃশ প্রভাব লক্ষিত হয় না। কুল্লুক ভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন। ইনিও একজন বড় স্মার্ত্ত পণ্ডিত। মনু সংহিতার এক উৎকৃষ্ট টীকা (মন্বর্থ মুক্তাবলী) ইঁহার দ্বারাই রচিত হয়। কুল্লুকভট্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়াই আমার অনুমান হয়। রঘুনন্দনের পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি মীমাংসা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকরাচার্য্য, পিতা ও পুত্রে উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। এই সমস্ত স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের নব্য স্মৃতি বিশেষতঃ মনু আদি প্রাচীন স্মৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন বাঙ্গলাদেশে আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তের নূতন ব্যবস্থা দিলেন। এই আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত বাঙ্গালী সভ্যতার এক বিশেষ উপাদান। বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে রঘুনন্দনের স্মৃতি ব্যবহার বিভাগে যাহা জীমূতবাহনের দায়ভাগকে অনুসরণ করিয়াছে, ও কোন কোন দিকে সময়োপযোগী সংস্কার করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের পাদপীঠ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুর মত অবশ্য বাঙ্গালীও হিন্দু। কিন্তু সমগ্র ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর যে জাজ্বল্যমান অথচ গৌরবময় বৈশিষ্ট্য, তাহার পারিবারিক ও

মানসিক জীবনের যে নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ—তাহার ভিত্তিভূমি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবহার শাস্ত্রে জীমূতবাহনের দায়ভাগ আর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিভাগে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধান। ইহাতে দোষ ছিল না এমন বলা যায় না। তবে ইহাই প্রধানতঃ, এমন কি আজ পর্য্যন্তও, বাঙ্গালী সভ্যতার যে বিশেষত্ব তার ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগকে বলিতে পারিয়াছে যে আমরা সাধারণতঃ হিন্দুত্বে এক হইয়াও বাঙ্গালীত্বে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ভারতের সমস্ত হিন্দু জাতির মধ্যে, বাঙ্গালী হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, সমগ্র হিন্দু জাতিকে খর্ব্ব করে নাই গৌরব দান করিয়াছে, উন্নতির পথে, বৈচিত্র্যে ও বিভিন্ন দিকে বিশেষত্বে, পরিপুষ্টি ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে। সমগ্র হিন্দুজাতি এজন্য বাঙ্গালী প্রতিভার নিকট ঋণী। আমি বাঙ্গালী হইয়াও একথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু, হিন্দুত্বের প্রাদেশিক বিশেষত্ব গবেষণা করিয়া পরিস্ফুট করিতে পারিলে, সাধারণ হিন্দুত্ব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইবে। এই প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অভিনব দৃঢ়তর ঐক্য আপনিই আত্মপ্রকাশ করিবে। কেন না—হিন্দুত্ব বহু নয় মুলে এক।

এখন বাঙ্গালীর স্মৃতিশাস্ত্রের দিক অর্থাৎ পারিবারিক ও সমাজ বিধানের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, দেখিতে হইবে—যে আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানে এবং ব্যবহারে অর্থাৎ আইন সম্পর্কীয় ব্যাপারে—বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু হইতে কোন কোন দিকে পৃথক স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে যৌথ বা একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যবস্থা মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মিতাক্ষরা আইনের মধ্য দিয়া পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থকে অনেকাংশে খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন

জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনে দায়ভাগতত্ব।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যৌথ সম্পত্তির উপর প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অধিকার এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন যে তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের প্রসার এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, আইনের দিক্ হইতে মনে হয়, বাঙ্গলার দায়ভাগ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মিতাক্ষরার গ্রাস হইতে ব্যক্তিত্বকে উদ্ধার করিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালী প্রতিভার বিশেষত্ব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি ইহাও বলিতে বাধ্য যে বাঙ্গলার দায়ভাগ, সম্পত্তির বিভাগ বণ্টনে ও বিক্রয়ের ক্ষমতায়—তা সে সম্পত্তি পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত হউক—পুরুষকে যে স্বাধীনতা দিয়াছে, স্ত্রীলোক অর্থাৎ বিধবা স্ত্রী বা কন্যাকে ততদূর স্বাধীনতা দেয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে আমাদের মনে রাখিতে হইবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পত্তি বা পরিবারের মধ্যে স্ত্রীজাতিকে কোন বড় রকমের একটা অধিকার, বড় একটা দেন নাই। বাঙ্গালী যা দিয়াছে তাহা অপেক্ষা কেহ বেশী দিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জীবন্ত ও উন্নতি-মুখী জাতি সকল যেরূপ

দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, জ্ঞান বিশেষতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে বাঙ্গালী জাতি তাহা পারে নাই। বরং তাহার বিপরীত দেখা গিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ ও পরিবার বন্ধনের নিমিত্ত স্মৃতির বিধানে বাঙ্গালী প্রতিভার যে বিশেষত্ব তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনারা পাইলেন। এক্ষণে এই শতাব্দীর দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক। বাঙ্গালার দর্শন শাস্ত্র বাঙ্গালীর

নব্য-ন্যায়। রঘুনাথ শিরোমণি।

নব্য-ন্যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার উদ্ভব। রঘুনাথ শিরোমণি এই নব্য-ন্যায় অবিষ্কার করেন। গাঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা রচিত হইলেও প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারি বিভাগে ন্যায় শাস্ত্র সম্পর্কে তর্ক সকল এত নিগূঢ় ও পরিস্কৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে যে ইহা একখানি নূতন ন্যায়ের দর্শন বলিয়া পণ্ডিতেরা সেকালে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রঘুমণির গ্রন্থের নাম "চিন্তামণি দীধিতি।" এই গ্রন্থ ছাড়াও রঘুমণি বৈশেষিক শাস্ত্রীয় "পদার্থ তত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থ অবলম্বনে "পদার্থ খণ্ডন" গ্রন্থ এবং "আত্মতত্ত্ব বিবেক" ও মৈথিলি নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য প্রণীত ন্যায় গ্রন্থের মৌলিক টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত নঞর্থবাদ প্রমাণ্যবাদ নানার্থবাদ ক্ষণভঙ্গুরবাদ আখ্যাতবাদ নামে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রঘুমণির পূর্ব্বে মিথিলায় গিয়া বাঙ্গালার ন্যায় দর্শনের ছাত্রকে ন্যায় পড়িতে হইত। কিন্তু রঘুমণির নব্য-ন্যায় সর্ব্বত্র পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হইলে কাশী, মিথিলা, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, ও পাঞ্জাব প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র হইতে দলে দলে ছাত্রেরা নবদ্বীপ আসিয়া নব্য-ন্যায় পড়িতে লাগিল। দর্শনশাস্ত্রে একজন মাত্র বাঙ্গালীর প্রতিভা, সমগ্র ভারতে এইরূপে বাঙ্গালীয় মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রমাণ করিয়া গিয়াছে।

এই নব্য-ন্যায় জীবাত্মাকেও স্বীকার করে, ঈশ্বরকেও স্বীকার করে। ঈশ্বরকে স্বীকার করে বলিয়া ইহা আস্তিক, আর জীব ও ঈশ্বর এই দুইকেই স্বীকার করে বলিয়া ইহা অনেকটা দ্বৈতবাদ না হইলেও দ্বৈতবাদ ঘেঁসা;—আমার এইরূপ ধারণা। এস্থলে বলা আবশ্যক রঘুমণি শুধু নব্য-ন্যায়ের দার্শনিক ছিলেন না তিনি স্মৃতি শাস্ত্রীয় "মলিম্লুচ বিবেক" নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যে আজ এত তার্কিক তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, বোধ হয় রঘুমণিই তাঁহার জন্য অনেকটা দায়ী। বাঙ্গালী জাতি দার্শনিক। ষোড়শ শতাব্দীতে ছিল একদিন, যেদিন বাঙ্গালী জাতি বিনাপ্রমাণে ঈশ্বরকেও তর্কে স্বীকার করিত না। এই গেল বাঙ্গলার দর্শন।

তারপর ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে আমি সাধনের ধর্ম্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। ষোড়শ

শতাব্দীতেও, ঐতিহাসিকগণ সম্প্রতি স্থির করিতেছেন যে, বাঙ্গলার অনেক লোক, অনেক জাতি বৌদ্ধ ছিল। ইহা অসম্ভব নয়। কেননা একসময়ে বাঙ্গলার প্রায় ¾ অংশ বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।* নব্য হিন্দুর পুনরুত্থান কালে তাহারা কিছু একদিনেই পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মে ও আচার-ব্যবহারে ফিরিয়া আসে নাই। সমাজে, কোন বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তনের মুখে দুই তিন শতাব্দীর কাজ, নিশ্চয়ই দুই একদিনে হয়না। শুধু বৌদ্ধ কেন, জৈন মতও বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তবে তাহা কতটা প্রবেশলাভ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। এখনও বিচার চলিতেছে।

বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম, সাধনের ধর্ম্ম। কিন্তু তথাপি ইহা কেবল সাধনের ধর্ম্ম নয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া, বর্ণাশ্রমবিরোধী সমাজগঠনও বাঙ্গালায় দেখা দিয়াছিল এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে বৌদ্ধাধিকারের পর, বাঙ্গলায় নব্য-হিন্দুধর্ম্ম ও বঙ্গীয় সমাজের পুনর্গঠনে মন্বাদি প্রাচীন-স্মৃতি-কথিত বর্ণাশ্রম আর মাথা উঠাইতে পারিল না। রঘুনন্দনকে, ষোড়শ শতাব্দীতে বলিতে হইল, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণই আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। চারিবর্ণ আর চারি আশ্রম আর দেখা দিল না। তথাপি ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙ্গলা আবার নূতন করিয়া,—বিশেষ করিয়া হিন্দু হইতে আরম্ভ করিল। ইহা দুই বর্ণ ও মাত্র দুই আশ্রমের ব্যাপারে দাঁড়াইল। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে, স্মৃতি শাস্ত্রের দিক হইতে বিচার করিলে বাঙ্গলায় হিন্দুত্ব দুই বর্ণ আর দুই আশ্রমের ইতিহাস। তবে সন্ন্যাস যে বাঙ্গলায় ছিলনা এমন কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যাহা এমন প্রকটভাবে দেখা দিল তাহা ফল্গুনদীর মত ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। এবং ইতিহাসে তাহার প্রমাণও আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর বর্ণাশ্রম।

ষোড়শ শতাব্দীর সাধন ধর্ম্মে এইবার আমি তন্ত্রের কথা আপনাদিগকে বলিব। আজ বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ণব অপেক্ষা কোনদিনই কম তান্ত্রিক নয়। রক্ষণশীল বাঙ্গালী হিন্দু, তাহার দীক্ষা, আহ্নিক, উপাসনা, প্রভৃতি ব্যাপারে আজিও তান্ত্রিক ভূমির পাদপীঠের উপরেই দণ্ডায়মান। বাঙ্গলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে তন্ত্রশাস্ত্রের নব কলেবর হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ "তন্ত্রসার" নামে বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্ত্রমতে সাত্ত্বিক পূজা কিরূপে করিতে হয়, আগমবাগীশই তাহার বিধি দেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও পূজা পদ্ধতি

তন্ত্র। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

* More than three fourths of the population of Bengal were Buddhists. —*Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri* in his Introduction to Nagendranath Vasu's Modern Buddhism.

আগমবাগীশই প্রচলন করেন। মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতেই দেখা দেয়। কেননা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে মূর্ত্তির অধিক বাহুল্য বাঙ্গলাদেশে প্রায় ছিলনা। তান্ত্রিক মতে পূজা অর্চ্চনা ঘটস্থাপন করিয়া হইত। কার্ত্তিকী অমাবস্যার শ্যামাপূজার মূর্ত্তি আগমবাগীশের দ্বারা কল্পিত ও প্রচলিত। মূর্ত্তি সত্বেও প্রত্যেক তান্ত্রিক পূজায় অদ্যাপি ঘটের প্রচলন আছে।

পূর্ণানন্দগীরি পরমহংশ।

কেবল আগমবাগীশ নয়, পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংসও ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তন্ত্রের সাধনায় তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ। "ষটচক্রভেদ" "বামকেশরতন্ত্র" "শ্যামারহস্যতন্ত্র" "শাক্তক্রমতন্ত্র" এবং বেদান্ত দর্শনে "তত্বচিন্তামণি" নামক মুক্তি বিষয়ক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। 'তত্বচিন্তামণি' ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থভাগের প্রথমে রচিত হয়। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া যে সমস্ত স্থানে তিনি বাস করিয়াছেন তাহা "সিদ্ধ-পীঠ" বলিয়া কথিত আছে। নবদ্বীপের পশ্চিমে "ব্রাহ্মণীতলার ঘাট" পূর্ব্বস্থলীর বুড়মারঘট বা "বাগদেবীর ঘট" এবং নবদ্বীপের "পোড়ামার ঘট" ইঁহাদ্বারাই স্থাপিত বলিয়া তান্ত্রিকেরা বলেন। আমি তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি। অন্য কোন প্রমাণ সম্প্রতি আমি দিতে পারিতেছি না।

তন্ত্রের টোল।

সিদ্ধ পুরুষ ব্যতিরেকেও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে অনেক তান্ত্রিক অধ্যাপক ছিল। তাঁহারা ন্যায়-দর্শনের টোলের মত, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সাধনাই ছাড়িয়া শুধু তন্ত্রের ও তন্ত্রের দর্শনের দিক দিয়া, উপদেশ দিতেন। তন্ত্রের দর্শন অনেকটা শাঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের মত।

তন্ত্রের প্রসঙ্গ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আমি একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার কথা হইতে আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে তন্ত্র মত বাঙ্গলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতেই দেখা দেয়। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে, এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলায় তন্ত্র ধর্ম্মের প্রচলন দেখা যায়। তবে তাহা বৌদ্ধ-তন্ত্র। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম কতকটা এই প্রচলিত তন্ত্র ধর্ম্মের দুর্গতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। ধর্ম্মও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্মটাই বৈদিক ধর্ম্মের দুর্গতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। যেমন বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে তেমনি কর্ম্মকাণ্ডের দিক দিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সাদৃশ্য অনেক পণ্ডিত সম্প্রতি দেখাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র।

এক্ষণে সাধনধর্ম্ম বিষয়ে বাঙ্গলায় মহাপ্রভু দ্বারা অনুষ্ঠিত ও প্রচলিত ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্পর্কে আপনাদিগকে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই—বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশেষতঃ

আচার্য্য রামানুজ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় মহাপ্রভু কর্ত্তৃক যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহা দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট কিম্বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক। বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মেও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান। তত্ত্বে বা দর্শনের দিক্ হইতে মহাপ্রভুর সহিত পুরীতে সার্ব্বভৌম ও কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত বিচারে দেখা যায়, যে মহাপ্রভু শাঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশকে ভগবানের লীলা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রায় রামানন্দের সহিত ধর্ম্মবিচারকালে মহাপ্রভু লৌকিক ধর্ম্মকে যেরূপ বাহিরের বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে পরে কান্ত ভাবের কথায় পৌঁছিয়া শ্রীরাধার প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে কান্ত-ভাবাশ্রিত এই শ্রীরাধার প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতরের কথা। ইহাই বৈশিষ্ট্য। কান্ত-ভাব বর্ণনার পরেও যখন মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন যে ইহার পরেও বল। তখন "রায় কহে, আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার।" ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক জগতে আছে বলিয়া জানিতাম না। তার পরেই শ্রীরাধার প্রেমের কথা আসিল। প্রভু অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "রামরায়, বল বল, সেই রাধাকৃষ্ণের বিলাস বিবর্ত্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" রাধাকৃষ্ণের বিলাসবিবর্ত্তের কথাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের শেষ কথা।

মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

বাঙ্গলার তন্ত্রে যেমন "মাতৃ-ভাবের" প্রাচুর্য্য, বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম্মেও সেইরূপ 'কান্ত-ভাবের' প্রাচুর্য্য।

এক্ষণে আপনাদিগের নিকট ক্রমে ক্রমে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার কয়েকটি মূল উপাদান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে লিখিয়াছেন—

—"কপিলদেবপ্রিয়া ন্যায়শাস্ত্র প্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা আর কতকাল আত্ম বিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

অবশ্য, তাহা আমরা বলিতে পারিনা, কতদিন থাকিবেন। কিন্তু ভূদেব ব্রাহ্মণের এই উক্তির মধ্যে ন্যায় শাস্ত্র ও তন্ত্র শাস্ত্রকে এমন কি সাংখ্যদর্শনকেও বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার সহিত বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর রাজনীতি, সাহিত্য ও বিশেষভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেও সংযুক্ত করিয়া দিতে পারি।

রাজনীতিতে, সাহিত্যে, স্মৃতিশাস্ত্রে, দর্শনে, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে ষোড়শ শতাব্দীতে যে বিশেষ বাঙ্গালী সভ্যতার জন্ম হইল, সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহার গতিকে আপনাদের লক্ষ্য করা উচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে যাহা অর্জ্জিত হইল সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাই পরিপুষ্ট

হইল। কেননা একদিনে রঘুমণির নব্য ন্যায়, বা একদিনে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধান বা এমনকি একদিনে মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালী গ্রহণ করে নাই। কোন নূতন দর্শন, কোন নূতন আচার ব্যবহার, কোন নূতন ধর্ম্ম কোন জাতিই একদিনে গ্রহণ করে না। ইহার জন্য সময়ের আবশ্যক হয় কেননা ইহাকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাই হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতা, সমস্ত দিকেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ষোড়শ শতাব্দীর সভ্যতা অনেকটা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কি রাজনীতি, কি সাধারণ সাহিত্যের রুচি, কি লোক-ব্যবহার, কি শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা ন্যায় অথবা অন্যান্য দর্শন সমস্তই যেন প্রাণ-হীন, মলিন, নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল—এ রাষ্ট্রবিপ্লব, ষোড়শ শতাব্দীর ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার জমিদারের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ নহে। আলীবর্দ্দীর সময়ে উপর্য্যুপরি মারাঠা বর্গীর ক্রমাগত দশ বৎসর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের পর পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদের নবাব বা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পরাজয়। সম্ভবতঃ ইহা বাঙ্গালার সমগ্র হিন্দু-মুসলমানেরও ইংরেজের নিকট পরাজয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের ক্ষমতা ইংরেজের ক্ষমতার সম্যকরূপে অধীনে আসিল। ক্রমে ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় তৎসঙ্গে সমগ্র ভারতে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করিলেন।

এই বৈচিত্র্যময় বাঙ্গালার পরাধীনতার ইতিহাস যে শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে সেই শতাব্দীতে বাঙ্গালী সভ্যতার অন্যান্য বিভাগ কিরূপে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল অতি সংক্ষেপে আমি তাহা বলিয়া আমার আলোচ্য উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সেই অবসাদগ্রস্ত সভ্যতাকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিব।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রতাপাদিত্য ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার তুলনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা ও তদনুরূপ ক্ষমতা বাঙ্গালার জমিদারগণ ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্য "বায়ান্ন হাজার ঢালি" লইয়া আকবরের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এবং তাহা একটা ইতিহাসের স্মরণীয় যুদ্ধ। আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মীরকাসিম ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সামান্য মাত্র একটা হুকুমে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অনেক জমিদারই মীরকাসিমের দ্বারা বন্দী হইয়াছিল। কাহাকে কাহাকেও জীবিত অবস্থায় গঙ্গায় ডুবাইয়া হত্যা করা হইয়াছিল। এত অল্প আয়াসে ষোড়শ শতাব্দীর বারভুঞার কোন এক ভুঞাকে সম্রাট আকবর এমন কি সেনাপতি মানসিংহ দ্বারা এরূপ করিতে পারিতেন না।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে সিরাজদ্দৌল্লা বাঙ্গালার অপহৃতক্ষমতা কোন জমিদারেরই সহায়তা পান নাই। বাঙ্গালার হৃত-গৌরব জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, সিরাজদ্দৌল্লার পূর্ব্বকৃত মন্দ ব্যবহারের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, আমার বিশ্বাস তাঁহাদের, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের এই ব্যক্তিগত আক্রোশের ও স্বার্থের জন্য ষড়যন্ত্র, পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ে। সুতরাং বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের ইংরেজ অধীনতার প্রধান কারণ। প্রাতঃস্মরণীয়া অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহীয়সী নারী রাণী ভবানী এই ষড়যন্ত্রে ছিলেন না বলিয়া প্রবাদ আছে।

পলাশীর যুদ্ধ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রতাপাদিত্য আকবরের মত ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সাহস অথবা হউক—দুঃসাহস—রাখিত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সিরাজদ্দৌল্লা মীরজাফর বা মীরকাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ত দূরের কথা, শুধু ষড়যন্ত্র ও তাহার ফলে বন্দী হওয়া বা বন্দী অবস্থায় পলায়ন করা ভিন্ন আর কিছুই করিবার ক্ষমতাই রাখিত না। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার স্বাধীনতা-স্পৃহা ও তাহা রক্ষার্থে ক্ষমতা কতদূর পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই গেল রাজনীতির দুরবস্থা। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ নয়।

বীরের উপযোগী সৎসাহস যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনীতিতে নাই, তেমনি এই শতাব্দীর সাহিত্যেও তাহা নাই। প্রমাণ? রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর"। একজন রাজপুত্র আর একজন রাজকন্যার প্রণয়প্রার্থী। রাজকন্যা তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। এপর্য্যন্ত অতিশয় উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সেই রাজপুত্র আসিলেন—বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষাতেও তিনি রাজকন্যার নিকট জয়ী হইলেন, তথাপি—চোরের মত সুড়ঙ্গ কাটিয়া; রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধানের বহির্ভূত, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, যাহা বাঙ্গালী জাতি বহু শতাব্দী পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা যাহা রক্ষা করিবার শক্তি হারাইয়াছে তাহাই করিলেন। রাজকন্যা গর্ভবতী হইলেন। এই বিবাহ সমাজে অপ্রচলিত। কাজেই কোটাল দ্বারা প্রমোদ গৃহে, রাজপুত্র চোরের মত বন্দী হইলেন। বন্দী হইবার প্রাক্কালে একজন নিকৃষ্ট লম্পটেরও বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে অপর পক্ষ রাজকন্যার সম্মতি ছিল যেরূপ প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়ার প্রয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি একটা রাজপুত্রকে দিয়াও তাহা দিতে ভরসা পাইলেন না। কালী মাহাত্ম্য বর্ণনাই যদি উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি রাজপুত্রকে, রাজপুত্র রাখিয়াও তাহা সম্ভব হইত। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ইহা চলিত না। ইহা তৎকালীন জমিদার সভার বা কতকাংশে সামাজিক জীবনের প্রতিবিম্ব। কেননা কৃষ্ণচন্দ্র যখন মীরকাসিমের হস্তে বন্দী, যখন প্রতিমুহূর্ত্তে

বিদ্যাসুন্দর। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে বীরের উপযোগী সৎসাহসের অভাব।

মৃত্যুর আজ্ঞা তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া তিনি পলাইয়া আসেন এবং রাজবল্লভের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ঢাকায় নবাব সরকারে বহু লক্ষ টাকা মাপ লইয়া, রাজবল্লভের বিধবা কন্যার বিবাহ বিধি প্রচলন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া পরে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা চক্রান্ত করিয়া, এই বিধবা বিবাহবিধি ব্যর্থ করিয়া দেন। ধূর্ত্ততায় বাঙ্গলার জমিদার তখন ষোড়শ শতাব্দীর ভাড়ুদত্তকেও লজ্জা দেয়। রাজনীতিক্ষেত্রে এহেন অবস্থায়—ষোড়শ শতাব্দীর উদ্ভাসিত বাঙ্গালী সভ্যতার অন্যান্য উপাদান যে স্বভাবতঃই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। কেননা জাতীয় চরিত্রে দুর্গতি আসিলে সেই জাতির দেবদেবীরা পর্য্যন্ত ঐরূপ দুর্গতি হইতে মুক্তি পান না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দনের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার বিধান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগ হইতেই বাঙ্গালী হিন্দু মুখে স্বীকার করিলেও, কার্য্যকালে গোপনে অস্বীকার করিয়া আসিতেছিল। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে ও গার্হস্থ্য জীবনে একটা পরিবর্ত্তন, শুধু পরিবর্ত্তন নয় এক মহাবিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ মুর্শিদাবাদে ও দিল্লীতে রাজশক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় ও অপচয়।

রাজশক্তির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অন্যান্য বিভাগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবনতি দেখা দেয়।

যে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত স্বদেশীয় রাজশক্তির অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকে না সেই রাজশক্তি ও সামাজিক শাসন ও নিয়ম পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপ্লবের সূত্রপাত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে বাঙ্গালাদেশে তাহাই হইয়াছিল। বাঙ্গালী সভ্যতার কোন এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের যোগ ছিল না। বাঙ্গালী সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগই বা প্রত্যেক অঙ্গই স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ইতিহাসের অনেক বড় বড় সভ্যতা এইরূপে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়াই ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী সভ্যতার দশাও ঐরূপ হইতেছিল।

তারপর ধর্ম্ম। সাধনের ধর্ম্ম বলিতে তখন শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল। গৃহী এবং গার্হস্থ্যের অর্থাৎ রঘুনন্দনের স্মৃতির বাহিরেও এই দুই সাধন ধর্ম্ম গার্হস্থ্যাশ্রম বিরোধী আউল, বাউল, দরবেশ সাই সহজিয়া কর্ত্তাভজী প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষ মিলিত অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত সম্প্রদায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের অনেক স্মৃতিচিহ্ন লক্ষিত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ বাঙ্গালার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের, চক্রের সাধনায় ও সহজিয়া সাধনায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালার শাক্ত ও বৈষ্ণব বিশেষভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি ও রেষারেষি এত প্রবল হইল যে ইহারা যে এক হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত ও বৈষ্ণব পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

বশতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ প্রায় ভুলিয়া গেলেন। শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগের দেবদেবীকে পর্য্যন্ত নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন, বৈষ্ণবগণও শাক্তদিগের দেবদেবীকে আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। শৈব বা শাক্তগণ তুলসীপত্র স্পর্শ করা পাপ মনে করিতেন, অপর পক্ষে বৈষ্ণবগণ বিল্বপত্রের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতেন না। অবস্থা এইরূপ।

ষোড়শ শতাব্দীর ন্যায় দর্শন গতানুগতিক ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল সত্য, কিন্তু এই দর্শনশাস্ত্রে আর কোন নূতন বা মৌলিক গবেষণার উদ্ভব হয় নাই। নব্য ন্যায় আস্তিক্য দর্শন হইলেও, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম কলহের মধ্যে এই দর্শন কোন মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশের জন্য এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অদ্বৈত বাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজা রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহাই করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর ষোড়শ শতাব্দীর উদ্ভাবিত সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই বিষ্ণুচক্রে মৃত সতী দেহের মত খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বাঙ্গালী সভ্যতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতা অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বহুধা বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া এই সভ্যতার শরীরে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত যে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের আন্দোলন বাঙলা দেশকে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া আন্দোলিত করিয়াছে—তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মধ্যযুগের বাঙ্গালী সভ্যতাকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া শুধু বঙ্গদেশ কেন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পরিপূর্ণ ভারতবাসীকে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। সমগ্র ভারতবাসীকে ধর্ম্মের বৈষম্য সত্ত্বেও একটা জাতি বলিয়া ইউরোপের সম্মুখে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করাও তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছে—ঐতিহাসিকের নিকট ততই তাহার মূল্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং যতটা না পারিয়াছে, ততটাই তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে। জাতি তাহার মজ্জাগত বিচ্ছিন্ন ভাব,—ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সমাজের নিম্নস্তরে খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা সুতরাং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ভিন্ন—আর কোনরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার পৌঁছিতে পারে নাই। রাজনৈতিক সংস্কার ত নহেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কার। এক্ষণে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা দেখিব যে সভ্যতার কোন কোন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ও শেষ যথাক্রমে রামমোহন ও বিবেকানন্দ বাঙ্গলার মধ্যযুগকে অতিক্রম করিয়া নবযুগের — বিশ্বমানবের, বিশালতর ক্ষেত্রে, বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দিকে আলোচ্য শতাব্দী কিরূপে কি সংস্কার করিয়াছে। বিশেষরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে একটা শতাব্দীকে অযথা নিন্দা বা অযথা প্রশংসা করা কর্ত্তব্য নহে। অথচ এই শতাব্দীর একটা যথাযথ সমালোচনা ব্যতিরেকে আমরা বিংশ শতাব্দীতে অসতর্ক পদক্ষেপে হয়ত আরও নিষ্ফলতার দিকে চলিয়া যাইতে পারি।

রামমোহন।

শতাব্দীর প্রথমেই দেওয়ান রামমোহন। তিনি সভ্যতার প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী সংস্কারের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন ও প্রচণ্ড উদ্যম করিয়া গিয়াছেন। কোন জাতির মধ্যে, কোন যুগে, একা একজন ব্যক্তি এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না।

স্মৃতি দায় ভাগ মীমাংসা

স্মৃতির ব্যবস্থায় আচারে ও ব্যবহারে বহুসংস্কারের কথা তিনি বলিয়াছেন। ব্যবহার বিভাগে দায়ভাগ আলোচনা কালে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উপর পিতার অপ্রতিহত অধিকারের দাবী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমি মনে করি দায় ভাগের তাহা অভিপ্রেত নয়। স্ত্রী জাতির বিশেষতঃ বিধবা বিমাতা ও কন্যা ও পুত্রবধূদিগের সম্পর্কে সম্পত্তির ভাগবণ্টনে তিনি প্রাচীন স্মৃতির সাহায্যে তাঁহাদের প্রাপ্যের অংশ আরো বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। দায় ভাগ সম্পর্কে তাঁহার মীমাংসা সমালোচনার অতীত নহে। তথাপি এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পরিবার এবং সমাজের মধ্যে নারী জাতির স্বাধীনতা আরো বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। সহমরণ নিবারণ কল্পেও তিনি প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। জাতিভেদকে তিনি রাজনৈতিক পরাধীনতার ফল নয়—কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র মতে হিন্দুর সহিত মুসলমানের শৈব বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের কলহের মধ্যে শাঙ্কর অদ্বৈতের প্রয়োজন।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রামমোহন শাঙ্কর বেদান্তের এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা দিলেন। এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবের দেব দেবীদিগের অস্তিত্ব মায়াবাদ সাহায্যে অস্বীকার করিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা চালিত হইয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ হিন্দু ধর্ম্মের মূল ভিত্তি যে বেদ বেদান্ত, তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তাহারা ধ্বংসোন্মুখ, ঠিক সেই সময় রামমোহন শাঙ্কর বেদান্তের ভেরী নিনাদিত করিলেন। এই অদ্বৈতবাদ ও ঐক্য মূলক শাঙ্কর বেদান্ত দ্বারা তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের উপর শাক্ত ও বৈষ্ণবের দৃষ্টিকে অকর্ষণ করিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও তিনি বিচার করিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে রামমোহন যেমন সমস্ত দিকেই শাক্ত ধর্ম্মের উপর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর কথঞ্চিৎ অবিচার করিয়াছেন।

তারপর দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নব্যন্যায়ের কোন উন্নতি উনবিংশ শতাব্দীতে হয় নাই। কারণ এই শতাব্দীতে প্রাচীন প্রথার সংস্কৃত ও শাস্ত্রালোচনা প্রায় হইয়া

যায়। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের দর্শন বাঙ্গালী বিদ্যার্থীকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। এবং রামমোহন প্রবর্ত্তিত বেদান্ত দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের মিশ্রণ হইয়া,—দর্শন শাস্ত্রের এমন এক অদ্ভুত খেচরান্ন দেখা দেয় যে ধর্ম্মান্দোলনের ভিত্তি স্বরূপ ঐ সমস্ত দার্শনিক মতবাদ দর্শনকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিতে না পারিয়া,—দার্শনিক চিন্তাকে ঐ চিন্তার ধারায় সর্ব্ব প্রকার মৌলিকতাকে, নষ্ট করিয়া ফেলিল। বিভিন্ন ভাষ্যকারের বেদান্ত দর্শনের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন,—ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক নব্য ন্যায়ের মত কোন নূতন দর্শন উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিভাগে বাঙ্গালী মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার পরিচয় সন্দেহ নাই।

দর্শন শাস্ত্রের অবনতি

সাহিত্য, সভ্যতার এক অতি বড় অঙ্গ। আলোচ্য শতাব্দীর প্রথমে সংস্কার কার্য্যের জন্য রামমোহনকে বলিতে গেলে বাঙ্গলা সাহিতের গদ্যের অংশ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। বাঙ্গলা গদ্য রামমোহনের পূর্ব্বেও ছিল। কিন্তু রামমোহন সেই গদ্যকে সাহিত্যের পদবীতে আসন দিলেন। লিখিত ও কথিত গদ্য থাকিলেও সাহিত্যে স্থান পাইবার মত বাঙ্গলা গদ্য রামমোহনের রচনাবলির পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাকে সাহিত্য বলিলে অত্যুক্তি হয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য।

রাজনীতি ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তা ও চেষ্টা বিশেষরূপে আলোচনা এই শতাব্দীর মধ্যে হয় নাই। তাঁহাকে কেবল ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া জানিতেই এদিকে আলোচনা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ কেন, ভারতবর্ষে এমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হয় নাই,—যাহার সূত্রপাত রামমোহনের চিন্তা ও রচনাবলীর মধ্যে না পাওয়া যায়। জাতীয় শক্তির সমবায়ে বৈধ উপায়ে ক্রমশঃ রাজনৈতিক উন্নতি লাভের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। একদিকে যেমন রাজার অত্যাচার, তেমনি অন্যদিকে প্রজার নিষ্ফল বিদ্রোহ বা অরাজকতার বিরোধী তিনি ছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে বৈধ উপায়ে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ।

আপনারা জানেন, প্রশ্ন উঠিয়াছে যে রামমোহন, বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব গুলিকে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নষ্ট বা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সত্য কি না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। বিশেষতঃ এই বক্তৃতার অল্প পরিসরের মধ্যে তাহা আমি দিতে পারি না। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ঊনবিংশ শতাব্দীতে হুবহু রক্ষা করা যায় না। গতিশীল জাতি তাহা উন্নতির পথেই হউক, অথবা অবনতির পথেই হউক (কেননা কোন জাতিই কাল স্রোতে, স্থির হইয়া একই স্থানে অবস্থান করিতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজ বিজ্ঞানের অনুমোদিত সমাজের গতি-বিধি আলোচনা করিলেই আপনারা তাহা দেখিতে পাইবেন।) তিনি চারি শতাব্দীর পরে,—পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে গিয়া,—আত্ম রক্ষার্থে

রামমোহন ও বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

অন্তুতঃ—সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্যকেই পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে বাধ্য হন। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কেহই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হুবহু রক্ষা করিতে পারিত না। কোন যুগের কোন বাঙ্গালীই পারে নাই। সুতরাং কোন কোন স্থানে বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য যদি উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে উন্নতি বা অবনতি মুখে তাহার প্রয়োজন ছিল আর ঠিক প্রয়োজন না থাকিলেও, অবস্থাধীনে তাহা না হইয়া উপায় ছিল না। দ্বৈতবাদী ন্যায় দর্শনের স্থানে, রামমোহন শাঙ্কর অদ্বৈত আনয়ন করিয়াছিলেন, তান্ত্রিক কর্ম্মবাদ ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের মধ্যে তিনি বৈদান্তিক জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, গৃহীর পক্ষে যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার বিধি আছে,—ইহা যে কেবল সন্ন্যাসীর জন্য নহে—এই তত্ত্ব এযুগে আবার প্রচার করিয়াছিলেন, শাক্তের মাতৃভাবে উপাসনা ও বৈষ্ণবের কান্তভাবের উপাসনা এই দুই ভাবই রামমোহন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—অথচ নারীজাতির উচ্চাধিকারের তিনি এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপে বাঙ্গালী সভ্যতার কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে তিনি অতীত কাল হইতে নবযুগের বিশালতর ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আবার কোন কোন বৈশিষ্ট্য যেকোন কারণেই হউক,—তাঁহার হাতে পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইতিহাসের চলন্ত স্রোতে কোন বস্তুকেই চিরকাল ধরিয়া রাখা যায় না।

রামমোহনের পর, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে—রামমোহন হইতে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহনে যে বিশদ আলোচনা ছিল, দেবেন্দ্রনাথে তাহা নাই। রামমোহনের শাঙ্কর অদ্বৈত দেবেন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করিলেন। বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করিলেন। বেদের স্থানে আসিল আত্ম প্রত্যয়। মূর্ত্তিপূজা অবশ্য রামমোহনেই ছিলনা। মূর্ত্তি পূজা নাই, বেদ নাই, স্মৃতিকথিত ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্রিয়া কাণ্ড নাই, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনরূপ সংস্কার বা আলোচনাই নাই,—আছে কেবল উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মবাদ, ও তাঁহার উপাসনা। অবশ্য তৎকালীন খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতিবাদও দেবেন্দ্রনাথে যথেষ্ট ছিল। এবং ইহার গুরুত্ব ঐতিহাসিক বিস্মৃত হইতে পারেনা।

মহর্ষিদেবেন্দ্র নাথ

এক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে, ব্রহ্মধর্ম্ম শাক্ত ও বৈষ্ণবের দেশে আর একটা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মরূপে দেখা দিল। রামমোহনের শাঙ্কর অদ্বৈত বাদ মুলক নির্গুণ একেশ্বরবাদ পরিবর্ত্তিত হইয়া উপনিষদের সগুণনিরাকার ঈশ্বর বাদ প্রবর্ত্তিত হইল। "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্মের" স্থানে হইল "ব্রহ্ম ধর্ম্ম"। শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে যে ধর্ম্মের তত্ত্বমীমাংসা রামমোহন করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল "আত্ম প্রত্যয়ের" উপর ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বেদ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম প্রত্যয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পর শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকাতেও আত্ম প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এই আত্ম প্রত্যয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ফরাসীর কার্ত্তেজীয়ান দর্শন হইতে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই দার্শনিক ভিত্তির উপর সগুণ ব্রহ্মবাদ মূলক উপনিষদ বাক্য গুলিকে আহরণ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। "আত্মতত্ত্ব বিদ্যা" নামক একখানি চটিগ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর অদ্বৈতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক শাঙ্কর অদ্বৈত খণ্ডনের চেষ্টা।

দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর অদ্বৈতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া, সগুণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিলেও, তদঙ্গীয় পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন, অথচ বিবর্ত্তবাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মকে "বিবর্ত্ত উপাদানকারণ বলা অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র"। এ অতি অদ্ভুত মীমাংসা; পরিণামবাদও নয়, বিবর্ত্তবাদও নয়, অথচ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশে ও গতিতে কোন একটা মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত যদি দেবেন্দ্রনাথ না দিতে পারিলেন, তবে কি করিয়া অন্ততঃ তিনি শাঙ্কর মায়াবাদের প্রতিবাদ করিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন অতিবড় সৌন্দর্য্যের উপাসক, সাধক ছিলেন, দার্শনিক তত ছিলেন না। তাহাতে তাঁহার চিরপূজ্য মহিমা খর্ব্ব হয় না।

আপনারা দেখিলেন—ফরাসী কার্ত্তেজীয়ান দর্শনের সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের খৃষ্ট প্রীতি সত্ত্বেও তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের "সহজ জ্ঞান" বাদ—এই দার্শনিক ভিত্তির উপরেই, তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাক্ষাৎ আমরা পাই—তাহার

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের দার্শনিকভিত্তি ইউরোপের দর্শন।

ভিত্তি জার্ম্মেনীর হেগেল দর্শনের ইংলণ্ডীয় তর্জ্জমা। তরঙ্গের পুরোভাগে ফেনিল বেদান্তের কলকল ধ্বনি থাকিলেও দেবেন্দ্রনাথ—কেশবচন্দ্র ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি যথাক্রমে ফরাসী, স্কট্‌ল্যাণ্ড, জার্ম্মান, ও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মেরই একটা তদঙ্গীয় দার্শনিক ভিত্তি আছে। বাঙ্গালার শাক্ত বা শৈব ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি, ঠিক শঙ্কর-অদ্বৈত নয় তবে অনেকটা সেই রকম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের

শাক্তধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি অনেকাংশে অদ্বৈত বেদান্ত। বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি "অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ।"

দার্শনিক ভিত্তি না রামানুজী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, না বল্লভাচারী দ্বৈতবাদ, —ইহা জীব গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের "অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ"। বাঙ্গালার শাক্ত ও বৈষ্ণব বৌদ্ধ-প্লাবনের পর অনেকটা বাঙ্গালীর নিজ প্রকৃতি হইতে, স্বরূপ হইতে, জন্মলাভ করিয়াছিল। এই দুই সাম্প্রদায়িক সাধন ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি স্বভাবের নিয়মেই, আপনা হইতেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে দেখা দিয়াছিল। উত্তর ভারতের শঙ্কর অদ্বৈত,

অথবা দক্ষিণ ভারতের বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ বাঙ্গালার কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব কোন ধর্ম্মেরই ভিত্তি হইতে পারে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে কেবল নব্য ন্যায়ের মত কোনরূপ নূতন দর্শনের উদ্ভবই যে শুধু হয় নাই, তাহা নহে। শাক্ত ও বৈষ্ণব বেদান্ত যেমন বাঙ্গালীর নিজস্ব, ব্রাহ্ম বেদান্ত বাঙ্গালীর তেমন নিজস্ব নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে বাঙ্গালার দার্শনিক বৈশিষ্ট্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমি আশঙ্কা করি। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের অত্যুজ্জ্বল অথচ বলপ্রদ প্রভাব হইতে, ব্রাহ্ম, শাক্ত, বা বৈষ্ণব কাহারই এযুগে দূরে থাকা উচিত নয়, কেননা তাহা সম্ভব নয়; তবে দেশীয় দর্শন ও দেশীয় ধর্ম্মের সংস্কার অর্থ যদি তাহাকে এক কালে পরিত্যাগ হয় তবে তাহা পরানুকরণ মাত্র।

এইবার আমি উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিব। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার বলিতেই যুগপৎ পৌরুষ এবং দয়ার অবতার, সেই পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাই সকলের মনে আসে। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনই শতাব্দীর মধ্যভাগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আন্দোলন। পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ করাইলেন। ২৫ সহস্র হিন্দু বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। রামমোহন-প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার রাধাকান্ত দেব সহমরণ নিবারণ কল্পে যেমন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন, তেমনি বিধবাবিবাহ আইনসম্মত করিবার বিরুদ্ধেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। যাহাতে বিধবাবিবাহ-আইন পাশ না হয়, তজ্জন্য তিনি ত্রিশ সহস্র লোকের স্বাক্ষর সংযুক্ত আর এক আবেদন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। রাজদ্বারে যেমন সহমরণ নিবারণকল্পে রামমোহন জয়ী হইয়াছিলেন, তেমনি বিধিবাবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ করার পক্ষে বিদ্যাসাগর জয়ী হইলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই উভয় ক্ষেত্রেই রাধাকান্তদেব রাজদ্বারে পরাজিত হইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাজশক্তির প্রভাবে যেমন সহমরণ প্রথা নিবারণ করিয়া দিলেন, তেমনি বিধবাবিবাহ-আইন সিদ্ধ করিয়াও হিন্দু-সমাজে তাহা আশানুরূপ প্রচলন করিতে পারিলেন না। ভিন্নধর্ম্মী ও বৈদেশিক রাজশক্তি সমাজক্ষেত্রে কোন নূতন প্রথা যত সহজে বন্ধ করিতে পারে তত সহজে প্রচলন করিতে পারে না। কেননা বন্ধ করায় কেবল বল প্রয়োগ বুঝায়। আর প্রচলনকল্পে সমাজের নিজের একটা আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন হয়। সমাজের তাহা নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ সমাজ সংস্কার।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর স্মৃতিবচন উদ্ধার করিয়া হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রথমে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন। পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পুনরায় বৃহদাকারে ঐ গ্রন্থ প্রচার করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য যেমন তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় লইলেন তেমনি

শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়

তিনি অকাট্য যুক্তিরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ঠিক রামমোহনের মতই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে তাহাই চিরন্তন প্রথা ছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত পদ্ধতিতে শাস্ত্র ও যুক্তির যে মণিকাঞ্চণযোগ দেখা গিয়াছে—তাহাতে বাঙ্গালী সভ্যতারও বৈশিষ্ট্য যুগোপযোগিভাবে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ হইতে কেশবচন্দ্র বা এমনকি তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম প্রচারকদের সংস্কার পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ যুক্তির প্রসারই খুব বেশী।

কেশবচন্দ্র ও অসবর্ণবিবাহ ১৮৭২খৃঃর তিন আইনের বিবাহ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খৃঃ তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে কতকাংশে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে তিন আইনের অসবর্ণ বিবাহে জাতিভেদ রহিত হইল, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার গভর্ণমেণ্ট দ্বারা আইনসম্মত বলিয়া গৃহীত হইলেও এবং শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই সমস্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে ইহা আশানুরূপ চলিতেছে না। ইহার কারণ মজ্জাগত রক্ষণশীলতা, প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সৎসাহসের প্রকাণ্ড অভাব, এবং বৈদেশিক রাজশক্তির সহিত স্বদেশীয় সমাজের অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই বলিয়া। এতক্ষণ আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগের কথাই বলিলাম। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতাকে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীতে তাহাকে সংস্কার করিয়া কিরূপে উন্নত মুখী করা যায়—তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কোথায় বা রক্ষিত হইয়াছে এবং কোথায়ও বা হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের অনুকরণ মোহ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত জাতিকে স্বভাবতঃই তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে কৃত্রিম ও অসুস্থ উত্তেজনায় সময় সময় উত্তেজিত করিয়াছে। তজ্জন্য সমাজ সংস্কারে কৃত্রিম উত্তেজনাপ্রসূত চাঞ্চল্যও দেখা গিয়াছে।

সংস্কার যুগের পরে, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগের প্রথম অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে এক প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয় যুগের সূত্রপাত হয়, তাহা আমি প্রথম বক্তৃতাতেই আপনাদের নিকট বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় ছিল শাক্ত আর বৈষ্ণব। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় দেখা গেল শাক্ত বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে ছিল দুইটি প্রধান সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—শাক্ত আর বৈষ্ণব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা গেল, শাক্ত, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্ম। আবার এই ব্রাহ্ম সমাজও—আদি, নব-বিধান ও সাধারণ—তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে এক মহামিলনের জন্য যদি রাজা রামমোহনের পক্ষে শঙ্কর-অদ্বৈত প্রচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে—তবে শাক্ত-বৈষ্ণব এবং তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ব্রাহ্মগণ (যাঁহাদের কোন এক

সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই বিশুদ্ধ শঙ্কর-অদ্বৈতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু যাহারা শঙ্কর অদ্বৈতের উপর খড়্গ হস্ত) ইঁহাদের পরস্পর মতের অনৈক্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী-বিবেকানন্দকেও সেই একই মহামিলনের জন্য শঙ্কর-অদ্বৈতের ভেরী পুনরায় নিনাদিত করিতে হইল। যত্র জীব তত্র শিব। প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যেই যে ব্রহ্ম আছে এই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে নরনারী প্রত্যেকেই জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম। পতিত দেশের নরনারীকে এই কথা আবার বলিবার একটা গুরুতর দায়িত্ব স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন।

কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয় যুগে শ্রীরামকৃষ্ণকে শাক্ত ও পণ্ডিত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যুগাবতার বলিয়া আমি ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। রামমোহন শঙ্কর অদ্বৈতের মধ্য দিয়া যেরূপ তৎকালীন শাক্ত ও বৈষ্ণবকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ নিজ নিজ জীবনের অপূর্ব্ব উদার ধর্ম্মবোধ ও অধ্যাত্ম অনুভূতি দ্বারা শাক্ত, বৈষ্ণব বা এমন কি ত্রিবিধ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের কতকাংশের মধ্যেও একটা মিলন সমন্বয় বা ঐক্য দেখাইয়া গিয়াছেন। সংস্কারযুগ মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ বিবেকানন্দকে তাহা পর্য্যন্ত করিতে হয় নাই। ইহাতে সংস্কারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে।

এই পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছা হইতেই প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত দেখা দিয়াছে। সমাজ সংস্কার উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে তাহার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে একটা রক্ষণশীলমূলক সংস্কার যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ভাব। সমগ্র জাতিকে বিংশ শতাব্দীতে এই প্রতিক্রিয়ার ভাব অনেকটা পরিহার করিতে হইবে ; অন্যথা এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ সুফল দেখা যাইবে না।

কেননা—এই সমন্বয় যুগের পৃথিবীবিখ্যাত প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে—"আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর যদি কোন পুরাণ কোনরূপে বেদের বিরোধী হয়, তবে পুরাণের সেই অংশ নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। শাস্ত্রের এই মতটি কি উদার ও মহান্। সনাতন সত্যসমূহ মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্ত্তন হইবে না, অনন্তকাল ধরিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায়ই ঐগুলি ধর্ম্ম। স্মৃতি অপরদিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে কালে সেগুলির পরিবর্ত্তন হয়। একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকাল পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। * * বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে। সময় স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব্বে পূর্ব্বে স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ হইবে। আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া

"কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম্মগেল মনে করিওনা।

সমাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন। সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকীয়, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না, তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্ত্তব্য সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।"

সংস্কার-যুগের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া স্বামীজী যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার কতকগুলি উক্তি আমি দ্বিতীয় বক্তৃতায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। ঐ সমস্ত উক্তি হইতে আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে স্বামীজী সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাহা নয়। এই জন্য আমি উপরে স্বামীজীর সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞান অনুমোদিত মতটি পুনরায় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। বস্তুতঃ, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সামাজিক অনেক গুরুতর বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতাবলম্বীরা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার আবরণে যেরূপ বিচার বুদ্ধি ও দায়িত্ব-হীনতার পরিচয় দেন, তাহাতে সাধারণের সমক্ষে স্বামী বিবেকানন্দকে অযথা কলঙ্কের ভাগী করা হয়।

আমার পরবর্ত্তী বক্তৃতায় রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস আলোচনা কিরূপ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা রহিল।*

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

ভাঙ্গা বাঁশী

কার্য্যান্তরে গমন হেতু আমার Bar Library যাওয়া আসা এক রকম বন্ধ হয়ে গেল। যে সব বন্ধুদের মুখ প্রত্যহ দেখতুম্, তাঁরা অতীতের স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়ে গেলেন। অনেকের কথা এক রকম ভুলেই গেলুম। দুই চারিজনের ছবি স্মৃতিপটে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে আঁকা রইল। এক মহাজন বন্ধু কিন্তু আমার মনের চিত্রাগারে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রইলেন। তাঁকে রায়সাহেব বলেই পাঠকের নিকট পরিচয় দিব।

রায়সাহেবকে স্মরণ রাখবার আমার অনেকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। তিনি যে কেবল তাঁর সমসাময়িক ব্যারিষ্টারদের মধ্যে একজন successful লোক ছিলেন তা নয়। তা হলে এ প্রসঙ্গের অবতারণা আজ করতুম্ না। তাঁর মত উচ্চমনা এবং কোমলহৃদয় লোক কৃতকার্য্য ব্যবহারাজীবদের মধ্যে আর কাহাকেও দেখেছি বলে মনে হয় না। জুনিয়ারদের প্রতি তাঁর বিশেষ একটা টান ছিল, আর যখন সম্ভব হত, তাদের সাহায্য না করে তিনি থাকতে পারতেন না। সমস্ত Bar Libraryর ভিতর তিনিই আমার প্রতি একটু আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন।

* লেখক কর্ত্তৃক শীঘ্র প্রকাশ্য "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী" নামক দ্বাদশ বক্তৃতায় পূর্ণ বৃহদাকার গ্রন্থের ইহাই নবম বক্তৃতা। বঃ সঃ।

আমি বড় নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলুম। Libraryতে আমার নিজের কোণে বসে থাকতুম, কারও সঙ্গে বড় কথা-টথা কইতুমনা। আমার প্রতিও কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যারিষ্টার বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করতেন না। আমার একটু লেখার অভ্যাস গোড়া থেকেই ছিল। একদিন একটী ইংরাজি কাগজে আমার একটা লেখা বেরুলো। লেখাটি বোধ হয় ভালই হয়েছিল। কারণ সেটী বেরোবার দুই চারিদিন পর রায়সাহেব নিজেই এসে আমার সঙ্গে প্রবন্ধটী নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন, আর উৎসাহ বাড়াবার জন্যে বেশ দুই চারিটী মিষ্ট কথা আমায় বল্লেন। আমি তাঁর মত লোকের প্রশংসাবাদ শুনে বড় আপ্যায়িত হলুম। এর পর রায়সাহেব দুই একটী ব্রিফ (Brief) ও আমায় পাঠিয়ে দেন। এইসব কারণে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক একটা টান ছিল।

রায়সাহেবের করুণ এবং উদার হৃদয়ই যে কেবল লোককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতো তা নয়। তাঁর মত সুপুরুষ Bar Libraryতে দ্বিতীয়টী ছিলেন না। তাঁর চেহারা তাঁর মনের উচ্চতা সুন্দররূপে ব্যক্ত করতো। তাঁর শরীরটী ছিল অতি সুগঠন এবং বাহুল্যবর্জ্জিত। আর তাঁর মুখাকৃতির মধ্যে একটা classical সামঞ্জস্য ছিল যা আমাদের এই মেলেরিয়া-প্রপীড়িত এবং অম্লরোগ-নির্য্যাতিত বাঙ্গলা দেশে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়ে থাকে। তাঁর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তাঁর ক্ষোদিত প্রস্তর মূর্ত্তির মত মুখটীকে এমন একটী আড়ম্বরশূন্য সৌন্দর্য্য দিয়েছিল যা দেখে রংএর ছটা একটা vulgar জিনিস বলে মনে হত। আর সবের উপর তাঁর উজ্জ্বল মেধাব্যঞ্জক চক্ষু দুটীর মধ্যে এক করুণ বিষাদের ভাব ছিল যা দেখে মনে হত তাদের অন্তরালে ভাবের কোন সুন্দর এবং বিচিত্র খেলা চলেছে। তাঁর ঋজু গঠন, উন্নত গ্রীবা এবং কর্ত্তৃত্বব্যঞ্জক হাব-ভাব কিন্তু একথাও প্রকাশ করতো যে জগতে উচ্চ হবার অভিলাষ অর্থাৎ ambitionও তাঁর মনে যথেষ্ট মাত্রায় বিরাজ করছে। এই ভাবটী কিন্তু তাঁর চোখ দুটীর এবং মুখের কবিত্বময় ভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খেত না। তিনি সেই জন্য কখন কখন একটা মূর্ত্তিমান প্রহেলিকার মত দেখাতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো তাঁর অন্তরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে অহরহঃ এক দ্বন্দ্ব চলেছে, আর সেই দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনকে শান্তিশূন্য করেছে।

যেদিন হাইকোর্ট ছাড়লুম সেইদিন থেকে তাঁর সঙ্গে দেখাশুনাও বন্ধ হল। মধ্যে মধ্যে তাঁর বাড়ীতে দেখা করবার সঙ্কল্প করতুম, কিন্তু সেটা কার্য্যে পরিণত হত না। Bar ছাড়বার দুই বৎসর পর একদিন সন্ধ্যার সময় Eden Gardensএ বেড়াতে গিয়েছি। Band standএর নিকট পাদচারণ করতে করতে হঠাৎ দেখলুম একটী বেঞ্চে রায়সাহেব একেলা বসে আছেন। নিকটে গিয়ে অভিবাদন করলুম। আমার সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে তিনি বড়ই আনন্দিত হলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বল্লেন "অনেকদিন পর আজ তোমার সাথে দেখা হল; এস, একটু বেড়ান যাক।" আমি আনন্দে সম্মতি দিলুম। দুইজন তখন Garden ছেড়ে মাঠে

নাবলুম। রায়সাহেব বল্লেন "আমি Practice ছেড়েছি শুনেছ ?" আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম "আপনি অমন লাভের Practice এত শীঘ্র কেন ছাড়লেন ? আরও ৭।৮ বৎসর তো অনায়াসে কায করে যেতে পারতেন।"

একটা ক্ষীণ হাসি হেসে রায়সাহেব বল্লেন "কোর্টের ভণ্ডামি আর ভাল লাগে না।" আমি বল্লুম "আইনের ব্যবসার মত মহৎ ব্যবসাকে আপনি ভণ্ডামি বলেন! আমাদের ব্যারিষ্টার ভাইয়েরা শুনলে বলবে কি ?"

রায়সাহেব—"চুলোয় যাক তোমার ব্যারিষ্টার ভাইয়েরা। প্রত্যহ সত্যকে মিথ্যা বানাতে বানাতে, রামের ধন শ্যামকে দিতে দিতে, আর কালোকে ধলা সাজাতে সাজাতে আমার নিজের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। Practiceটা ছেড়ে তবু একটু শান্তি পেয়েছি। ভগবান কি এই অদ্ভুত ব্যাভিচারের জন্যই মানুষকে তার প্রতিভা দিয়েছেন ?"

অনুমোদনের প্রবৃত্তিটা দমন করে আমি বল্লুম "কেন, সকলেই ত অমন করে আসৃছে। ঐ দেখুন C সাহেব। তিনি বলেন, "আইনের বই ছাড়া অন্য বই পড়ার মত পাপ পৃথিবীতে আর নাই। আইনের বইয়েতে ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, রাজনীতি সবই আছে। লোকে যে কেন আইনের অত সব মহা মহা Standard বই আর সর্ব্বজন মান্য authoritative decisions থাকতে অন্য রকম সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয় তা আমি বুঝতে পারি না।"

সি (C) সাহেবের এই উক্তি শুনে রায় সাহেবের মুখে এমন একটা ঘৃণার ভাব প্রকটিত হয়েছিল, যা, সে সময়ে কোন Leonordo da Vanci কিম্বা Van Dyke থাকলে আর্টে অমর করে যেতে পারতেন। আর C সাহেবের প্রতি তিনি যে বিশেষণটার প্রয়োগ করলেন, সেটা ছাপাবার মানসিক কিম্বা নৈতিক সাহস আমার নাই। উত্তেজিতকণ্ঠে আমায় তিনি বল্লেন "আমাকেও কি তুমি ঐসব লোকেদের মধ্যে গণ্য কর ?"

আমি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্লুম, "ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি যে চক্ষে দেখি Barএর আর কাকেও সে চক্ষে দেখি না। আমাদের সমব্যবসায়ীদের মতের কথা আপনাকে বলেছিলুম মাত্র; তুলনার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।"

রায় সাহেব—"সম ব্যবসায়ীদের আর তাদের মতের কথা আর আমায় বলোনা। আমি তাদের যথেষ্ট দেখেছি, আর তাদের মতও যথেষ্ট শুনেছি। ওসব দুঃস্বপ্ন যত শিগ্‌গির ভুলতে পারি ততই ভাল। আমার জন্ম হয়েছিল অন্য কাযের জন্য। কেবল লোভে পড়ে আর পৃথিবীর একজন বড় মানুষ হবার নীচ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আমি হৃদয়ের অঙ্গুলি সঙ্কেতকে তাচ্ছিল্য করে এই soul destructive (আত্মঘাতী) ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলুম। স্বকৃত এই মহাপাপের শাস্তিও আমি পেয়েছি। আমার সমস্ত জীবন একটা প্রকাণ্ড মরুভূমির মত নিষ্ফল হয়েছে।"

আমি বল্লুম "আপনার জীবন নিষ্ফল হয়নি। আপনার দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হয়েছে।"

রায়সাহেব—"সেসব কি আমার ব্যারিষ্টারি না করলে হ'তনা? আসল কথা তা নয়। আমি জন্মেছিলুম আর্টের জন্যে আর সাহিত্যের জন্যে। আমি যদি আর্ট কিম্বা সাহিত্য নিয়ে থাকতুম তাহলে জগৎকে স্থায়ী কিছু দিয়ে যেতে পারতুম। কিন্তু নীচ স্বার্থের পথে গিয়ে আমি আমার হৃদয়ের প্রেরণাকে তাচ্ছিল্য করেছি, আর আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে হেলায় নষ্ট করেছি।"

এই কথাগুলি বলতে বলতে ভাবাবেশে রায় সাহেবের চক্ষু দুটী জ্বলতে লাগলো। আমি কি উত্তর দিব কিছু ঠিক করতে পারলুম না। কেবল বল্লুম, "আপনাকে দেখলে আর আপনার কথা শুনলে আপনি যে একজন artist সে বিষয় কারও সন্দেহ থাকেনা!"

আবিষ্টের ন্যায় রায়সাহেব বল্‌তে লাগলেন "শুন, আবদুল্লা, আমার কথা শুন। হুগলি জিলার এক সঙ্গতিপন্ন জমিদার গৃহে আমার জন্ম। অতুল বিভবের অধিকারী না হলেও আমার বাবা বেশ একজন বিত্তবান লোক ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি অত্যন্ত ambitious এবং সম্মানলোভী ছিল। সরকারের বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তিনি বড় ভাল বাসতেন আর নানাবিধ Public কাযে অংশ নিয়ে দেশের লোকের এবং সরকারের কাছে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টায় সর্ব্বদা তিনি ব্যস্ত থাকতেন। শেষ জীবনে তিনি রাজসরকার থেকে রায়বাহাদুরের উপাধিও পেয়েছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র সন্তান। তাঁর ভবিষ্যৎ আশা ভরসা তিনি সব আমার উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। আমি কবে হাইকোর্টের বেঞ্চে বসবো, কিম্বা Advocate Generalএর গাউন পরব, সেই সুদিনের স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন।

"আমার মা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। আর তাঁর প্রাণে যথেষ্ট কবিত্বও ছিল। ভাবপূর্ণ সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে তিনি বন্ধু বান্ধবদের পড়ে শুনাতেন। প্রকৃত সৌন্দর্য্যামোদীর মত তাঁর সৌন্দর্য্য জ্ঞান আমাদের বাড়ীর প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে প্রকটিত হতো। ঘরের সাজ-সজ্জা, আসবাব পত্রের বিন্যাসের ধরণ জিনিষ পত্রের পারিপাট্য, ফার্ণিচারের বাহুল্যহীন সুরুচিসম্মত গঠন আমার মার সৌন্দর্য্যানুভূতির কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করতো। বাবার স্থূল প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু এসব একেবারেই স্থান পেতনা। তিনি বেশীর ভাগ সময় বাইরের ঘরে থাকতেন আর সেখানে নিজেকে আড়ম্বর, ধূমধাম এবং জাঁকজমকে পরিবৃত রাখতে ভালবাসতেন। প্রকৃত tasteএর তিনি বড় একটা ধার ধারতেন না। আর কবিতা দেবীর অঙ্গনে কখনও তিনি ভুলেও পা দিতেন না। তাঁর অনিচ্ছাবশতঃই মার কবিতাগুলি কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমার মা বিনা অনুযোগে বাবার আদেশ এবং ইচ্ছা শিরোধার্য্য করতেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে তাঁর আন্তরিক দুঃখের কথা আমি স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারতুম।

"আমাতে আমার বাবার এবং মায়ের দুই বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির একটা

সামঞ্জস্যহীন মিলন ঘটেছিল। প্রবল এক সৌন্দর্য্য পিপাসা আমার মনে ছেলেবেলা থেকে আত্ম প্রকাশের চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে ambition এবং খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাও আমার প্রাণকে বাল্যকাল থেকে চঞ্চল করে রেখেছে। কেবল অল্পদিন থেকে এই শেষোক্ত বৃত্তির তাড়না আমি অনুভব করিনি।

"আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়েই সরস্বতী নদী প্রবাহিতা। নদীর পাশে একটা বড় মাঠ আছে। ছেলেবেলায় নদীর তটে আর মাঠের মধ্যে খেলা করতে আমি বড় ভালবাসতুম। তখনকার কথা মনে হলে শরীর এখনও পুলকে শিউরে উঠে। মাঠে রাখাল বালকদের সঙ্গে হা-ডু-ডু, ঘোল ঘোল, ধাসা প্রভৃতি খেলার স্মৃতি এখনও আমার মনে জেগে আছে।

"ক্ষীণাঙ্গিনী সরস্বতী যখন বর্ষার জলে দুকূল ডুবিয়ে সমুদ্রের পথে ছুটতো, আমার খেয়ালও তখন তার সঙ্গে তার সুদূর অভিসারের পথে ভেসে যেতো। গাছে যখন কোকিল ডাকতো, আর বউ কথা কও পাখী যখন তার সোনার পোষাক পরে ঝোপের ভিতর থেকে অবিরাম ভাবে তার বউয়ের কাছে তার মিনতি জ্ঞাপন করতো, তখন আমার মনে হতো পৃথিবী কি সুন্দর। এখানে আছে কেবল আনন্দের সঙ্গীত, সোহাগের মিনতি আর প্রেমের আব্দার। পায়রার দল যখন ক্ষেতে বসে আহার করতো তখন তাদের পালকের বর্ণচ্ছটা, তাদের লাল ঠোঁটগুলির সুললিত গঠন, আর তাদের রাঙ্গা পায়ের তালবদ্ধ গতি কি অপূর্ব্ব আনন্দে আমার মনকে অভিষিক্ত করে দিত।

"আবার সন্ধ্যার সময় শ্মশানের সঙ্গীহীন তেঁতুল গাছটীর মধ্যে কত ভূত প্রেতের খেলাই না আমি দেখতুম, আলেয়ার গতিশীল আকস্মিক জ্যোতি তখন কত রোমাঞ্চক ভাবই না আমার মনের মধ্যে জাগিয়ে দিত!

"মাঠের মাঝখান দিয়ে যে পথ চলে গেছে, সেই পথে সকালে চাষাদের গিন্নি বউয়েরা চেঙ্গারী মাথায় করে হাটে বাজারে যেতো; পথিকেরা Canvasএর ব্যাগ হাতে করে ছোট ছোট নারকুলি হুকা টানতে টানতে সেই পথ দিয়ে তাদের কার্য্যক্ষেত্রে যেতো; নিষ্ঠাবান গ্রাম্য রমণীরা দলবদ্ধ হয়ে গল্প করতে করতে সেই পথ দিয়েই আবার গঙ্গাস্নানে যেতো। আমি গাছের আড়ালে বসে তাদের সব দেখতুম, আর তাদের কথা ভাবতুম। কোথা থেকে তারা আসে আর কোথায় তারা যায়; কাদের তারা গিন্নী, আর কাদের তারা বউ; তাদের ঘরগুলো কেমন কেমন, আর তাদের দিন গুলো কেমন করে কাটে; এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমি একেবারে তন্ময় হয়ে উঠতুম।

"রাত্রে আমাদের বাড়ির উঠানে রূপকথার বৈঠক হতো। পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সেখানে এসে জড় হতো। বড় একটা মাদুর বিছিয়ে আমরা সব তাতে বসতুম; আর মা, দিদিমা এবং আর আর প্রাচীনাদের জিদ করে গল্প বলতে বাধ্য করতুম। ছেলেবেলার সেইসব কথা-কাহিনী শুনে যে আনন্দ পেয়েছি এখন Hamlet আর Faust পড়ে তার শতাংশের একাংশও

পাই না। সেই তীব্র অনুভূতি এখন চলে গেছে। সুখের কথা শুনে প্রাণ আনন্দে তেমন আর নাচে না; দুঃখের কাহিনী চোখ দিয়ে সেই অশ্রুর বন্যা আর বহায় না। বাল্যের সেই কোমল দরদী হৃদয় সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে এখন পাষাণের মত কঠিন হয়ে পড়েছে।"

আমি প্রতিবাদ না করে এখানে থাকতে পারলুম না, বল্লুম "আপনার হৃদয়ের কোমলতা এখনও যায় নি। ব্যবহারিক জীবন আপনাকে যেমন অবিকৃত রেখেছে, তেমন আর কাউকে রাখতে পারে নি।"

রায় সাহেব একটু বিরক্তির স্বরে বল্লেন "আমি যখন ছেলে মানুষ ছিলুম, তোমার তখন জন্মও হয় নি। আমার মধ্যে পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা তুমি কি করে জানবে? যাক্, আমার কথা শুন, তর্ক তোমার আদালতের উকিলদের জন্য তুলে রাখ।

"একবার আমাদের পুরাণ চাকর খেনুর সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে আমি বাঁশের একটী ছোট বাঁশী কিনে আনি। সেই বাঁশীটী শেষে আমার প্রাণ স্বরূপ হয়ে পড়েছিল। বনে, মাঠে, নদীর তীরে বসে সেই বাঁশীটী বাজাতে আমি বড় ভালবাসতুম। কখনও গাছের ঝোপে সেই বাঁশীটীর সঙ্গে আলাপ করতুম; কখনও কোন নির্জ্জন পুকুর পাড়ে সেই বাঁশী বাজাতে বাজাতে ভাবে বিভোর হয়ে যেতুম; আবার কখনও নৈশ নিস্তব্ধতায় ছাদে বসে সেই বাঁশীর মধ্যে আমার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস ঢেলে দিতুম। আমার সুখ, আমার দুঃখ; আমার আনন্দ, আমার বিষাদ,—আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা সমস্তই সেই বাঁশীর সুরে ফুটে উঠতো। কখনও সেই বাঁশীর স্বরলহরী সমীরণে কেঁপে কেঁপে নাচতো, কখনও তার আনন্দ-গীতিতে তটিনী সৈকত মুখরিত হতো, আবার কখনও তার ব্যাথার মূর্চ্ছনায় প্রকৃতি বিষাদে ভরে যেতো। বাঁশীর মধুর সুরটী যখন নেচে নেচে, কেঁপে কেঁপে আকাশে উঠতো আমিও তখন কোন আলোয় গড়া arielএর মত তাতে চড়ে পরীর দেশে চলে যেতুম। খাবার কথা, শোবার কথা, পড়ার কথা তখন আমি একেবারে ভুলে যেতুম। আমার চেতনার মধ্যে তখন থাকতো কেবল সেই বাঁশীর মধুর স্বর লহরী, আর থাকতো আমার ভাবের সেই সোনার রাজ্য।

"বাবা মাঝে মাঝে আড় চোখে আমায় দেখতেন। মনে হতো যেন আমার কথা নিয়ে তিনি একটু ভাবাচিন্তা করছেন। এই সময় একদিন তখনকার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার Mr. Banerjee আমাদের আতিথ্য স্বীকার করলেন। তার অভ্যর্থনার মহা ধুমধাম পড়ে গেল। নিকটস্থ গ্রাম সমূহের ভদ্রলোকেরা তাঁর দর্শনের জন্য দলে দলে আমাদের বাড়ি আসতে লাগলেন। তিনিও রাজোচিত বিনয় নম্রতার সহিত তাঁদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করে তাঁদের আপ্যায়িত করলেন।

"আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবার মনে যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেটা এবার দূর হল। আমাকে ব্যারিষ্টারি পড়াবার জন্য তিনি স্থিরসঙ্কল্প হলেন। আমিও যে কালে Banerjee সাহেবের মত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করতে পারবো এই আশা এখন বাবার মনকে জুড়ে বসলো। Banerjee

সাহেবের সামনে আমার ডাক পড়লো। আমায় তিনি পরীক্ষা নিয়ে বাবাকে বল্লেন "বেশ intelligent ছেলে, তবে পড়া শুনায় ততটা মনোযোগ দেয় নি। এখন থেকে একে একটু আঁটা-আঁটির মধ্যে রাখা ভাল।

"তখন আমার বয়স মাত্র নয় বৎসর। Banerjee সাহেবের উপদেশে বাবা আমায় কলিকাতায় রাখবার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। আমার মাঠে-ঘাটে ঘোরা, বিরলে বসে বাঁশী বাজান আর চাঁদনীর রাতে রূপকথা শুনা সব বন্ধ হল। এক সপ্তাহ পরে বাবা আমায় নিয়ে কলিকাতায় এলেন, আর একজন খুব কড়া শিক্ষকের হাতে আমার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। আসবার সময় বাঁশীটীও কাঁদতে কাঁদতে অন্যান্য খেলনার সঙ্গে দেশে ছেড়ে এলুম।

"কলিকাতায় বাবা আমায় হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি আর ambition বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই আমি পেয়েছিলুম। এখানকার আবহাওয়ায় এই প্রবৃত্তিগুলি খুব সবল হয়ে উঠলো। নিজের ambitionএর তাড়নে আর বাবা এবং শিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহে আমি খুব মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করতে লাগলুম। প্রথম পরীক্ষাতেই ক্লাসে শীর্ষস্থান অধিকার করলুম। বাবা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলেন।

"বয়সের সঙ্গে আমার উৎসাহ, ambition এবং একাগ্রতা বাড়তে লাগলো। Entrance, F. A. B. A. তিনটী পরীক্ষাতেই ইউনিভার্সিটীতে আমি প্রথম স্থান অধিকার করলুম। বাবা তখন উপযুক্ত আয়োজন করে আমায় বিলাতে পাঠালেন। সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারী পাশ করে তিন বৎসর পরে আমি দেশে ফিরে এলুম আর হাইকোর্টে নাম লিখিয়ে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করলুম।

"এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার অতীত গ্রাম্য জীবনের কথা, আমার কল্পনা-জল্পনার কথা, আমার বাঁশীর কথা অবশ্য মধ্যে মধ্যে মনে পড়তো। কিন্তু এসবের দিকে অনুরাগ দেখলেই বাবা, আমার শিক্ষক মহাশয় এবং Banerjee সাহেব আমায় সতর্ক করে দিতেন। কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমার মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় ছিল। গুরুজনের উপদেশ অনুজ্ঞা আমি বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য্য করে নিতুম। পরীক্ষার কৃতিত্বও আমায় তাঁদের উপদেশের অনুসরণে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতো।

"ব্যারিষ্টারিতে আমি আশাতীত সাফল্য লাভ করলুম। অল্পদিনের মধ্যে আমার বেশ পশার প্রতিপত্তি হয়ে গেল। আমাদের ব্যবসায়ে একবার পশার হলে টাকার অভাব থাকে না। আমার বেলাতেও তাই হল। অর্থ পিপাসার কিন্তু নিবৃত্তি নাই। যত উপায় করতে লাগলুম টাকার লোভও ততই বাড়তে লাগলো। ব্যবসায়ে তখন আমি একেবারে মেতে গেলুম।

"বাল্যের ভাব-প্রবণতা কিন্তু আমাকে একেবারে ছাড়েনি। পর্ব্বতাভ্যন্তরস্থিত অগ্নি প্রবাহের ঊর্দ্ধগমন-প্রয়াস যেমন মধ্যে মধ্যে সমস্ত পর্ব্বতকে চঞ্চল করে তুলে, আমার

আত্মার উর্দ্ধগমনপ্রয়াসও আমাকে তেমনি মধ্যে মধ্যে চঞ্চল করে তুলতো। সে উত্তেজনা কিন্তু আমার মনকে বেশীক্ষণ চঞ্চল রাখতে পারতো না।

"সংসারের মোহ স্ববলে সেটাকে তাড়িয়ে আমায় আবার পূর্ব্বাচরিত অর্থোপার্জ্জনের পথে টেনে নিয়ে যেতো।

"ছয় মাস পূর্ব্বে কিন্তু এক অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা এসে আমার সমস্ত জীবনকে উলট পালট করে দিলে। আমার জীবনসঙ্গিনী আমায় শোকে ভাসিয়ে পরলোকে অন্তর্দ্ধান করলেন। আমাদের সন্তান-সন্ততি কেহ ছিলনা। আমি মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মত একেবারে ভুমিতে লুটিয়ে পড়লুম। সমস্ত জীবন আমাবস্যার রাত্রের মত অন্ধকার মনে হতে লাগলো। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে কয়েক দিন কাটালুম। তারপর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলুম। Practice করা তখন আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একবার ভাবলুম কিছুদিনের জন্য বিলাতে যাই। কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি হলনা। সেখানে কে আছে, কার কাছে যাব? তারপর ভাবলুম Darjeeling কিম্বা শিলং হয়ে আসি। তাতেও মন উঠলোনা। কলিকাতার নির্জ্জনতাই আমাকে পীড়িত করে তুলেছিল; সেখানে গিয়ে শেষে পাগল হয়ে না ফিরি। বাল্যের সুখ-স্মৃতি-জড়ান দেশের বাড়ির কথা তখন মনে পড়লো। ভাববার একটা বিষয় পেলুম।

"ধীরে ধীরে সেই সুদূর বাল্যজীবনের কথা আমার মনে পড়তে লাগলো। মার অসীম স্নেহের কথা মনে পড়লো। দিদিমার যত্ন আদরের কথা মনে পড়লো। বাবার গভীর অথচ ভ্রান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়লো। যে-দিন দেশ ছেড়ে কলিকাতায় এসেছিলুম সেদিনকার মার বাষ্পাকুল দৃষ্টির কথা মনে পড়লো, দিদিমার রুদ্ধ কণ্ঠের আশীর্ব্বাদের কথা মনে পড়লো। আমার Entrance পরীক্ষার ফলের গেজেট হাতে করে বাবা যখন আমার কৃতিত্বের খবর আমায় শুনিয়েছিলেন তখনকার তাঁর সেই গর্ব্বস্ফীত চেহারার কথা আমার মনে পড়লো।

"কোথায় এখন আমার সেই স্বজনেরা? একে একে আমাকে ছেড়ে সকলেই অনন্তধামে চলে গিয়েছিয়েছেন। কালের স্রোত আমার জীবনের শেষ অবলম্বনটাকেও এবার ভাঁসিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সংসারে এখন আমি প্রকৃতই একজন অনাথ; জীবন পথের এখন আমি প্রকৃতই একজন সঙ্গীহীন পথিক।

"আবার সেই জন্মভূমিতে ফিরে যাবার একটা অদম্য বাসনা এসে তখন আমার মনকে জুড়ে বসলো। আমার অন্তরাত্মা বলতে লাগলো আমি সেখানেই শান্তি পাব, আর কোথাও পাবনা। আর দেরী করতে পারলুম না। সেই দিনই আবশ্যকীয় জিনিসপত্রগুলি একটী গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে নিয়ে দেশে ফিরলুম।

"আমাদের সেই পুরাণ চাকর ধেমু অনেক দিন পূর্ব্বে মারা গিয়েছিল। তার ছেলে

রাম আমায় অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। তাকে দেখে ধেনুর কথা আমার মনে পড়্‌লো। চেহারায়, হাবভাবে, ধরণ ধারণে সে ধেনুর একটী নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তি। সেই ধেনুর মত মিশমিশে কাল রং, সেই ধেনুর মত খাঁদা বোঁচা নাক, সেই ধেনুর মত সরল অকপট হাসি, আর ঠিক সেই ধেনুরই মত বাৎসল্যপূর্ণ অথচ স্বসম্মান সম্ভাষণ। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ তার অসমাপ্ত কাজ তার সন্তান-সন্ততির হাতে ছেড়ে যায়। কর্ত্তব্য-পরায়ণ ধেনুও তার অসমাপ্ত কাজ তার রামের হাতে ছেড়ে গেছে। আমার অসমাপ্ত কাজ আমি কার হাতে ছেড়ে যাব?

"ভাবতে ভাবতে আমি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলুম। সেখানে এখন কেবল এক প্রাচীনা বিধবা আত্মীয়া একটী কুঠরিতে থাকতেন আর এই বাড়ির দেখাশুনা করতেন। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলুম। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি আমার জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। আমি তখন আমার সেই বাল্যের লীলাভূমির এদিক ওদিক দেখতে লাগলুম। সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা যা একদিন আমাদের আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হতো, আজ সেটী আরব্যউপন্যাসের কোন উজাড় সহরের মত নিস্তব্ধ পড়ে আছে। আলিসা থেকে বালি খসে পড়েছে। উঠানে আগাছার বন হয়েছে। মেজেতে শেওলা জমেছে। শ্রীহীনতার চিহ্ন সর্ব্বত্রই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"মরিচাধরা তালাটী খুলে মার কুঠারিতে প্রবেশ করলুম। সেই চিরপরিচিত কুঠারিটী পূর্ব্বাবস্থাতেই রয়েছে। কেবল দেওয়ালে, ছবিগুলির উপর আর আসবাব সামগ্রীর মধ্যে মাকড়সা তার জাল বিছিয়েছে। ঝুলে আর ধূলায় জিনিস পত্রগুলি মলিন হয়ে পড়ে আছে। মার জন্য তারা যেন তাদের শোকের বেশ পরেছে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অন্য-মনস্কভাবে মার আলমারির একটী Drawer খুল্লুম। Drawerএর এক কোণে আমার বাল্যবস্থার একখানি আলোক-চিত্র একটী রূপার ফ্রেমে পড়ে আছে দেখলুম। চিত্রটীর পাশেই সাটিনে মোড়া একটি লম্বা জিনিষ আমার দৃষ্টিতে পড়্‌লো। কৌতূহলপরবশ হয়ে সেটী তুলে তার আবরণটী খুল্লুম। ভিতরে দেখি কিনা আমার সেই পুরান বাঁশী! আমার স্নেহময়ী মা সেটীকে সযত্নে এই চারু আবরণে কোন মহামূল্য রত্নের মত লুকিয়ে রেখেছেন। বাঁশীটী এখন শুকিয়ে ফেটে ফেটে গিয়েছে।

"আমি আর থাকতে পারলুম না। বাঁশীটী হাতে করে একটী চেয়ারে বসে পড়লুম। দুই চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগলো।

"পরদিন সকালে সেই বাঁশীটী নিয়ে আমার সেই চির পরিচিত মাঠের দিকে গেলুম। ক্ষীণাঙ্গিনী সরস্বতী ক্ষীণতর হয়ে আগের মতই সমুদ্রের পথে চলেছে, কিন্তু আমার কল্পনার ভেলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা সে আর করলেনা। সেই বিভীষিকাময় তেঁতুল

গাছটী নদীর তীরে এখনও একেলা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমাকে পূর্ব্বের মত তার ডালপালা নেড়ে তার রহস্যের ভাণ্ডার খুলে আর দেখালেনা। সেই সরু গ্রাম্য পথটী জলার উপর এখনও বিছান রয়েছে আর তার উপর দিয়ে পথিকের দল আগের মতই তাদের গন্তব্য পথে চলেছে, কিন্তু আমাকে বুকে করে পরীর দেশে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা সে আর করলেনা। পাখিগুলি গাছে বসে আগের মতই গাইছে, কিন্তু তাদের সঙ্গীতে যোগ দিতে আমায় তারা আর ডাকলেনা। গাছের ডালপালাগুলি বাতাসে আগের মতই নড়ছে, কিন্তু আমায় তারা আগের মত তাদের নাচে যোগ দিতে আর সাধলেনা। আমায় এখন তারা সব ভুলে গেছে। আমি আর তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই!

"ব্যথিত মনে তখন বাঁশীটী নিয়ে বাজাবার চেষ্টা করলুম। দুই একবার সেটি পোঁ, পোঁ, ফিস, ফিস, করে উঠলো, কিন্তু তার মধ্যে সেই প্রাণমাতানো স্বর-লহরীর কোন সন্ধান আমি আর পেলুম না। তার প্রাণ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কেবল তার শুষ্ক দেহটী এখন পড়ে আছে।

"সব ছেড়ে নিজের জীবনের কথা তখন ভাবতে লাগলুম। আমারও প্রকৃত প্রাণ কি আমায় ছেড়ে যায় নি? বাল্যের সেই অভ্রচুম্বী আশা, সেই অতুল ভাব-সম্পদ, সেই অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার সেই দৈবদত্ত সৌন্দর্য্যানুভূতি—এসব কি আমার স্থূল সাংসারিক লোভের চাপে, আমার নীচ ambitionএর নিষ্পেষণে বিনষ্ট হয়ে যায়নি? ভগবানের নিকট থেকে বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে আমি জগতে এসেছিলুম, সে সম্পদের কি সদ্ব্যবহার আমি করেছি? বাঁদর যেমন মুক্তা চিনে না, আমিও তেমনি এই সম্পদের মূল্য বুঝিনি। সংসারের কতকগুলো রঞ্জিত কাচ খণ্ডের লোভে এই অমূল্য রত্নের হারকে আমি মাটিতে লুটিয়েছি! আমার জীবনের এই দীর্ঘ পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে আমার অস্তিত্বের সমর্থনের জন্য, ভগবান যে মহামূল্য দৌলৎ আমার হাতে দিয়েছিলেন তার হিসাব তাঁকে দিবার জন্য কি আমি করেছি?

"হাঁ, হাঁ করেছি বইকি! লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছি; সত্যকে অগণ্যবার মিথ্যে বানিয়েছি, মিথ্যেকে সত্য বানিয়েছি। করেছি বইকি; গরীবের রক্ত শোষণে ধনীকে সাহায্য করেছি, দুর্ব্বলের দলনে সবলের অমোঘ অস্ত্র হয়ে নিজের দ্যুতিতে জগৎকে চমকে দিয়েছি। করেছি বইকি; মনুষ্য-শার্দ্দূল এটর্ণিকে পিতৃহীন অনাথের, অভিভাবকহীন বিধবার অবাধ ভক্ষণে যথেষ্ট সাহায্য করেছি। করেছি বইকি,—কপর্দ্দকহীন খাতকের শেষ আশ্রয় তার বাস্তু ভিটাকে শেরিফের নিলামে তুলতে, শনিগ্রস্ত দেউলিয়াকে কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভিতর পুরতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছি! কি করিনি আমি? যথেষ্ট করেছি। এটর্ণি মহাজনদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলি সগর্ব্বে মাথা তুলে আমার কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। খাতকের শুষ্ক মলিন মুখ আমার প্রতিভার অপূর্ব্ব দাহনশক্তির শরীরী প্রমাণ-রূপে জগতের দিকে করুণনেত্রে চেয়ে আছে।

মন্দিরের ভগ্নচূড়া, মসজিদের ভগ্ন প্রাচীর—আমার অলৌকিক আইন জ্ঞানের কথা ভক্তসমীপে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করছে। অন্তর্যামী জানেন, আমি যা করেছি, যথেষ্ট করেছি।

"অনুশোচনার তীব্রজ্বালায়, আত্মঘৃণার তীব্র দংশনে আমি অধীর হয়ে পড়লুম। আমার সেই স্নেহময়ী ধাত্রী সরস্বতীকে সাক্ষ্য করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলুম, আইনের ব্যবসায়ে আর ফিরবোনা। জীবনের শেষ দিনগুলি পতিতপাবন ভগবানের চিন্তায়, দুঃখী-দরিদ্রের সেবায়, আর আমার বাল্যের সেই দেবদত্ত অনুভূতির পুনরুদ্দীপনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করবো। প্রতিভার নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ আবার জ্বলুক আর না জ্বলুক, অন্তরে অন্ততঃ তাতে শান্তি পাব। আমার মত মূঢ়ের পক্ষে তাও যথেষ্টের চেয়ে বেশী হবে।

"রাত্রে সেই বাঁশীটী যত্নে বালিশের নীচেয় রেখে মার সেই পুরাণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করলুম। আমার সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলি গতিশীল চিত্রের ফিল্মের মত আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে অস্পষ্টতর হয়ে সেগুলি শেষে আমার তন্দ্রার জোয়ারে ডুবে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। তখন এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখলুম।

"আমি যেন সরস্বতীর তীরে হাতে মাথা দিয়ে পড়ে আছি। আমার বাঁশীটীও আমার সামনে ঘাসের উপর পড়ে আছে। আমি অন্যমনস্কভাবে সেটীকে দেখছি। হঠাৎ সেটী কেঁপে বাড়তে আরম্ভ করলে। আমি চমৎকৃত হয়ে দেখতে লাগলুম। বাড়তে বাড়তে সেটী ফেটে দুভাগ হয়ে গেল আর তার ভিতর থেকে আমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে এক অলোক সামান্য রূপবতী রমণী বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল অপূর্ব্বদর্শন একটী সোনার বাঁশী। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। অতি মধুরকণ্ঠে আমার দিকে চেয়ে সুন্দরী বল্লেন "আমায় চিনতে পারছ?"

আমি মাথা নেড়ে বল্লুম "না, আপনি কি স্বর্গের কোন দেবী না কিন্নরী?

সুন্দরী বল্লেন "আমি হচ্ছি এই বাঁশীর প্রাণ। আমার কথা ভেবেছিলে বলে তোমায় দেখা দিতে এসেছি।"

আমি অনুযোগের স্বরে বল্লুম "আমার বাঁশীকে ছেড়ে তাহলে আপনি চলে গেলেন কেন?"

সুন্দরী ঈষৎতীক্ষ্ণ স্বরে বল্লেন "আমায় যে তাচ্ছিল্য করে, তার কাছে থাকবার আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

আমি কুন্ঠিত হয়ে চুপ করে রইলুম। কি বলবো ঠিক করতে পারলুম না। সুন্দরী তখন স্মিতমুখে বল্লেন "অনেক দিন পর আমায় স্মরণ করেছ; আজ তোমায় কিছু বাজিয়ে শুনাই।" আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কিছু বলবার আগেই তার সেই বাঁশীর সুর আমার শ্রবণে প্রবেশ করে আমার মন-প্রাণকে মোহিত করে দিলে।

"নদী প্রান্তর, বৃক্ষলতা, জল স্থল সুন্দরীর বাঁশীর সেই স্বর্গীয় তানে নাচতে লাগলো। এক

অপূর্ব্ব পুলকে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠলো। আমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে সেই নদীতটস্থ বনথেকে অনুপম লাবণ্যবিশিষ্ট, বিচিত্র কুসুমাভরণে সজ্জিত এক যুবক যুবতীর দল বের হয়ে এল, আর মধুর অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নাচতে লাগলো।

"সে কি অপরূপ দৃশ্য! সেই নৃত্যশাল যুবক যুবতীদের কটাক্ষে থেকে মন্মথের ফুলশর অজস্র ভাবে ছুটাছুটি করতে লাগলো। তাদের প্রত্যেক ভঙ্গিমাতে প্রেমের উৎস যেন উথলে উঠতে লাগলো। আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে লাগলুম। ক্ষণেক পরে বাঁশী থামিয়ে সুন্দরী সঙ্কেত করলেন, আর অমনি নিমেষের মধ্যে সেই নৃত্যশীল যুবক যুবতীর দল সেই বন মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আমি কথা বলতে যাচ্ছিলুম এমন সময় সুন্দরী এক নূতন সুর ধরলেন। সে সুরের রুদ্রতেজে জল স্থল কেঁপে উঠলো। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে লম্ফ দিয়ে কোন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবমান হবার একটা উৎকট প্রবৃত্তি আমার মনের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠলো। সুন্দরীর তর্জ্জনী সঙ্কেতে প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলুম বন জঙ্গল সেই নদীতট থেকে অদৃশ্য হয়েছে আর তাদের জায়গায় কোন ইউরোপীয় নগরীর প্রশস্ত রাজপথ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। নগরীর আকার প্রকার দেখে মনে হল আমি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দেখতে পাচ্ছি। রাজধানীর সেই পথ দিয়ে অসংখ্য নরনারী পতাকা হাতে করে কেউ "Liberty" কেউ "Equality" কেউ "Faternity" বলে চীৎকার করতে করতে দলবদ্ধ হয়ে পরিমিত পাদক্ষেপে বাজনা বাজিয়ে চলেছে। তাদের সেই বাজনার সঙ্গে সুন্দরীর বাঁশীতে মিলে "La Maisecllee's" এর উন্মাদনাময় সুরকে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে বাজিয়ে তুললে। আমি মোহাবিষ্টের মত শুনতে লাগলুম। বাদ্য বন্ধ হল। আমি চমকে দেখলুম প্যারিসের সেই রাজবর্ত্ত চলে গেছে আর তার সঙ্গে সেই বিপ্লবপন্থী জনপ্রবাহও শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

"সুন্দরী তখন এক নূতন সুর ধরলেন। এ সুরের মধ্যে প্রথম সুরের কোমল গুঞ্জনও ছিল না আর দ্বিতীয় সুরের গভীর বজ্রনিনাদও ছিল না। এতে ছিল অনন্ত, অফুরন্ত আশার মৃদু গম্ভীর মর্ম্মর ধ্বনি, ভগবদ্ভক্তির আবেগময় ঝঙ্কার, আর বিশ্ব প্রেমের উচ্ছ্বাসময়, উন্মাদনাময় মধুর গম্ভীর কল্লোল। সেই স্বরলহরী আমার মন প্রাণকে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয়ভাবে বিভোর করে দিলে। ভক্তির অমৃতময় উৎস আমার অন্তর থেকে উথলে উঠতে লাগলো। আমার দৃষ্টি আপনা থেকেই দিগন্তের দিকে চলে গেল।

"সেখানে দেখলুম আকাশের গায়ে হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘগুলি বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র হয়ে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। আর তাদের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ-সিংহাসনে এক মহাপুরুষ বসে আছেন। তাঁর শরীর থেকে এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক আভা বার হয়ে সমস্ত জগৎকে আলোকিত করেছে। আর তাঁর পদতলে কোটী কোটী জন প্রাণী এবং নরনারী ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। স্বতঃ-

প্রণোদিত হয়ে আমিও তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণত হলুম। এক অপার্থিব আনন্দে আমার মন প্রাণ ভরে গেল।

"হঠাৎ সুন্দরীর হস্ত-স্পর্শে আমি চমকে উঠলুম। তাঁর বাদ্য তখন থেমে গেছে। দেখলুম সেই অলৌকিক দৃশ্যও দিগন্ত থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে চাইলুম। তিনি বল্লেন "এস, এবার তোমায় অমরলোকে নিয়ে যাই। ভগবানের দরবার তোমায় দেখিয়ে আনি।"

"সুন্দরী আমার হাত ধরে শূন্যপথে উঠলেন। আমিও অক্লেশে তাঁর সঙ্গে বায়ুপথে চলতে লাগলুম। পৃথিবী থেকে আমাদের দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে লাগলো। ঘর, বাড়ী, গাছ, বন ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মনে হতে লাগলো। মেঘের পর মেঘ ছেড়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড গোলকের মত দেখাতে লাগলো। ক্রমে সহর জনপদ, নদ নদী প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হতে লাগলো। আমরা আরও উপরে উঠতে লাগলুম। ভূগোলকটী ক্রমেই ক্ষুদ্রতর দেখাতে লাগলো। এর মধ্যে আমরা পৃথিবীর মত একটী নূতন জগতের সামনে এসে পড়েছিলুম। সেখানে কেবল শুষ্ক মরুভূমি আর প্রস্তরময় পর্ব্বত দেখতে পেলুম। সুন্দরী বল্লেন এই হচ্চে চন্দ্রলোক। আমরা চন্দ্রকে ছেড়ে আরও উপরে উঠতে লাগলুম। পৃথিবী একটা জ্যোতিষ্কের মত দেখাতে লাগলো। চন্দ্রের গোলকটীও ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বোধ হতে লাগলো। এইরূপে অনেক গ্রহ, অনেক উপগ্রহ অতিক্রম করে আমরা এক অন্তহীন প্রচণ্ড অগ্নিপিণ্ডের সামনে এলুম। ভয়ে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপতে লাগলো। সেই অগ্নির ভীষণ গর্জ্জনে আমার কাণ বধির হয়ে যেতে লাগলো। আমরা অবিরামগতিতে আরও ঊর্দ্ধে উঠতে লাগলুম।

"ক্রমে অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য সূর্য্য, অসংখ্য গ্রহমালা অতিক্রম করে আমরা এক অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয় দেশে এসে উপস্থিত হলুম। সেখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই অনুপমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে চলতে চলতে আমরা অনতিবিলম্বে এক অতি সুন্দর নগরে প্রবেশ করলুম। দেখলুম আমাদের সামনে এক অতিপ্রশস্ত রৌপ্যনির্ম্মিত রাজপথ বিস্তৃত রয়েছে। সেই পথ দিয়ে আমরা চলতে লাগলুম। পথের দুই পার্শ্বে সুরম্য উদ্যান সমূহের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত এবং বিচিত্র বর্ণের মণিমাণিক্যে খচিত প্রাসাদগুলি এক অপূর্ব্ব শোভা বিকীর্ণ করছিল। অনুপম সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, চিরযৌবনসম্পন্ন নরনারীগণ বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হয়ে সেই পথ দিয়ে ইতস্ততঃ চলাফেরা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমার মন ব্যগ্র হয়ে উঠছিল, কিন্তু সুন্দরী আমাকে তার কোন অবসর না দিয়ে দ্রুত পথ অতিক্রম করে চললেন। আমিও অগত্যা তাঁর অনুসরণ করলুম।

"অনেকক্ষণ চলবার পর আমরা অতি মনোরম রম্য কাননের মধ্যে অবস্থিত এক কল্পনাতীত

সৌন্দর্য্যময় প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলুম। প্রাসাদটী যে কি উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত বুঝতে পারলুম না। একটী সুবৃহৎ জ্যোতিষ্কের মত সেটী জ্বলছিল। প্রাসাদের অগণ্য সোপানাবলী অতিক্রম করে, এক অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় দালান পার হয়ে আমরা এক প্রকাণ্ড হলের মধ্যে প্রবেশ করলুম। হলের গুম্বজগুলি আকাশ স্পর্শ করছে বলে মনে হল।

"হলের প্রান্তভাগে এক প্রকাণ্ড বেদীর উপর এক উজ্জ্বল সিংহাসনে এক মহাপুরুষ বসেছিলেন। তাঁকে দেখে সেই মেঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের কথা আমার মনে পড়লো। তাঁর শরীরের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমার পার্থিব চক্ষু দুটী যেন ঝল্‌সে যেতে লাগলো।

"হলে প্রবেশ করেই সুন্দরী একান্ত ভক্তির সাথে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কল্লেন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর অনুসরণ করলুম। সুন্দরী আমায় মৃদুকণ্ঠে বল্লেন "আমাকে মনে করেছিলে বলে ভগবানের দরবার আজ তোমায় দেখিয়ে দিলুম। চারি দিক দেখে তোমার জন্ম সার্থক কর।"

"আমি চক্ষু ফিরিয়ে দেখলুম ভগবানের সিংহাসনের তলে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সিংহাসনে অপূর্ব্ব জ্যোতিবিশিষ্ট মহাপুরুষেরা বসে আছেন। তাঁদের মুখাবয়ব দেখে পৃথিবীর কথা স্মরণ হল। দুই একজনকে তাঁদের মধ্যে আমি চিনতেও পারলুম। সুন্দরী আমায় তাঁদের পরিচয় দিতে লাগলেন। বল্লেন "ইনি হচ্চেন বাল্মীকি," "ইনি হচ্চেন হোমার," "ইনি হচ্চেন দান্তে।" এইরূপে অনেক মহাজনদের আমায় দেখিয়ে দিলেন। আমাদের যুগের Darwin, Dickens, Victor Hugo প্রভৃতি মহাত্মাদেরও সেখানে দেখতে পেলুম। তাঁদের সমস্ত শরীরের মধ্যে এক অলৌকিক জ্যোতি, এক অবর্ণনীয় লাবণ্য এসেছে। তাঁদের মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় শান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

"ক্ষণেক পরে সুন্দরী বল্লেন "এখানে তিষ্ঠিবার তোমার অধিকার নাই। এস আবার তোমায় পৃথিবীতে রেখে আসি।" একান্ত ভক্তির সঙ্গে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আমরা দুইজনে বাইরে চলে এলুম। সুন্দরীকে তখন জিজ্ঞাসা করলুম "এই মহাপুরুষেরা এমন কল্পনাতীত সৌভাগ্য কি করে পেলেন?" সুন্দরী বল্লেন "আমার বরেই পেয়েছেন।" আমি চমৎকৃত হয়ে বল্লুম "আপনার এত ক্ষমতা?" সুন্দরী মৃদু হেসে বল্লে "আমি কেবল তোমার বাঁশীর প্রাণ নই। আমি শিল্পেরও প্রাণ, সাহিত্যেরও প্রাণ। আমিই হচ্চি সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমার বরেই লোক কবি হয়, শিল্পী হয়, গায়ক হয়, বাদক হয়। আমিই তাদের সাধনা সার্থক করি। আমিই তাদের ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় দরবারে নিয়ে আসি।"

"বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে সুন্দরীর দিকে চেয়ে অতি করুণ কণ্ঠে আমি বল্লুম "আমাকেও তাহলে বর দিন। আমিও এই অমর পুরীতে আসতে চাই।"

সুন্দরী স্নেহের কোমল স্বরে বল্লেন "বাছা তোমাকে বর দিবার ক্ষমতা আমার আর নাই।

দেবী হলে কি হবে, তোমারই মত আমিও নিয়তির অধীন। তোমার সুযোগ একদিন এসেছিল কিন্তু তুমি তাকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সম্পদকেই কাম্য বলে গ্রহণ করেছ। তুমি যা চেয়েছিলে ভগবান তোমাকে তা দিয়েছেন। এখন অন্যায় আব্দার করলে চলবে কেন! এস তোমায় রেখে আসি। সুন্দরী আমার হাত ধরলেন। আমরা শূন্য পথে নামতে আরম্ভ করলুম। শোঁ শোঁ করে আমরা নেমে আসছি এমন সময় দরজায় হঠাৎ খট খট্ শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"উঠে দেখি সকাল হয়ে গেছে। প্রভাত সূর্য্যের আলো আমার কামরায় প্রবেশ করেছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমার বিধবা আত্মীয়াটী বলছেন,—উঠ বাবা, বেলা হয়ে গেছে, চা খাবে এস।"

রায় সাহেব হঠাৎ স্তব্ধ হলেন। আমি নিবিষ্টমনে তাঁর কথা শুনছিলুম। চমকে উঠে বল্লুম "কি চমৎকার স্বপ্ন।" আমরা এর মধ্যে motor stand এর কাছে এসে পড়েছিলুম। রায়সাহেব ঘড়ি বার করে বল্লেন "গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেছে। নটা বেজেছে।" তিনি তাঁর মোটরে উঠলেন। আমিও বিদায় অভিবাদন করলুম। মোটর stand থেকে বের হতে লাগলো, রায়সাহেব আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন "বুড়োকে একেবারে ভুলোন। মাঝে মাঝে দেখা কোরো।"

"নিশ্চয়" বলে আমিও বাড়ির পথ নিলুম।

শ্রীএস্, ওয়াজেদ আলি

সিরাজ-সমাধি

সিরাজ! সিরাজ! জাগো, জাগো, জাগো! এখনো ঘুমে?
পুরুষ-সিংহ, নাশো হুঙ্কারি' জড়তা-লেশ!
আঁখি মেলে ছাখো, আজি বাঙ্‌লার কি দীন-বেশ!
জনগণ সহে কত রোগ শোক জন্মভূমে!
কত প্লীহা ফাটে! ক্ষুধাতুর তবু চরণ চুমে!
বিলাস পঙ্কে ডুবে আছে কত কুকুর মেষ!
এই কি তোমার স্বর্গতুল্য সোণার দেশ!
শৃগাল শকুনি মেতে আছে যেথা খাবার ধুমে!

বঙ্গাধিপতি, হেথা নির্জ্জনে আসিয়া আমি,
ফিরিয়া যাব কি সজল নেত্রে দেখা না পেয়ে!
দেখা দাও মোরে! দেখা দাও, আমি পুণ্যকামী!
পাষাণ্-বোর্‌কা উন্মোচি' শুধু ছাখো গো চেয়ে!
স্মরিব এ কৃপা, যাবজ্জীবন, দিবস যামী!
কাঁদায়ো না আর! কাঁদিতেছি কত দুঃখ পেয়ে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সাহিত্যের সমালোচনা

কাহারো কোনও রচনার সমালোচনা করা যে ইংরাজী সাহিত্য হইতে ধার করিয়া আনা—বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। তাই ইহার ধরণ ধারণ হুবহু ইংরাজী কছমের করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, এবং আজকাল জাতীয়তার মিথ্যা দোহাই দিলেও করা হইতেছে। সত্য কথা বলিতে গেলে মনে হয় যেন ইংরাজ জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধ বা Æsthetic sense আমাদের চেয়ে বেশী প্রবল; তাই তাহাদের দেশে যে সব সমালোচক অথবা সমালোচনার যেসব কষ্টি পাথর অথবা standard জন্ম পাইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা পায় নাই। নব্য বাংলা সাহিত্যের গর্ভে যেদিন সমালোচনার জন্ম হইয়াছিল, সেদিন হইতে আজি তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সে বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হইয়া আসিতেছে, এবং আরো দুঃখের বিষয়, সে এখনো নাবালকই আছে, বিশ্ব সভায় সাবালকের অধিকার সে আজও পায় নাই।

ইংরাজী সাহিত্যে বহুদিন হইতে judicial criticism বা তুলনামূলক সমালোচনা প্রচলিত ছিল। ইহার এক সময়কার চাঁই Jeffrey কলমের জোরে Wordsworth এর যুগান্তরকারী কাব্যগ্রন্থ Lyrical Balladsকে কিছুদিন বগলচাপা করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইহারি বলে এলিজাবেথীয় যুগে Ben Jonson নাট্যপ্রতিভায় Shakespeare এর চেয়ে বড় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে Coleridge ও Hazlitt প্রভৃতির মনীষা অন্যপথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তাঁহারা যেখানে সুষমা, সামঞ্জস্য, গভীরতা পাইতেন তাহাকেই সরস্বতীর দরবারে উচ্চাসন দিতেন, তুলনার ধার বড় ধরিতেন না। তাঁহাদের যাহা ভালো লাগিত, তাহাকে তাঁহারা সকল অসঙ্গতিগুলি বাদ দিয়া আপনার মতো করিয়া গড়িয়া লইয়া তাহারি প্রশংসায় মুগ্ধ থাকিতেন। এইখানে সমালোচনা judicial না হইয়া হইল aesthetic; বিচার- বা তুলনা-মূলক নহে, সৌন্দর্য্য- ও সুষমা-মূলক। বর্ত্তমান সমালোচকেরা আরো বেশীদূর গিয়াছেন; মহামনীষী ফ্রাঁস্ বলেন—"The critic is a sensitive soul detailing his adventure among masterpieces." অধ্যাপক Spingarn এই মতের একজন পাণ্ডা। তিনি বলেন,—"As for me, I redream the poet's dream."

এই মত মানিতে হইলে নিজের বিশেষত্বকে অনেকটা না-মানিতে হয়। শরৎচন্দ্র সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন কিনা দেখিবার আগে দেখিতে হয়, ইনি যে-নীতি প্রচার করিতেছেন তাহাকে সত্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন কিনা। সুনীতি বা দুর্নীতির আদর্শ সকলের কাছে এক নয়। মতবাদের প্রভেদ থাকা সম্ভব, স্বাভাবিকও বটে। সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও এইরকম একটা বিভিন্নতা রহিয়া থাকে; তাই বলিয়া কেহই বলিতে পারেনা সত্য একটী মাত্র, এবং সেইটীকে

বাদ দিয়া আর-সব মিথ্যা। তাই আজকালকার সমালোচনা সত্যের সমালোচনাকে বাদ দিয়া চলে। জীবনের সম্বন্ধে একটা না একটা মতবাদ প্রত্যেক গুণীই পোষণ করেন, তা তিনি ভাস্কর, চিত্রকর, কবি, ঐতিহাসিক বা দার্শনিকই হউন। এই philosophy of life তাঁহার প্রতি রচনায়ই ফুটিয়া উঠে ; দেখিতে হইবে, তাঁহার সত্যকে তিনি সত্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিনা ; সুন্দর, সুষম, সমঞ্জস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিনা। তাই যদি তিনি করিয়া থাকিতে পারেন, তবে তাঁহার philosophy প্রচলিত নৈতিক বিধানের মতই প্রতিকূল হউক্ না কেন, সাহিত্যের বিশ্বসভায় সে অক্ষতদেহে বাহাল-তবিয়তে বিরাজমান থাকিবে।

সমালোচনা-সাহিত্য-বিষয়ে বাংলা ইংরাজীর একশত বৎসর পিছনে পড়িয়া হাঁপাইতেছে। বাঙালী সমাজে এখন একটা সহসা-পরিবর্ত্তনের কাল ; তাহার সাহিত্যও তাই ধীরে ধীরে polemical বা তর্কমূলক হইয়া উঠিতেছে। সমালোচনার ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহাদের নূতন ভাব সমাজ সমস্যার নূতন নূতন সমাধান কিছুতেই বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করিয়া গ্রহণ করিবার মতো শক্তি বা ঔদার্য্য নাই। সকলেই সঙ্কীর্ণমনা, এক একটী বিশিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত। ইঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিলে হাসি আসে, কান্নাও পায়। কেহ কেহ দাঁড়ি পাল্লা লইয়া বিচার করিতে বসেন, অমুক লেখকের রচনার মধ্যে কতটুকু বিদেশী, কতটুকু বঙ্কিম বাবু আর কতটুকু স্ব-সৃজিত। সাহিত্যের আলোচনা যে গহনার পান্-মাপা বা আলু-পটোলের ব্যবসা নয়, সেকথা অনেক সমালোচক প্রবরই মনে রাখিতে পারেন না।

বর্ত্তমান সমাজবিপ্লবের তরঙ্গে পড়িয়া বহু পুরাতন আদর্শ ও ভাব ডুবিয়া যাইতেছে ; তাহার সাথে সাথে নূতন নূতন আদর্শ ও ভাবের আমদানী হইতেছে। কাজেই গোঁড়াদল যে সমালোচনা করিতেছেন, তাহা সাহিত্য-সমালোচনা না হইয়া, দাঁড়াইতেছে লেখকের ধারণার সমালোচনা। শাস্ত্রমতে আছে, বিধবার পক্ষে প্রেমে পড়িতে নাই। পড়িতে নাই বটে, কিন্তু পড়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ, অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইলে অমন করিয়া শাস্ত্রনিগড়ের বাঁধন দিতে হইত না। জগতে যাহা হয়, তাহাকে অস্বীকার করিবার অধিকার সাহিত্যের নাই। তাহাকে আপনার মনের রসে নিষিক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার সাহিত্যের সব-সময়েই আছে, এবং নিছক বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে তফাৎ এইখানেই। এখন যদি কোন নব্য গ্রন্থকার এই স্বাভাবিক সত্যকেই মঙ্গল মনে করিয়া বিধবার প্রেমের ছবি আঁকেন তবে তাহাকে খারাপ বিষয় বলিয়া চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইলে তাহাতে সরস্বতীর সেবা হইবেনা, বরং তাঁহার বাহন রাজহংসটার গলা টানিয়া ছেঁড়ার সামিল হইবে।

বিষয়টা যে কি, তাহা লইয়া মাথাব্যথা করিবার দিন আর নাই। সে যাহাই হউক না কেন, তাহাকেই সত্য করিয়া, সুন্দর করিয়া বলা হইয়াছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালো বাসিয়াছিল, ভ্রমর সারাজীবন ধরিয়া গোবিন্দলালের উপর অভিমান করিয়াই

রহিল ;—ইহা শাস্ত্রসম্মত কি না, জানিতে চাওয়া বাতুলতা। মানুষের মন বেড়া ভাঙিয়া চলে বলিয়াই তো শাস্ত্র-বন্ধন! কিন্তু গোবিন্দলালের যদি বিতৃষ্ণা না আসিত, রোহিণী নিশাকরকে ভালো না বাসিয়া যদি রূপোকে ভালোবাসিত, ভ্রমর যদি মরণ-শয্যায় শুইয়া গোবিন্দলালকে দেখিতে না চাহিত, তবেই বলিতাম, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সাহিত্য হয় নাই, মিথ্যাকথার হাঁড়ি হইয়াছে। মানুষের জীবনে চোখেলাগার মতো দুই-চারিটা বড় কাজ শাস্ত্রের মহিমার ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু তাহার মনের অন্তরালে যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব অহর্নিশি লাগিয়াই আছে, তাহা বেশীর ভাগই অশাস্ত্রীয়। সাহিত্যে তাহারি ছায়া পড়ে; বর্ত্তমান সাহিত্য এই অন্তর্নিগূঢ় দ্বন্দ্বকেই লোকচক্ষুর গোচর করিতে চায়। এই পরস্পরবিরোধী মানসতরঙ্গগুলিকে যাঁহারা সত্যভাবে ফুটাইতে পারেন নাই, তাঁহারা যথার্থ সাহিত্যের জন্ম দিতে পারেন নাই। ইব্‌সেন-টুর্গেনিভ্, ফ্রাঁস্-বেনেট্, শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ, সকলেই মনের এই ফল্গুধারাকে লোকচক্ষুর গোচর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই গুণী বলিয়া মানুষের কাছে বিখ্যাত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সাহিত্যে, বিশেষতঃ উপন্যাস ও গল্পে পাপচিত্র বড় বেশী করিয়া অঙ্কিত হইতেছে বলিয়া বহুলোক আক্ষেপ করিতেছেন। সত্য বটে, উপন্যাস সাহিত্যে একমাত্র বিষয় বলিতে গেলে প্রেম; এবং শুনা যায়, শাস্ত্রমর্য্যাদা মানিয়া চলা নাকি তাহার বেশী অভ্যাস নাই। কিন্তু এমন 'চিত্র' থাকে শুধু বটতলার নভেলেই, এবং তাহা পড়িবার জন্য দায়ী বিকৃত-রুচি পাঠক। ঐ বইগুলি বাহির হইয়াছে বলিয়াই যে পাঠকের রুচি কদর্য্য হইয়াছে, তাহা নয়; পাঠকের রুচি কদর্য্য বলিয়া সে এইসব বই পড়িতে চায়, এবং চায় বলিয়াই এসব ওঁছা কদর্য্য বই বাহির হইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর লেখক যাঁহারা, তাঁহারা কখনও 'পাপচিত্র' অঙ্কিত করিতে ব্যস্ত হন্ না; জীবনের স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও গভীরত্বকেই তাঁহারা ফুটাইয়া তোলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজিকার কাব্য, উপন্যাস ও নাট্যকলা মনের সেই অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্বকেই লোকচক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর করিতেছে; যাঁহারা ইহার ব্যাপ্তি ও গভীরত্বকে দেখাইতে পারেন না, মাত্র একটী দিক্‌কে ফুটাইতে চাহেন, তাঁহাদের সাহিত্য কখনো চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

তাই যখন দেখি, সমালোচনার দুইটী পরস্পরবিরোধী অর্থ আজকাল বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত, তখন দুঃখ হয়। কাহারো প্রশংসা এবং আর কাহারো নিন্দাবাদ, ইহা করিলেই সমালোচনা হয় না। জীবনটা একটা মহারহস্য; জীবনের গভীরতম স্তরে গিয়া যাঁহারা সত্য-সন্ধানের প্রবল চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ গুণী; রুচি ও প্রকৃতি-গত ভিন্নতার জন্য সকলের চেষ্টা একপথে যায় নাই, তাই সাহিত্যে ঐ দুর্ব্বোধ্য রহস্যটীকে ভেদ করিবার বহুপথের সন্ধান আছে। তাঁহাদের সেই চেষ্টাগুলিকে বুঝিতে হইবে—মনকে প্রসারিত করিয়া, আপনার চিন্তা ও কল্পনাকে সহানুভূতির ফলে যখন তাঁহাদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে সত্যসত্য গভীর জ্ঞান জন্মিবে, তখনি সমালোচনার জন্ম হইতে পারে; নহিলে যাহা হইবে, তাহার নাম পল্লবগ্রাহিতা,—হয় ফেনানো ভাষায় বিজ্ঞাপন-

বিশেষ, নয় তাঁহাদের মতবাদের উপর একটা হিংসা ও বিদ্বেষ-পূর্ণ কুটিল কটাক্ষ। আপনার শ্রেয় প্রেয়ের ধারণাটাকে একটু মুলতুবি না রাখিতে পারিলে সমালোচনা হইতেই পারে না, আর বাংলা সাহিত্য যেদিন এই এক ধাপ পার হইতে পারিবে, সেই দিনই সে সত্যসত্য সমালোচনার জন্ম দিতে পারিবে। সে শুভদিন না আসা পর্য্যন্ত বাঙালীর সাহিত্যচর্চ্চা অনেকটা নিস্ফল হইয়াই থাকিবে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ

মহামানব

মহা ভারতের মহা সাধনার সিন্ধু-মথন ধন
কে তুমি উরিলে হে মহামানব অমিয়া পূরিত মন ?

ভোগের অতীত বিরাগ-জড়িত দিব্য লোচন যুগ,
করুণা তরল অশ্রু-সজল জ্যোতি-উচ্ছল মুখ।

পুণ্য-কবাট আয়ত ললাট দৃঢ়তার চিরবাস,
নাসার নিশাসে চিত্ত-নিরোধ পলে পলে পরকাশ।

কণ্ঠে মধুর মুক্তি-মন্ত্র জলদ-মন্দ্রে জাগে,
হিংসা মথিয়া শান্তি বিথারে দিশি দিশি অনুরাগে।

কোটী কোটী কোটী তাপিত জনার শরণ—উদার বুক,
পশি' ও হৃদয়ে সকলের পাপ লজ্জায় অধোমুখ।

এক করে বর, অপরে অভয় জনে জনে করদান,
লোটে পশুরাজ পদতলে ভুলি' হিংসার অভিযান।

দক্ষিণে বামে শক্তি ও ক্ষমা,
দোঁহার মাঝারে তুমি
মোক্ষ-মূরতি কে অবতরিলে
তারিতে ভারতভূমি ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

সমুদ্রগুপ্ত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেণুরব

সেইদিন প্রভাতে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দ্রুতপদে উত্তরদিক্ হইতে পাটলীপুত্রাভিমুখে আসিতেছিল। তখনও অন্ধকার দূর হয় নাই, বৃক্ষতলে বেণুকুঞ্জে ঘন অন্ধকারের ধ্বংসাবশেষ লুকাইয়াছিল। পাটলীপুত্র তখনও বহুদূরে, চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে জানিয়া বৃদ্ধ রাত্রি-শেষে যাত্রা করিয়াছিল। তীরভুক্তির সমতল প্রান্তরের শেষে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন বেণুকুঞ্জ হইতে সুমধুর বংশীরব বৃদ্ধকে বিপথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ বেণুকুঞ্জের নিকটে পৌঁছিবামাত্র বংশীরব স্তব্ধ হইয়া গেল, বৃদ্ধ সহসা দাঁড়াইল, রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে আসিয়াছে বুঝিয়া বৃদ্ধ যখন আবার পথের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল, তখন বেণুকুঞ্জের অন্তরাল হইতে কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বুড়ো, ও বুড়ো, তুই কি খুঁজছিস্?" মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উত্তর দিল, "পথ খুঁজছি বাবা—অন্ধকারে পথ হারিয়ে গেছি"।

যে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে আবার জিজ্ঞাসা করিল "পথ ত সবাই হারায়, তার মধ্যে কজন পথ খুঁজে পায়? বুড়ো তুই পাগল হয়েছিস—চোখ বুজে কখনও পথ পাওয়া যায়?"

সহসা বৃদ্ধের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, সে ঊষার ঈষৎ আলোকে রাজপথের অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া বেণুকুঞ্জের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সেই প্রশ্নকারী বলিল "পথ ত তোর সম্মুখে রয়েছে"।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

উত্তর হইল "আমি রাখাল। গরু চরাই, এখানে অনেক লোক পথ ভুলে যায় বলে শেষ রাত্রিতে এসে বসে থাকি"।

"তুমি কেমন করে জানলে যে আমি পথ ভুলে গেছি?"

"সবাই যে এই রকম করে পথ ভোলে বাবা!"

"বালক তুমি একবার বাহিরে এস"।

আহ্বানমাত্র এক অনিন্দ্যসুন্দর গৌরকান্তি বালক বেণুকুঞ্জের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ঊষার আলোকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিল যে বালক শ্যামকান্তি নহে, গৌর বর্ণ। সে কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার মুখে তখনও গুম্ফের রেখা দেখা দেয় নাই। সন্ন্যাসী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, বালক তাহার চিন্তাভঙ্গ করিয়া কহিল, "কই কি বলবি বল্ না বুড়ো!"

বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "না কিছুই বলছি না বাবা আমাকে পথটা দেখিয়ে দাও।"

"তুই নগরে যাবি ত? এই দেখ, এই বাঁশের বন ধরে চলে যা, তাহলে গঙ্গার ধারে পৌঁছবি।"

বৃদ্ধ বিদায় হইয়া চলিয়া গেল। তখন বালক বামাকণ্ঠে বেণুকুঞ্জের দিকে চাহিয়া বলিল "কি ঠাকুর বাহিরে এস না গো?

এক গৈরিক বসন পরিহিত ব্রহ্মচারী বেণুকুঞ্জের বাহিরে আসিয়া বলিল "ঠিক হয়েছে, তুমি পারবে।"

বালক কহিল, "পারব ত বলছি ঠাকুর কিন্তু গরু টরু আমি চরাতে পারবো না।"

"সেই রাখাল বালককে গরু নিয়ে আসতে বলেছি, তার গোপাল সেই চরাবে, তুমি কেবল বাঁশী বাজিও। দেখ দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে আস্‌ছে, এই পথে এখনই একজন লিচ্ছবী রাজা আসবে। তাকে কোন রকম করে রাজপথ থেকে ফিরিয়ে যে পথে সন্ন্যাসীকে পাঠিয়েছ, সেই পথে পাঠিয়ে দিতে পারলেই কার্য্য সিদ্ধি।"

"এখনও ঝোপে ঝোপে অন্ধকার রয়েছে ঠাকুর, তুমি কিন্তু এখন যেয়ো না। আমার এখনও ভয় করছে। আমরা নগরের স্ত্রীলোক বলে জঙ্গলে ঘোরা কি আমাদের কাজ?"

"আমাকে যে রাজপথে যেতে হবে, তা নইলে সে লিচ্ছবী রাজাকে কেমন করে এ পথে ফেরাব?"

"না না ঠাকুর তুমি যেয়ো না তাহলে আমি পালাব।"

"ঐ দেখ সেই রাখাল আস্‌ছে, সে একদণ্ডের মধ্যে তার গরুর পাল নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হবে। আমি যাই তা নইলে এত কষ্ট এত চেষ্টা সমস্ত বৃথা হয়ে যাবে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ব্রহ্মচারী চলিয়া গেল। বালকবেশী রমণী অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বংশী বাদন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। একদণ্ডের মধ্যে রাখাল তাহার গোপাল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বালকবেশী রমণী বংশী-বাদন পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "রাখাল তুই বাঁশী বাজাতে পারিস?"

রাখাল বলিল "না" এবং তাহার বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ শুষ্ক মধূক চর্ব্বণে ব্যাপৃত হইল। বালকবেশী রমণী তাহাকে সঙ্গীতে বীতরাগ দেখিয়া একমনে বংশী বাদন করিতে আরম্ভ করিল।

বিলম্বে শীতের সূর্য্য পূর্ব্বদর্শন দিল, রাখাল-বালক-বেশী রমণী তখনও তাহার বেণুদণ্ড নির্ম্মিত বংশী হইতে অমৃতবর্ষণ করিতেছিল। পথশ্রান্ত অশ্বারোহী কোন সময়ে বেণুকুঞ্জের প্রান্তে তাহার অশ্বের গতি সংযত করিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সহসা বংশীরব থামিল, সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত জগৎ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল, রমণী দেখিল এক দীর্ঘাকার অশ্বের আরোহী

একমনে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। অশ্বারোহী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাপু কোন পথে গেলে পাটলীপুত্রের তীর্থ পাব বলতে পার?"

রমণী তাহার আকার দেখিয়া বুঝিল যে গৈরিকধারী ব্রহ্মচারী তাহাকে যাহার কথা বলিয়াছিল এই অশ্বারোহীই সেই ব্যক্তি। সে কহিল "লিচ্ছবী রাজ! আজ পাটলীপুত্রে রক্তের স্রোত, তুমি গৃহে ফিরে যাও।"

আগন্তুক কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল "বালক তুমি আমাকে চেন? পাটলীপুত্রে যে স্রোতই বয়ে যাক না কেন আমাকে যেতেই হবে। দূরে এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী বলে দিলে যে তীর্থের পথ এইদিকে, তুমি বাক্যব্যয় না করে আমাকে পথ দেখিয়ে দেও। এই নাও পুরস্কার।"

অশ্বারোহী একটী নূতন সুবর্ণ বালকের দিকে ফেলিয়া দিল কিন্তু রমণীবেশী বালক অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "লিচ্ছবি-রাজ, শকরাজার অপবিত্র মূর্ত্তিযুক্ত সুবর্ণ নিয়ে আমি মহাপাপ করব না, যে দিন চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী বাসুদেবের মূর্ত্তি-শোভিত সুবর্ণ পাটলীপুত্রের পথে পথে বর্ষিত হবে সেই দিন তা মাথায় তুলে নিব।"

আগন্তুক উত্তর না দিয়া বালকের মুখের দিকে চাহিল কিন্তু প্রদত্ত সুবর্ণ উঠাইয়া লইবার জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন না। বালকবেশী রমণী আবার কহিল, "রাজা, পথ তোমার সম্মুখে, সূর্য্যদেবকে বামদিকে রেখে চলে যাও, দ্বিতীয় প্রহরে নদীতীর্থ পাবে।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল "বালক তুমি কে তাহা জানি না, কেমন করে আমার পরিচয় পেলে তাও বুঝতে পারছি না, কিন্তু রাজপথ কোথায় গেল?"

"মগধের সৌভাগ্য-রবির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মথুরায় চলে গেছে।"

"তুমি পাগলের মত কি বলছ? বৈশালীর রাজপথ মথুরায় কেমন করে যাবে?"

"চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন যদি হুবিকের রক্তবর্ণ প্রাসাদে যেতে পারে তাহলে বৈশালী পাটলীপুত্রের রাজপথ কেন যাবে না?"

অনেকক্ষণ বালকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আগন্তুক কহিল "বালক তুমি পাগল!" তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট পথে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল।

তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভে আগন্তুক যখন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল তখন গঙ্গার উত্তর কূল অসংখ্য নৌকায় আচ্ছন্ন। আগন্তুক দেখিল যে দলে দলে বৃদ্ধ বালক ও নারী নৌকা হইতে নামিয়া তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সে পরিচয় লইয়া বুঝিতে পারিল যে তাহারা পাটলীপুত্রের অধিবাসী, শ্বেত শক সেনার অত্যাচারের ভয়ে মগধ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাপারে লিচ্ছবি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তখন সহসা তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে উচ্চকণ্ঠে বলিল "স্বাগত পাটলীপুত্রিক নাগরিক, লিচ্ছবি শকের পদরেণু মস্তকে বহন করে না, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বৈশালী রাজ্যে বাস কর।"

তাহার কথা শুনিয়া দুই চারিজন বৃদ্ধ তাহার নিকট আসিল, আগন্তুক তাহাদিগকে কহিল "আমি লিচ্ছবিগণের অধিরাজ দৈবাৎ এসে নদীতীর্থে এসেছি, গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করে গ্রামে যাও। আমার আদেশে প্রতি গ্রামে, খর্ব্বটে ও নগরে লিচ্ছবি নাগরিক সাদরে তোমাদের অভ্যর্থনা করবে।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আগন্তুক তাহার ধূলি-ধূসর অশ্ব ছুটাইয়া যে পথে আসিয়াছিল সে পথে ফিরিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম প্রভাতের সুবর্ণ বরণ স্নিগ্ধ সূর্য্য-কিরণ যখন বাসুদেবের প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন চূড়া স্পর্শ করিল, তখন ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সেনা মরণের প্রতীক্ষায় জীর্ণ মন্দির বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা মনে করিতেছিল যে দূরে শ্বেত শক সেনার দৃপ্ত পদধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তাহাদিগের সম্মুখে বালক কচ ও যুবক মাধব, পশ্চাতে ধ্রুবভূতি ও চন্দ্রগুপ্ত। অনেকক্ষণ পরে যখন দূরে সত্যসত্যই বহুমানবের পদধ্বনি শ্রুত হইল তখন সহসা চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "রমণী,—একটী রমণী, আর একজন পুরুষ! দ্রুতপদে যাও ধ্রুবভূতি, দেখ এ রমণী কে! পাটলীপুত্রের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কোন্ নারী প্রকাশ্যে বাসুদেবের মন্দিরে আসতে সাহস করে?"

ধ্রুবভূতি মন্দিরের চত্বর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই আদিত্যনাথ ও মালিনী মন্দিরের নিকটে আসিয়া পৌছিলেন। সম্মুখ হইতে মাধব বলিয়া উঠিল, "মালিনী আদিত্যনাথের স্ত্রী, শক ক্ষত্রপের গুপ্তচর।"

তাহার কথা মালিনীর অগোচর রহিল না, সিক্ত বস্ত্রে আদিত্যনাথের পত্নী যুক্তকরে নতজানু হইয়া বলিল "প্রথম দুইটী কথা সত্য, কিন্তু শেষেরটী মিথ্যা। নাগরিক, কে তুমি তা জানি না, আমার স্বামী শকের পাদুকা বহন করে বটে, এ জঘন্য দেহ শকরাজার অন্নে পুষ্ট, কিন্তু আমি গুপ্তচর নই। আমার স্বামী শকরাজার ভৃত্য বটে কিন্তু আমি শকের দাসী নই। আমি বৈষ্ণবের কন্যা, বহুদিন পরে আরাধ্য দেবতার চিররুদ্ধ দ্বার মুক্ত হয়েছে শুনে বিগ্রহের চরণ দর্শন করতে এসেছি, হে মাগধ, ভক্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা দিও না।"

পশ্চাতে আদিত্যনাথ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মালিনী বসনাঞ্চল হইতে বহুমূল্য রত্নরাজি-খচিত অলঙ্কার গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে করিতে কহিলেন "বাসুদেবের মন্দির রক্ষা করতে তোমাদের যে অধিকার, সে অধিকার আমারও আছে নাগরিক, শকের দাসত্বের পুরস্কার জাহ্নবীর পবিত্র জলে নিক্ষেপ করে দিচ্ছি, হে মাগধ, পথ পরিত্যাগ কর, তা নইলে নারী রক্তে বৈষ্ণব চরণ রঞ্জিত করে দিয়ে যাব।"

সহসা কচ পথ ছাড়িয়া দিয়া কহিল "মা! এই দেখ পথ মুক্ত, মায়ের আদেশে মুক্তদ্বার রুদ্ধ

করতে দিই নি। আজ যে পাটলীপুত্রে বিশ্বরূপের নাম গ্রহণ করে আসবে, বাসুদেবের দ্বার তার কাছে চিরমুক্ত।"

মালিনী দ্রুতপদে মন্দিরে প্রবেশ করিল; মাধব কহিল, "কি আদিত্যনাথ, অনেক দিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করে পায়ে হেঁটে এসেছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। শিবিকা কি শকসেনার সঙ্গে আসছে?"

আদিত্যনাথ লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিমা দর্শন করিয়া মালিনী যখন ফিরিয়া আসিল তখনও আদিত্যনাথ সেই ভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া মালিনী চন্দ্রগুপ্তকে কহিল "আর্য্য, আমাকে একখানা অসি দিন।"

ঈষৎ হাসিয়া চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "মা তুমি কুলবধূ, এ অসি তোমার হাতে শোভা পায় না। দেবদর্শন সাঙ্গ হয়েছে এখন তুমি নিরাপদ স্থানে ফিরে যাও। এখনই সহস্র সহস্র শ্বেতশক সেনা এসে মাগধ রক্তে এই মাগধ মন্দির-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করে দেবে। তখন তোমাকে নিয়ে আমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হব।"

মালিনী চন্দ্রগুপ্তকে প্রণাম করিয়া কহিল "পিতা, যে বংশে বিপদের দিনে কুলপুত্রেরা অস্ত্রধারণ করে না সে বংশে বাধ্য হয়ে বধূ অস্ত্র ধারণ করে। আপনি অনুমতি করুন, আমাকে পরীক্ষা করুন, আমি ধর বংশের কন্যা নাথ বংশের বধূ, বোধ হয় দুর্ব্বলের মত অসিধারণ করব না।"

মালিনীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে চন্দ্রগুপ্তের নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তিনি নিজের কোষবদ্ধ অসি মালিনীর হস্তে দিয়া বলিলেন "মা, এ অজ্ঞাত কুলশীলের অসি, তথাপি আশাকরি তুমি এর মর্য্যাদা রক্ষা করবে।"

আদিত্যনাথের মস্তক লজ্জায় ও ঘৃণায় অধিকতর অবনত হইল। সেই সময়ে সহসা দূরে জয়পটাহ বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পাদক্ষেপ করিতে করিতে শ্বেত শকসেনা দেখা দিল। মাধব বলিয়া উঠিল "যাও আদিত্যনাথ, তোমার বন্ধুরা এসেছেন তাঁদের সংবাদ দিয়ে এস।"

আদিত্যনাথ বিদ্রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। শ্বেত শকসেনার সম্মুখে সুবর্ণ শিবিকায় আরোহণ করিয়া এক ভিক্ষুক আসিতেছিল। সে দূর হইতে আদিত্যনাথকে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আদিত্যনাথ, তুমি এখানে? তুমি বিদ্রোহীর দলে? তুমি না বৌদ্ধ?"

আদিত্যনাথ শিবিকার নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন "না মহাস্থবির, আমি বৌদ্ধ নহি, আমি বৈষ্ণব কিন্তু আমি বিদ্রোহী নই।"

অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া মহাস্থবির বলিলেন, "তুমি বৈষ্ণব? ভাল, সে বিচার পরে হবে।" মহাস্থবিরের আদেশে বাহকগণ উন্মুক্ত শিবিকা মন্দিরের নিকটে লইয়া গেল, তিনি শিবিকা হইতে বলিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত, তোমার গৃহে একজন বৌদ্ধভিক্ষু আবদ্ধ ছিল। মহাক্ষত্রপের বিরুদ্ধে তুমি প্রথম দণ্ডায়মান হয়েছ, তথাপি বলছি তোমার প্রাণদণ্ড দেব না, তুমি এই সব

অশিক্ষিত মূর্খ বৈষ্ণব দিগকে নগরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি তোমাদের দেব প্রতিমা চূর্ণ করে ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করব"।

অন্য কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বে মালিনী বলিয়া উঠিল "বৌদ্ধের আদেশে বৈষ্ণবের প্রতিমা আর চূর্ণ হবে না"।

মহাস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন "এ স্ত্রীলোকটী কে ?"

পশ্চাৎ হইতে অবনত মস্তকে আদিত্যনাথ বলিলেন "আমার স্ত্রী"।

মহাস্থবির ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আদিত্যনাথ, তুমি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বটে কিন্তু দেবকার্য্যে ও রাজকার্য্যে তোমার পত্নীর বাধা অসহ্য"।

আদিত্যনাথ অস্পষ্টস্বরে উত্তর দিল "আমার পত্নী অবাধ্য"।

মহাস্থবির অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "কে আছিস্ ঐ স্ত্রীলোকটাকে বন্দী কর।"

দশজন শ্বেত শক অগ্রসর হইল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত অসি কোষমুক্ত হইয়া নবোদিত সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইল। শকগণ আদেশের প্রতীক্ষায় মহাস্থবিরের মুখের দিকে চাহিলেন। তখন মালিনী বলিয়া উঠিল, "মহাস্থবির তোমার আদেশে বিশ্বরূপের চিরমুক্তদ্বার আর রুদ্ধ হবে না"।

ক্রোধে মহাস্থবিরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি শক সেনাকে মন্দির আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন, তখন সহসা সুপ্তোত্থিতের মত আদিত্যনাথ বলিয়া উঠিলেন "মহাস্থবির, মহাস্থবির এই মুষ্টিমেয় নাগরিক কেমন করে শত শত সুশিক্ষিত শক সেনার আক্রমণ সহ্য করবে ?"

মহাস্থবির আদিত্যনাথের মুখের দিকে না চাহিয়া একজন শককে আদেশ করিলেন "এই বৈষ্ণব কুকুরকে পদাঘাত করে দূর করে দাও"। আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। আদিত্যনাথের অবস্থা দেখিয়া মালিনীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। কিন্তু মাধব কহিল "শকের পুরস্কার আদিত্যনাথ দক্ষিণ গণ্ডে শুভ্রবর্ণের অধিকার পেয়েছে, এবার বামগণ্ডও মসিরঞ্জিত হলো"!

তৎক্ষণাৎ শকসেনা সেই মুষ্টিমেয় নাগরিকগণকে আক্রমণ করিল, লৌহ নির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সেনা বারবার সুশিক্ষিত শ্বেত শকসেনার আক্রমণ প্রতিহত করিল; বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবের রক্তে গঙ্গাসৈকত রঞ্জিত হইল। পরাজয় নিশ্চিত বুঝিয়া মহাস্থবির শিবিকা-রোহণে পলায়ন করিলেন। পরাজিত শকসেনা ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইল কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহাদের অনুসরণ করিল না। আহত ব্যক্তিদিগকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া আসিয়া মালিনী তাহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবনত মস্তকে আদিত্যনাথ পত্নীর সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন চন্দ্রগুপ্ত মাধবকে বলিলেন "মাধব, পঞ্চাশ জন মন্দিরে থাক, অবশিষ্ট লোক নিয়ে তুমি নগরে যাও। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বৈষ্ণবের স্বজন যে যেখানে আছে শীঘ্র ডেকে নিয়ে এস, কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করে এস। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, এ যুদ্ধ কোথায় শেষ হবে তাও বলতে পারি না"।

পশ্চাৎ হইতে কচ বলিয়া উঠিল "এ যুদ্ধ শেষ হবে মথুরায়"।

বিস্ময়ান্বিত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বলছ কচ ?"

কচ কহিল "কে যেন আমার কানের কাছে বলে গেল পিতা—এ যুদ্ধ মথুরায় শেষ হবে"।

চন্দ্রগুপ্ত পুত্রের মুখের দিকে না চাহিয়া মাধবকে বলিতে লাগিলেন—"যেখানেই শেষ হউক মাধব, এই যুদ্ধের এই আরম্ভ, এখনই শ্বেত শকসেনা সদলবলে ফিরে আসবে। পাষাণ নির্ম্মিত-মন্দির প্রাচীন হলেও সুদৃঢ়। আমরা সহস্র সহস্র শকসেনার বিরুদ্ধে এক প্রহরকাল মন্দির রক্ষা করিতে পারব—তুমি কচ আর সমুদ্রগুপ্তকে নিয়ে যাও, স্বজাতিবৎসল আর দেশভক্ত বৈষ্ণব নাগরিক যেখানেই থাক, তুমি এখনই তাদের অস্ত্র নিয়ে গঙ্গাতীরে আসতে বল"।

কচ চন্দ্রগুপ্তের নিকটে আসিয়া বলিল "পিতা সমুদ্র থাক, মাতার আদেশ আজ আপনাকে একা রেখে যাব না"।

চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পরে মাধবকে বলিলেন "তবে তাই হক"।

পঞ্চাশজন বৈষ্ণব সেনা মন্দির রক্ষায় রহিল, অবশিষ্ট নগরে ফিরিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রামগোপাল ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তথাকথিত কালা-আইন বা Black Act

উপক্রমণিকা

আমরা প্রারম্ভে কালা-আইন-সংশ্লিষ্ট কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আলোচনা করিব। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যভার ইংরাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফৌজদারী বা দেওয়ানী কার্য্য মুসলমান নবাবের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রাজ্য যখন ছত্রভঙ্গ, তখন রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত উভয়ই সে সময় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্টের সৃষ্টি হয়। সেই সময় মফস্বলের নানা জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। কিন্তু মফস্বলবাসী ইংরাজদিগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাকা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই মে লর্ড অকল্যাণ্ড মফস্বলবাসী ইংরাজদিগকে একটি আইনদ্বারা দেওয়ানী আদালতের এলাকাধীন করেন। এই আইনের বিপক্ষেও কলিকাতাবাসী ইংরাজ ঘোর আন্দোলন করিয়া ইহাকে Black Act বা কালা

আইন বলিয়া অভিহিত করেন। কলিকাতাবাসী ইংরেজেরা আপত্তি করেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উক্ত আইন প্রবর্ত্তন করিবার কোন অধিকার নাই। টমাস ব্যাকিংটন মেকলে (পরে লর্ড) তখন বড়লাটের ব্যবস্থাসচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি তুইটি মিনিটে ইহার প্রবর্ত্তনের সমর্থন করেন। মেকলে লিখিয়াছিলেন যে এখানকার মফস্বলের ও মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের ইংরেজ অধিবাসীরা এই নূতন আইনে সন্তুষ্ট; কেবল কলিকাতাবাসী ইংরাজেরা ইহার বিপক্ষে। আর যদি তাহাদের আন্দোলন সফলতা লাভ করে তাহা হইলে এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, তবে বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট ও পার্লামেণ্ট মহাসভার উপর তাঁহার এত অধিক বিশ্বাস ছিল যে তিনি জানিতেন ইহা কিছুতেই সফলতা লাভ করিবে না। তিনি আশা করেন যে এবার ইহা এরূপে সমর্থিত হইবে যে ভারতবর্ষের সাধারণ মঙ্গলের জন্য যখন আইন করা হইবে তাহাতে সে সময়ে ও উত্তর কালে কলিকাতার আন্দোলন উপেক্ষা করা যাইবে। পার্লামেণ্ট মহাসভায় এই আইনের যথাযথ আলোচনা হয় এবং মেকলের অভিমত সমর্থিত হইয়া আইনটি বিধিবদ্ধ হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই আইনের বিরুদ্ধে টার্টন, ডিকেন্স প্রভৃতি বেসরকারী ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

অতঃপর ইংরেজেরা মফস্বলের ফৌজদারী আদালতের এলাকা হইতে মুক্ত রহিলেন, কিন্তু দেওয়ানী অপেক্ষা ফৌজদারী প্রভাব হইতে মুক্ত থাকায় দেশবাসীর অসুবিধা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল। মফস্বলে কোন ইংরাজ কোন অপরাধ করিলে তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে হইত, কিন্তু ফরিয়াদী এতদূর আসিয়া বিচারপ্রার্থী হইতে সম্মত হইত না, আর সম্মত হইলেও এতদূর হইতে সাক্ষী সাবুদ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া হাজির করা অসম্ভব হইত, সুতরাং মফস্বলবাসী ইংরাজদিগের অপরাধের কোন দণ্ড হইত না। পাবনা, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলাতে নীলকরগণের উপদ্রব প্রজার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সংবাদ পত্রের স্তম্ভেও এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। ইহার প্রতিকার কল্পে এই সময়ে বীটন (Bethune) ব্যবস্থাপক সভায় চারিটি আইন পাস করিবার জন্য পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন। আমরা প্রস্তাবিত আইনগুলির সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করিলাম :—

১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতের এলাকার নির্দ্দেশ উঠাইবার নিমিত্ত আইন।

২। ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজাদিগের স্বত্ব ও অধিকারের বিবরণ বিষয়ক আইন।

৩। বিচারকদিগের রক্ষা করিবার জন্য আইন ও

৪। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারালয়ে জুরি প্রথার প্রবর্ত্তন বিষয়ক আইন।

ব্যবস্থাপক সভায় এই চারিটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইবামাত্রই কলিকাতাবাসী ইংরাজ একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। দেওয়ানী আইন প্রবর্ত্তনের সময় যেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল এবারে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক হইল। ভারতবাসীর প্রতি অবিচার দূর করিবার নিমিত্ত আইনগুলি প্রস্তাবিত হইয়াছিল বলিয়া সাহেবরা এবারেও সেগুলিকে কালা আইন বা Black Acts

নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা টাউন হলে সভা করিয়া বিপুল আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এদিকে বিলাতে আন্দোলন করিবার জন্য কয়েকদিনের মধ্যে ষাটি সহস্র মুদ্রা চাঁদা সংগৃহীত হইল।

রামগোপাল তখন দেশের নেতা, ইংরাজরা ভাবিল দেশের মঙ্গলের জন্য কোম্পানীর এ ইচ্ছার তিনি নিশ্চয়ই সমর্থন করিবেন, এই সূত্রে তাঁহার প্রতি প্রথম ইঙ্গিত, পরে কটাক্ষ, অবশেষে গালাগালি বর্ষিত হইতে লাগিল। এই সময় "বেঙ্গল হরকরা" পত্রে একদিন প্রাতঃকালে প্রকাশিত হইল যে তাঁহারা শুনিয়াছেন যে কালা আইনের সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোক একটি সভা সমাহূত করিবার জন্য কলিকাতায় সেরিফের নিকট আবেদন করিয়াছেন, আর রামগোপাল ঘোষই ইহার নেতা। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী তারিখের "ইংলিশম্যান" পত্রে রামগোপাল একখানি পত্রে লিখেন যে যদিও তথাকথিত কালাআইনের সমর্থনে এ দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে এবং তাহা তাঁহার অনুমোদিত হইলে তাহাতে তবে তিনি অবশ্যই স্বাক্ষর করিবেন কিন্তু তিনি যে এরূপ কোন কাগজে তখনও পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করেন নাই এবং আরও বলেন যে এরূপ কোন আবেদন প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়াও তিনি অবগত নহেন। সেই দিনের সন্ধ্যাকালে "হরকরার" অতিরিক্ত পত্রে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিত হয় যে, ইহা দুঃখের বিষয়, যে এ পত্রে তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহারা সুখী হইতেন যদি রামগোপাল তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন যে গর্ভমেণ্টকে সমর্থন করিয়া দেশীয়দিগের যে আবেদন পাঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে তাহার সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই, কেন না তাঁহারা শুনিয়াছেন সত্যসত্যই প্রায় বারশত দেশীয়ের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র সেরিফের নিকট প্রেরিত হইয়াছে আর সেই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ইচ্ছায় সহি করিয়াছেন। তৎপরেই লিখিত হয় যে তবে আজও অর্থগৃধ্নু চরিত্রের দেশীয় অধিবাসীর নিকট হইতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে। কিন্তু রামগোপাল বা অন্যকোন দেশীয় ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে এই আন্দোলনে তাঁহার সমধিক সম্মান বৃদ্ধি হইবে বা তাঁহার দেশবাসীর কোন উন্নতি সাধিত হইবে তাহা হইলে তিনি বিশেষ ভ্রমে পড়িবেন। এই আন্দোলনে দুই শ্রেণী ব্রিটিশ প্রজাদিগের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিপক্ষতার ভাব সৃষ্টি করিবে। এইরূপে বাঙ্গালী জাতি ও রামগোপালের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর কটূক্তি বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহার পর আবার একদিন প্রকাশিত হইল যে "ইংলিসম্যান" পত্রে রামগোপালের যে পত্র বাহির হইয়াছে তাহাতে এরূপ বুঝা যায় না যে এ সময় তিনি তাঁহার দেশবাসী সাধারণ ব্যক্তিগণের অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে পারিবেন ও তাঁহার দেশবাসীর নির্ব্বোধ ও সংকীর্ণ আন্দোলনের দোষ দেখাইয়া

উহা বন্ধ করাইয়া দিবেন। যাহা হউক তাঁহারা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হন যে রামগোপাল মেজিষ্টের নিকট প্রেরিত আবেদন দেখেন নাই বা তাহাতে সহি করেন নাই। ইহার দুই দিন পরে থিয়োডোর ডিকেন্সের (Dickens) দেশবাসীর প্রতি একটি সুললিত অনুযোগ সম্ভাষণও বাহির হয়। তিনি তাহাতে ভারতবাসীকে Fellow Subjects of the Imperial Crown বলিয়া সম্বোধন করেন। ডিকেন্স লিখেন যে তাঁহারা দুঃখের সহিত অবগত হইয়াছেন যে তাঁহাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে দেশীয়দিগের চিত্তবৃত্তি ও সংস্কারের উত্তেজনার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে ও কৌশলে ভারতবাসীদিগকে আইনের সাম্যবাদী অভিমতের পরিপোষক বলা হইতেছে। তিনি বলেন যে এই অভিমত অচিরে দেশীয়দিগের বিপক্ষেও প্রয়োগ করা হইবে। বাবু রামগোপাল ঘোষই যে এই চেষ্টার মূল তাহা প্রচারিত হইয়াছে। রামগোপাল বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় আছে ও তিনি তাঁহাকে সম্মান করেন। রামগোপাল যে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্ররোচক যদিও তাহা অস্বীকার করিয়াছেন তথাপি তিনি যে অনমুমোদন করেন এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। ডিকেন্স তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে যে কেহ এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবেন তিনিই আপনাকে লজ্জিত, উপহসিত ও অপমানিত করিয়া তুলিবেন। যাহারা ক্ষমতার চাটুকার, উমেদার উচ্চপদ লাভের অভিলাষী বা কোম্পানীর নিম্ন কর্ম্মচারী তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে এই চক্রান্তে যোগ দিয়া তাহাদের মনিবদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন কিন্তু স্বাধীন চরিত্র ও স্বাধীন অবস্থাপন্ন যে কোন বুদ্ধিমান দেশীয় ব্যক্তি যে তাঁহার সাধারণ বিবেক বুদ্ধির বিপক্ষে বেসরকারী ইংরাজদিগের ক্ষতি করিবার উদ্দেশে ও দেশীয় সম্প্রদায়ের কোন প্রকার উন্নতিসাধিত না করিয়া বেসরকারী ইংরাজদিগের অবনতি সাধন করিবার সঙ্কল্পে এই আইনের সমর্থন করিতে পারেন তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না।

উল্লিখিত কয়েক পংক্তি এইরূপ প্রকাশ্যভাবে রামগোপালের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। তারপর ডিকেন্স এই সূত্রে ভারতবাসীকে সম্বোধন করিবার কারণ স্বরূপ বলেন যে ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য ও তাঁহাদিগের অধিকার রক্ষা ও বিস্তৃতির জন্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত একত্রে ভারতবাসীর জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই জন্য ভারতবাসীকে উপদেশ দিবার তাঁহার অধিকার আছে।

ডিকেন্স যেমন সুললিত লেখক তদনুরূপ তাঁহার সুন্দর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা ছিল। বিবরণে, কারণ-নির্দ্ধারণে, মীমাংসায়, ভাবোপযোগী ভাষা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ-শেষে বলেন যে তাহাদিগকে নিম্নস্তরে আনিয়া ভারতবাসীর উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু নৈতিক, মানসিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির নিমিত্ত ভারতবাসী বিশেষরূপে উপযুক্ত এবং ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ পরিশ্রমের ফল স্বায়ত্তশাসনের ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এদেশবাসী এখনও উপযুক্ত নয়,—বাস্তবিকই অনুপযুক্ত। তিনি

উৎসাহে উন্মত্ত যুবাদিগের উন্মাদনায় তাহাদের স্বপ্নে অবিশ্বাস করিতে বলিয়া লিখেন যে তাহারা যদি এদেশ ছাড়িয়া জাহাজে গিয়া উঠেন বা কল্য এ রাজত্ব ত্যাগ করেন তাহা হইলে অচিরে এদেশের মহিমান্বিত সূর্য্য কিরণে আফগান, রোহিলা ও আরবদিগের তলওয়ার, গুর্খাদিগের কুক্রি, পিনডারি ও মারহাট্টাদিগের দীর্ঘ বর্ষা প্রতিভাত হইবে, আর তাহাতে ভারতবাসীর বৃথা অপরিণত উচ্চাভিলাষের জ্বলন্ত বহ্নি শোণিতের অশ্রুতে নির্ব্বাপিত হইবে। সেই পুরাতন কাসুন্দির কিঞ্চিৎ যাহা আমরা পাঠক সমক্ষে নিম্নে বাহির করিলাম তাহার কটুস্বাদ এখন সময়ের গুণে নষ্ট হইয়া যাইলেও আসল জিনিষটুকু অবিকৃতই আছে :—

"You never can become better by making us worse. But for moral intellectual and political advancement you are eminently fit and are advancing though slowly, but you are not fit, you are very unfit indeed, as yet for the noblest task of wisdom and of knowledge the task of self-government. Believe not in the dreams of young enthusiasts, who would so persuade you. Were we driven to our ships or did we abdicate this land to-morrow, right soon would you see flashing in the beams of your glorious sun the tulwar of the Afghan, Rohilla and Arab the kookree of the Goorkha, the long lence of the Pindaree and Marhatta and the flame of your vain unripe ambition would be quenched in tears of blood.

ডিকন্সে এই প্রবন্ধে ভারতবাসীকে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া বলেন যে তাহা হইলেই শান্তিতে সমান অধিকার লাভ করিতে পারিবেন " you will peaceably conquer an equal freedom. " প্রবন্ধশেষে ভারতবাসীর অনুরক্ত ভৃত্য বলিয়া নাম স্বাক্ষর করেন।

জেলা আদালতে ইংরাজদিগের বিচার হইলে তাঁহাদিগকে জেলার জেলখানাতেই বিচারার্থ থাকিতে হইবে। জেলাগুলি জ্বর ও কলেরায় পূর্ণ। এইরূপ জ্বরপুর (feverpur) বা কলেরাবাদের (cholerabad) জেলার জেলে বাস করিলে ইংরাজী স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু এ দেশবাসীর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে বিচারের সাম্যতা কোথায় রক্ষিত হইল! ভারতবাসীর সহিত এক বিচারালয়ে বিচারিত হইতে হইবে বলিয়া বেসরকারী ইংরাজের উচ্চতর জাতীয় অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল, সেই কারণে তাঁহারা ইহার বিপক্ষতাচরণ করেন আর যাঁহারা বীটনের বালিকা বিদ্যালয়ের বিপক্ষে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন এই তথাকথিত কালাআইনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। ইহাঁদের মধ্যে কলিকাতায় "হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার" পত্রে এই আইনের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ও মান্দ্রাজে "মান্দ্রাজ ক্রেসেণ্ট" (Madras Crescent) নামক পত্রে রামগোপালকে বীটনের মোসাহেব বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই দুইখানিই গোঁড়া হিন্দুর

মুখপত্র। বেসরকারী ইংরাজ সেইজন্য তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যাঁহারা অপরিবর্ত্তনীয় আচারাদি মানিতেন তাঁহারা বুদ্ধিহীন ছিলেন না, বেসরকারী ইংরাজ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইতে পারিলেন না।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে রামগোপাল সম্বন্ধে সমাচার পত্রের নানা মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। "দিল্লী গেজেট" পত্রে প্রকাশিত হইল যে এতদিন তাঁহারা কলিকাতার সমাচার পত্র গুলিতে রামগোপাল ঘোষের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার সুখ্যাতি দেখিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যেমনি তিনি কালা আইনের অনুকূলে ভাব প্রকাশ করিলেন অমনি সেই পত্রগুলিই প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে তিনি একটি নিরেট মুর্খ বা তদপেক্ষাও অধিক কিছু! কালা আইনের বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতে লাগিল।

এগ্রি-হর্টিকাল্‌চারাল্‌ সোসাইটি

এই সময়ে একটি ঘটনায় কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠেন। রামগোপাল তখন দেশের সর্ব্বপ্রকার সাধারণ অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সর্ব্ববিধ সভা সমিতিরই সভ্য ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতার এগ্রিহর্টিকাল্‌চারাল্‌ সোসাইটি (Agri Horticultural Society) র একজন বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কৃষির উন্নতির নিমিত্ত এই সভাটির সৃষ্টি হয়। যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতি হয় এইরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাব ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে এই সভাতে প্রেরিত হইত। বিশেষজ্ঞের দ্বারা নানাবিধ ফল, লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদির নমুনা এ সভায় পরীক্ষিত হইত, নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদির বিষয় ভারতবাসীকে জানাইবার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। ইহা প্রবন্ধ গুলি নির্ব্বাচন করিয়া তাহার অনুবাদ ভারতবাসীর মধ্যে প্রচার করে। রামগোপাল, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং, রাধাকান্ত শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব এই স্থায়ী কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ও হরিমোহন সেন এই কমিটিভুক্ত হন। তৈল ও তৈলবাজের এবং শস্যের কমিটি উভয়েরই রামগোপাল সভ্য ছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে পাঁচবৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি তিনি ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্টের পদে নির্ব্বাচিত হন, তদ্ব্যতীত এই সভার আর্থিক দুর্দ্দিনে রামগোপাল উহার ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত যে সাহায্য করেন তাহা সোসাইটির বিশেষ উপকারের মধ্যে গণ্য হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর ভাইস প্রেসিডেণ্ট রামগোপালের সভাপতিত্বে ইহা স্থির হয় যে মেটকাফ হলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ৫,৬০৯৩৲ টাকা ঋণ আছে তাহা সভ্যদিগের মধ্যে ত্রৈমাসিক চাঁদার হার বৃদ্ধি করিয়া পরিশোধ করা হইবে। এই অধিবেশনে ত্রৈমাসিক চাঁদার হার ৮৲ হইতে ১০৲ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সোসাইটির আয়ের হার বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ। এদিকে মেটকাফ হলের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের ঋণ আশু পরিশোধ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন।

সোসাইটি তখন মেটকাফ হলে অবস্থিত ছিল। এই অবস্থায় ইহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত রামগোপাল ও রাজা সত্যচরণ ঘোষাল দুই বৎসরের নিমিত্ত প্রত্যেকে বিনা সুদে সহস্র মুদ্রা ধার দেন এবং ডাক্তার হাফ্‌নাগ্ল (Huffnagle) ও রুস্তমজি কাওয়াসজি প্রত্যেকে উক্ত সর্ত্তে পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করেন। বেলঘরিয়ার সাগরচন্দ্র দত্ত, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী মাধবচন্দ্র সেন, বুদ্ধিনাথ বসাক প্রভৃতি অনেকে রামগোপালের অনুরোধে উক্ত সোসাইটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। এইরূপে রামগোপাল এগ্রি-হর্টিকালচার্ সোসাইটির সহিত বিশেষরূপে জড়িত ছিলেন। সোসাইটির উপকারিতা বিস্তারে বা উহার বিপদ উদ্ধারে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রদানে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তথা কথিত কালা আইন লইয়া যাঁহারা তাঁহার উপর বিদ্বেষ বর্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সোসাইটির উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগের আপনার ইচ্ছা সোসাইটির উপরে আরোপ করিয়া উহাকে তাঁহাদিগের রাজনৈতিক মতের রঙ্গপীঠ করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে রামগোপালকে এইখানেই একটু বিপর্য্যস্ত করা যাইতে পারে সুতরাং তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সোসাইটীর সাম্বৎসরিক কার্য্য নির্ব্বাহ কমিটি নির্ব্বাচিত করিবার নিমিত্ত মেট্‌কাফ হলে একটি সভা হয়। সে সময় রামগোপাল ও রাজা সত্যচরণ ঘোষাল উভয়ে সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। অধিবেশনের প্রারম্ভেই রাজা উক্ত পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থানে রমানাথ ঠাকুরকে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংএর নাম প্রস্তাবিত হয়। রামগোপাল পদত্যাগ করেন নাই সুতরাং তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব আদৌ প্রয়োজন ছিল না। রাজা সত্যচরণের পরিত্যক্ত পদের নিমিত্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন—একটি পদের নিমিত্ত এক ব্যক্তিই প্রস্তাবিত হইয়াছিল—এরূপস্থলে ভোটের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গোলযোগ করিয়া সে অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যদিগকে এরূপ বুঝান হইল যে রমানাথ ঠাকুর ও রাজা প্রতাপচন্দ্র উভয়েই উক্তপদপ্রার্থী। তবে উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে রামগোপালকে বিপর্য্যস্ত করা হয় না সেই নিমিত্ত তাঁহার অপরিত্যক্ত পদের জন্য তাঁহার নামটি জুড়িয়া দিয়া দুইটি ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদের নিমিত্ত তিনটী ব্যক্তিকে দাঁড় করান হইল। এ তিনজনের মধ্যে দুই জনকে নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত ভোটের প্রয়োজন। ভোট যখন গৃহীত হইল তখন দেখা গেল রাজা প্রতাপচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন, আর রামগোপাল রমানাথ অপেক্ষা একটি ভোট কম পাইয়াছেন। রমানাথ তখন সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি অধিবেশনের প্রারম্ভেই ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি যখন তিনি গোলমালে নির্ব্বাচিত হইয়া পড়িলেন আর তাহাতে যখন বিপক্ষ রামগোপালকে অপসারিত করিবার অবসর ঘটিল, তখন সভার ইউরোপীয় সভ্যেরা

ঘটনাটিকে বিধি প্রেরিত বিবেচনা করিয়াই তাঁহার পরিবর্ত্তে রমানাথকে মহোল্লাসে নির্ব্বাচিত করিলেন। এইরূপে রামগোপালের পরিবর্ত্তে অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্ব্বাচিত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিকে লোক চক্ষে একটু হীন করিয়া সাময়িক তৃপ্তিটুকু লাভ করিবার জন্য বেসরকারী ইংরাজ এখানে এই হাস্যজনক উপায় অবলম্বন করেন। বলা বাহুল্য অন্যান্য ব্যক্তিরা যেরূপ কমিটির সভ্য ছিলেন তাঁহারা অপরিবর্ত্তিত রহেন। এই অধিবেশনের দুই দিন পরে "ইংলিশম্যান" পত্র মহানন্দে লিখিলেন যে, যে সোসাইটিতে এতগুলি ইংরাজ সভ্য আছেন এবং যিনি তাঁহাদের বিপক্ষে যে আইন প্রবর্ত্তিত হইতেছে উহার সমর্থক এরূপ ব্যক্তি এই সভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইবার অধিকারী নহেন। ভারতবর্ষে যাহাতে কৃষির বিস্তার ও উন্নতি সাধিত হয় ইহাই সোসাইটির উদ্দেশ্য কিন্তু বীটনের ব্ল্যাক অ্যাক্ট দ্বারা তাহা নষ্ট হইবার সমূহ আশঙ্কা। এরূপ আইনের যিনি সমর্থক তিনি এই সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইতে পারেন না। সেই জন্য বাবুটির প্রতিভার খ্যাতি ও তাঁহার বন্ধুদিগের চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাকে ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে বিনা আড়ম্বরে বাদ দেওয়া হইয়াছে। রামগোপাল যদিও উক্তপদে পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য আদৌ চেষ্টা করেন নাই তথাপি "ইংলিশম্যান" পত্র সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিতা অবলম্বন করিয়া এইরূপে ঘটনাটি উল্লেখ করিতে দ্বিধা মাত্র বোধ করে নাই। ১২ই জানুয়ারী "Eastern Star" নামক পত্র ইংলিশম্যানের উক্ত প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বলেন যে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলির নিয়ম উক্ত সভার অনভিজ্ঞেরা জ্ঞাত নহেন সুতরাং তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। এই উপলক্ষে উল্লিখিত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিয়া তাঁহারা বলেন যে বীটন স্বয়ং কালা আইনের প্রবর্ত্তক কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় তিনি বিনা আপত্তিতে কমিটি অফ পেপার (Committee of paper) নিযুক্ত হইলেন আর একজন হিন্দু যিনি এই আইনে তাঁহার দেশবাসীর মঙ্গল হইবে বিশ্বাস করিয়া শুধু প্রসঙ্গক্রমে উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিয়াছেন তাঁহাকে সভার ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদচ্যুত করা হইল। Eastern Star কালা আইনের বিশিষ্ট আপত্তিকারীদিগের মধ্যে একজন; তথাপি ইঁহারাও বলিতে বাধ্য হন যে এরূপ লজ্জাজনক ঘটনা ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় আর কখন ঘটে নাই। ইহার দুইদিন পরে বীটন সোসাইটিকে পত্র লিখেন যে "গতবারের সভায় রাজনৈতিক মতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্যতা বিবেচিত হইয়াছিল, এরূপ সভার কোন পদগ্রহণে আমি সম্মত নহি।" সিসিল বিডন (Cicil Beadon) (পরে সার ও বাঙ্গালার ছোটলাট) লিখেন "সমাচার পত্রের একটি প্যারাগ্রাফে দেখিলাম যে কোন একটি রাজনৈতিক প্রশ্নের অনুমিত অভিমতের জন্য বাবু রামগোপাল ঘোষকে সভার ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সে রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধানে ব্যাপৃত আছেন, যাহাহউক যাঁহারা রামগোপালের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প

হইলেও যতক্ষণ রামগোপাল বাবুর প্রতি যে অপমান আরোপিত হইয়াছে সোসাইটি তাহা সাধারণ্যে অনুমোদন করেন ততক্ষণ আমি এ সভায় সভ্যশ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়া লইলাম।" সি এলেন (C. Allen) তখন বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের সেক্রেটারী। তিনি লিখেন "যে সোসাইটির রাজনৈতিক অভিমত সভার মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্দেশ করে, সে সোসাইটির সভ্য হইতে আমি সম্মত নহি। বলা বাহুল্য আমি বাবু রামগোপাল ঘোষের ভাইস প্রেসিডেণ্টপদে পুনর্নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ইহা বলিতেছি।" ইহারা ব্যতীত আটজন বাঙ্গালী সভ্য শ্রেণী হইতে তাঁহাদের নাম উঠাইয়া লইবার জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। এতটা গোলযোগ যে হইবে তাহা তখন ব্ল্যাক অ্যাক্টের বিপক্ষবাদীরা অনুমান করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে " ইংলিশম্যান " পত্র অতি দর্পে এই সামান্য সমিতির নির্ব্বাচনকে রাজনৈতিক বিজয় ঘোষণা করিত না। যে সভায় নির্ব্বাচন বিভ্রাট ঘটিয়াছিল তাহার পরের অধিবেশনে ডাক্তার ফকনার (Dr. Falcnor) এর প্রবর্ত্তনে ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সমর্থনে একটি রেজোলিউসনে ইহা প্রচারিত হয় যে উক্ত ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন যে রাজনৈতিক অভিমতদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই উপরন্তু এই সভা এরূপ দোষারোপ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। সোসাইটির সভাপতি সুপ্রিম কোটের চিফ জাষ্টিস সার লরেন্স পীল (Sir Lawrence Peel) ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখেন যে, বিলাতে কোন পদপ্রার্থী হয়ত পদলাভ করিতে পারেন না, তাহার কারণ তাঁহার কোন বিশেষ শত্রু গুপ্তভাবে তাঁহার বিপক্ষতা করে, বা হয়ত পদপ্রার্থী ব্যক্তি সাধারণের অপ্রিয়, কিন্তু সেই নিমিত্ত উক্ত নির্ব্বাচন ব্যক্তিগত বিদ্বেষের পরিচায়ক ভিন্ন সমিতির কার্য্য নহে তাহা সম্যক বুঝা যায়। এখানেই বা তাহা ঘটিবে না কেন? এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি রাজনৈতিক সমিতি নহে তাহা উক্ত সভার রেজোলিউসন দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে সুতরাং কোন রাজনৈতিক অভিমত ইহার কর্ম্ম নির্ব্বাহকগণের নির্ব্বাচনে কোন প্রভাব প্রকাশ করা সমীচীন নহে। দুঃখের বিষয় তিনি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না; থাকিলে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পাইত না। সার লরেন্স ইহাকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ফল বলেন। যাহা হউক ফক্‌নার-মিত্র রেজোলিউসনটি সন্তোষজনক নহে বলিয়া বীডন (Beadon) সভার সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। ইহার মাসখানেক পরে রামগোপালকে উক্ত সভার কাউনসিলার পদে এবং তৈল ও তৈলবীজের এবং শস্যের কমিটির সভ্য পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত করা হয়।

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

হারামণি

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের পুনর্মিলনে)

কে তোরা আজি এ প্রাতে
এনে দিলি মোর হাতে
হারাণ রতন,
দিলে স্বর্ণ শত ভারে
রত্ন ত মিলিবে না-রে
ইহার মতন,
কেঁদেছি ইহার লাগি
কত না রজনী জাগি'
কত দীর্ঘ দিন,
করিয়াছি হা-হুতাশ,
ফেলিয়াছি কি নিঃশ্বাস
বসি' কর্ম্মহীন।
এ যে প্রাণ ল'য়ে খেলা
ক'রিনি ক'রিনি হেলা
খুঁজিতে এ নিধি,
আতিপাতি চারিধারে
খুঁজিয়াছি বারে বারে
আলোড়িয়া হৃদি;
কে করিবে সমাধান
কেন এত অভিমান
মোর পরে, হায়,
জানি না কি দোষে এ যে
গিয়াছিল মোরে ত্যেজে
কোন অজানায়,
কেটে গেল কত দিন
আলোহীন, আশাহীন,
যেন অচেতন,
ছিলাম জড়ের প্রায়
সুখে, দুখে সাড়া, হায়,
দিত না এ মন,
অভ্যাসের বশে তাই
কাজ-কর্ম্ম ক'রে যাই
আপনার মনে,
ছিলাম উদাস পারা
সঙ্গী মাঝে সঙ্গ-হারা,
অতি সঙ্গোপনে,

খাই বটে অন্নজল
হৃদয়ে পাইনা বল,
লাগে সব তিত,
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা
বিনা সঞ্জীবনী সুধা
প্রেমের অমৃত!
অকু স্বপনবৎ
মনে হ'ত এ জগৎ
সুখ-দুঃখ মিছে,
মরু যেন করে ধু-ধু,
নর-নারী ঘোরে শুধু
মরী-চিকা পিছে,
কখন বা দিত দেখা
স্মৃতি সোণার রেখা
মনের নিকষে
ভাবিতাম আঁখি-নীরে
হয় তা বা পা'ব ফিরে
সে হারা-দিবসে,
শচী-মাতা বিষ্ণু প্রিয়া
পুনঃ উজলিবে হিয়া
রূপ, সনাতন,
আঁধার হৃদয় ভরি'
শ্রীগৌর কৃপা করি'
দিবে দরশন,
আবার ধরিয়া হাত
সাথে ল'বে রঘুনাথ,
দয়াল নিতাই,
বাসুদেব, হরিদাস
পূরাবে মনের আশ
অদ্বৈত গোঁসাই,
মুরারি কি গদাধর
কভু না করিবে পর
এ অধীন জনে
দামোদর রামরায়
ঠেলিবে না রাঙা পায়
আশা ছিল মনে,

ক্ষণ পরে দেখি, হায়,
স্বপন মিলায়ে যায়,
পরাণ বিকলে,
পরশমণিটি নাই,
শুধু তার ছায়া পাই
সোণার শিকলে,
মিলে না যতই খুঁজি,
হারায়ে তখন বুঝি
কি ধন সে ছিল,
কে আসি' গ্রাসিল তায়
দ্বিতীয় রাহুর প্রায়
অমৃত হরিল!
হৃদয়ে আলোক নাই
দিবা-নিশি হেরি তাই
নিবিড় আঁধার
অমা-রাতে অকস্মাৎ
হ'ল আজি সুপ্রভাত
কৃপা বিধাতার;
সহসা বনের পাখী
"হরি" "হরি" বলি ডাকি'
মাতায় ভুবন
প্রেমের নদীয়া হ'তে
বহে অনুকূল স্রোতে
মঙ্গল পবন,
থাকি' থাকি' ক্ষণে ক্ষণে
জাগিছে মনের কোণে
হারাণ' হরষ—
শিরে যেন লাগে ফের
পদধূলি ভকতের;
সরস পরশ;
এ ধন হৃদয়ে ধরি,
এ ধন মাথায় করি,
প্রেমের এ খনি,
ধন্য তোরা, ধন্য আমি,
মাণিক হইতে দামী
এই হারামণি!

চর্য্যার ও দোঁহার রচয়িতাদের পরিচয়

[শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই প্রবন্ধগুলির রচনায় যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন,—তিনি যে পদ্ধতিতে বৌদ্ধগান ও দোঁহা বইখানির সকল রচনার বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা অসম্ভব; আমি এবিষয়ে সুধী শীল মহাশয়ের নিকটে ঋণী, কেবল তাহাই জানাইতেছি।]

দোঁহাগুলির এক ভাগের নাম সরহ বা সরোজবজ্র, আর অন্য ভাগের লেখকের নাম কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু। চর্য্যা অংশের ৫০টি কবিতার মধ্যে ২২, ৩০, ৩৮ ও ৩৯ এই চারিটি কবিতার লেখকের নাম সরহ, আর ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫ এই বারটি কবিতার লেখকের নাম কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্য। দোঁহার সরহ ও কাহ্নু চর্য্যাপদের সরহ ও কাহ্নু হইতে অভিন্ন কিনা, তাহার বিচার হইবে পরে; তবে বলিয়া রাখি যে, প্রাচীন টীকাকারের মতে তাঁহারা এক ও অভিন্ন। একই সরহ ও কাহ্নু কি করিয়া বিভিন্ন যুগের প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে কবিতা লিখিলেন সে সমস্যার বিচার হইবে ভাষার বিচারের সময়ে। দোঁহার ভাষা ও চর্য্যাগুলির ভাষা যে আলাদা, অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে লেখা, তাহা সাধারণ পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইলে ঐ ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়া বুঝাইতে হয়; এ সমালোচনায় তাহা অসম্ভব। যাঁহারা প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা জানেন, তাঁহারা একটু চোখ বুলাইয়া পড়িলেই ধরিতে পারিবেন যে চর্য্যা ও দোঁহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষায় লেখা। কাহ্নুর ভাষা যে আবার সরহের ভাষা হইতে ভিন্ন, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত।

চর্য্যা রচনায় কাহ্নু ও সরহের কবিতাগুলির সংখ্যা বলা হইয়াছে। ঐ দুই জন ছাড়া আরও ১৯ জনকে চর্য্যালেখকরূপে পাই; তাঁহাদের নাম ও তাঁহাদের কবিতার সংখ্যার একটি তালিকা দিতেছি; এই তালিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। (১) লুই (১ ও ২৯), (২) কুক্কুরীপাদ (২ ও ২০), (৩) বিরুআ বা বিরূপ (৩), (৪) গুণ্ডরী পাদ (৪ ও ৪৭), (৫) চাটিল্ল (৫), (৬) ভুসুকু (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ ও ৪৯), (৭) কম্বলাম্বর (৮), (৮) ডোম্বীপাদ (১৪), (৯) শান্তিপাদ (১৫ ও ২৬), (১০) মহীধর (১৬), (১১) বীণাপাদ (১৭), (১২) শবরপাদ (২৮ ও ৫০), (১৩) আর্য্যদেব (৩১), (১৪) ঢেন্ঢন্ (৩৩), (১৫) দারিক (৩৪), (১৬) ভাদে (৩৫), (১৭) তাড়কপাদ (৩৭), (১৮) কৌঙ্কন (৪৪) ও (১৯) জয়নন্দী (৪৬)।

এই যে কয়েকজন গুহ্য সাধনের সাধক বা অবধূত বা পদকর্ত্তা বা কবির নাম পাওয়া গেল, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার বিষয় আছে অনেক। অন্য সাহিত্য ও রচনাগুলির টীকার সাহায্যে যথাসাধ্য স্থির করিতে হইবে—(১) ইঁহারা এক দেশের এক সময়ের লোক, না, নানাদেশের বিভিন্ন সময়ের লোক; (২) ইঁহাদের নামে কেবল এক একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির

নাম সূচিত হয়, না ঐসকল একই নামে একই গুহ্য সাধনার অনেক পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়; (৩) রাম শ্যাম যদু প্রভৃতির মত সকলগুলি নামেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় অথবা ঐনামগুলি কেবল পদকর্ত্তাদের অবলম্বিত সাধনপ্রণালী বুঝায়; অর্থাৎ যে নামগুলিতে সাধনা বিশেষের সূচনা হয়, সেনাম ধরিয়া একসময়ের একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি স্থির করা সম্ভব কি না; (৪) যাঁহারা টীকা লিখিয়াছেন তাঁহারা কবে ও কোথায় ঐ টীকা লিখিয়াছিলেন; (৫) যিনি বা যাঁহারা চর্য্যাপদ ও দোঁহাকোষ প্রভৃতি একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা কবে ও কি অবস্থায় ও কোথায় বসিয়া পদগুলি জড় করিতে পারিয়াছিলেন। একে একে এই প্রশ্ন কয়েকটির আলোচনা করা যাইবে।

এক সময়ে আমাদের উদ্দিষ্ট সাধকশ্রেণীর লেখকদের অনেক রচনা তিব্বতের ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল, তবে ঠিক কবে কাহার কোন্ রচনাটির কিরূপ তর্জ্জমা হইয়াছিল, তাহা ধরা কঠিন; Tengyur নামে পরিচিত তিব্বতী Encyclopaedia গ্রন্থে এবিষয়ে যে উল্লেখ আছে, কেবল সেইটুকু ধরিয়াই সকল কথার বিচার করিতে হয়। তেঙ্গ্যুর গ্রন্থের বিবরণে এই অবধূত-শ্রেণীর সাধকদের সম্বন্ধে জানা যায় যে, যাঁহারা চর্য্যা ও দোহা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন বা তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, অথবা রচনাগুলির টীকা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ বা বঙ্গজ, কেহ বা ওড়িয়া, কেহ বা নেপালী, কেহ বা বেহারী, কেহ বা কাশ্মীরী, কেহ বা সমরকন্দবাসী; হেরুকোদয় প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে এই বিশেষ শ্রেণীর অবধূতদের সাধনা পদ্ধতি স্পষ্টভাবে লেখা আছে, সে সকল গ্রন্থের অনুবাদক ও টীকাকারকদের মধ্যে মালববাসী দানশ্রীজ্ঞানের, রত্নদ্বীপবাসী বরবোধির ও সমরকন্দবাসী বজ্রগুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রকীর্ত্তি নামে এক ব্যক্তি কোন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে চর্য্যাগীতি-কোষবৃত্তি নামক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে; তবে সে কাহার রচনা ও কোথাকার লোকদের রচনা, তাহা সম্পূর্ণ ধরা যায় না। তেঙ্গ্যুর্ গ্রন্থ হইতে অন্য বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে পণ্ডিত হরপ্রসাদ এই তেঙ্গ্যুর্ অবলম্বনে যে কয়েকটি অদ্ভুত কথা লিখিয়াছেন তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

দোঁহা ও চর্য্যাপদগুলির সময় ঠিক করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় যে তর্কের শিকলগাছি গাঁথিয়াছেন তাহার গ্রন্থি ৩টির পরীক্ষা করিতেছি। মুখবন্ধের ৬এর পৃষ্ঠায় আছে:—(১) "ইংরেজি ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত [যে সময়ে "খুব তর্জ্জমা করিত", তাহার পূর্ব্বে ও পরে যে কোন তর্জ্জমা করে নাই, একথা পণ্ডিত মহাশয় বলেন নাই, ও বলিতে পারেন না], (২) তাহা হইলে এই বাঙ্গলা বইগুলি ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল [এখনকার "তাহা হইলে" শিকলটির গ্রন্থিতে একটি বিচিত্র যোজনা; বইগুলি বাঙ্গলা কিনা, সে কথা পরে হইবে], (৩) খৃষ্টিয় ৮।৯।১০।১১।১২ শতে এই

সকল বইগুলি লেখা হইয়াছিল বলা যায় [এখানে আবার শিকল গাছির নেজামুড়া উড়িয়া গেল কেন, অর্থাৎ শিকলগাছি হইতে সপ্তম ও ত্রয়োদশ শতাব্দী খসিয়া পড়িল কেন, তাহা দুর্ব্বোধ্য]। পণ্ডিত মহাশয়ের তর্ক-পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া বিচার করা যাউক যে তিনি বহুদেশের অবধূত লেখকদের উল্লেখ পাইয়াও সকলগুলি পদকর্ত্তাকেই কি উপায়ে বাঙ্গলার লোক বলিয়া ধরিলেন। বাঙ্গলার লোক বলিয়া প্রমাণিত হইলেও (যাহা হয় নাই) তাঁহাদের রচনা বাঙ্গলা বলিয়া প্রমাণিত হয় কি না, সে, কথা অল্প পরেই দেখা যাইবে; এখানে পণ্ডিত মহাশয়ের বাঙ্গালী ধরিবার একটি যুক্তির নমুনা দিতেছি।

৪৯ সংখ্যক চর্য্যাগানের রচয়িতা ভুসুকু যে শ্রেণীর সাধনার কথা লিখিয়াছেন সেই সাধনার নাম "বঙ্গাল" সাধনা; অবধূতদের অন্যান্য পদ্ধতির সাধনার মধ্যে (যথা, ডোম্বী-সাধনা, শবর-সাধনা, কুক্কুরী-সাধনা ইত্যাদি) এই সাধনাটি যে কোন দেশের যে কোন সাধক অবলম্বন করিতে পারিত, ও যথার্থই করিত। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি বঙ্গাল সাধনায় দীক্ষিত হইয়া লিখিল যে, সে সেই সাধনার দরুণ বঙ্গালী হইল, তাহাকে বাঙ্গালী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। একজন যদি ইংরেজের ধরণে পোষাক পরিয়া বলে যে 'আমি আজ ইংরেজ হইলাম', তবে বরং বুঝিতে হয় যে সে যাহা ছিল না, তাহাই হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ভুসুকুকে বাঙ্গালী বলা চলে কিনা, তাহা পদকর্ত্তাদের নামের বিচারে শীঘ্রই বলিব; যদি ধরিয়া লওয়া যায় তিনি বাঙ্গালী, তবুও কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের যুক্তিটি ভুসুকুর জাতির পরিচয়ের অনুকূল নয়। অন্যান্য সাধনায় যেমন ডোমের ব্যবহারের বা শবরের ব্যবহারের বা কুকুরের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে, সেইরূপ ৪৯ সংখ্যক গানে নানা ছলে গুপ্ত সাধনার কথা বলিতে গিয়া নদীর খালে নৌকা বাহিবার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, ও উক্ত সাধনায় যে নিজের স্ত্রীকে "চণ্ডালী"রূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার ধ্বনি আছে। শবর-সাধনার কথা যাঁহার লেখা, তাহাকে কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ওড়িষার সীমান্তের শবর জাতির লোক বলেন নাই, বরং তাঁহাকে বাঙ্গালীই বলিয়াছেন।

অবধূতদের গোটাকতক নাম খাঁটি ডাক নাম বটে, যেমন কৃষ্ণনামের অপভ্রংশ কাহ্নু, মহীধর, জয়নন্দী ও ভাদে; ভাদ্রমাসে জন্ম ধরিয়া পশ্চিম ওড়িষায় অনেক লোকের এখনও ভাদো বা ভাদে নাম পাওয়া যায়, আর বাঙ্গলাদেশে যেমন কৃষ্ণ নামের অপভ্রংশে পাই, কানাই ও কানু, তেমনই ওড়িষা প্রভৃতি অঞ্চলে কাহ্নু নাম অত্যন্ত অধিক প্রচলিত। অন্য নামগুলি যে সাধনের অনুরূপ নাম, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে; কারণ, বিভিন্ন সময়ে ও নানা দেশে সাধনের পন্থা ধরিয়া বিভিন্ন লোকের একই নাম হইতে পারে ও হইয়া থাকে, আর কাজেই নামের সমতা ধরিয়া একটি সাধন পন্থার কবিকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের লোক বলিয়া ধরা কঠিন। অন্য নামেও নামের সমতা ধরিয়া কিছু ঠিক করা শক্ত বটে, তবে সেখানে রচনার বিষয় ধরিয়া লোক নির্দ্দিষ্ট করা কতকটা সহজ হয়। কিন্তু নাম যেখানে সাধন পন্থার অনুরূপ,

সেখানে নানা সময়ের ও নানা দেশের লোক একই ভাবে নির্দ্দিষ্ট একটি সাধনের কথা তাহাদের রচনায় লিখিতে পারে। যাহাই হউক পদের অর্থ ও টীকা ধরিয়া কয়েকটি নামের আলোচনা করিতেছি।

চর্য্যাপদের যেগানে (২৮ ও ৫০) শবর ভাবের সাধনা আছে,—ওড়িষার সীমান্তের শবরদের পার্ব্বত্য বাসস্থান ও রীতি-নীতির দৃষ্টান্ত দিয়া সাধনের কথা বর্ণিত আছে, সে গান ২টির লেখকের নাম ভণিতায় নাই, কিন্তু সাধন প্রণালী দেখিয়া টীকাকার তাঁহার নাম দিয়াছেন শবরীপাদ। ঠিক সেই রকম ডোম জাতীয়দের কথার দৃষ্টান্ত দিয়া যে গানটি (১৪) আছে, তাহার পদকর্ত্তার নাম ডোম্বীপাদ। এই গানটির ভণিতায় "ডোম্বীপাদ" বলিয়া উল্লেখ নাই, তবুও সাধনের পদ্ধতি ধরিয়া টীকাকার ঐ গানের কর্ত্তার নাম দিয়াছেন ডোম্বীপাদ। কুক্কুরীপাদ যে ২টি গানের রচয়িতা (২ ও ২০), তাহাতে কুকুরের মত ব্যবহারের কথা আছে, যাহার সকল কথা খুলিয়া লেখা চলে না; দ্বিতীয় সংখ্যক গানটিতে রাত্রিকালের চুরির ও তাহার সঙ্গে পাহারার ধ্বনি আছে, আর বিশ সংখ্যার গানটিতে কুকুরের ব্যবহারের "নখলি বাল সংঘারা" etc. লেখা আছে। ৪৮ নম্বরের গানটি লুপ্ত বলিয়া বৌদ্ধগান ও দোঁহায় ছাপা নাই, কিন্তু উহার টীকার যে অল্পকয়েক ছত্র রহিয়া গিয়াছে তাহাতে সেই গানের কর্ত্তাকে কুক্কুরীপাদ বলা হইয়াছে ও কোন একটী পদের ব্যাখ্যায় "অঙ্গুলীমূর্দ্ধীকৃত্য" কথাটি হইতে কুকুরের ব্যবহারের বিষয় ধ্বনিত হইয়াছে। চুয়াল্লিশ সংখ্যার গানটিতে কঙ্কণের ধ্বনি বা "নাদ" (তথতানাদ) সাধনের কথা আছে.ও সেই গানের ভণিতায় কঙ্কণপাদ নাম পাই। সতর সংখ্যক গানের ভণিতা নাই, কিন্তু ঐ গানটিতে সাধনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে বীণা ও টীকাকার লেখকের নাম দিয়াছেন বীণাপাদ। পঁচিশ নম্বরের গানটি লুপ্ত, কিন্তু উহার খানিকটা টীকা রহিয়া গিয়াছে ও সেই গানের লেখককে তন্ত্রীপাদ বলা হইয়াছে; আর গানের ব্যাখ্যায় "বেম প্রতিমান (পোড়েন) সূত্র বাতদ্বয় (বাণা ও তান)" পড়িতে পাই।

গানের আংশিক ব্যাখ্যার সময় পরে দেখাইব যে, শান্তিপাদের নামের গান ২টিতে শান্তিভাব সাধনের কথা আছে, আর ভুসুকুর নামের গানে "সহজানন্দের" জন্য বুভুক্ষার কথা আছে; হরিণী মাংসের জন্য বুভুক্ষার কথা যে গানটিতে আছে, তাহাতেও সহজিয়াদের আনন্দ বিশেষের কথাই ধ্বনিত। ভুসুকু = ভুক্ষুসু = ভুক্ষু = (ভুখা সাধনে সিদ্ধ)। খুব সম্ভব যে লুই নামটিও লুবই সাধন হইতে; যাহারা পাখীর শিকারী ছিল, তাহাদের নাম হইত "লুব" আর লুই রচিত ২৯ সংখ্যার গানটিতে জাল, বাণ-চিহ্ন প্রভৃতি কথার শ্লেষজনিত ধ্বনি আছে। তবে হইতে পারে (খুব সম্ভব সেইরূপ হইয়াছিল) যে, বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া একজন লুই, একজন শান্তি ও একজন ভুসুকু ঐ ঐ নামে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ও চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

নামের প্রসঙ্গে এখানে আর কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কাহ্নু বা কৃষ্ণাচার্য্য একজন সাধকের খাঁটি নাম; এই নামেও আর কয়েকজন অবধূত

পাওয়া যায়, তাহা পরে দেখাইব। সকল অবধূতেরাই সকল রকমের সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাধন পন্থায় চলিত, কারণ ৬৪ রকমের সাধন-বিধি grade বা ধাপ অনুসারে অবধূতদের গ্রন্থে পার পরে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই নির্দ্দিষ্ট নামের কাহ্নুকে নানা রকমের সাধন পন্থার গানের কর্ত্তারূপে পাই; কাহ্নুরচিত ১৮ নম্বর গানটিতে ডোম্বী সাধনা বর্ণিত আছে। একথাটা এই জন্য বুঝাইবার প্রয়োজন যে, বঙ্গাল সাধনাটি যে কোন দেশের যে কোন সাধক অবলম্বন করিত অথবা করিয়াছিল। আর একটি কথা এই,—মনে হয় যে একজন লুই এক সময়ে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; পরে দেখাইব যে, চর্য্যাগানগুলি সাধনার হিসাবে দুইটি বড় ভাগে বিভাগ করিয়া চর্য্যা সংগ্রহ করা হইয়াছিল, ও ঐ বিভাগের প্রথম অংশ হইল প্রথম হইতে আটাশ সংখ্যার গান পর্য্যন্ত, আর দ্বিতীয় অংশ হইল ২৯ হইতে শেষ পর্য্যন্ত; এই দুই অংশের আরম্ভসূচক প্রথম গান লুই রচিত। এবিচারেও একজন নির্দ্দিষ্ট লুইকে আদি সিদ্ধাচার্য্য বলা যায় কি না সন্দেহ। একটি টীকার একটি স্থান ছাড়া অন্যত্র সকল স্থানেই অন্যান্য অবধূতদিগকে যে ভাবে সিদ্ধাচার্য্য বলা হইয়াছে, লুইকেও সেইভাবে কেবল সিদ্ধাচার্য্য বলা হইয়াছে। যেখানে আদি সিদ্ধাচার্য্য কথাটি আছে, সে স্থানটি একটুখানি সন্দিগ্ধ; মূল বই এখন নেপালে, কাজেই সন্দেহের কথাটা ছাপা টীকা ধরিয়াই বলিতেছি। টীকায় আছে (কেবল একস্থানে)—ইত্যাদি আদি সিদ্ধাচার্য্য; ইত্যাদি সিদ্ধাচার্য্য লিখিতে আর একটা "আদি" ভুলক্রমে বসিয়াছে কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়; কারণ, এই বিশিষ্ট শ্রেণীর অবধূতদের অন্যকোন গ্রন্থে লুইকে সিদ্ধাচার্য্য ও সুন্দরানন্দ নামে ভিন্ন আদি সিদ্ধাচার্য্য নামে আমরা পাই নাই।

এবারে টীকাগুলি আলোচনা করিয়া লেখকদের নাম ও সময় নিরূপণের জন্য একটু চেষ্টা করিব। তেঙ্গ্যুরে লিখিত আছে যে একজন চন্দ্রকীর্ত্তি "চর্য্যাগীতি কোষবৃত্তি" তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন; সাহিত্যপরিষদের ছাপা বইখানিতে যে টীকা পাই, তাহা সেই টীকা কি না জানা যায় নাই, কারণ সেই টীকায় ঠিক এই পঞ্চাশটি চর্য্যা ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, জানি না। অদ্বয়বজ্র (শবর সিদ্ধ) সরোহর দোঁহাকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন, আর সেই টীকার নাম দিয়াছিলেন দোঁহাকোষ পঞ্জিকা (সহজ আম্নায় পঞ্জিকা)। অমিতাভ নামে একজন "কৃষ্ণ ব্রজপাদ দোঁহাকোষ টীকা" লিখিয়াছিলেন; মুদ্রিত "মেখলা" টীকা, সেই টীকা হইতে পারে। বৈরোচন মহাযোগী কোশলবাসী ঐ টীকাখানি তিব্বতীতে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। অদ্বয়বজ্রের দোঁহাকোষের টীকা যিনি তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম পাই বৈরোচন ব্রজ।

এইসকল টীকা ধরিয়া পদকর্ত্তাদের পূর্ব্ব-পরবর্ত্তিতা কতকটা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। সাহিত্যপরিষদের মুদ্রিত চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের টীকাকার দোঁহাকোষের সরহকে চর্য্যাপদের সরহের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। ভাষা সমালোচনার সময় আমরা অনেক কথা বলিব, কিন্তু এখানে এইটুকু বলি যে যাঁহারা প্রাচীন ও প্রাকৃতের অপভ্রংশের সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণেও পরিচিত, তাঁহারাও দেখিবেন যে, দোঁহাকোষের ভাষা ও চর্য্যার ভাষা কত আলাদা। যদি দুইই একজনের

লেখা হয়, তবে কি কারণে ভাষায় এতটা ভিন্নতা হইতে পারে, তাহা ভাষার বিচারের সময়ে বলিব। ঐ টীকাকার সরহের মত দোঁহাকোষের ও চর্য্যাপদের কাহ্নুকে এক বলিয়াছেন ; ভাষা সম্বন্ধে সরহের রচনার সম্বন্ধে যে কথা এখানেও সেই কথা প্রযোজ্য। পণ্ডিত হরপ্রসাদ টীকাতে এই নামের সমতা দেখিয়া দায় ঠেকিয়া দোঁহার ভাষা ও চর্য্যার ভাষাকে এক সময়ের বাঙ্গলা বলিয়াছেন, যদিও উভয় ভাষায় অত্যধিক প্রভেদ রহিয়াছে।

টীকায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতে লুইগুরুর শিষ্য বা পরবর্ত্তীদের এইরূপ নাম পাওয়া যায়, যথা :—৩৪ নম্বর গানের কর্ত্তা দারিককে পাই লুইএর শিষ্য বা বংশধর ; দারিক নামটির অর্থ দুইটি গানের বিশ্লেষণের সময় লিখিব। দারিক একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন ; যদি এই দারিক সেই দারিক হন, যিনি বজ্রযোগিনী-টীকা ও "ব্যক্ত ভাবানুগত তত্ত্বসিদ্ধি" লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের উল্লেখের অনুরূপে তিনি ওড়িষার ইন্দ্রভূতির দুহিতা লক্ষ্মীঙ্করার পরে আবির্ভূত ; লক্ষ্মীঙ্করা "বজ্রযোগিনীসাধন" ও "ব্যক্তভাবসিদ্ধি" লিখিয়াছেন। দারিকের চর্য্যাগানে আছে, তিনি পারিম নামে নদীর কূলে বাস করিতেন। লুইএর আর একজন পরবর্ত্তী আচার্য্যের নাম পাই কিলপাদ। "হেবজ্র" নামে যে সাধন প্রণালী ছিল ও যাহার ব্যাখ্যা হইবে পরে, সেই সাধন পন্থায় প্রথম নাম পাই একজন সরোরুহ বা সরহের। যে সরোরুহ পদ্মাচার্য্য হেবজ্র সাধন গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহাকে প্রথম সরহ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। জালন্ধরিপাদ সিদ্ধাচার্য্য শুদ্ধি-বজ্র-প্রদীপ নামে হেবজ্র সাধনের এক টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন ; ৩৬ নং চর্য্যার লেখক কৃষ্ণাচার্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই জালন্ধরি পাদের শিষ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে, আর এই কৃষ্ণাচার্য্যই "বজ্রগীতির" প্রণেতা। দোঁহাকোষের "কৃষ্ণবজ্র" উক্ত কৃষ্ণাচার্য্যের সহিত অভিন্ন কিনা, তাহা বিবেচ্য। টীকাকার দুইজনকেই এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কৃষ্ণাচার্য্যের শিষ্য পরম্পরায় যে "ধেণ্ডন-এর নাম পাই, তিনিই ঢেন্ ঢন্ ; আর ধামপাদ ও মহিপাদকেও কৃষ্ণের বংশধররূপে পাই। উল্লেখ করিয়া রাখি যে ধামপাদের গানে ধাম অর্থাৎ বাড়ী পোড়ার দৃষ্টান্ত দিয়া সাধনের কথা ধ্বনিত করা হইয়াছে। এই কৃষ্ণাচার্য্যের বংশে একজন সরহকেও পাই, যিনি "বসন্ত তিলক-দোঁহাকোষগীতিকা" লিখিয়াছেন। এই সরহকে মুদ্রিত দোঁহাকোষ ও চর্য্যার সরহ হইতে ভিন্ন ধরিয়া ইহাকে তৃতীয় সরহ বলা যাইতে পারে। চর্য্যার মধ্যে একজন বিরূআ (অর্থাৎ বিরূপ সাধনের অনুগামী) পাই যে বিরূআ বা বিরূ কৃষ্ণাচার্য্যের দোঁহার অংশ অঙ্গীভূত করিয়া দোঁহাকোষ লিখিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিব দ্বিতীয় বিরূআ। এই বিরূআকে সেই বিরূআ বা বিরূপ বলিয়া মনে হয়, যিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিরূআ বা বিরূপের "কর্ম্মচণ্ডালিকাদোহাকোষগীতি" অবলম্বনে "শ্রীবিরূপপাদ চতুরশীতি" সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই প্রথম বিরূপ চর্য্যার কাহ্নুর পূর্ব্ববর্ত্তী ; কাহ্নুর ১৮ নং গানে বিরূআকে লক্ষ্য করিয়া "বিরূআ বোলে" লিখিত হইয়াছে।

চর্য্যাপদের কম্বলাচার্য্য অথবা কম্বলাম্বরপাদ মহাসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য, "অভিসময় নাম পঞ্জিকা" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কঙ্কণ এই কম্বলের পররর্ত্তী সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন, ও তিনি চর্য্যাদোহাকোষ-গীতিকা লিখিয়াছিলেন।

শবরসিদ্ধ সম্প্রদায়—বজ্রযোগীনীসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া যিনি মহামুদ্রা বজ্রগীতি ও চণ্ডমহাবোধন লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইয়াছিল শবরপাদ বা শবরীশ্বর; ইনি লক্ষ্মীঙ্করার পরবর্ত্তী বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত, কেননা লক্ষ্মীঙ্করাই প্রথমে বজ্রযোগিনীসাধন পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শবরিপাদের ব্যাখ্যা ধরিয়া আর একজন বই লিখিয়াছিলেন, যাঁহার নাম অজপাণিনাদ। সরহমহাশবর নামে আর একজন সরহ্ "দোহাকোষনামমহামুদ্রোপদেশ" লিখিয়াছিলেন। এই সরহ্ ছাড়া শবর সাধনের আর একজন সরহ পাই যাঁহাকে মহাব্রাহ্মণ ও মহাযোগী বলা হইয়াছে; এই চতুর্থ সরহকেও একখানি দোঁহাকোষগীতির লেখকরূপে পাই। আবার কৃষ্ণ বা কাহ্নুর অনুবর্ত্তী যে সরহকে পাই, তাঁহাকে হয়ত তৃতীয় সরহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। মুদ্রিত দোহাকোষের লেখক সরহ মহাশবর যদি হেবজ্রসাধনের গ্রন্থখানির লেখক হন তবে এই সরহকে প্রথম সরহ বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুর গুরু জালন্ধরপাদ সরহের ঐ হেবজ্রসাধনের একখানি টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। তাহা হইলে কাহ্নুসরহের অনেক পরবর্ত্তী হন্। দোহাকোষের কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু বজ্রধরকে (সরোজবজ্রকে বা সরহকে) শবর বলিয়াছেন; এই নির্দ্দেশ জাতিবাচক কি কেবল সাধনবাচক, তাহা ধরা কঠিন।

সরহমহাশবরের বাখ্যা অনুসরণ করিয়া কমলশীল নামে আর একজন আচার্য্য ডাকিনী বজ্রগুহ্য-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, আর এই কমলশীলই মহামুদ্রোপদেশ-বজ্রগুহ্যগীতির রচয়িতা।

সাহিত্যপরিষদের মুদ্রিত মহাশবর সরহের দোহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রকে শবরসিদ্ধ উপাধিযুক্ত পাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই টীকার নাম দোহাকোষপঞ্জিকা।

পাঠকেরা যদি এই নামগুলির খটমট বিচার পড়িয়া থাকেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে এক নামের অনেক সাধককে পাওয়া যায়, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই বিষয় লইয়া নানা বই লিখিয়াছিলেন, আর চর্য্যাসংগ্রহে যাঁহাদের নাম পাই তাঁহারা বিভিন্ন সময়ের লেখক। যে সময়ে সঙ্গীতকারদের মুখ হইতে ঐ চর্য্যাগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল, তখন মূল রচনার ভাষা সঙ্গীতকারদের মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা,—অথবা কোন কোন প্রাদেশিক ভাষা অল্লাধিক পরিমাণে উহাতে জড়াইয়া গিয়াছিল কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। রচনার মূল ভাষার বিচারের সময় সে কথার বিচার হইবে। দোহাকোষ দুইখানি যে বিভিন্ন সময়ের লেখা, তাহাও ধরা পড়িয়াছে; টীকাকারের মতের অনুরূপে দোহার সরহ যদি চর্য্যার সরহ হন্ তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, চর্য্যার গানগুলির ভাষা যে কারণেই হউক, রচনার ভাষা হইতে বহু পরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সময় নিরূপণ সম্বন্ধে অনেক মাল-মসলার উল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিচার হইবে পরে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

—— ——

খেয়ালী

(১২)

দ্বিপ্রহরে অজিত মায়ের প্রসারিত কোলের উপর মাথা রাখিয়া কি একটা বই পড়িয়া মাকে শুনাইতেছিল। শৈলজা পরম স্নেহে অজিতের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। ছেলের বয়স যে বিশ বছর হইয়া গেছে, মা ও ছেলে কাহারও বোধ হয় তাঁহা মনে ছিল না।

সহসা পদশব্দে উভয়ে চাহিয়া দেখিল, হরপ্রসাদ কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। অজিত বই মুড়িয়া ত্রস্তে উঠিয়া বসিল, শৈলজা মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল।

হরপ্রসাদ কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর বসিলেন। তারপর অজিতকে বলিলেন, "অজিত, তুমি তো একেবারেই শাসনের বাইরে গেছ, সে সম্বন্ধে তোমাকে বলবার আর আমার কিছুই নেই। নিজে যা খুসী করতে পার, কিন্তু তোমার জন্যে কারু সঙ্গে তো আমি ঝগড়া করতে পারব না।"

হরপ্রসাদের কথা শুনিয়া শৈলজা বিস্মিত ও ভীত হইয়া অজিতের দিকে চাহিল। অজিত আবার কাহার সঙ্গে কি গোল বাধাইল? পিতার কথায় অজিত কিন্তু ভয়ের পরিবর্ত্তে কৌতুকই বোধ করিতেছিল। কারণ পিতা তাহাকে কটু-তিক্ত বা অম্ল-মধুর কোন কথাই বলিতেন না। তিনি শুধু তাহার সম্বন্ধে নির্ব্বাক দ্রষ্টা ও সাক্ষী স্বরূপ থাকিতেন। তাঁহার অপ্রিয় বা অনভিপ্রেত কার্য্যে ও তাঁহার ক্রোধ উদ্রেক করিতে না পারিয়া অজিত মাঝে মাঝে একটা বিস্ময়, একটা অস্বস্তি অনুভব করিত। সে সহজকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমি কি করেছি?" হরপ্রসাদও অনুত্তেজিত সহজ কণ্ঠেই জবাব দিলেন, "করেছ আমার মুণ্ডপাত! রামতারণ বোসের গোমস্তাকে মেরেছ কেন? সত্যি, একটা গুণ্ডা হয়েই উঠলে নাকি?"

অজিত স্মিতমুখে প্রহারের ইতিহাসটা পিতাকে বলিয়া গেল। শুনিয়া হরপ্রসাদ বলিলেন, "তা তাকে মারধোর করবার কি দরকার ছিল? শান্তভাবে তাকে বুঝিয়ে বললেই হ'তো। তোমার কথা সেকি অগ্রাহ্য করতে পারত? সে একটা সামান্য গোমস্তা বৈত নয়।"

অজিত বলিল, "ধীর কথায় বুঝবার লোক নয় সে। আমি আপনার ছেলে, এ কথা বললে সে আমার সামনে কদর্য্য গালাগালি করতে সাহস পেত না বটে, কিন্তু সে পরিচয় না দিয়ে, আমি যে একজন মানুষ, এই পরিচয়ই তাকে দেওয়া উচিত মনে করেছি।"

হরপ্রসাদ বলিলেন, "কিন্তু তোমার পৌরুষ প্রকাশের জন্যে রামতারণের কাছে মাপ চাইতে হবে। সে তোমার এই অসঙ্গত অনধিকার চর্চ্চার বিচার করবার জন্যে আমাকে লিখেছে।"

অজিত আবেগ উত্তেজনায় পিতার একান্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আপনি কিছুতে তার কাছে মাপ চাইতে পারবেন না, আমি কিছু অন্যায় করিনি। বেটা সাইলক—"

অজিতের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার চক্ষে রোগাতুর নিঃস্ব দরিদ্র দম্পতীর করুণ চিত্র ভাসিতে লাগিল।

হরপ্রসাদ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি এখন একটু বিশ্রাম করতে চাই।"

অজিত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শৈলজা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া স্বামি-পুত্রের কথা শুনিতেছিল। অজিত চলিয়া গেলে সে স্বামীকে বলিল, "এখন অজিতের বিয়ে দিলে কেমন হয়?" প্রশ্নটা এমনি অতর্কিত এবং আকস্মিক যে, হরপ্রসাদ শুধু যে বিস্ময় অনুভব করিলেন তাহা না, একটু চমকাইয়াই উঠিলেন। কিছুকাল নীরবে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "বিয়ে হলেই যে তোমার অজিত অন্দর-বদ্ধ হয়ে থাকবে, এমন ভুল করোনা। রাত দুপুর পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে হল্লা করে বেড়ান তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

স্বামী যে বুদ্ধিমান এবং সুশিক্ষিত, শৈলজা তাহা জানিত, কিন্তু অজিত যে প্রায়ই গভীর রাত্রে গৃহে আসে, তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? তাহার একান্ত গোপন আশঙ্কার আভাসই বা তাঁহাকে কে দিল? তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন? শৈলজা আরক্ত মুখ নত করিয়া একটু খানি চুপ করিয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, "অজিতের কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে, এটা কি বিয়ের অসময়? তা ছাড়া পৌত্রমুখ দেখতে কার অসাধ?"

"পুত্র যোগ্য হলে সাধ হয় বটে, কিন্তু—থাক্ তুমি কি এখন অজিতের বিয়ে দিতে চাও?"

"চাই-ই তো।"

"তা বেশ। আমার আপত্তি নেই, ধীরার আর অজিতের বিয়ে এক সময়েই হতে পারবে। তাহলে এক খরচেই দুই বিয়ের অনেক কায হয়ে যাবে।"

"সীতাকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি সীতার সঙ্গে অজিতের বিয়ে দিতে চাই।"

"সীতার সঙ্গে! নরেশের মেয়ে সীতার সঙ্গে!"

"হাঁ। অমন চমকালে কেন। রূপে গুণে সে অজিতের বৌ হবার অযোগ্য নয়। সঘরও বটে।"

"কিন্তু তাই কি সব?"

"নয় কেন? ধনই কি মনুষ্যত্বের চরম নিদর্শন? যারা বড় লোকের ঘরে জন্মায় নি, তারা কি মানুষ হিসাবেও তোমাদের চেয়ে ছোট?"

স্ত্রীর বিদ্রূপাত্মক দৃপ্ত স্বর স্বামীকে নির্ব্বাক করিয়া দিল। শৈলজা বলিল, "কথা বলছ না

কেন ? আমি তো আর জেদ করছিনে। তোমার অমত হলে বরং অন্য যায়গায় সন্ধান লও। পাত্রী কিন্তু নিখুঁত সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী হওয়া চাই।"

হরপ্রসাদ ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদুষী চাওনা ?"

"না।"

"কেন বল দেখি ? পাছে বিদুষী বৌ ছেলেকে অশ্রদ্ধা করে, এই ভয়ে ?" শৈলজার মুখ আবার আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কথা কহিল না।

হরপ্রসাদ বলিলেন, "তোমার ফরমাস মত বৌ এনে দিতে না পারলে তো শেষে মুস্কিল হবে। তার চেয়ে বরং সীতার সঙ্গেই বিয়ের প্রস্তাব করা যাক্। কিন্তু প্রস্তাবটা করবার আগে তোমার গোঁয়ার ছেলের মত জেনে নিও, নইলে কিন্তু বেকুব হতে হবে, বলে দিলাম।"

অজিতের মত লওয়া সম্বন্ধে হরপ্রসাদের কথাটা শৈলজার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হইল। রাত্রে অজিত খাইতে বসিলে শৈলজা বলিল, "অজিত, শীগ্গিরই তোর বিয়ে দিচ্ছি।"

অজিত আজ পর্য্যন্ত একটি দিনও বিবাহের কথা ভাবিয়া দেখে নাই। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া ফেলিল, "কেন মা ?"

শৈলজা হাসিয়া জবাব দিল, "কেন কিরে ? তোর কি বিয়ের বয়স হয়নি নাকি ? তা ছাড়া ধীরা বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে ওঁর খুব কষ্ট হবে। বৌ এসে ধীরার অভাব পূর্ণ করবে।"

অজিত জড়িতস্বরে আমতা আমতা করিয়া বলিল, "তা—তা—এখন—এত শীগগির কেন ?

শৈলজা গম্ভীরমুখে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি এখনি তোর বিয়ে দিতে চাই।" মায়ের এ কণ্ঠ অজিতের সুপরিচিত। এই দৃঢ়কণ্ঠোচ্চারিত বাক্যের অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অজিত নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

শৈলজা বলিল, "সীতাকে আমি বৌ করতে চাই।"

চকিতে অজিত আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। দ্রুতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "না, না, মা, তা করতে পাবে না। সীতাকে—ছি, ছি,—তা আমি কখনো করতে পারব না। তোমার পায় পড়ি মা, এমন কথা আর মুখেও এন না।"

শৈলজা বিস্ময়াপ্লুত স্বরে বলিল, "কেনরে ?"

"কেন কি আবার ? না, না, তা হতেই পারে না ; ছি, ছি, কি যে বল তুমি" বলিতে বলিতে অজিত ক্ষিপ্রপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

শৈলজার প্রস্তাবটা পরের দিনও অজিতের মনে খোঁচা দিতে লাগিল। প্রস্তাবটা এমনি অদ্ভুত! যাহাকে এতটুকু দেখিয়াছে, যাহার সঙ্গে কত মারামারি করিয়াছে, এখনও সুযোগ পাইলেই যাহার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া সে পরম কৌতুক অনুভব করে, সে কিনা হইবে বধূ ? তা অসম্ভব।

ইহা যে কল্পনা করাও যায় না। সীতার 'সীতাত্ব' অজিতের কাছে চিরকাল এমনি অনাবৃত, এমনি স্বচ্ছ যে, তাহার অন্তরে বাহিরে বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য সে কোন দিন অনুভব করিতেই পারে নাই।

নব নব বৈচিত্র্যই নাকি একটা অজানা আনন্দের কম্পনে মানুষের মন আশ্চর্য্য রকমে আকর্ষণ করে। যাহা নূতন, যাহা সহজপ্রাপ্য নহে, তাহা সহজেই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে। অজ্ঞাত চিত্তের রহস্য সন্ধান এক নূতন কিছু আবিষ্কার করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ চেষ্টা জন্য নহে, স্বতঃজাত। ইহা আপনিই চিরজাগ্রত থাকিয়া মন জিনিসটাকে সচেতন ও আনন্দপিপাসু করিয়া রাখে। কিন্তু অজিত তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাই বুঝিতে পারিল, বিস্ময়ও অনুভব করিল; অনিচ্ছাটা যে কি জন্য, তাহা সে তলাইয়া ভাবিয়া দেখিল না। তবে শৈলজার প্রস্তাবটা লইয়া সীতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার প্রলোভন অজিতের অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। সুযোগও মিলিল।

বৈকালে বাগানের বাঁধান বকুল তলায় বসিয়া সীতা ও ধীরা গল্প করিতেছিল। দ্বিতলের জানালা হইতে অজিত তাহা দেখিতে পাইয়া নামিয়া আসিল। হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত দেখিয়া সীতা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসছ যে বড় ?"

অজিত হাসিতে হাসিতেই বলিল, "তোকে দেখে আজ কেবলি আমার হাসি পাচ্ছে, রাণি।"

সীতা মুখ ভারি করিয়া বলিল, "আমি একটা হাসবার জিনিষ নাকি ?"

অজিত জবাব দিল, "তা নয়তো কি ?"

ঝগড়া বাধিবার উপক্রম দেখিয়া ধীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সীতার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না ভাই রাণি, তুই দাদার সঙ্গে কথা কসনে; ওর শুধু ঝগড়া করবার ইচ্ছা।"

এমন সময়ে ঝি আসিয়া হরপ্রসাদের কি প্রয়োজনের জন্য ধীরাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

সীতা স্মিতমুখে বলিল, "ধীরা গেল, ভালই হলো; তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে।"

অজিত বিস্ময়ের সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তোর আবার গোপন কথা কিরে ?

সীতা একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া কাসিয়া বলিল, "আছে, আছে।"

বলিয়াই সীতা চুপ করিয়া গেল। অজিত অধৈর্য্য হইয়া সীতার খোলা চুলের এক গোছা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ ক'রে রইলি কেন ? অমন ঢঙ্ করিস তো চুল ছিঁড়ে দেব।"

সীতা প্রবীণার মত মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "আচ্ছা, মণিবাবুর সঙ্গে ধীরার বিয়ে দাও না কেন ? তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনি ভাল স্বভাব, দেখতেও বেশ।"

অজিত সীতার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ধীরা তোকে কিছু বলেছে ?"

"না না, কিচ্ছু বলেনি। তাঁর নাম তো পারতপক্ষে মুখেও আনেনা। তাঁর কথা কিছু বল্‌লে ধীরা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। তাই তো আমার মনে হয়, ও মণিবাবুকে ভালবাসে।"

"একরত্তি মেয়ে তুই, এসব বুঝলি কি করে ?"

"আমি তোমার মত বোকা কিনা ? সেদিন রাত্তিরের কথা মনে নেই তোমার ? সেই যে তুমি ধীরাকে মণিবাবুর ভক্ত বললে ? তখন যে আমি তোমাদের পাশের ঘরেই ছিলাম। তোমার কথা শুনে ধীরা কেমন লাল হয়ে উঠেছিল, মনে নেই ?"

"আমি তা লক্ষ্য করিনি। আমি তো তোর মত ইঁচড়ে পেকে যাইনি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।"

"তুই আবার কাকে ভালবেসেছিস্, বল দেখি। ওরে রাণি, রাণি, রাগ করে যাস্‌নে; একটা আশ্চর্য্য কথা শোন্।"

গমনোদ্যতা সীতা আশ্চর্য্য কথা শুনিবার জন্য লুব্ধা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সাগ্রহে বলিল, "বল, শীগ্‌গির বল।"

অজিত যথাসাধ্য গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মা আমার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চান।"

"তা তুমি মাকে কি জবাব দিলে ?"

"জবাব দিলাম, 'তা হতে পারে না'। তোকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।"

"তোমার মত থিয়েটারের এ্যাক্‌টরকে কে-ইবা বিয়ে করে ? বড়লোকের ছেলে ব'লে অহঙ্কারে ফেটে পড়ছ! তোমার মত গুণধরকে যে মেয়ে দেবে, তার মত হতভাগা আর নেই ?"

তীব্রস্বরে কথাগুলা বলিয়াই সীতা ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

অজিত স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন মুখরা বেহায়া মেয়েটার মধ্যে শৈলজা এমন কি পাইয়াছে যে, পুত্রবধূ কবিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল ?

(১৩)

সীতা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কিরণের বড় মেয়ে পুঁটু উঠানে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া উচ্চ ক্রন্দনে বাড়ী ফাটাইতেছে। কিরণ ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া রোষগম্ভীর মুখে বারান্দায় বসিয়া আছে। ছেলের পরে কিরণের দুইটি মেয়ে হইয়াছে। বড়টির দুই বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে ছোটটি জন্মলাভ করিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলির দুরন্তপণার অন্ত নাই। ছেলেটি বাপের কাছেই বেশী থাকিত, কিন্তু মেয়ে দুটি মাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও কাছে বড় যাইতে চাহিত না। মাকে ঘেঁসিয়া থাকিতেই ভালবাসিত। এক সঙ্গে দু'টি শিশু পালনের কষ্ট ও ঝঞ্ঝাটের জন্য কিরণ অর্দ্ধেক দায়ী মনে করিত ঘরের লোকদিগকে এবং অর্দ্ধেক দায়ী মনে করিত পুঁটুকে।

পুঁটু যখন তার কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিত, তখনই সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। একটু বায়না বা একটু দুরন্তপণা করিলে তো রক্ষাই ছিল না।

আজ পুঁটু মায়ের নিষেধ না মানিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সন্থ-ধোওয়া ঢাকাই কাপড়ে খানিকটা ময়লা লাগাইয়া দিয়াছিল। সেই গুরু অপরাধের দণ্ডস্বরূপ মায়ের হাতে বিলক্ষণ মার খাইয়া এখন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছিল। মেয়ের পিঠে যখন দুম্ দুম্ করিয়া কিল্ পড়িতেছিল, তখন করুণা ছুটিয়া আসিয়া মেয়েকে ধরিতেই মেয়ের মা তর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল, "যারা আমার ছেলে মেয়ের জন্যে কিছু করতে পারবে না, তারা যেন শাসনে বাধা দিয়ে দরদ জানাতে আসে না। কখনো আমার মেয়েকে আমি সীতার মত অবাধ্য আদুরে হ'তে দেব না।" করুণা বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার ছেলে মেয়ের যত্ন করিনে, এটা কি সত্যি কথা? সীতাও তো তোমার মেয়ে, তাকে তোমার নিজের ইচ্ছামত গড়ে তুললেই পারতে?" কিরণ উষ্ণ শ্লেষের সহিত জবাব দিয়াছিল, "কে বলে অযত্ন কর? প্রাণ দিয়ে সীতাকে আদর যত্ন করছ, সে কি আমি দেখিনা?"

নির্ব্বাক করুণা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি করিলেই তুমুল কলহ বাধিয়া উঠিবে। অবশেষে মেয়েটির চীৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া পাশের বাড়ী চলিয়া গেলেন। পর মুহূর্ত্তেই সীতা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। সীতা পুঁটুকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। যে হাতে সে মার খাইয়াছে, সেই হাতের স্পর্শলাভের জন্যই বোধ করি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে কিছুতেই দিদির কোলে উঠিতে চাহিল না। অগত্যা সীতা তাহার পাশে বসিয়া তাহার গায় হাত বুলাইতে লাগিল।

নরেশচন্দ্র এতক্ষণ খোকার বায়না লইয়া ঘরের মধ্যেই ছিলেন, প্রহৃতা কন্যার সান্ত্বনার জন্য বাহিরে আসিতে পারেন নাই। খোকাকে শান্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি সীতা?" সীতা বলিল, "ধীরার কাছে ছিলাম।"

"ধীরার কাছে ছিলাম! কি দরকার তোমার ধীরার কাছে? বড় লোকের বাড়ীর সোফায় বসে রোজ ঘণ্টা চারেক গল্প না ক'রলে তোমার চলেনা?"

"আমিতো এক ঘণ্টাও সেখানে ছিলাম না বাবা।"

"আবার মুখে মুখে জবাব! এক মিনিটই বা থাকবার দরকার কি? তোমার মা যে দু'টা মেয়ে নিয়ে পেরে ওঠেনা, তাকি তুমি দেখনা? পুঁটুকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখতে পারনা?"

"ও আমার কাছে থাকতে চায়না যে।"

কিরণ স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তুমি শুনেছ কখনো যে যত্নআত্তি করলে শিশু বশ না হয়ে থাকতে পারে?"

নরেশ বলিলেন, "যত্ন করতে ওর বয়ে গেছে। ছোট ভাইবোনদের ওপর ওর একটুও দরদ আছে নাকি ?"

'কথাটা শুনিয়া প্রথমে সীতার চোখে জল আসিল। খোকাকে যে সে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। ছোট বোনদের সেবায়ই যে তাহার দিনের অর্দ্ধেক সময় কাটিয়া যায়। পিতার চোকে সর্ব্বদা তাহা না পড়িলেও কিরণেরতো কিছুই অজানা নাই। কিরণকে নিরুত্তর দেখিয়া ক্রোধের উত্তাপে তাহার অশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল। সে বহু চেষ্টায় আপনাকে সামলাইয়া ঠোঁট বুজিয়া রহিল।. কিরণ স্বামীকে বলিল, "দরদ না থাকলে আর কি করব বল ? কিন্তু একটা কথা তোমায় না বলে তো থাকা যায় না। তোমার মেয়ে যে যখন তখন জমিদার বাড়ী যায় আর বসে বসে অজিতের সঙ্গে গল্প করে, এটা তো এখন আর ভাল দেখায় না। ওতো এখন আর ছোটটি নেই, অজিতের স্বভাবও লোকে ভাল বলে না।"

সীতা আর সহিতে পারিল না, বলিল, "অজিতদার সঙ্গে আমি বসে বসে গল্প করি, একথা তোমায় কে বলেছে মা ? তার সঙ্গে প্রায়ই তো আমার দেখা হয় না।" কিরণ যুক্তকরে বলিল, "বাছা আমার ঘাট হয়েছে ; আমি মিথ্যা বলেছি, আমাকে মাপ কর।"

"কি ! বেহায়া মেয়ে, অন্যায় করবি আর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করবি" বলিয়া নরেশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সীতার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, কিরণ ত্রস্তে উঠিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, মেয়েকে কিছুই বলো না। তাহলে ঠাকুর ঝি আমার রক্ষা রাখবে না।"

সীতা অশ্রু গোপন করিবার জন্য দ্রুত পদে ঘরের মধ্যে যাইয়া শুইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে করুণা ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া সীতাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবেলায় শুয়ে কেন মা ? অসুখ করেনি তো ?"

সীতা কথা কহিল না। করুণা বিছানার নিকটে সরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সীতার চোখের জলে বালিস ভিজিয়া যাইতেছে। তিনি বার বার ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কেন কাঁদছিস ?" কিন্তু সীতার নিকট উত্তর পাইলেন না। নরেশ যে কিছু বলিয়াছেন, তাহা তিনি আন্দাজেই বুঝিলেন। মাতৃহীনা সীতার উষ্ণ অশ্রু ধাতু-নিঃস্রবের মত তাঁহার বুকে যাইয়া বাজিতে লাগিল।

করুণা যে শুধু মাতৃহারা সীতার জন্য ভ্রাতৃগৃহে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন ! দেবরের কাছে তো আদরেই ছিলেন। আজ যে তাঁহার পূজা, জপ, পাঠ কিছুই তেমন ভাল করিয়া হয় না, তাও তো সীতার জন্যই। নহিলে সংসারে তাঁহার কিসের বন্ধন ? বিবাহের কয়েক মাস পরেই তিনি বিধবা হন। বালবিধবা বধূর হৃদয়টি উচ্চ তারে বাঁধিবার জন্য তাঁহার সাত্ত্বিক স্বভাব শ্বশুরের সমস্ত মনোযোগ অর্পিত হইয়াছিল। তিনিও বধূর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন।

সেই শ্বশুরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সীতার মায়ের মৃত্যু হইল। তদবধি করুণাকে বাধ্য হইয়া ভ্রাতৃগৃহে থাকিতে হইতেছে। প্রথমে তিনি সীতাকে লইয়া বিব্রত হইয়াই পড়িয়াছিলেন। শিশু পালনে তো তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তারপর দিনে দিনে কেমন করিয়া যে তিনি তাহাতে শুধু অভ্যস্ত নয় দক্ষ হইয়া উঠিলেন, তাহা তিনি নিজেই জানিলেন না। তারপর তাঁহার বাঁধন-শূন্য জীবন কোন্ যাদু বলে যে শিশু সীতার কোমল বাহু দু'টি শক্ত বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিল, তাহা ভাবিয়া এখনও তিনি বিস্মিত হন। আজ যে সীতা তাঁহার পথের পাথেয়, দুঃখের সান্ত্বনা, অনাদৃত জীবনের আদর। সীতার কান্না তিনি কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন না।

সীতার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে করুণা বলিলেন, "মা বাবা যদি কিছু বলেই থাকে, সে তোমার ভালোর জন্যে; তাতে কি কাঁদতে হয় এমনি করে?" সীতা সুশীলা বালিকার মত নীরবে পিসিমার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিল না। কান্নার সুরে বলিয়া উঠিল, "আমি যা করিনি, তা মা বললে কেন? আমার নামে মিছে কথা বলবে কেন?"

করুণা কি বলিতে উদ্যত হইয়া কিরণের আকস্মিক আবির্ভাবে থামিয়া গেলেন। কিরণ হয়তো এতক্ষণ জানালায়ই দাঁড়াইয়া ছিল। সে সীতার মুখের কাছে যুক্তকর তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার ঘাট হয়েছে আমাকে মাপ কর বাপু। আমি আর কখনো তোমার নামও মুখে আনব না। তোমায়তো আমি কখনো কিছু বলিইনে, ভুলে চুকে নামটা মাঝে মাঝে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। পিসিমার কাছে যে বড় লাগালে, আমি তোমার নামে মিছে কথা কি বলেছি? যাক, এবার আমায় মাপ কর, আমি ঘাট মাপছি, আর কখনো তোমার নাম মুখে আনব না।" করুণা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওকি বড় বৌ, মা হয়ে মেয়ের কাছে মাপ চাচ্ছ! তুমি পাগল হলে নাকি?"

কিরণ করুণার প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মা-ই বা কে? আর মেয়েই বা কে? আমি যে ওর মা, একথা তুমি কখনো বুঝ্‌তে দিয়েছ ওকে?" করুণা ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "অমন কথা বলোনা। আমি কখনো সীতাকে অন্যায় শিক্ষা দিইনি। তবে ওকে আমি ছোটটি থেকে বড়টি করেছি, এই আমার অপরাধ। তাও আমি সাধ করে করিনি। দাদাই আমাকে জোর করে নিয়ে এসে মেয়ের পালনভার দিয়েছিলেন।"

পাশের ঘরে বসিয়া নরেশ সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলেন, "করুণা, আমাকে দু'টো পাণ দিয়ে যাও শীগগির।"

করুণা তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নরেশ গৃহে থাকিতে যখনই কিরণ উগ্রভাবে করুণার উপর রুখিয়া পড়িত তখনই তিনি কোন কাযের ছলে করুণাকে আহ্বান করিতেন। করুণা দাদার মত সব জানিতেন, এবং মনে মনে হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

তিন চার দিন পরে অজিত আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "পিসিমা, পিসিমা।"

করুণা তখন হবিষ্যের আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন। বাহির হইয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "কে, অজিত? এস বাবা, এস। ঘরে এস।"

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "রাণী কোথায় পিসিমা?"

করুণা বলিলেন, "শোবার ঘরে বোধ হয়। ওরে সীতা, তোর অজিত দা ডাকছে, এদিক আয় মা।"

সীতা আসিল না। অজিতও তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ঘরে প্রবেশ করিয়া সীতাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। সীতা উঠানের পদ শব্দ শুনিয়াই অজিতের আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি একটা কিসের বিজ্ঞাপন পুস্তক খুলিয়া লইয়া তাহার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিরণের সেদিনকার কথাগুলি তাহার মনে বিঁধিয়াছিল; সে আর অজিতের সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহাদের বাড়ী যাইবে না, এইরূপ একটা কঠিন সঙ্কল্পই নাকি করিয়া ফেলিয়াছিল। অজিত ঘরে ঢুকিয়াই তাহার হাতের বইটা লইয়া টানাটানি করিতে করিতে বলিল, "রাণি তুই তিন চার দিন আমাদের বাড়ী যাসনে কেনরে?"

সীতা গম্ভীর মুখে বলিল, "আমার খুসী।"

অজিত হাসিয়া বলিল, "ইস, রাণীইতো সত্যি। নইলে কে আর খুসী-মত চল্‌তে পারে?" সীতা সভয়ে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া করিয়া দেখিল, কিরণ কোথাও আছে কি না। তখনি সে শুনিতে পাইল, করুণা বলিতেছেন "পুঁটু, ও ঘরে গোলমাল করে মার ঘুম ভেঙ্গনা কিন্তু, তা হলে মা মারবে।" কিরণ তবে ঘুমাইয়াছে। সীতা খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, "তুমিও আর আমাদের বাড়ী এস না অজিত দা।"

এতো কলহের সুর নয়। অজিত আশ্চর্য্য হইয়া সীতার ম্লান মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "কেন রাণি?"

সীতা কথা কহিল না। অজিত একটু ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তোর মা বারণ করেছেন,—নারে? তোর মার মত—"

সীতা ছুটিয়া আসিয়া অজিতের মুখ চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি বলিল, "তোমার পায় পড়ি, মা'র কথা কিছু বলোনা।"

অজিত তাহার মুখে চাপা দেওয়া সীতার হাত খানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তারপর আর্দ্রকোমল কণ্ঠে বলিল, "রাণি, মা না থাকা বড় কষ্ট। তোর ভারি কষ্ট হয়।"

সীতা বলিল, "তোমারও তো মা নেই।"

অজিত সগর্ব্বে বলিল, "তুই বলিস কিরে? আমার মা'র মত ক'জনের মা আছে?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সীতা মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অজিতের কথা শেষ হইতে না হইতে অন্তরের সহিত বলিল, "তোমার মা'র মত মা পাওয়া ভাগ্য বটে।"

ক্রমশঃ

৺সরোজবাসিনী গুপ্তা

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ

অদ্যকার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অধিকার করিবার ন্যায়-সঙ্গত দাবী আমার নাই। সুতরাং আপনাদের এই সম্মানটি সম্যক্ উপভোগ করিবার পথে অন্তরায় হইতেছে আমার সঙ্কোচ ও আতঙ্ক। আমার এই ক্ষণস্থায়ী পদোন্নতিতে আশঙ্কার কারণ ত আছেই, উপরন্তু ইহার দরুণ অনেকের বিরাগ বিদ্রূপ অর্জ্জন করারও সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ প্রতিগ্রহ করা সমীচীন কিনা তাহা ভাবিতেছিলাম। একবার মনে হইল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করিয়া এ সঙ্কট উৎরাইয়াই যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, এই দার্শনিক সমাগমে আমার পদবীর সব চেয়ে কায়েমী স্বত্ব হয়ত আমার দর্শন শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত। এমন হইতে পারে যে, সভাপতি হিসাবে আপনারা তেম'ন লোকটিই চান যিনি নির্ব্বিকারভাবে উদাসীনপন্থী, যিনি অন্তত কোন বিশেষ মতবাদের বশ্যতা জ্ঞানতঃ স্বীকার করেন না, কারণ যাবৎ মতবাদ সম্বন্ধেই তিনি নিরপেক্ষভাবে অনভিজ্ঞ। এক্ষেত্রে আমার গুণাগুণ তুলনামূলক সমালোচনার বহির্ভূত; কারণ তাহা অস্তি নাস্তি দুই বাদেরই বাহিরে এবং হয়ত আমাকে এইস্থানে আনিবার পক্ষে সেটা মস্ত বড় সুবিধার কথা। এ অবস্থায় আমার মনে হয় আমি যেন একটা বাতিদান; বাতির মত তার আলোক বিকীরণের শক্তি নাই বলিয়াই যেন দীপ্তিহীন নিষ্ক্রিয় গাম্ভীর্য্যে অবিচলিত থাকার পক্ষে সে বেশী উপযোগী।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আপনারা আমায় নীরব থাকিতে দিলেন না, যদিও আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞব্যক্তিদের উপদেশ অনুসারে আমার এ অবস্থায় নীরব থাকাই উচিত ছিল। এই দ্বিধা কাটাইয়া আমার পাণ্ডিত্যরিক্ত মনটিকে কথা বলাইতে সাহায্য করিয়াছে একটি জিনিষ। সেটি এই যে, আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন কাব্য যাহা হউক—একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাতন্ত্র্য-প্রসূত অসূয়ার বালাই তাহাদের নাই, সুতরাং পাশ্চাত্য-সুলভ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকার প্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না।

দার্শনিকপ্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণরাষ্ট্র হইতে কবিদের নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ এখানে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা—বিদগ্ধমণ্ডলীর রুদ্ধদ্বার খাসকামরা আশ্রয় করা নহে। এই জন্যই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের মত দার্শনিকের প্রতিও অনেক কবিতার আরোপ করিতে আমাদের জনশ্রুতি কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। অথচ এই শঙ্করাচার্য্যকে কোনও আতিথ্যদ্বেষী "ইমিগ্রেশন" আইনের সাহায্যেই প্লেটো তাঁহার আদর্শরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। হয়ত সেইসব কবিতা অধিকাংশই উচ্চ অঙ্গের কাব্য নহে, কিন্তু কবিতা সরবরাহ করাটা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে একটা অপরাধ বা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার বলিয়া কোন কাব্যামোদী দোষারোপ করেন না।

আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত ইহার সাক্ষী। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। ছোট বড় কত রকমের মানব চরিত্র, কি অদ্ভুত বৈচিত্র্যে, কত বিভিন্ন স্তরের মনস্তত্ত্বে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহাই নহে; কত নীতি, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্ম তত্ত্বের কত বিচারবিন্যাস এই মহাভারতের উদার আয়তনে কেমন সহজে আশ্রয় পাইয়াছে! এই অমিতাচারী ঔদার্য্যের ফলে কাব্য তার নিজস্ব সীমা লঙ্ঘন করিবার বিপদ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সম্ভব হইল ভারতবর্ষে; কারণ এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক বিরাট্ সাধারণতন্ত্রে (Communism) বিধৃত। বস্তুত মহাভারত যেন একটী ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ; ইহার মধ্যে কত বিচিত্র মানস সৃষ্টি, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের মত জটিল-বিষম ছন্দে নৃত্য করিয়া ফিরিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছে। একজন বিশেষ কবির খামখেয়ালী ইহাতে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব এখানে দেখিতে পাই। আমাদের এই জাতিটি বিচিত্র তর্কবিতর্কজটিল পন্থা আশ্রয় করিয়া সেই ভাবলোকে ভ্রমণ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না যাহা অসংখ্য উপাখ্যানের উপগ্রহপরিবেষ্টিত একটি মহা আখ্যায়িকার সৌরমণ্ডল বলিলেই হয়।

মুসলমানযুগেও এই ভারতে যে-সব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই গীতরসিক। তাঁহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তিমান, তাঁহাদের ধর্ম্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্মস্থল হইতে উৎসারিত, মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাঁহাদের কারবার। হয়ত ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। কিন্তু যখন দেখি যে তাঁহাদের সেই সমস্ত বাণী, সমস্ত সঙ্গীত কেবলমাত্র শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য নহে, তাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নরনারীর আদরের ধন, তখন বুঝিতে পারি দর্শন বস্তুটি কি গভীরভাবে আমাদের সাধারণের মগ্নচৈতন্যলোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি :—

"পানীমে মীন পিয়াসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসী রে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে ;
ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।"

কবীরের এই উচ্চ হাস্য সেই হিন্দুগায়কের ধর্ম্মনিষ্ঠায় এতটুকুও আঘাত করে নাই। বরং কবীরের সঙ্গে তিনি একাত্ম; কারণ, তত্ত্বজ্ঞান যে তাঁহার মনকে মুক্তি দিয়াছে এবং তিনি বুঝিয়াছেন তীর্থ হিসাবে মথুরা বা কাশীর প্রতীকগত তাৎপর্য্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নাই। সুতরাং উক্ত স্থানদ্বয়ে তীর্থযাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেও তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি যদি তাঁহার থাকিত তাহা

হইলে কোন বিশেষ স্থানে যাইয়া ধর্ম্মবোধ জাগাইবার কোন প্রয়োজনই হইত না। তবে যে সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরে কত যুগ ধরিয়া কত সাধকের ভজন পূজন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহার উদ্বোধিনী শক্তিটি তাঁহার মত সাধকের তেমনই প্রয়োজন বলিয়া তিনি স্বীকার করেন যেমন প্রয়োজন আমাদের আবহমানকাল প্রচলিত মন্ত্রের, যে মন্ত্র বহুযুগের ভক্তসাধকের কণ্ঠস্বরে প্রাণবান্ হইয়া আমাদের প্রাণকে সহজে উদ্বোধিত করিতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই—সেটি এই যে, ব্যক্তি-স্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন ;

"মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন ;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম ;
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুষবয় বদবয়।"

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

"রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে॥"

এই সব তত্ত্ব-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জ্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্য কর্তৃক অবজ্ঞাত। এইসব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন। এমনি একটি কবির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ব্যাখান শুনিয়া তিনি এই গানটি রচনা করেন :—

"ফুলের বনে কে ঢুকেছেরে সোণার জহরি
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।"

বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাঙলার সেই শ্রেণী হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। আমি তাহাদের গান কতকগুলি আমায় লিখিয়া দিতে অনুরোধ করায় দেখি তাহারা বেশ একটু বিব্রত হইয়াছিল ; শেষে যখন ভরসা করিয়া লিখিল, আমি তাহার পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া হতাশ হইলাম, তাহাদের বানান ও অক্ষরবিন্যাস এমনই অপ্রত্যাশিত রকম অসনাতনী। কিন্তু এই সব কবি-বাউলদের সাধন-পদ্ধতি মানবদেহতত্ত্বের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও দুরবগাহ। ইহারা পথে বিপথে তাহাদের গান গাহিয়া ফেরে ; আমার পথের ধারের জানালা হইতে একটী গান বহুকাল পূর্ব্বে শুনি, কিন্তু এখনও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে।

"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তারি পায়।"

এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে একমত; আমাদের বাক্য ও মন ভূমাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবু সেই প্রাচীন ঋষিগণের মত এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন; বরং এই দুঃসাহসিক ব্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা শেলীর সেই কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের অতীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন।

সেই অজানা দুরধিগম্য হইলেও যেসকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং এই অজ্ঞাতনামা বাঙালী বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গ্রাম্য সঙ্গীত সেই অজানা পাখীর ডানার ছন্দে মুখরিত। শুধু এই প্রভেদ যে শেলীর ভাষা জনকয়েক শিক্ষিত লোকের জন্য আর এই বাউল গান গ্রামের চাষী ও সর্ব্বসাধারণের, যাহারা এই গানের আধ্যাত্মিক অতি-বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না।

একটি কারণে এসমস্ত সম্ভব হইয়াছে; লোকশিক্ষার যে আশ্চর্য্য প্রণালী বহুকাল ধরিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সমস্ত বিকাশের মূলে; কিন্তু তাহা আজ ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের প্রাক্তন বিদ্যায়তনগুলিতে দলে দলে ছাত্রগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও আর্য্যগণের চারিদিকে সমবেত হইত। সেই শিক্ষাসত্রগুলি গভীর ও স্থিরসলিল হ্রদের মত; সেখানে আসিতে হইলে দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে হয়। কিন্তু সেই সব জলাশয় হইতে প্রতিনিয়ত বাষ্পোদ্‌গম হইয়া যে সব মেঘ জন্মিত, তাহা বায়ুভরে কত প্রান্তর পর্ব্বত উপত্যকার উপর দিয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইত। পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কত গীতিনাট্য, কথক-শিল্পীর মুখে কত বিচিত্র উপাখ্যান-কথা, ভিক্ষুক বাউল গায়কের মুখে লোক সাহিত্যের কত অমূল্য গীতসম্পদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হইত, এবং এই মেঘপুঞ্জই ত জন-সাধারণের চিত্তক্ষেত্রকে সুসিক্ত ও উর্ব্বর করিয়া তুলিত এবং যে সমস্ত তত্ত্ব মূলতঃ অতি কঠিন তাহা সাধারণগম্য করিত। সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত দর্শনের গভীর মতবাদগুলি লোকসাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া প্রাণের ফসল ফলাইত এবং যে অগণ্য নরনারী শিক্ষা ও অবসরের অভাবে কোন দিনই সেই তত্ত্ববিদ্যার মূল উৎসে যাইতে পারিত না, তাহাদেরও গৃহদ্বারে সেই তত্ত্বগুলিকে উপস্থিত করিত।

সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা জটিল কর্ম্মভার বহিবার জন্য এক দল লোককে বাস্তব অভাবাদি দূর করিবার ভার লইতে হয়। সে দায়িত্ব যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা এড়ান চলে না। সুতরাং এই সব মানুষদের পক্ষে মানসিক উন্নতি সাধন করার সুযোগ হয় না। এই ভাবে বিরাট্ জনসঙ্ঘ শুধু পণ্য উৎপাদনের চাপে লুপ্তচৈতন্য যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হয় বলিয়াই

কয়েক জন মানুষ বড় ভাব ও অমর শিল্পরূপের স্ফুরণ করে এবং বিশ্বমানবকে অধ্যাত্মসাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে লইয়া যায়।

সমাজের জন্য এই যে সকল ব্যক্তি আত্মবলিদান দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভারত কোন দিন উপেক্ষা করে নাই; তাঁহাদের জীবনব্যাপী শ্রমের ভীষণ অন্ধকারের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য তাঁহাদের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে এবং সহজ কর্ত্তব্য-বোধেই তাহা করিয়াছে। কোন বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই কাজটি হয় নাই; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত সামাজিক ব্যবস্থার ফলেই ইহা জীবদেহে রক্তপ্রবাহের মত সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহার মূল উদ্দেশ্যটি চাপা পড়িলেও কাজটি চলিতেছে।

এক সময় আমি বাঙলার একটি সামান্য গ্রামে যাই। সেখানে প্রধানত মুসলমান চাষীদের বাস। গ্রামবাসীরা আমার জন্য একটি যাত্রা গানের পালা অভিনয় করে। সে নাট্যের আখ্যান-বস্তু একটি লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মপন্থীদের শাস্ত্র হইতে আহরিত, একদা সেই ধর্ম্মের বিস্তৃত প্রভাব ছিল। সে ধর্ম্ম আজ প্রাণহীন, তবু তাহার বিশেষ বাণী জনসাধারণের নিকট ইহার নিজস্ব তত্ত্বটি প্রচার করিতেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কারে সেই লোকেরা ভিন্ন হইলেও সে বাণী শুনিতে তাহাদের বিতৃষ্ণা নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদ অনুসারে উক্ত গীতি-নাট্যটি মানবস্বরূপের বিভিন্ন উপাদান, তাহার দেহ, অহংবোধ ও আত্মা লইয়া বিচার করিয়া চলিল। পরে কথোপকথন ব্যপদেশে একটি মানুষের ইতিহাস বিবৃত হইল। মানুষটি রসকুঞ্জ বৃন্দাবনে যাইতে চায় কিন্তু এক প্রহরী পথরোধ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে চৌর্য্যাপরাধ উপস্থিত করিল। স্তম্ভিত হইয়া মানুষটি প্রশ্ন করায় প্রহরী তাহাকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া দিল, যেহেতু যাত্রীটি তাহার গাত্রাবরণের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে তাহার অহংটিকে অবৈধপণ্য হিসাবে বৃন্দাবনে আমদানি করিতে উদ্যত; অহং বস্তুটি যে মালিকের, তাহার নিজের নয়, সেটা সে স্বীকার করে নাই। সেই বমালশুদ্ধ ধরা পড়ায় অপরাধীর নিকট তার কল্পলোকের পথ অবরুদ্ধ। বাঁশের উপর ছিন্ন সামিয়ানা খাটাইয়া, ধোঁয়াটে কেরোসিনের আলোয় গ্রামের লোক ভিড় করিয়া শুনিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র হইতে শৃগালের পাল চীৎকার করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসে, তবু শ্রোতাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। তাহারা নাটকটির অভিনয় দেখিতেছে এবং আপাত-বিসদৃশ নৃত্যগীত ও হাস্যপরিহাসের আবেষ্টনে মানব-জীবনের অনেক চরম সমস্যা ও তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যান চলিতেছে।

এই উদাহরণগুলি হইতেই বুঝা যাইবে, ভারতে কাব্য ও দর্শন কেমন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জীবনে পূর্ণতা লাভের সহজ ও সম্ভব পন্থাটি মানুষকে ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব দর্শন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই এটি ভারতে সম্ভব হইয়াছে। সে পূর্ণতার অর্থ কি? ইহার অর্থ সত্যের মধ্যে মুক্তি, যাহার জন্য এই প্রার্থনা জাগিয়াছে—অসতো মা সদ্গময়—কারণ যাহা সত্য, তাহাই আনন্দ।

আমি ছন্দ-শিল্পী। কাব্য-কারবারের ভিতর দিয়া আমি সত্যের একটি আনন্দরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। চিত্তের মুক্তিপথ দিয়া সত্যের আস্বাদ আমাদের দান করাই সমস্ত শিল্পের মূল প্রকৃতি। সেই সম্বন্ধটি মনে রাখিয়া যখন আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের (aesthetics) কথা বলি, তখন সৌন্দর্য্যের সাধারণ সংজ্ঞা ছাড়িয়া তাহাতে কবিগণ যে গভীরতর তাৎপর্য্য দিয়াছেন সেই কথাই ভাবি; "সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য।" চিত্র-শিল্পী একটি জরাজীর্ণ মানুষের ছবি আঁকিলেন, ইহা দেখিতে শোভন নয়, তথাপি তার সেই ছবিখানি ছবি হিসাবে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে যখন আমরা তাহার সত্য মূর্ত্তিটি গভীরভাবে অনুভব করি। ব্রাউনিঙ্-এর কবিতায় ঈর্ষাউন্মত্ত যে নারীটি বিষ প্রস্তুত হইতে দেখিতেছে এবং সেই বিষ তাহার প্রেমঈর্ষার পাত্রীটিকে কি ভাবে জর্জ্জর করিবে তাহা কল্পনায় উপভোগ করিতেছে—এ-হেন নারীর মনকে সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু যখন এই নারীর ছবিটি পরিকল্পন ও রূপস্ফুরণের সুসঙ্গতিতে আমাদের চোখের সম্মুখে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠে, তখন আমরা এই ছবিও উপভোগ করি। মহাভারতে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্রে মধ্যে মধ্যে যে নীচতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার দরুন শিল্পসঙ্গতির আনন্দ ইহাতে আমরা যতটা পাই, কেবল মাত্র অবিমিশ্র ঔদার্য্যের আদর্শ চিত্র হইতে ততটা পাইতাম না। নৈতিক আদর্শের পূর্ণতাটি নানা বিসংবাদী রসের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত চরিত্রটি আমাদের কাছে সত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের আনন্দ দেয়, প্রীতিকর বলিয়া নহে, সৃষ্টির ছন্দে সুনির্দ্দিষ্ট বলিয়া।

জীবনে যাহা আমাদের মিলে না তাহা শিল্পের ভিতর দিয়া আমরা কতকটা উপভোগ করি বলিয়াই যে শিল্পের এত মূল্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শিল্পের আসল মূল্য এইখানে যে তাহার বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া ইহা আমাদের সঙ্গে সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। সেই শিল্প-সৃষ্টিগুলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইবার দরকার নাই, তাহারা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে সত্য হইয়া উঠিলেই আনন্দ দেয়। শিল্পের জগতে আমাদের চেতনা ও অনুভূতি স্বার্থবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়াই আমরা ঐক্য ও সঙ্গতির একটি অপ্রতিহত স্বপ্নরূপ উপভোগ করি; পূর্ণসত্যের মানসী প্রতিমা বলিয়াই তাহা চিরন্তন আনন্দের উৎস।

শিল্পীর জগতে যে নিয়ম, বিধাতার জগতেও তাই; সৃষ্টির উৎস ও চরম লক্ষ্য যে নিঃস্বার্থ আনন্দ, তাহা লাভ করিতে হইলে অহমের কবল হইতে মুক্ত হওয়া চাই। সেই মুক্তির প্রতীক্ষায় আমাদের আত্মা উন্মুখ হইয়া আছে এবং তাহার যে তৃষিত আমিটা আপাত সত্যের মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছে, তাহাকে সত্যের ঐক্যালোকে মুক্তি দিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। এই মুক্তির আদর্শটি আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে ইহা ভারতের জীবনকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করিয়াছে এবং আমাদের সমস্ত ভাবপ্রেরণা ও প্রার্থনাকে উৎসারিত করিয়া দিব্য লোকের পানে ছুটাইয়াছে; কাব্য পক্ষপুটে ভর করিয়া আমাদের আত্মা ঊর্দ্ধে উড়িয়া যায়। সহজবিশ্বাসী তুচ্ছশিক্ষিত কত লোক দেখি তাহাদের প্রার্থনা মুক্তিদায়িনী তারাকে নিবেদন করিয়া গাহিতেছে—

"তারা, কোন অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল।"

আমাদের দেশের এই সব সাধারণ মানুষ সত্যের জগৎ হইতে বিচ্যুত হইবার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত; বস্তু-জগতের ফেনপুঞ্জের মধ্যে একটানা ভাসিয়া যাওয়া, পুলক-বেদনার তরঙ্গভঙ্গে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়া, জীবনের কোন চরম লক্ষ্য খুঁজিয়া না পাওয়া, ইহার মত আতঙ্কের বিষয় তাহাদের আর কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ গাড়োয়ান হাটে গাড়ী হাঁকাইয়া যায়, কেহ বা জেলে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। তাহারা যে সকল গান গায় তাহার গভীর অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা খুব সম্ভব উপযুক্ত জবাব দিতে পারিবে না, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি বিষয়ে সেখানে কোন সন্দেহ নাই। সেটি এই যে, সমস্ত দুঃখের কারণ জীবনের আসবাব্ পত্রের অভাব নয়, জীবনের সত্য তাৎপর্য্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব। এই জন্যই দেখি যে "আমি ও আমার" এই ভাবটার উপর অযথা জোর দিলেই আমাদের দেশের লোক তাহার নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ 'আমি ও আমার' উগ্রবোধটা সত্যের পরিপ্রেক্ষণকে অলীক করিয়া তোলে। তাহারা যে দেখিয়াছে, সংসারের সমস্ত সম্বল পিছনে ফেলিয়া দিয়া সত্যের অভিসারে বাহির হইয়াছে কত মানুষ, যাহাদের সামাজিক পদবী বা মানসিক বিকাশ সাধারণের উপরে যায় না।

এই সকল দুর্গমপথ-যাত্রীদের যে পার্থিব শক্তি সম্পদ বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা যে মুক্তির ভিখারী, সেকথা আমাদের দেশের লোক বোঝে। তাহারা হয় ত এমন মানুষকে দেখিয়াছে যে তাহাদেরই মত দরিদ্র এবং গ্রামে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসায়লিপ্ত। সে তাহার দৈনন্দিন কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তবু তাহার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যে সে একজন মুক্তজীব—শাশ্বত পুরুষের হৃদয়ে সে আশ্রয় পাইয়াছে। এমন একটি মানুষ একবার আমার চোখে পড়িয়াছিল; সে একটি জেলে, সারাদিন গঙ্গায় মাছ ধরিয়া ফেরে আর তন্ময় হইয়া গান গাহিয়া যায়; একজন মাঝি তাহাকে ভক্তিভরে দেখাইয়া বলিল, উনি মুক্তপুরুষ। সমাজ মানুষের উপর যে মামুলী নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, এ-লোকটি তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে; বাজার দর অনুসারে দোকানে সাজান পুতুলের মত মানুষকে সমাজ যে ভাবে সাজায়, তার কোন কোটায় এ লোকটি পড়ে না।

এই জেলেটির মুখ যখন মনে পড়ে, তখন না ভাবিয়া থাকিতে পারি না যে, বন্ধন-মুক্ত আত্মার মহাকাব্য যাহারা জীবন দিয়া রচনা করিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা হয় ত নিতান্ত কম নয়—যদিও ইতিহাসে তাহাদের নাম কখনও দেখিব না। এই সব অবিকৃতআত্মা সামান্য চাষাভুষা জানে যে, সম্রাট তাহার সাম্রাজ্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হইলে বিচিত্রবেশী ক্রীতদাস মাত্র; লক্ষপতি তাহার কর্ম্মফলে সোনার খাঁচায় বন্দী, কিন্তু ঐ সামান্য জেলেটি জ্যোতির্লোকে মুক্তি পাইয়াছে।

যখন অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া ফিরিতেছি, তখন কোন একটি জিনিষে ঠোকর খাইয়া

সেইটিকে আঁকড়াইয়া ধরি এবং তাহাকে আমাদের একমাত্র আশা ও নির্ভরস্থল মনে করি। কিন্তু যখন আলোকের প্রকাশ হয়, তখন ঐ সমস্ত টুক্‌রা টুক্‌রা বস্তুকে ছাড়িয়া দিই। কারণ দেখি যে ভূমার সঙ্গে আমরা সকলে সম্বন্ধযুক্ত, বস্তুগুলি ত তার অংশমাত্র। গ্রামের সামান্য লোকেরা জানে মুক্তি কি জিনিষ—অহমের বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্তি, যাহা হইতে আমাদের অত্যুগ্র অধিকার বোধ জাগে সেই বস্তুর ভেদলিপ্সা হইতে মুক্তি। তাহারা জানে যে কেবল মাত্র বন্ধন অস্বীকার করিলেই মুক্তি আসে না, সম্পদের হ্রাস হইলেও নয়—মুক্তি আসে আস্তিক্যবোধের সাধনে, তাহার সিদ্ধি প্রাণে বিশুদ্ধ আনন্দের প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাই গান উঠে :—

"যে জন ডুব্‌ল সখী তার কি আছে বাকি গো।"

তাই ত ইহারা গাহিয়া থাকে :—

"মনরে আমার মনের সাথে মিল্‌বি যদি আয়
দুই মনেতে এক মন হয়ে আজব সহর চলে যাই।"

এক মন আমারে বাহিরে এই বৈচিত্র্যের রাজ্যে নানা বস্তু খুঁজিয়া ফেরে আর এক মন ভিতরে ঐক্যের স্বপ্নমূর্ত্তির সন্ধানে ছোটে—এই দুই মনের মধ্যে দ্বন্দ্বটি যখন মিটিয়া যায়, তখনই আমরা 'আজব'কে, অনির্ব্বচনীয়কে উপলব্ধি করি। কবীরও এই সত্যটির প্রচার করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম কেবল মাত্র অন্তরের অধ্যাত্ম লোকে বাস করেন ইহা বলিলে বাহিরের এই বস্তুলোকের অপমান করা হয় এবং যখন তাঁহাকে কেবল মাত্র বাহিরে নির্দ্দেশ করি তখনও সত্য বলি না।

এই সব বাউল গায়কদের মতে সত্য ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মুক্তি ঐক্যের সাধনে। আমাদের দৈনিক আরাধনা ও মন্ত্রাদি মনকে সেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে যাহাতে মনকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যত ব্যবধান আছে সব জয় করিতে পারা যায় এবং তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় যিনি অদ্বৈতম্ বলিয়াই অনন্তম্। গভীর তত্ত্বজ্ঞান বাষ্পের মত ভারতের জনসাধারণের চিত্তে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি জাগাইয়াছে। এই জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া দিতেছে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বাহিরে চলিয়া যাইতে; কারণ এখানে তথ্য মাত্র তথ্য বলিয়া আমাদের কাছে বিদেশী সঙ্গীতের ধ্বনির মত অপরিচিত। কিন্তু স্বরগ্রামের সহিত পরিচয় হইলে যেমন আমরা তাহাদের ঐক্যটিকে সঙ্গীতরূপে পাই, তেমনি অন্তহীন বহু যেখানে এককে প্রকাশ করে, সেই সর্ব্বভূতের অন্তরতম সত্যের মধ্যে মুক্তি লাভ করিবার পরামর্শ এই জ্ঞান হইতে আসে।

এই মুক্তি একমাত্র সত্যেই আছে, সত্যাভাসে নাই; সেইজন্য ফলপ্রাপ্তির লোভ তাড়াতাড়ি যে সার্থকতার পথ কাটিয়া বসে, তাহা ঠিক পথ নহে। একজন নগণ্য গ্রাম্য কবি যাহাকে বিশ্বের মান্যগণ্য লোকেরা কেহ জানে না, যাহার মনের উপর সরকারী শিক্ষাবিভাগ

তাহার ছাঁচেঢালা শিক্ষার নিগড় চাপায় নাই, সেই মানুষটি গানের ভিতর দিয়া ঐ পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছে।

"নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহুনে।
দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড ;
এর আছে কোন্‌ উপায় ?
কয় সে মদন, দিস্‌নে বেদন, শোন নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজ ধারা আপন-হারা তাঁর বাণী শোনে,
রে গরজী।"

কবি জানেন জোর করিয়া মুক্তি লাভের কোন বাহ্য উপায় নাই। অন্তরের সাধনপ্রক্রিয়ায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া হারাইতে পারিলেই তবে মুক্তির দিকে যাওয়া যায়। বন্ধন তার অসংখ্য রূপে আমাদের এই অহমের মধ্যেই কেল্লা গড়িয়া বসিয়াছে। তাহা বহির্জগতে নাই। বন্ধন রহিয়াছে আমাদের চৈতন্যের নিষ্প্রভতায়, আমাদের দৃষ্টি-রাজ্যের সঙ্কীর্ণতায় এবং সর্ব্বত্র আমাদের স্থায়ী মূল্য নির্দ্ধারণের ভ্রমে।

ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে; এই সভ্যতা এক নিরবচ্ছিন্ন অভাবের তাড়নায় চালিত; এই যে দুর্দ্দমনীয় গতিবেগের অন্ধশক্তি (inertia), যাহা কোথায় কেমন করিয়া থামিতে হয় তাহা জানে না—এই আপাতমুক্তিকেই সত্য মুক্তি বলিয়া মানুষ ভ্রম করিতেছে। কোন কোন বর্ব্বর জাতি মানুষের মাথার খুলির উপর একটা মনগড়া মূল্যের আরোপ করিয়া থাকে এবং সেই সম্বন্ধে তাহাদের গাণিতিক উন্মত্ততা এমনই বাড়িয়া যায় যে, তাহারা নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া আর শ্রান্ত হয় না। নিষ্ঠুর নিয়তি যেন তাহাদিগকে একটা অন্তহীন বাড়াবাড়ির পথে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহারা কেবলই যোগের পর যোগ দিয়া ছুটিতে থাকে। এই বীভৎস সংগ্রহের পথে যে অবাধ স্বাধীনতা তাহা ঘৃণ্যতম বন্ধনেরই নামান্তর। ইহাদের এই নিষ্ঠুর দাবীর তাড়না কেবল বাড়িয়াই চলে, কারণ যে-বস্তু তাহাদের লক্ষ্য ও কাম্য তাহা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া নাই। সেইরূপ এ কথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কেবল মাত্র গতিবেগকে বাড়াইয়া, তামসিক ভোগের আড়ম্বর ও আস্‌বাব পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া, প্রাণহিংসার যাবতীয় উপাদান ও অস্ত্রশস্ত্রের বিভীষিকা বিপুল করিয়া তুলিয়া, যাহা মহান্‌, যাহা বিরাট্‌ তাহার

একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কদর্য্য পরিহাসোৎসব মাত্র করিতেছি। বন্ধনের শৃঙ্খল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং একটা নিরর্থক নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দাবীর তাড়না সমস্ত পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বে দেখি যে, জন্মগত একটা শাস্তি হইতে নিস্তার লাভই মুক্তি। ভারতে মুক্তি হয় অবিদ্যার অজ্ঞানের অন্ধকারা হইতে, যে অবিদ্যা অহম্‌কেই চরম বলিয়া মোহ উৎপাদন করে। কিন্তু যে প্রজ্ঞা আমাদিগকে এই অবিদ্যা হইতে মুক্তি দিবে তাহা শূন্যগর্ভ নহে। শূন্যতায় মুক্তি নাই। যে অবাধ সুসঙ্গত গতিবিধির ভিতর দিয়া আমরা আমাদের এই আবেষ্টন—এই পার্থিব জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারি, তাহাই মুক্তি। শূন্য নিষ্ফল নিঃসঙ্গতা নহে, সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি—ইহাই ত উপনিষদের কথা—সর্ব্বভূতে যিনি নিজের আত্মাকে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার কাছে সত্য আর অপ্রকাশ থাকেন না।

বাস্তব জগতেও মুক্তির সেই একই তাৎপর্য্য। শুধু তাহা তাহার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যতদিন আমাদের কাছে এক দুর্ব্বোধ্য যুক্তিহীন খামখেয়ালীর প্রকাশ মনে হইয়াছে, ততদিন আমরা যেন এক অজ্ঞেয় বিজাতীয় লোকে বাস করিয়াছি। তাহার মধ্যে যে আমাদের স্বরাজের স্থান আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে এই জগতের চালচলনের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে সেই মিলনের সেই সঙ্গতির মধ্যেই যে ঐক্য ও মুক্তি দেখা দিল। অবিদ্যাই আমাদের আবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের অনৈক্য ঘটায়। এবং বিদ্যা যাহা বস্তুজগতের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশকে বুঝাইয়া দেয়, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যাই ত বাস্তবজগতের মর্ম্মস্থলের ঐক্যটিকে ধরাইয়া দেয়—অদ্বৈতম্‌কে চিনাইয়া দেয়।

জগতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে যাহারা বাড়িয়াছে, যাহারা জানে না যে, জ্ঞানের দাবীতে এই জগত তাহাদেরই সেই সব মানুষ কাপুরুষতায় কায়েমী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। যে নিয়তি অসন্দিগ্ধভাবে আঘাত করিয়া চলিয়াছে—যাহার বিরুদ্ধে আপিল নাই—সেই নিয়তির উপরই আশাহতদের আস্থা। এমন-কি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতেও যখন তাহারা বঞ্চিত হয় তখনও তাহারা বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করে। কারণ তাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে যেন তাহারা জন্ম হইতেই আইনের বাহিরে এবং এ জগৎ সর্ব্বদাই তাহাদের উপর দুর্ব্বোধ্য দুর্ঘটনার উপদ্রব চাপাইবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পর-ভাব এবং অদ্বৈতবোধের অভাবই মুক্তির অন্তরায়। মিলনের গ্রন্থিগুলির উপর জবরদস্তি চলিতেছে বলিয়াই আমাদের বন্ধন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই মুক্তি; কারণ সম্বন্ধের অর্থই হইতেছে অপরের প্রতি দায়িত্ব-বোধ। কিন্তু হেঁয়ালীর মত শুনাইলেও ইহা সত্য যে, জীবজগতে অন্যোন্যসম্বন্ধবোধটি পূর্ণ করিয়া সুসঙ্গত করিয়া

পরস্পরের ভার গ্রহণেই মুক্তি। উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশে কোন দায়িত্বই স্বীকার না করা কেবল মাত্র বর্ব্বরদের পক্ষেই সম্ভব এবং সেই জন্যই বর্ব্বরদের পূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। যে আগুন ভাল করিয়া জ্বলে নাই সুতরাং ধূমজালেই আচ্ছন্ন, সেই আগুনের মতই বর্ব্বরগণ চাপা পড়িয়া থাকে, তাহারা তামস সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই নির্ব্বাপিতপ্রায় তমসাচ্ছন্ন জীবনের কারাবাস হইতে তাহারাই মুক্তি পায়, যাহারা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে ও এক জোটে কাজ করিতে সমর্থ। মানবের মুক্তির ইতিহাস মানবসম্বন্ধের পূর্ণবিকাশেরই ইতিহাস।

এই সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ব্যক্তির বা দলের স্বার্থপরতা। বিশ্বমানবের পূর্ণ বিকাশে যত দূর সম্ভব সাহায্য করাই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শের স্থান অধিকার করিয়া যখন কোন রকম স্বার্থপরতা অবাধে সমাজের মূল উপাদানগুলি গ্রাস করিতে বসে, তখন সভ্যতার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ, গ্রাস করিবার লোভ এবং সৃষ্টি করিবার জীবন্ত শক্তি পরস্পরবিরোধী। জড়ের জগতে প্রাণই প্রথম মুক্তির জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে; কারণ প্রাণ কেবল বাহ্যিক ঘটনা মাত্র নহে, ইহা অন্তর-জগতের প্রকাশ, ইহা বস্তুর সীমা ছাড়াইয়া যায়—উপাদানের ভারে আত্মাকে আটক করিতে দেয় না, অথচ নিজের সত্য সীমাটি মানিয়া চলে। প্রাণের প্রাচুর্য্যে তাহার বৃদ্ধি ও সঙ্গতি চাপা পড়ে না; ভিতর এবং বাহির, লক্ষ্য এবং উপায়, বর্ত্তমান এবং অনাগত এক সমন্বয়ে ঐক্য লাভ করে।

জীবন কেবলমাত্র সঞ্চয় করে না, পরিপাক করে। ইহার বস্তু এবং শক্তি, কর্ম্ম এবং সত্তা নিগূঢ়ভাবে একীভূত। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের জড় উপাদান যখন ওজন ছাড়াইয়া ভয়াবহ হইয়া উঠে, যখন তাহারা যন্ত্র এবং সঞ্চয়ের স্তূপ মাত্র, তখন আমাদের জীবন ও আমাদের জগতের মধ্যে সংগ্রামে জীবনই পরাস্ত হয়। প্রাণনদীর স্রোতটি ক্ষীণ হইয়া হটিয়া যাওয়ায় যে খাদ বাহির হইয়া পড়ে, তাহা অবিশ্রাম ধন বর্ষণে পূর্ণ করিতে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু দেখি যে ধন জরাট করিতে পারিলেও যোগ স্থাপন করিতে পারে না। সেজন্য বস্তুস্তূপের চোরাবালির চাকচিক্য বিপদ্‌জনক ফাটলগুলিকে শুধু লুকাইয়া রাখে। কিন্তু একদিন যখন আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারে হঠাৎ সব তলাইয়া যায়।

কিন্তু আসল দুর্দৈব মনুষ্যত্বের পরাভবে, বৈষয়িক অসুযোগের বিনাশে নহে। মানুষ তাহার আবেষ্টনকে তাহার প্রাণে ও প্রেমে সজীব করিয়া সৃষ্টিধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার সুযোগধর্ম্মী দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সেই মানুষই আবার নির্ম্মম লোভের দাস হইয়া সমস্ত জগৎকে বিকৃত ও কদর্য্য করিয়া তুলিতেছে। মানুষের সৃষ্ট এই যন্ত্রজগতের বেসুরো আর্ত্তনাদ ও কলের মতন নড়াচড়া মানুষের প্রকৃতির উপর বিষম প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সর্ব্বদা এমন একটি বিশ্ব-সংস্থানের দ্যোতনা করিতেছে যাহা সম্বন্ধহীন ও নিরপেক্ষ। এহেন জগতে মুক্তির অবকাশ নাই; কারণ বিচ্ছিন্ন তথ্যের চাপে তাহা নিরেট হইয়া গিয়াছে। শুধু খাঁচাটাই সর্ব্বস্ব,

তাহার বাহিরে আকাশ নাই। তাই জগৎটা সর্ব্বতোভাবে একটা বদ্ধ জগৎ; কঠিন খোলার ভিতর বীজের মত বন্দী। কিন্তু বীজের মর্ম্মস্থলে তখনও প্রাণ কাঁদিতেছে মুক্তির জন্য তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও যখন মৌন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মুক্তির জন্য এই জীবন্ত পিপাসাকে যখন কোন একটা বিরাট্ লোভ পদদলিত করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়, তখন স্ফুরণশক্তিহীন বীজের মত মানব সভ্যতা মরিয়া যায়।

ভারতের মুক্তির আদর্শ নিষ্ক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা পূর্ণভাবে সত্য নহে। ঈশোপনিষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের কর্ত্তব্য শতায়ু হইয়া কর্ম্ম করা। কারণ ইহার মতে পূর্ণতার নিষ্ক্রিয় আদর্শ এবং তাহার বিকাশের সক্রিয় পদ্ধতির মিলন করা চাই, অসীম ও সসীমের সমন্বয়সাধন চাই; ইহাতেই পূর্ণ সত্য। সুতরাং শুধু অসীমকেই চরম সত্য বলিয়া যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা গভীরতর অন্ধকারে পতিত হয়; তাহাদের তুলনায় সসীমবাদীদের অধঃপতন কম গুরুতর। পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি স্বরের সমষ্টিতেই অপরিবর্ত্তনীয় সঙ্গীতের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয় নির্ব্বোধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে সঙ্গীতে স্বরের কোন বালাই নাই, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা ততোধিক। কিন্তু সমন্বয় কোথায়? তুরীয়ধর্ম্মা (Transcendental) সঙ্গীত কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন স্বরগ্রামকে তাহার আত্মপ্রকাশের বাহন করিয়া লয়? ইহার সৃষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে যে ছন্দ, যে সীমা দেখা দেয় তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। সসীমের পন্থা অতিক্রম করিয়াই আমরা অসীমকে লাভ করি। এই কথাই ঈশোপনিষৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

> "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ—
> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

সীমার ছন্দেই আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং তাহার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করি। অমৃতত্ব মাত্র এই বাহ্য জীবনের প্রসারমাত্র নহে—ইহা পূর্ণতার সিদ্ধি, ইহা জীবনের সুসঙ্গত সুন্দর সীমানির্দ্দেশ; প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমাকে প্রকাশ করে। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই উপদেশ আছে, মা গৃধঃ; লোভ করিও না। কিন্তু কেন করিব না? কারণ লোভ সীমার মর্য্যাদা রক্ষা করে না বলিয়া জীবনের ছন্দকে বিনষ্ট করে; সেই ছন্দের ভিতর দিয়াই যে অসীম আত্মপ্রকাশ করেন।

আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহননকারীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহারা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতক। এই সভ্যতায় অনিয়ন্ত্রিত বাসনা ও 'অহম্'কে অতিস্ফীত করিয়া তুলিবার অন্তহীন প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। জীবনের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা জীবনের সৌন্দর্য্য-সংস্কৃতিও হারাইতেছি। অলীক কবির মত আমরা বাক্‌চাতুর্য্যকেই শক্তি বলিয়া, বাস্তববাদকে সত্যবস্তু বলিয়া, ভ্রম করিতেছি। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ স্বর্গরাজ্যে আস্থাবান্ ছিল, তখন জীবনের বিচিত্র শক্তিকে ছন্দোবদ্ধ করিতে এবং সেই আদর্শের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রবৃত্তির রুদ্রসংঘাতের

মধ্যে সেই আদর্শ জীবন ডাক দিয়াছে এবং ইউরোপের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রয়াসের মূলে ছিল একটি সৃষ্টির প্রেরণা—একটি গভীর আস্তিক্যবোধ যাহা আদেশ করিয়া বলিত—লোভ করিও না, আপন সীমাটি চিনিয়া লও। সুসঙ্গত সৌধের স্থান জুড়িয়া আজ অসংখ্য ইটের পাঁজা গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিয়াছে, এবং চূর্ণ ইটের গুঁড়ায় দক্ষ স্থপতির আদর্শটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিচ্ছেদ সূচিত হইতেছে। সেই জন্যই এক ছন্দহীন শক্তি সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া এক প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দীপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে।

ছন্দেই সৃষ্টি; ছন্দেই বিদ্যা ও অবিদ্যার, সীমা ও অসীমের মিলনভূমি। অরূপের বক্ষ হইতে শতদলটি কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল জানি না। অস্পষ্টতার গর্ভে যতদিন ইহা লুকাইয়াছিল ততদিন আমাদের কাছে ইহার কোন তাৎপর্য্যই ছিল না, তবু কোথাও সেই পদ্মটি ছিল ত। কোন দুরবগাহের তলদেশ হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া অপূর্ব্ব ছন্দসীমায় ইহা ধরা দিল, আমাদের চেতনায় একটি নূতন আবর্ত্ত জাগাইল! অসীমের স্পর্শে যে আনন্দ চিনিলাম তাহা যে সীমারই দান। সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজই যে সীমা নির্দ্দেশ করা; তিনি যে বন্ধনের মধ্য দিয়াই মুক্তি পান, সীমার ভিতর দিয়াই অসীমকে পান। জড়-বস্তুর উপাসনায় অসীম অতৃপ্তি। তাহা ক্রমবর্দ্ধমান আতিশয্যের পথে শুধু ছুটায়, কিছু প্রকাশ করে না; তাহার কোন রূপ নাই। এই লোক চিরঅন্ধকারে আবৃত, অন্ধেন তমসাবৃতা; এখানে আছে শুধু মূক বস্তুপিণ্ডের বোঝা। মানুষের সত্য প্রার্থনা বৃহৎকে চায় না; সত্যকে চায়, আলোককে চায়। তাহা অগ্নিকাণ্ড নয়, জ্যোতিরুন্মেষ; মানুষ অমৃতকে চায়, কালের ব্যাপ্তিতে নয়, পূর্ণের শাশ্বত গৌরবে।

মুক্তির অন্তর্লোকের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জ্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে লোকে বস্তু আছে কিন্তু তাহার অর্থ-সিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে লোকে বাঁচিয়া থাকা দাসত্ব। জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মানুষের পক্ষে জীবনকে পাপ বলা সম্ভব হইয়াছে। একটি পাখায় ভর করিয়া পাখী আকাশে উড়িতে গিয়া বাতাসের উপরেই ক্রোধ প্রকাশ করে—কেন সে তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল। খণ্ড সত্যমাত্রই পাপ। খণ্ড সত্য মানুষকে পীড়া দেয়; কারণ তাহা যাহা দিতে পারেনা আভাসে তাহারই কথা মনে জাগায়। মৃত্যু আমাদের পীড়া দেয় না, কিন্তু রোগ যন্ত্রণা দেয়, কারণ রোগ কেবলই স্বাস্থ্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকেই কাড়িয়া রাখে। অসম্পূর্ণ জগতে জীবনও পাপ; কারণ যেখানে জীবনের অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ, সেখানেও তাহা পূর্ণতার ভাণ করে, শুধু পানপাত্রটি মুখের কাছে ধরে কিন্তু প্রাণ-রস হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখে। সত্য খণ্ডিত থাকিয়া যায় বলিয়া, তাহার বিকাশযন্ত্রটির পূর্ণাবর্ত্তন হয় না বলিয়াই সৃষ্টির মধ্যে এত দুর্দ্দৈব।

শত বৎসরের পুরাতন একটি বাউলের গান শুনাইয়া আমি আজিকার বক্তব্য শেষ করিব। এই গানে কবি অনন্তের সহিত সান্ত জীবাত্মার চিরন্তন মিলন বন্ধনের কথা গাহিয়াছেন; এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই, কারণ এই পরস্পর সম্বন্ধেই সত্য সম্পূর্ণ হয়, কারণ প্রেমই পরমতত্ত্ব, নিরপেক্ষ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বন্ধ্যাতা ও শূন্যতামাত্র। অবিমিশ্র বিদ্যাতেও সত্য নাই, অবিদ্যাতেও নাই, দুইয়ের মিলনেই সত্যের প্রকাশ—উপনিষদের এই কথায় যাহা পাই, এই গানটিতেও আমরা সেই ভাবটি উপলব্ধি করি।

"হৃদয়-কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কী করি।
ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ,
এই কমলের যে-এক মধু রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারে না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
মুক্তি কোথাও নাই।" *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথের দাবী†

(২৯)

স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় ভারতী নৌকায় আসিয়া বসিল, এবং নদী-পথের সমস্ত ক্ষণ নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর হইবে; আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রালোকে পৃথিবীর অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, নৌকা আসিয়া সেই ঘাটে ভিড়িল। হাত ধরিয়া ভারতীকে নামাইয়া দিয়া সব্যসাচী নিজে নামিবার উপক্রম করিতে ভারতী বাধা দিয়া কহিল, আমাকে পৌঁছে দিতে হবেনা দাদা, আমি আপনিই যেতে পারবো।

একলাটি ভয় করবেনা?

করবে। কিন্তু তা'বলে তোমাকে আস্‌তে হবেনা।

সব্যসাচী কহিলেন, এইটুকু বই ত নয়, চলনা তোমাকে খপ্‌ করে পৌঁছে দিয়ে আসি, বোন্। এই বলিয়া তিনি নীচে সিঁড়ির উপরে পা বাড়াইতেই ভারতী হাতজোড় করিয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তুমি সঙ্গে গিয়ে ভয় আমার হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়োনা। তুমি বাসায় যাও।

* এই অভিভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।

† সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বাস্তবিক, সঙ্গে যাওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আর জিদ্ করিলেন না, কিন্তু ভারতী চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নদীকূলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাসায় আসিয়া ভারতী চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, আলো জ্বালিয়া চারিদিক সাবধানে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পরে কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ অবশ, মন অবসন্ন, তন্দ্রাতুর দুই চক্ষু শ্রান্তিতে মুদিয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলনা। ঘুরিয়া ফিরিয়া সব্যসাচীর এই কথাই তাহার বারম্বার মনে হইতে লাগিল যে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্যবস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে;—যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

ভারতী মনে মনে বলিল, মানবের প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে নূতন সত্য সৃষ্টি করিয়া তুলাই ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় সত্য। অর্থাৎ, ইহার কাছে কোন পন্থাই অসত্য নয়; কোন উপায়, কোন অভিসন্ধিই হেয় নয়। এই যে কারখানার কদাচারী কুলি-মজুরদের সৎপথে আনিবার উদ্যম, এই যে তাহাদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার আয়োজন, এই যে তাহাদের নৈশ বিদ্যালয় ইহার সমস্ত লক্ষ্যই আর কিছু—এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে সব্যসাচীর কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা নাই! পরাধীন দেশের মুক্তি-যাত্রায় আবার পথের বাচ-বিচার কি? একদিন সব্যসাচী বলিয়াছিলেন, পরাধীন দেশে শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হয়ে দাঁড়ায় তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নেই, ভারতী! সেদিন একথার তাৎপর্য্য সে বুঝিতে পারে নাই, আজ সে অর্থ তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। ইহার পরে কখন্ যে তাহার চৈতন্য নিদ্রায় ও তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল তাহার মনে নাই, কিন্তু মনে পড়িল নিদ্রার ঘোরে সে বারবার আবৃত্তি করিয়াছে, দাদা, অতি-মানুষ তুমি, তোমার পরে ভক্তি-শ্রদ্ধা স্নেহ আমার চিরদিনই অচল হয়ে থাক্‌বে, কিন্তু, তোমার এ বিচার-বুদ্ধি আমি কোনমতেই গ্রহণ করতে পারবনা। জগদীশ্বর করুন, তোমার হাত দিয়াই যেন তিনি স্বদেশের মুক্তি দান করেন, কিন্তু, অন্যায়কে কখনও ন্যায়ের মূর্ত্তি দিয়ে দাঁড় করিয়োনা। তুমি পরম পণ্ডিত, তোমার বুদ্ধির সীমা নেই, তর্কে তোমাকে এঁটে ওঠা যায়না,—তুমি সব পারো। বিদেশীর হাতে পরাধীনের লাঞ্ছনা যে কত, দুঃখের সমুদ্রে কত যে আমাদের প্রয়োজন, দেশের মেয়ে হয়ে সে কি আমি জানিনে দাদা? কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনকেই যদি সকলের শীর্ষে স্থান দিয়ে দুর্ব্বলচিত্ত মানবের কাছে অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলে সৃষ্টি কর, এ দুঃখের আর কখনো তুমি অন্ত পাবেনা।

পরদিন ভারতীর যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। ছেলেরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া

ডাকাডাকি করিতেছে, সে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া লইয়া নীচে আসিয়া কবাট খুলিতেই জনকয়েক ছাত্র ও ছাত্রী বই-শ্লেট লইয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের বসিতে বলিয়া ভারতী কাপড় ছাড়িতে উপরে যাইতেছিল, হোটেলের মালিক ঠাকুরমশায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, অপূর্ব্ব বাবু তোমাকে কাল রাত থেকে খুঁজছেন দিদি।

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে এসেছিলেন?

ঠাকুরমশায় কহিল, হাঁ। আজও সকাল থেকে বসে আছেন, গিয়ে পাঠিয়ে দিগে?

ভারতীর মুখ পলকের জন্য শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আমাকে তাঁর কি দরকার?

ব্রাহ্মণ বলিল, সে তো জানিনে দিদি। বোধহয় তাঁর মায়ের অসুখের সম্বন্ধেই কিছু বল্‌তে চান।

ভারতী হঠাৎ রুষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় তাঁর মায়ের কি অসুখ হয়েছে তার আমি কি কোরব?

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। অপূর্ব্ববাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি পদস্থ ব্যক্তি, আগেকার দিনে এই গৃহে তাঁহার যত্ন এবং সমাদরের ত্রুটি ছিলনা, সময়ে ও অসময়ে তাহার অনেক মাল মশলা হোটেল হইতে তাহাকেই যোগাইয়া দিতে হইয়াছে। আজ অকস্মাৎ এই উত্তাপের সে হেতু বুঝিলনা। কহিল, আমি ত সেসব কিছু জানিনে দিদি, গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই, ভারতী ডাকিয়া বলিল, সকালে আমার অনেক কাজ, ছেলে-মেয়েরা এসেছে তাদের পড়া বলে দিতে হবে, বলে দাওগে দেখা করবার এখন সময় হবেনা।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, তবে দুপুরে কি বৈকালে আস্‌তে বলে দেব?

ভারতী কহিল, না, আমার সময় নেই। এই বলিয়া এ প্রস্তাব এই খানেই বন্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন সে ঘণ্টাখানেক পরে নীচে নামিয়া আসিল, তখন ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া গেছে ও তাহাদের বিদ্যালাভের ঐকান্তিক উদ্যমে সমস্ত পাড়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে দু'বেলাই পাঠশালা বসিত, এখন লোকের অভাবে নৈশ বিদ্যালয়টা প্রায় বন্ধ হইয়াই গেছে; সুমিত্রা নাই, ডাক্তার আত্মগোপন করিয়াছেন, নবতারা অন্যত্র গিয়াছে, শুধু নিজের বাসা বলিয়া সকালবেলাটার কাজ ভারতী চালাইয়া লইতেছিল। প্রাত্যহিক নিয়মে আজও সে পড়াইতে বসিল, কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। পড়া দেওয়া এবং লওয়া আজ শুধু নিষ্ফল নয়, তাহার আত্ম-বঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবুও কোনমতে এম্‌নি করিয়া ঘণ্টা দুই কাটিলে পড়ুয়ারা যখন গৃহে চলিয়া গেল, তখন কি করিয়া যে সে আজিকার সমস্ত দিন কাটাইবে তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। আর সকল ভাবনার মাঝে মাঝে আসিয়া অবিশ্রাম বাধা দিয়া যাইতে লাগিল অপূর্ব্বর চিন্তা। তাহাকে এভাবে

প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে অশোভনতা যতই থাক্, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে ঢের মন্দ হইত এ বিষয়ে ভারতীর সন্দেহ ছিল না। কোন একটা অজুহাতে দেখা করিয়া সে পূর্ব্বেকার অস্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিতে চায়, না হইলে মায়ের অসুখ যদি, তবে সে এখানে বসিয়া করিতেছে কি? মা তাহার, ভারতীর নয়। তাঁহারই সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া যাওয়া যে পুত্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য তাহা কি পরের সহিত বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে? তাহার মনে পড়িল রোগের সম্বন্ধে অপূর্ব্বর নিদারুণ ভয়। তাহার কোমল চিত্ত বাহিরে হইতে ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া যত ছট্‌ফট্ই করুক, রুগ্নের সেবা করিবার তাহার না আছে শক্তি, না আছে অভিজ্ঞতা। এ ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত করার মত সর্ব্বনাশ আর নাই। এ সমস্তই ভারতী জানিত,—সে ইহাও জানিত জননীকে অপূর্ব্ব কতখানি ভালবাসে। মায়ের জন্য করিতে পারেনা পৃথিবীতে এমন তাহার কিছু নাই। তাঁহারই কাছে না যাইতে পারার দুঃখ অপূর্ব্বর কত, ইহাই কল্পনা করিয়া একদিকে যেমন তাহার করুণার উদয় হইল, অন্যদিকে এই অসহ্য ভীরুতায় ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ভারতী মনে মনে বলিল, শুশ্রূষা করিতে পারে না বলিয়াই কি পীড়িতা মায়ের কাছে গিয়া কোন লাভ নাই? এই উপদেশ আমার কাছে অপূর্ব্ব প্রত্যাশা করে নাকি?

এম্‌নি করিয়া এই দিক দিয়াই তাহার চিন্তার ধারা অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতার অসুখের সম্বন্ধে অপূর্ব্বর আর কিছু যে জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, এ ছাড়া অন্য কিছু যে ঘটিতে পারে যাহা তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে ইহার আভাষ পর্য্যন্ত তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না।

ক্ষুধার লেশমাত্র ছিলনা বলিয়া আজ ভারতী রাঁধিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাহার দ্বারে লাগিল। ভারতী উপরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময় ও শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মোট ঘাট গাড়ীর ছাদে চাপাইয়া শশী আসিয়া উপস্থিত। গত রাত্রের হাসি-তামাসাকে জগতে যে কোন মানুষই এমন বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে, ভারতী বোধ হয় তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না। কিন্তু ইহার কাছে অভাবনীয় কিছু নাই। রহস্য একেবারে মূর্ত্তিমান সত্যরূপে সশরীরে আসিয়া হাজির হইল।

ভারতী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া কহিল, একি ব্যাপার শশী বাবু?

শশী স্মিতমুখে কহিল, বাসা তুলে দিয়ে এলাম। এবং তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে হুকুম করিয়া দিল, সমান সব কুছ্ উপরমে লে যাও—

ভারতী বিরক্তি দমন করিয়া কহিল, উপরে যায়গা কোথায় শশী বাবু?

শশী কহিল, আচ্ছা বেশ, তা'হলে নীচের ঘরেই রাখুক।

ভারতী বলিল, নীচের ঘরে পাঠশালা, সেখানেও সুবিধে হবে না।

শশী চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভারতী তাহাকে ভরসা দিয়া কহিল, এক কাজ করা যাক্ শশীবাবু। হোটেলে ডাক্তারের ঘরটা ত আজও খালি পড়ে আছে, আপনি সেখানেই বেশ থাক্‌বেন। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট হবে না, চলুন।

কিন্তু ঘরের ভাড়া লাগ্‌বে ত?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, না, তাও লাগ্‌বেনা, ছমাসের ভাড়া দাদা দিয়ে গেছেন।

শশী খুসি না হইলেও এই ব্যবস্থায় রাজী হইল। সমস্ত জিনিস-পত্র সমেত দাদাঠাকুরের হোটেলের মধ্যে কবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতী যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি হইয়াছে। আজ সকল দিক দিয়া তাহার শ্রান্তি ও চিন্তার আর অবধি ছিলনা, পাছে শশী কিম্বা আর কেহ আসিয়া তাহার নিঃসঙ্গ শুদ্ধতায় বিঘ্ন ঘটায় এই আশঙ্কায় সে নীচের ও উপরের সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অভ্যাস মত পরদিন প্রত্যুষে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনাহারের দুর্ব্বলতায় সমস্ত শরীর এমনি অবসন্ন যে শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তৃষ্ণায় বুকের মধ্যেটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং দেহ ধারণের এ দিকটায় অবহেলা করিলে আর চলিবে না, তাহা সে বুঝিল।

খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও যে ভারতী খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সত্যই বাচ-বিচার করিয়া চলিত এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তথাপি, মনে হয় সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হইতেও পারে নাই। যে ব্যক্তিকে তাহার জননী বিবাহ করিয়াছিলেন, সে অত্যন্ত অনাচারী ছিল, তাহার সহিত একত্রে বসিয়াই ভারতীকে ভোজন করিতে হইত, তাই বলিয়া পূর্ব্বেকার দিনের অখাদ্য বস্তু কোনদিনও তাহার খাদ্য হইয়া উঠে নাই। ছোঁওয়া-ছুঁইর বিড়ম্বনা তাহার ছিল না, কিন্তু যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার হাতে খাইতেও তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইত। মায়ের মৃত্যুর পরে হইতে সে খরচের দোহাই দিয়া বরাবর নিজে রাঁধিয়াই খাইত। শুধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে, বা কাজের ভিড়ে অতিশয় ক্লান্তি বা একান্ত সময়াভাব হইয়া উঠিলেই কদাচিৎ কখনও ঠাকুর মশায়ের হোটেল হইতে সাগু বার্লি বা রুটি আনাইয়া লইয়া খাইত। বিছানা হইতে উঠিয়া সে হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রস্তুত হইল, কিন্তু রান্না করিয়া লইবার মত জোর বা প্রবৃত্তি আজ তাহার ছিল না তাই হোটেল হইতে রুটি ও কিছু তরকারী তৈরী করিয়া দিবার জন্য ঠাকুর মহাশয়কে খবর পাঠাইল। সোমবারে তাহাদের পাঠশালা বন্ধ থাকিত বলিয়া আজ এ দিকের পরিশ্রম তাহার ছিল না।

অনেক বেলায় ঝি খাবারের থালা হাতে করিয়া আনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, বড্ড বেলা হয়ে গেল দিদিমণি—

ভারতী তাহার নিজের থালা ও বাটি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। হিন্দু হোটেলের শুচিতা রক্ষা করিয়া ঝি দূর হইতে সেই পাত্রে রুটি ও তরকারি এবং বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, নাও বোসো, যা পারো দুটো মুখে দাও।

ভারতী তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। ঝির বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতে লাগিল, ওখান থেকে ফিরে এসে শুনি তোমার অসুখ। একলা হাতে তখন থেকে ধড়ফড় করে মরচি দিদিমণি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে দুখানা রুটি বেলে দেয়। আর দেরি কোরোনা দিদি, বোসো।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি যাও ঝি, আমি বস্‌চি।

ঝি কহিল, যাই। চাকরটা ত সঙ্গে গেল, একলা সমস্ত ধোয়া মাজা,—যাহোক্, ফিরে এসে কুড়িটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বাবু কেঁদে ফেলে বল্‌লেন, ঝি, শেষ সময়ে তুমি যা করলে মার মেয়ে কাছে থাকলে এমন করতে পারতো না। তিনিও যত কাঁদেন আমিও তত কাঁদি দিদিমণি! আহা, কি কষ্ট! বিদেশ বিভুঁই, কেউ নেই আপনার লোক কাছে,—সুমুদ্দুর পথ, টেলিগ্রাফ্ কর্‌লেই ত আর বউ ব্যাটা উড়ে আসতে পারে না—তাদেরই বা দোষ কি?

ভারতীর বুকের ভিতরটা উদ্বেগ ও অজানা আশঙ্কায় হিম হইয়া উঠিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া শুধু স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝি বলিতে লাগিল, ঠাকুরমশাই ডেকে বল্‌লেন, বাবুর মায়ের বড় ব্যামো, তোমাকে যেতে হবে ক্ষান্ত। আমি আর না বল্‌তে পার্‌লুম না। একে নিমোনিয়া রুগী, তাতে ধম্মশালার ভিড়, জানালা কবাট সব ভাঙা, একটাও বন্ধ হয় না—কি আতন্তর! মারা গেলেন বেলা পাঁচটার সময়, কিন্তু মেসের বাবুদের সব খবর দিতে, ডাক্‌তে হাঁক্‌তে, মড়া উঠ্‌লো সেই দুটো আড়াইটে রাতে। ফিরে আস্‌তে তাঁদের বেলা হল,—একলাটি সমস্ত ধোয়া মোছা—

এইবার ভারতীর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অপূর্ব্ববাবুর মা মারা গেলেন বুঝি?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ দিদিমণি, তাঁর বর্ম্মায় যেন মাটি কেনা ছিল। সেই যে কথায় কি বলে, লা ভাড়া করে যায় সেখানে—এ ঠিক তাই। অপূর্ব্ববাবুও এখান থেকে বেরিয়েছেন, তিনিও ব্যাটার সঙ্গে ঝগড়া করে সেখানে জাহাজে উঠেছেন, সঙ্গে কেবল একজন চাকর। জাহাজেই জ্বর, ধম্মশালায় নেমে একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়ীতে পা দিয়েই বাবু ফিরতি জাহাজে ফিরে এসে দেখেন মা যায়-যায়। গেলেনও তাই,—কিন্তু দাঁড়িয়ে এক দণ্ড কথা কবার যো নেই দিদিমণি, এখনি সবাই আবার বার হবে। আস্‌বো তখন সন্ধ্যেবেলায়,—এই বলিয়া সে গল্পকরার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রুটির থালা তেম্‌নি পড়িয়া রহিল, প্রথমে দুই চক্ষু তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল, তাহার পরে

বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গণ্ড বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অপূর্ব্বর মাকে সে দেখেও নাই, এবং স্বামী পুত্র লইয়া এ জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন এ ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানিতও না, কিন্তু কতদিন নিজের নিরালা ঘরের মধ্যে সে রাত্রি জাগিয়া এই বর্ষীয়সী বিধবা রমণীর সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করিয়াছে! সুখের মাঝে নয়, দুঃখের দিনে কখনো যদি দেখা হয়, যখন সে ছাড়া আর কেহ তাঁহার কাছে নাই, তখন ক্রীশ্চান বলিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে পারেন এ কথা জানিবার তাহার ভারি সাধ ছিল। বড় সাধ ছিল দুর্দ্দিনের সেই অগ্নি-পরীক্ষায় আপন-পর-সমস্যার সে শেষ সমাধান করিয়া লইবে ধর্ম্মমত-ভেদই এ জগতে মানুষের চরম বিচ্ছেদ কি না, এই সত্য যাচাই করিবার সেই পরম দুঃসময়ই ভাগ্যে তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ রহস্য এ জীবনে অমীমাংসিতই রহিয়া গেল!

আর, অপূর্ব্ব! সে যে আজ কত বড় নিঃসহায়, কতখানি একা, ভারতীর অপেক্ষা তাহা কে বেশি জানে? হয়ত, মাতার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদই তাহাকে কবচের মত অদ্যাবধি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা অন্তর্হিত হইল। ভারতী মনে মনে বলিল, এ সকল তাহার আকাশ-কুসুম, তাহার নিগূঢ় হৃদয়ের স্বপ্ন-রচনা বই আর কিছু নয়, তবু যে সেই স্বপ্ন তাহার নির্দ্দেশহীন ভবিষ্যতের কতখানি স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভায় অপরূপ করিয়া রাখিত, সে ছাড়া এ কথাই বা আর কে জানে? কে জানে তাহার চেয়ে বেশি, ঘরে-বাহিরে অপূর্ব্ব আজ কতবড় নিঃসহায়, কতখানি একা!

এই প্রবাসভূমে হয়ত অপূর্ব্বর কর্ম্ম নাই, হয়ত, আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভীরু, লোভী, নীচাশয় বলিয়া বন্ধুজন মধ্যে সে নিন্দিত,—আর সকল দুঃখের বড় দুঃখ মা আজ তাহার লোকান্তরিত। ভারতীর মনে হইল, পরিচিত কাহারও কাছে অপূর্ব্ব লজ্জায় যাইতে পারে নাই বলিয়াই বোধহয় সকল লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সে বারবার তাহারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। উদ্যমের পটুতা, ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কার্য্যের তৎপরতা কিছুই তাহার নাই, অথচ, অতিথি-শালায় অসহ্য জনতা ও কোলাহল, এবং সর্ব্ববিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে সেই মায়ের মৃত্যু যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন একাকী কি করিয়া যে তাহার মুহূর্ত্তগুলি কাটিয়াছে এই কথা কল্পনা করিয়া চোখের জল তাহার যেন থামিতে চাহিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে যে কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, সেই কথাই স্মরণ হইল, যেন সকল দুঃখের সূত্রপাত অপূর্ব্বর তাহার সহিত পরিচয়ের সঙ্গেসঙ্গেই জন্ম লইয়াছে। না লইলে, পিতা ও অগ্রজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকূলে যখন সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শতেক দুঃখ সহিয়াছে, তখন স্বার্থবুদ্ধি তাহাকে সত্য-পথভ্রষ্ট করে নাই কেন? দুর্ব্বলতা তখন ছিল কোথায়? স্বধর্ম্মাচরণে আস্থা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা,—সমস্তই যাহার মায়ের মুখ চাহিয়া, সে কি এমনই ক্ষুদ্রাশয়? তাহার পূজা-অর্চ্চনা, তাহার গঙ্গাস্নান, তাহার টিকি রাখা,—তাহার সকল কার্য্য, সকল অনুষ্ঠান—হোক্‌না ভ্রান্ত, হোক না মিথ্যা, তবু'ত

সে সকল বিদ্রূপ, সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অটল হইয়া ছিল। একি অপূর্ব্বর অস্থিরচিত্ততার এত বড়ই নিদর্শন? আজ তবে সেই লোক বর্ম্মায় আসিয়া এমন হইয়া গেল কিরূপে? এবং এত কাল এতখানি দুর্ব্বলতা তাহার লুকানো ছিল কোন্ খানে? সব্যসাচীর কাছে উত্তর জানিতে গিয়া কতদিন এই প্রশ্নই তাহার মুখে বাধিয়া গিয়াছে। শুধু ত কৌতূহলবশেই নয়, হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে দিয়াই সে কতবার ভাবিয়াছে, এ সংসারে যাহা কিছু জানা যায় দাদা ত সমস্তই জানেন, তবে এ সমস্যারও উচ্ছেদ তিনিই করিয়া দিবেন। কেবল সঙ্কোচ ও সরমেই তাহা উত্থাপন করিতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা নূতন প্রশ্ন তাহার মনে আসিল। কর্ম্মদোষে যখন সবাই অপূর্ব্বর প্রতি বিরূপ, তখনও শুদ্ধমাত্র যে লোকটির সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই,—সে সব্যসাচী। কিন্তু, কিসের জন্য? শুধু কি কেবল ভগিনী বলিয়া তাহারই সমবেদনায়? তাঁহার স্নেহ পাইবার মত নিজস্ব কি অপূর্ব্বর কিছুই ছিল না? সত্যসত্যই কি ভারতী এত ক্ষুদ্রেই এত বৃহৎ ভালবাসা সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে! তখন সতর্ক করিয়া দিবার মত কিছুই কি তাহার অন্তরে ছিল না? হৃদয় কি তাহার এম্‌নি দেউলিয়া হইয়াই ছিল!

এম্‌নি করিয়া একভাবে বসিয়া ঘণ্টা দুই সময় যখন তাহার কোথা দিয়া কাটিয়া গেছে, ঝি ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হোটেলের জরুরি কাজের মধ্যে সমস্ত আলোচনা নিঃশেষ করিয়া যাইবার তাহার অবসর ছিল না, এখন একটুখানি ছুটি পাইয়াছে। অপূর্ব্ব ও ভারতীর মাঝখানে যে একটি রহস্যময় মধুর সম্বন্ধ আছে তাহা আভাষে-ইঙ্গিতে অনেকেই জানিত, ঝিরও অবিদিত ছিল না। তবে, সহসা এমন কি ঘটিল যাহাতে অপূর্ব্বর এতবড় বিপদের দিনেও ভারতী তাহার ছায়াস্পর্শ করিল না? এত বড় সম্বাদ স্ত্রীলোক হইয়াও না জানা পর্য্যন্ত ক্ষান্তর মুখে অন্ন-জল রুচিতেছিল না। তাই সে কোন একটা আছিলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে অবাক্ হইল, পরে কহিল, কিছুই ত ছোঁওনি দেখ্‌চি!

ভারতী লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না।

ঝি মাথা নাড়িয়া, কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া কহিল, খাওয়া যায় না, দিদিমণি, যে কাণ্ড চোখে দেখে এলুম। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখ্‌বে চল, ভাতের থালা আমার যেমন তেম্‌নি পড়ে রয়েছে,—মুখে দিয়েছি কি না দিয়েছি।

ইহার অবাঞ্ছিত সমবেদনায় ভারতীর সঙ্কোচের অবধি রহিল না। জোর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাউকে দিয়ে একখানা গাড়ী ডাকিয়ে দাও না ঝি।

যাবে বুঝি?

হাঁ, একবার দেখি গিয়ে কি হল।

ক্ষান্ত বলিল, আজ সকালে ঠাকুরমশায়কে কি সাধ্যি-সাধনা। আমি শুনে বলি সে কি কথা!

মানুষের আপদে-বিপদে কোরব না তো আর কোরব কবে? হাতের কাজ পড়ে রইল, যেমন ছিলুম, তেম্‌নি বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যি তবু—

সেই সমস্তর পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া কহিল, তুমি অসময়ে যা করেছ তার তুলনা নেই। কিন্তু, আর দেরি কোরো না ঝি, গাড়ী একখানা আনিয়ে দাও। আমার যেতে হলে একটু বেলা-বেলি যাওয়াই ভাল। ঘরের কাজ-কর্ম্ম ততক্ষণ সেরে রাখি।

ঝি লোক মন্দ নয়। সে গাড়ী ডাকিতে গেল, এবং দুঃসময়ে সাহায্য করিবার আগ্রহে এমন কথাও জানাইল যে, ঘরের কাজকর্ম্ম আজ না হয় সে-ই করিয়া দিবে। এমন কি খাবার জিনিসগুলা যখন ছোঁয়া যায় নাই, তখন তাহাও পরিষ্কার করিয়া দিতে তাহার বাধা নাই। শেষে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিলেই চলিবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে এমন করিতেই হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিনিট পনেরো পরে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে ভারতী সঙ্গে কিছু টাকা লইয়া ঘরে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পান্থ-শালায় আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখনও বেলা আছে। দ্বিতলের একখানা উত্তর ধারের ঘর দেখাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানী দরওয়ান জানাইয়া দিল যে, বাঙালী বাবু ভিতরেই আছেন; এবং বাঙালী রমণীর কাছে বাঙ্‌লা ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, যেহেতু তিন দিনের বেশি থাকার রুল নাই, অথচ ছয় দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ম্যানিজর্ সাবের লুটিশ হইলে তাহার নোক্‌রিতে বহুত গুলমাল হইয়া যাইবে।

ভারতী ইঙ্গিত বুঝিল। অঞ্চল খুলিয়া গুটি দুই টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া তাহারই নির্দ্দেশমত উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল সমস্ত মেঝেটা তখনও জলে থৈ থৈ করিতেছে, জিনিস-পত্র চারিদিকে ছড়ানো, এবং তাহারই একধারে একখানা কম্বলের উপরে অপূর্ব্ব উপুড় হইয়া পড়িয়া নূতন উত্তরীয় বস্ত্রখানা মুখের উপর চাপা দেওয়া—সে জাগিয়া আছে কিম্বা ঘুমাইতেছে তাহা বুঝা গেল না। ভারতী শুনিয়াছিল সঙ্গে চাকর আসিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও সে ছিল না, কারণ, অপরিচিত তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেহ নিষেধ করিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভারতী ধীরে ধীরে ডাকিল, অপূর্ব্ব বাবু!

অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিল, তারপরে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্থিরভাবে থাকিয়া চোখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। সদ্য মাতৃ-বিয়োগের সীমাহীন বেদনা তাহার মুখের উপরে জমাট হইয়া বসিয়াছে, কিন্তু আবেগের চাঞ্চল্য নাই,—শোকাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টির সম্মুখে এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই যেন তাহার একেবারে মিথ্যা হইয়া গেছে। মাতার পক্ষ-পুটচ্ছায়া-বাসী যে-অপূর্ব্বকে একদিন সে চিনিয়াছিল এ সে-মানুষ নয়। আজ তাহাকে মুখোমুখি দেখিয়া ভারতী বিস্ময়ে এম্‌নি অবাক্ হইয়া রহিল যে, কোন্ কথা বলিবে, কি বলিয়া ডাকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিল অপূর্ব্ব নিজে। সেই কথা কহিল, বলিল, এখানে বস্‌বার কিছু নেই, ভারতী, সমস্তই ভিজে, তুমি বরঞ্চ ঐ তোরঙ্গটার উপরে বোস।

ভারতী উত্তর দিল না, কবাটের চৌকাট ধরিয়া নতনেত্রে যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেম্‌নি স্থির হইয়া রহিল। তাহার পরে বহুক্ষণ অবধি দুজনের কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না।

হিন্দুস্থানী চাকরটা তেল কিনিতে দোকানে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে হারিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব্ব কহিল, ভারতী, বোস।

ভারতী বলিল, বেলা নেই, বস্‌লে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে!

এখ্‌খুনি যাবে? একটুও বস্‌তে পারবে না?

ভারতী ধীরে ধীরে গিয়া সেই তোরঙ্গটার উপরে বসিয়া এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, মা যে এখানে এসেছিলেন আমি জান্‌তাম না। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু বুকের ভেতরটা আমার পুড়ে যাচ্চে। এ নিয়ে তুমি আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না। বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, সময় হয়েছিল, মা স্বর্গে গেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, এজন্মে তোমাকে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না, কিন্তু এমন কোরে তোমাকে ফেলে রেখেই বা আমি থাক্‌বো কি করে? সঙ্গে গাড়ী আছে, ওঠো, আমার বাসায় চল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

ভারতীর ভয় ছিল অপূর্ব্ব হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার শুষ্ক চক্ষে জলের আভাষ পর্য্যন্ত দেখা দিল না, শান্তস্বরে কহিল, অশৌচের অনেক হাঙ্গামা ভারতী, ওখানে সুবিধে হবে না। তা'ছাড়া এই শনিবারের ষ্টিমারেই আমি বাড়ী ফিরে যাবো।

ভারতী বলিল, শনিবারের এখনো চার দিন দেরি। মায়ের মৃত্যুর পরে হাঙ্গামা যে একটু থাকে সে আমি জানি, কিন্তু সইতে পারবোনা আমি, আর পারবে এই অতিথি-শালার লোকে? চল।

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ভারতী কহিল, না বল্‌লেই যদি এই অবস্থায় ফেলে রেখে তোমাকে যেতে পারতাম, আমি আস্‌তাম না, অপূর্ব্ব বাবু। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, এতদিনের পরে তোমাকে ঢেকে বল্‌বার, লজ্জা করে বলবার আর আমার কিছুই নেই। মায়ের শেষ কাজ বাকি—শনিবারের জাহাজে তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতেই হবে, এবং তার পরে যে কি হবে সেও আমি জানি। তোমার কোন ব্যবস্থাতেই আমি বাধা দেব না, কিন্তু এ সময়ে এ ক'টা দিনও যদি তোমাকে চোখের ওপর না রাখতে পারি, ত তোমারই দিব্যি করে বল্‌চি, বাসায় ফিরে গিয়ে আজ আমি বিষ খেয়ে মরবো। মায়ের শোক তাতে বাড়বে বই কম্‌বে না, অপূর্ব্ব বাবু।

অপূর্ব্ব অধোমুখে মিনিট দুই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চাকরটাকে তা'হলে ডাকো, জিনিস-পত্র গুলো সব বেঁধে ফেলুক।

জিনিস পত্র সামান্যই ছিল, গুছাইয়া বাঁধিয়া গাড়ীতে তুলিতে আধঘণ্টার অধিক সময় লাগিল না। পথের মধ্যে ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা আস্‌তে পারলেন না?

অপূর্ব্ব কহিল, না, তাঁর ছুটি হোলো না।

এখানকার চাকরি কি ছেড়ে দিয়েছ?

হাঁ, সে একরকম ছেড়েই দেওয়া।

মা'র কাজ-কর্ম্ম চুকে গেলে কি এখন বাড়ীতেই থাক্‌বে?

অপূর্ব্ব কহিল, না। মা নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও ও-বাড়ীতে আমি থাক্‌তে পারবোনা। শুনিয়া ভারতীর মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমালোচনা

" সুদুর্লভাঃ সর্ব্ব-মনোরমা গিরঃ "

সাময়িক সাহিত্য

সবুজপত্র—পৌষ, ১৩৩২

সাময়িক সাহিত্য—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের কতগুলি দুষ্পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া লেখক বিশ্রী উদ্গার ছাড়িতেছেন। তা'ছাড়ুন, -কিন্তু তাঁহার বদহজমে সবুজপত্রের বক্ষ বিড়ম্বিত হয় কেন? নূতন বা অপ্রচলিত শব্দ এবং যাহা হইতে পারে না, সেইরূপ পদের প্রয়োগ করিয়া নিজের কস্‌রত্‌ দেখাইতেও লেখক কম প্রয়াস পান নাই। যথাঃ—"রূপায়ন"; বাতায়ন-রসায়ন-রামায়ণ হইতে পারে, আর "রূপায়ন" হইবে না?

তারপর, উপনিষদাদিতেও যে লেখক লব্ধ-প্রবেশ,—তারও পরিচয় দিয়াছেন "একটা বৃহতের ভূমার মধ্যে।" মানে কি?—"বৃহতের ভূমা" বস্তুটি কি? খুব সাহস বটে! তবে লেখকের "যে 'স্বভাবগত রসাত্মিকী শক্তি, তাহা" যখন "স্বয়ম্প্রকাশ, স্বয়ং ক্রিয়াশীল" তখন আর ভাবনা কি? "শক্তি"টায় বোধ হয় একটু বদ্‌রস জমিয়াছে, নতুবা রসাত্মিকী হইত। লিখিবার শক্তি থাকিলেই যে তাহার অপব্যবহার করিতে হইবে, এর মানে কি? তাড়াতাড়ি—একেবারে ২।৩ দিনের মধ্যে—"খুব একটা মস্ত দার্শনিক লেখক" হইতে চেষ্টা না করিয়া, সাধনার দ্বারা অগ্রসর হইতে হয়। প্রবন্ধটী কি বীরবল না পড়িয়াই পত্রস্থ করিয়াছেন?

পণের মুক্তি—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। "এ সেই আদিম যুগের কথা। দেশ ছিল যখন বনে জঙ্গলে ঢাকা এবং মানুষের লজ্জানিবারণের উপায় ছিল—গাছের বাকল, পশুর চামড়া ও পাতার আচ্ছাদন"—সেই সময়ে হঠাৎ একদিন বাতাসে এক রাজকন্যার পরণের বাকল খসে' পড়ায় তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে

"বাতাসের ঘায়ে যে অচ্ছাদন খসে' পড়ে না, গায়ের ত্বকের সঙ্গে ত্বকের মতো ক'রেই যে আচ্ছাদন জড়িয়ে থাকে, সেইত নারীদেহের যোগ্য আচ্ছাদন !" তা' যদ্দিন না পাবো তদ্দিন "আলোবাতাসের স্পর্শ আমরণকালের জন্য আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু হয়ে রইল"। এই প্রতিজ্ঞা ক'রে রাজকন্যা একদম এক অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে পড়ে রইলেন। শেষে অনেক ব্যাপারের পর—রাজকন্যা একদিন অশ্রুমুখী পাটরাণীকে, নিজের পণের কথা শুনালেন, বল্‌লেন—" মা, তুমি রাজ্যের ভিতর ঘোষণা ক'রে দাও, যে আমার দেহের আচ্ছাদন গড়ে' দিতে পারবে এ দেহটাকে তোমরা তার পায়ে উৎসর্গ ক'রে দেবে।"—ইত্যাদি।

এক শিল্পীর বাগানে অনেক কাপাসের গাছ ছিল, শিল্পী এক যন্ত্র " আবিষ্কার " ক'রে তাই দিয়ে কাপাসের তুলোর সূতো কেটে রাশীকৃত করে তুল্‌লো। অর্থাৎ চরকার " প্রথম উদয় তব কারখানায় " হইল এবং সূতাতৈরি প্রথম সুরু হইল। শিল্পী একখানা খাঁটি খদ্দর তৈরি ক'রে রাজকন্যাকে দিলেন, রাজকন্যার পণ ভঙ্গ হল, শিল্পীর চরকায় রাজকন্যাও খুব সরু সূতো কাট্‌তে লাগলেন,—তু'জনে মিল হলো। বাস্‌। এই হইল প্লট। এই বিরাট প্লট লইয়া সবুজপত্রের পনরোটি পৃষ্ঠায় লেখকের গল্পমন্দাকিনী তর তর বেগে বহিয়া গিয়াছে। একটা গল্পেই সবুজপত্রকে এমাসে জাঁকাইয়া তুলিয়াছেন। এরূপ গল্প যদি লেখক সবুজপত্রে আরো গোটাকতক লিখিতে পারেন, তবে হয়ত মিঃ বীরবলকে সত্বরই সবুজপত্রের চিরসবুজ বক্ষ লাল আলোতে উদ্ভাসিত করিতে হইবে। আবোল-তাবোল যা' খুসি বকিলেই আজকাল প্রবন্ধ হয়। সে হিসাবে গল্পটী একটি মস্ত প্রবন্ধ। নতুবা ইহার ভিতরে এমন কিছুই নাই যে তার' গুণে সবুজপত্র কেন—কোনো পত্রের গাত্রে ইহারা স্থান হইতে পাবে। মিঃ বীরবলের সেই আজীবন অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সাহিত্যের পরিপুষ্টির প্রয়াস যে কতটা সার্থক হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা তিনি নিশ্চয়ই এই গল্প-কেশরীতে পাইয়া থাকিবেন, নতুবা ইহা ছাপিবেন কেন ? বীরবলের লেখায় একটা এমন প্রাণ আছে, যাহা পাঠককে অতর্কিত টানিয়া লইয়া যায়,—সে টানে মত্ত ঐরাবতকেও ভাসিয়া যাইতে হয়,—সেরূপ লেখা একটা মস্ত প্রলোভনের বস্তু ; তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া লেখক মহাশয় রাজবাড়ীর বিষাদ বর্ণনাচ্ছলে লিখিতেছেন, –

"দিনের পর দিন রাজপুরীর একটি আলোহীন, জনহীন কক্ষে বেদনা ও নিরানন্দের জাল বুনে বুনে রাজকন্যার দিন কাট্‌তে লাগলো। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আনন্দের স্বচ্ছ ধারা, যা' মানুষের হাসির ভিতর দিয়ে, গানের ভিতর দিয়ে ঝরণার মতো ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তো—তা'ও কোথায় লুকিয়ে, শুকিয়ে হারিয়ে, লুপ্ত হ'য়ে গেল।"

—লেখকের রাজকন্যা ব'সে ব'সে জাল বুনুন্‌, আমরা সরিয়া গেলাম। তবে যাওয়ার পূর্ব্বে একটা অনুরোধ,—অন্ততঃ বীরবল স্বয়ং মধ্যস্থ হইয়া (সবুজপত্র, পৌষ, পৃষ্ঠা ৩১৩) "শিল্পীর"—"নিজের দৃঢ় সবল করতলের ভিতর" হইতে "রাজকন্যার বাহুলতা" ছাড়িয়া দিন।

ঝরণার ঝারা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি। কবিতা। যতীন বাবু একজন সুকবি, তাঁহার কবিতা একটা উপভোগ্য বস্তু, হঠাৎ তিনি ঝরণায় গিয়া সর্দ্দি বাধাইলেন কেন ? এই কবিতায় সবুজপত্রের চেয়ে তাঁর যে বেশী ক্ষতি হইল। তাঁহার কল্পনার সুরতরঙ্গিণী যে এত সত্বর ভাঙ্গন ধরিল দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। বিলাতী onomatopœia পান করিয়া —যতীন বাবু গান ধরিয়াছেন—

"হরদম্‌ হরদম্‌ ধূলা বালি কর্দ্দম
লতা পাতা কুট্‌কাট্‌ চলে করে' লুটপাট,

ফুরসুত নাই তার, বিদ্যুৎ ভাই তার
হিমজল অঞ্চল অবিরল চঞ্চল,
কিঙ্কিণী কঙ্কণ রামধনু রং কোন্!
বালা আর চুড়ীতে বাজে শিলানুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্‌পাই আস্‌মান কম্‌পাই।”

তা’র পর যতীনবাবু কখনো—

“শিখরীর উচ্চে চমরীর পুচ্ছে,
আষাঢ়ের ঘটাতে সিংহের জটাতে,
নামে মহাঝম্পে হরিণের লম্ফে,”

বেড়াইতেছেন,—এবং ঝরণার চক্রগতি দর্শনে চকিত হৃদয়ে

“সাপ সাপ ঐ সাপ,—সর্ সর বাপ্ বাপ্!”

বলিয়া দশহাত পিছাইয়া যাইতেছেন, পরে চোখের ঝাপ্‌সা একটু কাটিলেই দেখিলেন

“সাপ নয় সাপ নয়—বরফের ধাপ নয়,
ও যে সেই ঝরণা গারিবরকরণা,
ও যে মোর ঝরণা আপনার, পর না!”

বলিয়া যেমন ঝরণাকে আক্‌ড়াইয়া ধরিতে গেলেন, অমনি—

“এইবার পাহাড়ে ঠেকে বুঝি ডাহাবে।”

বলিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমরাও কবির সঙ্গে সঙ্গে “ডাহা” বলিয়া বলিয়া পড়িলাম। কিন্তু বিলাতী “অনোমেটোপিয়া”র প্রভাবে ঝরণা আবার ছুটিল—অমনি কবিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন;—

গদ্ গদ্ গদ্ গদ্ চলে ফেরে তদ্বৎ
বুদ্ বুদ্ বুদ্ বুদ্ কেটে চলে বুদ্বুদ,
কল কল তল তল আঁখি দেখে ছল্ ছল্”

এইবার বোধ হয় কবি কাঁদিয়া পড়িবেন, আমরা বলি—

“থাম্ থাম্ আর না, থামা তোর কান্না
ঐ দেখ গঙ্গা তরলতরঙ্গা;
বিলিয়ে দে আপনায় থাকবে না ভাবনাই;

বাস্। কবিও বাঁচলেন, কবিতাও বাঁচ্‌লো, আর সেই সঙ্গে গরীব পাঠকরাও বাঁচ্‌লেন।

সম্পাদকের নিবেদন—প্রমথ চৌধুরী। কিছুকাল পূর্ব্বে “রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্বন্ধে নিজ মত সবুজপত্রে প্রকাশ করেন”—তা’র “ছুটি” “ধীরভাবে লিখিত ও সুলিখিত প্রতিবাদ” উপলক্ষে লেখক গোটাকতক চোখা চোখা, সত অথচ প্রিয় বচন বিন্যাস করিয়াছেন। প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ ও সুখপাঠ্য।

নাতনীর উদ্দেশে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা। চমৎকার! প্রথম চরণ পড়্‌তেই মনে পড়ে—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াঽপিবা।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ মনোনাপহৃতং যয়া॥

মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

মাতৃহারা—(কবিতা)—শ্রীঅমূল্যকুমার রায়চৌধুরী। কবিতাটি অতি সুন্দর। আবৃত্তিকালে অশ্রুসংবরণ করা দায়। স্থলবিশেষ তুলিলে ইহার অমর্য্যাদা করা হয়।

লক্ষ্মী ছাড়া—(কবিতা)—শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৫টি লাইনে পয়ার ছন্দে একটি লক্ষ্মীহীন গৃহশূন্য গৃহীর ভাঙ্গা সংসারের বুকভাঙ্গা বর্ণনা। অতি চমৎকার রচনা। সদাশিব বাঁশী বাজাইতে জানেন।

"ভৈরবী গেয়োনা"—(কার্ত্তিক মাসের "মাসিক বসুমতীর" চিত্রদর্শনে)—(কবিতা)—শ্রীঅমৃতলাল বসু। ছোট বড়তে, তেরটি লাইন্। কিন্তু এই তের লাইনে বর্ত্তমান বিপন্ন বঙ্গের অন্তঃপুরের বেদনা-দ্যোতক চিত্র যেরূপ ফুটিয়াছে, তাহাতে রসরাজ নটকুঞ্জর অমৃতলালের উদ্দেশে মস্তক নত হইয়া থাকে।

গজেন্দ্রর ভজন—(ক্রমশঃ) গল্প—শ্রীঅমৃতলাল বসু। যেটুকু পড়িলাম, বেশ লাগিয়াছে, সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় রহিলাম।

"হৃদয়ের তান"—(কার্ত্তিক মাসের "মাসিক বসুমতীর" ১ম চিত্র দর্শনে) একটি ছোট্ট কবিতা। এই "হৃদয়ের তান" লইয়া গত মাসের "বঙ্গবাণী"তে কিছু বলা হইয়াছে, সুতরাং ও সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। তবে নটশেখর কবিবর অমৃতলালের এই সুললিত ব্যঙ্গ কবিতা পাঠকালে ভারতচন্দ্রের—

"আজি দিবা দ্বিপ্রহরে
দেখিলাম সরোবরে,
কমলিনী বাঁধিয়াছে করী"

প্রভৃতি মনে পড়ে।

আজকাল বাংলাভাষা হইতে ব্যঞ্জনাবৃত্তি যেন লোপ পাইতেছে, সমস্তই এখন অভিধার দ্বারা চালানো হয়। এটা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিলে, ব্যঙ্গ বা ধ্বনি কাব্য অতি কমই দেখা যায়। সুকবি অমৃতলালের কৃপায় সেই ধ্বনি বা উত্তমকাব্যের মাঝে মাঝে আস্বাদ পাই, এটা পরম ভাগ্যের কথা।

প্রবাসী—পৌষ, ১৩৩২।

চিঠি—(এই চিঠিগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন।)

বোলপুর শান্তিনিকেতন ও সিলাইদহ হইতে এই চিঠি ক'খানা লিখিত। দু'একখানায় অনেক সুপাঠ্য ও জ্ঞাতব্য বস্তু আছে। কিন্তু ২।১ খানা আবার অদ্ভুত রকমের। সেগুলিতে আমরা ত কিছুই পাইলাম না। তবে ভালো ডুবুরি হইলে হয়ত মুক্তা ফলিতেও পারে। যেমন একখানা—

ওঁ শান্তিনিকেতন, ১০ মে ২৫

"কল্যাণীয়েষু

চারু, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবে না? একবার এসে কিছু আলাপ আলোচনা ক'রে যাও না। আপাততঃ আমি চলৎশক্তি-রহিত, ভাগ্যক্রমে এখনো বলৎশক্তি আছে। কিছু কাল পরেই আর একবার ইয়ুরোপ পাড়ি দেব।"

আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এচিঠির গূঢ়ার্থ বা শাঙ্করভাষ্য করা অসাধ্য। তবে—কি না—।

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের লেখনীভঙ্গিতে বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব,মধুসূদনের জীবনী বড়ই সুন্দর জমিয়াছে। আরম্ভ করিলে সারা না করিয়া উঠা যায় না। জ্ঞানেন্দ্র-বাবু পাঠককে মুগ্ধ করিতে জানেন। প্রবন্ধটী অতি চমৎকার হইয়াছে।

কাব্যকথা—কবিওকাব্য,—শ্রীসত্যসুন্দর দাস—কবি ও কাব্য লইয়া সত্যসুন্দর বাবু অনেক দরকারী কথা পাড়িয়াছেন, ও সমাধানেরও প্রয়াস করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সিদ্ধকামও হইয়াছেন। সেই আচার্য্য দণ্ডী বা তাঁরও পূর্ব্ব হইতে—রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য পর্য্যন্ত—শত সহস্র বৎসর যাবত ঐ কাব্যকথার আলোচনা হইয়াছে, সভ্যজগৎ যতদিন থাকিবে ততদিন হইবেও। সত্যসুন্দর বাবুর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধটী আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

মানসীও মর্ম্মবাণী—পৌষ, ১৩২৩।

সাহিত্য ও সত্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ। সুলেখক যতীন্দ্রমোহন একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক। ইতিপূর্ব্বে বহুস্থানে বহুবার, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের মদস্খলিত গমন দর্শনে ব্যথিত হইয়া, তিনি নির্ভয়ে ও দৃঢ়তার সহিত, অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গিও অতি সুন্দর। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে যতীন বাবু কোনো মৌলিক তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তবে—ভালো রাঁধুনীর হাতের পুঁই চচ্চড়ির মত তাঁহার প্রবন্ধটী আনন্দ দান করে। সমালোচনামূলক প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন হঠাৎ তদীয় "ধ্রুবতারার নায়ক উপেনকে" টানিয়া আনিয়া একটু অসংযমের পরিচয় দিলেও কিন্তু,—তাঁহার—"যেখানে কেবল বাস্তবতার নগ্নচিত্রই সাহিত্যের একমাত্র সম্বল, সে সাহিত্য সত্য হইলেও পাঠকের মনে রাস্তার ময়লার গাড়ীর বর্ণনার ন্যায়, কেবল ঘৃণার উদ্রেক করে,"—উক্তির আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিধ্বনি করিতেছি। চিরন্তন মঙ্গলসৃষ্টিই কবির কার্য্য। নিয়তির নিয়মে যাহা আছে তাহা—সেই সত্য কবি-সৃষ্টিতে থাকিবেই, উপরন্তু তদতিরিক্ত বস্তুও উপভোগ্য সহকারিরূপে ঐ স্বয়ম্প্রকাশ সত্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া সামাজিকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবে, এবং সেই উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ক্রমে রসভাবাদির স্ফুরণে উজ্জ্বলতম হইয়া চিরদিনের মত সামাজিকের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে, ঐ সৎ-সাহিত্যের প্রভাবে তাঁহারাও ক্রমে অপার আনন্দরসে ডুবিয়া যাইবেন,—এক বিন্দু কর্পূরের সম্পর্কে কলস কলস জলের মত, তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়টা সৌরভময় হইয়া উঠিবে;—এই হইল সাহিত্যের ধর্ম্ম। পাঠকের অজ্ঞাতসারে তদীয় হৃদয় সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখীর মত, সৎ-সাহিত্য-সৃষ্ট সাধু চিত্রের প্রতি অনুরক্ত হইবে, এবং তদ্দ্বারাই সমাজদেহ চিরমঙ্গলের করস্পর্শে চিরদিনের মত মঙ্গলময়ই হইয়া উঠিবে। এই হইল সাহিত্যের কার্য্য। এতবড় গুরুতর বিষয় লইয়া যতীন বাবু সাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু বোধ হয়, প্রবন্ধের সঙ্ক্ষিপ্ততা-নিবন্ধন তাহা এই একবারেই ফুটাইতে পারেন নাই। বারান্তরে হয়ত, তাঁহার নিকট আরও উপাদেয় বস্তু আমরা পাইব। পরিণত জীবনে ও পরিণত হস্তে "মর্ম্মন্তুদ" লিপি ভাষায় বড়ই অরুন্তুদ,—এটা কি যতীন বাবু বিস্মৃত হইলেন!

শেফালি—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত। ১৬ পংক্তি কবিতা। অজিতকুমারের এই কবিতা পড়িবার ও পড়িয়া পড়িয়া উপভোগ করিবার বস্তু। কালিদাসের পর ভারতের তদানীন্তন প্রায় সমস্ত কবিতাতেই

যেমন কালিদাসের ছায়ার আভাস পাওয়া যাইত, এখনকার প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই সেইরূপ বাঙ্গালার কালিদাস রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নবীন বঙ্গীয় কবি—রবীন্দ্রনাথের সত্তায় আত্ম-সমর্পণ না করিয়া পারেন না। অজিতকুমারের শেফালির প্রত্যেক পাপড়িটিও খুঁজিলে রবীন্দ্রনাথের মানসোদ্যানে পাওয়া যায়। তবে তাহাতে দোষ নাই।

তক্ষশীলা বিশ্বালয়—শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী, (মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।)—বড় বড় সভাসমিতিতে যে সব প্রবন্ধ চলে, মাসিক সাহিত্যে তাহা চালাইবার চেষ্টা সব সময় সুফলপ্রসূ হয় না। অনেক জিনিষ শুনিতে মন্দ না হইলেও কালিকলমের কষ্টিপাথরে কষিলে তাহার আর কিছুই থাকে না। আলোচ্য প্রবন্ধটিও সেই ধরণের; এটা না ছাপিলেই বিবেচনার কাজ হইত।

"রূপোপজীবিনী শালবতী-তনয়," "বিবাহযোগ্যা কুমারীগণকে," "জাত্যাভিমানের" এবং "ম্রিয়মান" ও "অপূর্ব্ব বারতা" প্রভৃতি অপূর্ব্ব পদাবলী দর্শনে আমরা পদকর্ত্তা হিরণকুমারকে কিছু না বলিলেও "মানসী"র প্রজাপতিকে কি বলিয়া রেহাই দিব? যদিও এই প্রবন্ধে (সরলার) "অতীত গৌরববাহিনী তক্ষশীলার অনুশাসনে" (দ্বিজেন্দ্র লালের) "মৌনমুখর" সাক্ষ্য ব্যতীত বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না—লেখকের একথা বর্ণে বর্ণে সত্য, তথাপি এইরূপ উদ্গীর্ণচর্ব্বণের আবশ্যকতা কি বুঝিলাম না। ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। আজকাল বঙ্গভাষায় "বারতা" "নিরখিয়া" "পরশনে" প্রভৃতি কবিতা সুন্দরীয় অঙ্গুলীচালনার আধিক্য দর্শনে মনে হইতেছে, সব বুঝি এইবার "কাব্যি" হইয়া যায়।

বাঙ্গালী সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যহীনতা—শ্রীঅনুকণা বসু সরস্বতী। গত কার্ত্তিকের মানসীতে বিবি সালেমাখাতুন ছিদ্দিকা বাঙ্গালী সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যহীনতা বলিয়া যে প্রবন্ধ লেখেন, ইহা তাহারই প্রতিবাদ, এবং সেই সঙ্গে বিবি সালেমার পুনঃ প্রতিবাদ।

এ বাদ-প্রতিবাদে একটা জিনিষ অন্ততঃ দেখিবার ও বুঝিবার আছে। একজনের টক্ করে' সুইচ্ টিপিয়া বিজ্‌লি বাতি জ্বালিয়া আকাশ প্রদীপ দেওয়া, ও সাঁঝের হাওয়ায় নিভে যাওয়ার ভয়ে আঁচলে ঢাকা তেলের প্রদীপ লইয়া ধীরে ধীরে আর একজনের তুলসী তলার দিকে যাওয়া,—দুইটাই সুদৃশ্য। বুঝিবার এইটুকু যে, অনেক গরীব পল্লীতে এমনও তেলের প্রদীপ জ্বলে, বিদ্যুতে একদম তা ঝল্‌সে যায় নি। প্রবন্ধটি মন্দ নয়।

ভারতবর্ষ,—(পৌষ ১৩৩২)

নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টি কর্ত্তা—আচার্য্য ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ইহা একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। তর্কবাগীশ মহাশয় একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। আলোচ্য প্রবন্ধে, যাঁহাদের ন্যায়ের পরিভাষায় অধিকার নাই তাঁহাদের তত রসগ্রহ হইবে না। প্রবন্ধটিতে শিখিবার বহু জিনিষ আছে এবং ইহা দ্বারা পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

গৃহস্থালী—শ্রীনির্ম্মলা দেবী। বঙ্গের বর্ত্তমান অন্তঃপুর-বাসিনীদের অবশ্য-পাঠ্য-প্রবন্ধ। ছিল একদিন, যখন, শিশুর কান্ কামড়ালে বা গা' গরম হলে'ই শুধু নীলরতনকে বা ডাঃ বিধান রায়কে বিরক্ত করতে হতোনা, গৃহদেবীগণ তাঁহাদের নিজের নিজের ওষুধের চুপ্‌ড়ি বের্ করে' এটা-ওটা ঘসে খাইয়ে দিয়ে ও প্রলেপ দিয়েই শিশুকে সেরে তুল্‌তেন, আজ আর তা' নাই। নির্ম্মলার নির্ম্মল লেখায় সেই পুরাতন ছবির শীর্ণমূর্ত্তি মনে পড়িতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরচ্চন্দ্র পর্য্যন্ত কতজনে কতরকমে সময়ে অসময়ে বাংলার সামাজিক ক্ষত চিকিৎসার জন্য কত প্রকার ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন, তেমন বিশেষ কোনো ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এইবার যদি নির্ম্মলার এই

ঔষধে কোনো ফল হয়, ভাগ্যের কথা। সেকালের গৃহিণীদের মত, নির্ম্মলা দেবী সর্দ্দি-কাতর বাঙ্গালীর অন্তঃপুর সমাজকে আদার রস ও মধুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেখিলেও ভরসা হয় যে, হাওয়া বুঝি ফিরিতেছে।

৭. অরণ্যের আহ্বান—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি, এ। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতায় অঙ্গ অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রত্যেক মাসিকই ব্যস্ত, তাই প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার কবিতা পরিদৃষ্ট হয়, ফলে হইতেছে এই—ক্রমে যেন আমাদের স্বভাবকবি কবিশেখরের কল্পনার মন্দাকিনীর গতি মন্দ, মন্দতর হইয়া আসিতেছে, ভয় হয় শেষে মন্দতম হইয়া না পড়ে। বনভূমি ভারতের ভূপকে কহিতেছেন—

"পঞ্চাশোর্দ্ধে ভারতের ভূপ, আমার দীর্ঘ বিরহ হর,"—আমরাও কবিকে কহি—পঞ্চাশোর্দ্ধে বাঙ্গালার কবি—

কিছুকাল তুমি নীরব থাক ;——

অন্ততঃ ২।১টা বৎসর একটু থিতাইয়া তার পর আবার বাঁশীতে তান ধরিলেই ভালো হয়। বাঁশী ভালো বাজিবে।

সেকালের তীর্থযাত্রী (কবিতা)—শ্রীকামিনী রায় বি, এ, (শ্রীক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায়)—গৈরিকস্রাবের মত অবাধিতভাবে কবির কল্পনা বহিয়া চলিয়াছে। কবিতাটি পাঠ করিবার সময়ে কেমন যেন একটা গরকেরা অপ্রকাশ্যভাবে পাঠকের হৃদয় ভরিয়া আসে।

"পায়ের ক্ষত, গায়ের জ্বর, বুলিয়ে পদ্মহাত,
ভুলিয়ে দিলেন এক নিমিষে স্বয়ং জগন্নাথ।
হাত নাই তাঁর ? বলিস্ কিবে ? আমার সারা গায়ে,
হাতের স্পর্শ প্রলেপ আছে ;—"

পড়িতে পড়িতে আপনাকে হারাইয়া যাই, মুমূর্ষু জগন্নাথ যাত্রীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে গিয়া অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হই। ইহা কবিশক্তির পরম উৎকর্ষ।

দক্ষিণাপথ—মান্দ্রাজ—রায়শ্রীজলধর সেন বাহাদুর, রায় বাহাদুর হইবার পূর্ব্বেই জলধর বাবুর উত্তর ভারত পরিক্রমার পরিচয় আমরা তদীয় হিমালয়ে পাইয়াছি, এবার তিনি রায় বাহাদুর সাজোয়ার সন্নদ্ধ হইয়া দক্ষিণাপথ বিজয়ে বাহির হইয়াছেন, অর্থাৎ বর্দ্ধমানপতির "ধিরাজকুমারের" সহিত মান্দ্রাজ বেড়াইতে গিয়াছেন, এটা তাহারই বর্ণনাপত্র। সৌভাগ্যের আদরের দুলালের সহিত ভ্রমণ, সুতরাং কোনো অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া আইন কলেজের পর্য্যন্ত ফটো তোলা হইয়াছে, জলধর স্বয়ং ভারতবর্ষের সম্পাদক, সুতরাং ব্লকেরও অভাব থাকিবে কেন ?—প্রয়োজন অপ্রয়োজন সর্ব্বদাই কোথাও অন্বয়মুখে কোথাও বা ব্যতিরেকমুখে—বর্দ্ধমানাধিরাজও তদীয় ধিরাজকুমার, এবং তদ্বংশ পরম্পরার উদ্দেশে পুষ্পবৃষ্টি। ইহাতে পাঠকের বা ভারতবর্ষ পত্রিকার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হোক্ বা না হোক, রায় বাহাদুরের যে উদ্দেশ্যে এই ভ্রমণ কাহিনী লেখা, তাহার কতকটা সিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে "তৈল"—প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন যে, "ইহা দিয়া রাখো, আজ না হোক, কাল কাজে লাগিবে।" ইত্যাদি—আমাদের আজ সেই কথা মনে পড়িতেছে। প্রবন্ধটীতে সাধারণের জানিবার মত কিছু দেখিলাম না।

সুদর্শন।

শোক সংবাদ

স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়

বঙ্গের ভূস্বামী-সমাজের গৌরব ও অলঙ্কার নাটোরের খ্যাতনামা জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত। আমরা যখন অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, কলিকাতার ঘোড়-দৌড়ের মাঠে বহুলোকের জনতার মধ্যে জগদিন্দ্রনাথ দৈবাৎ একখানি মোটর গাড়ির সংঘর্ষে আঘাত পাইয়াছিলেন, তখন কিছুতেই মনে হয় নাই যে তাঁহার আঘাতের ফল শোচনীয় হইবে। সাহিত্য-চর্চ্চায় ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে তিনি গভীর আন্তরিকতায় ও উৎসাহে যত কাজ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি নিজে কবি ছিলেন ও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, দেশের সকল বড়বড় সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল ও তিনি অনেক সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রক্ষণাধীনে ও সম্পাদকতায় "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকা যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিতেছিল। যেদিন তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পাদিত হইবে সেই ১লা মাঘ মানসী পত্রিকার জন্মদিন। ২১শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ সময়ে নিজের কলিকাতার বাসভবনে ৫৮ বৎসর বয়সে জগদিন্দ্রনাথের জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রামজীবন ও রাণীভবানী যে বংশের চিরস্মরণীয় গৌরব, সেই বংশের এই কৃতি ব্যক্তির বিয়োগ-বার্ত্তা, এখন বাধ্য হইয়া অতি অল্প কথায় লিখিতে হইল ; তিনি দেশের শিক্ষিতদের নিকটে সুপরিচিত, হয়ত তাঁহার কথা এখন অধিক করিয়া না বলিলে চলে। জগদিন্দ্রনাথের পরিবারবর্গের সকলকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যে সমস্ত মহাপ্রাণ বাঙ্গালীর জন্য বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের অন্যতম কাণপুরের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৩শে অগ্রহায়ণ ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন।

২৪ পরগণার বারাসাত মহাকুমার অন্তঃপাতী রঙ্গপুর গ্রামে মাতুলালয়ে মহেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান---কালীঘাট। ৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অনেক সময়ে একবেলাও অন্ন জুটে নাই, আলোকের অভাবে রাস্তার আলোকে মহেন্দ্রনাথের পাঠাভ্যাস করিতে হইয়াছে।

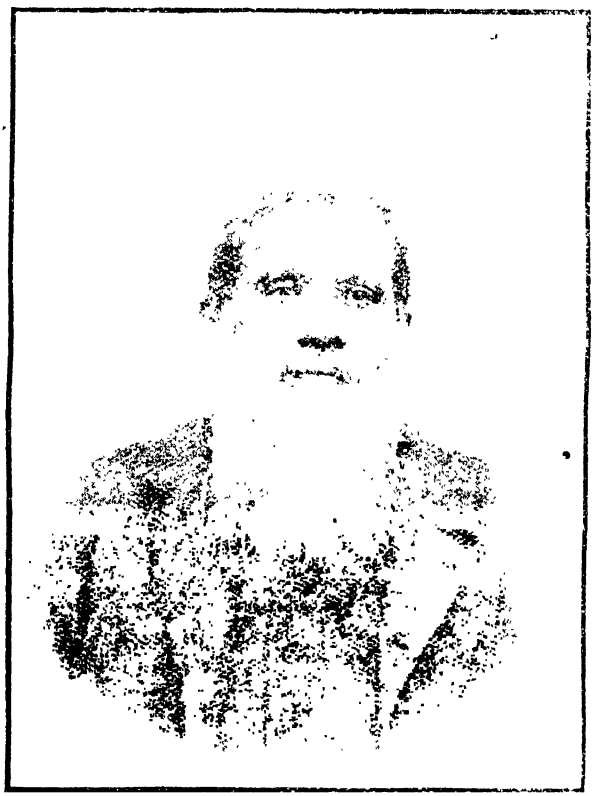
১৮৭৩ সালে লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৮৭৮ সালে মেডিক্যাল কলেজ হইতে শেষ ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহেন্দ্রনাথ পাণিহাটী গ্রামে ডাক্তারি আরম্ভ



নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সৌজন্যে।

করেন। কিন্তু পরে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এলাহাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি কাণপুরে ডাক্তারি করিতে যান। জাতি যাইবার আশঙ্কায় সে সময়ে কাণপুরে কেহই এলোপ্যাথিক ঔষধ খাইত না। এইজন্য ইহার পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. জি. কর মহাশয়কে কাণপুর পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু উৎসাহী মহেন্দ্রনাথ প্রথমে গুঁড়া ঔষধ ও পরে গঙ্গাজলে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়া কাণপুরে এলোপ্যাথি ঔষধের প্রচলন করেন এবং অচিরকাল মধ্যে অর্থ, সামর্থ্য, নাম ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।



ইহার পর হইতে কাণপুরের দেশহিতকর যে-কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ফ্রি মেশন (Free Mason)। তাঁহাকে "Ganges Lodge"এর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাণপুরের থিওজফিক্যাল সোসাইটি, হিন্দু অর্ফানেজ, আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়, ভৈরব ঘাটের শ্মশান ঘাট, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানের সহিতই তাঁহার নাম বিজড়িত।

কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কালীঘাটে বাস করিবার জন্য পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটায় ২নং হালদারপাড়া রোডে তিনি প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৌজন্য, আতিথেয়তা, দেশপ্রীতি তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালীর জন্য মহেন্দ্রনাথের কাণপুরের "কালীঘাট হাউস" নামক নিজবাটী সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "প্রবাসের পত্রে" লিখিয়াছিলেন—

"আজ আমি কাণপুরে। সৌজন্যতার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কাণপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার, আমাকে ষ্টেশন হইতে আদরে তাঁহার বাটীতে লইয়া আসেন। তিনি দাসত্বশৃঙ্খল চরণে ঠেলিয়া এখানে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেছেন, কাণপুরে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহের নিম্নতল ডাক্তারখানা, উপরের প্রকোষ্ঠ সকল আবাস গৃহ। ডাক্তারখানা শুনিয়া তুমি হয়ত কেষ্টর অয়েল চিরতা ও কুইনাইন মনে করিয়া নাক সিট্‌কাইতেছ। এ তাহা নহে, মহেন্দ্রবাবুর ডাক্তারখানা একটী ক্ষুদ্র ইন্দ্রালয়। এমন সুন্দর, সুসজ্জিত বাঙ্গালীর ডাক্তারখানা কোথাও দেখি নাই। ডাক্তার খানার মধ্যে তাঁহার বসিবার কক্ষটীর গবাক্ষ সকল সুরঞ্জিত চিত্র দৃশ্যাবলির দ্বারা সুসজ্জিত। কক্ষের প্রাচীরে চীনদেশীয় নরনারীর বিচিত্র চিত্র শোভিতেছে। কক্ষস্থিত দ্রব্যাদি ঝক্ ঝক্ করিতেছে! তাঁহার সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপের পর এতদূর সম্প্রাণতা হইয়াছে, এবং তিনি এত আদর করিতেছেন যে আমার কাণপুর ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না।"

গ্রন্থ পরিচয়

জৈনপদ্মপুরাণ (কথাসার)—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, বি, এ প্রণীত। ৪৮ পৃঃ. মূল্য আট আনা।

জৈনদের পদ্মপুরাণে রামচরিত যেরূপ বর্ণিত আছে এই কথাসার গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জৈনদের পদ্মপুরাণ সংস্কৃতে রচিত আছে, আর জৈন প্রাকৃতে বা প্রাচীন অপভ্রংশেও রচিত আছে; যেখানি প্রাচীন অপভ্রংশে রচিত, এদেশে সেখানি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে বড় উপকার হয়। সে গ্রন্থ বহুলোকে পড়িবে না বটে, তবে ধনী জৈনেরা এদেশে ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার সুবিধার জন্য আপনাদের সমাজসিদ্ধ বদান্যতায় সে কাজটি যাহাতে করেন, তাহার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য প্রভৃতিতে নানাভাবে রামচরিত পাওয়া যায়; সেগুলি সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গে তুলনায় সমালোচিত হইলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই কথাসার খানিতে কেবল গল্পের সারভাগ দেওয়া হইয়াছে; তাহা পড়িয়াও সাধারণ পাঠকদের কৌতূহল বাড়িতে পারিবে।

সঙ্গীত গুরুপ্রসাদ—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। ১২৫ পৃঃ; মূল্য ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থখানির এক ভাগে রাগ-রাগিণীর বিবরণ আছে ও অন্যভাগে কতকগুলি ওস্তাদি গান

আছে। রাগ-রাগিণীগুলির জন্ম ও পরিবর্দ্ধনের ইতিহাস যেরূপ ভাবে দিলে সকল শ্রেণীর নিকটে উহা শিক্ষণীয় হয়, সেভাবে দেওয়া হয় নাই; সঙ্গীতে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা হয়ত ঐ বিবরণ হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারেন। মুসলমানদের আমলে প্রাচীন কালের গানের সুর কি কি নামে ও কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও খুঁজিয়া পাই নাই; হয়ত এই গ্রন্থ প্রণেতা সেরূপ বিবরণ লিখিতে পারিতেন। যেগান গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে গাইতে হইবে, তাহাও সঙ্গীতের সঙ্কেত চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পল্লীব্যথা ও মঞ্জুমালতী (কবিতার বই)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত; দুইখানিরই মূল্য এক টাকা করিয়া।

এই কবিতার বই দুই খানির রচয়িতা বঙ্গবাণীর পাঠকদের নিকটে সুপরিচিত; আমরা তাঁহার অনেক সুরচিত কবিতা অনেক সময়ে পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছি। এই বই দুইখানিতে ৬৭টি কবিতা আছে আর উহার অনেক গুলিই সুখপাঠ্য।

বৈষ্ণব সাহিত্য—শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ৩৭ পৃঃ; মূল্য দুই টাকা।

বইখানিতে খুব সুশৃঙ্খলায় ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে গ্রন্থকারের আলোচনার স্থানে স্থানে জ্ঞাতব্য কথা আছে। যাহা হউক এখন সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন; আশাকরি যাঁহারা এ আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের এই বইখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন।

মাঘে

স্যার্ আবদুর রহিম—যিনি সরকারি চাকুরিতে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ও অল্পদিন পূর্ব্বে লর্ড লিটন বাহাদুরের পদে অস্থায়িভাবে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইবার যাঁহার দাবি ছিল,—আর সেই দাবি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া এদেশের সকল "অমুসলমান" যাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই স্যর্ আবদুর রহিম সম্প্রতি আলিগড়ে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। দেশের শাসনকর্ত্তা হইতে হইলে যাঁহাকে নিরপেক্ষভাবে সমান অনুরাগে দেশের সকল জাতি, ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়, সেরূপ উপযোগী ব্যক্তি যদি নিজের ধর্ম্মমতের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট বিরোধী হ'ন্, অথবা তীব্রভাবে নিজের মনে অন্যের প্রতি বিরোধভাব পোষণ করেন, তবে দুঃখ ও কষ্ট হয় অনেক। যে ইউরোপীয়েরা স্যর আবদুরের বক্তৃতার অনেক মন্তব্য সাদরে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে তিনি হিন্দুদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে

ক্রোধের উত্তেজনা যথেষ্ট আছে'। কথাটা আমরা বলিলে শোভন হইত না বলিয়া পরের উক্তির উদাহরণ দিলাম।

এদেশে হিন্দু আছে, জৈন প্রভৃতি আছে, খৃষ্টান আছে, এনিমিষ্ট নামে পরিচিত অতি অধিক সংখ্যায় আর্য্যেতর জাতির লোক আছে; আর এই সকল শ্রেণীর জাতির লোকসংখ্যা দেশের ৩২ কোটি লোকের মধ্যে ২৫ কোটি। তবুও যখন রাষ্ট্রীয় সকল অধিকারের দাবির প্রসঙ্গে একদিকে একভাগ করিয়া ধরা হয় মুসলমানকে, আর বহুগুণে বড় ভাগকে অ-মুসলমান বলিয়া ধরা হয়, তখন আমরা কোন ওজর আপত্তি করি না। সকলের উপরে মুসলমানদের এতখানি প্রশস্ত অধিকার থাকিতেও যদি হিন্দুকে মুসলমানের স্বার্থের বিরোধী বলিয়া তিরস্কৃত হইতে হয়, তবে হিন্দুরা বুঝিতেই পারে না যে মুসলমানদের জন্য আর কতখানি পথ ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা কোণ-ঠেসা হইয়া থাকিবে। হিন্দু প্রভৃতি জাতির লোকের মধ্যে যাহারা লেখা-পড়া শিখিবার ভাল সুবিধা পায় না ও চাষ বা শ্রমশিল্পের কাজ করিয়া খায়, আর যে অনার্য্য জাতির লোকেরা নিম্নস্তরের হিন্দুদের মত চাষ প্রভৃতি কাজ করে ও ভাল শিক্ষা পায় না, তাহাদের সঙ্গে যদি সামাজিক অবস্থার হিসাবে বঙ্গের মুসলমান কৃষকদিগকে একদলে ফেলা হয়, তবে দেখা যাইবে যে যাঁহারা চাকুরি ও সম্মানের জন্য বিশেষ দাবি করেন সেই মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের সংখ্যা অপেক্ষা কত অল্প। যে সময় নিম্নস্তরের মুসলমানদিগকে লেখা-পড়া শিখাইয়া বড় করিবার কথা হয়, তখন নিম্নস্তরের যে সকল হিন্দু-অহিন্দু জাতির লোক আছে তাহাদের কথা কোন প্রকার নীতিতে মুসলমানদের দাবি অপেক্ষা ছোট করিয়া বিচার করা চলে না। যাহা চলে না, তাহাও হইতেছে, তবুও স্যর্ আবদুর রহিমের আবদার মেটে না।

স্যর আবদুর রহিম বলিয়াছেন যে মুসলমানেরা পরিচ্ছদে, আহারে, সামাজিক আচারে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে, ধর্ম্মমতে ও জীবনের লক্ষ্যের গণনায় হিন্দু হইতে এত ভিন্ন, যে কিছুতেই উভয় দলের সঙ্গে মিল হইতে পারে না, ও কিছুতেই কোন যোগ্য হিন্দুকে মুসলমানেরা কর্ত্তা বা শাস্তা বলিয়া বরণ করিতে পারে না। মুসলমানদের এত বড় যোগ্য মুখপাত্রের কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের উন্নতির সকল কল্পনাই অসার হইয়া দাঁড়ায়। রহিম মহাশয়ের বিচারে হিন্দুরা সকল অমুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়া এক রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কাজ করিতে পারে,—জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও এনিমিষ্টদের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্ব করিতে পারে, কিন্তু সাম্য ও মৈত্রীবাদী মুসলমানদের সঙ্গে কিছুতেই নাকি একজোটে কাজ করিতে পারে না।

যে মজলিসে শ্রীযুক্ত রহিম সাহেব হিন্দুদিগকে অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা বলিয়া গালি দিয়া মুসলমানদের উদারতা ও সাম্য-নীতির কথা বলিয়াছিলেন, সেখানে আলোয়ারের মহারাজ বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন; মজলিসটি বসিবার মুখেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে ঐ হিন্দু রাজা মুসলমানদের ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষার সুবন্দোবস্তের আনুকূল্যে পূর্ব্বে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন ও সেই মজলিসের

দিনে আরও বহু সহস্র টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অমুদার ও সঙ্কীর্ণমনা হিন্দুরা অন্য অনেক স্থলে এইরূপ কাজ যাহা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিব না; কেবল জিজ্ঞাসা করি যে সাম্যবাদী, উদার মুসলমানেরা কাফেরদের ধর্ম্মশিক্ষার অথবা সামাজিক উন্নতির জন্য কোথাও একটি পয়সা ব্যয় করিবার ইতিহাস আছে কিনা। গোড়ায় যে ধর্ম্মের উন্নতিবিধায়ক ছিলেন সাধু-কুল-তিলক ওমর ও আলি, ও যে ধর্ম্মের বিস্তারকারীরা একদিন স্পেনে ও অন্যত্র জাতি নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য সমানে উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মমণ্ডলীর একজন একালের সুশিক্ষিত ব্যক্তি আজ যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য মর্ম্মাহত হইয়া এই কথাগুলি লিখিলাম, বিবাদ বাড়াইবার জন্য নয়।

উপসংহারে আর একটি বিষয় উল্লেখ করিব। স্যার আবদুর রহিম তাঁহার বক্তৃতার সময়ে ও পরে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, শুদ্ধি সংগঠনের পরিচালকেরা মুসলমানকে হিন্দু করিবার জন্য যে উদ্যোগ করিয়াছেন, তাহার জন্য সেই শ্রেণীর লোকেদের প্রতি তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম, ও তাহার দাদ্ তুলিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প। ইউরোপীয় খৃষ্টান সমাজের লোকেরা মুসলমান ও অমুসলমান সকলকেই খৃষ্টান করিবার উদ্যোগ করেন ও অনেক মুসলমানকে খৃষ্টান করিয়াছেন; এস্থলে তিনি ও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভুলিয়াও কখন ক্রোধের বা উত্তেজনার ভাষা ব্যবহার করেন নাই। আর মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে বহু কোটি অ-মুসলমানকে এদেশে মুসলমান করিয়াছেন, ও এখনও তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা চলিয়াছে। স্বাধীনভাবে সকলেই যেখানে ধর্ম্মপ্রচারে অধিকারী সেখানে শুদ্ধি সমাজের লোকেরা চোর-দায়ে ধরা পড়িবে কেন?

* * * *

দেশীয় খৃষ্টান সমাজ—গত খ্রীষ্ট মাসের ছুটিতে কলিকাতায় দেশীয় খৃষ্টান সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভার সভাপতি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে এখন খৃষ্টানের সংখ্যা ৩০ লক্ষের উপর। দেশীয় খৃষ্টান সমাজ দলে এত পুরু, তবুও ঐ সমাজের শিক্ষিত নেতারা রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রভৃতির দাবি করেন নাই, বরং দেশের সকলের সঙ্গে জুটিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবার কথাই বলিয়াছেন। মুসলমানদের মত খৃষ্টানদের সামাজিক ঐতিহ্য আদম্ ইব্ ধরিয়া,—প্রাচীন বাইবেলের বিবরণ ধরিয়া,—হিন্দুদের বেদ-পুরাণ ধরিয়া নয়। তবুও কিন্তু খৃষ্টানেরা সকল শ্রেণীর অ-খৃষ্টানদের সঙ্গে মিলিয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইতে পারেন। ব্রাহ্মপ্রচারকেরা যদি খৃষ্টানদিগকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তবে খৃষ্টানেরা যে ব্রাহ্মদের মাথার উপর সংহারদণ্ড তুলিতে চান্ না, তাহাও কতকটা জানা আছে। ধর্ম্মমতে ও সামাজিক ঐতিহ্যে গুরুতর প্রভেদ সত্ত্বেও ভাবে সুধী ও সাধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের সকলের

সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। জীবিতদের মধ্যে অনেকের নাম করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তুলনা করিলে মুসলমানেরা এমন কিছু বিশিষ্টতা দেখাইতে পারেন না, যাহার জন্য তাঁহারা অ-মুসলমানদের প্রতি তাঁহাদের গভীর বিদ্বেষ-বুদ্ধির সমর্থন করিতে পারেন। দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের যথার্থ কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিয়া যদি আমরা সকলে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলেই সকল বিদ্বেষ দূরে চলিয়া যায়। আশা করি স্যার আবদুর রহিম প্রমুখ বিজ্ঞ মুসলমানেরা খৃষ্টান সমাজের সুবিচারের দিকে দৃষ্টি দিবেন।

আমাদের উন্নতির পথ—সম্প্রতি বিলাতের ডেইলি মেল পত্রের একটি উক্তি পড়িয়া সুখী হইলাম; উক্তিটি আমাদের আশার ও কামনার সম্পূর্ণ অনুরূপ বলিয়া সুখী হই নাই, একটি খাঁটি সত্য কথা চাতুরীর আবরণে ঢাকা পড়ে নাই বলিয়া সুখী হইয়াছি। ভারতের শাসন সংস্কারের যে প্রস্তাব ও আলোচনা চলিয়াছে, তাহারই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, কোন শাসন বিধি রচিবার আগে অতি স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজের পক্ষে বলা উচিত যে এদেশের শাসনে ও রক্ষায় ইংরেজেরা কতখানি অধিকার কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। এদেশটিকে যে ইংরেজেরা তাঁহাদের অর্জ্জিত সম্পত্তিরূপে রাখিবেনই রাখিবেন, আর এদেশ ইংরেজেরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা যে রক্ষিত হইবেই হইবে, ইহা স্পষ্ট ভাষায় গোড়ায় বলিয়া দিবার জন্য উক্ত পত্রে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় শ্রীমতী এনি বেসান্ত কংগ্রেসের সভানেত্রীরূপে তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন, তখন উহার সমালোচনায় অতি বিস্তৃতভাবে এবিষয়টি ঠিক ঐ ভাষায় লিখিয়াছিলাম, আর এই পত্রিকায় বারে বারে এই কথাটি পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। আমাদের সকল অধিকারের দাবি, ইংরেজের যে শাসন নীতিতে নিয়মিত হইতেছে ও হইবে, তাহা ভুলিলে চলিবে না; সত্য যতই অপ্রিয় হউক, সজাগ হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। আমরা যে সকল অধিকার চাই তাহা যে ইংরেজের পক্ষে এদেশ রক্ষার নীতির অনুকূল, তাহা না বুঝাইয়া দিলে ছলে ও কপটতায় এই উত্তর ধ্বনিত হইবে যে আমরা শাসনের দায়িত্ব পাইবার উপযোগী হই নাই। সরকারের সঙ্গে Co-operation করিয়া বা সহযোগে কাজ করিবার অর্থ—এই নীতি মানিয়া চলা; যাঁহারা এভাবে সহযোগ চান্ না, তাঁহাদের কোন প্রস্তাব শাসন-সংস্কারে গৃহীত হইবে না। শাসনের দায়িত্ব হাতে নিতে হইলে শাস্তাদের দায়িত্ব রক্ষা করিতে হইবে।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.